ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম

ডঃ শ্রীমতী অঞ্জলি কাঞ্জিলাল এম্. এ., পি-এইচ. ডি.
অধ্যাপিকা শ্রীশিক্ষায়তন কলেজ, কলিকাতা,
প্রাক্তন অধ্যাপিকা প্রসন্নদেব উইমেন্স কলেজ, জলপাইগুড়ি

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

পরম পূজনীয় বাবা শ্রীজগদীশচন্দ্র চক্রবর্তী

ও

পরম পূজনীয়া মা শ্রীমতী শান্তিময়ী চক্রবর্তী

শ্রীচরণেষু

ভূমিকা

আমার ছাত্রী কল্যাণীয়া শ্রীমতী অঞ্জলি কাঞ্জিলাল (চক্রবর্তী) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অধীনে পি-এইচ ডি উপাধির জন্য 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম' বিষয়টি নিয়ে গবেষণা শুরু করে।

ছাত্রী-জীবন থেকেই দেখে আসছিলাম, শ্রীমতী কাঞ্জিলালের মধ্যে কেবল মাত্র যে গতানুগতিক একটি সাহিত্য-প্রীতি ছিল তাই নয়, সাহিত্য ও সমাজ-দর্শনের সে একজন প্রকৃত বোদ্ধা ছিল। সাহিত্যেরই হোক, কিংবা সমাজ-নীতিরই হোক অনেক দুরূহ বিষয়ও অতি সহজেই সে বুঝতে পারত ; সেইজন্য তার প্রতি আমার বিশ্বাস ছিল, কারণ, আমি জানতাম যে, যে-বিষয়টি সে তার গবেষণার জন্য নির্বাচন করেছে, তা নিতান্ত সহজসাধ্য নয়।

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেন এবং স্বর্গত ডঃ নীহাররঞ্জন রায় প্রমুখ বিশিষ্ট অধ্যাপকগণ তার গবেষণা-পত্র পরীক্ষা করে লেখিকাকে উচ্চ প্রশংসা করেন। তাঁরাই গবেষণা-পত্রটি মুদ্রণের পরামর্শ দিয়েছিলেন। তথাপি মুদ্রণ কার্যে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। গবেষণা-গ্রন্থটি প্রকাশ করবার পূর্বে তার একটি ভূমিকা লিখে আমি আনন্দের সঙ্গে পাঠক সমাজে তাকে উপস্থিত করে দেবার ভার নিয়েছি।

ইংরেজি 'প্যাট্রিয়ট্' এবং 'প্যাট্রিয়টিজম্' শব্দ দুটির বাংলা কোনো প্রতিশব্দ নেই। সাধারণভাবে কাজ চালানোর মত দু'টো শব্দ আমরা তাদের জন্য ব্যবহার করি 'স্বদেশপ্রেমিক' এবং 'স্বদেশপ্রেম'। কিন্তু 'স্বদেশপ্রেম' কথাটি ইংরেজি 'প্যাট্রিয়টিজম্' কথাটি থেকে অনেক বিস্তৃত বা ব্যাপক অর্থবহ ; তার তুলনায় 'প্যাট্রিয়টিজম্' শব্দটির অর্থ অনেক সঙ্কীর্ণ। ইংরেজিতে 'প্যাট্রিয়ট্' শব্দটির অর্থ যে ব্যক্তি স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষাকারী কিংবা তার অন্ধ সমর্থক। কিন্তু 'স্বদেশপ্রেম' শব্দটিতে কেবল মাত্র দেশের রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথাই বলা হয় না, তার রাজনৈতিক স্বাধীনতা না থাকলেও আরো বহুবিধ কার্যে স্বদেশের প্রতি প্রীতি ও ভালবাসা প্রকাশ পেতে পারে, তার জন্যও জীবন উৎসর্গ করবার দৃষ্টান্তও আছে, তাতে তাও বুঝায়। দীর্ঘকাল পরাধীন এই দেশে আমাদের স্বদেশের স্বাধীনতা লাভের চিন্তা কিংবা কর্ম কোনটিই বেশীদিনের নয়, কিন্তু স্বদেশপ্রেম বহু দিনের। কোন আধুনিক রাজনৈতিক চিন্তাধারার সঙ্গে যুক্ত হবারও বহু পূর্ব থেকেই স্বদেশপ্রেম আমাদের জীবনে সত্য হয়েছিল।

স্বদেশপ্রেমের মধ্যে দীর্ঘকাল যাবৎ রাজনৈতিক চিন্তার কোনো স্থানই ছিল না। জননীর সঙ্গে জন্মভূমির তুলনা করার মধ্য দিয়েই এই বিষয়টি বুঝতে পারা যাচ্ছে।

গর্ভধারিনী জননীর সঙ্গে যেমন কোন রাজনৈতিক ধ্যানধারণার* সম্পর্ক নেই, জন্মভূমি বা দেশের মাটির সঙ্গেও তেমন বহুদিন পর্যন্ত আমাদের কোন রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ক্রমে বহুকাল পর জাতীয় চেতনা উন্মেষের লগ্নে জন্মভূমির সঙ্গে যখন রাজনৈতিক চেতনা এসে যুক্ত হল তখন থেকেই জননী ও জন্মভূমি একাকার হয়ে গেল। তার পূর্ব পর্যন্ত জননী এবং জন্মভূমি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেই বর্তমান ছিল। রাজনৈতিক চেতনা জন্মলাভ করবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দেশে মাতৃভূমির চেতনাও জন্মলাভ করল, ক্রমে এই ভাবনা সাহিত্যের মধ্যে প্রবেশ করে তা একটি ভাবমূর্তি গড়ে তুলল। যা ছিল প্রত্যক্ষ, তা অপ্রত্যক্ষ ভাবাদর্শে পরিণত হল। মাতৃভূমি হলেন বঙ্গজননী, ক্রমে তিনিই ভারতমাতা হলেন। তাতে রাজনৈতিক আন্দোলন দেশব্যাপী একটি অখণ্ড এবং সংহত রূপ পেল সত্য, কিন্তু যে প্রত্যক্ষ জননী এবং জন্মভূমিকে আশ্রয় করে একদিন সমাজে শ্রদ্ধা এবং প্রেমের বাস্তব ভাবনা গড়ে উঠেছিল, তা কেবল মাত্র ভাবমূর্তির উপাসনা করতে গিয়ে শক্তিহীন হয়ে পড়ল—কারণ তা নিরাকার আদর্শ।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "আইডিয়া যত বড়োই হউক, তাহাকে উপলব্ধি করিতে হইলে একটা নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ জায়গায় প্রথম হস্তক্ষেপ করিতে হইবে। তাহা ক্ষুদ্র হউক, দীন হউক, তাহাকে লঙ্ঘন করিলে চলিবে না দূরকে নিকট করিবার একমাত্র উপায় নিকট হইতে সেই দূরে যাওয়া। ভারতমাতা যে হিমালয়ের দুর্গম চূড়ার উপরে শিলাসনে বসিয়া কেবলই করুণ সুরে বীণা বাজাইতেছেন, এ কথা ধ্যান করা নেশা করা মাত্র। কিন্তু ভারতমাতা যে আমাদের পল্লীতে পঙ্কশেষ পানাপুকুরের ধারে ম্যালেরিয়াজীর্ণ প্লীহারোগীকে কোলে লইয়া তাহার পথ্যের জন্য আপন শূন্য ভাণ্ডারের দিকে হতাশ দৃষ্টিতে চাহিয়া আছেন, ইহা দেখাই যথার্থ দেখা।"

(রবীন্দ্র রচনাবলী, শিক্ষা, ১১ খণ্ড, ১৩৬৮, পৃ. ৫৫১)

যতদিন আমরা প্রকৃতই দেশপ্রেমিক ছিলাম, ততদিন আমাদের জননী এবং জন্মভূমি আমাদের চোখের সামনে সত্য ছিল, তাই আমরা ততদিন জননীকে, শ্রদ্ধাভক্তি করেছি, দেশের-সমাজের নানাভাবে সেবা করেছি, তার প্রত্যক্ষ সেবার কার্যে আমরা আত্মোৎসর্গ করেছি। কিন্তু যেদিন থেকে আমরা পাশ্চাত্ত্য 'প্যাট্রিয়টিজমে' দীক্ষা লাভ করেছি, সেদিন থেকে আমরা আমাদের জন্মগত সংস্কারলব্ধ যে স্বদেশপ্রেম তা বিসর্জন দিয়েছি। কারণ, স্বদেশপ্রেমই আমাদের জন্মলব্ধ সংস্কার, 'প্যাট্রিয়টিজম্' নয়। তাই আমাদের সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের আত্মপ্রকাশ যত সহজে হয়েছে, 'প্যাট্রিয়টিজমে'র প্রকাশ তত সহজ এবং স্বাভাবিক হয়নি। প্রকৃতই হয়েছে কিনা তাও বিতর্কের বিষয়।

সমগ্র ভারতবর্ষের কথা বাদ দিয়ে শুধু বাংলাদেশের কথাই যদি ধরা যায়, তা হলেও দেখতে পাই বাঙ্গালী জাতি স্বভাবতই স্বদেশপ্রেমিক, তার স্বভাবের মধ্যে এই গুণটি আছে এবং এই গুণটি থাকবার কতকগুলো কারণও আছে, একেবারে অকারণেই তা হয়নি। বাঙ্গালী তার দেশকে ভালবাসে এ কথা এই জাতির জীবনের একটি মৌলিক সত্য। জন্মসূত্রেই সে স্বদেশপ্রেমিক। এই স্বদেশপ্রেমিক কিন্তু 'প্যাট্রিয়ট' (patriot) নন। বাঙ্গালী তার দেশকে ভালবাসে, ইতিহাসের কোনো যুগে এমন দেখা যায় নি যে বাঙ্গালী স্বেচ্ছায় স্বদেশ ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে বসতি স্থাপন করেছে। তারপর সে নিজেই যে দেশকে ভালবেসে তার মধ্যে বাস করেছে তাই নয়, বাইরে থেকে যখনই যে এখানে এসে বাস করতে চেয়েছে, তাকেওসে বাধা দেয়নি, তাকেও সে বাস করতে দিয়েছে, তার সঙ্গে সে প্রতিবেশীরূপে বাস করেছে, তার কিছুদিন পর একদিন বাইরে থেকে যে এসেছিল, তারা তাদের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে, কোনোদিন এই নিয়ে কোনো বিরোধের সৃষ্টি হয়নি। মধ্যযুগে একটি প্রচলিত কথা ছিল, বাংলাদেশে ঢোকবার পথ আছে, কিন্তু তা থেকে বেরিয়ে যাবার পথ নেই। বেরিয়ে যাবার পথ প্রকৃতই ছিল না তা নয়, কিন্তু এই দেশের এতই আকর্ষণ ছিল যে এখানে কেউ একবার এলে আর তার বেরিয়ে যাবার ইচ্ছা হতো না। এ'দেশে এসে প্রবেশ করা যেমন সহজ ছিল, বাস করাও তেমনি সহজ ছিল, এই নিয়ে বাঙ্গালী কোন দিন বিরোধ করেনি।

কারণ, জীবনের উপকরণের দিক থেকে এদেশে জিনিসের প্রাচুর্য ছিল, নিরুপদ্রব লঘু পরিশ্রমে প্রচুর খাদ্যশস্য এখানে সুলভ ছিল, তার ফলে এদেশে বাইরে থেকেও যখন যেই এসে বাস করেছে সেও জীবনের বিশেষ কতকগুলো সহজসাধ্য কর্মে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। তার ফলে তার চরিত্র এবং মানসিকতা একভাবে সকলের সঙ্গে গড়ে উঠেছে। দেশপ্রেম তার মধ্যে প্রধান। ক্রমে তা এদেশের মানুষের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠল। এ প্রেম বিশেষ কোনো স্তরের ভালোবাসা নয়, তা সর্বস্তরের ভালোবাসা, এমন কি জড় পদার্থ এবং জীবমাত্র অবলম্বন করেও তা গড়ে উঠতে পারে। যে চাষী মাটি চাষ করে, বিশ্রামের সময় যে গাছের ছায়ায় বসে সে বিশ্রাম করে, যে পুকুরের জল পান করে, যে গাছের সে ফল খায়, যে কুটীরে যাদের স্নেহচ্ছায়ায় সে প্রতি দিন রাত্রি কাটায়, যে জননী তাকে অসহায় শৈশব থেকে সংসারের কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করবার সুযোগ করে দেন, সকলেই তার ভালোবাসার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। তা থেকে প্রতিবেশীর উপকার করবার প্রেরণা সে পায়, বৃহত্তর সমাজ সেবার প্রেরণাও তা থেকেই আসে। এই প্রেমই প্রাথমিক স্বদেশপ্রেম, তার

উপরই মহত্তর সাধনার প্রথম সোপান স্থাপিত হয়। এদের সঙ্গে 'প্যাট্রিয়টিজম্'-এর কোনো সম্পর্ক নেই।

সেজন্য সেদিন যাঁরা দেশপ্রেমিক ছিলেন, তাঁরা দেশের মাটিকেই একান্তভাবে আঁকড়ে ধরেছিলেন বলে দেশের সিংহাসন নিয়ে যাঁরা কাড়াকাড়ি করতেন, সে দিকে দৃষ্টিপাত করতেন না। দেশের সীমানা কতদূর বৃদ্ধি পেল, কতখানি হ্রাস পেল, সে বিষয়েও তাদের কোনও উদ্বেগ ছিল না। এমন কি সেদিন তাঁরা দেশপ্রেমের সাধনায় বিদেশী শাসকদের সহায়তা গ্রহণেও কোনো সঙ্কোচ প্রকাশ করেননি। রাজা রামমোহন রায় ইংরেজ শাসকের সহায়তায় আইন করে সতীদাহ প্রথা রোধ করলেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরও ইংরেজের দ্বারস্থ হয়ে আইন প্রণয়ন করে বিধবা বিবাহের প্রবর্তন করলেন। দেশের কল্যাণই ছিল তাঁদের প্রত্যক্ষ কর্মযজ্ঞের মুখ্য উদ্দেশ্য, দেশ সম্পর্কিত কোনো আদর্শবাদ তাঁদের কোনো কল্পনাকে অবলম্বন করতে পারেনি। দেশের স্বাধীনতা-সংক্রান্ত কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনে যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও কিংবা বিদেশী শাসক-গোষ্ঠীর সহায়তা গ্রহণ ক'রেও রাজা রামমোহন রায়, কিংবা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে স্বদেশপ্রেমিক, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

ইংরেজিতে 'ফিল্যানথ্রোফি' (philanthrophy) নামে একটি কথা আছে, বাংলায় তাকে লোক-হিতৈষণা বলা যেতে পারে। যাঁরা স্বদেশপ্রেমিক তাঁরা স্বদেশের লোকহিতৈষী, কিন্তু লোকহিতৈষণা কোনো দেশের সীমায় আবদ্ধ থাকে না, তা দেশ বিদেশেও সমান ভাবে বিস্তার লাভ করতে পারে। ডেভিড হেয়ারকে স্বদেশ-প্রেমিক বলা কতদূর সঙ্গত তা জানি না, কারণ বাংলা তাঁর স্বদেশ নয়, যদিও সমগ্র জীবনই তিনি এ দেশের শিক্ষার সেবায় ব্যয় করেছেন, তাঁরও এদেশের প্রতি প্রেমের কিছুমাত্র অভাব ছিল না। সুতরাং স্বদেশপ্রেম নিজের মধ্যে সীমিত, তা সাধারণভাবে 'লোক-হিতৈষণা' বা কবির ভাষায় 'বিশ্বপ্রেম' নয়। স্বদেশপ্রেমের অবলম্বন স্বদেশ, লোক-হিতৈষণার অবলম্বনও বিশেষ কোনো দেশ, 'বিশ্বপ্রেমে'র কোনো অবলম্বন নেই, তা একটি ভাবাশ্রিত ধারণা মাত্র, স্বদেশপ্রেম সত্য এবং বাস্তব। ক্রমে 'পেট্রিয়টিজমে'র নেশা লেগে আমাদের স্বদেশপ্রেম আচ্ছন্ন হ'য়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ এই অবস্থাটিকেই একটু কঠিন ভাষায় নিন্দা করেছেন, তিনি লিখছেন,

'মাতালের পক্ষে মদ্য যেরূপ খাদ্যের অপেক্ষা প্রিয় হয়, আমাদের পক্ষে দেশহিতৈষার নেশা স্বয়ং দেশের চেয়েও বড়ো হইয়া উঠিয়াছিল। যে দেশ প্রত্যক্ষ তাহার ভাষাকে বিস্মৃত হইয়া, তাহার ইতিহাসকে অপমান করিয়া, তাহার সুখ-দুঃখকে নিজের জীবনযাত্রা হইতে বহু দূরে রাখিয়াও আমরা দেশহিতৈষী হইতেছিলাম। দেশের সহিত লেশমাত্র লিপ্ত না হইয়াও বিদেশীয় রাজদরবারকেই দেশহিতৈষিতার একমাত্র

কার্যক্ষেত্র বলিয়া গণ্য করিতেছিলাম। এমন অবস্থাতেও এমন ফাঁকি দিয়াও, ফললাভ করিব, আনন্দ লাভ করিব, উৎসাহকে বরাবর বজায় রাখিব, এমন আশা করিতে গেলে বিশ্ববিধাতার চক্ষে ধূলা দিবার আয়োজন করিতে হয়।' (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৫৫১)

বর্তমান গ্রন্থের লেখিকা ইতিহাসের ক্রম অনুসরণ করেছেন বলে তাঁর 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম' নামক গ্রন্থে স্বদেশপ্রেমের কথাই বলছেন। অত্যন্ত বিস্তৃত, ব্যাপক অর্থে তা সাহিত্যের অনেকখানি অংশ জুড়ে আছে, সেইজন্য বিচিত্রমুখী বহু বিষয় তার অন্তর্ভুক্ত করতে হয়েছে। এ কথাও সত্য যে, আমাদের দেশে সাহিত্যে যেদিন থেকে 'প্যাট্রিয়টিজমে'র অনুপ্রবেশ ঘটেছে সেদিন থেকেই যে স্বদেশপ্রেমের ধারাটি সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে গেছে, তাও নয়; অনেক সময় দেখা গেছে দুই-ই সমান্তরাল ভাবে চলেছে। বরং স্বদেশপ্রেমের তুলনায় প্যাট্রিয়টিজমের ধারাটিই ক্রমে প্রবল হয়ে পড়েছে। তবে তা বিংশ শতাব্দীর বিষয় বলে বর্তমান গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়নি।

প্রাচীন ও মধ্যযুগ থেকেই লেখিকা তাঁর গ্রন্থরচনার সূত্রপাত করেছেন, কিন্তু এ কথা সকলেই জানেন, সে যুগে বাঙ্গালীর রাজনীতি চর্চার কিছুমাত্র অবকাশ না থাকলেও স্বদেশপ্রেম ছিল। সেই প্রেমের প্রকাশ হয়েছে তার সে যুগের সাহিত্যে, সঙ্গীতে, নৃত্যে, চিত্রশিল্পে, ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায়। সব কিছুরই যে একটা বঙ্গীয় বা গৌড়ীয় রীতি উদ্ভাবিত হয়েছিল তার কারণ এই যে, তাতে স্বদেশপ্রেম সক্রিয় ছিল, তাই পরের অনুকরণ তাতে স্থান পেতে পারেনি। জাতির মধ্যে তখন থেকেই একটা আত্মানুসন্ধান ও আত্মপ্রত্যয় সৃষ্টি হয়েছিল। বাঙ্গালী যা ভাবে, যা সৃষ্টি করে তার যে একটি স্বকীয়তা আছে এই বোধ তার মধ্যে জাগ্রত হয়ে তাকে একটা নিজস্ব মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ', বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', মালাধর বসুর ভাগবতের অনুবাদ 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়', এমন কি কৃত্তিবাস রচিত বাল্মীকি-রামায়ণের অনুবাদের মধ্যেও বাঙ্গালী তার নিজের জীবনের রূপ মুদ্রিত করে দিয়েছে। সেই পথ ধরেই আবির্ভাব ঘটল চৈতন্যদেবের। তাঁর ধর্মীয় আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কেবল মাত্র নৈর্ব্যক্তিক কৃষ্ণপ্রেমেরই ব্যাখ্যা শুনতে পাওয়া যায় নি, তার মধ্য দিয়েও তাঁর স্বদেশপ্রেমের কথা বা দেশের ছোট বড় সকল শ্রেণীর মানুষের কথাই ব্যক্ত হয়েছে। লেখিকা তাঁর এই গ্রন্থ রচনায় সেজন্য শ্রীচৈতন্যদেবকে যথার্থই একটি প্রধান স্থান দিয়ে এই বিষয়ে তাঁর ভূমিকার কথা বিশেষভাবে আলোচনা করেছেন।

শ্রীচৈতন্যদেবের ধর্মান্দোলনের মধ্যে যে একটি রাজনৈতিক চেতনাও প্রচ্ছন্ন ছিল, তা অনেকেই মনে করেছেন। বহুধাবিভক্ত সমাজ ক্রমে খণ্ডিত হয়ে হয়ে যে ভাবে হতবল হয়ে পড়েছিল, তাদের একটি অখণ্ড সংগঠনের মধ্যে নিয়ে এসে

শক্তিশালী করে গঠন করা তাঁর আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে রাজনৈতিক চিন্তার এখানেই উন্মেষ দেখা যায়। স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রেমের বশবর্তী হয়েই চৈতন্যদেব এই সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক ভাবনা তাঁর মনে স্থান দিয়েছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম শতধা বিচ্ছিন্ন সেদিনকার বাংলার সমাজকে যে এক নাম এবং এক আচরণ দিয়ে এক অখণ্ড সংগঠনে পরিণত করবার প্রয়াস পেয়েছিল, তার মধ্যে তার প্রবক্তার সে দিনকার দেশের অবস্থায় স্বদেশপ্রেম গোপন থাকবার কথা নয়। এই বিষয়টির উপর লেখিকা যথার্থই বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেখা যায় এই রাজনৈতিক চিন্তা চৈতন্যদেবের একান্ত ব্যক্তিগত। কিন্তু জাতিগতভাবে বাঙ্গালী মূলতঃ শাক্ত এবং তান্ত্রিক। বৌদ্ধ ধর্ম যে উড়িষ্যায় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দী কিংবা মহারাজ অশোকের সময় থেকেই যেরকম দৃঢ়মূল হয়ে গড়ে উঠেছিল, বাংলাদেশে তা কখনো হতে পারেনি, তাই উড়িষ্যায় মধ্যযুগে যে সামরিক শক্তিরই বিকাশ হোক না কেন, তার ভিত্তিমূলে বৌদ্ধধর্মের অহিংসার বীজ ছিল। তাই চৈতন্যধর্ম মধ্যযুগে সেখানে গিয়ে যখন প্রচার লাভ করল, তখন তা অতি সহজেই জনসাধারণের মধ্যে গৃহীত হলো। উড়িষ্যাতেও ইতস্তুতঃ বিক্ষিপ্তভাবে তান্ত্রিক ধর্ম যে না ছিল তা নয়, কিন্তু তাও বৌদ্ধধর্মের সর্বব্যাপী অহিংসা-ধর্মের ভিত্তির উপরই তার আসন স্থাপন করে নিয়েছিল, সেইজন্য তাও সেখানে তার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত চৈতন্যধর্মের কাছে তাকেও পরাজয় স্বীকার করতে হলো। বৌদ্ধধর্মে অহিংসা, মৈত্রী এবং করুণার বাণী প্রচার লাভ করেছিল, তা এখানে এসে পৌঁছুতে পারেনি। সুতরাং বাংলাদেশের মূল ধর্মীয় ভিত্তিটিই শাক্ত কিংবা তান্ত্রিক উপাদানে গঠিত হয়েছিল। চৈতন্যদেবের ভাব এবং ভাবনা নানা দিক দিয়ে বাঙ্গালীকে প্রভাবিত করলেও জাতির জীবনের বহির্মুখী আচরণে তাঁর ধর্ম ব্যাপক স্থান লাভ করতে পারেনি। কেবল মাত্র কিছু কিছু গোষ্ঠী এবং বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে তা সীমাবদ্ধ হয়ে আছে, উড়িষ্যার মত সর্বাত্মক জাতীয় ধর্মরূপে তা গণ্য হতে পারেনি।

আগেই বলেছি, বাঙ্গালী জাতি স্বভাবতঃ দুর্বল বলেই ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় শক্তির উপাসনা করে তার দৈহিকশক্তির অভাব পূর্ণ করতে চেয়েছে। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী আক্রমণের পর থেকে দুর্বল বাঙ্গালীর মধ্যে অসহায়তা বোধ আরো শতগুণ বেড়ে গেল, দৈহিক শক্তির প্রত্যক্ষ প্রয়োগ দিয়ে সেই অবস্থা থেকে মুক্তি লাভের তার কোন উপায় ছিল না। সাহিত্য অবলম্বন করে সেই মনোভাব প্রকাশ করবার সুযোগ দেখা দিল, তার ফলেই শাক্ত দেবীর মাহাত্ম্য-সূচক কাব্য রচিত হতে লাগল। ধর্ম সে যুগে সাহিত্যকে অবলম্বন করেছিল, রচনা

করেছিল, দুটি ধারা—একটি ধারায় বৈষ্ণব সাহিত্য জন্ম লাভ করে সমাজ জীবনের চরম দুর্গতির দিনে ভগবানের কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে আত্মবিস্মৃতির সন্ধান করতে চেয়েছিল, আর একদিকে শাক্ত সাহিত্য তার বিরুদ্ধে কল্পিত এক হিংস্র প্রতিশোধ গ্রহণ ক'রে সেই অক্ষমতার মধ্যে অসহায় জীবনের সান্ত্বনা সন্ধান করেছিল। তাই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যও পরোক্ষে রাজনীতি চর্চা করেছে। সেযুগের রাষ্ট্রশক্তির অত্যাচারের স্বরূপটি অত্যাচারী দেবদেবীর চরিত্রের মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে, সেই অত্যাচারের বিরুদ্ধে যে দেশবাসীর কি মনোভাব ছিল, তাও এই সকল কাব্যের মধ্যে গোপন থাকেনি।

কোন কোন সময় বিদেশী শাসকদিগের দেশবাসীর উপর অত্যাচারের ঘটনাও মঙ্গলকাব্যের কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে; তাতে নানা বাধা এবং বিপদের আশঙ্কা সত্ত্বেও মনসা-মঙ্গলের মত একটি বহুল প্রচলিত মঙ্গলকাব্যে হাসান হোসেন পালার মত বিধর্মীর একটি অত্যাচারের প্রসঙ্গ কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। যথার্থ স্বদেশপ্রেম না থাকলে এ জাতীয় কাব্যে বিদেশীর অত্যাচার সম্পর্কে এত বাস্তবধর্মী বর্ণনা থাকতে পারত না। কাহিনীর মধ্যে শেষ পর্যন্ত যে দৈব সান্ত্বনার কথা আছে, তা শক্তিশালী অত্যাচারীর বিরুদ্ধে দুর্বলের পরাজয়ের অসহায় স্বীকৃতি, তা ছাড়া আর কি হতে পারে?

সুতরাং মধ্যযুগ থেকেই একভাবে না একভাবে যে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ হয়েছে, তা স্বীকার করতেই হবে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সেই স্বদেশপ্রেমকে করবার কখনো 'পেট্রিয়টিজম্' বলে মনে করা যেতে পারে না। সে প্রেম প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ উপায় ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও, সে প্রেম প্রকাশ করবার কোনো বাধা মানেনি। নানা রূপক অবলম্বন করেও তা প্রকাশ করা হয়েছিল। দীর্ঘকাল বিদেশী এবং বিধর্মী রাষ্ট্রশক্তির অধীনে এই দুর্গতির মধ্যেই পরোক্ষে এবং রূপকের মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের স্বদেশপ্রেম প্রকাশ করতে হয়েছে। এমন কি, ইংরেজ আমলেও বিদেশী শত্রু ইংরেজের বিরুদ্ধেও অনেক কথাই আমাদের স্বদেশপ্রেমিক সাহিত্যিকদের নানারকম পরোক্ষ উপায়ে প্রকাশ করবার প্রয়োজন হয়েছে। সে দিন দেব-দেবীর সাহায্য পাওয়া যায়নি সত্য, কিন্তু বাধ্য হয়ে ইতিহাসকে বিকৃত করতে হয়েছে। কারণ, স্বদেশপ্রেমই যেখানে মুখ্য, সেখানে ঐতিহাসিক তথ্য বিসর্জন দিতে আমাদের স্বদেশপ্রেমিক সাহিত্যিকগণ বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ করেননি।

মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে পরোক্ষে দেশপ্রেমের কথা থাকলেও অন্ততঃ একখানি মঙ্গলকাব্য আছে, তার মধ্যে দেশপ্রেম প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে, তা ধর্মমঙ্গল। তা লেখিকা যথার্থই লক্ষ্য করেছেন।

ধর্মমঙ্গলেই বহু বলিষ্ঠ নরনারীর বাস্তবধর্মী চরিত্রের একসঙ্গে সদর্প পদধ্বনি আমরা শুনতে পেলাম। তাদের সকলেই দেশরক্ষায় প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, কবি তাদের কারো কারো হৃদয়ে দেবতার প্রতি ভক্তি-শূন্যতার জন্য দুঃখ করলেও তাদের বীরত্বের জন্য গৌরব প্রকাশ করেছেন, বীরত্ব প্রকাশের বা প্রতিপক্ষের সঙ্গে তাদের যুদ্ধের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়েছেন, সে বর্ণনা সহানুভূতিপূর্ণ নয়, সে কথা বলা যায় না। এই সকল চরিত্রের মধ্যে স্ত্রীচরিত্রও বাদ যায়নি, অথচ এই সকল স্ত্রীচরিত্র নিম্নশ্রেণীর ডোমজাতীয়। তাদের মধ্যেও যে শত্রুর আক্রমণ কালে দেশরক্ষার পবিত্র দায়িত্ববোধ আছে, তা স্মরণ করেছেন; সেই দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে তারা প্রাণবিসর্জন করেছে। মাতা পুত্রকে যুদ্ধে অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত করে পাঠিয়েছেন। যে যুদ্ধে মাতার এক পুত্র নিহত হয়েছে, সেই যুদ্ধে আর এক পুত্রকে যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত করে পাঠিয়েছেন, এক হাতে চোখের জল মুছেছেন, আর এক হাতে একমাত্র অবশিষ্ট পুত্রের যুদ্ধযাত্রাকালে অস্ত্রসজ্জা করেছেন। তারপর সেই পুত্রও যখন আর ফিরল না, তখন নিজে সেই জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের মত যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে শত্রুহস্ত থেকে দেশরক্ষা করবার অন্তিম চেষ্টা করেছেন। যে কবি এই কথা লিখেছেন, তিনি ইংরেজি সাহিত্যের 'প্যাট্রিয়টিজম্' কি তা জানেন না, তাঁর কাব্য তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লিখেছেন, সুতরাং ইংরেজি সাহিত্যের সঙ্গে তাঁর কোনো পরিচয় ছিল না। লেখিকা এই প্রসঙ্গটির উল্লেখ করেছেন, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্য আমাদের দেশের শিক্ষিত সমাজের নিকট অবহেলিত, বিশেষ কেউ তার মর্মকথা জানে না, তাই বিষয়টির উপর সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের মৌলিক রূপটি কি ছিল, তা বোঝাবার চেষ্টা করা গেল। কারণ, অনেকেরই ধারণা স্বদেশপ্রেম অন্যান্য অনেক বিষয়ের মত আমাদের ইংরেজি সাহিত্যের কাছে ধার করা। কিন্তু আমি বল্‌তে চাই যে স্বদেশপ্রেম আমাদের ধার করা বিদ্যা নয়, প্রকৃতপক্ষে 'প্যাট্রিয়টিজম্' বিদ্যাটিই আমাদের ধার করা, স্বদেশপ্রেম আমাদের নিজস্ব।

লেখিকা মধ্যযুগের ইতিহাসে উল্লিখিত 'বারোভুঁইঞা'র কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁরা আঞ্চলিক ভূস্বামী ছিলেন, দেশের দূরত্ব, অবস্থান, পরিবেশের সুযোগ নিয়ে অনেক সময় দিল্লীর সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবার প্রয়াস পেয়েছেন, অনেকেই সাময়িকভাবে কিছু কিছু সাফল্যও লাভ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলতে যা বুঝায় তা তাঁরা প্রকৃত কতদূর ছিলেন, তার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

তুর্কী পাঠান মোগলের পরাধীনতার মধ্য দিয়েই বাঙ্গালী আর এক কঠিনতর

বিদেশী পরাধীনতার শৃঙ্খল গলায় তুলে নিল, তা ইংরেজের পরাধীনতা। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই দেখা গেল, তার রূপ এবং স্বাদ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। ইংরেজ শাসনের পরাধীনতার মধ্যেই রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হল। সমাজের যে সকল ব্যবস্থা নিয়ে আমাদের কোন ভাবনা ছিল না, তিনি তারই মধ্যে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন, সেগুলো কিভাবে আমাদের মনুষ্যত্ব বিকাশের অন্তরায় সৃষ্টি করছে। আমরা দেশকে এতদিন ভালোবেসেছি সত্য, কিন্তু অন্ধ ধর্মীয় আচারের নিকট মানুষকে বলি দিতে সঙ্কোচ বোধ করি না, সুতরাং এ ভালোবাসা সর্বসংস্কার মুক্ত স্বাধীন ভালোবাসা নয়, জননী এবং জন্মভূমিকে স্বর্গের চাইতেও গরীয়সী বলে মনে করেও কতকগুলো হৃদয়হীন নিষ্ঠুর আচারের নিকট জননীকেও নিঃসঙ্কোচে বলি দিয়েছি। রামমোহন যখন সে ভুল আমাদের ধরিয়ে দিলেন, তখন আমাদের এ যাবৎ দেশপ্রেম যে কতখানি সঙ্কীর্ণ ছিল তা আমরা বুঝতে পারলাম। রামমোহন যথার্থ দেশপ্রেমিক ছিলেন, কিন্তু তিনি যদি 'পেট্রিয়ট' হতেন তবে আগে দেশ স্বাধীন করে ইংরেজকে দেশের সীমানা থেকে দূর করে তারপর সতীদাহ প্রথা দূর করতে আসতেন, কিন্তু তিনি দেশপ্রেমিক ছিলেন বলেই বিদেশী ইংরেজের সাহায্য নিয়েও সমাজের বুক থেকে সতীদাহের নির্মম প্রথা দূর করলেন। কারণ, সেদিন সেই মুহূর্তেই তা একান্ত আবশ্যক হয়েছিল, বিলম্বে অগ্রগতির সকল পথ আমাদের সামনে রুদ্ধ হয়ে যেত।

তারপর এই পথেই এলেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনিও দেশপ্রেমিকই ছিলেন, 'পেট্রিয়ট' ছিলেন না। মধ্যযুগের নির্বিচার অত্যাচার এবং স্তূপীকৃত কুসংস্কারের ভারে নিষ্পেষিত নারীসমাজের লাঞ্ছনার পাপ থেকে দেশপ্রেমিক ঈশ্বরচন্দ্রই সমাজকে মুক্ত করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। তাঁদের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে আরো অনেক দেশপ্রেমিক এই পথে এগিয়ে এলেন। তারা একদিকে প্রত্যক্ষ কর্মের মধ্য দিয়ে আর একদিকে তাঁদের রচিত সাহিত্যের মধ্য দিয়ে বিশেষতঃ প্রবন্ধাকারে তাদের বক্তব্য এবং চিন্তাধারাকে প্রকাশ করে সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম প্রচার করলেন। আবার কেউ প্রত্যক্ষভাবে সমাজ সেবার কোন কর্মের মধ্যে লিপ্ত হওয়ার পরিবর্তে কেবল মাত্র সাহিত্য রচনার মধ্য দিয়েই তাঁদের স্বদেশপ্রেমমূলক ভাবনাকে রূপ দিতে লাগলেন। সেযুগের এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তাঁর কেবল মাত্র প্রবন্ধ নয়, বহু উপন্যাসও বাঙ্গালীর স্বদেশপ্রেমের উৎস স্বরূপ হয়ে আছে।

বর্তমান গ্রন্থখানি 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম' নিয়ে লেখা, সুতরাং বিংশ শতাব্দীর কোন বিষয়ই তার অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কিন্তু একদিক থেকে দেখা যায়, স্বদেশপ্রেমমূলক বাংলা সাহিত্য উনবিংশ শতাব্দী অতিক্রম ক্রমে বিংশতি

শতাব্দীর প্রথম দশকে সামান্য কিছু দূর অগ্রসর হলেও তারপর অর্থাৎ বিংশ শতাব্দীতে আর উল্লেখযোগ্য ভাবে অগ্রসর হ'তে পারেনি। কারণ, উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশ ছিল স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি, স্বদেশী আন্দোলন ছিল তার শেষ পরিণতি, তারপর বিংশতি শতাব্দীতে স্বদেশী আন্দোলনের পর মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের সময় থেকে সমগ্র ভারতবর্ষ হল স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি। স্বদেশী আন্দোলনের পরই প্রকৃত স্বদেশপ্রেম আমাদের মধ্য থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়ে 'প্যাট্রিয়টিজমে'র ভাব-স্বপ্ন আমাদের অন্তর অধিকার করে নিয়েছে। তার মধ্যে স্বদেশী ভাবনা আর প্রবেশ করতে পারেনি।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে বাঙ্গালীর জীবন নেই, বাঙ্গালীর ভাষা নেই, বাঙ্গালীর সমাজ নেই, তার সংস্কার নেই, তার ধর্ম নেই, সে তার জাতীয় বিশেষত্ব বিসর্জন দিয়ে কেবল মাত্র তার দেহটি নিয়ে বেঁচে আছে। তার দেশ নেই, তাই দেশের প্রতি তার প্রেমও নেই। তার দেশ আজ 'বিশ্ব'। বিশ্বের ভাবনা তার মাথা জুড়ে বসে আছে, দেশ থাকলেও সে প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণতার জন্য নিন্দার ভয়ে দেশপ্রেমের কথা ভাবতেও পারে না; কারণ, সে নিজেকে দেশের মানুষ বলে ভ বে না, বিশ্বের মানুষ বলেই ভাবে। সেইজন্য প্রেমও তার যদি কিছু থেকেও থাকে, তা অবায়বীয় 'বিশ্বপ্রেম'। তাই দেখা যায়, স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যেই বাঙ্গালীর স্বদেশপ্রেমের সমাধি হয়েছে। এমন কি, তাকেও রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত সমর্থন জানাতে পারলেন না। তবু আমরা ইতিহাসের দিক থেকে সেই ঘটনাকেই বাঙ্গালীর সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের শেষ পরিণতি বলে নির্দেশ করতে পারি।

শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য

৩২, বি. আর. চ্যাটার্জি রোড
কলিকাতা—৩৪
বৈশাখ, ১৩৭৫

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা সাহিত্যের
প্রাক্তন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অধ্যাপক এবং
আধুনিক ভারতীয় ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ

নিবেদন

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আধুনিক তথা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য পার্থক্যের মধ্যে একটি হল এই যে, প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম নামক কোন বিশিষ্ট চেতনা সুস্পষ্ট হয়নি—অথচ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শুরু থেকেই সর্বস্তরের বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের স্পন্দন অনুভূত হয়েছে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গেলে বাংলা সাহিত্যের সামগ্রিক পরিবর্তনের হেতুটি নির্ণয় করা দরকার যেহেতু অন্যান্য অনেক পরিবর্তনের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের অনুভূতিকেই আমরা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিব্যক্তি এবং গভীরতম উপলব্ধি বলে প্রত্যক্ষ করেছি। বাংলা সাহিত্যের আধুনিকতার ভিত্তিমূলে যুক্তিবাদ, আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিসচেতনতার মনোভাবটিই সক্রিয় হয়েছে, অনেকদিনের গতানুগতিকতা, দৈব-নির্ভরতা, নির্লিপ্ত ও নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের প্রতি অটল আনুগত্যের পরে বাংলা সাহিত্য সেদিন আত্মপ্রত্যয় সম্বল করে, আত্মশক্তি নির্ভর করে মানবতাবাদকেই সাহিত্যে অবলম্বন করেছে—মোটামুটিভাবে সেই যুগ থেকেই বাংলা সাহিত্য 'আধুনিক' সংজ্ঞা লাভ করেছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ লগ্নে বাংলা সাহিত্যের চরিত্রে একই সঙ্গে এত মহিমা একযোগে প্রকাশিত হয়েছিল। এই সময়েই স্বদেশ চেতনার অস্পষ্ট অনুভূতিও বাংলা সাহিত্যে অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ আত্মসচেতন ও পরিবেশ সচেতন সাহিত্যে সমাজ, মানুষ ও দেশের প্রসঙ্গ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই প্রকাশিত হয়ে থাকে এবং লেখকের বিন্দুমাত্র আন্তরিকতায় সেটুকুই স্বদেশপ্রেমের মহিমা লাভ করে। বাংলা সাহিত্যে যেদিন আত্মপ্রত্যয়শীল লেখক পরিবেশসচেতন মন ও গভীর সহানুভূতিসম্পন্ন হৃদয় নিয়ে সমাজ ও মানুষের দিকে দৃষ্টিপাত করেছেন সেদিন থেকে সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের সূচনা হয়েছে বলা যেতে পারে। তবে এখানে 'স্বদেশপ্রেম' শব্দটিকে একটু বিশ্লেষণ করে নেওয়া দরকার। ইংরাজী patriotism-এর বাংলা অনুবাদ হিসেবে স্বদেশপ্রেম শব্দটি বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে। তবে এও সত্যি যখন ইংরাজী ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার যোগাযোগ ঘটেনি তখন ঠিক এই ভাবোদ্দীপক কোন বাংলা শব্দের বহুল প্রচলন ছিল না। সংস্কৃত সাহিত্যে জন্মভূমিপ্রীতির অজস্র দৃষ্টান্ত রয়েছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে ঠিক স্বদেশপ্রীতিমূলক কোন লক্ষণীয় অংশের বর্ণনা কিংবা স্বদেশাত্মক শব্দের জনপ্রিয়তা দেখা যায়নি। 'স্বদেশ' শব্দটির চেয়ে অনেক বেশী অর্থবহ শব্দই সংস্কৃতে গৃহীত হয়েছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অত্যন্ত গভীর দেশাত্মবোধক

পংক্তিটি "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী।" একদিক থেকে স্বদেশপ্রেমের অভিধানের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান উক্তি বলে মনে হয়েছে। শুধু শব্দপ্রয়োগের বৈচিত্র্যেই নয় ভাবের সম্পদেও এ জাতীয় শ্লোক তুলনাহীন। কিন্তু বাংলা ভাষায় ও সাহিত্যে সম্ভবতঃ স্বদেশপ্রেমাত্মক কোন অংশ রচিত হয়নি বলেই কোন সঠিক শব্দও ব্যবহৃত হয়নি। এ প্রসঙ্গে জার্মান সাহিত্যের স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গে লেখা একটি অংশ উদ্ধৃত করলে দেখা যাবে শুধু বাংলা সাহিত্যেই এই অভাব ছিল না।

লেখক জার্মান সাহিত্যের প্রসঙ্গে বলেছেন—

Yet during the eighteenth century western enlightenment began to stream into Germany not in small rivulets, but in broad rivers and within a century the intellectual backwardness of the country had been overcome.........Under these conditions the exprussion of nationalism, remained confined to the literature, being partly a reminiscence of the patriotic authors of antiquity read in school, partly the influence of English and French writers. The lack of political feelings made itself felt even in literature itself: With subjects for satire all around, German literature developed neither a political satire nor a vigorous patriotic prose.[১]
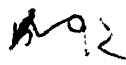
স্বদেশপ্রীতিকে মুখ্য বিষয়রূপে চিন্তা করার যে প্রয়োজন আজকের সাহিত্যে দেখা দিয়েছে প্রাচীন যুগে সে প্রয়োজনটিই ছিল অনুপস্থিত। এ প্রসঙ্গে আলোচনা শুরু হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতেই। পরাধীন জাতির জীবনে স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি পরিস্থিতির দান হিসেবে অনিবার্য হয়ে উঠে কিন্তু স্বাধীন জাতির জীবনেও এ অনুভূতি জাগতে পারে। স্বদেশপ্রেমিক নিজের জাতি ও সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতিকে আন্তরিকভাবে ভালবাসেন, কিন্তু সেই আবেগ তরঙ্গায়িত হয়ে ওঠে প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে সংঘর্ষের ফলেই। বাংলা সাহিত্যের আদি ও মধ্যস্তরে স্বদেশ-চেতনার অভাব ছিল, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, সেযুগের মানুষ দেশের জলবায়ু, মাটি, ভাষা ও সংস্কৃতিকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসতেন না। কিন্তু সাহিত্যের উপাদান হিসেবে স্বদেশপ্রেম যে ব্যবহৃত হয়নি তার কারণ আছে। জার্মান সাহিত্য সমালোচকের মতে রাজনীতির সঙ্গে মানবজীবনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের অভাব থাকলে স্বদেশপ্রেম সাহিত্যে সোচ্চার হয় না। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও এই

১. Hans Kohn, *The Idea of Nationalism*, Now York, 1951, p.345.

সমালোচনা প্রযুক্ত হতে পারে। রাজনীতির প্রতি অসীম ঔদাসীন্য সেযুগের লেখকের চরিত্রে এতই প্রকট যে এ ব্যাপারে আর কাউকেই দোষারোপ না করে বাঙ্গালী লেখকের আত্মমগ্ন নিস্পৃহ স্বভাবকেই দায়ী করতে হয়। খুব বেশী বিরক্ত না হলে কোন লেখক সে যুগের রাজনীতির জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করেননি। মুকুন্দরামের উৎপীড়িত মনই শুধু মঙ্গলকাব্যের আধারে রাজার অত্যাচার কাহিনী বর্ণনা করে ছন্দপতন ঘটিয়েছে।

স্বদেশপ্রেমের সত্যকার অর্থ নির্ণয়ের চেষ্টা করলে দেখা যাবে শব্দটির নিজস্ব অর্থ-গৌরব যতটুকু আছে তার চেয়েও বেশী রয়েছে শব্দটির ব্যঞ্জনা। স্বদেশের প্রতি ভালবাসার অকৃত্রিম অমলিন প্রকাশকেই যদি স্বদেশপ্রেম আখ্যা দিই তাহলে অর্থ-গৌরবটুকু ব্যক্ত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। যে অর্থে বঙ্কিমচন্দ্র 'স্বদেশপ্রীতি' প্রবন্ধটিতে বলেছেন—

"বস্তুতঃ জাগতিক প্রীতির সঙ্গে, আত্মপ্রীতি বা স্বজনপ্রীতি বা দেশপ্রীতির কোন বিরোধ নাই।"

এই অর্থে স্বদেশপ্রীতির মধ্যে রয়েছে সর্বজনীন, তথা বিশ্বজনীন প্রীতির স্পর্শ। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেম অবশ্যই বিশ্বপ্রেম বা নিছক জাগতিক প্রীতিমাত্র ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই যে শব্দ বাংলা ভাষায় গৃহীত হয়েছে—তাতে রয়েছে ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি বিশেষ অর্থব্যঞ্জনা। স্বদেশপ্রীতির উপলব্ধি সেযুগের বাঙ্গালীর জীবনে একটি নবলব্ধ অনুভব। বাঙ্গালীর জীবনের যে সর্বাঙ্গীণ পরিবর্তন ঊনবিংশ শতাব্দীতেই দেখা গেছে—তারই আভাস শুধু স্বদেশী সাহিত্যের মধ্যেই পাওয়া যাবে। সমগ্র বিশ্বেও এই বিশেষ শব্দটি আধুনিক যুগেই অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় একটি সুচিন্তিত উক্তিতে—So profound, so dominating, and so vital is the sense of nationality at the present day that it is difficult to recognise that it is not a fundamental and primitive instinct of human nature, but a habit of slow growth whose development is subject to a thousand influences which may thwart it, deflect it, annihilate it, or, on the other hand, may foster it, direct it, bring it to the fruition of a sacred patriotism.[২]

২. John Oakesmith, *Race and Nationality—An Euquiry into the Origin and Growth of Patriotism*, London, 1919, p. 159.

যথার্থ স্বদেশপ্রেম তীব্রতর অর্থে গৃহীত, বর্দ্ধিত ও স্বতঃস্ফূর্ত আবেগে প্রকাশিত হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতেই। পূর্বেই বলেছি পরিস্থিতি মানুষের মনের এই স্বদেশচেতনাকে বাড়িয়ে তোলে। কোনো কোনো জাতির জীবনে এই আবেগ যত বেশী আবেদন সৃষ্টি করে—সর্বক্ষেত্রে ঠিক তেমনটি দেখা যায় না। কোন জার্মান সমালোচক বলেছিলেন—"Our hearts remain cold at the name Fatherland. This is because one cannot be strongly touched by something which one hardly knows, or knows too little...In our case the name Fatherland is only an insignificant sound, to the Roman or the Greek it sounded like the name of a 'beloved".[৩]

আমাদের জীবনে স্বদেশপ্রীতির অতি উচ্ছ্বাসকে ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে হয়ত 'strongly touched by something'-এর অভাব ছিল বলেই যে অনুভূতি ছিল সুপ্ত—তাই আজ পরিস্থিতির সঙ্গে সংঘর্ষে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল আমাদের জীবনে। স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে বিশিষ্ট সমালোচকের মতামত আলোচনা করলে দেখা যাবে রাজনীতি-সচেতন জাতীয়চেতনার পারিভাষিক অভিধা হিসেবে স্বদেশপ্রীতি শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়েছে সর্বত্র। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকাতে Patriotism শব্দটির বিস্তৃত কোন ব্যাখ্যা ত দূরের কথা, শব্দটির উল্লেখমাত্রও নেই দেখে বিস্মিত হয়েছি। কিন্তু Nationalism সম্বন্ধে যে আলোচনা রয়েছে তা পাঠ করলে বোঝা যায় Patriotism সম্বন্ধে পৃথক আলোচনার প্রয়োজন নেই। আধুনিক রাজনীতিবিদও Patriotism-কে Nationalism-এর অন্তর্গত একটি উচ্ছ্বাস বলেই বর্ণনা করেছেন। Harold Laski বলেছেন—'Patriotism, the love of one's nation, may stray into devious paths; but at bottom, it seems a genuinely instinctive expression of kinship with a chosen group that is deliberately exclusive in temper.[৪]

অন্যত্রও তিনি আরও স্পষ্ট করে বলেছেন 'Patriotism is built in part from the gregarious instinct of man, and in part from rational desire for self-government'.[৫]

Patriotism সম্পর্কে এই আলোচনা তাঁর গ্রন্থের Nationalism and Civiliza-

৩. Hans Kohn, '*The Idea of Nationalism*' New York, 1951, p.376.
৪. Harold J. Laski, *A Grammer of Politics*, London, 1925. p.221.
৫. Ibid, p.221.

tion অংশ থেকে নেওয়া হয়েছে—যেখানে লেখক বারবারই রাজনীতিসচেতন গোষ্ঠীর সামগ্রিক জাতীয় চেতনাকেই Patriotism আখ্যা দিয়েছেন। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যাবে বিভিন্ন সমাজতাত্ত্বিক প্রদত্ত জাতীয়তাবোধের সংজ্ঞার সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের মূলতঃ কোন পার্থক্য নেই। স্বদেশপ্রেমের ব্যাপক অর্থটি [বঙ্কিম ব্যাখ্যাত অর্থ] কোথাও গৃহীত হয়নি—এবং সর্বত্রই রাষ্ট্রচেতনার সঙ্গে দেশপ্রেমের যোগাযোগের কথাই জোর দিয়ে বলা হয়েছে। সুতরাং কখনও কখনও স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তাবোধ, জাতীয় চেতনা, শব্দগুলিকে সমার্থক বলেই মনে করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোন সমালোচক Nationality সম্পর্কে যা বলেছেন তা উদ্ধার করি। তিনি বলেছেন,—"It is true that the idea of nationality has also been associated with ideals of political freedom...In other words, a nation is a group of people who consider themselves to be a nation; regarding themselves as essentially alike in their standards of conduct and belief, they desire to control their own social life in religion, law and politics".[৬]

এই মন্তব্যের সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের কোন পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। সুতরাং জাতীয়তাবোধ বা জাতীয় চেতনাই যে পরোক্ষভাবে স্বদেশপ্রীতি তাতে সন্দেহ নেই। পৃথক শব্দ হলেও অর্থদ্যোতনায় স্বদেশপ্রীতি জাতীয়তাবোধের সঙ্গে প্রায় সমার্থক। সেজন্য এ গ্রন্থে স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে জাতীয়তাবোধ বা জাতীয় চেতনাকে পৃথকভাবে দেখাবার চেষ্টা করা হয়নি—পৃথক করা যায় না বলেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশে রাজনীতি সচেতন বাঙ্গালীর মনে যে স্বদেশচিন্তা জাগ্রত হয়েছিল তারই প্রতিফলন পড়েছে সমগ্র বাংলা সাহিত্যে। এই নতুন উপলব্ধিকে নবজাগরণ বা রেনেসাঁ যাই বলি না কেন—জাতীয় চেতনা বা স্বদেশপ্রীতি এই উপলব্ধিরই ফলমাত্র।

Encyclopaedia Britannica-তে Nationalism সম্বন্ধে যে সংজ্ঞা দেওয়া আছে—আমাদের সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে তার অর্থটি স্পষ্টতর হবে। Nationalism হচ্ছে a state of mind in which the supreme loyalty of the individual is felt to be due to the nation-state. Though attachments to the native soil, to parental traditions and to established territorial authorities have been known throughout history, it was only at the end of the 18th century that nationalism

৬. Francis W. Coker, *Recent Political Thought*, New York, 1934, p.441.

began to become a generally recognized sentiment moulding public and private life and one of the great, if not the greatest, single determining factors of history.[৭]

উনবিংশ শতাব্দীতে সমগ্র বাঙ্গালীর মনে এই পরিবেশটিই সৃষ্টি হয়েছিল—সাহিত্যে তাকেই রূপ দিয়েছেন কবি-নাট্যকার-ঔপন্যাসিক। সাহিত্যে যে স্বদেশপ্রেমের জোয়ার দেখা গেছে সেটাও ঠিক ইচ্ছাকৃত বা চেষ্টাকৃত কিছু নয়। স্বতঃস্ফূর্ত এ আবেগ সমগ্র মানুষের চিত্তকে যখন গ্রাস করে ফেলে সাহিত্যে তার প্রকাশ অনিবার্য হয়ে ওঠে। সমগ্রের বাণীকে সাহিত্যিকই রূপ দিতে পারেন। এ ব্যাপারে সমগ্রের বাণীকে প্রত্যেকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্বও নিয়ে থাকেন সাহিত্যিকই। সাধারণতঃ সাহিত্যিকের রচনায় দেশপ্রেম এমন একটি আসন লাভ করে যার প্রতিক্রিয়া ঘটে দ্রুতগতিতে। এ সম্পর্কেই যথার্থই বলা হয়েছে—

In many cases poets and scholars emphasized cultural nationalism first. They reformed the national language, elevated it to the rank of a literary language, delved deep into the national past, thus preparing the foundations for the political claims for national statehood soon to be raised by people in whom they had kindled the spirit of nationalism.[৮]

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর সর্বাঙ্গীণ জাগরণের মূলে সাহিত্যিকের লেখনীই সক্রিয় হয়েছিল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আন্দোলন এবং সিদ্ধিলাভ পর্যন্তই কবির লেখনী অক্লান্তভাবে সৃজনের ভার গ্রহণ করেছিল। প্রথম যুগে অস্পষ্টভাবে যে আকৃতি সাহিত্যে স্পন্দিত হয়েছে—ক্রমশঃ প্রচণ্ড কলরবে তা আমাদের চিত্তকে অধিকার করেছে। স্বদেশপ্রেমের ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে দেখা যাবে যুগে যুগে তা শুধু তীব্রতা লাভ করেছে। রাজশক্তির রক্তচক্ষুকে ভয় পায়নি সে—প্রকাশ্যে-পরোক্ষে অব্যাহত গতিতে চলেছে স্বদেশপ্রেমিক লেখকের অপ্রতিহত লেখনী। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের মূল সুর অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে—স্বদেশপ্রেমই একমাত্র বক্তব্য যা প্রতিভাবান কিংবা স্বল্পমেধাসম্পন্ন সব স্রষ্টাকেই আন্দোলিত করেছে। মধুসূদন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত স্বদেশপ্রেমের অব্যাহত গতি—পরবর্তীকালে স্বাধীনতা লাভের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত প্রচণ্ডবেগে তা সকলেরই চিত্তলোক অধিকার করে আছে। উনবিংশ শতাব্দী জুড়ে যে উপলব্ধি যে কোন বুদ্ধিজীবীকেই ভাবিয়ে

৭. Encyclopaedia Britannica, (Vol-16), U.S A., 1965.
৮. Ibid

তুলেছে বিংশ শতাব্দীতে প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তার বেগ হয়েছে দ্রুততর।

সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের প্রাধান্য একটি বিশেষ সাময়িক পরিস্থিতির ফলেই ঘটে থাকে কারণ চিরন্তন ও সর্বজনীন আবেদন স্বদেশপ্রেমের মত ব্যক্তি-নিরপেক্ষ ভাবোচ্ছ্বাসে থাকতে পারে না। সাহিত্যের যে স্বীকৃত রসোপকরণ স্বদেশপ্রেম তার মধ্যে অন্যতম বা একতম নয়। স্থায়ী রসের চিরন্তনত্ব নেই বলেই স্বদেশপ্রেমের আবেগে রচিত সাহিত্যেরও চিরন্তন মূল্য নেই। স্বদেশপ্রেমিকতামাত্র সম্বল করেই যে সাহিত্যিকের আবির্ভাব সাহিত্যজগতে তার আসন চিরস্থায়ী না হলে খুব বেশী অবাক হওয়া যায় না। চিরন্তন বা সর্বজনীন আবেদন না থাকলে সে সাহিত্যও চিরস্থায়ী হতে পারে না। তাই চিরন্তনত্বের নিরিখে স্বদেশপ্রেমাত্মক সাহিত্যের বিচার চলতে পারে না। সাময়িক উচ্ছ্বাসের ঢেউ স্থায়ী আলোড়ন তোলার আগেই যেমন বিলীন হয়ে যায় উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমাত্মক সাহিত্যও আজকের মানুষের মনকে আর তেমন করে আলোড়িত করে না। সমস্যার সমাধানের সঙ্গে সঙ্গে সেই সাময়িক আবেগটিও চিরতরেই বিলীন হয়ে গেছে। সুতরাং স্বদেশপ্রেমাত্মক সাহিত্যের মূল্য বিচারকালে একথা সর্বাগ্রে স্মরণ রাখা দরকার যে, সাময়িক সাহিত্য রূপেই এর অস্তিত্ব। এ সম্পর্কে একজন ইংরেজ সাহিত্যিক স্বদেশপ্রেম নামক আবেগটির স্থান নির্ণয়কালে বলেছেন, 'Patriotism, or love of country, is a theme that has been hardly less engaging to literature than the eternal inspirations of the seasons, and beauty's passing, and the approach of death, or the love of woman itself...Sometimes, it is true, the love of country takes on a strange and almost unrecognisable character.'[১]

মানব মনের গভীর ভাবগুলি অলংকার শাস্ত্রে ব্যাখ্যাত হয়েছে—সাহিত্যে উৎকৃষ্ট রসসৃষ্টির উপকরণ সেই ভাবগুলিতে বর্তমান। স্বদেশপ্রেমকে কোনমতেই সেই ভাববাহী বলে মনে করা যায় না। কিন্তু ব্যক্তিনিরপেক্ষ ভাব হলেও সাময়িক পরিস্থিতির প্রয়োজনে এই গৌণ অনুভূতিই দীর্ঘদিন ধরে সাহিত্যিকের চেতনা অধিকার করতে পারে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যই তার প্রমাণ। উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমই একটি সাধারণ যোগসূত্র—প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা থেকে সর্বস্তরের প্রতিভাকে তা প্রভাবিত করেছিল। কবির কাব্যে,

---

১. John Drinkwater, *Patriotism in Literature*, London, 1924, p.11.

নাট্যকারের নাট্যরচনায়, উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর চরিত্রে, প্রবন্ধের বক্তব্যরূপে স্বদেশপ্রেম সর্বত্র পরিবেশিত হয়েছে, তবে স্বদেশপ্রেমের পূর্ণ স্বরূপে হয়ত নয়। কোথাও তা নিছক স্বদেশচেতনারই নামান্তর—দেশের ভাষা, সংস্কৃতি ও সমাজ-প্রীতিকে অবলম্বন করে কোথাও অস্পষ্ট স্বদেশচেতনার পরিচয় পেয়েছি—আবার কোথাও প্রকাশ্যে বা ইঙ্গিতে রাজনৈতিক স্বাধিকারের বাসনা পোষণ করেছে। কোথাও স্বদেশপ্রীতি শুধুই বঙ্গপ্রীতি—কোথাও বা ভারত চেতনায় রূপলাভ করেছে। কিন্তু যে ভাবেই হোক না কেন—স্বদেশপ্রেমী সাহিত্যিক দেশ ও জাতির কথা যে চিন্তা করেছিলেন—তাতে কোন সন্দেহ নেই। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে স্বদেশচেতনার বাণী নানাভাবে-নানাভাষায়-নানা রূপকে-ব্যঞ্জনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে।

স্বদেশপ্রেমিকতা স্রষ্টার চরিত্রের লক্ষণীয় কোন প্রতিভা নয়, স্বদেশপ্রেমিক নন অথচ বিশ্বজয়ী সাহিত্যিকরাই তার প্রমাণ। অনেক সময় স্বদেশপ্রেমিকতা লেখকের অন্যান্য বিশেষ ক্ষমতাকে আচ্ছন্ন করে রাখে। সাহিত্যের চিরন্তন মূল্যবিচার কালে এই স্বভাবটিকে অনেক সময় বিশেষ বোঝাস্বরূপ মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস সম্পর্কে একথা বারবার মনে হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচেতনা অনুপস্থিত থাকলে 'মৃণালিনী', 'দেবী চৌধুরানী', 'আনন্দমঠের' আবেদনই অন্যরকমের হত। চরিত্র বিশ্লেষণে কিম্বা কাহিনীর গ্রন্থনায় ঔপন্যাসিক আরও বেশী সচেতন হতে পারতেন, তার ফলাফল অবশ্যই অন্যরকম হত। উপন্যাসে ঔপন্যাসিক আরোপিত স্বদেশচেতনার বাণী অনেক জায়গাতেই বেমানান মনে হবে, এটাই স্বাভাবিক। আবার স্বদেশচেতনার অতিপ্রভাব যখন কোন সার্থকতার সম্ভাবনাকেই: বিনষ্ট করে দেয় তখন লেখকের স্বদেশপ্রেমিকতাকে দায়ী করা হয়। অবশ্য এ সবের জন্য স্বদেশ-চেতনাকে দায়ী না করে লেখকের রসসৃষ্টি বা রসদৃষ্টির অভাবকেই অভিযুক্ত করা যায়। চিরন্তন মূল্য বিচারকালে যে-কোন সাহিত্যিকের যে-কোন প্রবণতারই অসার্থক প্রয়োগের সমালোচনা হতে পারে। রসসৃষ্টির দায়িত্বের কথা বিস্মৃত হয়ে প্রবণতার দ্বারা অভিভূত হওয়াকে নিশ্চয়ই স্রষ্টার ত্রুটি বলেই গণ্য করা উচিত। সাহিত্যের চিরন্তন মূল্যবিচার প্রসঙ্গে Saintsbury বলেছিলেন—"The critical question about poetry is not, 'Is it sincere? "It is original?" "Is it this, that and the other?" but "It is poetical?" To this question, in the case of the writers of the Interval, we can only answer 'Yes' on the rarest occasions, with some hesitation even, and with constant allowances."[১০]

১০. George Saintsbury, *The Earlier Renaissance*, London, 1907, p.265.

সুতরাং স্বদেশপ্রীতিকেই সেই দিক থেকে প্রতিবন্ধক রূপে দেখার যুক্তিও খুব নেই। সমগ্র উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য স্বদেশচেতনার বোঝা নিয়েও মাঝে মাঝে সুসাহিত্য হতে পেরেছে, এমন কি শুধু স্বদেশচেতনা সম্বল করেই কেউ কেউ সে যুগের জনপ্রিয়, শক্তিমান ও প্রতিভাবান কবিরূপে গণ্য হয়েছিলেন—তারও প্রমাণ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম করা যায়। হেমচন্দ্রের স্থায়ী কীর্তির আলোচনা কালে আধুনিক সমালোচকবর্গ তাঁর মহাকাব্য ও অসংখ্য কাব্যকে গণ্য না করে স্বদেশচেতনামূলক আন্তরিকতাপূর্ণ কবিতার মধ্যেই তা অনুসন্ধান করেছেন। কারণ স্বতঃস্ফূর্ত কবিত্বের আবেগেই হেমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমের কবিতাগুলি রচনা করেছিলেন। একালেও স্বদেশপ্রেমিকতাই তাঁর কাব্যের একমাত্র আন্তরিক উপাদান বলে গৃহীত হয়েছে।

নিছক স্বদেশপ্রেম অবলম্বন করেই সে যুগের অসংখ্য কবি-নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব হয়েছিল। নাটকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ও উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। স্বদেশপ্রেমিকতাই এঁদের মৌলিক রচনার মূলে বিদ্যমান।

উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র সাহিত্যে দেশপ্রেমের এই অতি উচ্ছ্বাসের হেতু নির্ণয় কালে দেখা যাবে—প্রাচীন সাহিত্যের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য একটি পার্থক্য রচনায় স্বদেশপ্রেমকে অনেক জায়গায় মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। সে যুগের বাঙ্গালী যে চিন্তাধারায় ও আদর্শে প্রাচীনত্বের গণ্ডী অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল—দেশভাবনার মাধ্যমেই সে কথা প্রমাণ করেছেন তারা। নিতান্তই নিজের ভাবনা নয় সমগ্রের চিন্তায় তারা উৎকণ্ঠিত। লেখক সম্প্রদায়ের আধুনিক মনোভাবের প্রতিফলন স্বদেশপ্রেমাত্মক সাহিত্যেই স্পষ্ট হয়েছিল। ঈশ্বর গুপ্ত ও রঙ্গলালের কবিভাবনায় দেশপ্রেম যখন বিশিষ্ট বক্তব্য রূপে পরিবেশিত হয়েছে তারও আগে গদ্য সাহিত্যে রামমোহন-বিদ্যাসাগর স্বদেশচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন। আর যে-কোন নতুন কথাই সাগ্রহে অনুকরণ করার একটা প্রবণতা সবযুগেই দেখা যায়, যতদিন পর্যন্ত বহু ব্যবহারে তা জীর্ণ না হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে মৌলিক দেশপ্রেমাত্মক রচনা যা পেয়েছি তার সংখ্যা খুবই কম, কিন্তু নিছক অনুকরণসর্বস্ব রচনার পরিমাণই বেশী। দেশপ্রেমাত্মক বক্তব্যে বৈচিত্র্য সম্পাদনের সুযোগও খুব বেশী থাকে না, আবেগসর্বস্ব এই জাতীয় রচনায় যথার্থ সৌন্দর্যসৃষ্টির অবকাশও কম। স্বদেশপ্রেমাত্মক যে-কোন রচনার মূল্য নির্ণয়ের আগে এসব কথা মনে রাখা দরকার।

বাংলা সাহিত্যে স্বদেশভাবনা যে অভিনব উপলব্ধি সে কথা আমরা অস্বীকার করতে পারি না, কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই উপলব্ধি যখন উত্তরোত্তর বেড়েই চলে তখন তার সঠিক কারণ নির্ণয় করা দরকার হয়ে পড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের

সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাঙ্গালী আত্ম-আবিষ্কারে সক্ষম হয়। স্বদেশচেতনার সূত্রপাতও একই সঙ্গে হয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই আত্ম অনুসন্ধানের প্রচেষ্টাটি ক্রমশঃ প্রবল হয়ে ওঠে। সমগ্র শতাব্দী জুড়ে বাঙ্গালীর সব সাধনাই এই আদর্শকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। সুতরাং দেশপ্রেমের আবেগটিও ক্রমশঃ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। সমগ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে তার অজস্র প্রমাণ দেখতে পাই আমরা। এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে দেশসাধনা যখন ধর্মসংস্কার কিংবা সমাজসংস্কারেরই চেষ্টায় পর্যবসিত সাহিত্যেও এই বক্তব্যই পরিবেশিত হয়েছে। রামমোহনের প্রবন্ধ কিংবা বিদ্যাসাগর-রাজনারায়ণের প্রবন্ধাবলীতে স্বদেশপ্রেম সমাজচিন্তারই নামান্তর। কিন্তু এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে স্বদেশচর্চার গুরুত্ব অনেক বেশী বেড়েছে। নিছক সমাজকল্যাণের আদর্শের সঙ্গে বিদেশী শাসনের ভয়াবহতার উপলব্ধি যুক্ত হওয়ায় সমগ্র বাঙ্গালী সেদিন মহাক্ষোভে পরাধীনতার বেদনা হৃদয়ঙ্গম করেছে। এই ক্ষোভটি দ্রুতগতিতে প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত করে দিয়েছিলেন সে যুগের স্বদেশপ্রেমী লেখকগোষ্ঠী। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্ মুহূর্তে স্বদেশপ্রেম শুধু সাহিত্যেই নয় জীবনেও আবেগ সৃজন করেছে। এই শতাব্দীর সাধনাই ছিল আত্মমুক্তির সাধনা। লেখক সম্প্রদায় নানাভাবে এই অনুভবটি জাগিয়ে রাখার ব্রত নিয়েছিলেন। পরাধীন জাতির জীবনে স্বাধীনতালাভের বাসনা যখন জাগ্রত হয় সাময়িক ভাবে তা এমনি প্রবল হয়ে ওঠে বলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর সব কথা ছাপিয়ে স্বদেশপ্রেমের কথাটিই বড়ো হয়ে উঠেছিল। বিশ্ব ইতিহাসেও এর নজির মিলবে। শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীর বক্তব্য হিসেবেই নয়—যত দিন পর্যন্ত ভারতবাসী রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা পায়নি ততদিনই স্বদেশচর্চার প্রয়োজন তীব্রতর হয়েছে। বিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমমূলক সাহিত্যের আলোচনা থেকেই তা প্রমাণিত হবে। আমাদের আলোচনা ঊনবিংশ শতাব্দীতেই আবদ্ধ। বিংশ শতাব্দীর অর্ধাংশ জুড়ে যে বিপুল স্বদেশপ্রেমাত্মক রচনার জন্ম হয়েছিল—আপাততঃ সে আলোচনায় প্রবেশ করিনি আমরা। তবে বিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমমূলক রচনায় অতিরিক্ত কোন রহস্য নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যিক-গোষ্ঠী যেকথা সাড়ম্বরে প্রচার করেছিলেন—পরবর্তী শতাব্দীর রচনাকারেরা তারই সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছেন। সিদ্ধি লাভ না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম ও সাধনা থেমে থাকে না। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে বাঙ্গালীর নতুন পরিচয় ঘটেছে—তাই স্বদেশপ্রেমের আবেগটিই শতধারে উৎসারিত হয়েছিল—পরবর্তীকালে তা নিতান্তই গতানুগতিক হয়ে গেছে। স্বদেশপ্রেমমূলক রচনার স্বর্ণযুগ হিসেবে ঊনবিংশ শতাব্দীকেই বেছে নেবার যুক্তি এখানেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র সাহিত্য ইতিহাসই এ আলোচনার জন্য প্রয়োজন হয়েছে। সবিস্ময়ে লক্ষ্য করেছি যে, এই শতাব্দীর যিনি যত বড় লেখক তিনি তত বড়ো স্বদেশপ্রেমিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর যুগন্ধর কবি মধুসূদন ও সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়েই এ সত্যটি স্পষ্ট হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেই সাহিত্য জীবন শুরু করেছেন এবং অজস্র স্বদেশাত্মক রচনায় দেশপ্রেম ব্যক্ত করেছেন এমন বহু কবি-ঔপন্যাসিক-প্রাবন্ধিক সম্পর্কে আলোচনা করতে পারিনি, তার কারণ বিংশ শতাব্দীতেই গ্রন্থগুলি প্রকাশিত হয়েছিল। যেমন প্রাবন্ধিক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী ও স্বামী বিবেকানন্দের রচনাবলী। এমন অনেক কবির রচনাও এ আলোচনায় স্থান পায়নি, কারণ তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত স্বদেশপ্রেমাত্মক রচনাংশের সবই প্রায় পরের শতাব্দীতে লেখা। কবি দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমমূলক রচনা এ কারণেই আলোচনায় বাদ দিয়েছি। পরবর্তী শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমিক লেখকরূপে এঁদের সকলেরই বিশিষ্ট পরিচয় রয়েছে। এ গ্রন্থে যেসব লেখকের স্বদেশপ্রেমমূলক রচনা আলোচনার স্থান পেয়েছে তাঁদের সামগ্রিক সাহিত্য-কীর্তির সঙ্গে একাকার করে এ জাতীয় রচনার বিচার করতে পারিনি। বোধহয় তা করাও উচিত নয়। কোনো লেখকের সামগ্রিক চিন্তাধারা একটি বিশেষ সাময়িক প্র ণতার আলোকে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় না। বিশেষতঃ যে প্রবণতাকে চিরন্তন হৃদয়াবেগের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি হিসেবে গণ্য করা যায় না। স্বদেশপ্রেমের মত অস্থায়ী ও সাময়িক উপলব্ধিকে কোনো লেখকের লেখকসত্তার পূর্ণ পরিচয় হিসেবে গণ্য করাই অনুচিত। সুতরাং স্বদেশপ্রেম চিন্তাধারাটিকে বিচ্ছিন্নভাবেই আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। কোনো কোনো লেখকের জীবনাদর্শের প্রতিফলন হয়ত এ জাতীয় রচনার সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে—সে প্রসঙ্গটিও অগ্রাহ্য করিনি। সুতরাং এ আলোচনায় স্বদেশপ্রেমিক সাহিত্যিককেই খুঁজে পাবার চেষ্টা করেছি মাত্র, তা অকপটে স্বীকার করি। সেজন্য দেশপ্রেমমূলক রচনাংশের সঙ্গে পাঠক সাধারণের পরিচয় ঘটানোর জন্যই প্রত্যেক লেখকের উৎকৃষ্ট স্বদেশপ্রেমাত্মক অংশ উদ্ধার করেছি যথাসাধ্য। অনেক সময় উদ্ধৃতির বাহুল্য বলে মনে হবে, কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক লেখকের স্বদেশভাবনায় বৈচিত্র্যের সন্ধান পেতে হলে উদ্ধৃতির সাহায্য নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বহুক্ষেত্রে একই মনোভাব, একই অভিব্যক্তি একাধিক লেখকের রচনায় ধরা পড়েছে। তার কারণ নিতান্তই সাময়িক এমন একটি অনুভূতির প্রকাশ-ভঙ্গিতে বৈচিত্র্যের সুযোগই বা কোথায়? তাছাড়া পরবর্তী লেখক অনেক সময় পূর্ববর্তী লেখকের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকেন। নাটকের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্য করেছি। একই চরিত্র অবলম্বনে একাধিক নাট্যকার নাট্যকাহিনী

রচনা করেছেন। ফলে মৌলিকত্ব দেখাবার চেষ্টা না করে এঁরা অনুকরণেরই চেষ্টা করেছিলেন—সহজে সেকথা প্রমাণিত হয়। তবু এই বিপুল স্বদেশপ্রেমমূলক সাহিত্যে অনুধাবনযোগ্য, লক্ষণীয় বহু বৈচিত্র্য খুঁজে পেয়েছি। জাতীয়তাবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত এই লেখকগোষ্ঠী দেশপ্রেমের বাণী প্রচারকে তাঁদের বিশেষ কর্তব্য বলেই গ্রহণ করেছিলেন—স্বপ্ন রচনা করেছেন আগামী ভবিষ্যতের এবং তা সফলও হয়েছে। স্বাধীন ভারতের জন্মদান করেছেন এঁরাই—সেদিক থেকে জাতীয় জীবনের একটি মহৎ কর্তব্য পালনে এঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন। সেদিক থেকেও এঁদের স্মরণ করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

গবেষণা ব্যাপারে শতাব্দীজড়িত এই বিশাল সাহিত্যকীর্তি আলোচনার খণ্ডাংশ-মাত্রই যেখানে পর্যাপ্ত, সেখানে আমার পরমশ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ও গবেষণা নির্দেশক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য আমায় নিরন্তর উৎসাহ দান করেছেন সমগ্র শতাব্দীর পটভূমিকায় বিষয়টির প্রস্ফুটনে। তিনি আমার গ্রন্থটির একটি মূল্যবান ভূমিকা রচনা করে আমায় অশেষ স্নেহপাশে বদ্ধ করেছেন। আমার শ্রদ্ধেয় গবেষণাপরীক্ষক শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন এই বিষয়ে পরবর্তী শতাব্দীকেন্দ্রিক খণ্ডটিও আমায় রচনা করার উৎসাহ দান করেছিলেন। গ্রন্থ রচনা প্রসঙ্গে এই উৎসাহ আমার পরম প্রাপ্তি বলেই মনে করি।

গ্রন্থ প্রকাশনার ব্যাপারে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্যের যে আনুকূল্য ও অকৃপণ সহযোগিতা পেয়েছি তাতে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ। এ জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশের বহু বাধা সত্ত্বেও শ্রীভট্টাচার্যের সর্বাঙ্গীণ সহযোগিতায় এ গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হোলো। নিউ নিরালা প্রেসের সর্বাধ্যক্ষ শ্রীধীরেন্দ্র নাথ বাগ ও কর্মীরাও এ ব্যাপারে আশাতীত সহযোগিতা করেছেন—আমার কৃতজ্ঞতা তাদের সকলের কাছেই।

প্রচ্ছদ অংকনে স্বনামখ্যাতা স্থপতি ও শিল্পী আমার সহকর্মিনী অধ্যাপিকা উমা সিদ্ধান্তের সহযোগিতায় আমি অত্যন্ত আনন্দিত। আমার বান্ধবী অধ্যাপিকা মঞ্জুশ্রী সিন্হা ও শ্রীছায়া বিশ্বাস আমাকে নানা বিষয়ে সাহায্য করেছেন—তাদেরও ধন্যবাদ জানাই। যাঁরা আমাকে সর্বদাই সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন—যাঁদের সহযোগিতা ধন্যবাদের অপেক্ষা রাখে না তাঁরা হলেন, শ্রীমনোজ চক্রবর্তী (অনুপ), শ্রীমতী ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়, শ্রীচিত্তরঞ্জন কাঞ্জিলাল ও কুমারী মহানন্দা কাঞ্জিলাল।

মুদ্রনের ক্ষেত্রে কিছু কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি থেকেই গেলো বলে আক্ষেপও থেকে গেলো।

গ্রন্থকার

॥ সূচীপত্র ॥

প্রথম অধ্যায়

॥ প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলাদেশে রাজনীতিচর্চা ॥

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের যোগাযোগ এত ক্ষীণ যে সাহিত্যের পাতা থেকে সে যুগের রাজনৈতিক পরিবেশটিকে আবিষ্কার করা প্রায় অসম্ভব। সেজন্য ইতিহাসের দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই আমাদের, কিন্তু ঐতিহাসিকও যখন সঠিক তথ্যের অভাবে অসহায় বোধ করেন—তখন ব্যাপারটি হয় জটিলতর। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস যাঁরা লিখেছিলেন তাঁরা ছিলেন বিজয়ী শাসকগোষ্ঠীর প্রতিনিধি। এঁরা বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীকে দেখেছিলেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিতে—তা থেকে বাঙ্গালীর সত্যকারের রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা গড়ে ওঠে না। কিন্তু বাঙ্গালীর লেখা ইতিহাসের অভাব থাকলেও,—বাঙ্গালী যে রাজনীতির প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে বিশ্লিষ্ট একটি জীবন যাপন করেছিল তাও হতে পারে না। বাঙ্গালী সম্পর্কে বিদেশী ঐতিহাসিকের লেখা বিবরণ থেকে খানিকটা ইঙ্গিত মিলবে তার। বাকীটুকু আধুনিক ঐতিহাসিকের মতামত নির্ভর করেই জানতে পারি আমরা।

বাঙ্গালী সম্পর্কে একটি সর্বজনীন ধারণা এই যে, জাতি হিসেবে তারা শান্তিপ্রিয় —ভাববিলাসী ও কল্পনাপ্রবণ। এই ধারণাটি যে অসত্য নয় বাঙ্গালীর রাজনৈতিক জীবনযাত্রার ইতিহাসই তার প্রমাণ। ভৌগোলিক আবেষ্টনী বাঙ্গালীর চরিত্রে এই জাতীয়স্বভাব সৃষ্টিতে সহায়তা করেছিল সম্ভবতঃ। কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনের এই শান্তিময় পরিবেশ বারবারই বিঘ্নিত হয়েছে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বিধৌত এই বঙ্গভূমির উর্বর পলিমাটিতে শস্যপ্রাচুর্য ছিল, অনায়াস জীবনযাপনের স্বপ্নময় পরিবেশ ছিল ঠিকই—ছিল না শুধু সুখসম্ভোগের নিশ্চিন্ত অবসর। বিধাতার এ এক নির্মম রসিকতা—তবু মনে হয়, এর ভিতরেই বোধকরি কোন গভীর তাৎপর্য ছিল। বিধাতার অজস্র আশীর্বাদে ধন্য এই বাঙ্গালীজীবন যদি চিরদিনই রাজ্যলোলুপ বিদেশীদের দৃষ্টির আড়ালে থাকত—তবে আজ তা আর নতুন করে আলোচনার সামগ্রী হোত না। ইতিহাসে বাঙ্গালীর মৃত্যু ছিল আরও অনেক অনালোচিত প্রাগৈতিহাসিক জাতির মতই অবধারিত। কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনে নানা ঘটনাবৈচিত্র্য একদিক থেকে বাঙ্গালীর গুরুত্ব বাড়িয়েছে, নানা ঘাত-প্রতিঘাতে সে সঞ্চয় করেছে অনেক অভিজ্ঞতা আর অমিত জীবনীশক্তি। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ

লোলুপের মনে বাসনার ইন্ধন জুগিয়েছে—বাংলার শান্তনির্জন জনপদের শান্তিপ্রিয় অধিবাসীদের মনে আতঙ্ক সঞ্চার করেছে। বারবার বাঙ্গালী বিদেশী অত্যাচারীদের দ্বারা উৎপীড়িত-লাঞ্ছিত হয়েছে—ইতিহাসেই সে প্রমাণ মিলবে। কিন্তু বাঙ্গালী কেন এই বহিঃশত্রুকে প্রতিরোধ করেনি তার কারণ আত্মরক্ষার শক্তি তাদের ছিল না। আরও একটি যুক্তি হতে পারে যে, বাঙ্গালীর জাতীয় চেতনা বলে কোন অনুভূতি ছিল না। শক্তিহীনতা এবং জাতীয় চেতনার অভাব লক্ষ্য করেই বিদেশী শত্রুরা এদেশে অনায়াসে প্রবেশ করেছে আর বিদেশী ঐতিহাসিক বাঙ্গালীর চরিত্রে লেপন করেছে গাঢ় কলঙ্ককালিমা।

ইতিহাসের প্রথম পর্ব থেকেই বাঙ্গালীর পরাজয়ের প্রসঙ্গটিই মুখ্য হয়েছে বলেই আত্মরক্ষায় অসমর্থ—রাজ্যরক্ষায় ব্যর্থ বাঙ্গালীর চরিত্রে বীরত্বের ভূমিকা নেই। তবে বিদেশী অধিকারেরও আগে শৌর্য-বীর্যে রাজ্যজয়ে বাঙ্গালীর কিছু গৌরব কাহিনীর অস্তিত্ব যে ছিল সে কথাও অনস্বীকার্য। জাতি হিসেবে সেদিন কিছু বিশিষ্টতার পরিচয় হয়ত ছিল কিন্তু পরের যুগে তা মুছে দিয়েছে বাঙ্গালীই। তবু সপ্তদশ অশ্বারোহীর বঙ্গবিজয়ের গল্পকথাকে প্রতিবাদ করার যথেষ্ট যুক্তি ঐতিহাসিকের ছিল। পরাজয় সত্য, কিন্তু গল্পকথাটি বানানো এ মতটি ঐতিহাসিকের—"History does not record definitely how and when the City of Gaur with its ample and mighty fortifications fell to the lance of Bakhtyar."[১]

বিদেশী অধিকৃত বাংলাদেশে রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে বাঙ্গালীর যোগ এমনি করেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। বাঙ্গালী ফিরে গেছে তার নিশ্চিন্ত গৃহবলীভুক্ পারাবতকূজিত নির্জন গৃহকুটিরে—সেখানে বসেই ধর্মচর্চা ও সমাজচর্চা করেছে একান্তমনে। গৌড়ের হিন্দুরাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাসের যে অধ্যায় শুরু হল দীর্ঘদিন ধরে তারই জের চলেছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায় নিয়ে যে বাঙ্গালী গৃহজীবনে আবদ্ধ হয়েছিল বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে সেই পূর্বকাহিনী বুঝি বারবারই পুনরাবৃত্ত হোত।

সুতরাং আদিইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গালীর সম্পর্ক ছিন্ন করে মুহম্মদ বিন্ বখ্‌তিয়ার খিল্‌জি একটি স্থায়ী কীর্তি অর্জন করেছিলেন। লক্ষ্মণসেনের 'লক্ষ্মণাবতী'—বল্লাল সেনের 'বল্লালবাড়ী'র গৌরব চিরদিনের মতই বিলীন হয়ে গেল কালগর্ভে। যদিও পূর্ববঙ্গে গৌরবের ও শৌর্যের সঙ্গে রাজ্য

১. Jadunath Sarkar, History of Bengal (Volume II), Dacca, 1948, P—8.

শাসনের চেষ্টা করেছিলেন লক্ষ্মণ সেনের বংশধরেরা, কিন্তু গৌড় হারানোর দুঃখ তাতে ভোলা যায় না। রাঢ়ভূমি ও গৌড়বঙ্গ বাংলার কেন্দ্রভূমি—বাংলা সাহিত্যচর্চার আদিপীঠ জয়দেব-বৌদ্ধ-সহজিয়া সাধকদের বিহারস্থল। গৌড়ের গৌরবসূর্যের সঙ্গে বাঙ্গালীর নামও মুছে গেল দীর্ঘদিনের জন্য। ভাগীরথীর পশ্চিম তটেই বাঙ্গালী একদিন সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক-সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল, পরাজিত বাঙ্গালীর হাত থেকে সহজেই তা ছিনিয়ে নিয়ে গেল বিদেশী অত্যাচারী শাসক—এ বেদনাটিও সেদিন বাঙ্গালীর মনে জাগেনি। আসলে সেই চেতনাটিই যখন একটি জাতির চরিত্রে আত্মপ্রকাশ করে তাকেই আমরা বলি জাতীয়তাবোধের বা স্বদেশচেতনার উপলব্ধি। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর জীবনে এই উপলব্ধি ঘটেনি—ইতিহাসই সে কথা প্রমাণ করেছে।

বাঙ্গালী জাতি ও বর্তমান বাংলাদেশের যে সাম্প্রতিক রূপ অতীত ইতিহাসের সঙ্গে তার যোগাযোগ খুবই ক্ষীণ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে সম্ভাবনার আলোকে সমগ্র বাঙ্গালীজীবন আলোকিত তার পশ্চাৎপট হিসেবে অনুসন্ধান করার জন্য আমরা ইতিহাসে ফিরে যেতে পারি, কিন্তু পুলকিত হতে পারি না। বিগত দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অধিনায়কত্ব করার সবরকম সুযোগ থেকে বঞ্চিত-বিতাড়িত বাঙ্গালীর কিছু কিছু আলোড়নের ইতিহাস যে নেই তা নয়, কিন্তু মধ্যযুগের পরাধীনতা ও বিপর্যয়ের আঘাতে আঘাতে তা ক্ষীণ হয়ে গেছে শুরুতেই। তবু আলোড়নের কোনো-না-কোনো প্রভাব বা তাৎপর্য আছেই, সেটুকুই বা অগ্রাহ্য করব কেন? রাজনীতি ক্ষেত্রে অধিনায়কত্ব করার মত শক্তির অভাব থাকলেও বাঙ্গালীর আকস্মিক শক্তির স্ফুরণ দেখেছি বাঙ্গলার সামন্তশক্তির পারস্পরিক সংঘর্ষের কাহিনীতে, বারোভুইঞাদের শৌর্য-বীর্যের মধ্যে, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষাংশে ইংরেজের সঙ্গে আঞ্চলিক সংঘর্ষের বিবরণে। এসব কাহিনী এতই বিচ্ছিন্ন, ইতিহাস-অসমর্থিত ও কল্পনাভিত্তিক যে এ জাতীয় ঘটনা থেকে সমগ্রজাতির অস্থির অন্তরাত্মাটিকে পূর্ণরূপে আবিষ্কার করা যায় না। কিন্তু এই ঘটনাগুলিতেই বাঙ্গালীর রাজনৈতিক জীবনের স্পন্দন ধরা পড়েছে। নিস্তরঙ্গ বাঙ্গালী জীবনের মাঝখানে এই ঘটনাগুলিই একমাত্র সশব্দ ব্যতিক্রম।

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে আমরা যে জাতীয়চেতনার ক্ষীণ আভাস পাই তার মধ্যে বাঙ্গালীত্বের চেতনাটি বেশ স্পষ্ট ছিল। জাতীয়ত্ব বা স্বদেশবোধের প্রথম স্তরে জাতিগত চেতনাটি প্রধানভাবে বর্তমান থাকে। কিন্তু মধ্যযুগের বাঙ্গালীদের মধ্যে বাঙ্গালিত্বের চেতনাটি মোটেই স্পষ্ট ছিল না। অধীনতায় অভ্যস্ত হবার পর রাজপ্রসাদপুষ্ট যে বাঙ্গালীসমাজের বনিয়াদ গড়ে ওঠে এঁরা পুচ্ছগ্রাহী

রাজকর্মচারী, বিধর্মী রাজার রাজসভায় স্থান করে নেবার আগ্রহ এদের কিছুমাত্র কম ছিল না। বল্লালসেনের কৌলিন্যপ্রথায় ও সনাতন সমাজব্যবস্থায় যে রক্ষণশীলতা ছিল শুধু অর্থ আর প্রতিপত্তির লোভে অনায়াসে তা একশ্রেণীর বাঙ্গালীরা পরিত্যাগ করেছিল। মোঘল শাসনে কিংবা তুর্কী শাসনেও বাংলাদেশে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল,- উচ্চবর্ণ থেকে নিম্নবর্ণের সমস্ত প্রসাদপুষ্ট বাঙ্গালীরা তাতেই ছিল সন্তুষ্ট। এরা বিদেশীশক্তির কাছে আত্মনিবেদন করেছে, পরিবর্তে নানা খেতাব ও প্রশংসা মিলেছে। ব্রাহ্মণ ছেড়েছে যজন-যাজন-অধ্যাপনা, সরকারী মহলে এঁদের নতুন পদবী ও নতুন মর্যাদা ঘোষিত হয়েছে। মজুমদার, সরকার, খান, রায়, তালুকদার, তরফদার পদবীগুলি ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনায়াসেই প্রচলিত ছিল সেযুগে, আজও। এরা কেউ শান্তির পরিবর্তে বিদ্রোহ ঘটাতে চাননি, অনায়াসবশ্য বলেই এদের সুনাম ছিল। শাসকগোষ্ঠীর অত্যাচারের বিবরণও যেমন পেয়েছি—চারিত্রিক উদারতার দৃষ্টান্তও তেমনি উজ্জ্বল। ডিহিদার-খাজনা আদায়কারীদের দৌরাত্ম্যে সাধারণ বাঙ্গালীজীবন বিপর্যস্ত হলেও রাজানুকূল্য ঘটেছে গুণীজনের কপালে। একাধিক বিদেশী শাসক বিজিতদের ভাষা ও সাহিত্যের যোগ্য সমাদর করেছেন। কৃত্তিবাস, মালাধর বসু, রূপ সনাতন, চৈতন্যদেবও সে যুগে রাজসমর্থন লাভ করেছিলেন। বাঙ্গালীস্বভাবের গভীরে যে কল্পনাপ্রবণতা, সাহিত্যপ্রতিভা ও মহত্ত্ব রয়েছে, গুণী-রসিক বিদেশী রাজারা তা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। এমনি করে পরাধীনতার তীব্র অনুভূতি খানিকটা স্তিমিততেজ হয়েছিল—তা আর কাউকেই তেমন করে চঞ্চল করেনি। তবুও বলব, কোন জাতির জীবনে এই নীরব রাজানুগত্য নির্বিচারে প্রশংসনীয় নয়। প্রখর আত্মসম্মান ও স্বাধীনচেতনা যে জাতির চরিত্রে দীপ্ত মহিমা সঞ্চার করে—এই আত্মবিলীন স্বভাব তাঁদের দৃষ্টিতে সর্বদাই নিন্দনীয়।

কিন্তু বাঙ্গালীর জীবনে এই ঐতিহাসিক সত্যের বহু প্রমাণ বর্তমান। ধর্মের প্রভাবও খানিকটা দায়ী এজন্য। এই সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি আলোচনা করলে দেখা যাবে জনজীবনের প্রচণ্ড লাঞ্ছনাতেই প্রতিবাদের ভাষা স্তব্ধ হয়ে আছে,—রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বাদ সম্পূর্ণরূপে ভুলে গেছে বাঙ্গালী। তাদের শেষ সম্বল ছিল ধর্ম,—দুঃখে-বিপদে-বিপর্যয়ে তারা ধর্মের আশ্রয় প্রার্থনা করেছে,—অত্যাচার দুর্নিবার হলেও প্রার্থনা ছাড়া অন্য কোন পথ তাদের জানা ছিল না। এ যুগের সাহিত্যের মধ্যেও তার পরিচয় মিলবে। ধর্মীয় সাহিত্য হলেও মঙ্গলকাব্যগুলি সে যুগের হৃৎস্পন্দনের ইতিকথা। মঙ্গলকাব্যের দর্পণে অতিস্বচ্ছভাবে ধরা পড়েছে সে যুগের রাজনৈতিক ঘটনার সত্য ইঙ্গিতগুলি। মঙ্গলকাব্যের প্রসঙ্গে আমরা সে আলোচনা করব। কিন্তু বাঙ্গালীর ধর্মজীবন কিভাবে তাদের চারিত্রিক

শক্তির স্বাভাবিক স্ফুরণকে ব্যাহত করেছিল তার মূলে চৈতন্যের আবির্ভাবের প্রসঙ্গটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে হয়। চৈতন্যের ধর্ম বাঙ্গালীর ভীরু স্বভাবকে আরও ভীরু করেছে। 'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা'—দর্শনের বাণী হিসেবে অনেক মহৎ—কিন্তু শক্তিহীন জাতির আত্মপরীক্ষা পর্বে এর কোনো মূল্য নেই। নবদ্বীপে চাঁদকাজির অত্যাচারে অতিষ্ঠ, মুসলমানের শাসনে বাঙ্গালীজীবন যখন শঙ্কার সমুদ্রে ভাসছে—চৈতন্য এলেন বদ্ধাঞ্জলি হাতে ক্ষমার মন্ত্র নিয়ে। এর মধ্যে মাহাত্ম্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু এ ঘটনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে সমগ্র বাঙ্গালী স্বভাবের ভীরুতা ও দুর্বলতার লক্ষণ। নিপীড়িত মানুষকে রক্ষার অভয় বাণী নিয়ে সেদিন যদি কোনো শক্তিমান বীরপুরুষের আবির্ভাব হোতো ইতিহাসটাই হয়ত অন্যরকম হয়ে যেতো।

অবশ্য চৈতন্যদেবের আবির্ভাব বাংলাদেশের সামাজিক জীবনে, ধর্মজীবনে এমনকি রাজনৈতিক জীবনেও একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। হিন্দুসমাজের আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের দিনে, বিপন্ন বাংলার দুর্দিনে, অবতার চৈতন্যের আবির্ভাবের ফলাফলও হয়েছিল সুদূরপ্রসারী। সমাজজীবনের ঐক্য বিনষ্ট হলে গৃহবিবাদ তখন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তার ওপর মুসলমানের অত্যাচারে হিন্দুধর্ম ও হিন্দুসমাজও সেদিন মুমূর্ষু,—চৈতন্যদেবের আবির্ভাব সেই আন্তরবিক্ষুব্ধ বহিঃশত্রু-লাঞ্ছিত বাংলাদেশে। সমাজ তখন সঠিক কর্তব্য জানে না,—ধর্মজগতেও একটা দিশাহারা প্লাবন,—একটা সর্বাত্মক পতনের সংকেত যখন আসন্ন—'সম্ভবামি যুগে যুগে'র প্রতিশ্রুতিই যেন পালন করতে এলেন চৈতন্যদেব—নর-অবতার রূপে। সেই যুগটি সম্পর্কে নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি স্মরণ করি—The degraded Sahajiya and Nathism and various phases of decadent Buddhism and Tantricism, of which the mantle of Hinduism was thrown, brought in superstitious rites and doubtful practices which weakened the inherited spirituality of Brahmanism as a religion.... The times were such as needed a reformer and saviour.[২]

সেই পরিত্রাতা হলেন শ্রীচৈতন্যদেব। ধর্মজীবনের পুনরুত্থানের ইতিহাসে চৈতন্যের আবির্ভাব সার্থক হয়েছিলো। আপাতঃদৃষ্টিতে রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে তাঁর কোনো যোগ নেই বটে, কিন্তু গভীরভাবে চিন্তা করলে চৈতন্য আবির্ভাবের সঙ্গে

২. Dr. S. K. Dey, Early History of the Vaisnava Faith and Movement in Bengal, Calcutta, 1942, P—22.

বাঙ্গালীর রাষ্ট্রচেতনারও একটা যোগাযোগ আবিষ্কার করা সম্ভব। ষোড়শ শতাব্দীর অগ্রগতির পথে ধর্মই সেদিন মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।—ধর্ম জাগরণই জনচিত্তকে উদ্বোধিত করেছে নবতর জীবনাদর্শে, নতুন করে জীবনের মূল্যায়নও শুরু হয়েছে। এই নবজাগরণের সঙ্গে সে যুগের রাষ্ট্রীয়জীবনের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল না, কিন্তু একটা অস্পষ্ট জাতীয়চেতনার উপলব্ধি এই নবজাগরণের মূলে আবিষ্কার করা যায়। ধর্ম-আন্দোলন ও রাষ্ট্র-আন্দোলন সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাপার, কিন্তু একেবারে যোগসূত্র বিহীন বলা যায় না। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়চেতনা এই ধর্মান্দোলনকে কেন্দ্র করেই ঘনীভূত হয়েছিল। চৈতন্যযুগের এই নবজাগরণের সঙ্গে রাষ্ট্রচেতনার যোগ নেই—ধর্মান্দোলনের নায়করূপেই সারা ভারতে চৈতন্যদেব স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তবে চৈতন্যদেব সমাজচেতনা সঞ্চার করেছিলেন বাঙ্গালীর প্রাণে। কুসংস্কার ও দেশাচারে মগ্ন, কৌলিন্যপ্রথার বিষে জর্জরিত হিন্দুসমাজের সামনে চৈতন্যদেব মানবতার নতুন বাণী শোনালেন। বল্লালী গোঁড়ামী, ব্রাহ্মণ্যশাসনের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে মুক্তি পাবার আকুতি ছিল মানুষের মনে, চৈতন্যদেব সেই বাণীই প্রচার করলেন। সে-যুগের সমাজজীবনে এর চেয়ে বড়ো বিপ্লবের বাণী আর কী-ই-বা হতে পারত? শুধু হিন্দুসমাজের গোঁড়ামীই নয়—হিন্দু-মুসলমানের ভেদকেও উপেক্ষা করে মানুষের সত্য আত্মার জয়ঘোষণা চৈতন্যযুগের সবচেয়ে বড়ো সমাজ বিপ্লবের বাণী বহন করেছে। অহিন্দু মুসলমান চৈতন্যভক্ত হতে পেরেছে, ধর্মীয় রীতি ও নীতির এই অনাবিল উদারতার মধ্যে সমাজ পরিবর্তনের একটা নিশ্চিত ইঙ্গিত লুকিয়েছিল। সমাজ বিবর্তনের এই সীমারেখা শুধু ধর্মজীবনেই আবদ্ধ নয়, রাষ্ট্রজীবনেরও সূচনা করেছে বলা যেতে পারে। চৈতন্যধর্মের পলিমাটিতেই ঐক্য ও রাষ্ট্রচেতনার প্রথম বাণী উচ্চারিত হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু একথাও সত্য যে সেই যুগের ধর্মীয় জয়োল্লাসের মধ্যে তা ডুবে গেছে। চৈতন্যদেব শুধু সর্বশ্রেণীর মানুষকে একাকার করে যাননি—মানুষের প্রচণ্ড শক্তির একটা ধারণাও পেতে চেয়েছিলেন। সামাজিক ভেদবুদ্ধির ঊর্ধ্বে সম্মিলিত মানুষের সংঘবদ্ধ শক্তির মধ্যে তিনি একটি অলক্ষ্য ঐক্যের শক্তিও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ধর্মের ডাকে যারা এক হতে পারে—অন্য কোন অনুভূতির আহ্বানেও তারা একদিন মিলিত হতে পারে—একথা যেন সকলেই বুঝেছিল। চৈতন্যদেবের প্রবর্তিত এই ধর্মান্দোলনের অন্য কোনো ব্যাখ্যা হয়নি। নিতান্তই ধর্মভীরু মানুষ নামগানে মাতোয়ারা হয়ে আছে—এর আর অন্য কি ব্যাখ্যাই বা হতে পারে? কিন্তু অহিন্দু শাসকগোষ্ঠী এই ঐক্যের শক্তিকে সুনজরে দেখেনি—তারাই এর অন্য মানে খুঁজে পেয়েছিল। নবদ্বীপে কাজির অত্যাচার যখন চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছে চৈতন্য শিষ্যদের মনে তখন একটি অদৃষ্টপূর্ব শক্তিকেই প্রত্যক্ষ করেছি আমরা।

এতদিন অত্যাচারের হাত থেকে পলায়নের পথ খুঁজেছে যারা তারাই আজ সংঘবদ্ধ শক্তিকে সম্বল করে প্রকাশ্যে বুক পেতে দিয়েছে, উদ্যত শাসকের সামনে যে মনোবলের পরিচয় দিয়েছে,—ইতিহাসে তার নজির আর কোথাও নেই।

চৈতন্যদেব সহনশীলতার প্রতিমূর্তি।—বিপদ-বাধা তুচ্ছ করে সহ্যশক্তির যে পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি নিজের জীবনে, ভক্তরাও সে পথ অনুসরণ করেছে। চৈতন্য শিষ্য সম্প্রদায়ের ওপরে এই সহ্যশক্তির পরীক্ষা হয়েছে বারবার। লাঞ্ছনার ভীতিকে অগ্রাহ্য করে যে মনোবলের পরীক্ষায় চৈতন্যশিষ্যরা সসম্মানে উত্তীর্ণ, সমগ্র জাতির অন্তরে তা এক প্রচণ্ড উদ্দীপনা সৃজন করেছিল। তাই দেখি, চৈতন্যদেবের ধর্মান্দোলন বাংলাদেশের প্রথম জন-আন্দোলন; সর্বশ্রেণীর সর্বস্তরের মানুষ এতে অংশগ্রহণ করেছে। বাঙ্গালীর জীবনে এই আন্দোলন একটা অচিন্ত্যপূর্ব ইতিহাসের উদ্বোধন। এই ঐতিহাসিক উত্তরাধিকার বাঙ্গালীর জীবনে ব্যর্থ হয়নি। চৈতন্যযুগের এই মহিমাকে শুধু স্মৃতির সামগ্রী বলে বন্দনা করলেই এর সবটুকু মর্যাদা দেওয়া হয় না। বস্তুতঃ এই যুগ এসেছিলো বলেই বাঙ্গালী একদিন ভারতসভায় নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিল। মহান ব্যক্তিত্ব থেকে শুধু প্রত্যক্ষ উপকারই পাই না আমরা, পরোক্ষ-ভাবে সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও প্রভাবিত হই। জাতির চিন্তাধারাকে একটি পরিণতির দিকে চালনা করে নতুন ভবিষ্যতের দ্বারোদ্ঘাটন করেছিলেন চৈতন্যদেব। শুধু ধর্মযজ্ঞের হোতা বা অবতাররূপেই নয়,—সর্বযুগের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে দেখা যাবে চৈতন্যদেব জাতিস্রষ্টা ও ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাগরণের মুহূর্তে ষোড়শ শতাব্দীর ঐতিহাসিক জাগরণের চিত্র স্বভাবতই আমাদের মনে পড়ে—কিন্তু ইতিহাসে এ ঘটনার কোনো ছায়াপাত নেই।

চৈতন্যদেবের ধর্মের কোমল দিকটি সে যুগে বিশেষ প্রতিক্রিয়া সঞ্চার করেছিলো —সে সম্পর্কে পূর্বেই বলেছি। চৈতন্য শিষ্যসম্প্রদায় আদর্শে ও সহনদক্ষতায় অবিচল ছিলেন কিন্তু সাধারণ মানুষ ক্ষমা, প্রেম ও বিনয়ের দ্বারা বিগলিত হতে চেয়েছে,— চারিত্রিক দৃঢ়তা অর্জন করেনি। ভক্তিগঙ্গার জলে পবিত্র হয়ে, নির্বেদ বৈরাগ্যে মত্ত হয়ে থাকার মধ্যে জাতীয়স্বভাবের দৃঢ়তার পরিচয়টিই অনুপস্থিত। তাই শ্রীচৈতন্য যখন বদ্ধাঞ্জলি হাতে সমগ্র জাতির সামনে এসে দাঁড়ালেন—ভক্তির অলৌকিক মাহাত্ম্যে ক্ষত্রিয় রাজধর্ম ভুলে, হিংসা-দ্বেষ বর্জন করে পরম সাধু হল, তার সামাজিক প্রতিক্রিয়া শুভ হতে পারে না। পরাধীন জাতির অসাড় অনুভূতিতে আরও কয়েক স্তর নিষ্ক্রিয়তার ধূলো জমে উঠল এই সুযোগে। চৈতন্যদেব রাজদরবারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেননি—কিন্তু তাঁরই প্রভাবে হোসেনশাহার দুজন প্রভাবশালী অমাত্য বিষয়কর্মত্যাগ করে সন্ন্যাসী জীবন বেছে নিলেন, এতে গৌড়রাজ খুশি হননি

নিশ্চয়ই। তাই ঐতিহাসিক চৈতন্যপ্রবর্তিত ধর্মের সমালোচনা করে বলেছিলেন—too soft to conduct national defence.[৩] চৈতন্যের ধর্ম বাঙ্গালীর ভাবুক চিত্তকে আরও খানিকটা ভাবুক করে তুলেছিল একথা সত্য। শক্তি ও শৌর্যের কোনো জাগরণস্বপ্ন যদি বা থেকেও থাকে, চৈতন্যের ক্ষমা ও প্রেমের বন্যায় তা ভেসে গেল। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার কোনো মুমূর্ষু স্বপ্নও আর বেঁচে রইল না। উত্তেজনা সঞ্চার করতে পারে এমন খাদ্য গ্রহণে অপারগ হল বৈষ্ণবরা। মাছ ও মাংস আহারের রুচি কমে গেল, ক্ষত্রতেজ ও দৈহিকশক্তি স্তিমিত হল, সাধারণ মানুষ হরিভজনাকেই প্রত্যক্ষ মোক্ষলাভের একমাত্র উপায় হিসেবে গ্রহণ করে নিশ্চিন্ত রইল।

চৈতন্যধর্মের এই দিকটি বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের শক্তিস্ফুরণের অন্তরায় বলে মনে করা অসমীচীন হবে না। দেশের জনগণের মধ্যে শক্তিচর্চার একটা প্রশস্ত ক্ষেত্র থাকা অপরিহার্য বলে যদি গণ্য করা যায়—চৈতন্যযুগে সেই ধারণার বিলুপ্তি ঘটেছিল। শ্রীচৈতন্যের ধর্ম পরোক্ষভাবে বাঙ্গালীর স্বভাবগত নিষ্ক্রিয়তা বৃদ্ধি করেছে। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক মতামতটি এই—...It relaxed the fibres of national character in the field of action, though it undoubtedly prompted holy living and noble thinking.[৪]

এ সম্বন্ধে আরও একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে বহু রাজ পরিবার হিংসা-দ্বেষের মত রাজোচিত স্বভাব বর্জন করে ক্ষমা ও প্রেমধর্মের উপাসক হয়ে উঠেছিলেন। বৈষ্ণবতা ও রাজার ধর্ম দুটিই একত্রে পালন করা অসম্ভব; তাই ক্ষত্রধর্মচ্যুত হয়ে এরা জাতীয়শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। বৈষ্ণবধর্মে শক্তির প্রশংসা নেই—কিন্তু বিদেশী রাজশক্তির কাছে প্রেমধর্মের মহত্ব বর্ণনা আর অরণ্যে রোদন করা সমান। এজন্যই দেখতে পাই আসামরাজ গদাধরসিংহ বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারের বিরোধিতা করেছেন। বৈষ্ণব গোস্বামীদের সংস্পর্শে এলে তাঁর সৈন্যদলের মধ্যে অহিংস মনোভাবের উদয় হবে এবং রাজ্যরক্ষার মত সবচেয়ে গুরুতর ব্যাপারেই অবহেলা দেখা দেবে, এই ভয় ছিল তাঁর। এই শংকায় তিনি বৈষ্ণব বিরোধী হয়েছিলেন। ইতিহাসের বিবরণটিও লক্ষ্যণীয়--"Gadadhar Singh feared the physical deterioration that might ensue if his people obeyed the injunction of the Gosains and abstained from eating the flesh of cattle, wine and fowls and from indulging in strong drinks."[৫]

---

৩. Jadunath Sarkar, History of Bengal (Vol—II), Dacca, 1948, P—222.

৪. Ibid, P—223.

৫. Ibid, P—222—223.

ধর্মান্দোলনের নেতারূপেই যাঁর প্রসিদ্ধি সেই চৈতন্যদেবও রাষ্ট্রনায়কদের চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। পরাধীনতার স্পর্শ থেকে স্বাধীন অস্তিত্বরক্ষায় যারা প্রয়াসী—তারা আত্মরক্ষার জন্যই শক্তির উপাসনা করে থাকে। এখানেই বৈষ্ণবধর্মের সংগে শক্তি উপাসকদের বিরোধ। বাংলাদেশেও চৈতন্যের তিরোভাবের অল্পকালের মধ্যেই চৈতন্যধর্মের আবেদন আর তেমন প্রচণ্ড ছিল না। খুব অল্পকালেই তা প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গেছে।

চৈতন্যোত্তর যুগের রাষ্ট্রবিবরণ পেতে হলে আমাদের মঙ্গলকাব্যের সাহায্য নিতে হবে। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর এই সাহিত্যেই যুগজীবনের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। পরাধীন বাংলাদেশের পটভূমিকায় এ কাব্যের জন্ম; পরাধীন কবির মনোবেদনা যা কিছু মেলে তা এই মঙ্গলকাব্যেই। অনার্য-অধ্যুষিত বাংলার সমাজজীবন, বৈশ্যশাসিত বাংলাদেশের সত্য ইতিহাসের দলিল হিসেবে মঙ্গলকাব্য-গুলির কিছু মূল্য স্বীকার করতে হবে। পাল ও সেন রাজাদের আমলে বাংলাদেশের আদিম অনার্য অধিবাসীদের সংস্কৃতির সংগে ঐতিহ্যমণ্ডিত আর্যসমাজের অতলান্তিক বৈসাদৃশ্য বর্তমান ছিল। এই অনার্য আদিবাসীদের আদিম প্রকৃতি তখনও ছিল অবিকৃত—তারা দুর্ধর্ষ—বন্য। কিন্তু স্বাধীনপ্রকৃতি এই অনার্য বাঙ্গালী সেদিন আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির কাছে মাথা নত করেছিল। বাংলাদেশের আর্যীকরণ পর্যায়ের যদি কিছু উদাহরণ প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করতে হয় তবে মঙ্গলকাব্যেই তা অনুসন্ধান করতে হবে। চণ্ডীমঙ্গল, মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল সময়ের দিক থেকে পরবর্তীকালের রচনা হলেও আদিবঙ্গদেশের প্রকৃত রূপ বর্ণনাই এর বিষয়—আদিযুগের বাঙ্গালীরাই এর কুশীলব।

মনসামঙ্গল কাব্যটিতে অবশ্য আর্যীকৃত বাংলার স্পষ্টরূপ আছে কিন্তু চণ্ডীমঙ্গল ও ধর্মমঙ্গলের কাহিনী সম্পূর্ণভাবেই বাংলাদেশের নিজস্ব কাহিনী। ঠিক এই ধরনের সমাজজীবন সে যুগের বাংলাদেশ ছাড়া অন্যত্র বিরলদৃষ্ট। ভারতবর্ষের সর্বত্র যখন ব্রাহ্মণ্য শাসিত হিন্দুসভ্যতার জয়পতাকা উড্ডীন, অনার্যের বাসভূমি বাংলার পথেঘাটে তখনও ফুল্লরা-নিদয়া মাংসের ঝুড়ি কাঁখালে নিয়ে হাটে চলেছে দ্রুতগমনে। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে আমরা যে সমাজের বর্ণনা পেয়েছি তার নায়ক বন্য কিরাত ও শবর শ্রেণীর —সাদাবাংলায় যাদের নাম ব্যাধ। যুদ্ধবিদ্যার অপরিসীম পারদর্শিতা না থাকলেও দৈবকৃপাবলে এরা পার্শ্ববর্তী রাজার সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, মঙ্গলকাব্যের বিষয় বলে এই কাহিনীই আমরা পাঠ করে আসছি। কেন চণ্ডীমঙ্গলের নায়ক একজন বিশুদ্ধ বাংলার আদিবাসী, কেনই বা তার শৌর্য-বীর্য কাহিনীই মঙ্গলকাব্যের মুখ্য বিষয় তা আমরা জানি না প্রামাণ্য ইতিহাসের অভাবেই। এই আদিবাসী নায়কদের কোনো

রাজনৈতিক ইতিহাস নেই—কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণকারীদের কাছে এরা বিনাদ্বিধায় আত্মসমর্পণ করেছিল—একথা মানতে পারি না। সংঘবদ্ধতা বা একতার অভাবও যে ছিল না তাত নানাস্থানেই দেখেছি ;—তাছাড়া জাতি হিসেবেও এরা ছিল দুর্ধর্ষ বন্য, বাঘ-সিংহকে সুকৌশলে বধ করার নেশা এদের উত্তরাধিকারগত শক্তি, অথচ এরাই ভীরু মানুষের মত বিদেশীকে ভয় করেছে বা সহজে আত্মসমর্পণ করেছে সেটা বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের কালকেতু এক অমিতশক্তিমান বন্য পুরুষ, কিন্তু কোথাও বীরোচিত কুশলতা এর ছিল না—হয়ত এই অবোধ সারল্যই এদের শক্তিহীনতার-সহজবশ্যতার মূলকারণ। বুদ্ধিবৃত্তির সাধারণ স্তর থেকেই এরা জীবনকে দেখেছে, তার মূলে কোনো কূটনীতিকে প্রশ্রয় দেয়নি।

কিন্তু ধর্মমঙ্গল কাব্যখানিকে ঠিক এ পর্যায়ের রাজনীতি চেতনাশূন্য কাব্য বলে অভিহিত করা যায় না। মুখ্যতঃ রাজনীতিই এর প্রধান অবলম্বনীয় বিষয়। যুদ্ধের দামামা আর নবলক্ষ সেনাদলের অমিত বিক্রমের বর্ণনা এর পাতায় পাতায়, আর কিছু রাজনৈতিক মারপ্যাঁচের কাহিনীও এতে মিলবে। সপ্তদশ শতাব্দীর যুদ্ধমুখর মুহূর্তে ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কাহিনীকার ঘনরাম চক্রবর্তী অন্ত্যজদের দেবতাকে নিয়ে এই যুদ্ধ বর্ণনাকীর্ণ কাব্যখানি লিখেছিলেন। এর সমসাময়িক একজন কবিই আবার একাব্য লেখার অপরাধে ব্রাহ্মণ্যসমাজে ভ্রষ্ট বলে অভিহিত হয়েছেন। ঘনরাম চক্রবর্তী কিন্তু বাধানিষেধ না মেনে আদি বাংলার গৌরব গাথাকে তার কাব্যের বিষয়ীভূত করেছেন নির্ভীকচিত্তে। সে যুগের রাজনৈতিক আকাশে যুদ্ধের ঘনঘটা, বারভূইঞাদের সংগে মোঘল সম্রাটের প্রেরিত সেনাপতিদের যুদ্ধ চলেছে, তখন কবি নিভৃত গৃহকোণে নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছেন আরও একটি যুদ্ধবর্ণনায়। ঘটনাস্থল গৌড় যা সেযুগেও বিগতগৌরব-শ্রীহীন। আর যে পাত্রপাত্রী তাঁর কাব্যের নায়ক-নায়িকা তাঁরাও বহুদিনই অবলুপ্ত। রাজধানী গৌড়ে ধর্মপালের শেষতম বংশধরটিকেও আমরা বাংলাদেশের কোনো লুক্কায়িত গুহা থেকেও অনুসন্ধান করতে পারব না। অথচ ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মকাব্যের পটভূমিকায় এই অতীতচারী গৌড়পালের কীর্তিগাথা রচনায় উৎসুক হলেন কেন সে এক আশ্চর্য রহস্য। আর এই ধর্মমঙ্গল কাব্যেরই কোন একটি মানুষের মুখে আমরা এমন এক-একটি আশ্চর্য অনুভূতির সাক্ষাৎ পাই যার মধ্যে স্বদেশচেতনার পুরোপুরি প্রকাশ রয়েছে। গৌড়যাত্রার পালায় রাণী প্রিয়তম পুত্রকে গৌড়ে পাঠাবার সময় বলছেন—

"পরাধীন পরাণ বিফল হেন গণি॥"

রাণী পুত্রবিচ্ছেদে শঙ্কাতুরা-বিষাদপ্রতিমা কিন্তু পরাধীনতার অভাবে যে জীবনই বিফল-অর্থহীন এ সত্য তিনি বিস্মৃত হননি। আর পরাধীন শব্দটির সঙ্গে পরাণের

বৈফলতার দ্যোতনা সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাস সমর্থিত এক অত্যাশ্চর্য সত্যঅনুভব, বহুপরে যার সত্যতা উপলব্ধ হয়েছে; আরও দুটি কি তিনটি শতাব্দীর প্রয়োজন হয়েছে তারজন্য। উনবিংশ শতাব্দীতে যা আভাষমাত্র সপ্তদশ শতাব্দীর এক বিস্মৃত মুহূর্তে সেই আভাষই যেন অলক্ষ্যে উচ্চারিত হয়েই থেমে গেছে। এই উচ্চারণের মধ্যে কোন এক শুভলগ্নের সূচনা দেখা যেতে পারত—কিন্তু আমাদের গাঢ় অবচেতনার খোলস সে ভাঙ্গতে পারেনি। রাণী রঞ্জাবতীর মনোবেদনায় এই অসীম অর্থবহ পংক্তিটি কথায় কথায় মিলিয়ে গেছে মাত্র। ধর্মমঙ্গল কাব্যের মধ্যেই সচেতন রাজকাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। এখানে রাজা আছেন, অমাত্য আছেন, মন্ত্রী আছেন; আশ্রিত বিশ্বাসী প্রজা ও অত্যাচারিত প্রজারও সাক্ষাৎ পাই। মুখ্যতঃ এটি রাজার কাহিনী—যার সঙ্গে যুদ্ধ শব্দটি প্রায় জড়িয়ে থাকেই। আমরা রাজাকে জানি তার যুদ্ধসামর্থ্যের মাপকাঠিতে, শক্তির পরিচয়েই তার আত্মপ্রতিষ্ঠা। অন্যান্য মঙ্গলকাব্যগুলিতে রাজকাহিনী নেপথ্যে কিন্তু ধর্মমঙ্গলে রাজাই প্রধান ব্যক্তি "ধর্মপাল নামে ছিল গৌড়ের ঠাকুর" এবং এই গৌড়রাজ প্রত্যেকটি চরম মুহূর্তের সঙ্গে জড়িত। রাজকাহিনীই ধর্মমঙ্গলের মুখ্য বিষয়—রাজা, মন্ত্রী, মহাপাত্র, আশ্রিত সামন্তরাজ এর মুখ্য নায়কগোষ্ঠী।

সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসে আমরা দেখেছি এক চূড়ান্ত দ্বন্দ্ব—বার ভুইঞাদের বিক্রমকাহিনীর পরিচয়ও অন্যত্র রয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করেছি—যুদ্ধবিক্রমের দামামায় বাংলার প্রতিটি অঞ্চল যখন মুখরিত,—সুন্দরবনের গহন অরণ্যেও যে যুদ্ধমশাল জ্বলে উঠেছে,—পর্তুগীজ দস্যুদের অমিত বিক্রমে জলস্থল যখন আন্দোলিত তখন সাহিত্যস্রষ্টাদের আসর সে ব্যাপারে একেবারে নীরব। একমাত্র ধর্মগীতি হিসেবে কিছু বৈষ্ণব কবিতা পেয়েছি পূর্ববর্তী গৌড়যুগের নিছক অনুসরণই যেখানে প্রধান। যুগচিহ্নের কোন ছায়াপাত সে যুগের কোন কাব্যেই দেখা যায়নি। ধর্মের আবরণে কিছু প্রকাশ করা যদিবা সম্ভব ছিল—প্রকাশ্য ভাষা সেখানে অকল্পনীয়। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতে বাস্তবজীবনের যুদ্ধকেই সাহিত্যের বিষয় করে ঘনরাম চক্রবর্তী শ্রদ্ধার পাত্র হয়েছেন। ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ রচনাকার হিসেবে তার প্রসিদ্ধি অন্য কারণে। তিনি ধর্মমাহাত্ম্য বর্ণনায় পটুত্ব দেখিয়েছেন বলেই তার প্রশংসা। কিন্তু গ্রন্থটির প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে যে যুদ্ধ বর্ণনা করেছেন, সে যুগের যুদ্ধস্মৃতিকে জীবন্ত করে তুলেছিলেন সেকারণে তার বাস্তবদৃষ্টির প্রশংসা হয়নি। ধর্মমঙ্গলে লক্ষ্যণীয় যুগ-বৈশিষ্ট্য অনেক ধরা পড়েছে। এ কাব্যেই দেখি বিনা দোষে অত্যাচারী মন্ত্রী নিরীহ অনুগত প্রজার সর্বনাশ সাধন করেছে। কবি বন্দী সোমঘোষকে দেখলেন—'বিপাকে বৎসর বন্দী আছে কর্মদোষে' কারণ 'সম্প্রতি সামর্থ্য নাই রাজকর দিতে।' সোমঘোষের

দুরবস্থায় ধর্মপাল আশ্রিত হিসেবে অন্য এক শক্তিমান সামন্তরাজার কাছে পাঠালেন—কিন্তু সোমঘোষের শক্তিমান পুত্র ইছাই ঘোষ পিতৃ অপমানের প্রতিশোধ নিলেন আশ্রয়দাতা সামন্তরাজা কর্ণসেনকেই বিতাড়িত করে। সপ্তদশ শতাব্দীর ঘটনাবর্তের স্পষ্ট ছায়াপাত এখানে, আশ্রিত রাজাই শক্তিসামর্থ্যের অধিকারী হয়ে বিনাকারণে আশ্রয়দাতাকে বিতাড়িত করছে। কিন্তু সোমঘোষতনয় ইছাই ঘোষের বলিষ্ঠ যুক্তি ছিল—

অবিচারে অনাহারে,
গৌড়ে বন্দী কারাগারে—
দুঃখ ভাবে ছিল মোর বাপ।

একি শুধুই প্রতিশোধ মাত্র? পিতৃ অপমান ও লাঞ্ছনার প্রতিবাদে ইছাই ঘোষ দুর্বার হয়ে উঠেছে। শক্তিমান কখনও সুযোগের অপব্যবহার করে না, তাই প্রয়োজনে আশ্রয়দাতাকেই উৎখাত করেছেন তিনি। ইছাই ঘোষের আচরণের প্রথমাংশকে আমরা সম্পূর্ণ ভাবেই সমর্থন করি; পিতৃ অপমানের প্রতিশোধ যোগ্যপুত্রই নিতে পারে কিন্তু এর পরের ঘটনাকে সমর্থন করি না। আমাদের স্বাভাবিক ধর্মবোধ আশ্রয়দাতার অপমানের সমর্থন করে না, লেখকও করেননি। এখানেই ইছাই ঘোষ সম্পূর্ণরূপেই একটি অপরিচিত চরিত্র। আমাদের পরিচিত পৌরাণিক সংস্কারের সমর্থনবিহীন এক অমিত শক্তিধর বিশ্বাসঘাতক পুরুষ। বীরত্ব, শৌর্যবীর্য, স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রসঙ্গ ঘনরামেয় উপলব্ধ সত্য, সপ্তদশ শতাব্দীর সমাজজীবন থেকেই তা আহৃত। ইছাই ঘোষ পৌরুষের প্রতীক। একটু আবরণ-বিহীন করে দেখলে আমরা ইছাই ঘোষের মধ্যে যবন অত্যাচারীদের আত্মাকে অনুসন্ধান করে দেখতে পারি। ইছাই ঘোষ কি ভুঁইফোড় শক্তি নয়? সে শুধু সুযোগ ও সন্ধানের সুব্যবহার করেছে মাত্র। রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ইছাই ঘোষকে চিনে নিতে পারি একমুহূর্তেই। মোঘল শক্তির সঙ্গে এদেশীয় শক্তির দ্বন্দ্বে এমন অনেক অজ্ঞাত শক্তির আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল সে যুগেই। এদের অনেকেই নিম্নশ্রেণীর সমাজ উদ্ভূত।

ইছাই ঘোষ সম্পর্কে ঘনরামের পরবর্তী উল্লেখটিও লক্ষ্যণীয়—

"দৈববলে গড়ে গোপ রাজা হইল পাটে।"
দেবতা দানব ডরে নাহি চলে বাটে॥
সেইরূপে গোয়ালা বাড়িল দৈববলে।
সেনের সম্পত্তি লুটে নিল বলেছলে॥

ইছাই ঘোষ প্রসঙ্গে রচনাকারেরও সহানুভূতি ছিল না—এই অংশটি তার প্রমাণ।

অবশ্য ধর্মমঙ্গলের মূল উদ্দেশ্যটি লেখক সুকৌশলে ব্যক্ত করেছেন। রাজনৈতিক ঘটনার ফাঁকে লেখক ধর্মপ্রচার করেছেন বারংবার। আর ইছাই ঘোষ-এর মত একটি চরিত্রের মধ্যেও তিনি ধর্মের অবতারণা করেছেন। ইছাই ঘোষ পার্বতীর সেবক—আর দৈববলের মাধ্যমেই সে জয়ী।

ধর্মমঙ্গলের ইছাই ঘোষ অধ্যায়টিকে সে যুগের রাজনৈতিক ঘটনার রূপক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়;—আর সচেতনভাবে রাজনীতিকে প্রেক্ষাপটরূপে ব্যবহার না করে ঘনরাম চক্রবর্তীও একটা চিরাচরিত পথেরই অনুসরণ করেছিলেন মাত্র।

সে যুগের রাষ্ট্রচেতনার যে প্রত্যক্ষ পরিচয় ধর্মমঙ্গলে পেয়েছি—অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে তা নেই। তবে মনসামঙ্গলের চাঁদসওদাগর চরিত্রে পৌরুষ ও ব্যক্তিত্বের যে সমাবেশ দেখি—দুর্বল বাঙ্গালীচরিত্রের মাঝখানে সেও একটা ব্যতিক্রম। মনসা-মঙ্গলের এই চরিত্রটিকে আমরা দৈবের সঙ্গে লড়াই করতে দেখি—কিন্তু সে যুগের সমাজে এমন কোন চরিত্র কি সত্যিই ছিল না—ভাগ্যের ও পরিপার্শ্বের বিরুদ্ধে যে অনমনীয় দৃঢ়তা প্রদর্শনে সক্ষম? হয়ত ছিল বা হয়ত ছিল না কিন্তু তা সত্ত্বেও অমিত শক্তিমান চন্দ্রধর আমাদের দুর্বল চিত্তে একটা বিশেষ আবেদন জাগায়। ধর্মীয় সাহিত্য হলেও মঙ্গলকাব্যে সে যুগের হৃৎস্পন্দন ধরা পড়েছিল,—বিপর্যস্ত জনজীবনের কথা নানা রূপকে ও অলংকারেও ঢাকা পড়েনি। মুকুন্দরামের ভালুকের উক্তি আমরা স্মরণ করতে পারি এখানে। নিয়োগী চৌধুরী না হয়ে সে শুধু সাধারণ মানুষের মত শান্তিতে বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু তা থেকেও বঞ্চিত হয়েছিল সে। মুকুন্দরামই একমাত্র আত্মস্থ কবি—কাব্যের ছকবাঁধা কাহিনীর ফাঁকে নিতান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা যিনি বলেছিলেন। ডিহিদারতাড়িত বাস্তত্যাগী কবি সে যুগের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কথাটুকু না বলে পারেননি—কারণ তাকেও সময়ের শিকার হতে হয়েছিল। সমগ্র মঙ্গলসাহিত্যে মুকুন্দরামই রাজনীতি সচেতন কবি। মনসামঙ্গলের কবি চন্দ্রধরকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন—দুর্বল ও মেরুদণ্ডবিহীন বাঙ্গালী এ চরিত্র থেকে অনেক প্রেরণা পেতে পারে। ধর্মের কাছে নির্বিচারে আত্ম-সমর্পণ করতেই অভ্যস্ত আমরা, সেদিক থেকে চন্দ্রধরই প্রথম বিদ্রোহী পুরুষ; —গতানুগতিক বিশ্বাসের বিরুদ্ধে যে একদিন প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করেছে। চাঁদসওদাগরের সঙ্গে দেবী মনসার বিবাদের কাহিনীটি একটু হেরফের করে নিলেই সে যুগের বিপর্যস্ত মানুষের নীরব প্রতিবাদের গুঞ্জন যেন শোনা যায়। চাঁদসওদাগর বণিক না হয়ে যদি কোনো শক্তিশালী রাজদ্রোহী হতেন,—দেবী মনসার বদলে বিদেশী অত্যাচারীকে যদি কল্পনা করে নিই, তবে চন্দ্রধর ও মনসার আজীবনব্যাপী সংগ্রামের মধ্যে যেন সে যুগের অত্যাচার ও লাঞ্ছনার ছবিটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

কিন্তু মনসামঙ্গল রূপক কাব্য নয়,—চন্দ্রধরও রাজদ্রোহী নন এরা গতানুগতিক ধারণা থেকেই জন্ম নিয়েছিল। তবু বলব, চাঁদসওদাগর সেযুগে মঙ্গলকাব্যের সর্বাপেক্ষা সজীব পুরুষচরিত্র—লোক সহানুভূতিতে যে ধন্য হয়েছে। জনপ্রিয়তায় এ কাব্য যে অন্যান্য মঙ্গলকাব্যকে ছাপিয়ে গেছে অনবদ্য নায়ক চরিত্রটি তার অন্যতম আকর্ষণ। আরও আশ্চর্য এই যে, দেবতা বিরোধী হলেও চাঁদসওদাগর মানব দরদ থেকে বঞ্চিত হয়নি,—মনসার যুক্তিহীন পীড়নে আমরা দেবতার ওপরই শ্রদ্ধা হারিয়েছি। সমস্ত মঙ্গলকাব্যেই দেবতা উৎপীড়ক - মানুষ পীড়িত। এও যেন সে যুগের বিপর্যস্ত মানুষের নিখুঁত চিত্র। রাজশক্তি যাদের সুখ-শান্তিতে ব্যাঘাত ঘটিয়েছে—সেই দুঃখ ভারাক্রান্ত কবি যখন কাব্যরচনায় মনোনিবেশ করেন আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে সর্বস্বান্ত—বিপর্যস্ত মানুষের কথাই বারবার বলেন। কিন্তু মঙ্গলকাব্যের প্রচলিত রীতিনির্ভর এই রচনাকে অন্য কোনো দৃষ্টি-ভঙ্গি থেকে বিচার করাও যায় না। কিন্তু কবি যে সমসাময়িক যুগ পরিবেশ থেকেই কাব্যোপাদান সংগ্রহ করেন—সে কথা মনে করলে অনেক তথ্যই স্পষ্টতর হতে পারে।

বাংলাদেশে মোঘল. শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেই বাংলাদেশের শক্তিমান ভূস্বামীদের যে চমকপ্রদ ইতিহাস পাই—বাঙ্গালীর রাজনীতিচর্চার ইতিহাসে সে ঘটনাই সর্বাপেক্ষা মূল্যবান। বাংলাদেশে বিদেশী অত্যাচারীরা অবাধে প্রবেশ করেছে, সেদিন কোন শক্তিই তাদের গতিরোধে সক্ষম ছিল না। কিন্তু শক্তি-সামর্থ্য অর্জন করার পরও নির্বিচারে পরের অধীনতা মেনে নেবার মত কাপুরুষ ছিল না বাঙ্গালী। সেই সময়েই বারো ভুইঞার আবির্ভাব ঘটেছে বাংলা দেশে। তবে এঁদের বিবরণ ইতিহাসে লেখা নেই, যেটুকু পেয়েছি তাও সর্বদা সমর্থন-যোগ্য নয়। শক্তিমান শাসকগোষ্ঠীর হাত থেকে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষার তাগিদে যাঁরা একদিন আত্মপ্রকাশ করেছিলেন তাঁদের বিবরণ আমাদের অজানা বলে আজ আক্ষেপ করতে পারি মাত্র। তবে আধুনিক ঐতিহাসিক কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন। বারো ভুইঞাদের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে যে তথ্য পাই তা এই—

"The rise of the Bara-Bhuiyans of Bengal is to be dated from 1576 A.D., the year of the fall of Daud the last Karrani King of Bengal. In Assam history, we find that when the over land disappeared or became weak, a number of petty chiefs arose and became independent. Their common appellation was Bara-Bhuiyas.

When in 1576, with the fall of Daud, conditions became similar in Bengal,···and thus the independent chiefs that arose in Bengal promptly received the name of Bara-Bhuiyas."[৬]···

এ প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখতে হবে—বারো ভুইঞাদের মধ্যে প্রত্যেকেই বাঙ্গালী জমিদার বা খেতাবধারী রাজা নন,—এঁদের সঠিক সংখ্যাও পাওয়া যায়নি। বারো ভুইঞাদের মধ্যে যাঁদের নাম দ্বিধাহীনভাবে গৃহীত হয়েছে তাঁরা হলেন—ওসমান, মাসুম কাবুলি, ইসাখান, মসনদ-ই-আলি, কেদার রায়। আশ্চর্য এই যে, বারো ভুইঞা হিসেবে যে নামটি আমাদের মধ্যে প্রচলিত—যশোহরের প্রতাপাদিত্যের নামই সেই তালিকায় মেলেনি। এ প্রসঙ্গে এই উক্তিটি উদ্ধৃতিযোগ্য—As far as I have been able to understand and sift historical evidence, I have obtained no proofs to show that Pratapaditya ever fought with the forces of Akbar. Pratapaditya of Jessore and Anantamanikya of Bhulua appear to me to have fought the Mughals for the first and the last time in 1612 and 1613 in the reign of Jahangir when they had no other recourse but to fight, and they went down in the contest.[৭]

অথচ প্রতাপাদিত্য সম্পর্কেই বহু জনপ্রবাদ আমরা পেয়েছি; তার ওপর ভিত্তি করে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালী গৌরববোধ করেছে,—বহু মতামতের বাধা অতিক্রম করেও প্রতাপাদিত্য সার্থক শক্তিমান বাঙ্গালীরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। প্রতাপাদিত্যই মঙ্গলকাব্যে বন্দিত হয়েছেন, তার অজস্র প্রশংসায় মুখরিত হয়েছে বাঙ্গালী। ইতিহাসে যিনি অনাদৃত—বাঙ্গালীর কল্পনায় তিনি আদর্শ নায়ক—এর হেতুটিই জটিল। কেদাররায় ও প্রতাপাদিত্যের শৌর্যবীর্য ও স্বদেশচেতনার কাহিনী নিয়ে পরবর্তীকালে বহু উপন্যাস-নাটক রচিত হয়েছে,—বাঙ্গালীর জীবনে অতীতচর্চা যেদিন অত্যাবশ্যকীয় হয়ে উঠেছিল।

যে যুগে এই সব শক্তিমান বাঙ্গালীর আবির্ভাব ঘটেছিল—তখনও বাংলা দেশে পরাধীন বাঙ্গালী অনাদৃত—আত্মদৈন্যে ও অনৈক্যে দ্বিধা ভক্ত। তবু মাঝে মাঝে এই জাতীয় কিছু কিছু প্রচেষ্টার সংবাদ যখন কানে আসে—তার মধ্যেই গুরুত্ব আবিষ্কারের চেষ্টা করি আমরা। নিছক নিন্দার পটভূমিকায় এ যেন খানিকটা আত্মপ্রতিষ্ঠার

৬. Nalini Kanta Bhattasali, "Bengal Chief's Struggle", Bengal Past and Present 1928 (Jan.—March).

৭. Ibid.

চেষ্টা। এই জাতীয় ঘটনার মূলে রাষ্ট্রবিপ্লবের প্রসঙ্গ ছিল না—জাতীয় চেতনাও অনুপস্থিত। কিন্তু তবু দেখছি ইতিহাসের সমর্থনের অপেক্ষা না করেই প্রতাপাদিত্যের মত বীরবাঙ্গালীকে অবলম্বন করে আত্মগৌরবে স্ফীত হয়েছি আমরা। কোন কোন উত্তেজনার মুহূর্তে সামান্যও কিভাবে অসীম হয়ে ওঠে—এ তারই নিদর্শন। মোঘল শক্তির সঙ্গে একজন বাঙ্গালীর বিরোধের পটভূমিকায় অনেক কিছু কল্পনা করে নেওয়াটা খুব শক্ত কিছু নয়। এই অবান্তর আত্মপ্রশংসার সমালোচনা করে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন—A false provincial patriotism has led modern Bengali writers to glorify the Bara Bhuiyas of Bengal as the champions of national independence against foreign invaders.[৮]

বারোভুইঞা হিসেবে যাঁদের আমরা গৌরবে ভূষিত করেছি—সত্য ইতিহাসের সাহায্য নিলে দেখা যাবে এ সংগ্রামপ্রচেষ্টার মধ্যে কোন বীরত্ব ছিল না। অনেক সময়-ই তা নিছক অপারগ সংগ্রাম, বিজেতা রাজশক্তির বিরাগভাজন বলেই কিংবা সন্ধির কোন স্বাভাবিক উপায় ছিল না বলেই সংগ্রাম অপরিহার্য হয়েছে—যার একমাত্র ফলাফল নিশ্চিত পরাজয়। বিশেষ করে প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধেই আমাদের উচ্ছ্বাস একটা চূড়ান্ত আকৃতি লাভ করেছে। এর একটি কারণ আবিষ্কার করেছেন ঐতিহাসিকরা। বাংলার নবজাগরণ লগ্নে মেবারের স্বাধীনচেতা রাণা প্রতাপসিংহের আদর্শে মুগ্ধ বাঙ্গালী বাঙ্গালার ইতিহাস থেকে অনুরূপ একটি চরিত্র সন্ধান করতে চেয়েছিল, প্রতাপাদিত্য এই সুযোগেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন বলে ঐতিহাসিকদের ধারণা। The height of absurdity is reached when our dramatists call Pratapaditya of Jessore as the counterpart of Maharana Pratap Singh of Mewar. It is, therefore, necessary to debunk the Bengali 'Hero' by turning the dry light of history on him.[৯]

যাই হোক, মধ্যযুগের বাঙ্গলা দেশে কিছু শক্তিমান ভূম্যধিকারীর আবির্ভাবের ঘটনাটি একেবারে উপেক্ষণীয় নয়,—অতিরঞ্জন কিছু হয়েছে কিন্তু আসল ঘটনা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। এঁরা রাজনৈতিক দাবী নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাও সত্য। প্রতাপাদিত্য তাঁদেরই একজন। দ্যু' জারিকের ইতিহাসে আমরা যে তিনজন হিন্দুরাজার বারোভুইঞা হিসেবে নাম পাই—প্রতাপাদিত্য তাদের একজন।

৮. Jadunath Sarkar, History of Bengal (Vol. II), Dacca, 1948, P—225.

৯. Ibid.

শ্রীপুর, বাকলা ও চাঁদেকানের রাজাকে তিনি বারোভুইঞা বলে উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে শ্রীপুরের রাজা কেদাররায় ও বাকলার রাজা রামচন্দ্রের নাম স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা থাকলেও চাঁদেকানের রাজার কোন সঠিক উল্লেখ নেই। অথচ বাকলার রাজার সঙ্গে চাঁদেকানের রাজার আত্মীয়তার উল্লেখ আছে। বাকলার রাজা প্রতাপাদিত্যের নিকট আত্মীয়। সুতরাং উল্লিখিত চাঁদেকানের রাজা প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বিশদ বর্ণনায় অন্যান্য তথ্য সন্নিবেশ করেছেন। অথচ চাঁদেকানের রাজার সঠিক উল্লেখটিই করেননি।

মাত্র ৩ জন হিন্দুরাজার উল্লেখই প্রমাণ করে অতীতের স্তিমিত শৌর্যের সম্পূর্ণ সমাধি হয়েছে মনে হলেও হিন্দুরাজাদের অতীত শৌর্যের শেষ বৈভব এঁদের মধ্যে মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। পরাধীনতার গ্লানিতে জর্জরিত জাতির অন্তরের বিক্ষুব্ধ ভাবটিরই সময়োচিত বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বলা যায়। শক্তির দীনতায় কোন জাতি আন্তরিক নিশ্চিন্ততা লাভ করতে পারে না—তাই মোঘল-পাঠান-তুর্কী আমলের অত্যাচারে ছিন্নমূল বাঙ্গালীর মনে শান্তি ছিল না—নিশ্চিন্ততা ছিল না। অথচ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কোন পথ খোলা নেই। সংঘশক্তির অভাব, ঐক্যবোধ দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় বাঙ্গালী সেদিনকার সমস্ত অন্যায় নীরবে সহ্য না করে কি-ই-বা করতে পারত? হয়ত গোপনে একটা তীব্র জ্বালা তাকে অস্থির করত। কিন্তু নিরুপায়ের মত সেদিন সবকিছু সহ্য করে যেতে হয়েছে তাদের।

চৈতন্যের তিরোভাবের পরই বাংলার রাজনৈতিক জীবনের পট পরিবর্তিত হলো, ছোটখাট সামন্তশক্তিও আত্মরক্ষার জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হলেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্বের প্রারম্ভে এই গোলযোগের শুরু। আকবরের আমলেও এত বিদ্রোহ বা সংগ্রাম বাংলা দেশে হয়নি। আকবর সুশাসক ছিলেন, তাঁর রাজত্ব সময়ে সমস্ত ভারতবর্ষ শান্ত, একমাত্র চিতোর ছাড়া। প্রতাপসিংহের আমরণ সংগ্রাম এ যুগের এক বিস্ময়কর ইতিহাস। দিল্লীশ্বরের অতুলবৈভবের সামনে দাঁড়াবার কোন ক্ষমতা ছিল না প্রতাপসিংহের—কিন্তু তাঁর অন্তরের জ্বলন্ত স্বাধীনতা স্পৃহার উল্লাসে তিনি যুদ্ধ করলেন—এর নামই স্বাধীনতা সংগ্রাম। প্রতাপসিংহের কাছেই মুমূর্ষু ও পরাজিত ভারত স্বাধীনতার নতুন অর্থ শিখেছিলো। তাঁর পরই জাহাঙ্গীরের রাজত্ব সময়। এঁর সময়েই বাংলার ভূম্যধিকারীরাও স্বাধীন হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। সমস্ত বাংলাদেশ জুড়ে অঞ্চল ভেদে অনেক শক্তিমান জমিদারদের আবির্ভাব প্রায় একই সময়ে ঘটেছিল। এঁদের মধ্যে হিন্দু যেমন ছিলেন—তেমনি তুর্কী-পাঠানদের বংশধরও অনেকে ছিলেন। বঙ্গদেশে এদের বসবাস অনেক দিনের—বাংলাতেই এঁদের পৈত্রিক নিবাস সুতরাং বাংলার মাটিতে এরাও স্বাধীন অস্তিত্ব বজায় রাখার

সংগ্রাম চালালেন। বারোভুইঞা হিসেবে যাঁদের নাম বিশেষভাবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে তাঁরা সকলেই তুর্কী ও পাঠানের সঙ্গে সম্পর্কান্বিত রাজশক্তি। হিন্দু শাসকদের সঙ্গে এদের অসদ্ভাব ছিল না, কিছু ঐতিহাসিক গুরুত্ব আছে এই সমন্বয়ের পেছনে। ত্রয়োদশ থেকে সপ্তদশ—এই চারশো বছরের অধিবাসী এরা, এই সমস্ত রাজপুরুষের মধ্যে বাংলা প্রীতি ও বাঙ্গালী প্রীতি থাকা অসম্ভব ছিলো না।

সেযুগের বাংলাদেশের হিন্দু বা মুসলমান সকলেরই লক্ষ্য এক ; নতুনাগত শক্তির কাছে কি ভাবে নিজের বহু কষ্টার্জিত এই অস্তিত্ব বজায় রাখবেন। কিন্তু ভারত বিজয়ী মোঘলশক্তির সামনে দাঁড়ানোর মত ক্ষমতা এঁদের মধ্যে কারোরই ছিল না।

তবু বাঙ্গলার ইতিহাসে দেখি, সেদিন সমগ্র বাঙ্গালীই (হিন্দু ও মুসলমান) যুদ্ধোন্মুখ। বীরভূম ও বাঁকুড়ায় বীর হামীর, মেদিনীপুরে বীরভান বা চন্দ্রভান, যশোরে প্রতাপাদিত্য, বাকলায় রামচন্দ্র, ভুলুয়ায় অনন্তমাণিক্য, ঢাকার খলসিতে মধুরায়, চাঁদপ্রতাপ পরগণাতে বিনোদ রায়, পাবনার রাজা রায়, ভূষণায় রাজা সত্রাজিৎ, সুসঙ্গ-এর রাজা রঘুনাথ, এঁদের নাম এ সময়ে প্রবলপ্রতাপান্বিত মোঘল সেনাপতিদের কাছে ভীতিস্বরূপ হয়েছিলো। সারা বাংলায় এঁরা ছড়িয়ে ছিলেন—সম্ভবতঃ একের সঙ্গে অন্যের কোন প্রকার যোগাযোগ ছিল না, প্রত্যেকেই নিজের রাজ্যের গণ্ডীটুকু রক্ষায় তৎপর ছিলেন মাত্র। তাছাড়া একে অন্যের সঙ্গে কোন প্রকার একতাসূত্রেও বদ্ধ ছিলেন না। এঁদের একক পরাক্রম মোঘলশক্তিকে প্রতিহত করার পক্ষে মোটেই যথার্থ ছিল না—সেকথা সহজেই অনুমেয়। তাই পার্শ্ববর্তী যে কোন শক্তির সাহায্য এঁদের সর্বদাই প্রয়োজন হত। হিন্দুরাজাদের পাশাপাশি বহু অহিন্দু শাসক ছিলেন এবং এঁদের পরাক্রম এইসব বিচ্ছিন্ন হিন্দু-রাজাদের চেয়ে অনেক বেশীই ছিল। শক্তিমান বারোভুইঞা হিসেবে যাঁদের প্রসিদ্ধি তাঁরা হচ্ছেন—মুসাখান, খোজা ওসমান, মাসুমকাবুলি, ইসাখান। এঁদের মধ্যে মুসাখান ছিলেন সর্বাপেক্ষা শক্তিমান। মোঘলের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইনি যে পরাক্রম দেখিয়েছিলেন তাকেই যথার্থ বীরত্ব বলে আখ্যা দেওয়া যায়। মোঘলশক্তির কাছে নিজের স্বাধীনতা বিসর্জন দেবার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত ইনি বীরের মত যুদ্ধ করেছেন। ঠিক এ-ধরণের যুদ্ধ আর কারোর সঙ্গেই হয়নি। এর কারণ অতি সহজেই তারা মোঘলের আয়ত্তে এসে গেছেন। এর পরই ওসমানের নাম করা চলে। একক শৌর্যের চূড়ান্ত শক্তি ইনিও দেখিয়েছিলেন। বাংলাদেশের এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটি আলোচনা করলে দেখা যাবে যে স্বদেশচেতনাই দেশরক্ষার মহান ব্রত সম্বন্ধে সে যুগের কিছু শক্তিমান রাজাকে সচেতন ও সক্রিয় করেছিল,—পরবর্তী যুগের কাছে এসব দৃষ্টান্তের সামাজিক ও রাজনৈতিক মূল্য অপরিসীম। প্রতাপাদিত্য ও চাঁদরায়ের

মধ্যে তুলনায় চাঁদরায়ই যথার্থ অর্থে বারোভুইঞা বলে গণ্য হয়েছেন—একথা বলেছি পূর্বে। প্রতাপাদিত্যকে কেন এখানে ধরা হয়নি—তারও কারণ রয়েছে। প্রতাপাদিত্য ও চাঁদরায় এঁরা উভয়েই কর বিনিময়ে রাজ্য রক্ষা করতেন। উভয়েই সমৃদ্ধ ভূম্যধিকারী, প্রজা, সৈন্য ও যুদ্ধোপকরণ নিয়ে এঁরা সুসজ্জিত; আত্মশক্তিতেও আস্থাশীল ছিলেন। মোঘলশক্তির কাছে সহজে আত্মসমর্পণ করা এঁদের পক্ষে অসম্ভব বলেও মনে করা যেতে পারে,—কারণ এঁদের মধ্যে অনেকেই আপন অঞ্চলের সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা রক্ষায় সর্বদাই তৎপর ছিলেন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল স্বাধীনতার চেতনাকে লাঞ্ছিত করে প্রতাপাদিত্যই সর্বাগ্রে উপঢৌকন পাঠিয়ে বাংলার সদ্য আগত সুবাদার ইসলামখানের কাছে আপন মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এই আচরণ থেকেই প্রতাপাদিত্যকে ঐতিহাসিকগণ বিচার করেছেন। সেখানে তিনি বারোভুইঞাদের একজন নন,—মোঘলশক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়াবার কোন ইচ্ছা তাঁর মধ্যে দেখা যায়নি। অথচ এই প্রতাপাদিত্যের মধ্যেই আমরা অনমনীয় স্বাধীন চেতনা আবিষ্কার করেছি। ইতিহাসের প্রতাপাদিত্য অন্যবর্ণে চিত্রিত। স্বাধীন-চেতনা বলতে আমরা যে মনোভাব বুঝি প্রতাপাদিত্যের মধ্যে তা মোটেও ছিল না। কিন্তু এটাই একমাত্র সত্য ঘটনা যে, তাঁকেও মোঘলের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। ইসলামখানের সঙ্গে সন্ধিসর্তের বিশ্বাসভঙ্গের অপরাধে প্রতাপাদিত্য অভিযুক্ত হয়েছিলেন। দূরদর্শিতার অভাব না থাকলে তিনি হয়ত মোঘলশক্তির সন্ধিসর্ত রক্ষায় সচেষ্ট হতেন। কিন্তু একাধারে দোলাচল মনোবৃত্তি, অদূরদর্শিতা, নির্বুদ্ধিতা তাঁর চরিত্রে বর্তমান; এ গুণগুলিই স্বার্থান্বেষী প্রতাপাদিত্যকে কলঙ্কিত করেছে,—তাই তাঁকে ঐতিহাসিকগণ বারোভুইঞার সম্মান দিতে কুণ্ঠিত হয়েছেন। বারোভুইঞারা অন্ততঃ মোঘলশক্তির বিরুদ্ধে আপন শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা করেছেন; রাজ্যরক্ষার অনমনীয় চেতনা তাঁদের দুঃসাহসী করেছিলো,—মোঘলের হাতে নিশ্চেষ্টভাবে আত্মসমর্পণ না করে তাঁরা মোঘল ঐতিহাসিকের প্রশংসা অর্জন করেছেন—বীরত্ব ও স্বাধীনচেতনার প্রশংসা তাঁদের ধন্য করেছে। বারোভুইঞাদের পরস্পরের মধ্যে কোন সম্মিলিত ঐক্য প্রচেষ্টা ছিলো না, এককথায় জাতীয়তাবোধের কোন উপলব্ধি ছিলো না বলেই বিচ্ছিন্ন সংগ্রামে এঁরা প্রত্যেকেই বিনষ্ট হলেন। শুধু নিস্তরঙ্গ জলে লোষ্ট্রনিক্ষেপের মত মুহূর্তের জন্য একটা অস্পষ্ট শক্তিচেতনা এঁদের বিমূঢ় করেছিলো মাত্র, পরাজয় ছিলো যার অবশ্যম্ভাবী ফল; তবু এই চেতনাটুকুর জন্য তাঁরা ইতিহাসের শ্রদ্ধা পেয়েছেন। ঐতিহাসিকের ভাষায় The absence of the spirit of nationality, the bitter feeling of rivalry, jealousy and hostility amongst the Zamindars on the one side, and

the skilful separatist or 'divide and rule' policy initiated by the Mughal viceroys on the other side, account for this political tragedy.[১০]

পরবর্তী যুগের সামনে এ যুগের অবদান আলোচনা করলে দেখা যাবে এ যুগ প্রায়-সুপ্ত বিগত শতাব্দীগুলির চেয়ে পৃথক, আগামী শতাব্দীর কাছে একটা নতুন কিছু। বৈদেশিক আক্রমণ বাংলাদেশে প্রথম ও অভিনব নয়, তবু সপ্তদশ শতাব্দীতে কিছু শক্তি যাঁদের ছিলো তাঁরা সাধ্যমত তা প্রয়োগ করার ত্রুটি করেননি। তুর্কী আক্রমণের প্রথম জয়োল্লাসের মধ্যে যে জাতি সম্পূর্ণভাবে স্তব্ধ হয়েছিলো—সপ্তদশ শতাব্দীর রণভেরীতে তার প্রথম সশব্দ আত্মঘোষণা।

চাঁদরায়, কেদার রায় ছাড়াও এমন বহু শক্তিমান রাজপুরুষ এ যুগে ছিলেন যাঁরা রাজ্যরক্ষার ত্রুটি রাখেননি। প্রতাপাদিত্যের বৈভব ঘোষণায় যথেষ্ট মুখর এ যুগের ঐতিহাসিকগণ। আবুলহুসনের অনুচর হিসেবে বঙ্গদেশ ভ্রমণের সময়ে লতীফ্ প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে বলছেন—'এই প্রতাপাদিত্যের মত সৈন্য ও অর্থবলে বলী রাজা আর বঙ্গদেশে নাই। তাঁহার যুদ্ধসামগ্রীতে পূর্ণ প্রায় সাতশত নৌকা, বিশহাজার পাইক [পদাতিক সৈন্য] এবং ১৫ লক্ষ টাকা আয়ের রাজ্য আছে।'[১১]

প্রতাপাদিত্যের সংগ্রাম সামর্থ্য ছিলো—জল ও স্থলপথে সুরক্ষিত রাজ্য তিনি রক্ষা করেছেন। পার্শ্ববর্তী অন্য যেকোন শক্তির কাছে তিনি প্রায় অজেয় বলা যায়। দীর্ঘদিন বাদে বাংলাদেশের এককোণে এই সংগ্রামী জমিদার আপন বৈভবে স্বনামখ্যাত হয়েছিলেন। তদানীন্তন সম্রাটের কানে পৌঁছেছিল তাঁর বৈভব ও সমৃদ্ধির বার্তা। শংকার হেতু হয়েছিলেন তিনি। দিল্লী থেকে বাংলার দূরত্ব কম নয়—এই ছিল শংকার প্রথম কারণ। দিল্লীশ্বরের ক্ষমতার পূর্ণপ্রভাব বাংলায় ছিল না এবং বারোভুইঞাদের একক শক্তির জাগরণের পক্ষে সেটাই অনুকূল হয়েছিলো। ইসলাম খানের বাংলায় আগমন শুধু তৎকালীন বাংলার কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় সংগ্রহ করা,—সুসজ্জিতসৈন্য ও প্রস্তুতমন নিয়ে তাঁর বাংলায় আগমন। তৎকালীন বাংলাদেশে যে শক্তি জেগে উঠেছিলো প্রাণস্পন্দনের তীব্রতায়, শাসকের কাছে তা ভীতিজনক।

প্রতাপাদিত্যের সমৃদ্ধির বর্ণনা ইতিহাসে উজ্জ্বল। সাহিত্যের পৃষ্ঠায়ও তার মর্যাদা কমেনি যদিও ঐতিহাসিক বিবরণের সঙ্গে কোন মিল সেখানে নেই।

১০. Ibid, P—246.

১১. যদুনাথ সরকার—'প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ'—প্রবাসী আশ্বিন। (১৩২৬)

সাহিত্য প্রচলিত কাহিনী নির্ভর—ভারতচন্দ্রের "অন্নদামঙ্গলে" প্রতাপাদিত্যের বৈভব বর্ণনা—

যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজা বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহিমানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত ভূপতি দ্বারস্থ ॥

প্রতাপাদিত্যের বৈভবপ্রকাশে ভারতচন্দ্রের বর্ণনায় বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি নেই। প্রতাপাদিত্যই দক্ষিণ বাংলার অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। "নাহি মানে পাতসায়"—অংশটিতে প্রতাপাদিত্য চরিত্রের যে গুণটির প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে—তা লক্ষ্যণীয়। স্বাধীনচেতা প্রতাপাদিত্য দিল্লীর বাদশাহকে অমান্য করেছিলেন—ভারতচন্দ্রের কণ্ঠে এখানে প্রশংসার সুঁর।

কিন্তু সেযুগের ঐতিহাসিক জাগরণের মূলসূত্র ভারতচন্দ্র দেখতে পাননি। বাংলার অসীম শক্তিমান প্রতাপাদিত্যের প্রসঙ্গে পরের অংশেই তিনি বলছেন—

বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালী।
ষোড়শ হলকাহাতী অযুত তুরঙ্গ সাথী
যুদ্ধকালে সেনাপতি কালী ॥

"বরপুত্র ভবানীর" তাই প্রতাপাদিত্যের উত্থান,—মঙ্গলকাব্যানুসারী এই ধারণা যেমন অনৈতিহাসিক—তেমনি অযৌক্তিক তাঁর পরাজয়ের বর্ণনা—

বিমুখী অভয়া কে করিবে দয়া
প্রতাপ আদিত্য হারে।

সুতরাং কাব্যের প্রতাপাদিত্য আর বাস্তবের প্রতাপাদিত্য যেন দুটি পৃথক চরিত্র।

কাব্যে তাঁকে ভক্তিমান রূপে প্রকাশের চেষ্টা, বাস্তবে তার মধ্যে সেই অচলা ভক্তির সম্পূর্ণ সমাধি রচিত হয়েছে। তবু প্রতাপাদিত্য সে যুগের সর্বাধিক আলোচিত একটি বিচিত্র পুরুষ—শক্তি ও সামর্থ্যে, দূরদর্শিতা ও অদূরদর্শিতায় বুদ্ধিমত্তা ও বুদ্ধিহীনতায় প্রতাপাদিত্যের মধ্যে সে যুগের অস্থির আত্মার অপূর্ব রূপায়ণ ঘটেছে। আরও একটি কারণে প্রতাপাদিত্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। নিস্তব্ধ বাংলাদেশের সজল শ্যামল আবেষ্টনীতে একটি প্রচণ্ড হুঙ্কারধ্বনি শুনলে হঠাৎ চমকে উঠতেই হয়,—অন্ততঃ অভ্যস্ত ক্রিয়াকর্মে স্তব্ধতা নেমে আসে। একটি বীরমানুষের কথা ভেবে মনের কোণে আশার আলো জেগে ওঠে। প্রতাপাদিত্য বাংলাদেশের বাস্তবজীবনের সঙ্গে যতটুকু জড়িত তার পরিচয় দেবার চেষ্টা করেছি—

কিন্তু এখানে তাঁর সর্বাত্মক রূপ প্রকাশ পায়নি। তিনি সুপ্ত বাংলার অবচেতন সত্তায় উদ্ভাসিত এক জ্যোতির্ময় স্বপ্নপুরুষ। বাংলার ঘরে ঘরে ভীতচকিত মানুষের সামনে তিনি ছিলেন একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। রাজনীতির রণদামামা যাদের অন্তরে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা সঞ্চার করেনি—তারাও অতিপরিচিত এই পরমপুরুষকে অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা জানিয়েছে। সুতরাং এক হিসেবে রাজনৈতিক চেতনা বিহীন বাঙ্গালীকে রাষ্ট্রসচেতনতার দীক্ষা দেবার দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেযুগের প্রতাপাদিত্য-চাঁদরায়-কেদার রায়। তাঁদের সংগ্রাম সাফল্যের ইতিহাস হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়েছে কিন্তু জাতির অন্তর্জীবনে যে স্বদেশপ্রেমের চেতনা তাঁরা জাগিয়ে গিয়েছেন—তার দীপ্তি কখনই নিভে যাবে না। সভ্যতার অস্তিত্বের সঙ্গে তারাও বেঁচে রইল। এখানেই তাঁরা যথার্থ সার্থক ও সফল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে যে জাগরণের বন্যা এসেছে—সে কি শুধুই আকস্মিক কোন সদ্যলব্ধ অনুভূতি? জাতির জীবনে এই জাগরণ বন্যার পশ্চাতে ইতিহাস যে একেবারেই স্তব্ধ নয়—অন্ততঃ সপ্তদশ শতাব্দীর মোঘল পাঠান, মোঘল ও সামন্ত হিন্দুজমিদারদের সংঘর্ষ কাহিনীর মধ্যে তার স্পষ্ট ছায়াপাত রয়েছে। বিদেশীরচিত রাষ্ট্রবিবরণের মধ্যে সত্যানুসন্ধান অর্থহীন কিন্তু সত্য আবিষ্কারের জন্য নিরপেক্ষ ইতিহাসের অভাব বড় প্রত্যক্ষ।

বারোভুইঞাদের বিজয় অথবা পরাজয়ের মুহূর্তগুলিই বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের একমাত্র উজ্জ্বল মুহূর্ত, এর পরের ইতিহাসে আবার সেই গতানুগতিক আনুগত্যের বিবরণ। শাহজাহান, আওরঙ্গজীবের আমলে বাংলাদেশ আবার একটি শান্ত স্তিমিত রাজনৈতিক জীবন যাপন করেছে। ছোটখাট যুদ্ধবিগ্রহ যা ঘটেছে তা দমনের জন্য কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াসের প্রয়োজন ঘটেনি। অন্ততঃ দিল্লীর সম্রাটকে সুদূর প্রান্তবর্তী এই দেশটির কথা বিশেষভাবে চিন্তা করতে হয়নি। রাজশক্তিকেও যা ভাবিয়ে তোলে সেই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাই ইতিহাসে স্থান লাভ করে। যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনার মধ্যেই ধরা পড়ে একটা দুরন্ত জীবনাবেগ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে সে ধরনের কোন উল্লেখযোগ্য গোলযোগ ঘটেনি। মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনে ও ব্যবস্থায় বাংলাদেশ আবার আপাতঃ শান্তির সন্ধান করেছে। মুর্শিদকুলী খাঁর রাজত্বকালের ঐতিহাসিক গৌরব আছে।—এদেশীয় ভূস্বামীদের বশীভূত করার একটা চমৎকার পন্থা তিনিই কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন; এদের রাজকীয় মর্যাদার উৎকোচে বশীভূত করে সংঘবদ্ধ জনশক্তির অভ্যুদয়ের সম্ভাবনাকে এদেশ থেকে প্রায় বিনষ্ট করেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে বিভক্ত জমিদার সম্প্রদায় বিগত শতাব্দীর বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু সাবধানতা শিক্ষা করেছিলেন। সহজেই বশ্যতা স্বীকার করে তারা নিশ্চিন্ত

হয়েছিলেন। কিন্তু আত্মদৈন্যের লজ্জাটুকু তারা গোপন করতে পারেননি—এখানেই তাঁরা সম্পূর্ণ পরাজিত। প্রতাপাদিত্য ও কেদাররায়ের স্বপ্ন সফল হয়নি—কিন্তু পরের ইতিহাসে এমন ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ নিয়ে যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের সংখ্যাও খুবই অল্প।

প্রতাপাদিত্যের পরেই আমরা যে ভূস্বামী রাজার সংগ্রামী মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি তিনি সীতারাম রায়। এঁর আবির্ভাব কাহিনী অজ্ঞাত—কিন্তু শক্তি সামর্থ্যেই ইনি আপন শৌর্যের ভিত্তি স্থাপন করেছেন। ইতিহাস এঁর সংগ্রাম সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছে—"In pride of power he humbled and robbed the smaller zamindars of the country round and stopped sending any revenue to the subahdars".[১২]

সীতারাম রায় শক্তিমত্তার পরিচয় দিয়েছেন প্রতিবেশী শক্তিকে দমিত করে। এই হঠকারিতা, অদূরদর্শিতার ব্যাখ্যা করা যায় অনেক ভাবেই। শক্তিমানের স্বভাবই যদি এই—তবে সীতারাম শক্তিমান ছিলেন সন্দেহ নেই। কিন্তু নিশ্চিত পতনের সোপান সৃষ্টি করে যে শক্তি আপন ক্ষমতার সমাধি রচনা করে—তার মধ্যে এক দুঃসাহসী আত্মার অনুসন্ধান না করলে সঠিক বিচার হয় না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারামের' ঐতিহাসিকতা বিচার প্রসঙ্গে শ্রীযদুনাথ সরকার ভূমিকায় মন্তব্য করেছেন—

'বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম নামক রাজার জীবনের ঘটনাগুলির ও সেই যুগের বাংলার অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন, তাহা অধিকাংশ একেবারে সত্য, ইহার কোন স্থানেই ঐতিহাসিক সত্যের প্রচণ্ড অপলাপ করেন নাই।···এর উপর সেই যুগে প্রজা ও শাসকের সম্বন্ধ, দেশের দশা, যুদ্ধবিগ্রহ প্রণালী বঙ্কিম অক্ষরে অক্ষরে সত্য করিয়া আঁকিয়াছেন, অর্থাৎ এই উপন্যাসখানির দৃশ্যপট একেবারে সত্য।'[১৩]—ইতিহাসের সামান্য নজির থেকেই উপন্যাসের অবয়ব সৃষ্টি হয়েছে, শুধু তাই নয় ইতিহাসানুগ পটভূমিকাকে বঙ্কিমচন্দ্র কাজে লাগিয়েছেন। যাই হোক, সীতারামের অস্তিত্ব যেমন ঐতিহাসিক তেমনি তাঁর দুর্দমনীয় আত্মচেতনার কাহিনীটিও কাল্পনিক নয়। সুতরাং ইতিহাসের নজির থেকেই সীতা রামের স্বাধীনচেতনার সাক্ষাৎ মেলে। সীতারাম শক্তি সঞ্চয় করেছিলেন কোন্ উদ্দেশ্যে কে জানে। সুবাদারশাসিত বাংলাদেশের একজন ভূস্বামীর পক্ষে সুবাদারকে অগ্রাহ্য করার দুঃসাহসও অকল্পনীয় মনে হয়; অবশ্য সুবাদার শাসনের

১২. Jadunath Sarkar, History of Bengal (Vol. II), Dacca, 1948, P—416.

১৩. যদুনাথ সরকার—সীতারাম গ্রন্থের ভূমিকা। সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত।

শিথিলতার একটা জোয়ার সে যুগে দেখা দিয়েছিল। ভারতসম্রাট দিল্লীশ্বরের আসনই সেদিন টলোমলো,—নানাস্থানে বিদ্রোহ, বিশেষ ভাবে দক্ষিণ ভারতের মারাঠা বিদ্রোহে সম্রাট ব্যতিব্যস্ত। সেই ক্ষুব্ধ ভারতবর্ষের সর্বত্র বুঝি তাই গোপন বিদ্রোহ—স্বাধিকার স্থাপনের প্রয়াস অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল। বাংলার নিভৃত অঞ্চলের শক্তিমান পুরুষরাও সে স্বপ্ন দেখতেন তার প্রমাণ স্থানে স্থানে বিদ্রোহ। রাঢ়ের অন্যত্র শোভাসিংহ ও রহিমখানের বিদ্রোহ তথ্যও আমরা জানি। —এঁরা প্রত্যেকেই রাজনৈতিক শিথিলতারই সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন।—আর দুঃসাহসী সীতারামও ধীরে ধীরে আপন শক্তি ও শৌর্যের পরিচয় দিলেন। সীতারাম প্রসঙ্গে শ্রীযদুনাথ সরকারের নিম্নোক্ত মন্তব্যটিও লক্ষ্যণীয়—"আমলার পুত্র এইরূপে তালুকদার হইলেন, ক্রমে জমিদার হইবেন, রাজা হইবেন, অবশেষে বিদ্রোহী সামন্ত হইবেন, তাহার আয়োজন আরম্ভ হইল।"[১৪]—সীতারাম সে'হিসাবে সেই যুগেরই একটা সম্ভাবিত চরিত্র—কিন্তু একটা প্রচণ্ড দুঃসাহসিকতাই তার বৈশিষ্ট্য। সীতারামের মধ্যে সেই দুঃসাহসিকতা দেখেছি আমরা—যার অবশ্যম্ভাবী ফলাফল নিশ্চিত অবলুপ্তি। নিশ্চিত ফলাফল জেনেও এই অপরিণামদর্শী শক্তিকে যখন উদ্যত হতে দেখি তখন তাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারা যায় না। শক্তির দীনতা আমাদের ভূষণ, আর সাধারণ মানুষ দুর্নামের চেয়ে শান্তিকেই বেশী লোভনীয় বলে মনে করে। সীতারাম সেই চিরাচরিত শান্তিকেই বিদায় দিয়েছেন সর্বাগ্রে, নিশ্চিত বিপদের ভূমিকা দিয়েই তার জীবনারম্ভ। কিন্তু ইতিহাসের আলোচিত অধ্যায়ে সীতারাম একপ্রকার অনুল্লেখ্য—কারণ সীতারাম দমনের ঘটনাকে প্রাধান্য দেবার কোন প্রশ্নই সুবাদারের মনে জাগেনি। কিন্তু ইতিহাসে প্রাধান্য না পেলেও কিংবদন্তী থেকেই সীতারাম বাংলা উপন্যাসের নায়ক পদে উন্নীত হয়েছেন রাতারাতি। বস্তুতঃ সীতারাম মানুষ হিসেবে, বিদ্রোহী হিসেবে, হয়ত নগণ্য,—হয়ত হঠকারী এই বিদ্রোহী পুরুষ শাসকসম্প্রদায়ের কাছে বিন্দুমাত্র প্রশংসা পাননি, তবু ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষীতে এই বিদ্রোহপ্রচেষ্টার মূল্যায়ন প্রয়োজন হয়েছিল। ক্ষণকালের এই স্ফুলিঙ্গই হয়ত আগামী দিনের পথরেখাকে চিহ্নিত করতে পারে। ইতিহাসের বুকে যা উল্লেখমাত্র—কল্পনা ও আদর্শের ক্ষেত্রে তার সাড়ম্বর আত্মপ্রকাশ সম্পূর্ণভাবেই সম্ভাবিত। সাহিত্যসেবী বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমমন্ত্র অসীম উৎসাহ এনেছে স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রাণে। বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম কাহিনীর মধ্যে ঐতিহাসিক স্বদেশপ্রেমের রূপোদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছিলেন,—স্বাধীনতামন্ত্রস্রষ্টা এই অমর

১৪. যদুনাথ সরকার—সীতারাম গ্রন্থের ভূমিকা। সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত।

ঔপন্যাসিকই সীতারামকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে গেছেন। ইতিহাসে অনাদৃত এই চরিত্রটির সাহিত্যিক ব্যাখ্যা কাল্পনিক হতে পারে কিন্তু স্বাধীন চেতনার যে প্রকাশ সীতারাম চরিত্রে দেখা গেছে—সেটুকু ইতিহাসানুগ। সীতারাম ব্যর্থ হয়েছিলেন—সীতারামের এই ব্যর্থতার চিত্রাঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যিক চিন্তা ও দূরদর্শিতার যোগাযোগ ঘটিয়েছেন—সেটুকু গল্পরচনার খাতিরে। তবে সাফল্য অসাফল্যের মধ্যে ঐতিহাসিক সীতারামকে দায়ী করার কোন যুক্তি নেই।—সীতারামের প্রসঙ্গটি যথাযথ রেখেই তাঁকে কাহিনীর নায়করূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র—এখানেই তাঁর ঐতিহাসিক গুরুত্ব। বঙ্কিমচন্দ্রপ্রসঙ্গের আলোচনাকালে সীতারাম পুনরালোচিত হবে। বস্তুতঃ মুসলমান রাজত্বে বাংলাদেশের রাষ্ট্রচেতনার যে পরিচয় পাওয়া গেছে পরবর্তীকালের জাতীয় চেতনার অনেক উপাদান এ জাতীয় ইতিহাসেও মিলবে।

যুদ্ধ, স্বাধীনতা, আত্মঅধিকার সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ ধারণার জন্য আকস্মিক কোন ঘটনাকে দায়ী করা চলে না। জাতির পূর্ণ জাগরণেরও বহু আগে এই ধারণাগুলির জাগরণ ঘটে, এবং বাংলাদেশেও সেই সূত্রেই যে জাতীয়চেতনা দেখা দিয়েছিল এ কথা বিশ্বাসেরও হেতু আছে। জাতির সুপ্ত স্বপ্নগুলি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে, দানা বাঁধবার মত কোন সুযোগেরই অপেক্ষায়। বিন্দুমাত্র স্ফুলিঙ্গস্পর্শে দারুবন যেমন দাবাগ্নি জেলে দেয় তেমনি স্ফুলিঙ্গস্পর্শের স্বপ্ন দেখেছে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রতীক্ষিত মুহূর্তগুলি। কিন্তু অন্তরের দারুবন বহু পূর্বেই তার আস্বাদ পেয়েছিল, এর নজির আমাদের বিগত দুটি শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় ইতিহাস। অবশ্য একথাও সত্য যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রচেতনা যেমন প্রতিটি মানুষকেই আলোড়িত করেছে এর পূর্বের রাষ্ট্রসংগ্রামগুলি সম্পূর্ণভাবেই তা থেকে পৃথক ছিল। ব্যক্তিগত চেতনাসঞ্জাত বলে জনমনকে তা আলোড়িত করেছিল কি না তার কোন পরিচয় সাহিত্যে ও ইতিহাসে অনুল্লিখিত। সৈন্যরা দেশের কথা সচেতনভাবে যতটুকু ভাবে তার চেয়েও বেশী ভাবে তাদের কর্তব্যের কথা—রাজাদেশের কথা। কিন্তু গণজাগরণের পটভূমিকায় সমগ্র দেশের অস্তিত্বের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের অস্তিত্ব অঙ্গীভূত হয়ে থাকে। একটি মানুষের চিন্তাধারায় একটি দেশের চিন্তাধারার প্রতিফলন পড়ে। দেশ ও মানুষ সেখানে একাঙ্গীভূত। ঊনবিংশ শতাব্দীর গণজাগরণের প্রস্তুতিপর্বেও আমরা এই সত্যটিই প্রত্যক্ষ করেছি। কিন্তু প্রতাপাদিত্য-চাঁদরায়-সীতারাম সেই ঐতিহাসিক চেতনার উৎসস্বরূপ।

মুসলিম শাসনের শেষভাগে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনার সাক্ষাৎ মেলে না—সমগ্রভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের বনিয়াদ কিভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল সে ইতিহাস

সমগ্রভারতে ছড়িয়ে আছে। বণিকরূপে প্রবেশ করে কিভাবে শাসকরূপে আত্ম-ঘোষণা করতে হয় সেই ইতিহাস ছড়িয়ে আছে দক্ষিণ ভারতের উপকূলে উপকূলে—বাংলায়—বোম্বাইতে—মাদ্রাজে। ভারতের সোনার মাটি রাজ্যলোলুপ একটি জাতিকেই প্রলুব্ধ করেনি—একই সঙ্গে এসেছে ওলন্দাজ ফরাসী ইংরেজ। এদের অন্তর্দ্বন্দ্বের সংগ্রামও আমরাই দেখেছি, বহির্দ্বন্দ্বে আমাদের ভূমিকা ছিল নেপথ্যে। কিভাবে শক্তির দ্বন্দ্ব শক্তিমানকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে—শক্তিহীনকে বিলুপ্তি তার প্রতিটি চিত্র ভারতের যেকোন স্থানের ঐতিহাসিক চিত্র। ভারতের যে দিকেই তাকাই শুধু দেখি একই নাট্যের অভিনয়, আর সেই অভিনীত প্রত্যেকটি ঘটনা থেকে একটি মাত্র সত্যই আমরা দেখতে পেয়েছি যে মোঘল পাঠানদের অভিনয় রজনীর শেষ মুহূর্তটুকু চলছে, শুরু হয়েছে এর পরের দৃশ্যপট পরিবর্তনের দ্রুত মহড়া। ভারতের পক্ষে এ অভিজ্ঞতা নতুন নয়, ঠিক একই ভাবে একই নিয়মে শাসকগোষ্ঠীর পরিবর্তন দেখা গেছে বহুবার। একদিন সুনীলজলধি থেকে সদ্যজাগ্রত ভারতের বুকে দ্রাবিড়সভ্যতার পদধ্বনি অনুরণিত হয়েছিল—কিন্তু শক্তিমান আর্যদের কাছে তাদের অবলুপ্তি ঘটেছে সেই একই নিয়মে। আর আজ মোঘল ইংরাজ দ্বন্দ্বের মধ্যেও সেই একই ঘটনার প্রতিচ্ছায়া। শক্তিমানের সঙ্গে দুর্বলের পরিচয় এভাবেই হয়ে থাকে। সমগ্রভারতে চলেছে—মোঘলশক্তির পরাজয় প্রস্তুতি—সভ্যতার ইতিহাসের সেই অনিবার্য সত্য। ইংরাজ-ফরাসী-ওলন্দাজদের মধ্যে ক্ষমতার কাড়াকাড়ি,—দিল্লীশ্বর ভাবছেন কোন্ পথ অবলম্বন করলে শুধুমাত্র প্রাণে বেঁচে থাকা যায়। বাংলায় বসে সিরাজউদ্দৌলা ভাবছেন কোথায় গেলে শুধু নিশ্চিন্ত আর নির্ভয় জীবন পাওয়া যায়। কিন্তু ইতিহাস যেমন দুর্বলকে ক্ষমা করে না, রাজনীতির রথ যেমন শত্রুধ্বংস না করে থামে না—তেমনিভাবেই দিল্লীশ্বরের সঙ্গে সঙ্গে সিরাজদ্দৌলাকেও একই পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হয়েছে। বেঁচে থাকতে হয়েছে ততদিন, যতদিন তারা মৃত্যুমঞ্জুর না করে।

সিরাজদ্দৌলার সঙ্গে ইংরাজ সংঘর্ষই বাংলার পরবর্তী রাজনৈতিক ইতিহাস। নানাকারণে এই সময়টুকু ইতিহাসে প্রাধান্য পেয়েছে—যথেষ্ট গুরুত্ব আছে এই সংঘর্ষের। বাংলার গতানুগতিক ইতিহাসে সরফরাজ-আলীবর্দির নূতনত্ব নেই; এঁরা নিশ্চিন্তে দেশশাসনের যোগ্যতা দেখাবার সুযোগ পেয়েছেন। আলীবর্দি বাংলার মসনদে বসে শাসনক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন,—বর্গীদমনের গৌরবলাভ করেছেন সত্য কিন্তু তার চেয়ে বেশী অপ্রশংসা পেয়েছেন চারিত্রিক দুর্বলতার জন্য; স্নেহান্ধ আলীবর্দিকে কেউ ক্ষমা করেনি—না স্বদেশী না বিদেশী। সকলেই সিরাজদ্দৌলার অক্ষম নামের সঙ্গে তাঁকে অপমানই করেছেন। ইংরাজ ঐতিহাসিক

Stewart-এর মন্তব্যটি এ ব্যাপারে লক্ষ্যণীয়। সিরাজদ্দৌলার প্রসঙ্গে তাঁর সংক্ষিপ্ত গভীর মন্তব্যটি এই "He was remarkable for the beauty of his person and perhaps owed his misfortune to a neglected education, and the doating fondness of his grandfather".[১৫]

সিরাজদ্দৌলার অসাফল্যকে যদি আলীবর্দির স্নেহান্ধতার পরিণাম বলে মেনে নিতে হয় তবে তা হবে পরিপ্রেক্ষিতকে—সম্ভাবিতকে অগ্রাহ্য করে ব্যক্তিগত অদূরদর্শিতাকে বড়ো করে দেখা। সিরাজদ্দৌলা যদি অসীম শক্তিমানও হতেন তবে দেশব্যাপী নিশ্চিত ও নির্ধারিত পতনকে তিনি কতটুকু রোধ করতে পারতেন? শুধু তাই নয়, সিরাজদ্দৌলার শক্তির ব্যর্থতা প্রমাণে তাঁর দায়িত্ব কতটুকু? মীরজাফরী চক্রান্তের কাছে তাঁর একক শক্তি-শৌর্য মূল্যহীনই হোতো। আলীবর্দির শাসনকালে বর্গীর উপদ্রব বাংলাদেশে একটি নতুন ও চমকপ্রদ ঘটনা। এই ঘটনাটির অভিনবত্ব এইখানে যে বর্গী নামধারী এই দস্যুসম্প্রদায় উচ্চসম্প্রদায়ের ভারতীয় হিন্দু। যদিও দস্যুতাই এদের লক্ষ্য কিন্তু অহিন্দু শাসক সম্প্রদায়ের কাছে অর্থদাবীই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিপূর্বেই মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুদের অত্যাচারের স্মৃতি বাঙালীর মনে দৃঢ়মূল হয়েছিল সুতরাং বর্গীর উপদ্রবের আকস্মিকতায় চমকিত হবার কথা নয়। তবু বর্গী নামধারী এই মারাঠা দস্যুসম্প্রদায় তৎকালীন মোঘল শাসক সম্প্রদায়ের ভীতির কারণ হয়েছিলেন। দস্যুতার অন্য কোন প্রতিশব্দ নেই, উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক না কেন—জনসাধারণের মনে তাঁর অনুভব শুধু ভীতির মধ্যে। দস্যুতার আবরণে যদি কোন মহৎ ও সম্ভাবনাময় উদ্দেশ্য থাকেও তবু তার ব্যর্থতা অবশ্যম্ভাবী। জনগণকে অত্যাচার করে জনসমর্থনের সুদৃঢ় ভিত্তিকে তারা নষ্ট করে দেয়। অথচ প্রয়োজনের তাগিদে এই দস্যুতাকেই আমরা সাহিত্যে আদর্শের উপকরণের কাজে না লাগিয়ে পারি না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দেবী চৌধুরানী', নিশিকান্ত বসুরায়ের 'বঙ্গেবর্গীই' তার প্রমাণ। এ প্রসঙ্গেও পরে আলোচিত হবে, এখন শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে বর্গীদমন করে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের প্রচেষ্টা সফল হয়েছিলো। গ্রাম্যমাতার মুখে বর্গী আগমনের কাহিনী ছড়ার রূপ নিয়ে বেঁচে রইলো মাত্র। কোনো ঘটনার গুরুত্ববিচারের জন্য সময়ের প্রয়োজন; কালের পটভূমিকায় তার মূল্যবিচার হয়ে যায় আপনা থেকেই। বর্গীর হাঙ্গামার কোন সুদূরপ্রসারী ভিত্তি পাওয়া যায়নি।

সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালের প্রথমার্ধ শান্তিপূর্ণ;—তাঁর রাজত্বের প্রথমদিকে

১৫. Charles Stewart. History of Bengal. Calcutta, 1903, P—604.

যতগুলি ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়—কোনো ব্যাপারেই সিরাজদ্দৌলা নিজেকে অযোগ্য বলে প্রমাণ করেননি। উপরন্তু বয়সোচিত চাপল্যের চেয়ে রাজনীতিবিদের দূরদর্শিতাই দেখা যায়। তাঁর সম্বন্ধে যত অপবাদই থাক না কেন—সিরাজদ্দৌলার সঠিক মূল্যায়ন হয়নি কোথাও। নাট্যকার বা ঔপন্যাসিকের তুলিকায় তিনি এক জলন্ত স্বদেশপ্রেমিক আবার ঐতিহাসিকের বিচারে তিনি অক্ষম—ব্যর্থ এক ভীরু শাসক। আর দুয়ের মাঝখানে সত্যিকারের সিরাজদ্দৌলা অস্পষ্ট।

সিরাজদ্দৌলার রাজত্বেই বাংলার রাজনৈতিক জীবনে সুগভীর পরিবর্তনের বন্যা এসেছে—এ কথা সত্য। শাসক হিসেবে ইংরাজের সাফল্যের কথাই এখানে বলা যায়। তবে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর বিচার করা যাক্। দীর্ঘ আলোচনায় আমরা দেখেছি,—মোঘল আমলে বাংলাদেশ শান্ত ছিল না;—অসন্তোষ অসহযোগ ছিল জাতীয় চরিত্রের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সুযোগের অপেক্ষায়। বিদ্রোহ-যুদ্ধও এসেছে অনিবার্যরূপে, জাতীয় জীবন আন্দোলিত হয়েছে, চঞ্চল হয়েছে। আর চাঞ্চল্যের আকর্ষণে মানুষের চরিত্রে এসেছে দৃঢ়তা ও ঐক্যবোধ। বাঙ্গালীর শক্তিহীনতার কথাই প্রবাদে পরিণত—কিন্তু এ কথার প্রতিবাদ শুধু ইতিহাসই করতে পারে। যথেষ্ট বাহ্যিক বিপদ ও সংগ্রামের মধ্যেও এই জাতি আপনার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখতে পেরেছে—এটাই বোধ করি শক্তির একটি প্রকট প্রমাণ। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর হাতে লাঠি দেখে গর্ববোধ করেছিলেন—কিন্তু বিদেশী দস্যু ও অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য বহুবার বাঙ্গালীকে অস্ত্রধারণ করতে হয়েছে—এটা ঐতিহাসিক সত্য। জীবন স্পন্দনের কোন দৈন্য যদি থাকত তবে প্রতাপাদিত্যের একশত বৎসর পরে দক্ষিণ বাংলার বুকেই সীতারামের আবির্ভাব ঘটত না। বলা বাহুল্য যুদ্ধনিস্পৃহ বলে বাঙ্গালীর যে অপবাদ তার মধ্যে যুক্তি নেই—প্রচলিত ধারণারই অনুরণন ছড়িয়ে আছে।

সিরাজদ্দৌলার আমলে বাংলাদেশের বুকে বহু শক্তিমান জমিদার সম্প্রদায় বর্তমান—বংশানুক্রমে তাদের প্রতিপত্তি বেড়েই চলেছিলো। আপন সীমানায় এরা সর্বেসর্বা—কিন্তু গৌড়েশ্বরের সঙ্গে আন্তর যোগাযোগ স্থাপনের কোন পথ ছিল না। এঁরা একক ভাবে ছিলেন,—সমগ্র বাংলার জমিদার সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত একতাবুদ্ধি কোনদিনই দেখা যায়নি। বরং সামান্য কারণে ঐক্যসৃষ্টির চেয়ে শক্তিক্ষয়ের পন্থাকেই এরা বড়ো বলে মনে করতেন। উপরন্তু সকলের লক্ষ্যই ছিল মোঘলসম্রাট তোষণ—কারণ তাঁরা জানতেন শক্তিমান শত্রু বলে যাকে গণ্য করা যায় তিনি মুর্শিদাবাদ সম্রাট।

সিরাজদ্দৌলার সামগ্রিক পতন যখন আসন্ন তখন বাংলার জমিদার সম্প্রদায়ের

করণীয় কিছুই নেই—এটা আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হলেও তৎকালীন রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় এটাই ছিল সত্য। পলাশীর প্রান্তরে বাংলার স্বাধীনতা সূর্য যখন অস্তমিত—বাংলার সর্বত্র জমিদার সম্প্রদায় তখন নীরব দর্শক মাত্র। তাঁরা জানতেন মোঘল-ইংরাজ সংঘর্ষে তাঁরা তৃতীয় পক্ষ, ঘটনাস্রোতে ভেসে যাওয়া ছাড়া আর কিছু করণীয় নেই। জমিদার সম্প্রদায়ের অতীত ইতিহাস গৌরবময় কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের নতুন ইতিহাসে, জনগণের নতুন জাগরণে, ইংরাজ রাজত্বের প্রথম থেকেই তাঁরা নীরব-কণ্ঠহীন। সিরাজদ্দৌলার ভাগ্যবিপর্যয়ের জন্য যেমন বাংলার জমিদার সম্প্রদায়কে দায়ী করা চলে না—তেমনি তৎকালীন যুগজীবনের কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকাতেই তাঁরা অংশগ্রহণ করেননি। অথচ বাংলার সর্বত্র খণ্ড খণ্ড অংশে এঁদের একাধিপত্য বর্তমান; রাজায় রাজায় যুদ্ধ চলে কিন্তু উলুখড় হিসেবে আপন অস্তিত্ব বিপন্ন করতে এরা রাজী ছিলেন না।

সুতরাং সিরাজদ্দৌলার পতনকে শুধুমাত্র মুর্শিদাবাদ রাজবংশের পতনের প্রতীক হিসেবেই গ্রহণ করতে হবে। সিরাজদ্দৌলার পতনের জন্য আমরা একটি রাজ-পরিবারের ও রাজসভার ষড়যন্ত্রকেই দায়ী করবো।—বস্তুতঃ বৃহত্তর জনসমাজ এই যুদ্ধ সম্পর্কে শুধু উদাসীন নয়—অজ্ঞ ছিল। সিরাজদ্দৌলা যে রাজসভায় রাজা হয়ে বসেছিলেন—তাদের চিত্র নির্ভরযোগ্য ইতিহাস থেকে নেওয়া যাক—When Clive struck at the Nawab, Mughal Civilisation had become a spent bullet. Its potency for good, its very life was gone. The country's administration had become hopelessly dishonest and inefficient and the mass of the people had been reduced to the deepest poverty, ignorance and moral degradation by a small, selfish, proud and unworthy ruling class...The army was rotten and honey-combed with treason.[১৬]

যোগ্য প্রজা বা যোগ্য সেনানী নেই পরিবর্তে বিশ্বাসঘাতকতা ও ষড়যন্ত্র রয়েছে। সুতরাং পলাশীর যুদ্ধে সিরাজদ্দৌলার পতন হল অবশ্যম্ভাবী। মোঘল-শাসনের অবসানের এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটি সমগ্র বাংলাদেশ ও বাঙ্গালীকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল সেটাই বিচার্য। মুর্শিদাবাদ তখত্ নিয়ে রাজা ও মন্ত্রীর কদর্য যুদ্ধ চলছিলই—সুচতুর ক্লাইভ শুধু বুদ্ধির সদ্ব্যবহার করেছেন। পলাশীর যুদ্ধ বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসের এক যুগান্তকারী সংগ্রাম, সে যুগে একমাত্র সিরাজদ্দৌলা

১৬. Jadunath Sarkar, History of Bengal (Vol. II), Dacca, 1948, P—497.

ছাড়া সেকথা কেউই বোঝেনি ;—আর তিনি যা বুঝেছিলেন তাঁর বিশ্বস্ত মন্ত্রীমণ্ডলী তা বোঝেনি। —আপন স্বার্থের প্রেরণায় তারা অন্ধ, এই মৃত্যু ও জীবনের যুদ্ধকে তারা একটা কৌতুকের বিষয় বলে উপেক্ষা করেছেন—এর চেয়ে বড়ো দুঃখের কথা আর কী হতে পারে? সিরাজের ব্যবহারে তারা বিরক্ত হতে পারেন কিন্তু বিদেশীর কাছে সিংহাসন বিক্রয় করে তারা এক অতিনিন্দিত পরিস্থিতির সৃষ্টি করলেন মাত্র। এই হীন ও কদর্য ষড়যন্ত্রই প্রমাণ করে দেশাত্মবোধ-জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে রাজপুরুষের ধারণা ছিল কতটুকু। তখ্ত নিয়ে যে আত্মকলহ চলছিল, সুযোগসন্ধানী ক্লাইভের দৃষ্টিতে তা দেখা দিল এক অত্যাশ্চর্য ভারতসাম্রাজ্যস্থাপনের সুড়ঙ্গপথ রূপে। সুতরাং ইংরাজ আগমন ও মোঘলশাসন অবসানের এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার জন্য আমাদের দায়িত্ব ছিল না বিন্দুমাত্র—জনগণের নেপথ্যলোকের অন্ধকার ষড়যন্ত্ররূপে এই যুদ্ধ জগতের সামনে শিক্ষণীয়-দর্শনীয় একটি ঘটনারূপে চিহ্নিত হল। 'ভারত জয় করা যে এত সহজ, বুদ্ধিজীবী ইংরাজের কাছে তা এক পরম বিস্ময় বলেই মনে হয়েছে। অন্ততঃ ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ ইংরাজের ইতিহাসে লেখা যাবতীয় যুদ্ধ কাহিনীর এক চাঞ্চল্যকর ব্যতিক্রম বলে মনে করা যায় সহজেই।

পূর্বেই বলেছি ইংরাজশাসনের প্রথমার্ধে বাংলাদেশের মানুষ এর ভবিষ্যৎ বা বর্তমান নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তা করেনি। ইংরাজ যে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির দূতরূপে সদ্য বিশ্ববিজয়ে চলেছে এ ধারণাও ছিল সাধারণ-অসাধারণ সকল বাঙ্গালীর কাছে অজ্ঞাত। শাসক পরিবর্তনের এই গুরুতর ঘটনাটি সম্বন্ধে বাংলাদেশ ছিল নিস্পৃহ দর্শক ;—অতীতকৌতূহল বিস্মৃত, আগামী ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অনিশ্চিত একটি ধারণা সমগ্র বাঙ্গালীকে পেয়ে বসেছে। আর জনগণের প্রতিনিধি স্বরূপ যে আঞ্চলিক জমিদার সম্প্রদায় ছিলেন তাঁরা নতুন শাসককে সহাস্য ও আন্তরিক আনুগত্যে মুগ্ধ করেছিলেন বলেই ধরে নেওয়া যায়।

কিন্তু অঞ্চলবিশেষে নবাগন্তুক শাসনকর্তাদের প্রতি বিরূপ ও বিক্ষুব্ধ মনোভাবও দেখা গেছে। সে সম্বন্ধে আলোচনা করলে ইংরেজ রাজত্বের প্রথমার্ধে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সম্পর্কে যথাযোগ্য ধারণা অবশ্য পাওয়া যায় না, কিন্তু আঞ্চলিক কিছু কিছু চমকপ্রদ বিবরণ পাওয়া যায়। এই সব ছোটখাট সংগ্রাম থেকে জাতীয় সংগ্রামের উৎস সন্ধান একেবারে নিরর্থক বলা যায় না। কিন্তু সচেতন ও সংঘবদ্ধ স্বাধীনচেতনা থেকে এই সব বিদ্রোহ জন্ম নেয়নি। শুধু তাই নয়, আঞ্চলিক শাসন-শৈথিল্যেই একধরণের দুর্দান্তপ্রকৃতি মানুষরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে, অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারী হিসেবে এধরণের বহু সম্প্রদায়ের বিবরণ সর্বত্রই মেলে। বাংলাদেশে মোঘলশাসনের অবসান ও ইংরাজ রাজত্বের প্রারম্ভ মুহূর্তে যে শাসনগত শৈথিল্য

দেখা দিয়েছিল, অত্যাচারী সম্প্রদায়ের কাছে তা একটা বিশেষ সুযোগ বলেই মনে হয়েছে। সুতরাং দলবদ্ধভাবে এরা এদের সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা অনুসরণ করে গেছে। গৃহস্থজীবন হয়েছে বিপর্যস্ত, ভীতি ও আতংকে জীবন হয়েছে বিপন্ন-অসহায়। অনেক সময় এও দেখা গেছে, দলবদ্ধ এই অত্যাচারীকে শাসন করতে ভীত হয়েছে স্থানীয় জমিদার বা শাসকগোষ্ঠী। তাঁরাও অর্থ ও উৎকোচ দিয়ে এদের উদ্যত আক্রমণকে বাধা না দিয়ে অপ্রতিহত করতেই সাহায্য করেছেন। ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে আক্রমণ করার কথা আসেই না—কিন্তু যখনই ইংরাজ এদের শাসন করতে গিয়েছে তখনই প্রচণ্ড বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত এই দস্যু সম্প্রদায়ের সঙ্গে ছোটখাট বহু যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে বাংলাদেশের নানাস্থানে।

মুসলমান রাজত্বের শেষভাগে শাসনশৈথিল্য সর্বজনস্বীকৃত। মুর্শিদাবাদের রাজতখত নিয়ে রাজা ও মন্ত্রী যখন গভীরতর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত—সুদূর অঞ্চলের অত্যাচারীদের অত্যাচারের মাত্রা তখন বেড়েই চলেছে। ইংরাজ এদেশ জয় করেই শাসনব্যবস্থার প্রথম কর্তব্য হিসেবে শান্তিরক্ষায় তৎপর হয়েছে। সুতরাং দেশের সর্বত্র শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার চেষ্টাও করেছে সর্বাগ্রে। আঞ্চলিক অশান্তির কোন খবর পাওয়া মাত্রই কোম্পানীর সশস্ত্র সৈন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছে এবং অধিকাংশ স্থানেই তারা অত্যাচারী এই দস্যু সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এটা অবশ্য শাসক হিসাবে তাদের শক্তি ও সামর্থ্যেরও পরিচায়ক। তারা যে শাসন ব্যাপারে অনেক বেশী যোগ্য ও দূরদর্শী এ তারই অন্যতম প্রমাণ। মোঘলশাসনের শৈথিল্যে বাঙ্গালী যখন বীতশ্রদ্ধ, জীবন ও সম্পত্তি যখন নিতান্তই অনিশ্চিত, তখন এই নতুন শাসকগোষ্ঠীই এদেশে জীবন ও ধনমান রক্ষার আশ্বাস দান করেছে।

ইংরাজ রাজত্বের প্রথমেই বাংলাদেশের নানাস্থানে নানা গোলযোগের সংবাদ পাওয়া যায়। এখানে যশোহরের ইতিহাসের কতকাংশ তুলে ধরছি।

Bengal District Gazetteers-এ L.S.S.O'. Malley লিখছেন—The records show clearly how great was the necessity of an efficient police system. In 1781 a noted dacoit or robber chief, after numerous outrages, in which he was screened by the landholders, was at length captured by Mr. Henckell....In 1873, a body of robbers about 3000 in number, attacked an escort conveying treasure from Bhushna murdered some of the escort, and succeeded in carrying off the treasure. None of these robbers were

captured. In 1784, Kalisankar, the head of the Narail family, was reported by Mr. Henckell to have been a "dacoit and a notorious disturber of peace". On one occasion, Mr. Henckell sent a party of sepoys to capture him; but Kalisankar, having 1500 of his followers at Narail, fought with the sepoys for three hours and defeated them.[১৭]

এই উদাহরণটির সত্যতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ না হলেও মোটামুটিভাবে এ থেকে সে যুগের বিদ্রোহী মনোভাবটির মূলানুসন্ধান করাটা সহজতর হয়। যশোহরের উপদ্রবকে নিতান্তই ডাকাতি বলে গণ্য করা যায় কি ? এ ধরণের সংঘবদ্ধ ডাকাতি সত্যিই সম্ভব ছিল সে যুগে। ৩০০০ জন মিলে যে লুঠতরাজ ও ডাকাতি তার লক্ষ্য ছিল দলীয় স্বার্থ, নিজস্ব এলাকায় প্রাধান্য লাভের বাসনা।' এমনকি স্থানীয় জমিদার—[কালীশংকর—নড়াইল বংশের প্রতিষ্ঠাতা।]—এই দলের অন্যতম নেতা। ইংরেজরা অনেক সময়েই বিদ্রোহী দমনে প্রথমে সম্পূর্ণই অসমর্থ হয়েছে। কিন্তু শাসক হিসেবে ইংরাজ নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হবার সুযোগ পেয়েছে। সাময়িক অসাফল্যই তাদের দৃঢ়তর করেছে পরবর্তী সংগ্রাম দমনে। এধরণের একটি উদাহরণের দর্পণে সে যুগের ছোটখাট বিদ্রোহগুলির পরিচয় স্পষ্টতর হয়। ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ সর্বত্রই এদের ডাকাত, চোয়াড় ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছে। আর অন্যকোন ইতিহাসের অভাবে বিদেশী লিখিত এসব ইতিহাস থেকে সত্যানুসন্ধান সর্বদাই যে অব্যর্থ হবে তা বলা যায় না। সুতরাং নির্বিচারে সত্য বলে এ ইতিহাস মেনে নেবই বা কেন ? ইংরাজরচিত ইতিহাসে যারা ডাকাত কিংবা চোয়াড়,—সত্যকারের ইতিহাসে কোন অন্তর চেতনার তাগিদ ছিল কি না সে সত্য আজ আর জানার উপায় নেই। বাংলাদেশের অঞ্চলে অঞ্চলে প্রায় একই সময়ে বিচ্ছিন্ন ও স্বতঃপ্রণোদিতভাবে এই যে সংগ্রাম চলেছে এর পেছনে বৃহত্তর কোন পটভূমিকা ছিল না বলেই মনে হয়। যদিও এদের উদ্ভব ও কার্যকাল আশ্চর্যভাবে একই সময়ের মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। ১৭৮০-১৭৯৯ সালের মধ্যেই এই সব বিদ্রোহ ও গোলযোগ ঘনীভূত—প্রকাশিত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। কিন্তু স্থানে স্থানে অতর্কিতভাবে এইসব দলবদ্ধ ও শক্তিমান অত্যাচারীদের সংগ্রাম সামর্থের পরিচয় নিতান্ত অবজ্ঞার নয়। যশোহরের ঐ দৃষ্টান্তটি বিচার করলেই বোঝা যায়, এরা দূরদর্শী, সংঘবদ্ধ, সুগঠিত ও যোগ্য নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত।

---

১৭. L. S. S. O' Malley—Bengal District Gazetteers—Jessore, Calcutta, 1912, P—38.

বাংলাদেশের সর্বত্রই এ ধরণের সদ্য জাগ্রত শক্তির পরিচয় পেয়ে পরবর্তী বাঙ্গালী ঔপন্যাসিকগণ এ থেকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপ্ন ও সত্য সন্ধান করেছেন। উপন্যাসের জনপ্রিয়তা দেখেই অনুমান করা যায়—ঘটনার সত্যকে অগ্রাহ্য করে কল্পনার সত্যকে নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতে আমাদের বিন্দুমাত্র বাধা নেই। ঐতিহাসিক তথ্যকে অভ্রান্ত বলে জানি না সুতরাং ঔপন্যাসিক কল্পনাকে নিতান্তই বুদ্‌বুদ্‌ বলে উপেক্ষা করা চলে না। তাছাড়া সেই উপন্যাসই যদি শক্তিমানের লেখনীসম্ভূত হয়, তাহলে রাতারাতি ইতিহাসের মিথ্যাই জনমানসের প্রচণ্ড উৎসাহে সত্যের বর্তিকা হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের "আনন্দমঠের" সন্ন্যাসী সম্প্রদায়, "দেবী চৌধুরাণীর" ভবানী পাঠক সম্প্রদায়ের কথা এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। একদা 'আনন্দমঠের' মধ্যে বাংলাদেশ পেয়েছে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রেরণা। 'আনন্দমঠের' পরিকল্পনা অভূতপূর্ব, জনমনে তার সুদৃঢ় প্রভাবও তাই সুদূরপ্রসারী। 'আনন্দমঠের' ত্যাগী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় গোপনে গোপনে যে সুবিশাল স্বাধীনতা আন্দোলনের পরিচালনা করেছেন—যে কোন দৃষ্টিতেই বিচার করি না কেন তা পরাধীন ও লাঞ্ছিত ভারতবাসীর মনে এনে দিয়েছে সংগ্রাম সামর্থ্য, আত্মদানের প্রেরণা। বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসটির মালমশলা সংগ্রহ করেছেন ইতিহাস থেকেই। সত্যিই সে সময়ে বাংলাদেশে একধরনের সন্ন্যাসী সম্প্রদায় আবির্ভূত হয়েছিলেন—ছড়িয়ে পড়েছিলেন সমগ্র বাংলাদেশে। ময়মনসিংহ অঞ্চলেই এদের আস্তানা, কিন্তু এরা সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে এদের কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করেছে। শক্তি ও সামর্থ্যে এরা উপযুক্ত, যখন তখন ইংরাজ সৈন্যদের মুখোমুখি হতে যারা বিন্দুমাত্র ভীত হয় না। মুহূর্তের মধ্যে এরা আবির্ভূত হয়, মুহূর্তে মিলিয়ে যায়। বঙ্কিমচন্দ্র এই সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের মধ্যেই অতীত বাঙ্গালীর স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিচয় দিয়েছেন, —কল্পনার মধ্যেই দেখেছিলেন তাদের আদর্শ ও দেশোদ্ধারের স্বপ্ন। বলা বাহুল্য, পরাধীন জাতির সামনে এই সংগ্রামের চিত্র মহামূল্যবান,—ভবিষ্যতের কর্মপন্থাকেই উজ্জীবিত করার সুকৌশল এখানে প্রয়োগ করা হয়েছে ইতিহাসের আবরণে। কিন্তু ঐতিহাসিক দলিল পত্র থেকে যা পাওয়া যায় তাতে সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের এ মহিমা নেই। শুধু তাই নয় বহির্বাংলার একদল লুণ্ঠনকারী সাধুবেশ ধারণ করে সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে যে অত্যাচার শুরু করেছিল ইতিহাসে পাই শুধু তারই বর্ণনা। Bengal District Gazetteers-র ময়মনসিংহের ইতিহাস প্রসঙ্গে এই ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়ের চমকপ্রদ বর্ণনা রয়েছে—"The history of the people is curious. They inhabit or rather possess the country lying south of the hills of Tibbet from Cabul to China. They go mostly

naked, they have neither towns, houses nor families; but rove continuously from place to place, recruiting their number with the healthiest children they can steal in the country through which they pass. Thus they are the stoutest and most active men in India. Many are merchants They are all pilgrims Such are the Sanyasis—the Gypsies of Hindusthan."[১৮]

এই বর্ণনাতেই সন্ন্যাসীদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলিও ধরা পড়েছে। ইংরাজ ঐতিহাসিকদের বর্ণনাতেই—এরা "stoutest and most active men in India" কিন্তু এই শক্তি তারা প্রয়োগ করেছে এদেশীয় জমিদার সম্প্রদায়ের ওপর ডাকাতি ও লুণ্ঠন করেই। শুধু তাই নয়,—জমিদারেরা এদের ভয় করে চলত সে শুধু শংকায়। সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে আরও বলা হয়েছে—

"They lent also to the zamindars and, when their clients could not pay, they banded together, plundered their houses and sold their children into slavery."[১৯]

সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের এই বীভৎস ক্রিয়াকলাপ দমনেই তৎপর হয়েছিল ইংরাজ। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বেঁধেছিল অনিবার্যভাবে। সন্ন্যাসীদের এই নির্বিচার অত্যাচারকেই স্বাধীনতা আন্দোলনের মহিমায় ভাস্বর করে তোলা হয়েছে উপন্যাসে। কারণ ঔপন্যাসিক ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছেন, তার ক্ষেত্র হয়েছে আরও বিস্তৃত। তবু বলি, সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বাংলার সার্থক আন্দোলন ত নয়ই উপরন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের মাহাত্ম্যবর্জিত সম্পূর্ণ একটি আঞ্চলিক হাঙ্গামা—সন্ন্যাসীরা যার নায়ক—বাংলাদেশের বুকে যারা শুধু গায়ের জোরেই অত্যাচারের তাণ্ডব লীলা চালিয়েছে। এদের দমন করতে ইংরাজকে যে বেগ পেতে হয়েছে সে সম্পর্কে বলা হয়েছে—In 1807, a separate Magistrate's Court was established at Kaligunge-Sherpur to check the unruliness on the borders"[২০] এবং তৎপরতার সঙ্গে সন্ন্যাসী দমন করে শান্তি ও শৃংখলা ফিরিয়ে আনার সমস্ত কৃতিত্ব ইংরাজ শাসকদেরই। ইংরাজদের শাসনদক্ষতা বুদ্ধি ও শাসন পরিচালনাকৌশল অনেক উচ্চাঙ্গের—সেই শক্তি দিয়ে বন্য ও অনগ্রসর যে কোন

১৮. F. A. Sachse—Bengal District Gazetteers—Mymensingh, Calcutta 1917. P—28.

১৯. Ibid P—30.

২০. Ibid P—31.

সম্প্রদায়ের উৎপাত সহজেই দমন করেছে। সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ইংরাজদের সংঘর্ষও অত্যন্ত ভয়াবহ আকার ধারণ করেছিল,—কিন্তু সন্ন্যাসীরা পরবর্তীকালে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হয়েছে। সন্ন্যাসী-বিদ্রোহকে নিছক সম্প্রদায়গত ঘটনা হিসেবে ব্যাখ্যা করা যত সহজ বিদ্রোহী সম্প্রদায়ের সচেতন সংগ্রামরূপে এর ব্যাখ্যা করা তেমনি অসম্ভব। পূর্বেই বলেছি সন্ন্যাসী-বিদ্রোহ যখন রীতিমত ভয়াবহরূপ ধারণ করে তখন সর্বশক্তি নিয়োগ করে ইংরাজ এদের দমন করে দেশের পরম কল্যাণই সাধন করেছে। বিদ্রোহ যদি জনগণের আন্তর সমর্থন না পায় তার সমাপ্তি ঘটে সাধারণতঃ এভাবেই। বহির্বাঙ্গলার একদল শক্তিমান লুণ্ঠনকারী সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ও সেদিন জনগণের মনে ভীতির সঞ্চারই করেছে মাত্র—এর বেশী কোনও উল্লেখযোগ্য পরিচয় দিয়ে এদের চিহ্নিত করা যায় না।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহের মত আরও অনেক আঞ্চলিক বিদ্রোহ বাঙ্গলার নানাস্থানে প্রায় একই সময়ে একই পদ্ধতিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। এ প্রসঙ্গে বীরভূমের আঞ্চলিক হাঙ্গামা ও মেদিনীপুরের চোয়াড় সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করতে হয়। প্রথমটির কারণ সুস্পষ্ট—"The early period of British administration was a time of trouble for Birbhum...it was devastated by famine... Distress and destitution drove the people to acts of lawlessness and violence, in which disbanded soldiers lent a willing hand, bands of dacoits gathering along the western borders and in the jungles across the Ajai".[২১]

বীরভূম আদিবাসী অধ্যুষিত প্রাচীন রাঢ়ভূমি।—শৌর্য ও বীর্যে রাঢ়ের প্রাচীন ইতিহাস সুসমৃদ্ধ গৌরবান্বিত। পাঠান-আফগান শক্তিকে প্রতিহত করার জন্যও এদের প্রচেষ্টার অন্ত ছিল না। বীরভূমির গৌরব বারবার রক্ষা করেছেন বীর সন্তান সম্প্রদায়। এর উল্লেখ মেলে মুসলমান ঐতিহাসিকের ইতিহাসে; Riyazu-S-Salatin-এ বলা হয়েছে—

"The Zaminders of Birbhum and Bishnupur, being protected by dense forests, mountains and hills, did not personally appear before the nawab, but deputed instead their agents to carry on

২১. L. S. S. O' Malley—Bengal District Gazetteers—Birbhum, Calcutta, 1910, P—16—17.

transactions on their behalf, and through them used to pay in the usual tributes, presents and gifts".[২২]

বীরভূমের এই উপদ্রবের মূলেও সেই আদিম শক্তিরই প্রকাশ দেখি। দুর্ভিক্ষের পীড়নে আত্মজাগরণের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে—ক্ষুধার শান্তি যার উপশম। বাংলা-দেশের বুকে এই দুর্ভিক্ষ যে বীভৎস প্রচণ্ডতা নিয়ে দেখা দিয়েছিল—তার পরিচয় মেলে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে'। শ্মশান বাংলার বুকে সেদিন জীবিত মানুষের মিছিল দেখা যায়নি। অন্নহীন শক্তিহীন শবের মিছিলেও বিদ্রোহী আত্মার গর্জন শুনেছি। সন্ন্যাসী বিদ্রোহেরও অন্যতম কারণ দুর্ভিক্ষের ভয়াবহ আবির্ভাব। বীরভূমের ঘটনার অন্তরালেও সেই একই কারণ। একটা প্রচণ্ড বৈপ্লবিক চেতনা নিয়ে সেদিন মানুষ সমবেত হয়েছে মানবিক দাবী প্রতিষ্ঠার তাগিদে। দুর্ভিক্ষ থেমে যাওয়ার পর এই ধরণের উৎপাতেরও সমাপ্তি ঘটেছে। বীরভূম ও মেদিনীপুরের বিদ্রোহে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে আমরা আদিবাসীদেরই প্রাধান্য দেখি। ইংরেজ ঐতিহাসিকের বিবরণে এরা 'hillman'—পার্বত্য অধিবাসী। মেদিনীপুরের যে বিদ্রোহ ঘটনাটি এখানে উল্লিখিত হবে সেটি ঘটনাবৈচিত্র্যে আরও অভিনব। মেদিনীপুরের বিদ্রোহীদের ইংরাজপ্রদত্ত নাম 'চোয়াড়'। এবং শব্দটির ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে—"This term signifies in Bengali "an outlandish fellow" and was applied in Midnapore to the wild tribes who inhabited the Jungle Mahals and the tracts beyond them"

এদের হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ নানাভাবে আরম্ভ হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষার্ধে। "Towards the close of the century the Chuars broke out in open rebellion and extended their raids to the heart of the district. The outbreak began in April 1798, when two villages were burnt down in Silda".[২৩]

দলবদ্ধ এই শক্তির অত্যাচারে সাধারণ মানুষের ধনপ্রাণ হয়েছে বিপর্যস্ত। প্রতিরোধ করার মত সংঘবদ্ধতা বা একতা সে যুগের গ্রামবাসীদের মধ্যে দেখা যেত অল্পই। যাও বা ছিল অত্যাচারীদের উদ্যত খড়্গের ভয়ে তারা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। মেদিনীপুরের ঘটনাটিতে যে বৈচিত্র্যের কথা বলেছি তা হল,—এ অঞ্চলের শাসনকর্ত্রীর অধীনে এই অত্যাচারী সম্প্রদায় হয়েছে আরও দুর্দ্ধর্ষ। সেকালে রাজা ও জমিদার

22. Ibid.

23. L. S. S. O' Malley—Bengal District Gazetters—Midnapore, Calcutta, 1911. P—40.

সম্প্রদায়ের অধীনে এ ধরণের দুর্দ্ধর্ষ সৈন্যদল থাকত—রাজ্যরক্ষার সহায়তা করাই যাদের কাজ। বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরানী"তে দেবী রানীর বর্ণনা পড়েছি, ডাকাত সম্প্রদায়ের অধিনায়িকা দেবীরানী পেয়েছে রাজ্য পরিচালনার সর্বময় কর্তৃত্ব। সম্পূর্ণ কাল্পনিক বলে একে অগ্রাহ্য করব কী করে? মেদিনীপুরের জঙ্গলমহলেও আমরা একজন রানীর সন্ধান পাই,—যার অধীনে কুখ্যাত চোয়াড় সম্প্রদায় তাদের অত্যাচারের অভিযান চালিয়েছে। ফলে ইংরাজ শাসকের কোপে পড়েছে এই চোয়াড় দলের অধিনায়িকা। এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—In the vicinity of the town of Midnapore there were three places where the Chuars assembled in force viz. Bahadurpur, Salboni and Karnagarh, the last place being the residence of the Rani of Midnapore, whose Zamindari had been brought under khas management.

At length the authorities were moved to action. Ausgarh and and Karnagarh were taken, and the Rani, who was suspected to be in league with Chuars was brought to Midnapore as a prisoner on 6th April 1799...It was suspected that the disturbances were fomented by the servants of the dispossessed Midnapore Rani and others, but the main cause of the outbreak appears to have been the issue of orders for the resumption of paik jagir lands in the zamindari of Rani".[২৪]

মেদিনীপুরের চোয়াড় বিদ্রোহ দমিত হলো;—বন্দী হলেন চোয়াড় দলের অধিনেত্রী "রাণী"। ইংরাজ বাংলার অঞ্চলে অঞ্চলে সুদৃঢ় শাসন ব্যবস্থার প্রবর্তন করে তাদের শক্তি ও স্থায়িত্বের শিকড় সুদূরপ্রসারী করতে সমর্থ হল। মোটামুটি ভাবে এই সব আঞ্চলিক বিদ্রোহের সবকটিই ইংরাজ দমন করতে সমর্থ হয়—সে শুধু রণকৌশলী ও শক্তিশালী বলেই নয় সেইসঙ্গে ইংরাজের সূক্ষ্মদর্শিতারও সংমিশ্রণ রয়েছে। যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানেই তারা কূটনীতি-ভেদনীতির সূক্ষ্ম চাতুরীর পন্থা অবলম্বন করেছে। সেই সঙ্গে বাংলাদেশের অন্তর্জগৎ—বহির্জগতের প্রতিটি অস্পষ্ট লিপির পাঠোদ্ধারে সমর্থ হয়েছে। এই দেশের মানসিক চিন্তাধারা, চারিত্রিক গঠন ও দৈহিক সামর্থ্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় নিবিড়তর হলো। ১৭৫৭—১৮০০ সালের মধ্যে ইংরেজ পেলো তাদের পরবর্তী কার্যধারার একটা সুস্পষ্ট

২৪. Ibid. P—42.

নির্দেশ এবং বাংলাদেশ দিল তার অস্থিরচিত্ততার,—অনৈক্যের, অসঙ্গবদ্ধতার ইতস্ততঃ পরিচয়।

এই সময়ের ইতিহাস থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক চেতনার যে পরিচয় মেলে তা এককথায় অবিন্যস্ত-শিথিল, অদূরদর্শিতায় ভরপূর। বাংলাদেশের সর্বত্র যে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের বহ্নিশিখা জ্বলে উঠেছে—সে আলোতে বাঙ্গালীর ঘর পুড়েছে কিন্তু আত্মবিসর্জনের অগ্নিতে শুদ্ধ হবার অবকাশ পায় নি তারা। বস্তুতঃ এ সমস্ত বিদ্রোহ ও বিপ্লবের সঙ্গে উচ্চস্তরের সামাজিক জীবনের যোগাযোগ ছিল অতি অল্পই। তারা সভয়ে আত্মগোপন করেছে—নিঃশব্দ শঙ্কায় গৃহকোণে আবদ্ধ থেকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের মানসম্ভ্রম রক্ষা করেছে। এই সমস্ত উৎপাতের সঙ্গে তাদের কোনরকম যোগাযোগের কথা ভাবাই যায় না। সাধারণতঃ আদিবাসী ও বহিরাগত দস্যুবলেই হাঙ্গামাকারীদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে—সুতরাং তাদের সঙ্গে বাংলাদেশের চিন্তাধারার যোগ কল্পনা করাই অসম্ভব। আজকের দিনে যে বিশাল বাঙ্গালী সমাজের অস্তিত্ব দেখি হয়ত ১৬০ কি ১৭০ বৎসর আগে তার আয়তন ছিল আরও সীমিত; কিন্তু সেই গোষ্ঠীবদ্ধ বাঙ্গালীসমাজ তখন রাজনীতির অন্তরালে সুস্থ জীবন ও শান্ত গৃহরচনায় নিমগ্ন—মাঝে মাঝে অত্যাচার ও লুণ্ঠনে দিশাহারা এইমাত্র। সামাজিক জীবনে এরা মাঝে মাঝে একত্র হোত কিন্তু রাজনৈতিক কোন হেতু সেখানে ছিল না। জমিদারও রাজা বলে যে শক্তিমান বাঙ্গালী ভূস্বামীদের কথা শোনা যায় এবার তাদের কথায় আসা যাক। শক্তি ও শৌর্য-বীর্যের যে উজ্জ্বল পরিচয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে পাওয়া গেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে তা একান্তই নিষ্প্রভ ও দ্যুতিবিহীন। জমিদার ও ভূস্বামীদের যেটুকু পরিচয় পাওয়া যায় তাও নিতান্তই অনুল্লেখ্য। বিদ্রোহীদের ও লুণ্ঠনকারীদের হঠাৎ আক্রমণের হাত থেকে রাজ্যরক্ষার কোন সামর্থ্যের অভাবেই এরা তাদের প্রশ্রয় দিয়েছে, অর্থ ও রসদ সাহায্য করেছে এই কারণে। অথচ বিদ্রোহদমনের কোন রকমের সংঘবদ্ধ আয়োজন বাংলাদেশের কোথায়ও দেখা যায় নি। ফলে ইংরাজ শাসকের কাছে বিনীত নিবেদনে এই ভূস্বামী সম্প্রদায় এদের অক্ষমতার ও অসামর্থ্যের কথাই জানিয়েছে;—বিনিময়ে লাভ করেছে ইংরাজ তরফ থেকে ধনমান বাঁচাবার আশ্বাস। এই ভাবেই সাম্রাজ্য লাভের প্রথম পঞ্চাশ বছরে ইংরাজ বাংলাদেশের জল, হাওয়া, মাটি ও মানুষ সম্বন্ধে একটা প্রগাঢ় ব্যুৎপত্তি লাভ করেছে। অন্ততঃ এই দেশের সঠিক ইতিহাস পড়ে নিতে ইংরেজের কোনো অসুবিধাই হয়নি। বাংলা দেশ, বাঙ্গালী ও বাংলার নিম্নশ্রেণীর আদিবাসী, ইংরাজ শাসনের প্রথম পর্যায়ে এদের প্রত্যেকের সঙ্গেই ইংরাজের যোগাযোগ ঘটেছে একান্ত ভাবেই।

তবু বাংলাদেশ নিতান্তই নির্জীব হয়নি কোন কালে। লক্ষ্য করতে হবে, বাংলাদেশের জন্মমুহূর্ত থেকেই কোন না কোন চাঞ্চল্য এতে লেগেই আছে। সফল ও অসফল যাই হোক না কেন যুদ্ধবিগ্রহ বারবার বাংলার গৃহজীবনকে আন্দোলিত করেছে। নিশ্চিন্ত ও নিরুপদ্রব শান্তি কোনদিনই বাংলাদেশে ছিল না। বিদেশী লুণ্ঠনকারী কি স্বদেশীয় অত্যাচারী উভয়হস্তেই অত্যাচার ও লাঞ্ছনা কপালে জুটেছে অনিবার্যভাবে। কোন না কোন বৈচিত্র্য ও চাঞ্চল্য এদেশের শান্ত ও স্নিগ্ধ প্রকৃতিকে ব্যঙ্গ করেছে বারংবার। অথচ বাঙ্গালীর ভাবুক হিসেবে, কবি হিসেবে অখ্যাতি। যুদ্ধ ও বিপ্লবে সক্রিয় অংশগ্রহণ না করেও বাঙ্গালী যে যুদ্ধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছে—মোটামুটি সেটা তুচ্ছ করার মত নয়। বলাবাহুল্য বাঙ্গালীর ভাবজীবনে এই যুদ্ধঅভিজ্ঞতার প্রভাব পড়েছিল গভীরভাবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ থেকেই একটা সুনির্দিষ্ট চিন্তাধারায় তা পরিচালিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার ভাবজগতে যে আলোড়ন দেখা দিয়েছে তাতে নেতৃত্ব করেছে বাংলাদেশের উক্ত সম্প্রদায়—যারা এতদিন রাজনীতি ও যুদ্ধনীতিকে বর্জন করেই এসেছে। শুধু মনন ও চিন্তনের ক্ষেত্রেই যাদের পদার্পণ ঘটেছিলো—তারাই এবার সক্রিয় ভাবে দেশ ও জাতির সঙ্গে এক সমতলে এসে দাঁড়িয়েছে। যুদ্ধ ও বিগ্রহের দীর্ঘ অভিজ্ঞতাকে দূর থেকেই অবলোকন করেছে এরা এবং এও বুঝেছে যে, সত্যকারের শক্তি লাভ করতে গেলে আন্তরশক্তির বিকাশ ঘটাতে হবে সর্বাগ্রে। নিছক দৈহিক ক্ষমতা দিয়ে যাকে লাভ করা যায় না আন্তর শক্তির দ্বারা তাকে জয় করা যায় অনায়াসে। বাংলাদেশের নানা অঞ্চলে যে সব ছোটখাট বিদ্রোহ ঘটেছে প্রায় সবকটির পরিণতির সঙ্গেই পরিচিত হয়েছে বাঙ্গালী। যে নিদারুণ ব্যর্থতায় তারা স্তব্ধ হয়েছে সে শুধু শক্তির সঙ্গে চিন্তার, বীরত্বের সঙ্গে বোধির, যোগাযোগ ঘটে নি বলেই। তাই, বাংলাদেশের অতীত ইতিহাসের শিক্ষা থেকে আধুনিক বাঙ্গালী নতুন জীবনের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। বহু আগন্তুক শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গেই তাদের পরিচয় বহুদিনের, ইংরাজ তাদের মধ্যে শেষ আগন্তুক। কিন্তু শিক্ষার আলোকে, পাশ্চাত্ত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভ করে বাঙ্গালীর যে আত্ম-জাগরণ ঘটল, সে জাগরণ অনির্বাণ দীপশিখার মতো তাকে পরিচালিত করেছে নবজীবন শুরু করার মুহূর্তে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

॥ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজনীতিচর্চা ॥

১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধ শুধু মোঘল শাসনের অবসান মুহূর্তেরই প্রতীক নয়, সম্পূর্ণ নতুন একটি রাজনৈতিক চেতনারও জন্মদান করেছে—সেই জন্যই স্মরণীয় ১৭৫৭। দীর্ঘদিন মোঘলশাসনে অভ্যস্ত বাংলাদেশ ঠিক সেই মুহূর্তে বোঝে নি এর তাৎপর্য—কিন্তু ক্রমাগতই নব্য শাসনতন্ত্রের অভিনবত্বে বিস্মিত হয়েছে সবাই। মোঘলশাসন সমগ্র ভারতের অস্থিমজ্জায় প্রবেশ করেছিল বহুদিন আগেই, বাংলাদেশের ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। সংঘর্ষ হয়েছে, যুদ্ধানল জ্বলে উঠেছে, কিন্তু সেই আলোকে একটি সত্যই ধরা পড়েছে বার বার, সে হল, আমরা পরাধীন-অসহায়; শাসক সম্প্রদায়ের কাছে আমাদের সত্তার কোন স্বীকৃতি নেই। তাই জমিদার থেকে সাধারণ প্রজা সকলেই মোঘলসম্রাটের কৃপালাভ করে নিশ্চিন্ত হতে চেয়েছিল। রাজদ্বারে সম্মানের লোভে বিদেশীভাষার অধ্যয়ন ছিল গৌরবের-সম্পদের-সমৃদ্ধির। অগণিত হিন্দুর ধর্মান্তর শুধু সামাজিক প্রতিষ্ঠার দাবীতেই নয়—তার চেয়ে বড়ো ছিল রাজপোষকতা। নিছক অত্যাচার কিংবা বিধিনিষেধেও মানুষ কি ধর্মান্তরিত হতে পারে যদি এর পেছনে রাজানুকূল্য না থাকে? তাই ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষ করি তার সর্বাঙ্গে বিগত শতাব্দীগুলির স্মৃতিচিহ্ন দীপ্যমান। মুসলমান প্রধান বাংলাদেশের পূজা-পার্বণে-উৎসবে-ব্যসনে হিন্দু মুসলমান সংস্কৃতির মধ্যে মিশ্রণ ঘটেছে। ধর্মেও এর অনুপ্রবেশ ঘটেছে। - হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই একটি অখণ্ড সামাজিকতার মধ্যে বাস করেছে। বলাবাহুল্য এই মিশ্র সাংস্কৃতিক জীবনের ভিত্তিমূলে ছিল মুসলিম শাসনপ্রভাব কিন্তু তারই অভাবে হিন্দুসমাজ বোধকরি অলক্ষ্যে নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিল। মুসলিম শাসনের কতগুলি জঘন্য ক্রিয়াকলাপ চিরদিনই হিন্দুর কাছে ঘৃণ্য—গোহত্যা ও নারীলোলুপতার বীভৎসতায় চিরদিনই হিন্দুসমাজ ছিল সন্ত্রস্ত। তাই নব্য শাসকসম্প্রদায়ের দিকে তাকিয়েছিল উৎসুক বাংলাদেশ। কোন প্রতিবাদ প্রতিক্রিয়ার সংবাদ পাওয়া যায় নি। জমিদার-প্রজা সকলের বিস্ময় ঘনীভূত হয়েছে নতুন শাসকগোষ্ঠী সম্বন্ধে।

সুদীর্ঘকাল ধরে ইংরাজশাসনের বর্ণনা প্রসঙ্গে আমাদের ঐতিহাসিকগণ নিরপেক্ষ প্রশংসা না করে পারেন নি।—জাতীয় ইতিহাসের কিংবা জাতীয়তার চেতনা থেকে নতুন এই বিদেশী শাসকশ্রেণী আমাদের সহানুভূতি দাবী করতে পারে

না। কিন্তু যে চেতনা থাকলে শক্তিমান বৈদেশিক রাজশক্তিকে প্রতিহত করা যায় সেই চেতনা তখন কোথায় ? দেশোদ্ধার-স্বাধিকারতন্ত্র-স্বায়ত্তশাসন—প্রত্যেকটি শব্দ তখন শব্দ-গৌরব অর্থ-গৌরব উভয়টিই হারিয়েছে। সদ্য আগত এই রাজতন্ত্রের কাছে বিনীত আনুগত্য প্রকাশ করার চেষ্টা করে আমরা আমাদের সেযুগেরই জাতীয় চেতনার পরিচয় দিয়েছি। আমাদের কাছে ইংরেজও যা, ফরাসীও তাই। কিন্তু এটুকুই আমাদের একমাত্র সৌভাগ্য যে ইউরোপের তৎকালীন শ্রেষ্ঠ শক্তি ইংরাজই আমাদের নতুন প্রভুর স্থলাভিষিক্ত হয়েছিলো। আমাদের ঐতিহাসিকগণ এই সৌভাগ্যেরই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন। "Education, literature, society, religion, man's handiwork and political life, all felt the revivifying touch of the new impetus from the west. The dry bones of a stationary oriental society began to stir, at first faintly, under the wand of a heaven-sent magician."[১]

১৭৫৭-১৮০০ সাল। সময়ের দিক থেকে এর স্থায়িত্ব মাত্র অর্ধ শতাব্দীর কিন্তু এর মধ্যেই বুদ্ধিমান ইংরেজ বাংলাদেশের প্রতিটি অন্ধকার কোণে জমে ওঠা দুর্বোধ্য-লিপিগুলি প্রায় পড়ে ফেলেছিলো। বিগত শতাব্দীর সমস্ত শাসনচিহ্ন থেকে মুক্ত করে নব্য বঙ্গ রূপায়ণের একটা কল্পনায় তৎকালীন ইংরাজ সরকার প্রায় ব্যস্ত বললেই চলে। নতুন পাওয়া গুপ্তধনের মতো হঠাৎ পাওয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যকে ভেঙ্গেচুরে মনোমত করে গড়ে নিতে গেলে যতটুকু গভীর পরিকল্পনার প্রয়োজন কূটনীতিক ইংরাজ গর্ভনরদের প্রত্যেকেই কিছু কিছু উপলব্ধি করে গেছেন। ইংরাজচরিত্রের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যায় নানা জনের নানা মত কিন্তু বাংলাদেশ ইংরাজকে অন্ততঃ মুসলমানের চেয়ে অনেক সহজে আপনার বলে ভাবতে পেরেছে—এর কারণ তার সহজাত বোধশক্তি। সাগরপারের এই সভ্য সমাজ সম্বন্ধে তৎকালীন বাঙ্গালীর ধারণা বেশ স্বচ্ছ ছিল বলা যেতে পারে।

১৮০০ সালকে বাংলার নবজাগরণের প্রথম ঊষালগ্ন বলে বর্ণনা করা যায়। ইংরাজ শাসনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার বৎসর এটি। এই পরিকল্পনার অভিনবত্বে বাংলাদেশ সচেতন। এই শিক্ষায়তনই আমাদের অতীত অচলায়তন ও জীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাসাদকে ভেঙ্গে চুরে একাকার করে দিয়েছে। বাংলাদেশে অনেকদিন বাদে সত্যিকারের আলোকস্তম্ভরূপী এই ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ। আমাদের সঙ্গে নব্য শাসকের যে আন্তরিক সহযোগিতার কথা বলেছি

১. Jadunath Sarkar, History of Bengal (Vol. II), Dacca, 1948, P—497.

তার প্রমাণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে সনাতনপন্থী ও সংস্কৃতনিষ্ঠ হিন্দু পণ্ডিতেরও সাগ্রহে শিক্ষাদান ব্রত গ্রহণ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসের প্রথমার্ধ বাংলাদেশের পটপরিবর্তনের একটি নিশ্চিত মুহূর্ত বলেই স্বীকৃত। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যচর্চার প্রথম সাড়ম্বর শুরু আর গদ্যচর্চার অন্যতম অর্থ জীবনচর্চা। জীবনের যে সত্যকে প্রকাশ করার জন্য ভাবালু ও ছন্দোবদ্ধ কবিতা অচল, সেই সরল ও ঋজুসত্যকে প্রকাশ করতে পারে গদ্যই। প্রতিদিনের ব্যবহারের-কথাবার্তার মধ্যে যে গদ্য সজীব ও প্রাণবান, শুধু লিখিত রূপের অভাবেই তার শক্তি সম্বন্ধে আমরা ছিলাম নীরব ও উদ্যমহীন। গদ্যকে সাহিত্যের ছাড়পত্র দেবার জন্য ইংরেজের যে সংঘবদ্ধ উদ্যোগ দেখেছি, তার মাধ্যমে ইংরেজী সভ্যতার স্বরূপ চিনে নিতে সাধারণ মানুষও ভুল করে নি—এর অনেক সমর্থনই দেখানো যায় সে যুগের উদাহরণ থেকে। গদ্যরচনা ও গদ্যপঠনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য ও জীবনের ওতপ্রোত সম্বন্ধটি আমরা চিনে নিলাম, জীবনের যেন একটা প্রচণ্ড অভাবের পূরণ ঘটল।

১৮০১ সালে রামরাম বসুর প্রথম গদ্যরচনার সূত্রপাত "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" রচনার মাধ্যমে। শুধু তাই নয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বেতনভোগী পণ্ডিতসম্প্রদায়ের প্রত্যেকেই কিছু না কিছু গদ্য রচনা না করে পারেন নি—সেটা খানিকটা নতুন ভাবধারার প্রেরণায়, কিছুটা প্রয়োজনে। উন্মুখ ও রসগ্রাহী ছাত্র সম্প্রদায়ের সামনে তাদের কিছু বলতেই হোত যেহেতু তাঁরা শিক্ষক। সুতরাং ক্ষমতা অক্ষমতার প্রশ্ন ওঠে না, ভালমন্দ বিচার নিরর্থক হয়ে পড়ে। তাছাড়া পৃষ্ঠ-পোষক ইংরাজদের একটা চূড়ান্ত নেশার মত পেয়ে বসেছিল এই নতুন প্রচেষ্টা; রাজ্যস্থাপনের বনিয়াদ দৃঢ় করার জন্য এদেশবাসীর দৈনন্দিন ভাষার সঙ্গে সুদৃঢ় পরিচিতি দরকার; তার জন্য সত্যিকারের আন্তরিকতার অভাব দেখা যায় নি। কেরীর নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ না করে অন্ততঃ বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস লেখা যাবে না কোনদিন। বিদেশী এই সব মহানুভব রাজকর্মচারীদের সঙ্গে আমাদের জাতীয়জীবনের নবজাগরণের অলক্ষ্য যোগ রয়ে গেছে,—সেটা দ্বিধাহীন সত্য।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্যচর্চার দ্রুত প্রসার সম্ভব হয়েছিল নানা কারণে,—তার মধ্যে উল্লেখযোগ্যটি হচ্ছে মুদ্রণ সৌভাগ্যলাভ। রামরাম বসুর "রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র" প্রথম মৌলিক গদ্যরচনা যা মুদ্রিত হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। সেই সঙ্গে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতসম্প্রদায় গদ্য রচনার প্রেরণা

ও উৎসাহ লাভ করেছেন।—শাসক সম্প্রদায়ের অর্থানুকূল্য ও আন্তরিকতায় বাংলাদেশের প্রথম গদ্যরচনাকার গোষ্ঠী হয়ত বিস্মিতও হয়েছিলেন। রচনার অভিনবত্বের দিকে দৃষ্টি দেবার সময় তখন কোথায়? হাতের কাছে যা এসেছে সানন্দে ও সাগ্রহে ইংরাজ প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের বিদেশী কর্তৃপক্ষ তা ছেপেছেন,—পঠন ও পাঠনের সুযোগের দিকে লক্ষ্য রেখে। জাতির জীবনে এই হঠাৎ পাওয়া পৃষ্ঠপোষকতায় এক যুগান্তকারী আশীর্বাদের বন্যার মত ভাসিয়ে দিয়ে গেছে আমাদের জীবন, তার উর্বরা পলিতেই ভবিষ্যতের সাহিত্য মহীরুহ পেয়েছে বাঁচার উপকরণ। ১৮০০ শতাব্দীর সেই মহৎপ্রাণ বিদেশীদের প্রণাম না জানালে সত্যের অপলাপ হয়—মহতের মাহাত্ম্য অনির্ণীত থেকে যায়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সেই শুভপ্রচেষ্টা ও বাঙ্গালীর নতুন জীবনচেতনা—একই সঙ্গে এদের যোগাযোগ বিচার করতে হবে।

সেই সময়কার গদ্য সাহিত্যের মধ্যে জাতীয়চেতনার সূত্রপাত অনুসন্ধান করতে গেলে সে যুগের সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে হবে; —কিন্তু তার চেয়েও বেশী করে অনুধাবন করতে হবে সেই সময়ের শিক্ষাব্যবস্থার অগ্রগতির ইতিহাসটুকু। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্যসাহিত্য স্রষ্টাদের মধ্যে সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় যতটুকু পেয়েছি তার চেয়েও বেশী করে পেয়েছি তাঁদের পণ্ডিতী প্রতিভা। তাঁরা সাহিত্যস্রষ্টা—একথার চেয়ে তাঁরা সাহিত্য শিক্ষক একথা অনেক বেশী অর্থবহ। গদ্য সাহিত্যের বিরাট দুর্ভিক্ষের ক্ষুধা মেটাতেই তাঁরা লেখনী ধরেছেন—শিক্ষক হয়েছেন সাহিত্যিক। তাই এঁদের সাহিত্যসম্ভার নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই দেখতে পাই সৃজনী ক্ষমতার চেয়ে শিক্ষাদান প্রবণতাই এঁদের মধ্যে বেশী। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহিত্যকে একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়;—রচনার উৎস সন্ধান করলে দেখা যাবে, তাতে রয়েছে—

(১) পাঠ্যপুস্তক—উপদেশ সম্বলিত কাহিনী রচনা।

(২) খুব বেশীদিনের ইতিহাস নয়—এমন ঐতিহাসিক চরিত্র থেকে রচনার উপাদান বেছে নেওয়া।

(৩) রাজবংশের ধারাবাহিক বিবরণের মধ্যে ইতিহাস রচনার উপাদান আবিষ্কার করা।

(৪) অভিধান রচনা।

যে সমস্ত পণ্ডিতের রচনায় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজীয় সাহিত্য গড়ে উঠেছে—এঁদের সকলের প্রবণতার মধ্যে একটা মোটামুটি রকমের সঙ্গতি আছে। প্রথমেই

রামরাম বসুর প্রতাপাদিত্য চরিত্র ও রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়ের মহারাজ 'কৃষ্ণচন্দ্র রায়ের জীবন চরিত্র' নিয়ে আলোচনা করা যাক। এঁরা দুজনেই প্রায় একই ধারণা থেকে উপরোক্ত গ্রন্থ দুটি রচনার প্রেরণা পেয়েছেন,—উদ্দেশ্যও প্রায় একই। স্বজাতীয় চরিত্রের মধ্যে আপন ঐতিহ্যের অনুসন্ধান করার এই প্রবণতাটি বিশেষ ভাবে লক্ষ্যণীয়। রাজা প্রতাপাদিত্য বাংলার এক উল্লেখযোগ্য জাতীয় চরিত্র—বাঙ্গালী হিসেবে রামরাম বসু এ সত্যটি উপলব্ধি করেছেন—সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। প্রতাপাদিত্য রচনার পশ্চাতে রামরাম বসুর এই প্রবণতার মূল্যটি অন্ততঃ সে যুগের পটভূমিকায় অপরিসীম বলা চলে। কিন্তু গ্রন্থটির মূল্যবিচারে দেখা যাবে, আর কোন উল্লেখযোগ্য বিষয়ের অবতারণা নেই। প্রতাপাদিত্যের অপরিসীম প্রতাপ কিংবা নির্ভেজাল স্বদেশপ্রেম কোনটিই গ্রন্থে নেই,—শুধু গতানুগতিক বিবরণ ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন সত্যের স্বাক্ষর নেই,—জাতীয়তা কিংবা স্বাধীনতার কোন স্বপ্ন ভুলেও আত্মপ্রকাশ করে নি—এটাই আশ্চর্য। অথচ সত্য হোক, মিথ্যাই হোক, প্রতাপাদিত্য বাংলাদেশে স্বাধীনতার পূজারী বলেই আদৃত হয়েছিলেন।—পল্লী বাংলার গ্রামে গ্রামে প্রতাপাদিত্য বীরপুরুষ বলেই প্রসিদ্ধ। সুতরাং প্রতাপাদিত্য চরিত্র ব্যাখ্যায় শুধু বিষয় নির্বাচন ছাড়া আর অন্য কোন কৃতিত্ব রামরাম বসুর নেই। শুধু তাই নয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের যে ছাত্র সম্প্রদায় পাঠ গ্রহণ করেছে তারা অন্ততঃ এ গ্রন্থ থেকে কোন নতুন চেতনা লাভ করে নি। আর লক্ষ্যণীয় এই যে প্রতাপাদিত্য রচনা করতে বসে রামরাম ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা দিয়েছেন।—সম্রাট আকবরবিদ্বেষী বাংলার নবাব দাউদের প্রসঙ্গে পঞ্চমুখ হয়েছেন তিনি,—দাউদের উক্তিই তার প্রমাণ···এখন আমার সামন্ত প্রচুর দিল্লীতে আমার কর দেওনের আবশ্যক নাই ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ এবং আর কতক অর্থ সঞ্চয় করিতে পারিলে তাহা দিয়া সেনা রাখিব তবে যদি দিল্লিপতি অন্যায় করিতে প্রবর্ত্ত হন আমিও তদনুযায়ী করিলে ক্ষেতি কি।

স্বাধীন চেতনার যে স্তিমিত প্রকাশ তা দাউদ প্রসঙ্গেই, প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে এই দৃঢ়তা নেই। উপরন্তু আত্মগোপন কালে দাউদের ভৃত্য তাকে সংবাদ দিচ্ছে—এক্ষণ সটের কাল পড়িয়াছে—তাহাতে তাহারা হিন্দুলোক অতি নষ্ট স্বভাব নিজে কর্ত্তৃত্ব ভার পাইলে এক্ষণকার সহিত আর বিষয় কি"।[২]

প্রতাপাদিত্য চরিত্র রচনায় রামরাম বসুর ঐতিহাসিক নিষ্ঠার সঙ্গে বাঙ্গালীপ্রীতির সংকীর্ণতা নেই ;—একে হয়ত উদারতা বলে অভিনন্দিত করতে পারি কিন্তু জাতীয়

২. রাম রাম বসু, রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র, শ্রীরামপুর, ১৮০২, পৃঃ—১৫

চেতনার ক্ষীণতম প্রয়াসও যে এযুগে ধরা পড়ে নি,—রামরাম বসুর "রাজাপ্রতাপাদিত্য চরিত্র" এর একটা প্রামাণ্য সাহিত্যিক নিদর্শন। বাঙ্গালীয়ানা—স্বাজাত্যবোধ জাতীয়চেতনা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র চিন্তাবোধ সে যুগের রচনায় দেখা যায় নি, তাহলে প্রতাপাদিত্য চরিত্র প্রসঙ্গে অন্ততঃ সেই নিভৃত চিন্তাধারা স্ফীত হয়ে উঠত। জাতীয় চরিত্রের প্রতি বিন্দুমাত্র সচেতনতা অলক্ষ্যে প্রতাপাদিত্য চরিত্রের মুখ্যভিত্তি গঠন করতে পারত। কিন্তু প্রতাপাদিত্য চরিত্র একটা ঐতিহাসিক সামন্ত চরিত্র, এর বেশী কোন কিছুই রামরাম বসু আবিষ্কার করতে পারেন নি।

এর সঙ্গেই যে গ্রন্থটির আলোচনা করতে হয় তা "মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং"।—বোধকরি, রামরাম বসুর "প্রতাপাদিত্য চরিত্র"ই এই গ্রন্থ রচনার প্রত্যক্ষ প্রেরণা দিয়াছে। রামরাম বসুর মত—"স্বশ্রেণী একই জাতি" বলেই মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়কেই উপযুক্ত চরিত্র বলে বেছে নিয়েছিলেন রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়। এবং একই জাতি ও বংশের এই চরিত্র রচনায় তিনি ছিলেন অতি আগ্রহী। তাঁর নিজস্ব ধারণার দর্পনেই চরিত্রাঙ্কন করে গেছেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র এবং তার পূর্ব-পুরুষদের। সমসাময়িক উদ্দীপনার চমৎকার ছাপ আছে গ্রন্থটিতে। ইংরেজ অধিকারের প্রথম পর্বে বাংলার সামাজিক অবস্থার সুন্দর বিবরণ পাওয়া যাবে গ্রন্থটিতে এবং তা প্রামাণ্যও বটে। মোঘলের অত্যাচারের সঙ্গে বাংলাদেশে বর্গীর অত্যাচার ও সন্ন্যাসীদের অত্যাচারের বর্ণনাও আছে,—সর্বোপরি আছে লেখকের দেশসচেতনতা—

এ দেশের উপর বুঝি ঈশ্বরের নিগ্রহ হইয়াছে নতুবা এককালীন এত হয় না প্রথম যিনি দেশাধিকারী ইঁহার সর্বদা পরানিষ্ট চিন্তা এবং যেখানে শুনেন সুন্দরী স্ত্রী আছে তাহা বলক্রমে গ্রহণ করেন এবং কিঞ্চিৎ অপরাধে জাতি প্রাণ নষ্ট করেন দ্বিতীয় বরগী আসিয়া দেশ লুট করে তাহাতে মনোযোগ নাই তৃতীয় সন্ন্যাসী আসিয়া যাহার উত্তম ঘর দেখে তাহাই ভাঙ্গিয়া কাষ্ঠ করে তাহা কেহ নিবারণ করে না অশেষ প্রকার এ দেশে উৎপাত হইয়াছে—[৩]

এই বর্ণনাটির বিশেষত্ব এই যে সমগ্র বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ অত্যাচারের একটি নিখুঁত ছবি এঁকেছেন লেখক অথচ এই অত্যাচার বর্ণনায় গতানুগতিক বিশ্বাসকেই প্রাধান্য দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না লেখকের। এ অত্যাচার যেমন ঈশ্বরের নিগ্রহে ঘটেছে তেমনি যে নতুন শাসক এদেশে শাসনের ভার গ্রহণ করেছেন তাতেও ঈশ্বরের অভিপ্রায়ই লক্ষ্য করেছেন লেখক। এর নাম অন্ততঃ সচেতন দেশপ্রীতি

৩. রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়—মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, কলিকাতা, ১৮০৫

নয়। বস্তুতঃ যে অনুভূতি অত্যাচারের প্রতিবাদে মুখর হতে চায়, উত্তেজনা সঞ্চারে সহায়তা করে, জনমত গঠন করে, আন্দোলন গড়ে তোলে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে সে চেতনাটুকু আবিষ্কার করা কোন মতেই সম্ভব নয়। এঁরা যুগসন্ধিক্ষণের নিষ্প্রাণ দ্রষ্টামাত্র,—ঘটনার স্রোতে এঁরাই তবু লক্ষ্যণীয় ব্যক্তিত্ব। স্বদেশচেতনার অস্পষ্ট আভাস এঁদের লেখায় মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু তাকে স্বদেশপ্রীতি বলে চেনাই যায় না। ইংরাজ অভ্যর্থনার এক সুন্দর উপায় গ্রন্থে সন্নিবেশিত করেছেন লেখক, বোধ করি ধন্য মনে করেছেন নিজেকে। রাজা যদি উৎপীড়ক হন প্রজা ও জমিদার উভয়ের পক্ষেই তা হয় অশুভ। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র মোঘল অত্যাচার প্রসঙ্গে বলেছেন—"দেশের কর্তা জবন থাকিলে কাহারু ধর্ম্ম থাকিবে না এবং জাতিও থাকিবে না অতএব ঈশ্বরের নিগ্রহ না হইলে এত উৎপাত হয় না" এবং এই অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য প্রার্থনা করছেন—"বিলাঁতে নিবাস জাতি ইঙ্গরাজ কলিকাতায় কোঠি করিয়া আছেন যদি তাঁহারা এ রাজ্যের রাজা হন তবে সকল মঙ্গল হবেক।[৪]

বলাবাহুল্য এই রাজপ্রশস্তির মধ্যে প্রভুভক্তির নিদর্শন যত প্রকট ততই অনাবৃত। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র প্রসঙ্গে এই ধরণের উক্তির মধ্যে কৃষ্ণচন্দ্র চরিত্রকে অন্ততঃ ইংরাজ প্রভুদের চক্ষে মহান করে তোলার বাসনা সুপ্ত ছিল। কিন্তু তা নিরাবরণ প্রশস্তির মতই শুনিয়েছে।

এই দুটি গ্রন্থের মধ্যে সে যুগের চরিত্র অঙ্কন প্রচেষ্টার একটা সযত্ন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সেই সঙ্গে সে যুগের সাহিত্যস্রষ্টাদের রাজনৈতিক চেতনার অস্পষ্ট ও আনুমানিক পরিচয়ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজা প্রতাপাদিত্য ও রাজা কৃষ্ণচন্দ্র—দুজন সম্পূর্ণ বাঙ্গালী চরিত্র এই সময়ে সাহিত্যিক কল্পনাকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন—এটুকুই সান্ত্বনা। জাতীয় চরিত্রকে জনগণের সামনে তুলে ধরার প্রচেষ্টা—তা যতই অসফল হোক তা সাধু প্রচেষ্টা সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের সাহিত্যসম্ভারে দুটি সম্পূর্ণ বাঙ্গালী চরিত্র দুটি গ্রন্থের নায়ক পদে উন্নীত হয়েছিলেন—এটা জাতীয় চরিত্রেরই প্রতিষ্ঠা। বিদেশী ছাত্রদের সামনে বলার মত অন্ততঃ দুটি চরিত্রও আমাদের মধ্যে ছিল একথা রামরাম ও রাজীবলোচন সপ্রমাণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে এটাই সবচেয়ে বড়ো কথা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ মুহূর্তে বাঙ্গালী জাতিহিসেবে সংঘবদ্ধ ও ঐক্যবদ্ধ হতে শেখেনি, কিন্তু একতা ও সম্মিলনের একটা স্পষ্ট ধারণা তাদের মধ্যে তখনও ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র

৪. রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রায়স্য চরিত্রং, কলিকাতা, ১৮০৫

যখন যবন অত্যাচারের কথা চিন্তা করছেন তখন তাঁকে বলতে শুনি—ধর্ম ও জাতির কথা। এই চিন্তা পরোক্ষভাবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির প্রসঙ্গেই, যে জাতি যবন সম্প্রদায়ের সঙ্গে কোনদিনই সম্মিলিত হতে পারবে না এবং যাদের ধর্মবোধ পৃথক। এই ধর্ম ও জাতির জন্য ভাবনা পরোক্ষভাবে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির জন্যই চিন্তা। যতই অস্পষ্ট হোক না কেন—সেই সময়েই জাতি ও ধর্ম সম্বন্ধে আমাদের চেতনা স্পষ্ট হতে চলেছে। তাই দেখি, এর পরের পর্যায়ে বাংলাদেশে যত আন্দোলন সবই ধর্মকেন্দ্রিক। ধর্ম ও জাতির মধ্যে যে গভীর যোগ, আন্দোলনের মাধ্যমে সেই যোগ হয়েছে আরও গভীরতর ও সুদৃঢ়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতসম্প্রদায় সে যুগের সমস্ত রাজনৈতিক কারণের সঙ্গেও জড়িয়ে পড়েছিলেন। দেশের প্রধান প্রধান আন্দোলনে তাঁরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে সতীদাহ প্রথার কথা উল্লেখ করতে হয়। রামমোহনেরও বহু আগে রামরাম বসুর মধ্যে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধতা ও সতীদাহ প্রথার সমর্থনের অভাব দেখি—তবে রামমোহনের মত প্রচণ্ড প্রতিভা ও দুরন্ত সংস্কারব্রত রামরামে ছিল না। রামমোহন যা আদর্শ বলে সংগ্রাম হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন রামরাম বসু তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামান নি। রামমোহনের সতীদাহ প্রথার পক্ষে রায় দিয়েছিলেন মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার। ১৮১৭ খ্রীঃ সহমরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মতামত ব্যাখ্যা করতে অনুরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুঞ্জয় বলেছিলেন—

"চিতারোহন অপরিহার্য নয়,—ইচ্ছাধীন বিষয়মাত্র। অনুগমন এবং ধর্মজীবন যাপন এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সংকল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্তে না।"[৫] বিপক্ষে ছিলেন তারিণীচরণ মিত্র। ধর্মসভা স্থাপন করে দেশব্যাপী কুসংস্কারের স্বপক্ষে বলার মত মানুষও সে যুগে অজস্র ছিল;—তারিণীচরণ ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষক হয়েও দেশীয় কুসংস্কারকেই বড়ো বলে মনে করেছিলেন। সুতরাং মতবাদের বিভিন্নতা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা সে যুগে সকলেরই ছিল—ইংরাজী সভ্যতার প্রভাবেই কুসংস্কার মুক্তি এসেছে—এ ধারণা ভুল।

দেশের মধ্যে জাগরণ বন্যার প্রথম উষালগ্নে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের শিক্ষকবৃন্দ ছিলেন প্রথম সচেতন যাত্রী। শিক্ষাদানব্রত গ্রহণ করে তাঁরা ইংরাজের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন, কিন্তু নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও চেতনার দাবী ছিল

৫. সাহিত্য সাধক চরিতমালা। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার থেকে উদ্ধৃত।

সকলের আগে। ইংরেজী শিখেও তাঁরা মাতৃভাষার দাবীকেই বড়ো বলে মনে করেছেন, নিজস্ব ধর্ম ও বিশ্বাসের মর্যাদা রেখে গেছেন।

মাতৃভাষার পঠন ও পাঠনের সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির সুপ্ত চেতনার জাগরণ ঘটেছিল,—রাজনৈতিক বা ধর্মকেন্দ্রিক, নৈতিক বা জাতীয় যে কোন আন্দোলনের তাৎপর্য বোঝাবার প্রধান সেতু হয়েছে মাতৃভাষা; মাতৃভাষার মাধ্যমেই ঘটনার গুরুত্বকে মর্যাদা দিতে এগিয়ে এসেছে জনগণ—হাত মিলিয়েছে, দাবী প্রতিষ্ঠার জন্য সমবেত হয়েছে। সভা সমিতি করে সমস্যার উপায় চিন্তা করতে শিখেছে,—এ সমস্তই সে যুগের অগ্রগতির ও চিন্তাধারার অভিনবত্ব।

মাতৃভাষা চর্চা ও ইংরাজী ভাষা শিক্ষা—একসঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের সমবেত অভিযান চলেছে সেই যুগের বাংলাদেশে। এই জাগরণ বন্যার মুহূর্তে প্রতিটি মানুষ সচেতন। অবশ্য সদ্যসৃষ্ট নগরীতে এই জাগরণ লক্ষণ যত সুস্পষ্ট পল্লীগ্রামে তা ছিল না। তাহলেও বাংলার প্রাণকেন্দ্র হিসেবে কলকাতার প্রতিষ্ঠাপর্ব প্রায় সমাপ্তির পথে;—দেশের সমস্ত ধনী সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়েছে কলকাতার ওপরে, শিক্ষাদীক্ষা রুজি-রোজগারের আশায় দলে দলে মানুষ চলে আসছে কলকাতায়।—এক আশ্চর্য নগরী এই কলকাতা; বাংলার জাগরণের সঙ্গে জন্মসূত্রেই জড়িত এই নগরী—যার পরিকল্পনা ও সম্ভাবনার ছবি দেখেছিল বিদেশী ইংরাজ, যাদের দূরদৃষ্টিকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। ঐতিহাসিকের ব্যাখ্যায় এর পরিচিতি—"Bengal had been despised and thrown into a corner in the Vedic as the land of birds (and not of men), in the epic age as outside the regions hallowed by the feet of the wandering Pandava brothers and in the Moghal times as, 'a hell well stocked with bread'. But now under the impact of the British Civilisation it became a path finder and a light bringer to the rest of India."[৬]

এই বাংলাদেশের সমস্ত পরিচয় একনিমেষেই যাওয়া যাবে শুধু কলকাতার ইতিহাস আলোচনা করলেই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, স্কুল বুক সোসাইটি, ওদিকে ধর্ম্মসভা, বড় বড় রাজা মহারাজাদের প্রাসাদ গড়ে উঠেছে কলকাতাতেই। নানা ধরণের অভিনব অভিজ্ঞতায় নাগরিক সম্প্রদায় তখন প্রায় ভরপূর বললেই চলে। ঠিক এমন সময়েই রামমোহন যাওয়া আসা করছেন কলকাতায় এবং সরকারী কর্ম পরিত্যাগ করে পৈত্রিক গ্রামে গিয়ে ধর্মমতের নব্য ব্যাখ্যা শুরু করলেন তিনি। অবশ্যম্ভাবী

৬. Jadunath Sarkar, History of Bengal (Vol. II) Dacca, 1938. P—498.

মনান্তরের ফলে স্থির করলেন—স্থায়ী বাসভবন নির্মাণ করবেন কলকাতাতেই—সেই স্মরণীয় সালটি ১৮১৪।

রামমোহন ও বাংলাদেশের নবজাগরণের মুহূর্তরূপী ১৮১৪ সাল নানাকারণে উল্লেখযোগ্য। রামমোহন ও সেযুগের বাংলাদেশের মধ্যে যে গভীর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তা এই সময় থেকেই।

রামমোহনকে আদর্শ বাঙ্গালী বলে আমরা যে গর্ববোধ করতে শুরু করেছি তা খুব বেশী দিনের কথা নয়। রামমোহন তাঁর দেশবাসীর জন্য কি করেছিলেন তার আলোচনা হয়েছে রামমোহনের তিরোভাবেরও বহু পরে। মহামানবদের জীবনে এ ধরণের পরীক্ষা বহুবারই হয়ে গেছে, তাঁরা দেশের জন্য, জাতির জন্য যে চরম নিষ্ঠা ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখে যান, ভ্রান্ত জাতি সেই মুহূর্তে তাকে মেনে নিতে—চিনে নিতে পারে না। সাধারণ মানুষের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা সীমিত, সুবিশাল ও প্রচণ্ড ধারণাকে তারা বুঝতে পারে না। রামমোহন এসেছিলেন অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে কিন্তু জাতির সঙ্গে তার জীবনানুভূতির কী প্রচণ্ড পার্থক্যই না ছিল। তাঁর অনেক চিন্তাধারাই প্রমাণ করেছে—তিনি বৈপ্লবিক শতাব্দীর যুগচিহ্ন ধারণ করে অপ্রস্তুত দেশবাসীর কাছে অনেক আগেই আত্মপ্রকাশ করে ফেলেছেন। অন্ততঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন মানুষ বলে চিনে নেবার আগে আমরা থমকে দাঁড়াই।—রামমোহন তাঁর সমসাময়িক যুগের একটা বিরাট ব্যতিক্রম; কি চিন্তাধারায়, কি ক্রিয়াকলাপে, কি আদর্শে, কি বক্তব্যে। যুগের সঙ্গে প্রথম থেকেই অসহযোগ পালন করে গেছেন তিনি,—আমরণ ছিল তাঁর এই ব্রত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের—বাংলাদেশ যেন শেষরাতের নিদ্রার আলস্যে মুহ্যমান;—সাহিত্যচেষ্টায়-জীবনযাত্রায় একটা প্রচণ্ড ফাঁকি যেন সমাজের শতছিদ্র ক্ষুদ্রতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করছে। শিক্ষাদীক্ষা ও কর্মক্ষেত্রের মধ্যে সে এক বিরাট অসঙ্গতি;—পুরোন যা কিছু তার বাঁধন গেছে আলগা হয়ে অথচ নতুন কিছু নিশানা পাওয়া যাচ্ছে না। সাহিত্যের আসরে নেমে এসেছেন কবিওয়ালারা।—আখড়াই—হাফ আখড়াই—টপ্পা খেউড়ে বাংলার আকাশ বাতাস মুখরিত। অথচ জানি, এর মধ্যে স্থিতি নেই,—সত্য সম্ভাবনার কোন ইঙ্গিত নেই। তখনও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে শিক্ষা-সংস্কৃতির নব্য চর্চা শুরু হয় নি,—বাংলাদেশের কোণে কোণে তখন পূজাপার্বণের অছিলায় শুধু অহেতুক মাতামাতি চলছে। রামমোহনের জন্ম এই আবছা আলোর সঙ্গমে কিন্তু কুয়াসা ভেদ করেও তাঁর স্বচ্ছদৃষ্টি প্রবেশ করেছে আরও গভীরে। মজ্জাগত শক্তি নিয়েই এই চিন্তানায়ক বিপ্লবী মানুষটির আবির্ভাব ঘটেছিল। এই বিপ্লবের দীক্ষা তিনি পেয়েছিলেন আন্তরশক্তির কাছে,

—কিংবা এই চেতনার উত্তরাধিকার তাঁর সহজাত শক্তির কাছেই পাওয়া। রামমোহনের জীবনের সত্যচেতনার মূল্যায়ন করলে সেই অত্যাশ্চর্য শক্তিগুলির পরিচয় পাওয়া কঠিন হবে না।

রামমোহনের অনন্যসাধারণ প্রতিভার সম্যক বিচার আমার উদ্দেশ্য নয়—কিন্তু যুগাতিক্রান্তী যে বৈপ্লবিক প্রতিভার স্ফুরণ তার চরিত্রে দেখেছি—তার আলোচনা না করলে নয়। স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে স্বদেশকে তিনি প্রত্যক্ষ করলেন এক গভীরতর দুর্যোগের মধ্যে। প্রাচীন ঐশ্বর্যের ভগ্নাবশেষ ধারণ করে মুহ্যমান এই দেশ রামমোহনের মনে এক গভীর আলোড়ন জাগিয়ে তুলল। পথভ্রান্ত-আদর্শচ্যুত-চেতনাশূন্য এক নিঃসম্বল জাতির সামনে তাঁর সর্বপ্রথম কর্তব্য যে কী হবে রামমোহন প্রথমে তা ঠিক করতেই পারলেন না। ধর্ম, রাজনীতি, সমাজনীতি কিংবা ইংরাজতোষণ এর কোন্‌টিকে তিনি বেছে নেবেন সেই সমস্যায় হলেন বিব্রত। রামমোহন তাঁর কর্মজীবনের যাত্রা শুরু করতে আর দেরী করলেন না। অমিত উদ্যম নিয়ে এই শক্তিমান পুরুষ বেছে নিলেন চিরন্তন বিপ্লবীর পথ—দেশের আহ্বানে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদারের উক্তিটি লক্ষণীয়—
A keen and mortifying feeling for it gave to the patriotic and humane heart of Rammohan the urge to launch his reforming or renaissant movements. He was also the truely nationalist mind in its broadest sense. It is true that he stood for the introduction of the new and enlightened ideas and ideals that brought in a new life in the west and raised the nation to the height of civilisation.[৭]......

রামমোহনের স্বদেশপ্রীতির যে মহান চেতনার দ্বারা আমরা প্রভাবিত, স্বদেশ-চিন্তনের যে স্বচ্ছ দৃষ্টির আলোকে আমরা আলোকিত, এখানে সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করব। লক্ষ্য করতে হবে, যে স্বদেশচেতনার দ্বারা রামমোহন স্বদেশউদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছেন—সেখানে তিনিই সর্বপ্রথম সচেতন পথিক। অষ্টাদশ শতাব্দীর ব্রাহ্ম মুহূর্তে কুয়াশাচ্ছন্ন বাংলাদেশের তিনিই সর্বপ্রথম স্বাধীনমনা বাঙ্গালী পুরুষ, প্রথম উষালগ্নের জ্যোতির্ময় সূর্যালোক। তাঁর জীবনে অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটেছে অনেক;—মহাপুরুষদের জীবনীতেই এই ঘটনাবলীর সাক্ষাৎ মেলে। অপরিসীম মেধা ও দুরন্ত

৭. Jatindra Kumar Majumdar, Raja Rammohan Roy and Progressive Movements in India. A Selection from Records (1775—1845) Calcutta—1941—Preface.

অনুসন্ধিৎসা বালক রামমোহনের চরিত্রে এনে দিয়েছে দৃঢ়তা। ১৬ বৎসর বয়সেই পিতার সঙ্গে মতান্তরের ফলে তিনি গৃহত্যাগ করে চলে যান তিব্বতে;—অনেকে এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন রামমোহনের মতবাদকে ভিত্তি করেই। তাঁদের মতে বিদেশীয় অধিকারের প্রতি ঘৃণাবশতঃই তাঁর ভারতত্যাগ। কিন্তু তাঁর জীবনের অন্যান্য সমসাময়িক ঘটনা থেকেই প্রমাণ করা যায় যে, বিদেশাগত প্রভুর প্রতি তাঁর আন্তরিক ঘৃণা সত্যি সত্যি জাগবার মত কোনো কারণ তখনও ঘটে নি, কিন্তু ধর্ম সম্বন্ধীয় নানা প্রশ্ন তখনই তাঁর মনকে ব্যাকুল করে তুলেছিল।—তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের একটা সার্বিক পরিচয় পেলেন কিন্তু মানসিক ব্যাকুলতার তৃপ্তি হল না। রামমোহনের স্বদেশপ্রীতির জলন্ত অধ্যায়রূপে এই তিব্বত গমনকে বড়ো করে দেখার কোন কারণই নেই;—আর পরজাতিপ্রভুত্ব স্বীকারের প্রতি যদি প্রথমেই এতটা বিদ্রোহী হতেন তবে আমরা বিরাট রামমোহনের অসংখ্য কীর্তিকলাপের পরিচয় পেতাম না। রামমোহনের মধ্যে স্বজাতি-প্রীতির যে ঘনীভূত রূপ ও আন্তরগভীর সহানুভূতির পরিচর পেয়েছি তার সূচনা আরও অনেক পরেই ঘটেছে। রামমোহন কার্যোপলক্ষে ইংরাজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন, শুধু তাই নয়, ইংরাজীভাষা শিক্ষা করে পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে নিবিড় পরিচয় লাভ করেছেন;—রামমোহনের স্বদেশপ্রেমের স্ফুরণ ঘটেছে এই সময়েই। বাংলাদেশের সত্যকারের সমস্যা তখন ধর্মকেন্দ্রিক সমস্যা। ইংরাজ পাদ্রীদের খৃষ্টান ধর্ম প্রচারের মুহূর্ত সেটি, সেই সঙ্গে সনাতন হিন্দুধর্মের নানা দোষত্রুটি নিয়ে রামমোহন বাংলাদেশে প্রচণ্ড সোরগোল তুললেন। যে ধর্মকে তিনি আজন্ম ধরে দেখে আসছেন তার অনেক ত্রুটিবিচ্যুতির ইতিহাস খুঁজতে খুঁজতে নতুনতর ব্যাখ্যা আবিষ্কার করলেন, এবং সুদৃঢ় এই স্ব-মত প্রতিষ্ঠার জন্য করলেন চূড়ান্ত প্রতিজ্ঞা। সমস্ত বাংলাদেশের বুকে সে এক চরম উত্তেজনালগ্ন; রামমোহন বাংলাদেশে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন। রামমোহনের ধর্মান্দোলনের কতগুলি সুদূরপ্রসারী ভিত্তির কথাই এখানে আলোচনা করব,—পরবর্তী জাতীয় ইতিহাসে এই ভিত্তিমূলই কার্যকরী হয়েছিল সকলের আগে।

রামমোহনের ধর্মান্দোলনের ফলেই জাতীয়তার-স্বধর্মের-স্বসমাজের প্রতি আস্থা ও অনাস্থার প্রশ্ন বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল সাধারণ-অসাধারণ সকল মানুষের মধ্যেই। ধর্ম, যা জীবনের প্রতিক্ষেত্রের-প্রতিদিনের-প্রতিজনের স্বার্থ সম্পর্কিত বস্তু, তার মধ্যে প্রতিবাদের বিন্দুমাত্র স্পর্শ মানুষকে বিচলিত করে।—সে যুগে বাঙ্গালীও ধর্মের নতুনতর ব্যাখ্যায় বিচলিত হয়েছিল।—ধর্মান্দোলনের মধ্যেই আমরা দেখেছিলাম স্বার্থরক্ষার প্রধানতম প্রশ্নটিকে। ধর্মান্দোলন পরোক্ষভাবে জাতীয় চেতনারই সংবদ্ধ আর্তি। রামমোহন সেযুগের জাতীয় চেতনাকে আঘাত করে পরোক্ষভাবে দেশের

এক বিরাট অন্ধতার মূলেই আঘাত করেছিলেন—উত্তেজিত করেছিলেন—সংঘবদ্ধ করেছিলেন। এ আন্দোলন চেতনা-সৃষ্টিকারী প্রথম জাতীয় আন্দোলন—সচেতন ঐক্যবদ্ধ জীবনান্দোলন।

রামমোহন বাঙ্গলাদেশের প্রথম আন্দোলনস্রষ্টা বাঙ্গালী। যে বলিষ্ঠ চিন্তা ও সুদৃঢ় আদর্শ মানুষকে কর্তব্যে অবিচল ও নির্ভীকতায় সাহসী করে তোলে রামমোহনের মধ্যে তারই ছায়াপাত। সুতরাং ধর্মান্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে রামমোহন স্বীয় আসনটি প্রতিষ্ঠিত করেছেন ;—শুধু বাংলা কেন, বাংলার বাইরে সুদূর দিল্লীর তখ্‌তের অধিকারী তৎকালীন মুঘলসম্রাটের কানেও এই আন্দোলনসৃষ্টিকারী নেতার সংবাদ পৌঁছেছিল।—তেজস্বী এই জননায়ককে দূতপদে বরণ করার পরিকল্পনা করেছিলেন তাঁরাই। আবার খ্রীষ্টানসমাজেও ধর্মান্দোলন স্রষ্টা রামমোহন চিহ্নিত হয়েছিলেন আপন মহিমায়।—বীর্যে ও গরিমায় এমন একজন বাঙ্গালী সেদিন সমগ্র দেশকে সচকিত করেছিলেন,—সকলের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রমে ধন্য হয়েছিলেন।

অসংখ্য ক্রিয়াকলাপের মধ্যেও রামমোহনের চরিত্রে দেখা গিয়েছিল কতকগুলি বিশেষ চেতনা—যা একান্ত তাঁরই। স্পর্ধাতীত শক্তিতে তিনি সে যুগের মুখপাত্র রূপে যে চিঠিপত্র রচনা করেছেন,—যে কোন ভারতীয়ের পক্ষে বিদেশীয় প্রভুর দরবারে তা দাখিল করার কথা ছিল প্রায় অচিন্ত্যনীয় ; কিন্তু স্বপ্রতিষ্ঠ ও মহিমা-ভাস্বর রামমোহন তা সহজেই পেরেছেন। ধর্মান্দোলনের বাইরেও দেশের কথা, স্বাধীনতার কথা,—নিপীড়িত মানবাত্মার কথা তিনি কত গভীরভাবে চিন্তা করেছিলেন, তার অজস্র প্রমাণ ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। দুঃখের বিষয় তাঁর বক্তব্যের কথা সেযুগের বাঙ্গালীর কানে পৌঁছয়নি। ইংরাজীতে রচিত অসংখ্য চিঠিপত্রে তাঁর স্বদেশপ্রেমিক যে আত্মাটির পরিচয় ছড়িয়ে আছে—রচনাসামর্থ্যে ও প্রকাশ-চাতুর্যে তা সত্যিই অতুলনীয়। সামাজিক বিধিবিধান, ক্ষমতারক্ষার চেষ্টায় তিনি ছিলেন অগ্রসর। সে যুগের দ্বিধাগ্রস্ত-আদর্শবিহীন জাতির কাছে তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট ছিল না—তাই রামমোহনকে স্বধর্মবিরোধী বলেই বিচার করা হয়েছে।—ধর্মান্দোলনের বাইরে যে সুবিশাল কর্তব্যক্ষেত্রে তিনি প্রবেশ করেছিলেন—সাধারণ মানুষ সে খবর রাখেনি।

রামমোহন প্রথম এক সচেতন ও শিক্ষিত বাঙ্গালী আধুনিকতার হৃদস্পন্দনে যিনি আন্দোলিত-বিচলিত হয়েছিলেন।—যে-কোন আন্দোলনের পথ ধরে জাতির সামনে তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠা করার আদর্শে তিনি অবিচল ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছেন।

রামমোহনের কর্মজীবনের প্রধান প্রধান কার্য্যাবলীর দিক নির্ণয় করলে দেখা

যাবে—নানাধরণের আন্দোলনের সঙ্গেই তিনি যুক্ত ছিলেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নায়কী ভূমিকায়। ধর্মান্দোলন, রাজনীতি,—সমাজসংস্কার, শিক্ষাপ্রবর্তন—সর্বত্রই তিনি অবিসংবাদিত নায়ক। ধর্মান্দোলন থেকে শিক্ষা প্রবর্তনের প্রত্যেকটি ধাপেই রামমোহন এগিয়ে গেছেন—কিন্তু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, দেশপ্রীতির নিবিড় অনুরাগের আদর্শই তাঁকে সর্বত্র পরিচালিত করেছে। কোন ব্যক্তিকেন্দ্রিক উদ্দেশ্য সেখানে ছিল না। সেযুগের আকাশে বাতাসে নিন্দায় প্রশংসায় শুধু একটি নামের পতাকাই পত্‌পত্‌ করে উড়েছে—সে নাম রামমোহনের। তাঁর ধর্মান্দোলনের মধ্যে কয়েকটি বিষয় খুবই লক্ষ্যণীয়। সে যুগের প্রচলিত ধর্মবিশ্বাসকে সমালোচনা করে রামমোহন সনাতন হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠারই চেষ্টা করেছেন। তাঁর আলোচ্য বিষয় ছিল আমাদের ধর্মালোচনার আদি গ্রন্থগুলি।—বেদ-উপনিষদের মূল সত্যের অনুসন্ধান করে রামমোহন স্বধর্মচর্চার একটি বৈজ্ঞানিক পথ প্রদর্শন করেছিলেন। আমাদের প্রচলিত ধর্মের মূল উৎসগুলি তিনি যুক্তি ও তর্কের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন,—নিঃসন্দেহে এই প্রচেষ্টা অভিনব। যথার্থ স্বাদেশিকতা ও স্বধর্মনিষ্ঠা না থাকলে রামমোহন স্বীয় ধর্ম নিয়ে এত প্রতিকূল সংগ্রামে অবতীর্ণ হতেন না।—নিজের ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানকে পরিপূর্ণরূপে যাচাই করে নেওয়াই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। সেই হিসেবে রামমোহন এক অদ্বিতীয় কীর্তির অধিকারী। আমাদের ধর্মের আদি গ্রন্থগুলির চর্চা ও বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ হওয়ায় জনগণের মধ্যে এর প্রচার সম্ভব হয়েছিল। সুতরাং জাতীয়তা সৃষ্টির একটি প্রধান পথ রামমোহনই দেখিয়ে গেছেন। পরবর্তী যুগের কাছে রামমোহনের ধর্মান্দোলনের একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব দেখেছি—রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ পর্যায়ে। ধর্ম যে জাতীয় জীবনের এক সুদৃঢ় ভিত্তি,—জনগণ রামমোহনের যুগ থেকেই সে বিষয়ে অবহিত হয়েছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত বেদান্তগ্রন্থের প্রথমে উদ্দেশ্য বর্ণনা করে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হোত সেটি বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।—গ্রন্থের সত্যকারের উদ্দেশ্য বিজ্ঞাপনেই ব্যক্ত করা হয়েছে—"The Bengalee Translation of the Vedant or Resolution of all the Veds; The most celebrated and reserved work of Brahminical Theology, establishing the unity of The Supreme Being and that He is the only object of worship".[৮]

হিন্দুধর্মের "most celebrated and reserved work" হিসেবে তিনি বেদ বেদান্তকেই আমাদের সামনে উপস্থাপিত করেছেন, এর মধ্যে কোন অযৌক্তিক

৮. রামমোহন গ্রন্থাবলী—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বেদান্ত গ্রন্থের ভূমিকা।

আত্মবিলাস ছিল না। আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচণ্ড পাণ্ডিত্য ও যুক্তিনিষ্ঠার আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন রামমোহন—চিন্তাবিলাসের ফাঁপা বুদবুদ বলে যাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। পৌত্তলিকতা বিরোধী রামমোহন গভীর শাস্ত্রচর্চার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছেন,—সেজন্য খ্রীষ্টান ধর্মকেও সমালোচনা না করে পারেন নি। যুক্তি ও নিষ্ঠার অভাবে যখন সাধারণ হিন্দু অনায়াসেই খ্রীষ্টান হয়ে যাচ্ছিল, যুক্তিবাদী রামমোহন তখন গভীরভাবে তাঁর প্রশ্নানুসন্ধান করেছেন আদি শাস্ত্রগ্রন্থরাজির পাতায় পাতায়। অবশেষে দেখলেন, অবতারবাদকে নিন্দা করেও খ্রীষ্টানরা অবতার বাদী। তাঁদের মধ্যেও যিশু, মেরী অবতারবাদেরই নামান্তর। সে যুগের পটভূমিকায় শাসক সম্প্রদায়ের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে তাঁদেরই ধর্মমতকে নির্ভীক ভাবে সমালোচনা করেছেন তিনি। সুতরাং রামমোহনের ধর্মান্দোলন একটি নির্ভীক ও যুক্তিনির্ভর-আন্দোলন,—সে যুগের এই আন্দোলন বাঙ্গালী জাতির সামনে একটি জ্বলন্ত দৃষ্টান্তের মতো। আর সহস্র প্রতিকূলতার মধ্যেও রামমোহনের মতো নেতা স্বদেশে ও বিদেশে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন একথা পূর্বেই বলেছি।

ধর্মকে যদি রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত করে আলোচনা করা যায়—তবে দেখা যাবে রামমোহনের ধর্মসংস্কার আপাত অসম্পৃক্ত হলেও রাজনীতির সঙ্গে এর যোগ ছিলই। ধর্মান্দোলনের মধ্যে রামমোহনের যে নির্ভীক জাতীয়তাবোধের পরিচয় — রাজনীতির ক্ষেত্রেও সেই একই নির্ভীকতার প্রকাশ। ইংরেজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত রামমোহন স্বীয় মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হয়েছিলেন,—সেই স্বাভাবিক মর্যাদাজ্ঞান তাঁকে প্রয়োজনে নির্ভীক করেছে,—অন্যায়ের কাছে তিনি মাথা নত করেন নি কোনদিন। এ প্রসঙ্গে লর্ড মিণ্টোর কাছে পাঠানো তার প্রতিবাদ পত্রটি স্মরণীয়। ফ্রেডারিক হ্যামিলটনের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ বাঁধে এই পদমর্যাদা নিয়েই ;— বড়লাটের কাছে রামমোহন প্রতিকার চাইলেন— "It natives, therefore of caste and rank were to be subjected to treatment which must infallibly dishonour and degrade them, not only within the pale of their own religion and society, but also within the circle of the English societies of high respectability into which they have the honour of being most liberally and affably admitted, they would be virtually condemned to close confinement within their house from the dread of being assaulted in the streets with every species of ignominy and degradation".[৯]

৯. সাহিত্য সাধক চরিতমালা—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে উদ্ধৃত [রামমোহন রায়]

পত্রটিকে রামমোহনের প্রথম ইংরেজী রচনা বলে দাবী জানান হয়। এই ঘটনা থেকে দৃপ্ত ও নির্ভীক রামমোহনের পরিচয় মেলে। জাতির সামনে এধরণের নির্ভীক আত্মপ্রকাশ সেযুগে প্রায় অকল্পনীয় বলা চলে। দিল্লীর পাতশাহের তরফ থেকে যে আবেদনপত্র নিয়ে রামমোহন চতুর্থ জর্জের দরবারে পেশ করেন—সেটি তাঁরই রচনা। পরাধীনতার মর্মজ্বালা তাঁকে কিভাবে বিদ্ধ করেছিল পত্রটির মধ্যে তা অনাবৃতভাবে প্রকাশ পেয়েছে; ভারতের সহায়সম্বলহীন রাজবংশধরদের প্রাপ্য দাবী আদায়ের প্রসঙ্গে তিনি যা লিখছেন, একটি দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা হিসেবে পত্রটিকে অভিনন্দিত করা চলে।—পত্রারম্ভে তিনি বলেছেন—"I regret to find that the policy of the East India Company and its servants is calculated to deprive us of this consolatory prospect and I cannot but express my surprise at the boldness of the Court of Directors in even questioning the prerogative of the crown which has ever been the acknowledged fountain of honour...In disregarding this rule the Court of Directors have gone far beyond their servants in India, who only violated their pledge to a fallen monarchy. But the directors disregard the respect and allegiance due to their own sovereign though the actual head of a mighty empire".[১০]

আবেদনপত্র হিসেবেই শুধু নয়,—পরাধীন ভারতবাসীর পক্ষ থেকে রামমোহনের এক গভীর ও বেদনাসিক্ত অন্তরের ছবি এখানে ফুটে উঠেছে। বক্তব্যের স্পষ্টতায়, ভাষার গাম্ভীর্যে রামমোহনের এ ধরণের বহু পত্রই বিস্ময়কর স্বদেশপ্রীতির স্বাক্ষর স্বরূপ। এই গভীর স্বদেশানুরাগ তাঁর অন্তরেই জ্বলে উঠেছে কিন্তু কোন রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে তাঁর রূপদান ছিল প্রায় অসম্ভব। রামমোহন যে অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে যুগকে অতিক্রম করেছিলেন সেই পথে তিনি একান্তই নিঃসঙ্গ। জনগণের পক্ষ থেকে, তবু যখনই কোন প্রস্তাব এসেছে—রামমোহন সকলের আগে এগিয়ে গেছেন। Press Act সম্পর্কে রামমোহনই আবেদনপত্র রচনা করেছেন "A Free Press has never yet caused a revolution in any part of the world, because, while men can easily represent the grievances arising from the conduct of the local authorities to the Supreme Government, and thus get them redressed, the grounds of discontent that excite

১০. Quoted from "The Modern Review" 1929 (Jan—Feb)—Rammohan Roy's Political Mission to England.

revolution are removed; whereas, where no freedom of the Press existed and grievances consequently remained unrepresented and unredressed, innumerable revolutions have taken place in all parts of the globe or if prevented by the armed force of the Government, the people continued ready to insurrection".[১১]

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য এই দাবীর মধ্যে রামমোহন দেখেছিলেন ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা। সংবাদপত্রই যে একদিন মানুষকে সংঘবদ্ধ ও সচেতন করে তুলবে এ সত্য তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিলো। স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম ও সম্ভাবনার সমস্ত পথই রামমোহনের চিন্তাকে ভারাক্রান্ত করেছিল,—তাই আবেদনের ছত্রে ছত্রে তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার নির্ভীক আত্মপ্রকাশ।—তিনি আরও বলেছেন—It is well known that despotic Governments naturally desire the suppression of any freedom of expression which might tend to expose their acts to the obloquy which ever attends the exercise of tyranny or opression and the argument they constantly resort to, is that the spread of knowledge is dangerous to the existence of all legitimate authority.[১২]

প্রিভি কাউনসিলে রামমোহন ও তৎকালীন বাংলার মনীষীবৃন্দ প্রেস অ্যাক্টের বিরুদ্ধে লিখিত প্রতিবাদ পেশ করেছিলেন। জাতির জাগরণ বন্যার প্রয়োজনীয় পথ হিসেবে সংবাদপত্রের নির্ভীক মতামতের অপরিসীম মূল্য সম্বন্ধে রামমোহন ছিলেন সচেতন। প্রিভি কাউনসিলে রামমোহনের এই আপীলটি নাকচ হয়ে যায়। তবু ভগ্নমনোরথ না হয়ে দাবী রক্ষার পরবর্তী উপায় চিন্তা করতে লাগলেন তিনি। এ সম্বন্ধে মিঃ মনটাগোমারি মার্টিন বলছেন "But to no individual is the Indian Press under greater obligations than to the lamented Rammohan Roy and the munificent Dwarkanath Tagore".[১৩]

স্বদেশপ্রিয়তার এমন অনেক দৃষ্টান্ত থেকে হিতৈষী রামমোহনের স্বরূপ চিনে নিতে কষ্ট হয় না।

১১. J. C. Ghose, The English Works of Raja Rammohan Roy, Calcutta, 1901. Volume II P—305.

১২. Ibid, P—308.

১৩. Quoted from the Speech of Mr. Montgomery Martin, 'Rammohan Roy as a journalist'. The Modern Review May, 1931.

রাজা রামমোহন সংস্কারমুক্ত দ্রষ্টা ; - তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টি দিয়ে তিনি সে যুগের সমাজজীবন প্রত্যক্ষ করেছিলেন আর বিন্দুমাত্র করণীয় কর্তব্য বলে যা তাকে উদ্বুদ্ধ করেছে—তাতে নির্ভীকচিত্তে প্রবেশ করতে দ্বিধা করেন নি। রামমোহনের পরবর্তী যুগেও ইংরাজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি একটা অন্ধ আনুগত্য দেখেছি—কিন্তু গভীর স্বদেশচেতনা, ঐকান্তিক আদর্শবোধ রামমোহনকে কর্তব্যে স্থির করে রেখেছিল। সমাজ ও স্বদেশের প্রতি সুগভীর ভালবাসা না থাকলে রামমোহন অতি সহজেই ইংরাজ কৃপা লাভ করতে পারতেন—কিন্তু আগেই বলেছি যুগচিহ্নের সমস্ত লক্ষণকেই তিনি আপন স্বভাবে অতিক্রম করেছিলেন। স্বাধীনতার প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষাবোধকে ব্যাখ্যা করতে গেলে স্বীকার করতেই হয়, - পরবর্তীকালে যে চেতনার বিন্দুমাত্র স্পর্শ জনগণকে বিক্ষুব্ধ করেছিল—রামমোহন তারও বহু আগে নিঃসঙ্গভাবে সেই চেতনার অগ্নিতে দগ্ধ হয়েছেন। পত্র রচনার মধ্যে তাঁর সেই আর্তির এক ধূমায়িত আক্ষেপ জমে আছে। বাকিংহামের কাছে লেখা একটি পত্রে রামমোহন লিখছেন—"From the late unhappy news, I am obliged to conclude that I shall not live to see liberty universally restored to the nations of Europe, and Asiatic nations, especially those that are European Colonies, possessed of a greater degree of the same blessing than what they now enjoy...Enemies to liberty and friends to despotism have never been, and never will be, ultimately successful. (Aug. 11th 1821).[১৪]

এ ধরণের বহু ছিন্নপত্রে তাঁর স্বদেশচেতনার লিখিত প্রকাশ রয়েছে—শুধু ভাষার অন্তরালে তা আত্মগোপন করে রয়েছে।—বলা বাহুল্য, রামমোহনের পত্রসাহিত্য রচনার এই অচিন্ত্যনীয় ক্ষমতা সম্বন্ধে আমরাও এ যাবৎ অচেতন। কিন্তু বাংলা ভাষায় রচিত হলে এই বক্তব্যের প্রভাব থেকে আমরা দূরে সরে থাকতে পারতাম না। রামমোহনের বক্তব্য থেকে আমরা তদানীন্তন স্বদেশী আন্দোলনের বহু মূল্যবান প্রেরণাই পেতে পারতাম। অবশ্য সচেতনভাবে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনে রামমোহন কোনদিনই অংশ গ্রহণ করেন নি। সেই যুগে রাষ্ট্রীয় আন্দোলনের চিন্তাও ছিল প্রায় অসম্ভব। ধর্মান্দোলনের নেতৃত্ব নিয়ে ব্যস্ত সে যুগ। রামমোহন তারই অবসরে তাঁর রাষ্ট্রচেতনারও পরিচয় রেখে গেছেন।

ভারতবর্ষ ও এর সনাতন সভ্যতা রামমোহনকে চিরদিনই বিস্মিত করেছে—এর

১৪. J. C. Ghose, The English Works of Raja Rammohan Roy (Vol II) P—352.

প্রতি ছিল তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে তিনি ছিলেন নিঃসংশয় তবু আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে ভারতবর্ষকেও এগিয়ে যাবার পরামর্শ তিনিই দিয়েছেন সর্বাগ্রে। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর কলিকাতা টাউন হলের একটি সভাতে তিনি বলেছিলেন—"From my personal experience, I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in literary, social and political affairs".[১৫]

প্রাচ্যকে বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতির সঙ্গে তাল ফেলে চলতেই হবে।—সনাতন ভারতবর্ষের সমস্ত শক্তি সম্বন্ধে শ্রদ্ধান্বিত রামমোহনের এই দূরদৃষ্টির মূল্য অপরিসীম। এ সম্বন্ধে "নবযুগের বাংলা" গ্রন্থে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের বক্তব্যটি উল্লেখযোগ্য—"এত বড় একটা প্রাচীন জাতি এরূপ একটা সার্বজনীন ও উদার সভ্যতা ও সাধনার অধিকারী হইয়া জগতের বিশাল ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে না, এমন দুর্ঘটনা রাজার কল্পনাতেও স্থান পায় নাই। এই দিক দিয়া দেখিলে রাজা রামমোহনকে আমাদের বর্তমান রাষ্ট্রীয় আন্দোলনেরও প্রবর্তকরূপে প্রত্যক্ষ করি।"

রামমোহনও সে যুগের বাংলাদেশের একটা সম্মিলিত ধারণা পাওয়া যাবে এখানে। সেযুগে যে চিন্তাকে সাধারণের চিন্তা বলে গ্রহণ করা চলে না—রামমোহন ও কয়েকজন আদর্শবাদী চিন্তানায়ক দেশ সম্বন্ধে, জাতি সম্বন্ধে সে কথাই ভেবেছেন। পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে সমগ্র জাতি যে আদর্শের স্বপ্ন দেখেছে—রামমোহন সেই স্বপ্নই দেখেছেন বহু আগে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সচেতন পূর্বসূরীরূপে রামমোহনের নাম করতে হয় সর্বাগ্রে—কিন্তু স্বজাতি ও স্বসমাজ তাকে বিধর্মী বলে দূরেই সরিয়েছে—পরম বন্ধু ও কল্যাণকামীরূপে স্বীকৃতি দেয়নি, এটাই দুঃখ। মুষ্টিমেয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই নিবদ্ধ ছিল তাঁর সুবিশাল কর্মজীবনের রোমাঞ্চকর ইতিহাস। ব্রাহ্মসমাজ স্রষ্টারূপে বাঙ্গালী তাঁকে যত চেনে,—নব্য বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী জাতির স্রষ্টারূপে ততটা চেনে না। পরম আত্মীয় এই প্রতিভাদীপ্ত বাঙ্গালীকে বাঙ্গালীরাই দূরে সরিয়ে রেখেছিল—এটা আমাদেরই দুর্ভাগ্য। আমাদের মুক্তি সাধনার চেতনায় যে আন্তরিক ও অগ্নিগর্ভ চেতনা তিনি যোগ করেছিলেন পরবর্তী মুক্তিসাধনার ইতিহাসে তা প্রোজ্জ্বল হবেই। রামমোহনের প্রসঙ্গে শ্রীনরেশ সেনগুপ্তের এই বক্তব্যটি মূল্যবান। "to indicate his high

১৫. The English Works of Raja Rammohan Roy, J. C. Ghose, Lecture given on 15th Dec. 1829 at Town Hall, Calcutta.

purpose, clear ideas and lofty philosophy and above all a great spirit of freedom underlying them, to make us sigh for systematic treatise from his own hands".[১৬]

রামমোহন সে যুগের কাছে যা দিয়েছিলেন—তাতেই নতুন প্রাণসঞ্চার করেছেন পরবর্তী উত্তরসাধকগণ। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে রামমোহনের যোগ সামান্যই। ধর্ম সংক্রান্ত তাঁর বিশাল রচনার অধিকাংশই জনগণের কাছে দুর্বোধ্য কিন্তু জাতীয় চেতনার মুক্তি কামনায় তাঁর আজীবন সংগ্রাম পরবর্তী যুগে এক অভিনব প্রাণরস সঞ্চার করেছিল। পরবর্তী সাহিত্যস্রষ্টাগণ তাঁদের রচনার প্রেরণা পেয়েছেন তাঁর ভাবাদর্শের কাছ থেকে। সংবাদপত্র নিয়েছিলো মুখ্য ভূমিকা। আর বাংলাভাষার নব্যচর্চার সঙ্গে জীবনানুভূতির গভীরতর স্পন্দন সহজেই যুক্ত হয়েছিল।

১৬. Naresh Ch. Sen Gupta. 'Raja Rammohan Roy and Law,' The Calcutta Review, January 1934.

তৃতীয় অধ্যায়

প্রবন্ধ

বাংলা সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা—কারণ বাংলা গদ্যের জন্মলগ্নেই শুভসূচনা হয়েছিল আমাদের জাতীয় জীবনেরও। আটপৌরে গদ্যকে যতদিন একঘরে করে রেখেছিলাম ততদিন জীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সত্যকার সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে নি। কাব্যের ভাবজগতে প্রাত্যহিক চিন্তার স্থান ছিল না, পরিমার্জিত চিন্তাধারার সুসম বিন্যাসে প্রাত্যহিক ভাবনা ছিল অনাদৃত। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপনার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাগদ্যের পঠন-পাঠন,—শিক্ষাপদ্ধতি ও পাঠ্যপুস্তক নিয়ে বিব্রত পণ্ডিতসম্প্রদায়ের প্রসঙ্গ পূর্বেই আলোচনা করেছি। এঁরা বাংলাদেশের প্রথম সংস্কারক গোষ্ঠী;—বাংলা ভাষা চর্চাকে এঁরা নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করেন নি—বৃহত্তর বাঙ্গালী সমাজের স্বার্থও চিন্তা করেছিলেন। স্বদেশপ্রেম কি বস্তু তা সে যুগে চিন্তারও অতীত—কিন্তু স্বার্থনিমগ্ন বাঙ্গালী সমাজে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠীর কৃতিত্ব শুধু গদ্য সাহিত্যেই আবদ্ধ ছিল না—এঁরা অন্যান্য বিষয়েও সচেতনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই পণ্ডিতসম্প্রদায়ের মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তাসামর্থ্যের অভাব থাকতে পারে—কিন্তু সচেতনতার অভাব ছিল না। স্বদেশপ্রেমের প্রথম স্তরে এই সচেতনতারই প্রয়োজন সবচেয়ে বেশী। রামমোহনের প্রচণ্ড শক্তি যখন বাঙ্গালী সমাজের কুসংস্কারের মূলে আঘাত করেছিল—অচেতন ও মুমূর্ষু জাতির ক্ষীণদেহে প্রাণসঞ্চার করেছিল—তখন এই পণ্ডিতগোষ্ঠীই স্বপক্ষে ও বিপক্ষে সমালোচনা করার অধিকার লাভ করেছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সূচনালগ্নে বাংলা গদ্যসাহিত্যের ভূমিকা সর্বোজ্জ্বল। বাদানুবাদের সূত্র ধরে সমগ্র জাতির চরিত্রে সচেতনতার উত্তেজনা সৃষ্টি করেছিলেন এঁরাই। স্বদেশপ্রেমের কোনো আদর্শ সেদিন তাঁদের সামনে ছিল না,—কাব্য-নাটক-উপন্যাসের কাছ থেকেও প্রেরণা সংগ্রহের উপায় ছিল না,—কুসংস্কার ও অসংখ্য বীভৎস সামাজিক আচারের মধ্যেই এঁরা পালিত হয়েছিলেন। স্বদেশচেতনা দূরের কথা, এঁরা পরিপার্শ্ব, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও ছিলেন অজ্ঞ। তবু বাংলা গদ্যের আশ্রয়ে আপন বিশ্বাস ও যুক্তি প্রদর্শনের শুভ সূচনা করেছিলেন এঁরাই। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকারের অসংকোচ সমর্থন ছিল সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে। রামমোহনকে সরাসরি অভিনন্দন জানাতে এগিয়ে এসেছিলেন এই প্রাচীনপন্থী

প্রবীণই। সহমরণ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় মতামত ব্যাখ্যা করতে অনুরুদ্ধ হয়ে মৃত্যুঞ্জয় শাস্ত্রীয় রীতির বাংলা অনুবাদ করেছিলেন,—সচেতনতার সে নিদর্শনটি পুনরুল্লেখ করি,—

"চিতারোহণ অপরিহার্য নয়,—ইচ্ছাধীন বিষয়মাত্র। অনুগমন এবং ধর্ম জীবন যাপন—এই উভয়ের মধ্যে শেষটিই শ্রেয়তর। যে স্ত্রী অনুমৃতা না হয় অথবা অনুগমনের সংকল্প হইতে বিচ্যুত হয়, তাহার কোন দোষ বর্তে না।"[১]

এভাবে বাংলা গদ্যের মাধ্যমেই আপনাপন বক্তব্য পরিবেশনের ও আদর্শজ্ঞাপনের রীতি প্রচলিত হয়েছিল। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনেই প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। স্বদেশপ্রেমের আবেগেই ধর্মান্দোলন ও কুসংস্কার বিনষ্ট করার সংগ্রাম চালিয়েছিলেন এঁরা,—প্রবন্ধ রচিত হয়েছে শুধু সেই বক্তব্যটি সুধী সমাজের হাতে পৌঁছে দেওয়ার জন্যই।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের বহুমুখী জীবন সাধনার প্রসঙ্গ আমাদের আলোচনার অঙ্গ নয়;—শুধু প্রবন্ধ সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের যে পরিচয়টুকু স্থায়ী রূপ পেয়েছে—তার আলোকে এঁদের মহিমা আবিষ্কারই আমার উদ্দেশ্য। অথচ উভয় ক্ষেত্রেই দেখি, এঁদের চারিত্রিক মহিমা, বিপুল কর্মসাধনাকে সাহিত্যে ধরে রাখার কোন আয়োজনই এঁরা করে যান নি। বিদ্যাসাগর কালের দিক থেকে রামমোহনের অনেক পরের যুগের মানুষ ছিলেন বটে কিন্তু এঁদের জীবনধারার মধ্যে আশ্চর্যজনক মিল ছিল। রামমোহন ধর্মান্দোলনের নেতৃত্ব করেছেন,—ধর্ম-জিজ্ঞাসাই ছিল তাঁর আন্তর প্রেরণা। মানুষ রামমোহনের মধ্যে যে স্বতঃস্ফূর্ত স্বদেশভাবনার পরিচয় পেয়েছি—স্বধর্মসংস্কারে, সমাজ সংস্কারে, প্রখর আত্মসচেতনতায় ও রাজনীতিজ্ঞানের মধ্যেই তা উদ্ভাসিত হয়ে আছে। স্বদেশপ্রেমের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন তাঁরা—অথচ এঁদের প্রবন্ধ সাহিত্যের যুক্তি ও আলোচনার গহন অরণ্য থেকে তার প্রমাণ সংগ্রহ করার চেষ্টা করলে বিফল হতে হয়। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও একথাই প্রযোজ্য। বিদ্যাসাগরের যুগে স্বদেশচেতনা খুব অপরিচিত অনুভূতি ছিল না। সভাসমিতির আলোচনায়, সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম তখন একটি পরিচিত অবলম্বন। অথচ তাঁর মত নিজের জীবনে স্বাদেশিকতার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হতে পেরেছিলেন কজন? স্বদেশপ্রেমের আবেগ বিদ্যাসাগরের প্রতিটি কর্মে প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। মানবতাবোধের প্রজ্ঞা দিয়ে স্বদেশ-স্বসমাজ ও প্রতিটি মানুষকে ভালবাসতে পেরেছিলেন তিনি। কুসুমকোমল প্রেমে নারীর প্রতি গভীর সহানুভূতিতে তিনি অস্থির হতে পারেন আবার বজ্রকঠোর ভঙ্গিতে বিদেশী

১. সাহিত্য সাধক চরিতমালা, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালংকার থেকে উদ্ধৃত।

শাসকের অন্যায়কে তীব্রভাষায় নিন্দা করতেও উদ্যত হন। এই জাতীয় চরিত্রই একটি জাতির মনে নির্ভীকতা, দৃঢ়তা ও স্বদেশচেতনা জাগাতে পারে। একজন প্রতাপসিংহই সমগ্র মেবারবাসীকে স্বাধীনতাব্রতে দীক্ষা দিয়েছিলেন—তেমনি একজন রামমোহন কিংবা একজন বিদ্যাসাগরই সমগ্র বাঙ্গালীকে জাতীয়তাবোধের ও আত্মসম্মানবোধের দীক্ষা দিয়েছিলেন। এঁদের রচিত সাহিত্য থেকে অজস্র প্রমাণ দেওয়া হয়ত যাবে না, কিন্তু সমগ্র জীবন দিয়েই এঁরা স্বদেশপ্রীতির আদর্শটি ব্যাখ্যা করে গেছেন। সাহিত্য রচনার মাধ্যমে নয়,—সমগ্র জীবনের প্রতিটি আচরণ দিয়েই এঁরা স্বদেশপ্রেমের আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। সমালোচকবৃন্দ ও জীবনীকারগণও একথা দৃঢ়কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। সাহিত্যিক রামমোহন, কর্মী-স্বদেশানুরাগী-সমাজ-সংস্কারক রামমোহনের কাছে ম্লান; বিদ্যাসাগর সাহিত্যের জন্যই নয়,—সমগ্র জীবন সাধনার জন্যই আমাদের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় চরিত্র।

প্রথম যুগের প্রাবন্ধিকদের রচনা পাঠকালে এ সত্যটিই প্রকট হয়ে ওঠে যে, এঁরা যত বড় স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন ততবড় স্বদেশপ্রেমের ব্যাখ্যাতা ছিলেন না। প্রথম যুগের প্রবন্ধেও স্বদেশপ্রেম সম্পর্কিত রচনাংশের স্বল্পতা চোখে পড়ে। বস্তুতঃ সমাজ সংস্কার ও ধর্মসংস্কার কিংবা ভাষাসংস্কারের মধ্যে দেশহিতৈষী ব্যক্তিটিরই পরিচয় পাই বটে—কিন্তু স্বদেশপ্রেমের প্রত্যক্ষ ও ঘনীভূত আবেগ সেখানে অত্যন্ত ক্ষীণ। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্বদেশপ্রেম যখন দানা বাঁধে নি—তখনও দেশানুরাগ ছিল,—স্বধর্মপ্রীতি ও স্বসমাজপ্রেম ছিল। দেশের সমস্ত দৈন্য হৃদয়ঙ্গম করার বেদনা নিয়েই সমাজসংস্কারকের আবির্ভাব; স্বদেশপ্রেমিক হয়ত ঠিক সেই পর্যায়ের বেদনা অনুভব করেন না—কিন্তু পরাধীনতার দুঃসহ জ্বালা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করতে পারেন। স্বদেশপ্রেমের প্রথম স্তরে পরাধীনতার এই চেতনাটি এতই অস্পষ্ট ছিল যে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গি আলোচনাকালে তা সহজেই বোঝা যায়। প্রবন্ধ সাহিত্যের আবির্ভাবলগ্নে প্রবন্ধের লক্ষণাক্রান্ত রচনাগুলি মুখ্যত সমাজসংস্কার, ধর্ম-সংস্কার কিংবা ভাষাসংস্কার প্রসঙ্গ নিয়েই রচিত হয়েছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসুর প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির বিষয়বস্তু আলোচনা করলেই এ সত্য সমর্থিত হবে। স্বদেশপ্রীতির পরিচয় অনুসন্ধানের জন্য এঁদের প্রবন্ধাবলীর সাহায্য নেওয়াটা অনেক ক্ষেত্রেই অবান্তর বলে মনে হবে। স্বদেশবাসীর জন্য আত্মস্বার্থ বিসর্জনের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন এঁরাই। ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবেই আত্মদর্শনে অভিলাষী হয়েছিলেন এঁরা, সমাজ ও ধর্মের পটভূমিকায় আত্ম-বিচারের এই চেষ্টা বাঙ্গালীর ইতিহাসে অভিনব ও অচিন্তিত। এ প্রসঙ্গে 'সেকাল আর একাল' প্রবন্ধে রাজনারায়ণ বসু বলেছেন—

"এই সময় হইতে ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে নবভাব হিন্দুসমাজে প্রবিষ্ট হয় ও সেইভাব এখনও কার্য্য করিতেছে। কিন্তু হিন্দুসমাজের বর্তমান পরিবর্তনের মূল কারণ অনুসন্ধান করিতে গেলে কেবল ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনা যে উহার একমাত্র কারণ বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে এমত নহে। আর একটি ঘটনা উহার একটি প্রধান কারণস্বরূপ গণ্য করা কর্তব্য অর্থাৎ রামমোহন রায় দ্বারা ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন।[২]

রাজনারায়ণ যুগানুগ পটভূমিকা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যেই উদ্ধৃত অংশটির অবতারণা করেছিলেন। ধর্মসংস্কার, সমাজসংস্কারের মধ্যেই প্রথম এই নবলব্ধ ভাবটি পরিস্ফুট হয়েছে সত্য কিন্তু এ জাতীয় অনুভূতির মধ্যে প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের আবেগটি লক্ষ্য করা যায় না বলেই তিনি যথার্থ স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ডিরোজিওর স্বদেশপ্রীতি প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—"দুঃখের বিষয় এই যে—একজন ফিরিঙ্গী ভারতবর্ষকে এমন প্রেমের চক্ষে দেখিতেন কিন্তু এক্ষণকার কোন কোন হিন্দুসন্তানকে সেরূপ করিতে দেখা যায় না" ॥ ঐ, পৃঃ ২৬ ॥

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা এই ইতিবৃত্ত মূলক গ্রন্থটিতে রাজনারায়ণ নিজের অভিজ্ঞতাকেই বিবৃত করেছিলেন এভাবে। নবলব্ধ ভাবকে স্বীকার করেও তিনি স্বদেশচেতনাকে একটি পৃথক বস্তু বলেই মেনে নিয়েছিলেন। রাজনারায়ণ হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসেবে সে যুগের আলোকপ্রাপ্ত ও প্রতিভাদীপ্ত বহু ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে এসেছিলেন কিন্তু স্বদেশপ্রেমের আবেগ তিনি অধ্যাপক ডিরোজিওর কাছ থেকেই লাভ করেছিলেন।

রামমোহনের প্রবন্ধ পুস্তকের তালিকায় সতীদাহ প্রথা ও ধর্মমত [হিন্দু মুসলমান ও খ্রীষ্টান] সম্পর্কিত আলোচনাই প্রধান। সমাজ ও ধর্মসংস্কারকের কর্তব্য হিসেবেই তিনি উপলব্ধ সত্য প্রচার করেছেন। শিক্ষা প্রচারের উদ্দেশ্যেই গৌড়ীয় ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। কোথাও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত না হলেও রামমোহন যে স্বাধীন স্বদেশের স্বপ্ন দেখতেন তার অজস্র প্রমাণ মিলবে। মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্বোধিত করার প্রাথমিক কাজটি সম্পন্ন হলেই স্বাধীন মননের পথটি প্রশস্ত হতে পারে, এই ছিল তাঁর ধারণা। চল্লিশ বছরের মধ্যেই এদেশ থেকে ইংরাজ শাসক বিলুপ্ত হবে—এমন ধারণা তিনি কোনো মৌখিক আলাপে একদা ব্যক্ত করে-ছিলেন হয়ত। এ প্রসঙ্গে মনীষী বিপিনচন্দ্র পালের মন্তব্যটিও স্বীকৃত সত্যের মর্যাদা পাবে,

২. রাজনারায়ণ বসু, সেকাল আর একাল, কলিকাতা, ১৮৭৪, পৃঃ ২৩।

রাজা কেবল স্বদেশবাসীগণের চিত্ত ও চিন্তাকে অন্ধ শাস্ত্রানুগত্যের বন্ধন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই। যেখানে বন্ধন সেখানেই তাঁহার শাণিত খড়্গ গিয়া পড়িয়াছে। ধর্মপ্রাণ হিন্দুকে স্বাধীনতামন্ত্রে দীক্ষিত করিতে হইলে সকলের আগে তাহার ধর্মকে স্বাধীন করিতে হয়।

[নবযুগের বাংলা—যুগপ্রবর্তক রামমোহন]

কিন্তু প্রবন্ধ সাহিত্যের কোথাও এই ধারণাটি স্পষ্টায়িত হয়নি বলে রামমোহনকে অভিযোগ করা যায় না। সম্ভবতঃ সৃষ্টির চেয়েও স্রষ্টার মহত্ব দিয়েই এজাতীয় মহাপুরুষকে বিশ্লেষণ করাই শ্রেয়।

বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধ রচনার হেতু সামাজিক কুসংস্কার দূর করার জন্য যুক্তিগ্রাহ্য ও শাস্ত্রসমর্থিত বক্তব্য প্রচার। যথার্থ গদ্যশিল্পী বিদ্যাসাগরের শৈল্পিকতা বিচার আমাদের লক্ষ্য নয় বলেই তাঁর অল্পপরিচিত উদ্দেশ্যমূলক এবং তুলনায় অসার্থক রচনাই আমাদের আলোচনায় স্থান পেয়েছে। স্বদেশপ্রেমিকতার প্রসঙ্গে তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতিসেবার প্রসঙ্গটিই মুখ্য হবে নিশ্চয়ই। কুসংস্কার ও জীর্ণতায় সমাজদেহ যখন মুমূর্ষু হয়, দৈবপ্রেরিত শক্তি নিয়েই যুগন্ধর মহাপুরুষের আগমন ঘটে সেদিন। অসামান্য পাণ্ডিত্য, সাহিত্য প্রতিভা, শিক্ষানুরাগ ও অসংখ্য গুণ সমভাবে বিদ্যাসাগর চরিত্রের উজ্জ্বলতা বাড়িয়েছে, কিন্তু তিনি নিজে স্বীকার করেছেন বিধবা বিবাহ তাঁর জীবনের সর্বাপেক্ষা সৎকর্ম। সমাজসেবার প্রয়োজনেই রামমোহন ও বিদ্যাসাগর তাঁদের অমিত কর্মশক্তি প্রয়োগ করেছিলেন—সাহিত্যসৃষ্টির তুলনায় সে কীর্তির মহিমা কিছুমাত্র কম ছিল না। সমাজ দেহের জড়ত্ব নাশ করে প্রগতি ও উদারতার বীজ বপন করতে পেরেছিলেন বলেই খুব অল্পসময়ের মধ্যে বাঙ্গালীর জীবনে নবজাগরণের হাওয়া লেগেছিল। বিদ্যাসাগরের প্রধানকীর্তি বিধবা বিবাহ প্রবর্তন হলেও হিন্দু সমাজের অধঃপতনের আরও কয়েকটি কারণ তিনি বিশ্লেষণ করেছিলেন। সমাজে নারীর যোগ্যমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত জাতির ভবিষ্যৎ কালিমালিপ্ত হয়েই থাকবে—এই সুস্পষ্ট অভিমতের দৃঢ়তায় অবিচল ছিলেন বলেই রামমোহনের মত বিদ্যাসাগরও আজীবন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর রাজশক্তির সাহায্য ছাড়া সামাজিক সংস্কার অকল্পনীয় মনে করতেন। এ ব্যাপারে স্বদেশবাসীর ওপর বিন্দুমাত্র আস্থা ছিল না তাঁর। এঁদের চরিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদ্যাসাগর সক্ষোভে বলেছিলেন,—

প্রস্তাবিত দেশহিতকর বিষয়মাত্র প্রতিপক্ষতা করা যাঁহাদের অভ্যাস ও ব্যবসায় তাঁহারা কোনও মতে ক্ষান্ত থাকিতে পারিবেন না।…ঈদৃশ ব্যক্তিরা সামাজিক দোষ

সংশোধনের বিষম বিপক্ষ। তাহাদের অদ্ভুত প্রকৃতি ও অদ্ভুত চরিত্র, নিজেও কিছু করিবেন না, অন্যকেও কিছু করিতে দিবেন না।[৩] [ভূমিকা, বহুবিবাহ]

স্বদেশবাসীর সমর্থন না পেলেও নির্ভীক নিষ্ঠা নিয়ে আন্দোলনে ঝাঁপ দিয়েছিলেন তিনি, এর প্রেরণাও পেয়েছিলেন আপন স্বদেশপ্রাণতার কাছ থেকেই। স্বজাতীয়রাই বিরোধিতা ও বিপক্ষতায় পর্যুদস্ত করেছিল তাঁকে—কিন্তু দমিত হননি তিনি। বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের সাফল্যের পরেও বহু বিরূপ সমালোচনায় বিক্ষত হয়েছিলেন তিনি। তবু এরপরও তিনি সামাজিক সমস্যা নিয়ে নতুন করে চিন্তা করার চেষ্টা করেছেন। বিধবাবিবাহের আন্দোলনের সঙ্গে হিন্দু সমাজের বাল্যবিবাহ প্রথা ও বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তিনি। আসলে বিদ্যাসাগর একটি বলিষ্ঠ জাতির স্বপ্ন দেখছিলেন,—যে জাতি কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করে আপন মহিমায় ভাস্বর হয়ে উঠবে। এই অনুভূতিটিই নিম্নলিখিত অংশটিতে প্রকাশ পেয়েছে—

ভারতবর্ষে নিতান্তই যে বীর্যবন্ত বীরপুরুষের অসদ্ভাব ছিল, এমত নহে, যেহেতু পূর্বতন ক্ষত্রিয়সন্তানেরা এবং কোন কোন বিপ্রসন্তানেরা যুদ্ধবিগ্রহাদি কার্যে প্রবল পরাক্রম ও অসীম সাহস প্রকাশ করিয়া এই ভূমণ্ডলে অবিনশ্বর কীর্তি সংস্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের তত্তচ্চরিত্র পৌরাণিক ইতিবৃত্তে প্রথিত আছে, সেই সকল বীরপুরুষ প্রসব করাতে এই ভারতভূমিও বীরপ্রসবিনী বলিয়া বিখ্যাত ছিল।···এতদ্দেশীয় হিন্দুগণ সেই জাতি ও সেই বংশে উৎপন্ন হইয়া যে এতাদৃশ দুর্বলদশাগ্রস্ত হইয়াছে, বাল্যপরিণয় কি ইহার মুখ্য কারণ নয়?—এতদ্দেশীয়েরা অন্নাভাবে জঘন্য বৃত্তিও স্বীকার করে, তথাপি কোন সাহসের ও পরাক্রমের কার্যে প্রবৃত্ত হয় না। এই জন্যই রাজকীয় সৈন্যমধ্যে কখন বঙ্গদেশোৎপন্ন ব্যক্তিকে দেখা যায় নাই। (বাল্যবিবাহের দোষ)

বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারাটি অনুসরণ করলে খুব সহজেই তাঁর স্বদেশপ্রেমিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতীয় জাগরণ লগ্নে স্বদেশাত্মক কাব্য-কবিতা-নাটক-উপন্যাসে একটি বক্তব্যই ধ্বনিত হয়েছে, - তাতে ছিল বাঙ্গালীকে একটি বলিষ্ঠ জাতির আদর্শে অনুপ্রাণিত করার আপ্রাণ প্রয়াস। জগতের ইতিহাসের দৃষ্টান্ত দিয়ে, অতীতের স্বপ্নজাল মেলে ধরে, ভবিষ্যতের ইঙ্গিত দিয়ে বাঙ্গালীকে শুধু সচেতন করার সাধনায় মেতেছিলেন এ যুগের সাহিত্যসাধকেরা। বিদ্যাসাগরের চিন্তাধারার সঙ্গে তাঁদের

৩. বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী। সাহিত্য।—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ফাল্গুন ১৩৪৫, সম্পাদক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

উপলব্ধির সাদৃশ্য আবিষ্কার করা মোটেই দুরূহ নয়। শূরত্ব, বীরত্ব ও মানসিকতাই যে কোন জাতিকেই স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করতে পারে,—এ সত্য বিদ্যাসাগরের উদ্ধৃত বক্তব্যে অকপটে ধরা পড়েছে।

দেশহিতকর যে কোন আন্দোলনেই বিদ্যাসাগরের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। কলিকাতার সনাতন ধর্মরক্ষিণী সভা বহুবিবাহ নিবারণকল্পে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং তাঁদের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্যই 'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন বিদ্যাসাগর। ভূমিকায় তাঁর অভিপ্রায় জানিয়েছেন,—

"তাঁহারা, সদভিপ্রায়প্রণোদিত হইয়া, যে অতি মহৎ দেশহিতকর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, হয়ত সে বিষয়ে তাঁহাদের কিছু আনুকূল্য হইতে পারিবেক, এই ভাবিয়া, আমি পুস্তক মুদ্রিত ও প্রচারিত করিলাম।"[৪]

'বহুবিবাহ' প্রবন্ধটিতে বিদ্যাসাগরের নির্ভীক সমালোচনা লক্ষ্য করেছি। বাঙ্গালীর অধঃপতনের নিখুঁত তথ্য পরিবেশনের জন্য তিনি জেলাওয়ারী পরিসংখ্যান গ্রহণ করে এবং বহুবিবাহকারী ব্যক্তির নামধাম পরিচয় মুদ্রিত করে যে দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন সমকালীন কোন রচনায় এ ধরণের স্পষ্টবাদিতা খুঁজে পাইনি। সমাজ সমালোচনার ক্ষেত্রে অগ্রণী ব্যক্তিদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখ করা চলে। বঙ্কিমচন্দ্রও প্রকাশ্য সমালোচনার পথটি এড়িয়ে গেছেন। এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের দৃঢ়তা তুলনাহীন, বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহ প্রবর্তনের জন্য সরকারী সাহায্য প্রার্থনা করেছিলেন কিন্তু বহুবিবাহ, বাল্য বিবাহ প্রথা রহিত করার জন্য সে জাতীয় উদ্যোগ করেন নি। এ ব্যাপারে তাঁর অভিমতটিও লক্ষ্যণীয়।

"বহুবিবাহ সামাজিক দোষ, সামাজিক দোষের সংশোধন সমাজের লোকের কার্য, সে বিষয়ে গভর্নমেণ্টকে হস্তক্ষেপ করিতে দেওয়া কোনও ক্রমে বিধেয় নহে। ...ফলতঃ কেবল আমাদের যত্ন ও চেষ্টায় সমাজের সংশোধনকার্য সম্পন্ন হইবেক, এখনও এ দেশের সে দিন, সে সৌভাগ্যদশা উপস্থিত হয় নাই, এবং কতকালে উপস্থিত হইবেক, দেশের বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, তাহা স্থির বলিতে পারা যায় না।

...আমাদের ক্ষমতা গভর্নমেণ্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, একথা বলা বালকতা প্রদর্শনমাত্র। আমাদের ক্ষমতা কোথায়। ক্ষমতা থাকিলে ঈদৃশ বিষয়ে গভর্নমেণ্টের নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যক হইত না। আমরা নিজেই

৪. বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী। সাহিত্য।—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ফাল্গুন ১৩৪৫, সম্পাদক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সমাজের সংশোধন কার্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম। ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, ক্ষমতা নাই, সুতরাং সমাজের দোষসংশোধন করিতে পারিবেন না, কিন্তু তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিলে অপমানবোধ বা সর্বনাশজ্ঞান করিবেন, এরূপ লোকের সংখ্যা বোধ করি, অধিক নহে, এবং অধিক না হইলেই দেশের ও সমাজের মঙ্গল।"

[বহুবিবাহ—ষষ্ঠ আপত্তি

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার'-প্রকাশিত হয়। রাজনীতিচর্চা ও দেশচর্চা সে সময়ে খুব অপরিচিত ব্যাপার ছিল না—কিন্তু আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা রীতিমতই প্রবল ছিল। বিদ্যাসাগর ভাবোচ্ছ্বাসে পীড়িত না হয়েও আত্মসমালোচনা করেছেন নির্ভুলভাবে। আমাদের ক্ষমতাদৈন্য ও নিশ্চেষ্টতার স্বরূপনির্ণয়ে বিদ্যাসাগর অসাধারণ দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন। কোনো ভাবাবেগ কিংবা কোনো প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতবাদের প্রেরণা দিয়ে স্বসমাজকে বিচার করেননি তিনি,—স্বাভাবিক ও সহজ আত্মবুদ্ধি দিয়ে সমাজের খাঁটি চেহারাটি দেখিয়ে দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারে সমাজের সঙ্গে তাঁর ভাবগত পরিচয়ও ছিল ঘনিষ্ঠ। বিধবাবিবাহ আন্দোলনেই তিনি সমাজের প্রকৃত চেহারাটি দেখতে পেয়েছিলেন। এই সমাজের বীভৎস রীতিনীতি দেখে শিহরিত হয়েছিলেন যেমন—এর জন্য বেদনাবোধও কিছুমাত্র কম ছিল না। মানবহিতৈষণার আন্তর প্রেরণা সম্বল করেই বিদ্যাসাগর সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হয়েছিলেন—এ ছাড়া অন্য কোন প্রত্যক্ষ কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই মানবতাবোধকেই স্বদেশপ্রেমে রূপান্তরিত করা চলে। স্বদেশপ্রেমের উদ্দেশ্য স্বদেশকে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে মূল্যবান বলে অনুভব করা। বিদ্যাসাগরও স্বদেশীয় মানবসম্প্রদায়ের স্বার্থচিন্তাকেই আত্মস্বার্থের চেয়ে মূল্যবান বলেই জ্ঞান করেছেন। তাঁর এই মানবপ্রেম সমাজের কুপ্রথা সংস্কারেই ব্যয়িত হয়েছে। তাঁর আক্ষেপ ও বেদনার ভাষাটিও স্বদেশ-প্রেমিকের আন্তর অভিব্যক্তি,—

আমরা অত্যন্ত কাপুরুষ, অত্যন্ত অপদার্থ; আমাদের হতভাগা সমাজ অতি কুৎসিত দোষপরম্পরায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ। এ দিকের চন্দ্র ও দিকে গেলেও এরূপ লোকের ক্ষমতায় এরূপ সমাজের দোষ সংশোধন সম্পন্ন হইবার নহে।[৫]

[বহুবিবাহ—ষষ্ঠ আপত্তি]

এ আক্ষেপ বিদ্যাসাগরের সমস্ত অন্তরমথিত অনুভবেরই প্রকাশ মাত্র।

---

৫. বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী। সাহিত্য। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ১৩৪৫, সম্পাদক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বঙ্কিমচন্দ্র কমলাকান্তের দপ্তরে রূপকান্তরালে সমাজ সমালোচনার রীতি প্রবর্তন করেছিলেন। কিন্তু সমাজ-সংস্কারক বিদ্যাসাগর স্বজাতীয়ের দুঃখকে অকপটে প্রকাশ না করে পারেননি। বিধবাবিবাহ দূর করার উদ্দেশ্যে লিখিত, "বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব" নামক গ্রন্থের দ্বিতীয় পুস্তকে বিদ্যাসাগর আবেগে কম্পমান হয়ে লিখেছিলেন,—

"ধন্য রে দেশাচার! তোর কি অনির্বচনীয় মহিমা! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে, দুর্ভেদ্য দাসত্বশৃংখলে বদ্ধ রাখিয়া, কি একাধিপত্য করিতেছিস! তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্মের মর্ম ভেদ করিয়াছিস, হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস, ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস।"[৬]

দেশপ্রেমমূলক রচনাংশ হিসেবে উদ্ধৃত অংশটি অনুপম বলেই মনে হয়। বিদ্যাসাগরের আবেগের পরিচায়ক বলে অংশটুকুর মূল্য আরও বেড়েছে। বিদ্যাসাগর পরাধীনতার জন্য আক্ষেপ করেননি, দুঃখ করেছেন আত্মার স্বাধীনতা হারিয়েছেন বলে। ধর্মবোধ, ন্যায়অন্যায় চেতনা, হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে আমাদের সমাজেও দেশাচারের প্রতাপ ঘোষিত হয়েছে—এর চেয়ে মর্মান্তিক দুঃখ আর কিছু হতে পারে না। বিদ্যাসাগরও মুক্তিসংগ্রামী—কিন্তু সে সংগ্রাম বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে নয়,—আত্মার পরাধীনতা মোচনই তার উদ্দেশ্য ছিল। বিদেশী শাসকের অত্যাচারে পিষ্ট ভারতবাসীর পরাধীনতাবোধ জাগারও আগে আত্মবোধ ও আত্মজিজ্ঞাসা জাগার প্রয়োজন ছিল। তাই প্রথম যুগের স্বদেশপ্রেমিকের সাধনা ছিল আত্মমুক্তির সাধনা। বিদ্যাসাগরও প্রাচীন ভারতের মহান ঐতিহ্য স্মরণ করে বেদনার্ত হয়েছেন। ভারতের সর্বাঙ্গীণ মুক্তিই ছিল তাঁর কাম্য। আর সর্বাঙ্গীন মুক্তি সাধনার শুরু সমাজের সর্বস্তরের মঙ্গলসাধনা থেকেই। বিদ্যাসাগর আক্ষেপ করেছিলেন—

"হা ভারতবর্ষ! তুমি কি হতভাগ্য! তুমি তোমার পূর্বতন সন্তানগণের আচার গুণে পুণ্যভূমি বলিয়া সর্বত্র পরিচিত হইয়াছিলে, কিন্তু তোমার ইদানীন্তন সন্তানেরা, স্বেচ্ছানুরূপ আচার অবলম্বন করিয়া, তোমাকে যেরূপ পুণ্যভূমি করিয়া তুলিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া দেখিলে, সর্বশরীরের শোণিত শুষ্ক হইয়া যায়। কতকালে তোমার দুরবস্থা বিমোচন হইবেক, তোমার বর্তমান অবস্থা দেখিয়া, ভাবিয়া স্থির করা যায় না"। [উপসংহার, বিধবা বিবাহ, দ্বিতীয় পুস্তক]

৬. বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী। সাহিত্য। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ফাল্গুন ১৩৪৫, সম্পাদক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধের জটিলতা ও শাস্ত্রবিচারের মধ্যে প্রবেশ করার মত অধ্যয়ন ও ধৈর্য সেকালে কিংবা একালেও খুব বেশী লোকের নেই,—এ কথা অতিশয়োক্তি নয়। তাঁর বিপুলায়তন প্রবন্ধে যে গভীর শাস্ত্রজ্ঞান, তথ্যনিষ্ঠা, যুক্তিধর্মিতা ও মননশীলতা রয়েছে—বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য বোঝবার জন্যই তার শরণ নিতে হয়। কিন্তু মাঝে মাঝে দেশসচেতনতার আবেগেও যে তিনি অধীর হতেন উদ্ধৃত অংশগুলোই তার প্রমাণ। পাণ্ডিত্য ও যুক্তিধর্মিতার অন্তরালেও মহৎপ্রাণ বিদ্যাসাগরের যে পৃথক পরিচয় রয়েছে—জটিল প্রবন্ধগুলির মধ্যে সে সত্তাটিই প্রতিফলিত হয়েছে।

বিদ্যাসাগরের রসিকতার প্রমাণ স্বরূপ তাঁর 'ব্রজবিলাস', 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', শীর্ষক রচনাবলীর উল্লেখ করা যায়। তাঁর দেশসাধনা কিংবা সমাজসংস্কারের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল নানাভাবে। লিখিত আক্রমণও সহ্য করতে হয়েছে তাঁকে। শেষ পর্যন্ত প্রত্যুত্তরের উদ্দেশ্যেই লেখনী ধারণ করলেন বিদ্যাসাগর। কস্যচিৎ উপযুক্ত ভাইপোস্য ছদ্মনামে তিনি এ শ্রেণীর রচনা প্রকাশ করেন। 'ব্রজবিলাসে' তাঁর রসিকতা ও ব্যঙ্গ চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে;—ভাইপো আক্ষেপ করে বলেছে,—

দুঃখের বিষয় এই, আমরা স্বাধীন জাতি নহি; স্বাধীন হইলে, এতদিন, কোনকালে, বিদ্যাসাগর বাবাজি সশরীরে স্বর্গারোহণ করিতেন। কারণ স্বাধীন সাধুসমাজের তেজীয়ান চাঁই মহোদয়েরা, কখনই, এ অত্যাচার, এ অপমান, সহ্য করিয়া, গায়ের ঝাল গায়ে মাখিয়া, চুপ করিয়া থাকিতেন না; বিদ্রোহী বলিয়া, বিচারালয়ে তাঁহার নামে অভিযোগ উপস্থিত করিতেন, এবং আপনারাই, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের ন্যায়, ধর্মাসনে বসিয়া, তাঁহাকে শূলে চড়াইয়া, যথোপযুক্ত আক্কেল-সেলামি দিতেন। হায়রে সেকাল!!! হা জগদীশ্বর! তুমি, কতকালে, সদয় হইয়া, এই হতভাগা দেশকে পুনরায় স্বাধীন করিবে। এরূপ যথেচ্ছাচার আর আমরা কতকাল সহ্য করিব!!![৭]

[ব্রজবিলাস—পঞ্চম উল্লাস]

বিদ্যাসাগরের ব্যঙ্গও এখানে অতলস্পর্শী মহিমা লাভ করেছে—পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করেও রসিকতার আশ্রয়ে সমাজের প্রকৃত স্বরূপটিই ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। স্বাধীনতার মর্যাদা হৃদয়ঙ্গম করা যে স্বাধীনতালাভ করার চেয়েও অধিকতর প্রয়োজনীয় বস্তু,—বিদ্যাসাগর এ সত্যই প্রচার করতে চেয়েছিলেন

৭. বিদ্যাসাগর গ্রন্থাবলী। সাহিত্য। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ফাল্গুন ১৩৪৫, সম্পাদক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সম্ভবতঃ। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূল্য নির্ণয়ের ক্ষমতাটুকু অর্জন করার মত মানসিকতাই সন্ধান করতে চেয়েছিলেন তিনি।

রামমোহন-বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টাকে পরবর্তীকালে যাঁরা হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, তাঁদের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করার স্বাভাবিক প্রবণতাই যাঁর চরিত্রকে মহিমান্বিত করেছিল তিনি দেবেন্দ্রনাথ। প্রচলিত অর্থে দেবেন্দ্রনাথকে শুধু স্বদেশপ্রেমী বলা যাবে না, কিন্তু পূর্বেই বলেছি দেশসাধনার বিচিত্র পন্থার মধ্যে যে কোন একটি অবলম্বন করেছিলেন যাঁরা তাঁদের দেশপ্রেমকে অস্বীকার করলে দেশপ্রেমিকতার পূর্ণ স্বরূপনির্ণয়ে ভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর, একজন ধর্মসংস্কারক, অন্যজন সমাজসংস্কারক; এঁদের উভয়কেই প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক বলতে আমাদের বাধা নেই। দেবেন্দ্রনাথ রামমোহনেরই ভাবশিষ্য,—ব্রাহ্মধর্ম প্রবর্তনেই তাঁর সমস্ত জীবনের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হয়েছে—কিন্তু গভীর স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা না থাকলে কিংবা স্বদেশহিতৈষণার প্রবৃত্তি না থাকলে ধর্মের জন্য আজীবন সংগ্রাম করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হোত না। রামমোহনের প্রবর্তিত ব্রাহ্মধর্মের প্রচার ও প্রসারে তিনি যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন—তা এককথায় বিস্ময়কর। সে যুগের পটভূমিতে নিছক ধর্মান্দোলনের প্রয়োজন তত ছিল না,—বস্তুতঃ আত্মরক্ষার ও স্বাজাত্যবোধের প্রেরণায় ধর্মান্দোলন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। দেবেন্দ্রনাথও স্বদেশসেবা ও ধর্মপ্রচারের মধ্যে কোন পার্থক্য দেখেন নি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধর্মমত ও সুষ্ঠু সাহিত্যাদর্শ গড়ে তোলার জন্য তিনি চিরস্থায়ী সম্মান পাবেন। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের আদর্শ ছিল তাঁর। সব মিলিয়ে দেখলে মহর্ষির দেশানুরাগী মনটিকে সহজেই আবিষ্কার করি আমরা। এঁরা পথভ্রষ্ট—আত্মঅচেতন বাঙ্গালীর শুভবুদ্ধি জাগানোরই চেষ্টা করেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করার জন্য রামমোহন লেখনী ধারণ করেছিলেন,—দেবেন্দ্রনাথ রামমোহন প্রবর্তিত বৈদান্তিক ও ঔপনিষদিক ভাবাদর্শকে প্রচার করেছেন। দেবেন্দ্রনাথের এই উদ্দেশ্যের বাহন হয়েছে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রের ইতিহাসে সার্থক সাহিত্যপত্রিকা হিসেবে যা পরিচিত। দেবেন্দ্রনাথ ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যেই লেখনী ধারণ করেছিলেন,—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মিক প্রবন্ধ ও বক্তৃতা প্রকাশিত হোত। তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় মিলবে স্বরচিত আত্মচরিত-এ। প্রকাশিত এই সব সাহিত্যিক সৃষ্টির মধ্যে কোথায় কোথায় স্বদেশপ্রেমী দেবেন্দ্রনাথের পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে—আপাতত তার অনুসন্ধানই আমাদের কর্তব্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতির কিছু পরিচয় বঙ্গদেশের তৎকালীন মনীষীদের মতামতেও ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ পিতৃদেব সম্বন্ধে যে বর্ণনা দিয়েছেন

সেখানেও স্বদেশপ্রেমিক দেবেন্দ্রনাথই আত্মপ্রকাশ করেছেন। এই অংশগুলি দেশপ্রেমিক দেবেন্দ্রনাথকে নিঃসংশয়ে চিনিয়ে দেয়;—সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথের সৃষ্টিতে দেশচিন্তার আলোচনা ও অনুসন্ধানের কৌতূহল সৃজন করে। কিন্তু এ জাতীয় আলোচনাতেই দেবেন্দ্রনাথের দেশপ্রেমিকতা প্রমাণিত হয়েছে,—তাঁর দেশ প্রেমিকতার বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য 'আত্মচরিতে' সাড়ম্বরে ঘোষিত হয় নি বলে অবাক হওয়াও উচিত নয়। অথচ মহর্ষি বাংলাভাষাকে সর্বপ্রধান ভাষা বলে স্বীকার করার আন্দোলনেও অন্যতম প্রধান ব্যক্তি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতেই তিনি এ বিষয়ে প্রথম আলোচনা শুরু করেন। রাজনারায়ণ বসু 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতায়' বলেছিলেন—

"বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবার উৎকৃষ্ট প্রণালী ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা প্রথম প্রবর্তিত করেন। ব্রাহ্মসমাজের বক্তৃতার মধ্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যাখ্যান অতিপ্রসিদ্ধ। উহা তাড়িতের ন্যায় অন্তরে প্রবেশ করিয়া আত্মাকে চমকিত করিয়া তুলে এবং মনশ্চক্ষু সমক্ষে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করে।[৮]

মহর্ষির মাতৃভাষানুরাগের কাহিনী রবীন্দ্রনাথের রচনা পাঠেও জানতে পারি, একদা ইংরাজীতে লেখা চিঠির উত্তরে তিনি নীরবতা পালন করে তাঁর মনোভাব জ্ঞাপন করেছিলেন। মাতৃভাষা ব্যবহার করতেই অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। স্বাদেশিকতার আবহাওয়া মহর্ষি তাঁর আদর্শে পরিবারের প্রতিটি মানুষের প্রাণে সঞ্চারিত করেছিলেন। [স্বাদেশিকতা] 'জীবনস্মৃতি' পর্যায়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন,

"স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষুণ্ণ ছিল, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়াছিল। বস্তুত, সে-সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়ীতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাঁহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরাজিতে পত্র লিখিয়াছিলেন সে পত্র লেখকের নিকট তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।"

মহর্ষির স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পেতে গেলে এই অংশগুলো আমাদের বিশেষভাবে সাহায্য করবে। মহর্ষির স্বলিখিত আত্মজীবনীতেও তাঁর দেশসেবার প্রসঙ্গ রয়েছে। সেযুগের আত্মসচেতন কোনো ব্যক্তির পক্ষেই স্বদেশপ্রসঙ্গ বিস্মৃত হওয়া সম্ভব ছিল না। খ্রীষ্টান পাদ্রীদের ধর্মপ্রচার বাসনা তখনো পুরোদমে সক্রিয়,—নবোদ্যমে প্রাচীন

রাজনারায়ণ বসু—বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা—কলিকাতা, ১৮৭৪, পৃঃ ৬৫।

হিন্দুধর্মের আদর্শ প্রচার করেও তা নিবৃত্ত করা যায় নি। মহর্ষির আত্মজীবনীর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়; রাজেন্দ্রনাথ সরকারের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উমেশচন্দ্র সরকার সস্ত্রীক খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য গৃহত্যাগ করেন,—রাজেন্দ্রনাথ তখন দেবেন্দ্রনাথের শরণাপন্ন হয়েছিলেন; দেবেন্দ্রনাথ অক্ষয়কুমারকে দিয়ে প্রবন্ধ রচনা করিয়ে তত্ত্ববোধিনীতে তা প্রকাশ করেন। এর বর্ণনা পাই আত্মজীবনীতে,—

শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তের প্রবন্ধ পত্রিকায় প্রকাশ হইল, আর আমি তাহার পরে প্রতিদিন গাড়ী করিয়া প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলিকাতার সকল সম্ভ্রান্ত ও মান্য লোকদিগের নিকটে যাইয়া তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম যে, হিন্দু-সন্তানদিগের যাহাতে পাদ্রীদের বিদ্যালয়ে যাইতে আর না হয় এবং আমাদের নিজের বিদ্যালয়ে তাহারা পড়িতে পারে, তাহার উপায় বিধান করিতে হইবে।[৯]

[ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ—আত্মচরিত]

মহর্ষিকে এখানে স্বদেশসচেতন ও সমাজপ্রেমিক বলে মনে হবে। স্বকীয়ত্ব রক্ষার জন্য মহর্ষির আন্তরিক প্রচেষ্টার বর্ণনাই পেয়েছি এখানে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে ধর্মচেতনা সর্বদাই দেশচেতনার উর্ধ্বে স্থাপিত। ব্রাহ্ম-সমাজে বক্তৃতাদান কালে একদা তিনি বলেছিলেন,—

"আমাদের মাতৃভূমি হিন্দুস্তান প্রিয়তরঃ, কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম প্রিয়তম।"

[১৭৮৯ শকের ১১ই কার্তিক, 'ব্রাহ্মদিগের ঐক্যস্থান' সম্বন্ধে বক্তৃতা]

এই প্রিয়তম ব্রাহ্মধর্মকে তিনি স্বকীয়ত্ব ও জাতীয়তার উপরেই প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়ে-ছিলেন, এখানেই তাঁর ধর্মচিন্তা ও দেশপ্রেমিকতার মূল সংযোগ রক্ষিত হয়েছে। ব্রাহ্মধর্মের মধ্যে স্বজাতীয়ভাব রক্ষার জন্য মহর্ষির চেষ্টা ছিল অন্তহীন। তাই কেশবচন্দ্রের সঙ্গে দেবেন্দ্রনাথের সংঘর্ষও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। মহর্ষির দৃঢ়তা ও জাতীয়তাবোধের আদর্শ এই সংঘর্ষের ফলে আরও তীব্রতর হয়ে উঠেছিল। মহর্ষির জাতীয়তা রক্ষার চেষ্টা সম্পর্কে একটি মহর্ষি কথিত কাহিনীর প্রসঙ্গ আলোচনা করা দরকার। কেশবচন্দ্রের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে মহর্ষি আমাদের সংস্কার রক্ষার দায়িত্ব আরও তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন। ধর্মরক্ষা ও স্বজাতীয়ভাব রক্ষা তাঁর কাছে সমান গুরুত্ব পেয়েছিল। আত্মচরিত 'পরিশিষ্টে' আছে,—

"কেশববাবু যখন নানাপ্রকার গোলযোগে পড়িয়া ব্রাহ্মবিবাহের আইন পাস করিবার চেষ্টায় রাজদ্বারে আবেদন করিলেন ও ব্রাহ্ম বিবাহের পরিবর্তে সিবিল ম্যারেজ আইন বিধিবদ্ধ হইল, তখন আমার প্রণীত বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতির

৯. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত—২য় সংস্করণ।

বিশুদ্ধতা ও বিবাহসিদ্ধি সম্বন্ধে কাশী, নবদ্বীপ, বিক্রমপুর, ভাটপাড়া প্রভৃতি স্থানের প্রসিদ্ধ অধ্যাপকগণের স্বাক্ষরিত মত সংগৃহীত করিয়া আনাইয়াছিলাম।...এই অনুষ্ঠান পদ্ধতিতে দুইদিক রক্ষা পাইয়াছে—স্বজাতীয় ভাব ও ব্রাহ্মধর্ম।"[১০]

ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল খ্রীষ্টান ধর্মের কাছ থেকে আত্মরক্ষা করা। বহু বক্তৃতায় মহর্ষির এই উদ্দেশ্যটি তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে,—

"খ্রীষ্টানেরা যেমন আমাদিগের ধর্মনাশের নিমিত্তে জাল পাতিয়াছে এমন আর কোন জাতিতে দেখা যায় না। কি আশ্চর্য, কি লজ্জার বিষয় যে অন্যদেশস্থ লোক আমাদিগের ধর্মনাশের নিমিত্তে এত চেষ্টা করিতেছে এবং কোন কোন স্থলে তাহারদিগের অসৎ কামনাও সফল হইতেছে, আমরা সেই ধর্মরক্ষা করিবার নিমিত্তে কিছুমাত্র যত্নশীল না হই।[১১]

[তত্ত্ববোধিনী সভার দ্বিতীয় বাৎসরিক জন্মতিথি উৎসবের ভাষণ]

মহর্ষির এ জাতীয় সচেতনতার আরও একটি পরিচয় থেকে তাঁর স্বদেশচেতনা সম্বন্ধে আমরা অবহিত হতে পারি। ১৭৮২ শকে পশ্চিম প্রদেশের দুর্ভিক্ষে মহর্ষি চঞ্চল হয়েছিলেন। ঐ শকের ১২ই চৈত্র একটি বক্তৃতায় দেবেন্দ্রনাথের দেশপ্রীতি ও সহানুভূতি তীব্ররূপে দেখা যায় -

প্রীতিকে প্রসারিত করিয়া ভারতভূমিতে ব্যাপ্ত কর। যে প্রীতি সমুদয় পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়া ঈশ্বরের উদার প্রীতির ভাব ধারণ করিবে, তাহা কি এই সংকীর্ণ ভারত ভূমিতে ব্যাপ্ত হইবে না।...দেখ, আমারদের দেশের কি প্রকার অবস্থা হইয়াছে। পশ্চিমে যোজন যোজন ভূমি মরুভূমি হইয়া রহিয়াছে, হরিৎবর্ণ আর কোথাও দেখা যায় না। আমারদের এমন ভারতবর্ষ আরব্যদেশের মরুভূমি তুল্য জনশূন্য মরুভূমি হইয়া গেল—ইহার আশ্রিত অগণ্য লোকদিগকে আর আহার দিতে পারে না—এ কি সামান্য শোচনীয় বিষয়? চক্ষে দেখিলেই কি আমাদের দয়ার উদয় হইবে? এই সকল দেখিলে কি আমরা ক্ষণকালের জন্য সুস্থ থাকিতে পারিতাম?

[পরিশিষ্ট – মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বরচিত আত্মজীবনী পৃঃ ৬৮-৬৯]

এই গভীর দেশচেতনাই মহর্ষিকে চঞ্চল করে তুলেছিল। মহর্ষি দুর্ভিক্ষের জন্য ২২৭৩।৶১০ টাকা চাঁদা সংগ্রহ করেছিলেন। এ জাতীয় দেশসেবার আদর্শ পরবর্তী কালে বিপুলভাবে গৃহীত হয়েছিল। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের দেশসেবার আদর্শ

১০. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত—২য় সংস্করণ। পরিশিষ্ট, প্রিয়নাথ শাস্ত্রী কর্তৃক লিখিত।

১১. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বরচিত জীবনচরিত—২য় সংস্করণ। পৃঃ ১৬৫-১৬৬।

স্মরণ করলে তা আমরা অনায়াসেই বুঝি—কিন্তু মহর্ষির যুগে দেশসেবার এ জাতীয় আদর্শ খুব সুলভ ছিল না। তিনি যা করেছিলেন—তা আপন অন্তরের আবেগ থেকেই করেছিলেন। সাহিত্যিক দেবেন্দ্রনাথ, ব্রাহ্মধর্মপ্রচারক দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে স্বদেশপ্রাণ দেবেন্দ্রনাথও সংগোপনে আপন অস্তিত্ব রক্ষা করে চলেছেন,—খুব নিবিষ্টভাবে লক্ষ্য না করলে হয়ত সে পরিচয়টি সাধারণের অগোচরেই থেকে যাবে। মহর্ষির নিজের রচনা থেকে বা বক্তৃতা থেকে তাঁর দেশসেবার প্রসঙ্গ পাওয়া সম্ভব নয়,—সে কারণেই এ সম্পর্কে বিস্তৃত কোন আলোচনাও সম্ভব নয়।

বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে অক্ষয়কুমার দত্ত একটি শ্রদ্ধেয় নাম। সাহিত্যসাধনা ও জীবনসাধনায় অনলসকর্মী অক্ষয়কুমার প্রতিটি কর্মে বিস্ময়কর নিষ্ঠার পরিচয় রেখেছিলেন। বাংলাদেশের তৎকালীন ধর্মান্দোলনের পুরোধা ছিলেন অক্ষয়কুমার,—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাকে কেন্দ্র করেই দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও অক্ষয়কুমার দত্ত মিলিত হয়েছিলেন। সেযুগে বাঙ্গালীর জীবনে বৈচিত্র্য যা কিছু সব তত্ত্বালোচনাতেই নিবদ্ধ ছিল,—ধর্মতত্ত্বব্যাখ্যা ও তারই বাদ প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলো সেদিনের বঙ্গদেশ। অবশ্য জড়ত্বের হাত থেকে মুক্ত হবার এ জাতীয় প্রয়াসেও যথেষ্ট জীবনলক্ষণ বর্তমান। তখনো আত্মসচেতনতা নিয়ে গর্ববোধ করার সময় আসেনি—শুধু সমাজসচেতনতা ও ধর্মচেতনা নিয়ে প্রগতির প্রথম ধাপটি অতিক্রম করছি আমরা। রামমোহন বাঙ্গালীকে সংস্কারব্রতের দীক্ষা দিয়েছিলেন—দেবেন্দ্রনাথ ও অক্ষয়-কুমার তাঁরই উত্তর সাধক।

শিক্ষাবিস্তার, ধর্মসংস্কার-এর সঙ্গে দেশচেতনার যোগটি খুব প্রকাশ্য নয় কিন্তু ওতপ্রোত। দেশপ্রেমই বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী সম্পর্কে সচেতন করে তোলে মানুষকে। সমাজসংস্কার, শিক্ষা-বিস্তার ও ধর্মান্দোলন পরোক্ষভাবে দেশসাধনারই নামান্তরমাত্র। তাই রামমোহন খাঁটি দেশপ্রেমিক,—বিদ্যাসাগর যথার্থ দেশসেবী। স্বাধীনতা আন্দোলনের সুদূর সম্ভাবনাকে যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরাই নানাভাবে দেশ-সেবাব্রত গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের দেশপ্রেম ও কর্মসাধনা পরস্পর সংযুক্ত, ক্বচিৎ তা সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত। অক্ষয়কুমার প্রমুখ প্রাবন্ধিকগণের সাহিত্যসাধনার মূলে শুধু দেশপ্রেম প্রচারই মুখ্য নয়,—এঁরা গদ্য সাহিত্যের সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপনের আদর্শ নিয়ে সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এঁদের লক্ষ্য ছিল বহুমুখী; উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে এই বহুমুখিতার সাধনা একটি মাত্র আদর্শে রূপান্তরিত হয়েছিল—সে আদর্শ স্বাধীনতালাভের একমাত্র সাধনা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সে চেতনাটি ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে মাত্র। অক্ষয় দত্তের রচনাতেই সে আভাস স্পষ্ট।

অক্ষয়কুমার দত্ত ও দেবেন্দ্রনাথের যুগ্ম প্রচেষ্টায় 'তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা' স্থাপিত হয় ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ই জুন। অক্ষয়কুমার এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। ধর্মসাধনার উদ্দেশ্যেই এ প্রতিষ্ঠানের পরিকল্পনা—কিন্তু কর্ণধার হিসেবে অক্ষয়কুমার এ দায়িত্ব নিছক ধর্মপ্রচারের দায়িত্ব বলে মনে করেন নি। তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা বাঁশবেড়িয়াতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। কিছুদিন পরে,—সে উপলক্ষে অক্ষয়কুমার একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন,

"ইদানীং কলিকাতা নগরে বঙ্গভাষা অনুশীলনের দ্বারা যে নানাপ্রকার বিদ্যার পথ পরিষ্কৃত হইতেছে এবং তত্রস্থ মনুষ্যেরা স্বদেশের মঙ্গল বৃদ্ধির নিমিত্ত যেরূপ উদ্‌যোগী হইতেছেন, তাহা দৃষ্টি করিয়া দেশহিতৈষী ব্যক্তি আহ্লাদে পরিপূর্ণ হয়েন. পরন্তু তৎপরক্ষণেই তিনি পল্লীগ্রামের প্রতি কটাক্ষপাত করিয়া অত্যন্ত ক্ষোভযুক্ত হয়েন।

...তাঁহাদিগের ভাষাই এ দেশের জাতীয় ভাষা হইবেক এবং তাঁহাদিগের ধর্মই এদেশের জাতীয় ধর্ম হইবেক, সুতরাং ব্যক্ত করিতে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, যে হিন্দুনাম ঘুচিয়া আমাদিগের পরের নামে বিখ্যাত হইবার সম্ভাবনা দেখিতেছি"[১২]

[তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১লা আশ্বিন, ১৭৬৫]

এই বক্তৃতাংশটুকু অনুসরণ করলে মনীষী অক্ষয়কুমারের চিন্তাধারার একটা স্বচ্ছ পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়। শিক্ষক ও দেশপ্রেমিক এখানে একসঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে অক্ষয়কুমারের চরিত্রে। যথার্থ শিক্ষকের কর্তব্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন, আদর্শ দেশসেবীর দায়িত্ববোধেও তিনি অনুপ্রাণিত। তাঁর মন্তব্যের শেষাংশ সেযুগের উন্মার্গগামী ইংরেজী শিক্ষিত যুবগোষ্ঠীর উদ্দেশ্যে। ইয়ংবেঙ্গল নামধেয় এই বঙ্গসন্তানদের আচরণে তাঁর বিক্ষুব্ধ মনোভাব এখানে স্পষ্ট ও অভীক। মনে প্রাণে স্বদেশীয়ানা নিয়েই অক্ষয়কুমার শিক্ষাব্রতীর কর্তব্য ও সাহিত্যসেবীর ব্রত পালন করেছেন।

সে যুগে পাঠ্যোপযোগী পুস্তকের অভাব দূর করার জন্যই ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম থেকেই বাংলা গদ্যচর্চা শুরু হয়—কিন্তু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত গোষ্ঠীর রচনা-সম্ভার পাঠ্যপুস্তকের অভাব পুরোপুরি দূর করতে পারে নি বলেই বিদ্যাসাগর, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছেন। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার যথার্থ আলোক এঁদের অন্তরে প্রবেশ করেছিল, জ্ঞানের মন্দিরে ভাবী যুগের ছাত্রদের অবাধ প্রবেশ ঘটুক—এ ছিল তাঁদের আন্তরিক কামনা। এঁরা সকলে ভাবী বঙ্গসন্তানদের ভবিষ্যৎ তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন।

---

১২. সাহিত্য সাধক চরিতমালা। ১ম খণ্ড। অক্ষয়কুমার দত্ত থেকে অনুলিখিত।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভায় বক্তৃতাদান কালে অক্ষয়কুমার বলেছিলেন,

"তিনি আমারদিগকে হীরক দেন নাই, স্বর্ণ দেন নাই, রজতও দান করেন নাই, কিন্তু তাহার অপেক্ষা সহস্রগুণ—কোটিগুণ মূল্যবান বিদ্যারত্ন প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চেষ্টা দ্বারা আমরা জ্ঞানের আস্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি, এবং তাঁহার চরিত্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা দয়া ও সত্য ব্যবহার যে কি মহোপকারি, তাহা পূর্ণরূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছি।"[১৩]

এই মহৎ প্রেরণা গ্রহণ করার মত সুদৃঢ় চারিত্রিক ভিত্তি ছিল তাঁর। সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি তাই শিক্ষাব্রতীর পুণ্যকর্তব্য নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন। স্বদেশসেবা ও স্বজাতিসেবার এই নির্মল দৃষ্টান্ত আমরা এ যুগেই পেয়েছি।

প্রকাশ্য সভায় সেদিন অক্ষয়কুমার আমাদের চারিত্রিক ত্রুটির উল্লেখ করেছিলেন। স্বদেশের মঙ্গলসাধনব্রত বিস্মৃত হয়ে আত্মদৈন্যে পীড়িত জাতির জন্য দুঃখপ্রকাশও করেছিলেন তিনি। পরাধীন জাতির স্বদেশপ্রেমিকের চরম লক্ষ্য নিশ্চয়ই স্বাধীনতালাভ, কিন্তু আত্মজাগরণ যেখানে ঘটেনি—স্বাধীন হওয়ার তাৎপর্য নির্ধারণেই তারা অক্ষম। এ যুগের স্বদেশসাধকের সাধনার মূলে ছিল আত্মবিস্মৃত-অধঃপতিত একটি জাতির জীবনবোধ সঞ্চার করা। অক্ষয়কুমারের সমগ্র জীবনেও এই আদর্শটিই মুখ্য ছিল। হেয়ার সাহেবের স্মৃতিসভায় অক্ষয়কুমার সেই উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন—

"আমরা কতকাল আক্ষেপ করিতেছি, যে স্বদেশের মঙ্গলচেষ্টা করা যে মনুষ্যের প্রধান কর্ম তাহা ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের চিত্ত হইতে লুপ্ত হইয়াছে—অনুৎসাহ, অল্প প্রতিভা, দ্বেষ, কলহ, বিচ্ছেদ আমারদিগের মহাশত্রু হইয়াছে।...আমরা বিদ্যাবিষয়ে, লোকের উৎসাহ বিষয়ে, রাজনিয়ম বিষয়ে কত চর্চা করিয়াছি, এবং নানা প্রকারে স্বদেশের মঙ্গলোন্নতি জন্য কত আন্দোলন ও কত প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছি। কিন্তু সে কেবল আন্দোলনমাত্র হইয়াছে। দুই বিদ্বান ব্যক্তির পরস্পর সাক্ষাৎ হইলে স্বদেশের মঙ্গল তাহাদিগের আলাপের প্রথম সূত্র হইত, কিন্তু পৃথক হইলে চিত্তপটে সে সমুদয়ের চিহ্নমাত্র থাকিত না।[১৪]

এই বক্তৃতাংশ থেকে অক্ষয়কুমারের দেশচিন্তার স্বচ্ছ রূপটি প্রতিভাত হয়।

---

১৩ শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা, কলিকাতা ১৮৪৫।

১৪. শ্রীযুক্ত ডেভিড হেয়ার সাহেবের নাম স্মরণার্থ তৃতীয় সাম্বৎসরিক সভার বক্তৃতা, কলিকাতা ১৮৪৫।

যুগোচিত ধারণাশ্রয়ী বলেই পরবর্তীযুগের উদ্দাম ভাবান্দোলনেরস্পর্শ এতে নেই কিছুমাত্র। স্বদেশপ্রেমের প্রথম স্ফুরণ ঘটেছিল ঠিক এভাবেই।

অক্ষয়কুমারের সাহিত্যসাধনার প্রসঙ্গই আমাদের আলোচ্য বিষয়। তাঁর সাহিত্যকীর্তির অন্তরালে স্বদেশপ্রেমের স্বতোপ্রবাহিত ধারাটি বর্তমান ছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু কদাচিৎ তা প্রকাশিত হয়েছিল। শিক্ষক অক্ষয়কুমার পাঠ্যপুস্তক রচনার উদ্দেশ্য নিয়ে 'চারুপাঠ' রচনা করেছিলেন তিন খণ্ডে। 'চারুপাঠে' সরল ভাষায় উপদেশাত্মক ভঙ্গিমায় জ্ঞানের বিষয়ই আলোচনা করেছিলেন লেখক। কিন্তু সহজাত গুণেই তা নীরস প্রবন্ধ হয় নি,—সুখপাঠ্য রচনা হতে পেরেছিল। অক্ষয়কুমার বাংলা গদ্যে প্রাঞ্জলতা এনেছিলেন, যুক্তিধর্মিতা ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব অক্ষয়কুমারের রচনাবৈশিষ্ট্য। রজনীকান্ত গুপ্ত অক্ষয়কুমারের ভাষাবিচার প্রসঙ্গে সঙ্গত উক্তিই করেছিলেন,

"প্রণয়ীজনের সহিত যে ভাষায় আলাপ করা যায়, স্নেহময়ী ধাত্রী বা বিশ্বস্ত পরিজনের সহিত কথোপকথনকালে যে ভাষার ব্যবহার করা যায়, অক্ষয়কুমার সাধারণতঃ সে ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করেন নাই।…যে নির্জীব ও নিশ্চেষ্ট জাতির বেদনাবোধ নাই, যে জাতি মহাপ্রাণতার অধিকারী হয় নাই, জাতীয় জীবনে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে নাই, উদ্দীপনার মর্ম পরিগ্রহ করিতে পারে নাই,…অক্ষয়কুমার সেই জাতির ভাষায় প্রচণ্ড তাড়িতবেগ সঞ্চারিত করেন এবং সেই জাতির ভাষাকে সুসম্বদ্ধ, সুশ্রাব্য শব্দমালায় শোভিত করিয়া তুলেন। মিল্টন একটি নিত্যস্বাধীন মহাজাতিকে কোন মহান বিষয়ে প্রবর্তিত করিবার জন্য উদ্দীপনাময়ী ভাষায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। চিরপরাধীন, চিরনিপীড়িত ও চিরনিগৃহীত জাতির মধ্যে অক্ষয়কুমারের ভাষা মিল্টনের ভাষারও গৌরবস্পর্দ্ধী হইয়াছে।"[১৫] [প্রতিভা—অক্ষয়কুমার দত্ত]

বাংলা গদ্যসাহিত্যের এই উদ্দীপনাময়ী ভাষার প্রবর্তয়িতা অক্ষয়কুমার। দেশাত্মবোধের আবেগই তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল,—সেই আবেগই সংহত ভাষায় আত্মপ্রকাশ করেছে। "চারুপাঠ" ছাত্রদের সৎশিক্ষা ও সৎ আদর্শদানের উদ্দেশ্যে রচিত হয়। স্বদেশপ্রাণ লেখক শিক্ষাদানের প্রথম স্তর থেকেই দেশপ্রীতি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন। বিদ্যাঅর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই এই শিক্ষা শিশুচিত্তে অনুপ্রবেশ করুক এ ইচ্ছা ছিল লেখকের। 'বিদ্যাশিক্ষা' প্রবন্ধে অত্যন্ত প্রাঞ্জল ভাষায় নিবেদন করেছেন লেখক,—

বিদ্যা অমূল্য ধন। বিদ্যা শিখিলে হিতাহিত বিবেচনা করিয়া আপনার ও অন্যের

১৫. রজনীকান্ত গুপ্ত, প্রতিভা, "অক্ষয়কুমার দত্ত"। কলিকাতা ১৮৯৬।

দুঃখহ্রাস ও সুখবৃদ্ধি করিতে পারা যায়।...কিরূপে রাজ্যপালন ও স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে হয়, এই সমুদায় বিদ্যানুশীলন ব্যতিরেকে সুচারুরূপে জ্ঞাত হওয়া যায় না।[১৬]

এখানে শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করেছেন লেখক। শিক্ষাই স্বাদেশিকতাবোধ জাগাতে পারে,—স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনের জন্যই শিক্ষালাভ। জ্ঞানব্রতী শিক্ষক অক্ষয়কুমার শিক্ষার মর্মার্থ অনুধাবন করেছিলেন বলেই দেশসেবার শিক্ষায় অনুপ্রাণিত করেছেন ভাবী বংশধরদের।

'স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন' প্রবন্ধেও তাঁর দেশসেবার আদর্শটি স্পষ্ট হয়েছে। দেশপ্রেমিক লেখকের আন্তরিকতা প্রাঞ্জল গদ্যে রূপলাভ করেছে,—

"প্রতিদিবস আপন আপন নিত্যকর্ম সমাপন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ কাল যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনার্থে ক্ষেপণ করা কর্তব্য। যাহাতে স্বদেশীয় লোকের জ্ঞান, ধর্ম, সুখ-স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি হয়, কুরীতি সকল রহিত হইয়া সুরীতি সমুদায় সংস্থাপিত হয়, এবং রাজনিয়ম সংশোধিত ও সত্যধর্ম প্রচারিত হয়, তদর্থে সচেষ্টিত হওয়া উচিত। স্বীয় পরিবার প্রতিপালনের ন্যায় স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদনার্থে যত্ন, পরিশ্রম ও বুদ্ধি পরিচালন করা যে মনুষ্যের অবশ্যকর্তব্য কর্ম, ইহা অনেকেই বিবেচনা করেন না।...আপন আপন জীবিকা নির্বাহের উপায় চিন্তা করা যে প্রকার আবশ্যক, সেইরূপ সময়ে সময়ে একত্র সমাগত হইয়া স্বদেশের দুঃখ বিমোচন ও সুখ সম্পাদনের পরামর্শ ও চেষ্টা করাও সর্বতোভাবে দ্রষ্টব্য।"[১৭]

উদ্ধৃত অংশটিতে দেশপ্রেমিক অক্ষয়কুমারকে খুব স্পষ্টভাবেই আবিষ্কার করা যায়। উপদেশাত্মক ভঙ্গিমাটিই এখানে প্রকট হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু দেশপ্রেমের যে অনুভূতি লেখকচিত্তে গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—সর্বসাধারণ সেই অনুভূতির অংশ লাভ করুক ও তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হোক এ ছিল লেখকের উদ্দেশ্য। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রথম পর্বে এ জাতীয় ছাত্রপাঠ্য গ্রন্থমালাতেও লেখক আপন আদর্শ প্রচার করেছেন অকপটে। ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধমালা রচনা করে ছাত্রদের কাছে জ্ঞানের ভাণ্ডার উন্মুক্ত করাই তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না, তাই আন্তরিক-ভাবে যে আদর্শ নিজের জীবনে অনুসরণ করেছিলেন—ছাত্রসমাজকেও সেই আদর্শের দীক্ষাই দিয়েছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে বঙ্কিমচন্দ্র রূপক ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে যে সত্য প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন—অক্ষয়কুমার অকপট সারল্যের সঙ্গেই তা প্রচার করেছেন। আত্মস্বার্থ বিসর্জন দিয়ে পরের কল্যাণ সাধন যে ব্রত হিসেবে

১৬. অক্ষয়কুমার দত্ত, চারুপাঠ, ১ম ভাগ। কলিকাতা ১৮৫৩।

১৭. অক্ষয়কুমার দত্ত, চারুপাঠ। ২য় ভাগ। কলিকাতা ১৮৫৪।

অবশ্যপালনীয়,—পাশ্চাত্য মনীষীরা যে সত্য প্রচারে ব্যগ্রতা প্রদর্শন করেছেন,—বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এই সত্যটিই চিনিয়ে দিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার এ বক্তব্য কত অনাড়ম্বর দৃঢ়তার সঙ্গেই না প্রচার করেছিলেন। স্বীয় পরিবার প্রতিপালনের মতই অবশ্যপালনীয় কর্তব্য স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন,—অক্ষয়কুমারই এই মূল্যবান বক্তব্যের প্রথম প্রবক্তা।

রামমোহন-বিদ্যাসাগর সচেতন সমাজসংস্কারক। সে যুগের পটভূমিকায় প্রখর ব্যক্তিত্ব ও অনুভবশক্তি এবং সমগ্র উদ্যম নিয়ে সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন উভয়েই। স্বদেশবোধের প্রেরণাই যে সংস্কার ধর্মে উৎসাহ দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই—তবু এঁদের রচনায় স্বদেশপ্রসঙ্গ সমাজসংস্কারবিষয়কে অতিক্রম করে নি কোথাও। বস্তুতঃ এঁরা স্বসমাজ, আরও সংকুচিত ভাবে বলতে গেলে স্বসংসারের সঙ্গেই দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অতিপরিচিত আত্মীয় ও বন্ধুরাও যে সহজসত্য অনুধাবনে অক্ষম একথা বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের মত কেউ এমন বেদনার সঙ্গে অনুভব করেন নি। সুতরাং সমাজদেহের দুরন্ত ব্যাধি দূর করার মত কঠিন দৃঢ়তা প্রদর্শন করে এঁরা সুগভীর দেশপ্রীতিরই পরিচয় দিয়েছেন। এঁদের প্রস্তুত জমিতেই অক্ষয়কুমার স্বদেশের প্রতি কর্তব্য নির্দেশ করে দেশাত্মক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। দেশ-পরিবার-ব্যক্তির মধ্যে একটা নিগূঢ় সম্পর্ক রয়েছে তার কোনটিই যে উপেক্ষনীয় নয়—এ সত্য প্রচারের নির্ভীকতা তাঁর চরিত্রে ছিল। প্রথম যুগের প্রবন্ধে দেশপ্রেমের অনুভূতি যত ব্যক্ত ও অনাবৃত ভাবে প্রকাশিত হতে দেখি—পরবর্তী কালে সেই বক্তব্যই তির্যক ভঙ্গিতে প্রকাশিত হয়েছে। স্বদেশচেতনা যখন সম্পূর্ণরূপেই ব্যক্তিগত উপলব্ধিতেই সীমাবদ্ধ,—বৃহৎ জনসাধারণ যখন সম্মিলিতভাবে দেশসেবার ব্রতে এগিয়ে আসে নি,—তখন একান্তভাবে আপন আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েই অক্ষয়কুমার এই জাতীয়তাবাদ প্রবন্ধে প্রচার করেছেন। 'চারুপাঠ' ২য় খণ্ডটিতে জনগণকে দেশসাধনায় উদ্বুদ্ধ করেছেন লেখক। শিক্ষণীয় বিষয় কি হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গ বর্ণনা করতে গিয়ে দেশসাধনাও শিক্ষণীয় বিষয় বলে প্রচার করেছেন। শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিদের তালিকায় পিতামাতার সঙ্গে স্বদেশহিতৈষীরও উল্লেখ রয়েছে। স্বদেশসাধনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেছেন,—

"যাহাতে স্বদেশে জ্ঞান ও ধর্ম প্রচারিত হয়, স্বদেশীয় কুরীতি সকল পরিবর্তিত ও সংশোধিত হয় এবং স্বদেশস্থ লোকের অবস্থা উত্তরোত্তর উন্নত হয় তাহার উপায় ও উদ্যোগ করা অবশ্যকর্তব্য কর্ম। স্বদেশ আমাদের সকলের গৃহ স্বরূপ। স্বদেশের শুভানুষ্ঠানে উপেক্ষা করা অধম লোকের স্বভাব।"

[নীতিচতুষ্টয় চারুপাঠ, ২য় খণ্ড]

অক্ষয়কুমারের দেশপ্রীতির মধ্যে এমন একটি অনাড়ম্বর সৌন্দর্য বর্তমান। দেশপ্রেম তাঁর চরিত্রে ওতপ্রোত হয়ে আছে—রচনাতেও তার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশই লক্ষ্য করা যায়। নানা ধরণের শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু আলোচনা করার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রের মূল উপাদান কি হওয়া দরকার—সে বিষয়টিও উপদেশচ্ছলে বর্ণনা করেছেন। স্বদেশের প্রতি মমত্ববুদ্ধিহীনের বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা খুঁজে পান নি লেখক।

এই খণ্ডের একটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'জন্মভূমি'। লেখকের স্বদেশানুরাগ যেন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে এখানে। ঈশ্বরগুপ্ত থেকেই সমাজসচেতনতা ও রাজনীতি সচেতনতা প্রতিটি লেখকচরিত্রের বৈশিষ্ট্যরূপে ধরা পড়েছে। অক্ষয়কুমারও সমাজ সচেতন লেখক। জন্মভূমির দুর্দশা অনুভব করে বেদনাবোধ করেছেন তিনি। তখনও যে স্বদেশসচেতন লেখকবৃন্দ পরাধীনতার জ্বালা হৃদয়ঙ্গম করেছেন—অক্ষয়-কুমারের রচনা সে সাক্ষ্যই দেবে। 'জন্মভূমি' প্রবন্ধটিতে অক্ষয়কুমার অকপটে আপন স্বদেশানুরাগ ব্যক্ত করেছেন,—

"জন্মস্থান স্নেহের আস্পদ। যে স্বদেশানুরাগী চিরপ্রবাসী ব্যক্তি ভূস্বর্গস্বরূপ স্বদেশের কোন নদী বা সরোবর, প্রাচীন বৃক্ষ বা প্রসিদ্ধ উৎসব ভূমি, প্রিয়বন্ধুর আবাস বা সর্বাপেক্ষা প্রিয়তর স্বীয় বাটী, প্রণয়—পবিত্র মিত্রমণ্ডলী বা নিজ নিকেতনস্থ মূর্তিমতী প্রীতিস্বরূপ মনোহর মুখমণ্ডল সকল সহসা স্মরণ করিয়া, তাহাদিগকে নেত্রগোচর করিবার নিমিত্ত, একান্ত উৎসুক হইয়াছেন, তিনিই জানেন, স্বদেশ কিরূপ প্রীতিভাজন ও স্বদেশীয় বস্তুর কেমন প্রেমময় ভাব।··যে সমস্ত স্বদেশা-নুরাগী বীরপুরুষ দুরন্ত শত্রুর হস্ত হইতে জননী স্বরূপা জন্মভূমির পরিত্রাণ সাধনের নিমিত্ত, অম্লানবদনে, অকুতোভয়ে উৎসাহান্বিত হৃদয়ে আপন জীবন সমর্পণ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাই জানিতেন প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর জন্মভূমির সমীপে জীবন কি তুচ্ছ পদার্থ। [চারুপাঠ—২য় খণ্ড]

পরাধীনতার বেদনা লেখকচিত্তে যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তা উদ্ধৃতিটির শেষাংশ থেকেই অনুমেয়। স্বদেশোদ্ধারব্রত পালনের জন্য জীবনকেও তুচ্ছ মনে করা উচিত এ ধারণাটিই পরবর্তীকালের লেখক কাব্য-নাটক-উপন্যাসে বিবৃত করেছেন। প্রবন্ধ সাহিত্যের আদিযুগের সফল স্রষ্টা অক্ষয়কুমারের উপলব্ধিতেও এই মূল্যবান সত্যটি ধরা পড়েছিল। জন্মভূমির দুঃখ মোচনের পবিত্র ব্রতে দীক্ষিত একটি নির্ভীক যুব সম্প্রদায়েরই স্বপ্ন দেখেছিলেন কবি। স্বদেশপ্রেমিকের কর্তব্য পালন করার জন্যই জন্মভূমির মহিমা ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন লেখক।

অক্ষয়কুমারের অন্যান্য প্রবন্ধগ্রন্থে শিক্ষণীয় বস্তুর আলোচনাই মুখ্য। জীবন-শিল্পী অক্ষয়কুমারের পরিণত রচনা—'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার'—

জর্জ কুম্বের 'Constitution of Man' গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত হয়েছে। গ্রন্থটির বিজ্ঞাপনে অক্ষয়কুমার তাঁর বক্তব্য স্পষ্টভাষায় জানিয়েছেন। গভীর জীবনবোধ ও প্রজ্ঞার সম্মিলনে লেখকচিত্ত যখন উদ্ভাসিত—সেই সময়েই গ্রন্থটি রচিত হয়েছে। যুক্তি ও বিশ্বাস অকপটে ব্যক্ত করে অক্ষয়কুমার নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন গ্রন্থটিতে। ধর্মপথ অবলম্বন করার উপদেশ দিয়েছেন লেখক;—গভীর জীবন-জিজ্ঞাসার প্রমাণ হিসেবে অভিজ্ঞ প্রাবন্ধিক অক্ষয়কুমার ধ্রুবপথটি চিনিয়ে দেবার স্বপক্ষে নানা যুক্তিও দেখিয়েছেন।

লেখক এ প্রবন্ধে সমাজ সংস্কারকদের মূল্যায়ন করেছেন এভাবে,—

"মধ্যে মধ্যে কোন কোন মহাত্মা স্বদেশহিতৈষী, ন্যায়পরতা ও অসামান্য বুদ্ধি শক্তি প্রকাশপূর্বক স্বদেশ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, কারণ তাঁহারা ধর্মপরায়ণ ছিলেন।" ধর্মচেতনাই সব সৎকর্মানুষ্ঠানের প্রেরণা জোগায় এ বিশ্বাস লেখকচিত্তে দৃঢ়মূল। এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি নির্ভয়ে ভারতবর্ষের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিশ্লেষণ করেছেন,—

"ইংরেজেরা যে সকল নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির বশীভূত হইয়া আমেরিকাবাসিদিগের উপর অত্যাচার করিয়াছিলেন, সেই সকল প্রবৃত্তিরই অনুবর্তি হইয়া ভারতবর্ষ অধিকার ও শাসন করিয়া আসিতেছেন। বিরলে বসিয়া এ বিষয় আলোচনা করিলে বিস্ময় সাগরে মগ্ন হইতে হয়।"[১৮]

[বিজ্ঞাপন—বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার]

পরাধীন ভারতের নাগরিক হয়েও অক্ষয়কুমার শাসকগোষ্ঠীর সমালোচনা করেছেন নির্ভীকভাবে। ধর্মশূন্যতাই অত্যাচারীর সম্বল, ধর্মপথ বিচ্যুতিই সাময়িক সমৃদ্ধির কারণ, কিন্তু চিরস্থায়ী সম্পদ শুধু ধর্মের দ্বারাই লাভ করা সম্ভব। এই যুক্তির সাহায্যেই লেখক মুক্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছেন—

"ইংরেজেরা অধর্ম সহকারে ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছেন এবং অধর্ম সহকারে শাসন করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু পরমেশ্বরের নিয়ম লংঘন করিলে অবশ্যই তাহার প্রতিফল প্রাপ্ত হইতে হয়।" [ঐ]

আজকের দৃষ্টিতে অক্ষয়কুমারের এই উক্তিকে ভবিষ্যৎ বাণীর মতই মনে হয়। ইংরেজের অধীনে বসবাস করেও স্বাধীন মনটি লেখক হারিয়ে ফেলেন নি। সত্য বলার নির্ভীকতা অক্ষয়কুমারের রচনার সর্বাপেক্ষা বড়ো সম্পদ। ইংরেজের এদেশ

১৮. অক্ষয়কুমার দত্ত, বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার। ২য় ভাগ। কলিকাতা। ১৮৫২।

অধিকার সম্পর্কে লেখকের চিন্তাধারার স্পষ্টতাও এখানে লক্ষণীয়। আর উপলব্ধির সত্যতা মুক্তকণ্ঠে প্রকাশ করার কোনো সংকোচও নেই তাঁর রচনায়। কিন্তু অত্যাচারী ইংরেজের অপকীর্তির নিন্দা করেও আত্মপক্ষ নির্বিচারে সমর্থন করেন নি তিনি। ভারতবাসীর স্বাধীনতা বিলুপ্তির কারণ নির্ণয়েও তিনি অপরিসীম দূরদর্শিতা ও নির্ভীকতা প্রদর্শন করেছেন। ভারতবাসীর অধঃপতনের মূলেও তিনি ধর্মহীনতার হেতুটিই আবিষ্কার করেছেন, —

"কিন্তু ইহাও বিবেচনা করিতে হইবে যে পরাধীনলোকের অধর্ম না থাকিলে স্বাধীনত্ব নষ্ট হয় না। আপনার দিগের শারীরিক দুর্বলতা এবং বুদ্ধিবৃত্তি ও ধর্মপ্রবৃত্তির হীনতাই তাহারদিগের এরূপ দুর্ঘটনার মূল কারণ। বোধ হয়, একজাতির উপরে অন্যজাতির অত্যাচার করিবার ক্ষমতা এই অভিপ্রায়ে প্রদত্ত হইয়া থাকিবেক, যে অত্যাচারিত জাতি নিতান্ত অসহিষ্ণু হইয়া আপনারদিগের পরিত্রাণার্থ অধিকতর বলবীর্য প্রকাশে চেষ্টা করিবেক।" [ঐ]

এই ভাবেই লেখক ভারতবাসীর চরিত্রবিচারে নিরপেক্ষ সত্যটিই প্রকাশ করেছেন। স্বদেশচিন্তার মধ্যে সংকীর্ণ জাতীয়চেতনার চেয়ে সত্যধারণাকে প্রতিষ্ঠা করাই অক্ষয়কুমারের দেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। ইংরাজ অধিকারের মধ্যে যেমন তিনি অন্যায় অত্যাচারের প্রতিচ্ছবি দেখেছেন ইংরেজশাসনের ফলাফল বিচারে কিন্তু সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ সত্যই তুলে ধরছেন।

"কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, ইতিপূর্বেই ইহা সম্পন্ন হইয়াছে, ভারতবর্ষে ইংরেজদিগের অধিকারে যে প্রকার সুখসৌভাগ্যের আলয় হইয়াছে, স্বকীয় রাজাদিগের অধিকারকালে সেরূপ কখনই হয় নাই। কিন্তু কেবল ইংরেজদিগের কথা প্রমাণে এ বিষয় অবধারিত করিতে পারা যায় না, পরাধীন লোকদিগের বাক্য দ্বারা ইহা কখনও সপ্রমাণ হইতে শুনা যায় নাই। বিশেষতঃ, ইহা প্রসিদ্ধই আছে, যে আমরা হিন্দুদিগকে পরাধীন জাতি বিবেচনা করিয়া শাসন করি, এবং তদনুসারে তাহারদিগকে সমুদায় উচ্চ উচ্চ সম্ভ্রান্ত পদলাভে বঞ্চিত রাখি। [ঐ]

অক্ষয়কুমারের নিরপেক্ষ বিচারনীতি সত্যানুসন্ধানেই ব্যস্ত—যুক্তি ও নীতির আলোকেই সত্যের স্বরূপ ব্যাখ্যার চেষ্টা এখানে প্রকট। ইংরাজ অধিকার এদেশের পক্ষে আশীর্বাদ কি অভিশাপ—এ নিয়ে বাদানুবাদ প্রবল হয়ে উঠেছিল যে যুগে অক্ষয়কুমার তাঁর সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করেছিলেন তখন। দেশানুরাগী ও সত্যসন্ধী লেখক অক্ষয়কুমার কর্মে, জীবনে ও সাহিত্যে একই আদর্শ প্রচার করে গেছেন।

'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' রচনার প্রেরণাও ইংরাজী গ্রন্থ Wilson-এর 'Essays and Lectures on the Religion of the Hindus' অক্ষয়কুমার

তখন মানসিক স্থিরতা হারিয়েছিলেন। এ সম্বন্ধেও রজনীকান্ত গুপ্ত 'প্রতিভা' গ্রন্থে বলেছেন,—

এই অস্থিরতার মধ্যে তাঁহার হৃদয়ে অনেক ভাবের উদয় হইয়াছে। বিশেষতঃ গরীয়সী জন্মভূমির শোচনীয় অধঃপতনের কথা যখন তাঁহার মনে হইয়াছে, তখন তিনি তীব্র যাতনায় অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন। [অক্ষয়কুমার দত্ত—প্রতিভা]

প্রথম যুগের প্রবন্ধ স্রষ্টাদের আদর্শ জীবনচরিত—ধর্মবোধ—কর্মনিষ্ঠা প্রখর আত্ম-স্বাতন্ত্র্যচেতনা—স্বদেশপ্রীতি তাঁদের রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। এঁদের সাহিত্য সৃষ্টির মূলে ছিল সমাজকল্যাণপ্রচেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্র যে আদর্শের কথা ঘোষণা করেছেন, এযুগের প্রাবন্ধিকদের রচনায় তা স্বতপ্রকাশিত।

বাংলা গদ্য সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায়ের উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিকদের অগ্রগণ্য ছিলেন রাজনারায়ণ বসু। প্রাবন্ধিক রাজনারায়ণ শুধু নন,—স্বদেশপ্রেমী প্রাবন্ধিক রাজনারায়ণই আমাদের আলোচনায় স্থান পাবেন। হিন্দুকলেজের প্রখ্যাতনামা ছাত্র রাজনারায়ণের বিচিত্র কর্মজীবনের স্তরভাগ করলে নানা তথ্য উদ্ঘাটন করা যাবে। মধুসূদন-ভূদেব-মহর্ষিদেবেন্দ্রনাথের বন্ধু হিসেবে—রাজনারায়ণের যে পরিচয় পেয়েছি, পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতির' বর্ণনার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে মোটামুটি একটা সঙ্গতি আবিষ্কার করা অসম্ভব নয়। হিন্দু কলেজের স্বদেশপ্রেমিক শিক্ষক ডিরোজিওর সুযোগ্য ছাত্র রাজনারায়ণের জীবনে-কর্মে ও সাহিত্যরচনায় স্বদেশপ্রেমই প্রধান স্থান অধিকার করেছিল। ইয়ংবেঙ্গলের সদস্য হিসেবে তিনি বহু বিচিত্র চরিত্রের ও বৈপরীত্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। মধুসূদনের প্রতিভাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব, ভূদেবের প্রশান্ত গাম্ভীর্যও দেবেন্দ্রনাথের আধ্যাত্মি-কতাকে হৃদয়ঙ্গম করে তিনি আত্মস্থ হতে পেরেছিলেন। রাজনারায়ণের অধিকাংশ রচনার মূলানুসন্ধান করলে দেখা যাবে, আত্মস্মৃতিমূলক বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাজনারায়ণ সেই সংঘাতময় যুগটির প্রামাণ্য দলিল দাখিল করেছেন। যে গ্রন্থরচনা করে তিনি খ্যাতি ও সম্মানের অধিকারী হয়েছিলেন সেই গ্রন্থসমষ্টিতে রাজনারায়ণ আপন অভিজ্ঞতারই বর্ণনা দিয়েছিলেন।

রাজনারায়ণই প্রথম হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোজিওর স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গটি বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করেন। ডিরোজিওর স্বদেশপ্রেমের কবিতাটির মূল ও তর্জমা প্রকাশ করে তিনিই শিক্ষিত সমাজের কাছে আবেদন করেছিলেন স্বদেশভক্ত হওয়ার। স্বদেশপ্রেমিক ডিরোজিওর প্রভাবেই রাজনারায়ণও দেশপ্রেমের দীক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। স্বদেশের ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েই তিনি সমগ্র জাতিকে যথার্থ স্বাদেশিকতার মর্মার্থ ব্যাখ্যা করেছিলেন। নিজের জীবনের উপলব্ধ সত্য প্রচারে

তিনি উৎসাহী ছিলেন। রাজনারায়ণের স্বাদেশিকতার চেতনার মধ্যে একটি অনাড়ম্বর পরিবেশ ছিল তাই নিজের বিশ্বাস ও সত্যকেই দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেছেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে যুবকমনে স্বদেশপ্রেম স্থায়িভাবে উন্মেষিত করার জন্য তিনি ধর্ম ও পুরাতত্ত্ব বিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় লিখেছিলেন,—

ঈশ্বরের প্রিয় কার্যের মধ্যে স্বদেশের উপকার সাধন সর্বাপেক্ষা প্রধান।...ভারতবর্ষ আমাদিগের জন্মভূমি, ভারতবর্ষের উপকার সাধনে আমরা প্রাণপণে যত্ন করিব।... যাহাতে ভারতবর্ষীয় আর্যকুলের আদি পুরুষ বৈবস্বত মনু হইতে রাজপুতানার বীরকুল চূড়ামণি প্রতাপসিংহের সময় পর্যন্ত ভারতের মহিমার প্রধান কথা অবলম্বন করিয়া হিন্দুজাতি উন্নতির মঞ্চে ক্রমে ক্রমে আরোহণ করিতে সমর্থ হয়, আমরা প্রাণপণে এরূপ চেষ্টা করিব।[১৯]

উদ্ধৃত উক্তির আলোকে রাজনারায়ণের স্বদেশপ্রেমের স্বচ্ছ রূপটি আমাদের চোখের সামনে উদ্ভাসিত হয়। ঈশ্বর অনুসন্ধানের বাসনা ছিল না তাঁর—কিন্তু ঈশ্বরের প্রিয় কার্যসাধনে জীবন উৎসর্গ করার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন তিনি। জন্মভূমির উপকার সাধনের জন্যই সাহিত্যসেবার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন রাজনারায়ণ।

১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা হলেও 'সেকাল আর একাল' গ্রন্থটিতে রাজনারায়ণ তাঁর ছাত্রজীবনের আত্মস্মৃতিই অবলম্বন করেছিলেন। কিন্তু এ গ্রন্থরচনার একটি হেতু নির্ণয় করেছিলেন রাজনারায়ণ। বহুদিন পর তত্ত্ববোধিনী সভার সহকর্মী অক্ষয়-কুমার দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার পর অক্ষয়কুমারের পরামর্শেই 'সেকাল আর একালের' জন্ম হয়েছে। বিজ্ঞাপনে রাজনারায়ণ একটি কারণ নির্ণয় করেছেন,—

"ইংরাজী শিক্ষার ইষ্টবিষয়ে অনেক প্রবন্ধ লেখা হইয়াছে, তাহা হইতে যে সকল অনিষ্ট উৎপত্তি হইতেছে তদ্বিষয়ে কেহ প্রবন্ধ লেখেন নাই, আমি সে বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লিখি, পূর্বে আমার এইরূপ মানস ছিল।" [সেকাল আর একাল]

এই উদ্দেশ্যটি যে স্বদেশহিতৈষী রাজনারায়ণের নিবিড় দেশচিন্তারই ফলাফল মাত্র সেকথা সহজেই বোঝা যায়। ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষাপ্রীতি তাদের জীবনের আচরণেও প্রতিফলিত হয়েছিল। রাজনারায়ণ যখন প্রৌঢ়ত্বে উপনীত—তখন ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়কে একটা নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচারের সুযোগ পেয়েছিলেন। শিক্ষাজীবনে তিনি নিজেই ইয়ংবেঙ্গলের কর্ণধার ছিলেন—যদিও 'সেকাল আর একালে' তাঁর পরিশুদ্ধ অনুভব এবং মহৎ দেশভাবনার স্পষ্ট

১৯. সাহিত্য সাধক চরিতমালা। ৪র্থ খণ্ড। রাজনারায়ণ বসু থেকে উদ্ধৃত।

স্বাক্ষর রয়েছে। ইংরাজী শিক্ষার ফলে কিছু অনিষ্ট যে সৃষ্টি হয়েছিল—রাজনারায়ণ 'সেকাল আর একালে' সেকথাই আলোচনা করেছেন।

ইংরাজী শিক্ষার ফলে বাংলাসাহিত্য, বাংলাভাষা, বাঙ্গালীর পোষাকগত পরিবর্তনের যে রূপটি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি 'সেকাল আর একালে' তার প্রকাশ্য সমালোচনা করেছিলেন। স্বদেশপ্রেমী রাজনারায়ণ স্বকীয়ত্বের মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্যই চেষ্টা করেছেন। ইংরাজীশিক্ষার প্রভাবে আমাদের কুসংস্কার বিনষ্ট হোক এ তার আন্তরিক কামনা হলেও সে যুগের পটভূমিকায় এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাজনারায়ণ পূর্ণ মাত্রায় অবহিত ছিলেন—কিন্তু সর্বগ্রাসী কিংবা আত্মনাশী অনুকরণের মোহ থেকে বাঙ্গালীকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন বলেই উচ্চকণ্ঠে সমালোচনা করেছেন। রাজনারায়ণের স্বদেশপ্রেমের ভিত্তি সম্পূর্ণভাবে স্বসমাজপ্রীতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত ছিল—কিন্তু তাঁকে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল বলে মনে করার কোন কারণ নেই। রাজনারায়ণ ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের তুলনামূলক আলোচনা থেকে উভয়ের আদর্শগত পার্থক্যটি স্পষ্ট হবে।

ইংরাজী শিক্ষার প্রারম্ভিক অবস্থায় ভূদেবের রক্ষণশীলতাই তাঁকে অন্যান্য সহাধ্যায়ীদের থেকে পৃথক করে রেখেছিল। রাজনারায়ণ নিজেকে অন্যান্য সহাধ্যায়ীদের সঙ্গে এক বলে ধরে নিয়েছিলেন। নতুন তরঙ্গে ভেসে গিয়েও অকূল সমুদ্রে দিশাহারা হয়ে পড়েন নি, এখানেই ছিল রাজনারায়ণের বিশিষ্টতা। দেবেন্দ্র-নাথের ধর্মানুরাগ, অক্ষয়কুমারের শিক্ষাব্রত, ভূদেবের রক্ষণশীলতা রাজনারায়ণে পাওয়া যাবে না—অথচ দৃষ্টিভঙ্গীর অসীম ঔদার্যে তিনিও ছিলেন আদর্শ পুরুষের প্রতীক। দেশপ্রেমের আলোক তাঁর চিত্তের গভীরে প্রবেশ করেছিল, দেশই ছিল তাঁর আরাধ্য বস্তু। সাহিত্যে-কর্মে-জীবনে দেশচিন্তাই স্থান পেয়েছে সবার ওপরে। রাজনারায়ণ সম্পর্কে সাহিত্য সাধক চরিত-মালাকার বলেছেন,—

"পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় বিভ্রান্ত বাঙ্গালী সমাজকে রাজনারায়ণ বরাবর আত্মস্থ হইতে উপদেশ দিয়াছেন এবং আজীবন জাতির সত্যকার উন্নতির পথ নিরূপণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। মাতৃভাষার অনুশীলনে রাজনারায়ণের প্রযত্ন সর্বজনবিদিত। বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর জাতীয়তা একটি স্বতন্ত্র ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয়তা সৌধ গড়িতে হইলে স্বদেশীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ভাষা, সাহিত্য, খাদ্য, পোষাকপরিচ্ছদ, শিল্পসম্পদ প্রভৃতির মূল ঠিক রাখিয়া প্রত্যেকটিরই উৎকট সাধনা যে আবশ্যক, তাহা তিনি প্রতিনিয়ত স্বদেশবাসীর কর্ণকুহরে ধ্বনিত করিয়াছেন।"

[সাহিত্য সাধক চরিতমালা, উপক্রমণিকা—যোগেশচন্দ্র বাগল]

রাজনারায়ণের দেশচিন্তার এই বৈশিষ্ট্য যে-কোন সমালোচকই লক্ষ্য করেছেন। স্বদেশপ্রেমের বিশুদ্ধ প্রেরণাই তাঁর সৃজনী প্রতিভার মূলে বিরাজমান। রাজনারায়ণই স্বদেশপরায়ণতা ব্যাখ্যা করে স্বদেশীয়দের মনে জাতীয় চেতনার সঞ্চার করেছিলেন। জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভার উদ্ভাবক রাজনারায়ণই যে চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলার প্রেরণা দান করেছিলেন, রাজনারায়ণের লেখা 'আত্মচরিতে' সে প্রসঙ্গ বর্ণিত হয়েছে। এই হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করেই জাতীয়ভাব সমগ্র জাতির চেতনায় প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সেদিক থেকে বিচার করলে রাজনারায়ণকে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়ভাবের প্রথম প্রবক্তা বলা যেতে পারে। রাজনারায়ণ স্বদেশপ্রেমকে বাস্তবতার ভূমিতে নামিয়ে এনেছিলেন। প্রাত্যহিক জীবনের প্রতিটি কর্মে-চিন্তায় স্বদেশপ্রেমের আবেগ সঞ্চারিত না হলে নিছক বক্তৃতায় ও সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হতে বাধ্য। রাজনারায়ণ তাই দেশসেবাকে আচরণের সীমানায় প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। রাজনারায়ণের প্রবন্ধ আলোচনাকালে তাঁর চিন্তার সূত্রটি এভাবেই বিশ্লেষিত হতে পারে।

রাজনারায়ণ বাঙ্গলাভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার উদ্দেশ্যে বহুবার আবেদন করেছেন। মধুসূদনের আবাল্য বন্ধু রাজনারায়ণ ইংরাজী শিক্ষার কুফল বর্ণনা করেছিলেন আপনার অভিজ্ঞতা থেকেই। ভাষাপ্রীতি যে স্বদেশপ্রীতিরই নামান্তর—মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু রাজনারায়ণের চেয়ে এ সত্য এমন তীব্রভাবে কেউ হৃদয়ঙ্গম করেন নি। এই ভাষাপ্রীতির অভাবই মধুসূদনকে পথভ্রষ্ট করেছিল—রাজনারায়ণ একথা বিশ্বাস করতেন। ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষার দাবী প্রথম রাজনারায়ণই উত্থাপন করেছিলেন। জাতীয়তাবোধের উন্মেষ লগ্নে এজাতীয় মনোভাবের মধ্যে উদারতার অভাব লক্ষ্য করার চেয়ে জাতীয় স্বার্থরক্ষার মহত্ত্বই আবিষ্কার করা দরকার। শিক্ষাদীক্ষার প্রভাবে বিদেশীয়ানার প্রাবল্যে এদেশে যে ধরণের বিকৃত মনোভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল 'একেই কি বলে সভ্যতায়' মধুসূদন তা চিত্রিত করেছেন। এই মনোভাবের অবসান না ঘটলে সত্যিকারের জাতীয়চেতনা জন্ম নেবে কি করে? রাজনারায়ণের দূরদর্শিতা ছিল বলে জাতির অধঃপতন রোধ করার প্রাথমিক উপায় নির্দেশ করেছিলেন তিনি। রাজনারায়ণের যুক্তিও ছিল খুব সহজ ও সাধারণবোধ্য। 'সেকাল আর একালে' তিনি বলেছিলেন,—

বাঙ্গালা ভাষায় ইংরাজী শব্দ মিশাইয়া কথা কহার আমি সম্পূর্ণরূপে বিরোধী।

[পৃঃ ৪১]

তাঁর যুক্তি ছিল,—

'শুদ্ধ গ্রন্থলেখা ও কথোপকথনে হীন অনুকরণ দৃষ্ট হয়, এমন নহে, সকল

বিষয়েই ঐ হীন অনুকরণ দৃষ্ট হয়। একটি সামান্য পত্র লিখিতে হইলে তাহা ইংরাজীতে লেখা হয়। কোন ইংরাজ, ফ্রেঞ্চ অথবা জার্মানভাষায় স্বদেশীয় লোককে পত্র লিখে?···

···যাহাতে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হয় তাহা কখন অকিঞ্চিৎকর হইতে পারে না। এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইতে হইতে মহৎ বিষয়ে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিত হইবে।' [সেকাল আর একাল ৫৪-৫৫ পৃঃ]

'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা'তেও রাজনারায়ণ কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা যে-কোন স্বদেশপ্রাণ মানুষেরই একান্ত কাম্য কিন্তু জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণার অভাব থাকলে রাজনৈতিক স্বাধীনতা আসতে পারে না। রাজনারায়ণ প্রমুখ স্বদেশসেবীরা জাতীয়তাবোধ জাগানোর চেষ্টা করেছেন বলেই তাঁদের চিন্তাধারায় কিছু উদারতার অভাব চোখে পড়ে। ভাষা ও সাহিত্য সংগ্রহ করেই সমৃদ্ধ হতে পারে কিন্তু দৈনন্দিন কথাবার্তায় সম্পূর্ণ দেশীয়ভাষা প্রয়োগের রীতিকে বর্জন করে সুলভ খ্যাতি অর্জনের দুরাশায় শিক্ষিত গোষ্ঠীর মনোবিকলনই সেযুগে প্রকাশিত হয়েছিল,—রাজনারায়ণ তারই প্রতিবাদ করেছেন। প্রকৃত দেশহিতৈষীর আন্তরিকতা নিয়েই রাজনারায়ণ পথভ্রষ্ট ও শিক্ষিত বাঙ্গালীকে সচেতন করেছেন মাত্র।

অদ্যাপি আমরা দেশীয় ভাষায় কথোপকথন করিবার সময় অধিকাংশ ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করি। আমাদিগের কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদিত না হইলে বাঙ্গলা বক্তৃতায় বিশেষ নৈপুণ্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। খাঁটি ইংরাজীতে কথোপকথন করিলে আমরা ইংরাজী ভাষায় উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি, কিংবা খাঁটি বাঙ্গালাতে কথোপকথন করিলে আমরা বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি। কিন্তু খিচুড়ি করিলে কোন ভাষাই উত্তমরূপে কহিতে শিক্ষা করিতে পারি না।[২০]

স্বদেশীয় ভাষানুশীলন প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ বক্তৃতায়, আলোচনায় তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন নানাভাবে। হেয়ার সাহেবের স্মৃতিসভায় একদা রাজনারায়ণ মন্তব্য করেছিলেন মাতৃভাষাপ্রীতি সম্পর্কে,—

"যথার্থ বলিতে কি হোমর, প্লেটো ও সফোক্লিস রচিত চারুতম নিরুপম কাব্যরস পানের প্রভূত সুখ সম্ভোগ করি, কিম্বা চরিত্র বর্ণনা নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শক সেক্সপিয়ারের অমৃত ধর্মপ্রাপ্ত নাটক সকল অধ্যয়ন করিয়া অত্যন্ত উল্লাসিত হই,

২০. রাজনারায়ণ বসু, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, কলিকাতা, ১৮৭৪, পৃঃ ৬৬

কিম্বা অদ্ভুত কল্পনা শক্তিসম্পন্ন গেটে ও শিলরের কাব্য পাঠ করিয়া আশ্চর্য্যার্ণবে মগ্ন হই তথাপি এক আশা অসম্পূর্ণ থাকে,—এক তৃষ্ণা অনিবৃত্ত থাকে, সেই আশা স্বদেশকে জগজ্জনপূজ্য বিশালখ্যাতি গ্রন্থকারদিগের যশঃ সৌরভ দ্বারা প্রফুল্ল দেখিবার আশা, সে তৃষ্ণা স্বদেশীয় সমীচীন কাব্যক্ষরিত অমৃত ধারা পান করিবার তৃষ্ণা।[২১] [বিবিধ প্রবন্ধ, প্রথম খণ্ড, স্বদেশীয় ভাষানুশীলন]

এখানে স্বদেশপ্রেমের সমস্ত আবেগ মাতৃভাষাপ্রীতি ও সাহিত্যপ্রীতিরূপে প্রকাশ পেয়েছে। রাজনারায়ণ মাতৃভাষার একনিষ্ঠ সাধকরূপে প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচন করেছেন। এটি এমন সময়,—যার মাধ্যমে স্বদেশপ্রেম জাগানো সম্ভব। মাতৃভাষা প্রীতিকে তিনি স্বদেশপ্রীতিরই নামান্তর বলে মনে করতেন। যে-কোন প্রসঙ্গেই মাতৃভাষাস্তুতি সম্পর্কিত বিষয়কে অবলম্বন করে রাজনারায়ণের উচ্ছ্বাস দেখেছি। বাংলা সাহিত্য সম্পর্কিত আলোচনার উপসংহারেও তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়েছেন।

"যখন আমরা দেখিব যে, তাঁহারা কথোপকথনের ভাষার বিশুদ্ধতা সম্পাদন করিতে সচেষ্ট হইয়াছেন, যখন আমরা দেখিব যে দেশীয় ভাষাতে পত্র লিখিতে তাহারা হেয় বোধ করেন না, যখন আমরা দেখিব যে, তাঁহারা ইংরাজী ভাষা অপেক্ষা বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিতে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছেন, তখন আমরা বলিতে পারিব যে, স্বদেশের প্রতি তাঁহাদিগের প্রকৃত প্রেম উদিত হইয়াছে। তাঁহারা নিশ্চয়ই জানিবেন, জাতীয় ভাষায় উন্নতিসাধনের প্রতি জাতীয় উন্নতি নির্ভর করে।"

[বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা পৃঃ ৭৪]

মাতৃভাষাপ্রীতির অজস্র প্রমাণ রাজনারায়ণের সমগ্র প্রবন্ধ সাহিত্যেই বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। তাঁর সমস্ত বক্তব্যের সারসংকলন করা কিছু দুরূহ নয়—কিন্তু একই বিষয়ের পুনরাবৃত্তির প্রবণতার আলোকে রাজনারায়ণের স্বদেশপ্রেমিকতাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে।

ভাষাপ্রীতির সঙ্গে মাতৃভূমির প্রতি অগাধ ভালবাসার পরিচয়ও তিনি ব্যক্ত করেছেন নানাভাবে। ১৭৭৮ শকে হেয়ার সাহেবের স্মরণার্থ স্মৃতিসভায় তিনি বলেছেন—"প্রত্যেক ব্যক্তির সম্বন্ধে পৃথিবীর সকল স্থান অপেক্ষা কোন এক বিশেষ স্থান সর্বাপেক্ষা মনোহর। ধ্রুবতারার প্রতি যেমন দিগদর্শনের শলাকা লক্ষিত থাকে, তেমনি বিদেশাগত পুরুষের চিত্ত সেই স্থানের প্রতি লক্ষিত থাকে। সেই স্থান তাঁহার স্বদেশ। সেই স্থানের সহিত তাঁহার বালসখিত্ব, সেই স্থান তাঁহার প্রাণপ্রিয়-জনদিগের আবাস। সেই প্রিয় মনোহর স্বদেশ নিরুর্বর ও প্রমোদজনক দৃশ্যশূন্য

২১. রাজনারায়ণ বসু, বিবিধ প্রবন্ধ। ১ম খণ্ড। কলিকাতা ১৮৮২।

হইলেও উৎকৃষ্ট অন্য কোন দেশ—এমন কি কাশ্মীরের নির্মল হ্রদ ও মনোহর উদ্যান ও সিরাজের সুচারু গোলাবপুষ্পের উপবন ও নেপলস সন্নিহিত জলের ও তটের নয়ন বিমুগ্ধকর শোভায় হাস্যমান বিখ্যাত উপসাগর পর্য্যন্ত তাঁহার মনকে আকৃষ্ট করিয়া রাখিতে পারে না, এমন স্বদেশ ও স্বদেশীয় ভাষার প্রতি যাঁহার অনুরাগ নাই, তাহাকে কি মনুষ্য বলা যাইতে পারে?" [বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা পৃঃ ৭৩]

উদ্ধৃত অংশে রাজনারায়ণের দেশপ্রীতির গভীরতা উপলব্ধি করে বিস্মিত হই। এজাতীয় আন্তরিক অনুভূতিও প্রবন্ধের বিষয় করে তুলেছেন লেখক। এতে দেশানুরাগী রাজনারায়ণকেই বিশেষভাবে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। বাংলা প্রবন্ধের গঠন পর্বের লেখক হিসেবেই রাজনারায়ণের আবির্ভাব। প্রথম যুগের প্রাবন্ধিকদের রচনায় বিষয়নিষ্ঠার প্রাধান্যই লক্ষ্য করেছি,—রাজনারায়ণের প্রবন্ধকে কিন্তু এর ব্যতিক্রম বলতে হবে। আত্মদর্শনের প্রতিফলন এ প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য। দেশপ্রেমের গভীর আবেগ প্রবন্ধের মধ্যে যে বিশেষ রসের সঞ্চার করেছে তা সহজেই অনুভব করা যায়। অবশ্য এ প্রবন্ধের অধিকাংশই কোন না কোন অনুষ্ঠানের ভাষণ হিসেবে লিখিত ও প্রচারিত হয়েছিল। বিজ্ঞাপনে রাজনারায়ণ বলেছেন,—

"এই বক্তৃতায় যাহা আছে, তাহা কেবল বাংলা সাহিত্যের ঐতিবৃত্তিক বিবরণ বিষয়ক পুস্তক হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, এমত নহে, আমার নিজের জীবনের দর্শনও অনেক সহকারিতা করিয়াছে, ইহা বলা বাহুল্য।"[২২]

বক্তৃতার ভাষণে ও প্রবন্ধের বক্তব্যে খুব বেশী পার্থক্য দেখি না,—মনীষী রাজনারায়ণের মৌলিক চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় উভয়টিতেই ব্যক্ত হয়েছে। সাহিত্যে ও জীবনে দেশপ্রেমের যে নির্মল অনুভূতির দ্বারা তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন বক্তব্যেও সেই বিষয়টিই তিনি সে যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে নিবেদন করেছিলেন।

রাজনারায়ণের দেশপ্রীতির আদর্শ মাতৃভাষার সমর্থনে সোচ্চার, মাতৃভূমির প্রেমে তদ্গত. আবার জাতীয়তাসঞ্চারের উদ্দেশ্যে পোষাক ও পরিচ্ছদেরও স্বকীয়ত্ব সৃষ্টিতে তিনি চেষ্টা করেছেন। জাতীয়তাবোধ সঞ্চারের জন্য তিনি পরানুকরণের নিন্দা করেছেন। এ ব্যাপারে রাজনারায়ণ পাশ্চাত্যের উৎকৃষ্ট ও গ্রহণীয় পন্থাকে গ্রহণ করার পরামর্শই দিয়েছেন। নিছক পরানুকরণের মধ্যে যে নীচতা ও বুদ্ধিহীনতারই পরিচয় প্রকাশ পায় এই সত্যটি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সামনে প্রমাণ করার উদ্দেশ্য পরোক্ষভাবে জাতীয়তার দীক্ষায় অনুপ্রাণিত করা - তা সহজেই অনুমান করা যায়। বস্তুতঃ এ সব তুচ্ছবিষয়ের চিন্তাতে রাজনারায়ণ অযথা কালক্ষেপণ করেন নি,

২২. রাজনারায়ণ বসু, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, কলিকাতা ১৮৭৪, বিজ্ঞাপন।

দেশপ্রেম সম্পর্কে সম্পূর্ণ অচেতন একটি জাতিকে তিনি সচেতন করে তোলার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর সামাজিক বীভৎস প্রথাগুলি দূর করে অশেষ উপকার সাধন করেছিলেন,—তাঁরাও চেয়েছিলেন স্বসমাজ ও স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কুপ্রভাবে সেই স্বকীয়ত্বই যখন নিন্দিত ও বর্জিত হতে চলেছে—রাজনারায়ণ তার বিরুদ্ধেই লেখনী ধারণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে উপদেশ দেওয়ার অধিকারও তাঁর ছিল। পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার কুফলে একদা তিনিও আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন ;—যে মুহূর্তে তাঁর চৈতন্য ফিরেছে—উপদেষ্টার আসনে এসে আপন অন্তরের নিগূঢ় অভিজ্ঞতার বাণী পরিবেশনে তিনি বিন্দুমাত্র দেরী করেন নি। রাজনারায়ণের ভঙ্গিটি ছিল উপদেষ্টার, আন্তরিকতাই ছিল তাঁর প্রধান অবলম্বন। পরবর্তীযুগে বঙ্কিমচন্দ্রও সমাজসংশোধনকার্যই জীবনের প্রধান ব্রত বলে গ্রহণ করেছিলেন—কিন্তু তাঁর ভঙ্গিটি ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। রাজনারায়ণ সমালোচক নন,—সমব্যথী।—বঙ্কিমচন্দ্র উৎকৃষ্ট সমালোচকের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন বলেই তাঁর বক্তব্যের তীব্রতা রূপকে ব্যঙ্গে নির্মম হয়ে উঠেছিল। রাজনারায়ণের গভীর দেশপ্রেম শান্ত স্তিমিত আবেদনেই পর্যবসিত হয়েছিল।

সমাজে সভ্য ও সুন্দর প্রথা প্রবর্তিত হোক এ অভিলাষ তিনি ব্যক্ত করেছেন। পরিপূর্ণ এদেশীয় ও সনাতন পথকেই তিনি আশ্রয় করতে চান নি ;—যে পথ অবলম্বনে আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে ওঠার সম্ভাবনা আছে—সেই পথটিই তিনি নির্ণয় করেছিলেন। 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার' কার্যক্রমের পরিকল্পনাটি আলোচনা করলেই রাজনারায়ণের উদ্দেশ্য খানিকটা স্পষ্ট হয়। ইংরাজী শিক্ষার সুফল হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলেই—আশা করেছিলেন সেই আদর্শে আমাদের ভবিষ্যৎ গড়ে উঠুক। 'হিন্দু বা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত'—আত্মস্মৃতিমূলক এই আলোচনা গ্রন্থটি সে যুগের একটি অমূল্য দলিল। এ গ্রন্থটিতে রাজনারায়ণ নির্ভয়ে বলেছিলেন,—

ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল এখনও ফলে নাই। ইংরাজী শিক্ষার প্রকৃত ফল তখন ফলিবে, যখন ইংরাজদিগের ন্যায় আমরা শারীরিক বললাভ করিব, সাহসী হইব, অধ্যবসায়শীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইব এবং স্বাধীনতাপ্রিয় হইব।"[২৩]

স্বাধীনতাপ্রিয় জাতিই রাজনৈতিক অধিকার লাভের বাসনায় অস্থির হতে পারে। বাঙ্গালী জাতির চরিত্রে স্বাধীনতাপ্রীতি সঞ্চার করার মহৎ উদ্দেশ্য না থাকলে এ জাতীয় গ্রন্থ রচনার উপযোগিতাও থাকত না। রাজনারায়ণ—দেবেন্দ্রনাথ—অক্ষয়-

---

২৩. রাজনারায়ণ বসু, বিবিধ প্রবন্ধ, 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত', কলিকাতা ১৮৮২।

কুমার প্রমুখ মনীষিবৃন্দ স্বাধীনতার মর্মার্থ ব্যাখ্যায় লেখনী ধারণ করেছিলেন,—স্বদেশচেতনা জাগানোর আকাঙ্ক্ষায় এঁরা সমগ্র জীবনকেই একটি আদর্শ পথে পরিচালনা করেছেন। শিক্ষা এঁদের জীবনে সুফল দান করেছিল, নবীনচেতনা ও আদর্শে উদ্দীপিত হয়ে এঁরা সমগ্র জীবনই দেশ ও দশের চিন্তায় ব্যয় করেছেন।

রাজনারায়ণের পরিকল্পনা ও স্বপ্ন ছিল বিরাট। 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভা' সংস্থাপনের প্রস্তাব তিনিই প্রথমে করেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর ইংরাজী রচনাটি ১৭৮৮ শকে প্রকাশিত হয়েছিল। বিবিধ প্রবন্ধে তাঁর বাংলা তর্জমাটি প্রকাশিত হয়। শিক্ষিত সমাজের জন্য তাঁর বক্তব্য যে ইংরাজীতে প্রকাশ করতে হয়েছিল এজন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এই সভা সংস্থাপনের প্রস্তাবটিতে লেখকের উদ্দেশ্যের সততা ও নিখুঁত পরিকল্পনা শক্তিই প্রকাশ পেয়েছে। দেশব্যাপী যে পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—তার প্রতিক্রিয়া ও ফলাফল ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

"অধুনা ইউরোপীয় জ্ঞানালোক বঙ্গদেশে প্রবিষ্ট হইয়া এতদ্দেশীয় জনগণের মনকে চিরনিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়াছে। বঙ্গীয় সমাজে অবিশ্রান্ত আন্দোলন চলিয়াছে। পরিবর্তন ও উন্নতির স্পৃহা সর্বত্রই দৃষ্টিগোচর হইতেছে।...আমরা পূর্বপুরুষদিগের নিকট হইতে যে সকল সুরীতি ও সুনীতি লাভ করিয়াছি তাহাও পাছে এই পরিবর্তনের স্রোতে ভাসিয়া যায় আশঙ্কা হইতেছে। যাহাতে শিক্ষিত দলের মধ্যে জাতীয় গৌরবোচ্ছ্বাস সঞ্চারিত হইয়া এই ভয়ঙ্কর অমঙ্গল নিবারিত হয় এবং সমাজ সংস্কারসকল জাতীয় আকার ধারণ করে, তন্নিমিত্ত এতদ্দেশীয় প্রভাবশালী মহোদয়গণ একটি সভা সংস্থাপন করুন। জাতীয় গৌরবেচ্ছার উন্মেষণ ব্যতীত কোন জাতি মহত্ত্বলাভ করিতে পারে নাই। সমগ্র ইতিহাস এই সত্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।"[২৪]

দেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ ভাবীযুগের স্বপ্নরচনায় ব্যস্ত ছিলেন কিন্তু দৃষ্টির স্বচ্ছতা হারান নি। যদি এই আন্দোলন একটা সুপরিকল্পিত লক্ষ্যের দিকে ধাবিত না হয় তার পরিণতি যে বেদনাদায়ক হবে—এ বিষয়েও তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন। নিছক ভাবাবেগে উন্মত্ত না হয়ে একটা গঠনমূলক পথে এই নবলব্ধ দেশচেতনাকে তিনি পরিচালিত করতে চেয়েছিলেন। পরিবর্তনের স্রোতে আমাদের ঐতিহ্যের আদর্শ ভেসে যাবার সম্ভাবনায় তিনি চিন্তিত হয়েছিলেন। সম্ভবতঃ এই আশঙ্কার হাত থেকে মুক্তি পাবার উদ্দেশ্যেই এই সভাটির পরিকল্পনা করেছিলেন।—এই সভাটি

২৪. রাজনারায়ণ বসু, বিবিধ প্রবন্ধ, 'হিন্দু অথবা প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিবৃত্ত', কলিকাতা ১৮৮২। শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনা সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব।

শেষ পর্যন্ত জন্মলাভ করে নি বটে কিন্তু এই সভার আদর্শেই হিন্দুমেলা জন্ম নিয়েছিল। আত্মচরিতে রাজনারায়ণ বলেছেন, "শ্রীযুক্ত নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভার অনুষ্ঠানপত্র পাঠ করাতে হিন্দুমেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়।—উহা আমার প্রস্তাবিত জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভার আদর্শে গঠিত হইয়াছিল।"[২৫]

সুতরাং হিন্দুমেলার প্রেরণা দান করে রাজনারায়ণ স্বদেশপ্রেমের আদর্শটিই বাস্তবে রূপায়িত করেছিলেন। হিন্দুমেলা যে আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সূচনা করেছিল প্রসঙ্গান্তরে সে কথা বলেছি। বাঙ্গালীর মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক ও ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলার আদর্শেই এই মেলার পরিকল্পনা হয়েছিল। রাজনারায়ণ এই মেলার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। স্বদেশীয়ানা প্রচার ও স্বদেশের জন্য গঠনমূলক কোন কাজে আত্মনিয়োগ করার আনন্দ এভাবেই তিনি লাভ করেছেন।

রাজনারায়ণের 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভার' নামকরণটিও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। নামকরণের মাধ্যমেই তিনি সভার উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করেছেন। এই সভার পূর্ব নাম ছিল 'জাতীয় গৌরব সম্পাদনী সভা।' জাতীয়চেতনা সঞ্চারের সম্ভাব্য উপায় আবিষ্কার করা ও তার প্রয়োগরীতি ব্যাখ্যা করাই ছিল এই সভার উদ্দেশ্য।

রাজনারায়ণ যে বাস্তব পন্থার নির্দেশ দিয়েছিলেন—পরবর্তী কালে সেই আদর্শ যে গৃহীত হয়েছিল এমন প্রমাণ আছে। শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে জাতীয় ব্যায়াম চর্চার পুনরুদ্দীপনার্থ সর্বতোভাবে চেষ্টা করা জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভার সর্বপ্রথম কার্য বলে পরিগণিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে রাজনারায়ণ-এর ধারণাটি আরও স্পষ্টভাবে বোঝা দরকার। বাঙ্গালীর শক্তিহীনতার অপবাদ দুর করার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর অতীত ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। শারীরিক শক্তি অর্জন করার প্রত্যক্ষ নির্দেশ বঙ্কিমচন্দ্র "আনন্দমঠ" ও "দেবী-চৌধুরানীতে" ব্যক্ত করেছেন। রাজনারায়ণের প্রচেষ্টা আরও আগেই শুরু হয়েছিল। বাঙ্গালীর ভীরুতা ও কাপুরুষতার দৃষ্টান্ত রাজনারায়ণের অন্য একটি রচনাতেও উল্লিখিত হয়েছে। "আত্মীয়সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত" নামক অভিনব পদ্ধতির রচনাটিতে তিনি তাঁর বন্ধুর [অভয়চিত্ত বন্দোপাধ্যায়] বর্ণনায় বলেছেন,—

"নব্যতন্ত্রের অনেক ব্যক্তি যেমন যেমন ইংরাজী আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণ করিতে

২৫. রাজনারায়ণ বসু, আত্মচরিত, ১৯০৮,—পৃঃ ২০৮।

বিলক্ষণ পটু, কিন্তু লালবাজারের একজন গোরা তাড়না করিলে তাঁহারা দশজন একত্র থাকিলেও পলায়ন পরায়ণ হয়েন, আমার বন্ধু তদ্রূপ নহেন। বাল্যকালাবধি তলওয়ার খেলা ও বন্দুক ছোঁড়া ও প্রত্যহ ঘোরতর ব্যায়াম অভ্যাস ও অত্যন্ত পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করাতে তিনি অতিশয় বলবান ও সাহসী।"[২৬]

এখানে রাজনারায়ণ শারীরিক দৌর্বল্যকে অত্যন্ত নিন্দা করেছেন এবং এই নিন্দাকে জাতির চরিত্র থেকে মুছে ফেলার অভিলাষ নিয়েই জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভার সর্বপ্রথম কাজ হিসেবে ব্যায়ামচর্চার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সংগঠন-মূলক দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর প্রত্যেকটি পরিকল্পনাতেই লক্ষ্য করি।

এই সভার অন্যতম প্রধান কাজ হবে একটি তৌর্য্যত্রিক বিদ্যালয় স্থাপন—যার উদ্দেশ্য তিনি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে,—

"এই সভা একটি হিন্দু তৌর্য্যত্রিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া তাহার ছাত্রগণকে এরূপ সংগীতশিক্ষা দিবেন যদ্বারা নীতিগর্ভ উপদেশ প্রদত্ত হয় এবং অন্তঃকরণে দেশহিতৈষিতা ও সমরানুরাগের সঞ্চার হইতে পারে।"[২৭]

রঙ্গলাল বীররসের কবিতা রচনা করে স্বদেশবাসীর চিত্তে উত্তেজনা সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন,—রাজনারায়ণ শুধু উত্তেজনা নয়—চরম উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চান। তিনি সমরানুরাগ সঞ্চারের কথাই প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেছেন। রাজনারায়ণের যুগেই গুপ্ত সভাসমিতির প্রচলন শুরু হয়। সমগ্র দেশবাসীকে একটি প্রত্যক্ষ সংগ্রামের নায়করূপে কল্পনা করে তিনি তাঁর বৈপ্লবিক দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীসুকুমার সেনের মন্তব্যটি স্মরণ করি—

শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্ত যখন সুপ্তি সংকীর্ণ গ্রামের বেড়া ভাঙ্গিয়া বঙ্গদর্শনেই পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে তখন রাজনারায়ণ ও তাঁহার তরুণ বন্ধুরা অখণ্ড ভারতের জাতীয় আদর্শখানি তুলিয়া ধরিলেন। ধর্ম ও সমাজ চিন্তায়, শিক্ষা ও সাহিত্যে, দেশপ্রেমে ও রাষ্ট্রীয় চেতনায় সবদিক দিয়াই তিনি স্বদেশকে আগাইয়া দিতে ব্যগ্র ছিলেন।"[২৮]

এই অদম্য প্রাণশক্তির আবেগই রাজনারায়ণ চরিত্রের বিশিষ্টতা নির্দেশ করছে। কিশোর রবীন্দ্রনাথ এই চিরতরুণ বৃদ্ধটির সংস্পর্শে এসে প্রাণের অদম্য শক্তিকে

২৬. রাজনারায়ণ বসু, বিবিধ প্রবন্ধ, আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত।

২৭. রাজনারায়ণ বসু, বিবিধ প্রবন্ধ, আত্মীয় সভার সভ্যদিগের বৃত্তান্ত। শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব।

২৮. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় খণ্ড। ১৩৬২, পৃঃ—২৬।

হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। জীবনস্মৃতির পাতায় চিরচঞ্চল বৃদ্ধটির অকৃত্রিম প্রাণবন্যার বর্ণনা পেয়েছি আমরা। রাজনারায়ণের জীবনের সমস্ত কর্মে ও চিন্তায় ঠিক এ জাতীয় মনোভাবেরই পরিচয় স্পষ্ট। "জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভা"র যে কার্যধারার পরিকল্পনা তিনি করেছিলেন—তার একটা পূর্ণ অবয়ব ছিল। জাতীয় চরিত্রের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের চেষ্টাটিই নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি।— চিকিৎসাবিদ্যালয় স্থাপন, নৃত্যগীত বিদ্যালয় স্থাপন করে সমরসংগীত শিক্ষাদান, প্রসিদ্ধ মহাত্মাদের জীবনচরিত প্রকাশ, ইংরাজী শিক্ষাদানেরও আগে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা, বাংলার সঙ্গে ইংরাজীর মিশ্রণ দূর করা, বাংলা ভাষায় পরস্পরকে চিঠিপত্র লেখা, বক্তৃতা করা তাঁর পরিকল্পনায় প্রথম স্থান পেয়েছে। মাতৃভাষায় শিক্ষাদান সম্বন্ধে বলেছেন তিনি,—

"যাঁহার মনে কিছুমাত্র স্বদেশানুরাগের ভাব আছে, তিনি স্বীয় 'সন্তানগণকে ইংরাজী শিখাইবার পূর্বে মাতৃভাষা একটুকু ভাল করিয়া শিক্ষা না দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন না।"[২৯]

এ ছাড়াও লেখকের আরও কিছু পরিকল্পনা ছিল।

"গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভা বাংলা ভাষার এরূপ পুস্তক সকল প্রকাশ করিবেন যাহাতে ভারতবর্ষে প্রাচীনকালে স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা, স্বয়ংবর বিবাহ, পূর্ণ বয়সে বিবাহ, বিধবা বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহ, সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদি উদার ও সভ্যপ্রথা প্রচারিত ছিল তাহার দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইবে।

যে সকল বিজাতীয় প্রথা দ্বারা সভ্যগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সমুত্তেজিত হয়, তৎপ্রচলনের চেষ্টা করিতে হইবে।" [ঐ]

এই পরিকল্পনা জাতীয়চেতনা জাগানোর সম্পূর্ণ অনুকূল বলা যেতে পারে। রাজনারায়ণকে বিদ্যাসাগরের মত সক্রিয় সমাজসংস্কারক বলতে পারি না বটে, কিন্তু হিন্দুসমাজের রক্ষণশীলতার মনোভাব দূর করার সদিচ্ছা যে তাঁরও ছিল উদ্ধৃত উক্তিই তার প্রমাণ। কুসংস্কারের বেড়াজাল ছিন্ন করার জন্য বিদ্যাসাগর বাল্যবিবাহ প্রথা দূরীকরণ, বহুবিবাহ প্রথা রোধ ও বিধবা বিবাহের প্রচলনে অগ্রণী ছিলেন। রাজনারায়ণ স্ত্রীস্বাধীনতার সমর্থন করেছিলেন সবার আগে। এ ব্যাপারে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব হয়ত ছিল—কিন্তু তার চেয়েও বড়ো ছিল তাঁর উদার দৃষ্টিভঙ্গী। প্রাচীন ভারতের সমাজ ব্যবস্থায় নারীর স্থান ছিল সবার উপরে,—রাজনারায়ণ সেই

২৯. রাজনারায়ণ বসু, বিবিধ প্রবন্ধ, শিক্ষিত বঙ্গবাসিগণের মধ্যে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভা সংস্থাপনের প্রস্তাব।

ব্যবস্থাটিই ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। স্বয়ংবর বিবাহ, অসবর্ণ বিবাহের সমর্থনেও রাজনারায়ণ উদারতারই পরিচয় দিয়েছেন। এ দেশীয় প্রাচীন প্রথার উজ্জীবন ঘটুক এ ছিল তাঁর প্রার্থনা—কিন্তু বিজাতীয় হলেও অনুকরণযোগ্য সুন্দর রীতি-নীতি প্রবর্তনেরও পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনে ঐক্যবোধ জাগাবার উদ্দেশ্যে পোষাকপরিচ্ছদ সম্পর্কিত চিন্তাও তিনি করেছিলেন। একটি জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ জাতির মধ্যে পোষাকগত সাম্য তিনি লক্ষ্য করেছিলেন—সুতরাং বাঙ্গালীর সর্বজনীন পোষাক সম্পর্কে রাজনারায়ণ বলেন,—

আমাদিগের সমাজ এখনও প্রকৃতরূপে সংগঠিত হয় নাই। তাহার একটি সামান্য প্রমাণ দিতেছি। প্রত্যেক জাতিরই একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ আছে; সেইরূপ পরিচ্ছদ সেই জাতীয় সকল ব্যক্তিই পরিধান করিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের বাঙ্গালী জাতির একটি নির্দিষ্ট পরিচ্ছদ নাই।...ইহাতে একপ্রকার বোধ হয়, আমাদিগের কিঞ্চিৎমাত্র জাতিত্ব নাই। বস্তুতঃ ঐক্য না থাকিলে প্রকৃত জাতিত্ব কিরূপে সংগঠিত হইবে। [একাল আর সেকাল পৃঃ ৫৬-৫৭]

আমাদের প্রাত্যহিক জীবনযাপনের মধ্যেও জাতীয় চেতনার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন রাজনারায়ণ। এ জাতীয় আলোচনা থেকে রাজনারায়ণের সংস্কারক মনোবৃত্তির ও দেশচেতনারই পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সর্বপ্রকারে উদারতার হাওয়া প্রতিটি মানুষের মনে প্রবাহিত হোক—এই অভিলাষ ব্যক্ত করেছেন তিনি। স্বদেশপ্রেমিকতার মধ্যে শুধু স্বদেশীয় ভাব অনুশীলনের প্রতি অনুরাগই এতদিন লক্ষ্য করেছি,—রাজনারায়ণের স্বদেশহিতৈষিতা আরও ব্যাপক আকারে আত্মপ্রকাশ করেছে। বিদেশীয় প্রথার সুফলটুকু গ্রহণ না করা পর্যন্ত সত্যকার জাগরণ ঘটা যে সম্ভব নয়—মনীষী রাজনারায়ণ তা বুঝেছিলেন। এ ব্যাপারে তাঁর স্পষ্ট মতামতটি তাঁর স্বদেশপ্রেমিকতারই পরিচায়ক,—

"যদি আমাদিগকে অন্য জাতির অনুকরণ করিতে হয়, আমরা দাসবৎ করিব না। আমরা নিজে আপনাদিগের পথ নিরূপণ করিব। [ঐ]

এই দৃষ্টিভঙ্গির দৃঢ়তা বিবেকানন্দের ছিল। আত্মবিশ্বাসে ও স্বাদেশিকতায় পূর্ণ হৃদয়ের অনুভূতি থেকেই এ জাতীয় ভাব ব্যক্ত হতে পারে। কিন্তু বিদেশীয় প্রথার মধ্যে কয়েকটি গ্রহণ করার পরামর্শও দিয়েছিলেন তিনি, মহৎ ব্যক্তির স্মরণে সভার আয়োজন, নববর্ষের সম্মিলনী সভায় পারস্পরিক প্রীতি বিনিময়ের প্রয়োজনীয়তাও ব্যাখ্যা করেছিলেন। কোন সভাসমিতিতে মিলিত হলে ভাবের আদান-প্রদান বৃদ্ধি পেতে পারে,—ঐক্যবোধ জাগতে পারে, তাই এর উপযোগিতাও স্বীকার করতে হবে। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ লগ্নে এ জাতীয় বক্তব্যের ও চিন্তাধারার

প্রশংসাই করব। ভূদেব ও বঙ্কিমচন্দ্র সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছিলেন,—সামাজিক উন্নতি ছিল এঁদের কাম্য। রাজনারায়ণের চিন্তাধারার বিস্ময়কর উদারতা এ ব্যাপারে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অথচ সমাজতাত্ত্বিক আলোচনামূলক গ্রন্থরচনা করার গৌরব তাঁর নেই। প্রবন্ধের ইতস্ততঃ প্রসঙ্গেই তাঁর এই প্রশংসনীয় দৃষ্টিভঙ্গী ধরা পড়েছে।

রাজনারায়ণের সমালোচনামূলক রচনাতেও একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাই। 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা' রচনার আদর্শ অনুসন্ধান করার সময় টাইটেল পেজের উদ্ধৃতিটি লক্ষ্যণীয়। নিধুবাবুর ধ্রুব উক্তিটিই স্থান পেয়েছে শিরোভূষণ রূপে,—

নানান্ দেশে নানান ভাষা
বিনা স্বদেশীয় ভাষা পূরে কি আশা ?

এ গ্রন্থের সমস্ত প্রবন্ধই বক্তৃতার জন্য রচিত। সাহিত্যসমালোচনাও স্থান পেয়েছে এ বক্তৃতায়। মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে রাজনারায়ণ বসুর আলোচনাটি এ প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয়। তাঁর সাহিত্য সমালোচনার মানদণ্ড দেশপ্রেম,—দেশপ্রেমিকতার অভাব খুঁজে পেলে তিনি সাহিত্যিককে অভিযুক্ত করেন। অবশ্য স্বদেশপ্রেমী প্রাবন্ধিক রাজনারায়ণের এ বিচারপদ্ধতিটি এ যুগে অচল। বিশেষ করে,—সাহিত্যবিচারে যুগাদর্শ ও ভাবাদর্শ যদি লঙ্ঘিত হয় সেই সমালোচনাকে ত্রুটিপূর্ণ বলতেই হবে। মধুসূদনের কবিমানস বিচারেও রাজনারায়ণ সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় দিতে পারেন নি। বস্তুতঃ সাহিত্যে বিজাতীয়ভাব অনুসন্ধানে রাজনারায়ণ এত নিমগ্ন ছিলেন যে প্রকৃত বিচার সম্পূর্ণ হয় নি। মধুসূদনের অনুরাগী বন্ধু হলেও ব্যক্তি মধুসূদনের খ্রীষ্টান হওয়া কিংবা বিজাতীয় জীবনযাপনের মধ্যে তিনি দেশানুরাগের অভাবই লক্ষ্য করেছিলেন। স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণের পক্ষে খ্রীষ্টান মধুসূদনকে স্বীকার করাও সম্ভব ছিল না। স্বদেশপ্রেমিকতা যে মনের একটি সংকুচিত ও সময়োচিত ভাবাবেগমাত্র—সে কথা আমরা স্বীকার করেছি। স্বদেশপ্রেমের প্রাবল্য ঘটলে সত্য আবিষ্কার করাও অনেক সময় অসম্ভব হয়ে পড়তে বাধ্য। এ দিক দিয়েই স্বদেশপ্রেমী রাজনারায়ণ চরমপন্থী সমালোচক। দেশানুরাগের বিচার করতে গিয়ে যে কবিসত্তার আরও গভীরে প্রবেশ করতে হবে—রাজনারায়ণ সে বিষয়েও ছিলেন অসাবধানী। ফলে মধুসূদনের কোটপ্যাণ্টুলন তাঁর দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়েছিল,—এ যুগের সমালোচকের মত তিনি কোটপ্যাণ্টুলনের অভ্যন্তরে মধুসূদনের বাঙ্গালী প্রাণটি আবিষ্কার করতে পারেন নি। অবশ্য সমালোচনায় ত্রুটি যতই থাক রাজনারায়ণের দেশপ্রেমের আবেগটি এতে আরও স্পষ্ট হয়েছে। রাজনারায়ণের মধুসূদন সম্পর্কিত সমালোচনাটি এখানে উদ্ধৃত করা হলো।

"জাতীয়ভাব বোধহয় মাইকেল মধুসূদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্ত কোন বাঙ্গালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাঁহার কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোটপাণ্টুলন দেখা যায়। আর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মণকে নিতান্ত কাপুরুষের ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দূষণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে স্থাপন,—বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে।" [বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক পত্রিকা পৃঃ ৩৫]

এই সমালোচনায় দেশানুরাগী রাজনারায়ণকে আবিষ্কার করি খুব সহজেই কিন্তু তাঁর সাহিত্যবিচারে সন্তুষ্ট হতে পারি না। জাতীয়ভাবের যে সুগভীর ও আন্তরিক প্রকাশ মধুসূদনের সাহিত্যে দেখি—রাজনারায়ণ তা আবিষ্কারে অক্ষম। সেযুগোচিত ভুল ব্যাখ্যার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন রূপেই রাজনারায়ণের এ সমালোচনাটিকে গণ্য করা যেতে পারে। মধুসূদনের সাহিত্যবিচারের আধুনিক পদ্ধতির সঙ্গে প্রাচীনযুগের সমালোচনার যে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য রয়েছে—সেটিও এখানে স্পষ্ট হয়েছে। তবে আশ্চর্যের বিষয়, নিজে স্বদেশপ্রেমিক হয়েও রাজনারায়ণ মধুসূদনের সুগভীর দেশপ্রীতি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন নি। সেযুগের স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস অনেক সময় স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিকেও আচ্ছন্ন করে রাখত—তাও প্রমাণিত হলো। বস্তুতঃ এ হচ্ছে আবেগাতিশায়নের একটি চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত। স্বচ্ছ উপলব্ধির সঙ্গে আবেগাধিক্যের দ্বন্দ্ব থাকবেই—দেশপ্রেম ছিল সে যুগের সর্বাপেক্ষা প্রবল আবেগ,—যুগধর্মের প্রয়োজনেই এই আবেগ একদা দুরন্ত হয়ে উঠেছিল। তার ফলাফল হয়েছে দু'রকমের ;—অনাস্বাদিতপূর্ব দেশপ্রেমের আবেগেই বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীর জীবনে ঐক্যবোধ জেগেছে, শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে এবং স্বাধীনতার বাসনাটিও উচ্ছ্বসিত হয়েছে। অন্যদিকে দেখি, এই আবেগের আধিক্যে স্বচ্ছ ও সংগত বিচারবুদ্ধিও অনেক সময় উপেক্ষিত হয়েছে।

রাজনারায়ণ আবেগধর্মী সমালোচক,—তাঁর নিজের জীবনের প্রচণ্ড দেশপ্রেমের অনুভূতি সম্বল করেই তিনি সাহিত্যজগতে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তাই রাজনারায়ণের আলোচনায় আবেগ যতো বড়ো স্থান পেয়েছে—যুক্তি ততোটা নয়। রাজনারায়ণ যেমন নিখুঁত একটি দেশসচেতন জাতিগঠনের স্বপ্ন দেখতেন—সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যেও দেশচেতনা অনুসন্ধানেরই চেষ্টা করেছেন। রাজনারায়ণ সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন,—

"এক্ষণকার অধিকাংশ কাব্য ইংরাজী ইংরাজী গন্ধ করে। এক্ষণকার কোন

কোন কাব্যে পূর্ব্বকার কাব্য অপেক্ষা কোন কোন বিষয়ে অধিক ক্ষমতা প্রকাশিত আছে বটে, কিন্তু জাতীয় ভাব, সারল্য ও সহৃদয়তা বিষয়ে হীন বলিতে হইবে।"

[সেকাল আর একাল পৃঃ ৫১-৫২]

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে "সেকাল আর একাল" রচনার পূর্বেই বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ', বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', মধুসূদনের 'মেঘনাদ-বধ কাব্য' ও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী', হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার কাব্য' ও 'ভারতসংগীত' প্রকাশিত হয়েছিল তবু রাজনারায়ণ বাংলা সাহিত্যের অধিকাংশ কাব্যে জাতীয় ভাবের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন কেন বলা মুস্কিল। স্বদেশপ্রেমই সে যুগে আমাদের জীবনে নবলব্ধ অনুভব এবং বাংলা সাহিত্যে তার প্রকাশ ঘটেছিল অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যেই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে। রাজনারায়ণ সম্ভবতঃ বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস মিলিয়ে সাহিত্যের প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করেন নি,—তা হলে খুব সহজেই তিনি বাংলা সাহিত্যে জাতীয়ভাবের প্রাচুর্যই লক্ষ্য করে পুলকিত হতেন। আমাদের জাতীয়জীবনে যে ভাবটি প্রকাশের পথ খুঁজছে,—সাহিত্যে বহুপূর্বেই তার আভাস পেয়েছি। পরাধীনতার চেতনা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই শিক্ষিত সচেতন বাঙ্গালীকে মর্মাহত করেছিল, একটু লক্ষ্য করলেই রাজনারায়ণ তা নির্ণয় করতে পারতেন। সাহিত্যসমালোচনা করতে বসে তিনি এ সব বিষয়ে অনবধানী হয়েছিলেন সম্ভবতঃ। কিন্তু তাঁর নিজের মনের বিস্ময়কর দেশানুরাগের পরিচয় কোথাও অস্পষ্ট নেই,—এ জাতীয় সমালোচনার মূলেও স্বদেশপ্রাণ রাজনারায়ণই আত্মপ্রকাশ করেছেন।

মধুসূদন সম্পর্কেও রাজনারায়ণ যেমন সুবিচার করেন নি,—বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও তাঁর ধারণা স্বচ্ছ ছিল না। উদারপন্থী ব্রাহ্ম রাজনারায়ণের দৃষ্টিতে গোঁড়া ব্রাহ্মণ—স্বদেশপ্রাণ ও আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারও তদনুরূপ হয়েছিল। কিন্তু কোট-প্যাণ্টুলন পরিহিত মধুসূদনকে আবিষ্কার করতে কিছু পরিশ্রমের প্রয়োজন থাকতে পারে, বঙ্কিমচন্দ্রের বিচারে সে বাধা ত ছিল না। তবু রাজনারায়ণ জাতীয় আন্দোলনের পুরোধা বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে বলেছিলেন,—

"কোন কোন স্থানে তাঁহার বর্ণনা সুসঙ্গত নহে এবং কোন কোন স্থানে জাতীয় ভাবের অভাব আছে, অর্থাৎ যে বিদেশীয় ব্যক্তিরা আমাদিগের হিন্দুজাতির রীতিনীতি অবগত হইতে চাহেন, তাঁহারা তাঁহার পুস্তক পাঠ করিয়া তাহা ঠিক অবগত হইতে পারেন না।" [বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা পৃঃ ৫৪]

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দু জাতীয়তার সমর্থক ছিলেন,—রাজনারায়ণ চেয়েছিলেন শুধুই জাতীয়চেতনা কিন্তু হিন্দুসংস্কার বর্জিত জাতীয়তার কল্পনা রাজনারায়ণেও খুব স্পষ্ট

নেই কোথাও। মধুসূদন ভবতারণ রামচন্দ্রকে পাপবিনাশক হিসেবে কল্পনা করেন নি বলে রাজনারায়ণ ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। সুতরাং রাজনারায়ণের স্বদেশপ্রেমে আবেগ যত বড় স্থান পেয়েছে যুক্তির স্থান ছিল তার নীচে তাই কোথাও কোথাও রাজনারায়ণের দেশচিন্তায় কিছু স্ববিরোধ দেখা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ জাতীয়ভাবের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন কেন—সেটাও খুব সুবোধ্য নয়।

রাজনারায়ণের দেশপ্রেম সম্পর্কে আরও একটি তথ্য পরিবেশন করলে দেখা যাবে, রাষ্ট্রচেতনা ও জাতীয়চেতনার মধ্যে সংযোগ সাধনের কোন পরিকল্পনাও রাজনারায়ণের ছিল না। পরাধীন জাতির জাতীয়চেতনা প্রবল হলে তা অনায়াসে রাষ্ট্রবোধেরও জন্ম দেবে এটাই স্বাভাবিক। রাজনারায়ণ সমগ্রজাতির চেতনা জাগাবার যে বিপুল পরিকল্পনা করেছিলেন সে আলোচনা করেছি—পরিশেষে রাজনারায়ণের একটি বক্তব্য দিয়ে দেখানো সম্ভব যে এই জাতীয়চেতনাকে তিনি রাষ্ট্রচেতনার সঙ্গে যুক্ত করতে চান নি। ধর্মচেতনার স্বাধীনতাকেও তিনি এ প্রসঙ্গের সঙ্গে যুক্ত করতে অনিচ্ছুক ছিলেন। জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভার কর্তব্য নির্দেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন,—

"ধর্ম্ম ও রাজনীতিসংক্রান্ত বিষয়ের আন্দোলনে জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভার হস্তক্ষেপ করিবার প্রয়োজন নাই।"

জাতীয়ভাব বস্তুটি সম্পূর্ণরূপে ধর্ম ও রাজনীতি নিরপেক্ষ হওয়াই বাঞ্ছনীয় এ ধারণা ছিল রাজনারায়ণের,—তাই তাঁকে আবেগপ্রবণ বলেছি। কারণ আবেগবান স্বদেশপ্রেমিক ধর্ম ও রাজনীতির ঊর্ধ্বেই তাঁর দেশপ্রেমকে প্রতিষ্ঠা করতে চান। যদিও পরাধীন জাতির স্বদেশচেতনা খুব তীব্র হয়ে উঠলে রাষ্ট্রচেতনার সঙ্গে তা যুক্ত হবেই। বিশেষ করে বাংলাদেশে নবজাগরণের সূচনায় যে স্বদেশচেতনা জন্ম নিয়েছিল সেখানে রাষ্ট্রচেতনা ছিল পুরোমাত্রায়। রামমোহন কিংবা ঈশ্বরগুপ্ত কেউই বিদেশী শাসনের ভয়াবহ দিকটিকে উপেক্ষা করতে পারেন নি,—অত্যাচার ও শাসকোচিত বর্বরতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন উভয়েই। প্রেস অ্যাকট-এর বিরুদ্ধে রামমোহনের রাষ্ট্রচেতনা বিক্ষুব্ধ হতে দেখেছি, নীলকর আন্দোলনে ঈশ্বর গুপ্ত আত্মসংযম হারিয়ে আক্ষেপ করেছিলেন। রাষ্ট্রচেতনাকে বাদ দিয়ে কিংবা আমাদের অধিকারের সীমা না জেনে, আবেগ উচ্ছ্বাস সম্বল করে দেশসাধনা বা দেশপ্রেম কোনটাই সম্ভব ছিল না। তবু রাজনারায়ণ দেশপ্রেমে মগ্ন হয়েও রাজনীতি ও ধর্মসংক্রান্ত বিষয়ের আন্দোলন থেকে সচেতনভাবে দূরে থাকারই চেষ্টা করেছেন। স্বদেশপ্রেমের পূর্ণ পরিণতি সম্বন্ধে তখনও ঠিক একটা সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নি

বলেই হয়ত এ ধরণের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরও রাজনীতির সঙ্গে তাঁর অকৃত্রিম সমাজসেবাকে বিযুক্ত রেখেছিলেন।

রাজনারায়ণের একটি রচনায় কিন্তু তাঁর রাজনীতি সচেতন মনোভাবের কিছু পরিচয় মিলবে। 'আশ্চর্য স্বপ্ন' নামক রসরচনায় রাজনারায়ণ স্বপ্নে যে একটি আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন—তারই বিবরণ দেবার প্রয়াস পেয়েছেন। স্বপ্নটি অবশ্য অকল্পনীয় ও হাস্যকর। নিদ্রার পূর্বে লেখক বর্তমান শাসকগোষ্ঠীর যোগ্যতা বিষয়ে আলোচনা করছিলেন—কিন্তু বিদেশীর পরদেশশাসনের যোগ্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়েও তিনি মন্তব্য করেছেন।

"তজ্জন্য চিরপরাধীনতা কি বাঞ্ছনীয় হইতে পারে?" এই সংশয় রাজনারায়ণের রাষ্ট্রসচেতন মনোভাবেরই পরিচায়ক। 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভাকে' ধর্ম ও রাজনীতি থেকে দূরে রাখতে চাইলেও রাজনারায়ণ নিজেও জানতেন এ জাতীয় সভা-সমিতির সঙ্গে রাজনীতির যোগাযোগ অবিচ্ছিন্ন। হয়ত রাজশক্তির হাত থেকে সহজ উপায়ে এই সমিতিটিকে রক্ষা করতে চেয়েছিলেন বলেই এ কৌশলের পথটি তিনি অবলম্বন করেছিলেন। উদ্ধৃত উক্তির আলোকে স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণের প্রকৃত দেশসাধনার উদ্দেশ্যটিই ব্যক্ত হয়েছে। জাতীয়চেতনা জাগার পরই পরাধীনতার চেতনা অনায়াসেই আমাদের উত্তেজিত করবে,—এই আশায় জাতীয়তার বাণী প্রচার করেছিলেন তিনি।

"আশ্চর্য স্বপ্নে" রাজনারায়ণের হাস্যরসবোধ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। রূপকার্থ বিশ্লেষণ করলে প্রবন্ধটিতে শিক্ষণীয় বিষয়ও বড়ো কম নেই। ভারতবর্ষের পরাধীনতা স্বাধীন ইংলণ্ডবাসীর স্কন্ধে আরোপ করে প্রথমেই তিনি বিশুদ্ধ হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। বিজয়ী জাতি সর্বদাই নিজের প্রাধান্য ও মহত্ত্বের প্রচারকার্য চালায়,—বঙ্গবাসীরাও তা করেছে। বিজিত জাতি সর্বদাই ম্রিয়মান হয়ে থাকে, আত্মশক্তির ওপর আস্থা হারায় ও নিজের মহত্ত্বকেও চিনে নিতে পারে না। বঙ্গ-বাসীদের জীবনযাপনের আদর্শ থেকে সহজেই এ সত্য উপলব্ধ হবে। প্রাচীনতার আদর্শ, জলবায়ুর উপযোগী পোষাকপরিচ্ছদের সুপরিকল্পিত ঐতিহ্য সবকিছুই পরিত্যাজ্য ও বিদেশীয়ানা অনুপযোগী হলেও গ্রাহ্য হয়েছে এদেশে। রাজনারায়ণ এই বিসদৃশ ও উৎকট নব্যতন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণের জন্যই প্রবন্ধটির পরিকল্পনা করেছিলেন—তা সহজেই বোঝা যায়। অবশ্য এ মনোভাবটি পরাধীন জাতির জীবনেই প্রত্যক্ষ করি আমরা। পরাধীন ইংলণ্ডবাসীরাও এই আদর্শে চিত্রিত হয়েছে। যথার্থ হাস্যরসের উৎস এখানেই। পরাধীনতা মানুষকে কি হাস্যকর জীবন যাপনে বাধ্য করে—তাই প্রমাণ মিলবে প্রবন্ধটিতে। পরাধীন ইংলণ্ডবাসীরা

আমাদের গ্রীষ্মপ্রধান দেশের উপযুক্ত পোষাক পরিধানে অভ্যস্ত হচ্ছে—এ সম্পর্কে লেখকের মন্তব্য,—

"যখন আমি স্মরণ করিলাম যে, বঙ্গদেশে পরাধীনতার কালে সাহেবি পরিচ্ছদ পরিধান গ্রীষ্মপ্রধান বঙ্গদেশে কষ্টকর জানিয়াও কোন কোন বাঙ্গালী তাহা পরিধান করিতেন তখন আমি ইহাতে আশ্চর্য্য হইলাম না।"

[আশ্চর্য স্বপ্ন—বিবিধ প্রবন্ধ]

এমন হাস্যরসাত্মক রচনা রাজনারায়ণ খুব বেশী লেখেন নি বলে আক্ষেপ হয়। স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ রসরচনাতেও স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গটিরই অবতারণা করেছেন। গুরুগম্ভীর ও উপদেশাত্মক প্রবন্ধ ও বক্তৃতায় স্বদেশবাসীদের দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করেছিলেন তিনি - "আশ্চর্য স্বপ্ন" তার ব্যতিক্রম। এখানে তির্যক-ভঙ্গিতে স্বদেশবাসীদের চরিত্র সমালোচনা করে তাঁদের চৈতন্য সম্পাদনের প্রচেষ্টাটিই মুখ্য। স্বদেশপ্রেমিকের প্রবণতাটি রাজনারায়ণের সমস্ত রকমের রচনাতে দৃষ্ট হয়। রসরচনার অন্য একটি নিদর্শন রাজনারায়ণের "জেঠামো" প্রবন্ধটিও লক্ষ্যণীয়। "সমাজ সংস্কার" প্রবন্ধে জাতিভেদ শিথিল করার পক্ষে তাঁর অভিমতটিও তাঁর উদার সমাজনীতির আদর্শকেই ব্যক্ত করে।

রাজনারায়ণের পূর্ণ ব্যক্তিত্বের স্বরূপ আমাদের আলোচনায় স্থান পায় নি—কিন্তু স্বদেশপ্রেমই তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রধানতম অবলম্বন ছিল এ সত্যটি বারবার উপলব্ধি করেছি। তিনি 'গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিনী সভার' পরিকল্পনা মাত্র করেছিলেন কিন্তু 'হিন্দুমেলা' নামে এই আদর্শেই একটি প্রতিষ্ঠান পরে জন্ম নিয়েছিল; বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদ প্রবর্তনে হিন্দুমেলার দান চিরস্মরণীয়। সেদিক থেকে রাজনারায়ণের স্বপ্ন বাস্তবে রূপলাভ করেছিল বলা যেতে পারে। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত স্বদেশ-চিন্তাই তাঁর সর্বপ্রধান চিন্তা ছিল, নানাভাবে সেই আবেগ তিনি প্রকাশ করেছেন। প্রবন্ধে ও রচনায় যা ব্যক্ত হয় নি—জীবনে তা ব্যক্ত হয়েছিল। তাই সাহিত্যিক রাজনারায়ণ সম্বন্ধে একটি কথা নিঃসংকোচে বলা যেতে পারে;—স্বদেশপ্রেমিক রাজনারায়ণ প্রাবন্ধিক রাজনারায়ণের চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন। প্রবন্ধ রচনা করে তিনি যে স্বদেশব্রত পালন করেছিলেন—তাঁর জীবনের সাধনা তাকে অতিক্রম করেছে অনায়াসে।

বাংলা সাহিত্যের প্রথিতযশা প্রাবন্ধিক ভূদের মুখোপাধ্যায়ের স্বদেশপ্রেম ও তাঁর জীবনদর্শন ওতপ্রোত হয়ে আছে। হিন্দু কলেজের মেধাবী ছাত্র ভূদেব-রাজনারায়ণ-মধুসুদন বাংলা সাহিত্যের চর্চা করেছেন বিভিন্ন মৌলিক আদর্শ প্রচারের জন্য। এঁরা সহপাঠী, কিন্তু চরিত্রধর্মে এঁদের বিন্দুমাত্র মিল নেই। একই অধ্যাপকের কাছ

থেকে পাঠগ্রহণ করেও মধুসূদন, রাজনারায়ণ কিংবা ভূদেবের আদর্শ গড়ে উঠেছিল স্ব স্ব আদর্শেই। এঁদের বিভিন্নতার আদর্শটি নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করলেই একটি নিখুঁত যুগচিত্রের সন্ধান মিলবে। ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠীর উন্মাদনার আবেগে রাজনারায়ণ নিজে চঞ্চল হয়েও পরবর্তী রচনায় ভূদেবের চরিত্র বিশ্লেষণ করেছিলেন এইভাবে,—

"সে তরঙ্গে স্বল্লাধিক পরিমাণে বিচলিত হন নাই, ভূদেববাবুর সহাধ্যায়ীদিগের মধ্যে সেরূপ অতি অল্পই ছিলেন। তিনি এবং তাঁহার ন্যায় আর দুই একজনই কেবল সাগর মধ্যস্থিত পর্বতের ন্যায় সেই প্লাবনের মধ্যে অটলভাবে দণ্ডায়মান ছিলেন।"[৩০]

এই উক্তিতে ভূদেবচরিত্র যত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—সহপাঠীর চরিত্র বিশ্লেষণে প্রাবন্ধিক রাজনারায়ণের ক্ষমতাও ততখানি লক্ষ্যণীয় হয়েছে। ভূদেবচরিত্রের পর্বত-কঠিন দৃঢ়তাই সমালোচক সম্প্রদায়কে বিশেষভাবে মুগ্ধ করেছিল। নবজাগরণের প্রবল শক্তি ধারণ করে এবং বিন্দুমাত্র চঞ্চল না হয়ে ভূদেব যুধিষ্ঠিরস্থৈর্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনচরিত পাঠ করলে জানা যাবে চাঞ্চল্য ভূদেব চরিত্রেও ছিল—কিন্তু পিতার আদর্শই শেষ পর্যন্ত পুত্রের জীবনে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছিল। নবজাগরণের প্রভাবকে অতিক্রম করে ভূদেব শেষে প্রবক্তার আসনেই অধিষ্ঠিত হলেন। মধুসূদন কাব্যে-নাটকে কালোত্তীর্ণ প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন—ভূদেব প্রবন্ধ রচনার দায়িত্ব তুলে নিলেন। ভূদেবের প্রবন্ধ ভূদেবের আত্মদর্পণ বলা যেতে পারে। বাংলা কাব্যের যে অভাব পূর্ণ করার জন্য বিদেশীয় উদ্যান থেকে পুষ্পচয়ন করে মধুসূদন সাহিত্যদেহ সজ্জিত করলেন তাঁর প্রতিভার উপযুক্ত কীর্তিরূপেই তা গণ্য হবে। ভূদেবের প্রজ্ঞার গভীরতার সঙ্গে পরিচিত হতে হলে তাঁর প্রবন্ধসাহিত্যের আশ্রয় নিতে হবে ;—বিদেশী শিক্ষার আলোকে স্বদেশীয় রীতিনীতি ও সমাজবিচারের সাধনায় মগ্ন হয়েছিলেন তিনি। কর্মজীবনের সঙ্গে সাহিত্য জীবনের কোন আপাতঃ সাদৃশ্য হয়ত ছিল না তবু ভূদেব রাজকর্ম নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেও সাহিত্যজীবনের ক্ষেত্রে নিজের স্বাধীন জীবনাদর্শের কথাই ব্যক্ত করেছেন নির্ভীক ভাবে। 'ভূদেবচরিত' পাঠে জানা যায় টনি সাহেব একদা মন্তব্য করেছিলেন, "ভূদেব বাবু সি, আই, ই, হইয়াছেন এবং মাসিক পনেরশত টাকা মাহিনা পান তথাপি ব্রিটিশ বিদ্বেষ্টা।"

ভূদেবকে নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করলে উদ্ধৃত মন্তব্যের সারবত্তা অবশ্যই স্বীকার করতে হয়। তাঁর প্রবন্ধে স্বদেশপ্রীতি এমন ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়েছে—যাকে সমালোচকরা রক্ষণশীলতা বলেই ব্যাখ্যা করেছেন বটে—কিন্তু রক্ষণশীলতার সঙ্গে যে

৩০. ভূদেব চরিত ১ম ভাগ থেকে উদ্ধৃত। ১৮৯৪ সালের জুন মাসে "দাসী" পত্রিকায় যোগীন্দ্রনাথ বসুর লিখিত প্রবন্ধে উদ্ধৃত। চুচুঁড়া, ১৯১৭।

গভীর স্বদেশপ্রেমও যুক্ত হয়েছিল সেকথাও অস্বীকার করা যায় না। নিছক রক্ষণশীলতার মহিমা অল্প কিন্তু রক্ষণশীলতা ও স্বাদেশিকতার যুগ্ম মহিমাই ভূদেবের সমগ্র সাহিত্য কীর্তিতে ধরা পড়েছে বলে আমাদের বিশ্বাস। রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত না হয়েও—নিপুণভাবে রাজকর্ম নির্বাহ করেও আমাদের দেশের লেখক সম্প্রদায় রাজনীতির বাণী প্রচার করেছিলেন আশ্চর্যভাবে। এবিষয়ে প্রমথনাথ বিশীর সুচিন্তিত মতামতটি উদ্ধৃত করা দরকার।

"রাজপুরুষগণ বেশ নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহারা জানিতেন না যে, কৃতী ও বিশ্বস্ত রাজপুরুষগণের লেখনীমুখ ভারতের মুক্তিজাহ্নবীর ভাষাপথ খনন করিতেছে। নব্য বাংলাভাষা রাজনৈতিক চেতনার ধাত্রী, পরবর্তীকালে রাজনীতিকগণ ভাষাধাত্রীর কোল হইতে সেই শিশুকে গ্রহণ করিয়া সাবালক করিয়া তুলিয়াছেন। এ বিষয়ে মূল কৃতিত্ব সাহিত্যিকগণের, স্থূল কৃতিত্ব রাজনীতিকগণের। এই মূল কৃতিত্বে ভূদেবের দাবী সামান্য নয়।"[৩১]

কাজেই ভূদেব প্রতিবাদ করলেও টনি সাহেব যে ভূদেবকে ঠিকমতই বিচার করেছিলেন তাতে আমাদের সন্দেহ নেই। এই রাজকর্মচারী সাহিত্যিক সম্প্রদায়ই রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করেছেন সৃষ্টির মাধ্যমে, কারণ সাধারণ বাঙ্গালীর সঙ্গে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রের যোগাযোগ ছিল সামান্য কিন্তু উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীই পেশা হিসেবে রাজকর্ম করবার সুযোগ পেতেন। অভিজ্ঞতাও ছিল এঁদের ব্যাপক। ভূদেবের কর্মজীবন আলোচনা করলে দেখা যাবে, কত বিচিত্র পরিবেশে বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে কালযাপন করতে হয়েছিল তাঁকে। প্রস্তুত মন নিয়েই ভূদেব এই জীবন ও পরিবেশকে গ্রহণ করেছিলেন।

ভূদেবচরিত্রের মূল ভিত্তি আলোচনা করলে দেখা যাবে দেশাদর্শ ও স্বদেশপ্রেম তাঁর নিজস্ব উপলব্ধি, অতি অল্প বয়সেই তা বিকশিত হয়েছিল তাঁর চরিত্রে। ভূদেব-চরিতকার এ বিষয়ে একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র ভূদেব রামগোপাল ঘোষ কর্তৃক আয়োজিত প্রবন্ধ প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের জন্য তাঁর সহপাঠীদের উৎসাহ দিয়েছিলেন। সহপাঠীরা এ জাতীয় বিষয় সম্পর্কে উন্নাসিকতা প্রদর্শন করায় ভূদেব দুঃখিতও হয়েছিলেন। চরিতকার মন্তব্য করেছেন,—

"এই সময় হইতেই তিনি ইংরাজী শিক্ষার তুঁষ ঝাড়িয়া লইতেছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে স্বজাতিপ্রীতিও তাঁহার অন্তঃকরণ মধ্যে ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল।"[৩২]

৩১. ভূদেব রচনা সম্ভার—প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত ভূমিকা।

৩২. ভূদেব চরিত। ১ম ভাগ। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়, চুচুঁড়া, ১৯১৭।

পরিণত জীবনে এই স্বদেশবাৎসল্যই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভূদেবের স্বধর্মানুরাগ স্বজাতিবাৎসল্য ও দেশপ্রেম একান্তই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। বিদেশীসাহিত্য তিনিও পড়েছিলেন—কিন্তু বিদেশীয়ানার কোথাও অনুকরণযোগ্য কিছু খুঁজে পান নি। তিনি নতুন করে 'পারিবারিক প্রবন্ধের' মধ্যে হিন্দু সমাজের রীতিনীতি, আচারবিচারের সমর্থনে ও প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। ভূদেবের এই মুগ্ধতাকে সমালোচকরা কখনও অনুদারতা কখনও রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামী বলেছেন। আসলে দেশপ্রীতির আলোকে ভূদেবের এ জাতীয় অতিপ্রশংসার একটা ব্যাখ্যা চলতে পারে যা অন্য কিছু দিয়েই বোঝানো সম্ভব নয়। সে যুগের অন্যান্য মনীষীরাও প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন একটি চূড়ান্ত আদর্শকেই গ্রহণ করতে চাইছিলেন। মধুসূদন-রাজনারায়ণ পরবর্তীকালে ভিন্ন আদর্শ বরণ করেও প্রাচীন হিন্দুসমাজের সঙ্গে যোগ রাখতে চান নি। মধুসূদন খ্রীষ্টান, রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম হলেন, - এঁদের সঙ্গে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বজায় রেখে স্বধর্ম ও স্বসমাজে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কার করলেন ভূদেব। ভূদেবের স্বধর্মপ্রীতির মধ্যেও তাই আবেগ ও উচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য। স্বধর্মের আদর্শ পালন করাও যে একটা বীরোচিত কর্ম, ভূদেব নিজের পরিপার্শ্ব থেকে এই মহাসত্যটিই আবিষ্কার করেছিলেন। তাই মধুসূদন-কৃষ্ণমোহনের মত কিংবা দেবেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণের মত ভূদেবও সে যুগের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। স্বধর্মনিষ্ঠা যে যুগে প্রশংসিত হয় না—বিদ্বজ্জনেরা তথা শিক্ষিত ব্যক্তিরা অভিনব বক্তব্য অভিনবভাবে প্রকাশ করতেই যখন ব্যস্ত ভূদেব তখন নির্ভীকতার সঙ্গে আপন সম্প্রদায়ের মহিমা প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের পরিবেশে [ব্রাহ্ম মত সমর্থন না করে এবং বিধবা বিবাহ সমর্থন না করে] ভূদেবও যে সত্যিই আপন শক্তি ও মৌলিক আদর্শকেই গ্রহণ করেছিলেন তাতে বিস্ময়ের যথেষ্ট হেতু আছে।

ভূদেবের মূল্যায়ন প্রসঙ্গে 'সাহিত্য' সম্পাদক বলেছিলেন—

"তাঁহার চরিত্রের মূল সূত্র তাঁহার মৌলিকতা। তিনি ইউরোপীয় সাহিত্য ও সভ্যতার পূর্ণ দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কখনও আত্মবিসর্জন করিয়া, পাশ্চাত্ত্য পথের পথিক হন নাই। স্বদেশের ধর্মে, শাস্ত্রে, সমাজে, সংস্কারে, সাহিত্যে তাহার প্রভূত আস্থা, অত্যন্ত অনুরাগ ছিল।"[৩৩]

এই মৌলিকতাই গভীর স্বদেশচেতনার আকারে উচ্ছ্বসিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধে। যুগবিচারে ভূদেব প্রাচীনপন্থী সন্দেহ নেই—কিন্তু এই সচেতন প্রাচ্যাদর্শ ইতিপূর্বে

৩৩. সুরেশচন্দ্র সমাজপতি—'সাহিত্য' জ্যৈষ্ঠ, ১৩০১।

কোনো বাঙ্গালীর চরিত্রে দেখা যায় নি। বিদ্যাসাগর ও রামমোহন যে উদার আদর্শে সমগ্র জাতির প্রাণে আধুনিকতার স্পর্শ সঞ্চার করেছিলেন,—ভূদেবের আদর্শ ছিল তার বিপরীত। তিনি সনাতন আদর্শের পূর্ণ পুনরুজ্জীবন চেয়েছিলেন। হিন্দু গৌরবের বিস্মৃত অধ্যায়ের আলোচনা করে ভূদেব বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে আত্মসচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের কথা উল্লেখ করা চলে। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার অতীত ইতিহাস অনুসন্ধান ও আলোচনা করে অতীতের গৌরবময় যুগটিকেই পুনরুজ্জীবিত করার কথা চিন্তা করেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে ভূদেবের আদর্শবাদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু সাদৃশ্য লক্ষ্য করি। দুজনেই বাঙ্গালীর চারিত্রিক বিশুদ্ধি ও আত্মবোধ জাগাতে চেষ্টা করেছিলেন এবং এজন্য বাঙ্গালীর ঐতিহ্যই অনুসরণ করেছিলেন। জাতীয়তাবোধের চেতনার মূলেই যে স্বজাতিচেতনা ও স্বধর্মচেতনা প্রবলভাবে সক্রিয় এ তথ্য উভয়ের রচনাতেই মিলবে। তবে স্বাধীনতার আন্দোলন ভূদেবের কল্পনাতেও স্থান পায় নি, বঙ্কিমচন্দ্র আসন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনের চিত্রটিই 'আনন্দমঠে' বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। বিদেশী শিক্ষাদীক্ষা এ ব্যাপারে তাঁকে গ্রাস করে নি, সহায়তাই করেছিল। 'ভূদেবরচিত' অবতরণিকায় জীবনী লেখকের মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য।

"তিনি স্বধর্মপালন, স্বদেশপ্রীতি, সহৃদয়তা, সদাচার, সৎকর্মে সম্মিলন, স্বাবলম্বন এবং সাত্ত্বিক উদ্যমের প্রচারক।...এই সকল সাত্ত্বিক উদ্যমের মহৎ শিক্ষা, তাঁহার গ্রন্থাবলীতে, এবং নিজের জীবনে দিয়া ভূদেববাবু পূর্ণ সর্বাঙ্গ সনাতন হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান সহ বৈধ স্বদেশীযুগের প্রবর্তন করিয়া গিয়াছেন।"—এ মন্তব্যটি যথার্থ। ভূদেবের লেখা প্রবন্ধসমষ্টি আলোচনাকালে তাঁর মনোভাব আরও স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব হবে। ভূদেবের প্রবন্ধই বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক প্রবন্ধ রূপে গণ্য হয়। ছাত্রপাঠ্য রচনার বাইরে—সমাজের ও সাধারণের জন্য কিছু সাহিত্যিক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন তিনি।

১৮৫৬ সালে ভূদেবের 'শিক্ষাবিধায়ক প্রস্তাব' [শিক্ষাবিষয়ক প্রস্তাব ?] প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থটিতে শিক্ষাব্রতী ভূদেবের বাস্তব অভিজ্ঞতার বর্ণনা রয়েছে। শিক্ষাপদ্ধতি যত নিখুঁত হবে—দেশের ভবিষ্যৎ তত বেশী আশাপ্রদ হয়ে উঠবে। ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার প্রবর্তন ও প্রসারে ভূদেব খুশী কিন্তু শিক্ষাপদ্ধতি যত বাস্তবানুগ ও দেশোপযোগী হয় তারই পরামর্শ দিয়েছেন তিনি। এ প্রবন্ধগ্রন্থটিতে প্রথম শিক্ষকদেরও উপযুক্ততার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন তিনি। "বঙ্গদেশের উন্নতি সাধনকল্পে এমন সুযোগ আর কখন হয় নাই।"—ভূদেব শিক্ষাব্যবস্থার সুষ্ঠু আয়োজনে সেজন্যই উদ্যোগী হয়েছিলেন। শিক্ষা যত ব্যাপকভাবে জ্ঞানলাভের উপযোগী হবে

ততই তা সার্থক। এ ব্যাপারে একটি দৃষ্টান্ত সম্বন্ধে আলোকপাত করা দরকার। ইতিহাসশিক্ষা বিষয়ে ভূদেবের পরামর্শটি লক্ষ্যণীয়। বাঙ্গালী ছাত্র বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক তথ্য লাভ করুক এ ছিল ভূদেবেরই পরামর্শ। সুতরাং ইতিহাসশিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বঙ্গে যবনাধিকারের বৃত্তান্তটিই নির্বাচন করেছেন—এবং শিক্ষণীয় বিষয়রূপে গণ্য করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার ইতিহাসের প্রকৃত তথ্য নির্ণয় করারও বহু আগে প্রকৃত ইতিহাস ভূদেব অকপটে বিবৃত করেছেন এই গ্রন্থটিতে।

বাংলাদেশের প্রখ্যাত শিক্ষাব্রতীরূপে আজীবন ভূদেব আদর্শ শিক্ষকের জীবন যাপন করেছিলেন,—'ভূদেব চরিতে' তার উল্লেখযোগ্য বিবরণ আছে। 'এডুকেশন গেজেট' ও 'শিক্ষাদর্পণে' ভূদেব বহু প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এই জাতীয় ক্ষুদ্র প্রবন্ধেও ভূদেব বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থা ও বিবিধ বিষয় নিয়ে যে আলোচনা করেছিলেন—পরবর্তীকালে তা 'বিবিধ প্রবন্ধের' শিরোনামে পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। এই প্রবন্ধ রচনার প্রেরণা এসেছিল নানাজাতীয় বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে। জীবনচরিতে ভূদেবের সমগ্র কর্মজীবনের যে চিত্র পাই তাতে আদর্শবাদী ভূদেব প্রতিটি কাজে কি ভাবে জীবনাদর্শ রক্ষা করে চলতেন তার বিবরণ আছে।

"ভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্ন সমাজের লোকের মুখে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তির আধার আর্য্যশাস্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবজনিত—কোনওরূপ তাচ্ছিল্যের কথা পাছে শুনিতে হয়, এই ভয়ে তিনি নিজে শাস্ত্রের উল্লেখ করিতেন না।"

[ভূদেবচরিত প্রথম ভাগ পৃঃ ২৬২]

আত্মরক্ষার জন্য, সম্মান রক্ষার জন্য, ভূদেব উত্তেজিত হতেন না—সংযম পালন করতেন। প্রতিবাদের প্রয়োজন হলে প্রতিবাদ করতেন তীব্রভাবে। স্বধর্মরক্ষা ও রাজকর্ম রক্ষা একই সঙ্গে উভয়টিই রক্ষা করা সে যুগে কঠিন ব্যাপার ছিল। ভূদেব অবশ্য উভয়টিই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে রক্ষা করতে পেরেছিলেন।

স্বদেশপ্রেম না থাকলে এই প্রখর চেতনাটিই থাকত না। ভূদেবের সঙ্গে সে যুগের সরকারী ও বেসরকারী বহু গণ্যমান্য ইংরেজের আলাপ ছিল। তীব্র স্বধর্ম-চেতনা রক্ষা করে তিনি কি ভাবে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হয়েছিলেন তার পরিচয়ও অনেক রয়েছে। সে যুগের ইংরেজ আমাদের বিচার করত যেভাবে তার একটি দৃষ্টান্ত 'ভূদেব চরিত' থেকে উদ্ধার করা যায়। একদা রেভারেণ্ড হিল ভূদেবকে বলেছিলেন,

"যে ভাষায় যে বিষয়ের ঠিক প্রতিশব্দ নাই, সে জাতির মধ্যে সে ভাবও নাই। আর বাঙ্গালায় যখন পেট্রিয়টিস্‌ম্ [স্বদেশহিতৈষিতা] কথার অনুরূপ বাক্য ইংরাজাগমনের পূর্বে ব্যবহৃত ছিল না, তখন এ দেশে ঐ ভাবও ছিল না বলা যাইতে পারে।"

[ভূদেবচরিত—পৃঃ ১১৪]

এ জাতীয় উক্তি থেকে ভারতবাসী সম্বন্ধে ইংরেজের মনোভাবটিই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এ বক্তব্য প্রতিবাদযোগ্য বলেই উত্তর দিয়েছিলেন ভূদেব,—

"ভারতবাসীর ধর্মপরায়ণতা বরাবরই স্বজাতিবাৎসল্য অপেক্ষা অধিক। ধর্মাধর্ম নির্বিশেষে স্বজাতিবাৎসল্য—স্বজাতির জন্য অধর্মও করা যায় এভাব—এদেশে ইংরাজী শিক্ষা প্রবেশের পূর্বে বোধহয় কখন শোনাই ছিল না, তবে জন্মভূমিকে জননীর সহিত তুলনা করিয়া এদেশের লোক স্বদেশের প্রতি গভীর ভক্তি প্রকাশ করিত বটে।"৩৪

জাতীয়তাবোধ বা স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে আমরা যত রকম আলোচনা করেছি তার মধ্যে ভূদেবের এই উক্তিটির একটি বিশেষ মূল্য স্বীকার করতে হয়। স্বদেশপ্রেম বা স্বজাতিবাৎসল্য বলতে যে ঠিক কি বোঝায় এবং পাশ্চাত্যদেশীয়রা বিষয়টিকে যে ভাবে গ্রহণ করেছে—প্রাচ্যাদর্শে ঠিক সেটি গৃহীত হয় নি—হওয়া উচিতও নয়—এ ছিল তাঁর মত। কারণ প্রাচ্যাদর্শ যে ধর্মকে আরও বড় স্থান দিয়েছে—তা মানবধর্ম, দেশধর্মের চেয়ে অনেক গভীর বস্তু। ভূদেব দেশপ্রেম এবং ধর্ম উভয়টিকেই পৃথক ভাবে গ্রহণ করেছেন এবং ধর্মরক্ষার প্রনোদনা তাঁর চরিত্রের গভীরে প্রভাব বিস্তার করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রও পাশ্চাত্য পেট্রিয়টিজ্‌ম-এর প্রশংসা করেন নি,—ভূদেব আরও অনেক আগেই এই বিষয়টিই আলোচনা করেছেন। ধর্মভিত্তিক দেশপ্রেম ভূদেব চরিত্রের সহজাত অনুভব—শুধু দেশপ্রেম বলে কোন বিশেষ অনুভূতির প্রসঙ্গ তাঁর আলোচনায় স্থান পায় নি। তবে সেযুগে নিছক দেশপ্রীতিব আবেগটিও জাতির চরিত্রে লক্ষ্য করেছিলেন ভূদেব। একটি প্রবন্ধে তিনি বলেছিলেন—

"যখন হিন্দু কলেজে পড়িতাম তখন সাহেব শিক্ষক বলিয়াছিলেন যে, হিন্দু জাতির মধ্যে স্বদেশানুরাগ নাই। কারণ, ঐ ভাবার্থ প্রকাশক কোন কার্য্যই কোন ভারতবর্ষীয় ভাষায় নাই। তাঁহার কথায় বিশ্বাস হইয়াছিল এবং সেই বিশ্বাস নিবন্ধন মনে মনে যৎপরোনাস্তি দুঃখানুভব করিয়াছিলাম। এক্ষণে জানিয়াছি যে আর্য্য-বংশীয়দিগের চক্ষুতে বায়ান্ন পীঠ সমন্বিত সমুদায় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ ঈশ্বরীদেহ।"৩৫

[অধিকারী ভেদ ও স্বদেশানুরাগ, বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ]

এই উক্তিতে দেশপ্রেম ও ধর্মচেতনার সমন্বয় দেখা যায়। এদেশবাসীর মনে স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি ছিল না, এই অপবাদে ভূদেব একদা মুহ্যমান হয়েছিলেন কিন্তু যে মুহূর্তে ধর্মচেতনার সঙ্গে দেশপ্রেমের সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন সে মুহূর্তেই তাঁর সমস্ত দ্বিধা ও দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। এই নবলব্ধ স্বদেশচেতনাই ভূদেব চরিত্রের

৩৪. ভূদেব চরিত। ২য় ভাগ। মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায়,—পৃঃ—১১৪

৩৫. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ। ২য় ভাগ। হুগলী, ১৮৯৫।

বিশিষ্টতা নির্দেশ করছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের স্বদেশপ্রেম কল্পনায় ভূদেবের এই অভিমতটির পৃথক আবেদন রয়েছে। বিদেশী সাহিত্যের স্বদেশপ্রেম ও ধর্মনির্ভর প্রকৃত দেশচেতনার পার্থক্যটি ভূদেব প্রবন্ধসাহিত্যে যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে প্রতিপন্ন করেছেন। ভূদেবের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে এই আলোচনাই স্থান পেয়েছে। 'সামাজিক প্রবন্ধ' ভূদেবের দেশচেতনা, ধর্মচেতনা ও জাতীয়চেতনার স্বরূপ প্রকাশ করেছে। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে এই প্রবন্ধ গ্রন্থটি অসামান্য সংযোজন বলা যেতে পারে। এ গ্রন্থে বিশিষ্ট দেশচিন্তার আলোচনাই মুখ্যত স্থান পেয়েছে—স্বদেশপ্রেম ভিত্তিক এ জাতীয় আলোচনা গ্রন্থের প্রয়োজনও সে যুগেই ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থটি ছাড়া দ্বিতীয় কোন আলোচনা গ্রন্থ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে নেই বলে ভূদেবের এ গ্রন্থটিকে বিশেষ মূল্য দিতে হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। ভূদেবের জীবিতকালে প্রকাশিত সর্বশেষ এই গ্রন্থটি আলোচনা করলেই স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে শিক্ষিত-প্রজ্ঞাবান-স্বদেশপ্রাণ বাঙ্গালীর মনোভাব ধরা পড়বে। 'বিবিধ প্রবন্ধের' অনেক রচনায় ভূদেবের দেশচিন্তার স্বচ্ছরূপ ধরা পড়েছে—কিন্তু 'সামাজিক প্রবন্ধে' অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে ভূদেব সমস্ত বক্তব্যের, এককথায় তাঁর সারাজীবনের আদর্শের সার সংকলন করেছেন। প্রাবন্ধিক ভূদেবের শ্রেষ্ঠত্ব অনুসন্ধানের জন্য যেমন "সামাজিক প্রবন্ধ" সমালোচনার প্রয়োজন, দেশপ্রেমী ভূদেবের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের জন্য তেমনিই 'সামাজিক প্রবন্ধের'ই শরণাপন্ন হতে হয়। 'সামাজিক প্রবন্ধে' সে যুগের যথার্থ সামাজিক অবস্থা ও মানসিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যাবে। মানসিক চিন্তাধারাই সমাজের গতি নিয়ামক। ভূদেব ঊনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র চিন্তা, জাতীয়তার চিন্তাকেই এ গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন। 'ভূদেব রচনা সম্ভারের' ভূমিকায় সার্থক সমালোচনায় প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

"এই গ্রন্থে লেখক 'জাতীয়ভাব' শব্দের দ্বারা জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজমকে বুঝিয়াছেন। জাতীয়তা সম্বন্ধে এ যুগে সকলকেই চিন্তা করিতে হইয়াছে, রাজনারায়ণ, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই জাতীয়তা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ভূদেবের মতের সঙ্গে তাঁহাদের মতের মৌখিক মিল আছে সত্য। মত প্রকাশে ভূদেব রাজনারায়ণ ছাড়া অন্য সকলের পুরোবর্তী। কিন্তু ভূদেবের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে তাঁহার অভিমত পূর্ণাঙ্গ, সর্বতোব্যাপী। আর সকলে যাহা খণ্ডশ প্রকাশিত ভূদেবে তাহা সর্ব্ব অবয়ব সমন্বিত। ভূদেবের জাতীয়তা সম্বন্ধে ধারণাকে অনায়াসে উনিশ শতকের বাঙ্গালী মনীষীর ধারণা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।"

[ভূদেব রচনা সম্ভার পৃঃ ১/০]

"সামাজিক প্রবন্ধ" রচনার উদ্দেশ্য গ্রন্থের আভাষে লেখক ব্যক্ত করেছেন। "জাতীয়ভাব" ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থের পরিকল্পনা এবং বিদেশী শাসনের ফলাফল ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে সমাজকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুচিন্তিত পথে চালনা করাই লেখকের উদ্দেশ্য। এ গ্রন্থটির কোনো সর্বজনীন আবেদন থাকতে পারে না;—শুধুমাত্র আমাদের সমাজের প্রকৃত অবস্থার পটভূমিকায় যে গ্রন্থের কল্পনা—তার সঙ্গে অন্য দেশ ও অন্য জাতির কোন সংশ্রব না থাকাই স্বাভাবিক। তাই তিনি বলেছেন,

"একখানি সর্বদেশ সাধারণ সমাজতত্ত্ব গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশে, অথবা রাজনৈতিক কোনো প্রকার আন্দোলনের সহকারিতা কারবার নিমিত্তে, এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয় নাই।" [গ্রন্থের আভাষ]

জাতীয়তা সম্বন্ধে এমন সুচিন্তিত প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেও লেখক কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের কল্পনাও করতে পারেন নি। পরাধীন জাতির মধ্যে জাতীয়তার চেতনা সঞ্চারের অবশ্যম্ভাবী ফল রাজনৈতিক আন্দোলন। লেখক ইতিপূর্বেও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গে এ ধরণের মন্তব্য করেছেন,—তিনি রাজবিদ্বেষ কল্পনা করতে পারেন নি। একটি প্রবন্ধে ইতিপূর্বে তিনি এ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন,—

"এ দেশীয় সাধারণ প্রজা সকল অবস্থাতেই রাজভক্ত আছে এবং নিজের গুণেই চিরকাল তাহা থাকিবে।" [রাজভক্তি, বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ]

ভূদেবের গ্রন্থে আন্দোলন সৃষ্টির মত উত্তেজক আলোচনা নেই এবং লেখক নিজেই আন্দোলন সমর্থন করতেন না। কিন্তু লেখকের অভিমত যাই হোক না কেন—'জাতীয় ভাব' অংশটিতে পরোক্ষভাবে আন্দোলনের মূল বাণীই প্রচার করেছেন। সে যুগের প্রত্যেক লেখকই শেষ পর্যন্ত রাজানুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন প্রথাগত ভাবে, যাতে আন্তরিকতার অভাবই সর্বত্র লক্ষ্য করেছি। ভূদেবেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দেবদেবী তুষ্টির প্রথাগত রীতি লঙ্ঘন করার উপায় ছিল না,—উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমিক লেখকরাও ইংরাজ তুষ্টির রীতি লঙ্ঘন করেন নি। যাতে আন্তরিকতার অভাব ছিল অবশ্যই কিন্তু রাজরোষ এড়িয়ে যাওয়ার উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবেই গণ্য করা চলে একে।

'সামাজিক প্রবন্ধের' প্রথম অধ্যায়ে 'জাতীয় ভাব' বস্তুটি ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। কোনো শ্রদ্ধেয় ইউরোপীয়ের সঙ্গে কথোপকথনচ্ছলে তিনি এ অংশটির অবতারণা করেছেন। নিছক প্রবন্ধ রচনায় সাধারণত যে রীতি অবলম্বিত হয় ভূদেব সে পথ বর্জন করেছিলেন। এতে বিষয়বস্তুটি অনেক সহজেই আকর্ষণীয় হতে পেরেছে। এই আলোচনাতে ভূদেবের স্বদেশচিন্তার একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করি। সমগ্র

বিশিষ্টতা নির্দেশ করছে। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের স্বদেশপ্রেম কল্পনায় ভূদেবের এই অভিমতটির পৃথক আবেদন রয়েছে। বিদেশী সাহিত্যের স্বদেশপ্রেম ও ধর্মনির্ভর প্রকৃত দেশচেতনার পার্থক্যটি ভূদেব প্রবন্ধসাহিত্যে যুক্তি ও তর্কের সাহায্যে প্রতিপন্ন করেছেন। ভূদেবের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ গ্রন্থটিতে এই আলোচনাই স্থান পেয়েছে। 'সামাজিক প্রবন্ধ' ভূদেবের দেশচেতনা, ধর্মচেতনা ও জাতীয়চেতনার স্বরূপ প্রকাশ করেছে। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে এই প্রবন্ধ গ্রন্থটি অসামান্য সংযোজন বলা যেতে পারে। এ গ্রন্থে বিশিষ্ট দেশচিন্তার আলোচনাই মুখ্যত স্থান পেয়েছে—স্বদেশপ্রেম ভিত্তিক এ জাতীয় আলোচনা গ্রন্থের প্রয়োজনও সে যুগেই ছিল। কিন্তু এই গ্রন্থটি ছাড়া দ্বিতীয় কোন আলোচনা গ্রন্থ বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যে নেই বলে ভূদেবের এ গ্রন্থটিকে বিশেষ মূল্য দিতে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এই গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। ভূদেবের জীবিতকালে প্রকাশিত সর্বশেষ এই গ্রন্থটি আলোচনা করলেই স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে শিক্ষিত-প্রজ্ঞাবান-স্বদেশপ্রাণ বাঙ্গালীর মনোভাব ধরা পড়বে। 'বিবিধ প্রবন্ধের' অনেক রচনায় ভূদেবের দেশচিন্তার স্বচ্ছরূপ ধরা পড়েছে—কিন্তু 'সামাজিক প্রবন্ধে' অত্যন্ত পারদর্শিতার সঙ্গে ভূদেব সমস্ত বক্তব্যের, এককথায় তাঁর সারাজীবনের আদর্শের সার সংকলন করেছেন। প্রাবন্ধিক ভূদেবের শ্রেষ্ঠত্ব অনুসন্ধানের জন্য যেমন "সামাজিক প্রবন্ধ" সমালোচনার প্রয়োজন, দেশপ্রেমী ভূদেবের বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের জন্য তেমনিই 'সামাজিক প্রবন্ধের'ই শরণাপন্ন হতে হয়। 'সামাজিক প্রবন্ধে' সে যুগের যথার্থ সামাজিক অবস্থা ও মানসিক চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যাবে। মানসিক চিন্তাধারাই সমাজের গতি নিয়ামক। ভূদেব উনবিংশ শতাব্দীর একমাত্র চিন্তা, জাতীয়তার চিন্তাকেই এ গ্রন্থে বিশ্লেষণ করেছেন। 'ভূদেব রচনা সম্ভারের' ভূমিকায় সার্থক সমালোচনায় প্রমথনাথ বিশী বলেছেন—

"এই গ্রন্থে লেখক 'জাতীয়ভাব' শব্দের দ্বারা জাতীয়তা বা ন্যাশনালিজমকে বুঝিয়াছেন। জাতীয়তা সম্বন্ধে এ যুগে সকলকেই চিন্তা করিতে হইয়াছে, রাজনারায়ণ, বঙ্কিম, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই জাতীয়তা সম্বন্ধে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। ভূদেবের মতের সঙ্গে তাঁহাদের মতের মৌখিক মিল আছে সত্য। মত প্রকাশে ভূদেব রাজনারায়ণ ছাড়া অন্য সকলের পুরোবর্তী। কিন্তু ভূদেবের শ্রেষ্ঠত্ব এই যে তাঁহার অভিমত পূর্ণাঙ্গ, সর্বতোব্যাপী। আর সকলে যাহা খণ্ডশ প্রকাশিত ভূদেবে তাহা সর্ব্ব অবয়ব সমন্বিত। ভূদেবের জাতীয়তা সম্বন্ধে ধারণাকে অনায়াসে উনিশ শতকের বাঙ্গালী মনীষীর ধারণা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।"

[ভূদেব রচনা সম্ভার পৃঃ ১৵০]

"সামাজিক প্রবন্ধ" রচনার উদ্দেশ্য গ্রন্থের আভাষে লেখক ব্যক্ত করেছেন। "জাতীয়ভাব" ব্যাখ্যার উদ্দেশ্যেই গ্রন্থের পরিকল্পনা এবং বিদেশী শাসনের ফলাফল ও ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে সমাজকে একটি সুনিয়ন্ত্রিত এবং সুচিন্তিত পথে চালনা করাই লেখকের উদ্দেশ্য। এ গ্রন্থটির কোনো সর্বজনীন আবেদন থাকতে পারে না;—শুধুমাত্র আমাদের সমাজের প্রকৃত অবস্থার পটভূমিকায় যে গ্রন্থের কল্পনা—তার সঙ্গে অন্য দেশ ও অন্য জাতির কোন সংশ্রব না থাকাই স্বাভাবিক। তাই তিনি বলেছেন,

"একখানি সর্বদেশ সাধারণ সমাজতত্ত্ব গ্রন্থ প্রণয়নের উদ্দেশে, অথবা রাজনৈতিক কোনো প্রকার আন্দোলনের সহকারিতা কারবার নিমিত্তে, এই প্রবন্ধগুলি লিখিত হয় নাই।" [গ্রন্থের আভাষ]

জাতীয়তা সম্বন্ধে এমন সুচিন্তিত প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেও লেখক কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের কল্পনাও করতে পারেন নি। পরাধীন জাতির মধ্যে জাতীয়তার চেতনা সঞ্চারের অবশ্যম্ভাবী ফল রাজনৈতিক আন্দোলন। লেখক ইতিপূর্বেও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রসঙ্গে এ ধরণের মন্তব্য করেছেন,—তিনি রাজবিদ্বেষ কল্পনা করতে পারেন নি। একটি প্রবন্ধে ইতিপূর্বে তিনি এ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন,—

"এ দেশীয় সাধারণ প্রজা সকল অবস্থাতেই রাজভক্ত আছে এবং নিজের গুণেই চিরকাল তাহা থাকিবে।" [রাজভক্তি, বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ]

ভূদেবের গ্রন্থে আন্দোলন সৃষ্টির মত উত্তেজক আলোচনা নেই এবং লেখক নিজেই আন্দোলন সমর্থন করতেন না। কিন্তু লেখকের অভিমত যাই হোক না কেন—'জাতীয় ভাব' অংশটিতে পরোক্ষভাবে আন্দোলনের মূল বাণীই প্রচার করেছেন। সে যুগের প্রত্যেক লেখকই শেষ পর্যন্ত রাজানুগত্য প্রদর্শন করেছিলেন প্রথাগত ভাবে, তাতে আন্তরিকতার অভাবই সর্বত্র লক্ষ্য করেছি। ভূদেবেও তার ব্যতিক্রম ছিল না। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের দেবদেবী তুষ্টির প্রথাগত রীতি লঙ্ঘন করার উপায় ছিল না,—উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমিক লেখকরাও ইংরাজ তুষ্টির রীতি লঙ্ঘন করেন নি। তাতে আন্তরিকতার অভাব ছিল অবশ্যই কিন্তু রাজরোষ এড়িয়ে যাওয়ার উৎকৃষ্ট পন্থা হিসেবেই গণ্য করা চলে একে।

'সামাজিক প্রবন্ধের' প্রথম অধ্যায়ে 'জাতীয় ভাব' বস্তুটি ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। কোনো শ্রদ্ধেয় ইউরোপীয়ের সঙ্গে কথোপকথনচ্ছলে তিনি এ অংশটির অবতারণা করেছেন। নিছক প্রবন্ধ রচনায় সাধারণত যে রীতি অবলম্বিত হয় ভূদেব সে পথ বর্জন করেছিলেন। এতে বিষয়বস্তুটি অনেক সহজেই আকর্ষণীয় হতে পেরেছে। এই আলোচনাতে ভূদেবের স্বদেশচিন্তার একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করি। সমগ্র

প্রবন্ধটিতে উদ্ধৃতিযোগ্য এমন অনেক উল্লেখযোগ্য অংশ রয়েছে—উদ্ধৃতি বাহুল্য ঘটার আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও তা মোটামুটি উপস্থাপনের চেষ্টা করব। পূর্বের আলোচনায় দেখেছি, ভূদেব স্বদেশপ্রেম বলতে পাশ্চাত্ত্য দেশাত্মবোধকে গ্রহণ করেন নি। স্বকীয় মতামত দিয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশপ্রেমকেও ব্যাখ্যা করে এদেশীয় লোকের যথার্থ স্বদেশ-চেতনার স্বরূপ নির্ণয় করেছিলেন তিনি।

ভূদেবের সমসাময়িক যুগে সর্বসাধারণের কাছে দেশপ্রেম একটি মহৎ উপলব্ধি ছিল,—কাব্যে-নাটকে-উপন্যাসে এই ধারণাটিই উচ্ছ্বসিত হয়েছে। এই দেশপ্রেম একটা আবেগের দ্বারাই সৃষ্ট। পরাধীনতার চেতনা যুক্ত হয়ে দেশপ্রেম মুখ্যতঃ অতীত ইতিহাস ও অতীত স্মৃতিকে অবলম্বন করেছিল। আর্য ইতিহাসের সঙ্গে বঙ্গ ইতিহাস বিচ্ছিন্নতা হারালেও কবি সাহিত্যিকগণ সেই সুদূর অতীতকেও মূর্ত-প্রাণবন্ত ও প্রত্যক্ষ করে তুলেছিলেন। আর্যমহিমার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে বর্তমান বাংলাদেশের মাটিতে তাঁরা যে স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন ঘটিয়েছিলেন—ভূদেব ঠিক সে উপলব্ধির দ্বারা প্রভাবিত নন। 'সামাজিক প্রবন্ধ' রচনারও বহু আগে বাঙ্গলাদেশে হিন্দুমেলা, জাতীয় নাট্যশালা—'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম্' সমগ্র বাঙ্গালীকে মাতিয়ে তুলেছিল। ভূদেব যে এজাতীয় আবেগের দ্বারা আন্দোলিত বা উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাই না। বস্তুতঃ আবেগের চেয়ে যুক্তিধর্মী বিচারবোধেই ছিল তাঁর আস্থা—তাই তাঁর মননশীলতায় যুধিষ্ঠিরস্থৈর্যের প্রমাণ এ ব্যাপারেও পেয়েছি। এই আবেগকেও তিনি সমালোচনা করেছেন। কাব্যে-নাটকে যখন আন্দোলনের স্পষ্ট আহ্বান—'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' বা 'শরৎ সরোজিনী নাটকে', 'আনন্দমঠ' ও 'দেবীচৌধুরানী', 'সীতারামে' যা পেয়েছি।—তখনও ভূদেব তাঁর বক্তব্যে অটল হয়ে আছেন। 'সামাজিক প্রবন্ধের' ইউরোপীয় বলেছেন,—

"১৮৪৮ অব্দে সমুদয় ইউরোপে যে ব্যাপক রাষ্ট্রবিপ্লব হইয়াছিল, সেই বিপ্লবের একটা ঢেউ আয়র্লণ্ডে আসিয়া লাগে এবং তথায় উপদ্রব জন্মায়। আমি কয়েকজন সহাধ্যায়ীর সহিত এই উপদ্রবে যোগ দিয়াছিলাম। আমাদের মনে জাতীয় ভাবের অত্যধিক উদ্রেক হইয়াছিল।"

[জাতীয় ভাব, উপক্রমণিকা]

উত্তরে ভূদেব বলেছেন—

"তোমাদের মনে যেমন জাতীয়ভাবের উদ্রেক হয়, অমনি তোমরা ইংরেজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়া বৈস। আমাদের মনে জাতীয়ভাবের উদ্রেকে আমরা রাজবিদ্রোহ করিতে চাই না। [ঐ]

ভূদেবের এ যুক্তিটি তাঁর নিজস্ব। বস্তুতঃ জাতীয়ভাবের উদ্রেক হলে পরাধীন

জাতির মনে সাধারণতঃ যে ভাবটি সক্রিয় হয়—তার ফলে রাজবিদ্রোহই অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

ভূদেব এ তথ্য অস্বীকার করেছেন কেন বোঝা মুস্কিল। আমাদের জাতীয় চেতনা আত্মপ্রকাশের জন্য কিভাবে পথ খুঁজছিল 'সামাজিক প্রবন্ধ' প্রকাশের কয়েক বৎসরের মধ্যেই তা দেখেছি। বঙ্গভঙ্গ [১৯০৫] আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সমগ্র জাতি সেদিন সংঘবদ্ধ বিদ্রোহ প্রদর্শন করেছিল। ভূদেবের আদর্শের সঙ্গে বাস্তব সত্যের অমিল এখানেই। জাতীয়ভাবের উদ্রেক হওয়ার পর রাজবিদ্রোহ করার জন্যই সমগ্রজাতি প্রস্তুতির সাধনায় মগ্ন ছিল, আদর্শের স্বপ্নলোক থেকে মনীষী ভূদেব তা দেখতে পান নি। কারণ বিদ্রোহ প্রকাশ্যে জন্ম নেয় না,—দৃষ্টির অগোচরে ধীরে ধীরে তা শক্তি সংগ্রহ করে।—১৮৯২ সালেও ভূদেব সমগ্র জাতির প্রবণতার ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করতে পারেন নি – তার প্রমাণ 'সামাজিক প্রবন্ধে' মিলবে। আত্মসমালোচনা করে ভূদেব অবশ্য একটি আদর্শ ভারতীয় মহাজাতি গঠনের চেষ্টা করেছেন—প্রাচীন ভারতীয় আদর্শ থেকে যে জাতি প্রাণরস গ্রহণ করবে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ লগ্নে সমগ্র জাতি একটা বাস্তব আদর্শ ইতিমধ্যেই খুঁজে পেয়েছে,—সে আদর্শ দেশোদ্ধারকেই প্রাথমিক কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছিল। ভূদেব যখন মহাজাতি সংগঠনের স্বপ্ন দেখছেন—সমগ্র জাতির জীবনে তার পরীক্ষা হয়ে গেছে ইতিপূর্বেই। কিন্তু ভূদেব স্বাতন্ত্রিকতা চেয়েছিলেন আন্দোলন বাদ দিয়ে।

ভূদেব বলেছেন,—"আমরা বাঁচিয়া থাকিতে চাই, একেবারে ইংরাজের জিনিষ হইয়া যাইতে চাহি না।"

"শিক্ষাদর্পণ" পত্রিকাতেও ভূদেব আপন স্বকীয়ত্ব রক্ষার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন—"যেমন গ্রীকেরা কখন আপনাদের জাতীয়ভাব পরিত্যাগ করে নাই,—রোমীয়েরাও করে নাই এবং ইংরাজেরাও করিতে ইচ্ছুক নহেন, আমাদিগেরও সেইরূপ থাকা উচিত। সাহেবদের স্থানে শিক্ষা করায় হানি নাই, অনেক উপকারই আছে, কিন্তু একেবারে সাহেব হইবার চেষ্টা করা নিতান্ত আত্মগৌরববিহীন ব্যক্তির কার্য"—

[ভূদেব চরিত ১ম ভাগ, পৃঃ ৩০৩]

কিন্তু তার পরের উক্তিটিই ভূদেবের নিজস্ব আদর্শের কথা—"বুঝিতে পারিবে না যে, আমরা ইংলণ্ড হইতে স্বাতন্ত্রিকতা চাহি না, অন্ততঃ বহুকালের জন্য তাহা চাহি না।"

এই উক্তিটিকে সে যুগের সমগ্র জাতির বক্তব্য বলে মনে করা যায় না। এ বক্তব্য ভূদেবেরই। আমরা শুধু মানসিক স্বাতন্ত্রিকতা নিয়েই খুশী হই নি, আমরা রাজনৈতিক স্বাধিকারের স্বপ্নও দেখেছিলাম। ভূদেবের জাতীয়তার আদর্শের সঙ্গে এখানেই

সাধারণের প্রবণতার প্রচণ্ড অমিল। ভূদেবের চিন্তাশীল প্রবন্ধে স্বদেশপ্রেমের যে আদর্শ বর্ণিত হয়েছে তার মূল্য স্বীকার করেও এ সত্য প্রচার করা যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বকীয় মতামত সম্বন্ধে দৃঢ়তাই এ জাতীয় আদর্শের জন্ম দেয়,—সাময়িক পরিবেশের পটভূমিকায় তার আবেদন যাই হোক না কেন। কোন ইংরেজ সমালোচকের উদ্ধৃতি এ প্রসঙ্গে স্মরণ করি।

The power of tradition and environment in fostering nationality is implicitly and most forcibly admitted by the racial apologists of nationality, in as much as their efforts have been directed to strengthen race-consciousness, which, as we have already seen, is itself an influence of the environment. It is not race itself which is a factor in national development but a sense of the unity of purpose springing from fancied unity of race.[৩৬]

ভূদেবও বিশুদ্ধ জাতীয়ভাব ব্যাখ্যা করেছেন,—বাস্তবে জাতীয়তাবোধের প্রবণতা ও প্রকৃতি বিচার করেন নি। সেদিক থেকে 'সামাজিক প্রবন্ধ' গ্রন্থটির সাময়িক মূল্যের চেয়ে চিরন্তন মূল্য বেশী। একজন উচ্ছ্বাসপ্রবণ দেশপ্রেমিকের আবেগ এ গ্রন্থে প্রকাশ পায় নি,—সত্যসন্ধানী প্রাবন্ধিকের বিচক্ষণতাই প্রকাশ পেয়েছিল। ভূদেবের দেশপ্রেমের মহান আদর্শ পরবর্তীকালে বহু মনীষীর দ্বারা অনুসৃত হয়েছিল এই কারণেই। তিনি মানবপ্রেমিকতাকে দেশপ্রেমিকতার চেয়ে সর্বদাই বড়ো বলে মনে করেছেন। এখানে ভূদেবের উদার মানবতার বাণী শোনা যায়,—

"মুসলমানকে নেড়ে বলিয়া, পশ্চিমের লোককে মেড়ুয়া বলিয়া দক্ষিণাঞ্চল-বাসীদিগকে কদাকার বলিয়া অশ্রদ্ধা করা অতিশয় দূষ্য মনে করি—আর সন্তান সন্ততিকে দৃঢ়কায়, পরিশ্রমী, বিদ্বান এবং স্বধর্মনিষ্ঠ ও স্বজাতির মুখাপেক্ষী করিবার নিমিত্ত প্রাণপণ যত্ন করি। [জাতীয় ভাব, উপক্রমণিকা]

এই সর্বভারতীয় মানবতাবাদের আদর্শ প্রচার ভূদেবের অসামান্য উদারতারই নামান্তর। ভারতবাসীমাত্রকেই একটি মহাজাতির অংশ বলে প্রচার করেছিলেন তিনি। এই উদার মানবতার আদর্শের প্রথম সার্থক প্রবক্তা ভূদেব। বঙ্কিমচন্দ্রও মানবতার আদর্শকেই গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু কোথাও কোথাও ভৌগোলিক সংস্কার তাঁকে আচ্ছন্ন করেছিল। ভূদেবের দৃষ্টি সর্বদাই স্বচ্ছ। ভারতের রাজনৈতিক

৩৬. John Oakesmith, Race and Nationality—An Enquiry into the Origin and Growth of Patriotism, London, 1919, P—48.

স্বাধীনতার আন্দোলন যখন জন্ম নিচ্ছে ঠিক সেই মুহূর্তে ভূদেবের এই উদারদার্শনিকতার পূর্ণ অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর হয় নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বাহ্নে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' ও 'বন্দেমাতরম' যত বেশী কার্যকরী হয়েছে—ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ' ততটা কার্যকরী হয় নি। ভূদেবের গভীর জীবনাদর্শ উত্তেজনার মুহূর্তে বোধগম্য না হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। তাছাড়া ভূদেব কালানুসারী নয়, কালাতিক্রমী বক্তব্যকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন 'সামাজিক প্রবন্ধে'। ভূদেব সে যুগের আন্দোলনে আস্থাবান ছিলেন না তার প্রমাণও রয়েছে। "ওগুলি ইংরাজাধিকারে ইংরাজী শিক্ষার অবশ্যম্ভাবী ফল, এবং নিরবচ্ছিন্ন অনুচিকীর্ষা প্রসূত, এইজন্য কিয়ৎপরিমাণে অবশ্যই অন্তঃসারশূন্য।"—এই ছিল তাঁর অভিমত। কিন্তু স্বদেশপ্রীতি যে সহজাত বস্তু একথা তিনি সর্বদাই উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। 'জাতীয়ভাব' শব্দটির দ্বারা তিনি যে কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন তা হল এই,—

"বস্তুতঃ স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি অনুরাগ কাহারই কখন একেবারে যাইতে পারে না।··একদেশজাত এবং একদেশপালিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে বাহ্য প্রকৃতির একরূপ হওয়াতে এবং একদেশজাত জনগণ পরস্পর সংসৃষ্ট থাকাতে তাঁহাদিগের অন্তঃকরণবৃত্তিও একরূপ হইয়া যায়। এই একরূপতাই স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি ভালবাসার গূঢ় কারণ এবং সেই কারণ, পুরুষ পরম্পরাক্রমে কার্যকরী হওয়াতে, জাতীয় ভাবটি মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে অতি গূঢ়তররূপেই অধিকার করিয়া থাকে।"

[জাতীয় ভাব, ইহার উপাদান]

এই জাতীয়ভাবকেই স্বদেশপ্রেম বলা যাবে কি না—সেটাই আমাদের বিচার্য বিষয়। ভূদেব কথিত জাতীয়ভাব ভাবমাত্র, এই ভাব যখন চিত্তে প্রবল হয়ে ওঠে তার বাহ্যপ্রকাশকেই স্বদেশপ্রেম বললে সম্ভবতঃ বিষয়টি স্পষ্ট হয়। স্বদেশপ্রেমের মধ্যে ভাবটাই আবেগের স্তরে উন্নীত হয়। সুতরাং ভূদেবের আলোচনা ভাব থেকে আবেগের স্তরে ওঠে নি বলেই আন্দোলনের কল্পনাও করতে পারেন নি তিনি।

ভূদেব ইংরেজ শাসনের ব্যাখ্যা করেছেন অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবে,—

"সমস্ত ভারতবর্ষের রাজ্যশাসন এক্ষণে সর্বতোভাবে এক হইয়া উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের ঈশ্বরী এখন ভারতেশ্বরী হওয়াতে আমরা সকল ভারতবর্ষীয় এক সম্রাটের অধীনে এক মহাসাম্রাজ্যবাসী বলিয়া আপনাদিগকে সুস্পষ্টরূপেই জানিয়াছি। এক্ষণে আমাদের সাধারণ সুখ, দুঃখ, আশা, ভরসা, আকাঙ্ক্ষা এবং নিরাশ, এক সূত্রে সম্বদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে।" [ঐ]

বিদেশী শাসনের পরোক্ষ ফলাফল ভূদেবকে সন্তুষ্ট করেছে—কিন্তু উনবিংশ

শতাব্দীর শেষের দশকে দেশব্যাপী যে ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছিল তার পটভূমিকায় ভূদেব যে নিরপেক্ষ বিচার ও দূরদর্শিতারই পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সর্বজনীন ঐক্যের ভাবী ফলাফল সম্বন্ধে ভূদেব নীরব ছিলেন। সর্বজনীন জাতীয়চেতনার আলোকেই সেদিন সমগ্র ভারতবাসী ভবিষ্যৎ দর্শন করেছিল, ভাবী সংগ্রামের প্রস্তুতিও চলেছে তখন থেকেই। স্বদেশপ্রেমই ছিল তাদের পাথেয়। ভূদেবের চিন্তা তখনও ভাবজগতেই আবদ্ধ।

ভূদেবের স্বদেশচিন্তায় নীতিজ্ঞানের প্রাধান্য অনেক ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করেছি। ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক অবস্থানের ঐতিহাসিক হেতু নির্ণয় করে ভূদেব ইংরাজের ভেদনীতির সমালোচনা করেছেন ও হিন্দুদের আদর্শ পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। রাজ্য শাসনের জন্য হিন্দু মুসলমানের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির যে চেষ্টা ইংরাজ সর্বদাই করে এসেছে ভূদেব সেই প্রবৃত্তির নিন্দামাত্র করেছেন—কিন্তু এর পরিণতি সম্পর্কে তিনি নীরব। তিনি উপদেশ দিয়েছেন ইংরাজদেরও,—

"ঐ সকল ইংরাজের এই কৌশলটি যে অপরিণামদর্শিতার ফল তাহা নিঃসন্দেহ, কারণ যদিও রোমীয়দিগের ঐরূপ রাজনীতি থাকা সত্য হয়, তথাপি সে রাজনীতির বলে রোম সাম্রাজ্য চিরস্থায়ী হয় নাই। অতএব এই রাজনীতি সর্বতোভাবে দূষ্য। কিন্তু উহা যতই দূষ্য হউক ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষ সতর্ক হওয়া উচিত।"

[জাতীয় ভাব, ভারতবর্ষে মুসলমান]

এই দূরদৃষ্টি ইংরেজের কানে অবশ্য পৌঁছয় নি—কিন্তু এই কৌশলটি যে ব্যর্থ হয়েছে ভূদেবের উদ্ধৃত মন্তব্যই তার প্রমাণ। ভূদেব এই ধুরন্ধর বিদেশীশাসকের প্রকৃতি নির্ণয় করেছিলেন অভ্রান্তভাবে, কিন্তু তবু এর আশু ফলাফল সম্বন্ধে তিনি আগাগোড়াই নীরব থেকেছেন। ইংরেজশাসনের অপকৌশলই অবশেষে হিন্দু ও মুসলমান নির্বিশেষে সমস্ত ভারতবাসীর মধ্যে একটি অখণ্ড জাতীয়তাবোধের চেতনা সঞ্চার করেছিল। ভূদেব যে যুগে 'সামাজিক প্রবন্ধ' রচনা করছেন—সে যুগের পক্ষে কোন উপদেশাত্মক রচনার চেয়ে উত্তেজনাকর রচনাই অনেক বেশী মূল্য পেয়েছিল- তাই ভূদেবের ইংরাজ আনুগত্যের নিদর্শন ও মানসিক স্বাধীনতা রক্ষার আপাতঃ অসম্ভব উপদেশ সে যুগে কার্যকরী হয় নি। 'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেব জাতীয় ভাব সম্পর্কে সুবৃহৎ ও তথ্যপূর্ণ আলোচনা করার আগে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধে এসব আলোচনা করেছেন,—"বিবিধ প্রবন্ধে" তা সংকলিত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন আবেগ তাঁর চরিত্রে ছিল না—তার হেতুও ছিল স্পষ্ট। ভূদেব আত্মিক স্বাধীনতার বেশী মূল্য দিয়েছেন, তাই রাজনৈতিক অধীনতার তীব্র জ্বালা

তিনি অনুভব করেন নি। এই বিষয়টির ওপর তিনি অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। স্বাধীনতা লাভের যে প্রেরণা সেযুগের ভারতবাসীকে উত্তেজিত করেছিল তার মূলে পরাধীনতার তীব্র বেদনাবোধ ছিল। বাঙ্গালী কবি ও সাহিত্যিকের কণ্ঠে যে বেদনার বাণী নানাভাবে ব্যক্ত হয়েছে—ভূদেব তা অনুভব করেন নি। আত্মিক স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্রিকতা পালনের মধ্যেই জীবনের চরম সার্থকতা লাভ করেছিলেন বলে স্বধর্ম রক্ষা ও জাতীয় ভাবের আলোচনাতেই তাঁর প্রচেষ্টা আবদ্ধ ছিল। তাই সেযুগের স্বদেশপ্রেমিক সাহিত্যস্রষ্টার সঙ্গে ভূদেবের স্বদেশচেতনার একটা পার্থক্য লক্ষ্য করি। ভূদেবও স্বদেশপ্রাণ কিন্তু পরাধীনতার বেদনা তাঁকে অধীর করে নি—তিনি আপন স্বভাবের প্রচণ্ড স্বাতন্ত্রিকতার আদর্শটিই গ্রহণ করে সন্তুষ্ট ছিলেন। এই মনোভাব তাঁর "স্বাধীন চিন্তা" প্রবন্ধে খুব চমৎকারভাবে ধরা পড়েছে,

"আমাদের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা ছিল এবং এখনও আছে একথা ইংরেজী শিক্ষিতদিগের কর্ণে বড়ই বিসদৃশবোধ হইবে, এইজন্য স্বাধীন এবং স্বাধীনচিন্তা এই দুইটি কথার অর্থ একটু সুস্পষ্টরূপে বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। আমরা যখন বলি ইংরাজেরা স্বাধীন জাতি তখন এই কথাই বলিতে চাহি যে, উহারা ভিন্ন জাতীয় অধিনায়কদিগের অধীন নহেন, স্বজাতীয় রাজপুরুষদিগের অধীনে এবং স্বজাতির ব্যবস্থার অধীনে পরিচালিত। ইহাই স্বাধীনতা।..ইংরাজ যখন বাইবেল মানেন, স্বদেশীয় রীতিনীতি মানিয়া চলেন তখনও তিনি স্বাধীন চিন্তাশীল হইতে পারেন। আমরা আপনাদের ধর্মশাস্ত্র এবং কুলাচার মানিয়াও তদ্রূপ স্বাধীন চিন্তাশীল থাকিতে পারি। তাহাতে পরাধীনতা ঘটে না।...চেষ্টা করিলেই এরূপ প্রকৃত স্বাধীনচিন্তার বলে তথ্য জানিতে পারিবে এবং বুঝিবে যে যাঁহারা আপনার শাস্ত্র মানে তাহারাই স্বাধীন। তাঁহাদের মন পরাধীন হয় নাই।"

[বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ]

এই মানসিক স্বাধীনতার আনন্দ ভূদেবকে রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে টেনে নিয়ে গেছে। তাই সে যুগের কাব্য-উপন্যাস-নাটকের প্রত্যক্ষ উত্তেজনা ভূদেবের চিন্তাজগতে প্রভাব ফেলতে পারে নি। তিনি প্রজ্ঞা ও বিচারবুদ্ধি দিয়ে মানসিক স্বাধীনতার মাহাত্ম্য নির্ণয় করেছেন। 'সামাজিক প্রবন্ধ' সেদিক থেকে একটি পৃথক সুরের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছে। উত্তেজনাবিহীন দেশপ্রেমের স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টাটাই এ গ্রন্থে আভাসিত। ভূদেবের স্বদেশপ্রেমের আদর্শ নির্ণয়ে অনুরূপা দেবী বলেছিলেন,—

"ভূদেব বাবুর চরিতে কেমন করিয়া মানুষ সমাজ ও স্বজনপ্রেমকে বজায়

রাখিয়া প্রকৃত বিশ্বপ্রেমিক হইতে পারে তাহার জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়।”[৩৭]

ভূদেব একটি মহৎ আদর্শের স্বপ্ন দেখেছেন,—পাশ্চাত্ত্য স্বদেশপ্রেম ও স্বাজাত্যবোধ কোনদিনই তাঁকে আকৃষ্ট করে নি। তাই ভূদেবের স্বদেশচেতনাকে সমসাময়িক উত্তেজনার স্পর্শবিহীন একটি পূর্ণাঙ্গ অনুভব বলা যেতে পারে। প্রমথনাথ বিশী ভূদেবের স্বদেশচিন্তাকে 'উনিশ শতকের বাঙ্গালী মনীষীর ধারণা', বলে চিহ্নিত করেছেন।

পাশ্চাত্ত্য ভাবের মূলে যে অহংচেতনা রয়েছে—ভারতের সনাতন আদর্শের সঙ্গে তার বিরোধটিই ভূদেব নির্ভুলভাবে নির্ণয় করেছিলেন। তাই 'জাতীয় ভাব' সম্বন্ধে ভারতবাসী কোনদিনই সচেতন ছিল না। জাতীয় ভাব নিয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশের লোক সর্বদাই গর্বোন্মত্ত। ভারতবাসী এ বিষয় সম্পূর্ণ অচেতন। ভূদেব নিরপেক্ষভাবে উভয় আদর্শ বিচার করেছেন।

“ইংরাজ সর্বদাই স্বজাতীয়ের স্বার্থানুসন্ধানে মনোযোগী, স্বজাতীয়ের প্রশংসাবাদে শতমুখ, স্বজাতীয়ের নিন্দাবাদে ক্রুদ্ধ ও উদ্যতপ্রহরণ। তাহার চরিত্র হইতে এই স্বজাতি বাৎসল্যটি শিখিতে পারিলে ভারতবর্ষে ইংরেজের সমাগম হিন্দুর পক্ষে ধর্মবর্দ্ধক হইতে পারে। ইহার কতকটা বাহ্যলক্ষণ সম্প্রতি দেখা দিতেছে। ঐ লক্ষণগুলি ক্রমশঃ জনগণের হৃদয়ের অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া গেলে ভারতবাসীর অনেক দুঃখ ঘুচিবার পথ মুক্ত হইবে। যাহাকে ইংরাজের উন্নতি বলা যায় তাহার হেতু ইংরাজের স্বার্থপরতা নয়, ইংরাজের স্বজাতিবাৎসল্য। ইংরাজের যদি অবনতি হয় তাহা ঐ স্বার্থপরতার জন্যই হইবে। অতএব ইংরাজের ন্যায় স্বার্থপর হইয়া কাজ নাই। ওরূপ স্বার্থপরতা আমাদের স্বভাবের বিপরীত। হিন্দু যদি ইংরাজের ন্যায় স্বজাতিবৎসল, স্বজাতি গুণগ্রাহী, স্বজাতি দোষ প্রচ্ছাদক হইয়া উঠেন, তাহা হইলেই যথেষ্ট হইবে।”

[পাশ্চাত্ত্যভাব, স্বার্থপরতা]

এই দীর্ঘ উক্তিটি বিশ্লেষণ করলে ভূদেবের সত্য বিচারের সূক্ষ্ম ক্ষমতাটি সম্পর্কে আমরা অবহিত হই। ভূদেব পাশ্চাত্ত্য স্বদেশপ্রেমের স্বরূপ নির্ণয় করেছেন অভ্রান্ত-ভাবে। স্বার্থপরতা ছাড়া অন্য কোন সংজ্ঞা দিয়ে সঠিকভাবে বোঝানো যায় না এ অনুভূতিকে। কিন্তু তবুও ইংরেজের অনুকরণযোগ্য গুণের প্রশংসা করতেও দ্বিধা করেন নি। ভূদেব ভারতবাসীর স্বজাতিবিদ্বেষ ও স্বধর্মবিদ্বেষেরও তীব্র সমালোচনা করেছেন। “এই স্বদেশী বিদ্বেষ পাপের স্খালনের জন্য ভগবান স্বদেশপ্রেমিক শ্রেষ্ঠ ইংরাজকে ভারতে প্রেরণ করিয়াছেন”—এমন মন্তব্যও ভূদেবেরই।

৩৭. ভূদেব চরিত। ২য় ভাগ। 'নিবেদন'—অনুরূপা দেবী।

বস্তুতঃ স্বদেশপ্রেম যে যুগে অতিউচ্ছ্বসিত আবেগের দ্বারা চালিত একটি সর্বসাধারণ অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে—তখনও ভূদেব যুক্তি দিয়ে এর অন্তর্নিহিত মহিমার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরাতে চেয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য স্বদেশহিতৈষিতার মধ্যে যেটুকু পরিবর্জনীয় তার সমালোচনা করেছেন। ভূদেব শুধু রাজনৈতিক মুক্তির কথা কখনও চিন্তা করেন নি, তাঁর সাধনা পূর্ণ মানবতা লাভের সাধনা। অন্ধ আবেগে ইংরাজী রীতির অনুসরণকে তিনি সর্বদাই আন্তরিক ভাবে বর্জনের উপদেশ দিয়েছেন।

"আমরা ইংরাজ রীতির প্রতি অতি ভক্তিমান হইয়াছি এবং ভারতবর্ষকে কিরূপে ইংলণ্ড করিয়া তুলিব তাহা ভাবিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছি বটে, কিন্তু ইউরোপীয় দর্শনশাস্ত্রবিদেরা পুনঃ পুনঃ বলিতেছেন যে. ইউরোপ নিতান্ত অসুখময় হইয়া উঠিতেছে, ওখানে একটা অতি ভয়ানক সমাজবিপ্লব অবশ্যই ঘটিবে।"

[পাশ্চাত্ত্য ভাব, ইংরাজ সমাগম]

এই প্রজ্ঞা দৃষ্টির যিনি অধিকারী তাঁর পক্ষে নিছক রাজনৈতিক মুক্তির উপায় মাত্র চিন্তা করা সম্ভব ছিল না। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ যে শাশ্বত ভারতবাণী প্রচার করে গেছেন ভূদেবকে তাঁদের পূর্বসূরী বলে অভিনন্দন জানাতেই হবে। মানব সমাজের সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করতেন ভূদেব, নিতান্ত সাময়িক একটি উত্তেজনাকে তিনি খুব বেশী গুরুত্ব দিয়েছিলেন বলে মনে হয় না।

'বিবিধ প্রবন্ধের' কোথাও কোথাও ভূদেব পরাধীনতাকে প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জনের প্রতিবন্ধক বলে ব্যাখ্যা করেছেন,—মনুষ্যত্ব অর্জনের সাধনা করলে পরাধীনতার বাধাকে অতিক্রম করা সম্ভব। তিনি বলেছেন—"যেখানে জাতিভেদ নাই এবং পরাধীনতা আছে, সেখানে পরাধীনতার অতিবিষময় ফলই ফলে, সেখানে আত্মগৌরব একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায়, মন ক্ষুদ্র হয় এবং প্রকৃত মনুষ্যত্ব জন্মিবার কোন পথই থাকে না।"[৩৮] [বঙ্গ সমাজে ইংরাজ পূজা, বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ]

অবশ্য জাতিভেদ প্রথার স্বপক্ষে ভূদেবের যুক্তি ছিল এই যে,—"ঐ প্রথা থাকাতে লোকে স্বজাতীয়দিগের মধ্যেই বড়লোক দেখিতে পায়, বিদেশীয় রাজপুরুষকেই সর্ববিষয়ে সর্বোপরি দেখে না এবং সেই জন্য উহাদিগের প্রতি অযথা ভক্তিও করে না।" [ঐ]

ভূদেবের মতামতে কিছু বিশিষ্টতা ধরা পড়লেও জাতিভেদের মহিমা অনুসন্ধান করে পরাধীনতাকে তিনি সহনীয় বলে মনে করেছিলেন বলে খুব আশ্চর্য লাগে।

৩৮. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বিবিধ প্রবন্ধ। ২য় ভাগ, হুগলী ১৮৯৫।

আমাদের মনোভাবের সবকিছুই যে উত্তম—একথা মনে করে আত্মপ্রসাদ লাভের ব্যগ্রতা ভূদেবেরই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বলা চলে। 'সামাজিক প্রবন্ধেও' বলেছেন,—

"জাতিভেদ প্রথা প্রত্যেক বর্ণের স্বাতন্ত্রিকতা স্থাপন করিয়া সকলেরই অনেকটা আত্মগৌরব রক্ষা করে। অতএব পরাধীন জাতির পক্ষে এই প্রথা বিশেষ শ্রেয়স্করী।"
[পাশ্চাত্ত্যভাব—সাম্য]

এই জাতীয় আলোচনায় ভূদেবের চিন্তাশক্তির উদারতাই ধরা পড়েছে। ভূদেব কখনও আত্মদৈন্যের দ্বারা পীড়িত হতেন না। পরাধীনতা তাঁর মনের সমৃদ্ধি ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি— মানসিক স্বাধীনতার আনন্দে তিনি এমনই মগ্ন ছিলেন। রজনীকান্ত গুপ্ত ভূদেব সম্পর্কে বলেছেন,—

"তিনি বিদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারের সহিত স্বদেশীয় জ্ঞানভাণ্ডারের তুলনা করিয়া, অধঃপতিত আত্মজাতিকে জাতীয় ভাবে শক্তিসম্পন্ন করিবার জন্যই আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বদেশহিতৈষিতা, তাঁহার স্বজাতিপ্রিয়তা, তাঁহার কর্তব্যবুদ্ধি এইরূপ বলবতী ছিল।...তাঁহার জাতীয় ভাবপ্রবাহের প্রখরবেগে বিজাতীয় ভাবের সঙ্কীর্ণ, পঙ্কিলপ্রবাহ একেবারে শক্তিশূন্য হইয়াছিল।

কিন্তু ভূদেব স্বদেশের কোনো বিষয়ে স্বকীয় সমাজের কোনো স্তরে পাশ্চাত্ত্য-ভাবের রেখাপাত করিতে প্রস্তুত হয়েন নাই। তিনি যেমন ইংরাজীতে সুপণ্ডিত ছিলেন, সেইরূপ সংস্কৃত শাস্ত্রেও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন, যেরূপ ইংরেজ সমাজের তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছিলেন, সেইরূপ স্বদেশীয় সমাজেরও অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। ইংরেজের জাতীয় প্রকৃতির সহিত আপনাদের জাতীয় প্রকৃতি মিলাইয়া লওয়াই তাহার উদ্দেশ্য ছিল।"[৩৯] [প্রতিভা—ভূদেব মুখোপাধ্যায় পৃঃ ৯২-৯৩]

ভূদেব 'সামাজিক প্রবন্ধের' উপসংহারে স্বদেশপ্রেমকে হৃদয়ের সর্বোচ্চ ভাব বলে স্বীকার করেন নি। জাতীয় ভাবের চরম উৎকর্ষের সাধনাই ভারতবাসী করে এসেছে চিরদিন। তাই সঙ্কীর্ণ দেশবাৎসল্য তাকে আকৃষ্ট করে নি। স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে ভূদেবের চিন্তাশীল গবেষণার সার অংশ হিসেবে এই স্তবকটি উদ্ধৃত করা দরকার।

"ইউরোপীয় সমাজের সহিত ভারত সমাজের তুলনায় প্রবৃত্ত হইয়া যাঁহারা ভারত-বাসীর জাতীয় ভাবটি পরিস্ফুট হয় নাই মনে করেন, তাঁহারা ঐ ভাবের তথ্যটি ভাল করিয়া বুঝেন বলিয়া বোধ হয় না। জাতীয় ভাবটি মনুষ্য হৃদয়ের খুব উচ্চভাব বটে, কিন্তু উহা সর্বোচ্চ ভাব নয়। জাতীয়ভাব একটি মিশ্র পদার্থ। ইহাতে ভাল এবং

৩৯. রজনীকান্ত গুপ্ত, প্রতিভা, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৮৯৬।

মন্দ, প্রশস্ততা এবং অপ্রশস্ততা দুইই আছে। কোন ভাবের সহিত তুলনায় ইহা অতি উদার ভাব, আবার কোন ভাবের সহিত তুলনায়, ইহা অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ ভাব।... একজন ইউরোপীয় পণ্ডিত বলিয়াছেন—স্বদেশানুরাগের মূল অভিমান, ইহার শাখা প্রশাখা এবং পত্র বিটপাদি বাহ্য আড়ম্বর, ইহার কাণ্ড পরজাতির প্রতি বিদ্বেষ, ইহার ফল পুষ্পাদি যেমন স্বদেশের সমৃদ্ধি, তেমনি পরদেশের পীড়ন, ইহা একটি দোষেগুণে জড়িত উপধর্মমাত্র।"

স্বদেশপ্রেমের চেয়েও বড়ো ধর্ম যিনি নিজের জীবনে অবলম্বন করেছিলেন তাঁকে যুগোপযোগী আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করলে সম্পূর্ণভাবেই অবিচার করা হবে। ভূদেব শাশ্বত ভারতবাণী প্রচার করেছিলেন বলেই তিনি নিতান্তই সাময়িক চিন্তাকে খুব সহজেই অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। স্বদেশপ্রেমের আবেগ সম্বল করে আমরা সহজেই উত্তেজিত হতে পারি,—আন্দোলন করতে পারি,—এমন কি রাজনৈতিক স্বাধিকার লাভে সমর্থ হতে পারি, কিন্তু আত্মিক মুক্তি লাভ সম্ভব হয় না। ভূদেবের মত দূরদর্শী প্রাবন্ধিকের চিন্তাধারার মহিমা এখানেই। তিনি যুগানুগ চিন্তাকে অতিক্রম করে যুগোত্তীর্ণ বা শাশ্বত সত্য অনুসন্ধানেই ব্যস্ত ছিলেন। তাই "সামাজিক প্রবন্ধের" মত এমন সমাজতত্ত্বমূলক মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব হয়েছিল। সনাতন ভারতের চিরন্তন আদর্শকে নতুন করে বিচার করেছেন তিনি। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর মনীষীরাও স্বাধীনতা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ ছিলেন না। এর প্রতিক্রিয়া দেখা গিয়েছে নানাভাবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শ নিয়ে মত পার্থক্য চিরদিনই ছিল। এ বিষয়ে ভূদেব দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছিলেন,—

"আমার দৃঢ় প্রতীতি এই যে, যতদিন আমাদের মধ্যে তাদৃশ কোন নেতৃ-মহাপুরুষের আবির্ভাব না হইতেছে, তাবৎকাল আমরা ধৈর্যাবলম্বনপূর্বক ভারত গভর্ণমেণ্টকেই রাজনৈতিক বিষয়ে আপনাদিগের সর্বোৎকৃষ্ট সহায় স্বরূপে লইয়া চলিলে নিতান্ত অকৃতকার্য হইবে না।

...ভারতবাসীর ক্ষমতা ন্যূন হইয়া গিয়াছে। ভারতবাসী আপনাকে বহিঃশত্রু হইতে রক্ষা করিতে অশক্ত, আপনার সুশাসনে আপনি অক্ষম, নিজের দেশটিকে নিজে মিলাইয়া এক করিতে পারেন নাই। এখন ত সমস্ত দেশ একচ্ছত্রে মিলিত হইয়াছে, তথাপি উহাকে স্বশক্তিতে একত্র করিয়া রাখিতে পারেন বলিয়া মনে করিতে পারেন না। সুতরাং ভারতবাসীর পক্ষে অপরের সাহায্য অত্যাবশ্যক।"

[ভবিষ্যবিচার—তাহার উপসংহার]

ভূদেবের এ মতটি যথেষ্ট অর্থপূর্ণ। ভূদেব খণ্ড-বিচ্ছিন্ন জাতির মানসিক প্রবণতা

নির্ণয় করেই এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। সে যুগের আন্দোলনের প্রবাহও তিনি লক্ষ্য করেছিলেন কিন্তু তাকে কেন্দ্র করেই ভারতের ভবিষ্যতের কল্পনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি "কর্তব্য নির্ণয়—নেতৃপ্রতীক্ষা" অংশটিতে তাঁর ভবিষ্যৎ আশার কথা ব্যক্ত করেছিলেন। আন্দোলন তখনই সার্থক হবে যখন এদেশের জলবায়ু-মাটিতে একজন খাঁটি ভারতীয় নেতার আবির্ভাব ঘটবে। ভূদেবের এই ভবিষ্যৎ-বাণীরও যথার্থ তাৎপর্য রয়েছে। আন্দোলন যে স্বাধীনতা আনে নি সে ত সত্যি কথাই,—অসীম শক্তিমান যুগন্ধর ব্যক্তির নেতৃত্বই আমাদের ঈপ্সিত স্বাধীনতা দান করেছিল। ভূদেব বলেছিলেন,—

"ইংরাজ নেতার প্ররোচনায় ইংরাজীশিক্ষিত লোকেরা এদেশে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং আপনাদের সমর্থনের উদ্দেশ্যে লোক সংগ্রহের চেষ্টা করেন। আমার বিবেচনায় ঐ প্রণালী এদেশের অনুপযোগী। অতএব ইংরাজ নেতৃত্বে এখানে সমীচীন কার্য হইতে পারে না, অর্থাৎ ইংরাজ সত্বেও ভারতবর্ষে দেশীয় নেতারই সমূহ প্রয়োজন হইয়া আছে।" [ভবিষ্যবিচার—তাহার উপসংহার]

'সামাজিক প্রবন্ধের' আলোচনা থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয়েছে যে, ভূদেব আগামী ভবিষ্যতে আসন্ন একটি গণ-অভ্যুত্থানের স্বপ্ন দেখেছিলেন বটে কিন্তু সুপরিচালিত না হলে এই অভ্যুত্থান বিফল হতে পারে—এমন আশঙ্কাও পোষণ করেছেন। ভাবাবেগে আন্দোলিত না হয়ে তিনি যুক্তির আশ্রয় নিয়েছিলেন। তথাকথিত আন্দোলনের ও উদ্দীপনার দ্বারা অভিভূত না হয়ে ভূদেব সার্থকতার কারণ অনুসন্ধানেই ব্যস্ত ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ সমালোচনার মাধ্যমে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা সৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন,—এ ব্যাপারে কমলাকান্ত-বঙ্কিমচন্দ্র তীব্র নির্মম ব্যঙ্গের হাতিয়ার প্রয়োগ করেছেন। ভূদেব সর্বদাই স্পষ্টবাদী উপদেষ্টা। সমাজের বিভিন্ন দিক নিয়ে যুক্তিপূর্ণ সমালোচনা করে তিনি যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন সামাজিক প্রবন্ধের "কর্তব্যনির্ণয় নেতৃপ্রতীক্ষা" অংশটিতে তার আভাস আছে,—

"ভারতবাসীর যত প্রকার ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায়, সকলগুলিই সম্মিলন-প্রবণতার ন্যূনতা হইতে সম্ভূত। ভারতবাসী রত্নপ্রসবা ভারতের ক্রোড়ে থাকিয়াও দরিদ্র। ভারতবাসী শ্রমশীল হইয়াও উদরান্নে বঞ্চিত। ভারতবাসী বুদ্ধিমান হইয়াও অন্যের পরিচালনার অপেক্ষী। ভারতবাসীর মৃত্যুভয় স্বল্প হইলেও তিনি ভীরু বলিয়া জগতে প্রসিদ্ধ। এই সকল এবং অপরাপর সকল দোষের একমাত্র মূল, সম্মিলনে অক্ষমতা।

...কোন স্বদেশীয় মহাপুরুষ কর্তৃক ইহার উপায় উদ্ভাবিত না হইলে আমাদের এই মৌলিক দোষ দূর হইবে না। তাদৃশ মহাপুরুষের যাহাতে

আবির্ভাব হয় তাহার কোন পথ আছে কি না, ইহাই এক্ষণে ভাবিয়া স্থির করিবার প্রয়োজন।" [কর্তব্যনির্ণয়—নেতৃ প্রতীক্ষা]

ভূদেবের এই প্রতীক্ষা পূর্ণ হয়েছিল। সত্যই ভারতবাসী যোগ্য নেতৃত্ব লাভ করেছে এবং স্বাধীনতা লাভের পূর্বাহ্ণে সমগ্র ভারতবাসী একদা ঐক্যসূত্রে মিলিত হয়েছে। ভবিষ্যৎ ভারতের সম্বন্ধে এ আশাপূর্ণ মন্তব্য করেছেন ভূদেব তার কারণ বর্তমানের উত্তেজনা তাঁকে স্পর্শ করে নি বলে তিনি হতাশ হন নি। 'সামাজিক প্রবন্ধে' ভূদেবের প্রজ্ঞাদৃষ্টি ও ভাবদৃষ্টির সমন্বয় সাধিত হয়েছে,—স্বদেশপ্রেমিক ভূদেব যতো নিশ্চিন্ত মনে এই গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন, এ গ্রন্থে সাধকোচিত যে নির্ভীকতা ও অম্লান বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অন্য রচনায় তা সুলভ নয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বে এই জাতীয় সুষ্ঠু চিন্তাধারার সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ ঘটেছিল বলেই স্বাধীনতা আন্দোলন শেষ পর্যন্ত একটা সুপরিকল্পিত আদর্শ বহন করেছে।

"বাংলার ইতিহাসে"ও ভূদেব নিরপেক্ষভাবে তদানীন্তন বৃটিশ শাসকের বিবরণ দান করেছেন,—কোথাও ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা তিনি লংঘন করেন নি। পরাজিত ও নিগৃহীত হয়েও ভূদেব মনোজগতে স্বাধীন ছিলেন। আপাতঃ দৃষ্টিতে এই সংযম-শক্তির মহিমা চেনা যায় না—কিন্তু ভূদেবের সমগ্রজীবন আলোচনা করলে তা স্পষ্ট হয়। সে যুগের প্রতিটি কবি-নাট্যকার ও ঔপন্যাসিকের চরিত্রে ও চিন্তায় যে বিক্ষুব্ধ মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি—তা হচ্ছে সাময়িকতারই প্রতিচ্ছবি। ভূদেবের নির্বেদ শান্ততাকে মাঝে মাঝে ব্যতিক্রম বলেই মনে হয়। ভূদেব আবেগশূন্য ছিলেন না কিন্তু সে আবেগ স্বধর্মপ্রীতি ও স্বসমাজরক্ষাতেই সীমিত ছিল। তাঁর "পারি-বারিক প্রবন্ধ" ও "আচার প্রবন্ধে" সেই আবেগ লক্ষ্য করেছি। বিদেশীয় শাসকদের নিষ্ঠুরতা ও উদারতার ইতিহাস বর্ণনাতে ভূদেবের সংযম ও আদর্শ লক্ষ্যণীয়। এক্ষেত্রে শিক্ষাব্রতী ভূদেবের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে। 'শিক্ষাদর্পণে' ছাত্রদের লক্ষ্য করেই তিনি উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ইতিহাস রচনা করেছেন। শুধু গ্রন্থের পরিশিষ্টে আপন মনোভাবের কিছু পরিচয় পাই।

"ইংরেজ অধিকারে দেশ নিরুপদ্রব হইয়াছে, সর্বত্র যাতায়াতের সুবিধা হইয়াছে, এবং সাময়িকপত্রে সমস্ত দেশের সংবাদ সকলে সহজে পাইতেছে একই ভাবের শাসন সর্বত্র চলিলে, সুখ, দুঃখ একই ভাবের হইলে, দেশের লোকের পরস্পরের সহিত সহজেই সহানুভূতি জন্মে। স্বধর্মনিষ্ঠ মুসলমানেরা এখন সযত্নে উহাদেরও মাতৃভাষা বাঙ্গালার অনুশীলন আরম্ভ করায় এবং নিম্ন বর্ণের বাঙ্গালীরা উচ্চবর্ণের অনুকরণে আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে কতক উন্নত হওয়ায়—বর্ণ ও ধর্ম নির্বিশেষে

বাঙ্গালী মাত্রের মনে একটা জাতীয় ভাব অঙ্কুরিত হইতেছে। তবে জাতীয় উন্নতি কি উপায়ে ঘটিবে তৎ সম্বন্ধে মতভেদ আছে।"৪০ [পরিশিষ্ট, বাঙ্গালার ইতিহাস]

এখানেও ভূদেব জাতীয় জীবনে একটা নতুন ভাবের অঙ্কুর লক্ষ্য করেছেন কিন্তু কোথাও এই জাগরণকে তিনি স্বদেশপ্রেম বলতে চান নি। বাঙ্গালীর জীবনে এই নতুন ভাবের আবির্ভাব হয়েছে যে চেতনা থেকে ভূদেব তাকে বড়জোর 'জাতীয় ভাব'—এই নামে চিহ্নিত করতে পারেন। "সামাজিক প্রবন্ধে" তিনি এই ভাবটিকেই বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

প্রবন্ধে ভূদেব দেশচিন্তার যে স্বচ্ছ পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অন্যান্য রচনাতে তা নেই। "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" ও "পুষ্পাঞ্জলি"তেও ভূদেবের দেশচিন্তা আছে—কিন্তু কোথাও তা স্পষ্ট হয় নি। প্রবন্ধের দেশচর্চা আরম্ভ করারও আগে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাসে মারাঠাবীর শিবাজীর চরিত্র অবলম্বনে দেশভক্তির আদর্শ তুলে ধরেছিলেন। শিবাজীকে নায়ক কল্পনা করে প্রথম গল্প রচনার কৃতিত্বও তাঁর। ১৮৫৭ সালে 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' রচনার দার্ঘদিন পরে শিবাজীর বংশধরদের নিয়ে ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" রচনা করেন। ইতিহাস রচনার প্রবণতা ভূদেবের বরাবরই ছিল। ছাত্রপাঠ্য ইতিহাস গ্রন্থও তিনি লিখেছেন। নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তদানীন্তন বৃটিশ শাসকবর্গের বিবরণ রচনাও ভূদেবেরই কীর্তি। কিন্তু "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" গতানুগতিক ইতিহাস নয়। নামকরণ থেকেই গ্রন্থটির বিষয়গত বৈচিত্র্যের আভাস মেলে। কোন আত্মীয় রচিত ভারতবর্ষের ইতিহাস থেকে "তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ" বৃত্তান্তটি পাঠ করে লেখকের চিন্তাজগতে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। ভূমিকায় গ্রন্থকার বলেছেন, 'যেদিন তাঁহার অনুবাদিত তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ পাঠ করি সেইদিন হঠাৎ আমার কণ্ঠতালু বিশুষ্ক হইতে লাগিল, শরীর পুনঃ লোমাঞ্চিত হইল, পুস্তক পাঠ যেন মহাভার হইয়া পড়িল। পাঠ নিবৃত্ত করিয়া ঐ তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ অন্যরূপে পরিসমাপ্ত হইলে কি হইত, এবিষয় ভাবিতে লাগিলাম।"৪১ [ভূমিকা, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস।

গ্রন্থটি এই ভাবনারই ফলাফলমাত্র। স্বপ্নে তিনি ভিন্ন ইতিহাস দর্শন করেছিলেন। "তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ" কালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস একটি অরাজকতার অধ্যায় মাত্র। সমগ্র ভারতে খণ্ডবিচ্ছিন্ন শক্তির যুদ্ধ ইতিপূর্বেও বহুবার হয়েছে। ভারতবাসীর অনৈক্যের ও দুর্বলতার ইতিহাস যে কোন স্বদেশপ্রেমী ব্যক্তিকেই পীড়া দেয়।

৪০. ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাংলার ইতিহাস, চুঁচুড়া, ১৯০৩।
৪১. ভূদেব রচনা সম্ভার, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত। ১৩৬৪।

স্বকৃত পাপের ইতিবৃত্ত স্বদেশপ্রেমী ভূদেবকেও চঞ্চল করেছিল। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধের নায়ক আহাম্মদ শাহের কাছে কাশীরাজের উক্তিটি লক্ষ্যণীয়। যবন অধিকারের প্রথম পর্বে হিন্দু নায়ক পৃথিরাজ যে মহত্ত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন,—তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধে জয়ী মহারাষ্ট্র সেনাপতিও অনুরূপ দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেছেন। কিন্তু এ জাতীয় মহত্ত্বও পরাধীনতার অভিশাপ বহন করে এনেছিল। মহারাষ্ট্র সেনাপতির বক্তব্যটি উপস্থিত করে কাশীরাজ বলেছেন,—

"সাহেবুদ্দিন মহম্মদ ঘোরি প্রথমে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসিয়া চোহান বংশাবতংস মহারাজ পৃথীরাজ কর্তৃক বন্দীকৃত হইয়াছিলেন। পৃথীরাজ অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। কিন্তু পরবর্ষে স্বয়ং বন্দীকৃত হইলে সাহেববুদ্দীন কর্তৃক নিহত হইয়াছিলেন। পূর্বে হিন্দুরা মুসলমানদিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, এবং মুসলমানেরাও হিন্দুদিগের প্রতি কেমন আচরণ করিয়াছেন, তাহা ঐ বিবরণেই প্রকাশিত হইতেছে।"

[পানিপথের যুদ্ধ, স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস]

এই কল্পিত কাহিনীর নায়ক মহারাষ্ট্র সেনাপতির ব্যবহারে সন্তুষ্ট হয়ে আহম্মদ শাহ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যবহার করেছেন,—

"দূত! তুমি মহারাষ্ট্র সেনাপতিকে গিয়া বল, আমি তাহার উদার ব্যবহারে একান্ত মুগ্ধ হইলাম— আর কখনও ভারতবর্ষআক্রমণে উদ্যম করিব না।" [ঐ]

সুতরাং মহারাষ্ট্র অধিনায়ক রাজা রামচন্দ্রই পুনরায় ভারতে অখণ্ড স্বাধীনতা-শান্তি-ঐক্য সৃষ্টি করবার দায়িত্ব নিয়ে ইন্দ্রপ্রস্থে অধিরূঢ় হলেন। এই ইতিহাসটিই ভূদেবের স্বপ্নলব্ধ ইতিহাস। স্বপ্ন সত্য হয় না কিন্তু এ জাতীয় স্বপ্নে কিছু আনন্দলাভ হয়। তৃতীয় পানিপথের যুদ্ধ শেষে ভারতবর্ষে হিন্দু শক্তি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে যে আদর্শ প্রচার করেছিলেন—তার মর্মার্থ এই, "আমাদিগের এই জন্মভূমি চিরকাল অন্তর্বিবাদানলে দগ্ধ হইয়া আসিতেছিল, আজি সেই বিবাদানল নির্বাপিত হইবে। আজি ভারতভূমির মাতৃভক্তিপরায়ণ পুত্ররা সকলে মিলিত হইয়া ইহাকে শান্তিজলে অভিষিক্ত করিবেন।" [সাম্রাজ্যের পরিবর্তন]

ভূদেবের কল্পিত ও স্বপ্নদৃষ্ট ভারতের ভবিষ্যতের ছবি এটিই। হিন্দুশক্তি সুপ্রাচীন ভারতের সিংহাসনে আরোহণ করুক এ বাসনাটি তিনি অন্ততঃ এ অংশে গোপন করেন নি। তিনি প্রাচীন আদর্শের পুনরুজ্জীবন ও পুনঃপ্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন—তাই "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসের" মত এমন কল্পিত ইতিহাসের চিত্র রচনা করা ভূদেবের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। কল্পিত ভারতবর্ষের শাসন ব্যবস্থায় নতুন বিধান রচনাতেও ভূদেবের আদর্শের প্রতিফলন রয়েছে। দীর্ঘদিন মোঘলশাসনের ফলে

মুসলমান সম্প্রদায়ও এদেশের অধিবাসী রূপেই গৃহীত হয়েছেন।—সার্থকতা আসবে হিন্দু মুসলমানের সম্মিলিত সাধনায়,—

"ভারতভূমি যদিও হিন্দুজাতীয় দিগেরই যথার্থ মাতৃভূমি, যদিও হিন্দুরাই ইহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তথাপি মুসলমানেরাও আর ইহার পর নহেন, ইনি উহাদিগকেও আপন বক্ষে ধারণ করিয়া বহুকাল প্রতিপালন করিয়া আসিতেছেন। অতএব মুসলমানেরাও ইঁহার পালিত সন্তান।

...অতএব ভারতবর্ষ নিবাসী হিন্দু এবং মুসলমানদিগের মধ্যে পরস্পর ভ্রাতৃত্বসম্বন্ধ জন্মিয়াছে। বিবাদ করিলে সেই সম্বন্ধের উচ্ছেদ করা হয়। আর আমাদিগের মধ্যে কি পূর্ব্বের মত বিবাদ চলিবে?" [ঐ]

ভূদেব হিন্দু মুসলমানের সম্মিলন চেয়েছিলেন,—উভয়ের সম্মিলিত ঐক্যশক্তিতেই বর্তমান ভারত তার প্রাচীন মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে—এ ছিল তাঁর বিশ্বাস। সেই যুগের জন্য এমন বলিষ্ঠ ও উদার চিন্তাধারার প্রয়োজনও ছিল। জাতীয়তাবোধের ছত্রছায়াতলে সংকীর্ণ ধর্মান্ধতা বলি দিতে হবে এ উপদেশ মনীষী ভূদেবের গভীর অন্তর্দৃষ্টিকেই চিনিয়ে দেয়। "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাসে" ভূদেবের রাজনৈতিক চিন্তাধারার সুস্পষ্ট পরিচয় রয়েছে। তিনি ভবিষ্যৎ ভারতের চিত্ররচনা করেছিলেন এভাবে,—

"এক্ষণে সকলকে সম্মিলিত হইয়া মাতৃদেবীর সেবার ভারগ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু সকলের কর্তা একজন না থাকিলেও সম্মিলন হয় না। কোন্ ব্যক্তি আমাদিগের সকলের অধিনায়ক হইবেন?" [ঐ]

"সামাজিক প্রবন্ধে"ও এই ভাবী নেতার প্রতীক্ষা করতেই বলেছিলেন ভূদেব। রাজনৈতিক জীবনের পরিচালনাভার সুযোগ্য নেতার হস্তে অর্পিত হলেই ভূদেবের সমস্ত হতাশা দূর হতে পারে; আন্দোলনে তাঁর বিশ্বাস ছিল না কিন্তু সুযোগ্য অধিনায়কের আবির্ভাবকে তিনি অভিনন্দন জানিয়েছেন সবার আগে। কিন্তু প্রশ্ন এখানে থেকেই যায় যে ভূদেবের কল্পিত নেতা কাদের পরিচালনা করবেন? সেখানেই সংঘবদ্ধ আন্দোলনের ছবিটিই মনে পড়া স্বাভাবিক। এটি ভূদেবের চিন্তার পারস্পরিক বিরোধিতারই চিত্র। অন্যদিকে হিন্দু সমাজের জাতিভেদ প্রথার দৃঢ় সমর্থন করেও তিনি সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী মুসলমানকেও ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ করার কথা বলেছেন। হিন্দুদের ভেদবুদ্ধি জাতিভেদ প্রথার অবদান বললে খুব বেশী বাড়িয়ে বলা হয় না। জাতিভেদ প্রথা মানবতাবোধের অন্তরায় বলেও বিবেচিত হয়েছে। ভূদেবও মানবতাবাদী সংস্কারক। সুতরাং জাতিভেদ প্রথার সমর্থনকারী ভূদেবের বক্তব্য স্ববিরোধী বলেই মনে হয়েছে। জাতিভেদের সুফলবিচার কালে ভূদেব বলেছিলেন,—

"ঐ প্রথা থাকাতে লোকে স্বজাতীয়দিগের মধ্যেই বড়লোক দেখিতে পায়, বিদেশীয় রাজপুরুষকেই সর্ববিষয়ে সর্বোপরি দেখে না এবং সেইজন্য উহাদিগের প্রতি অযথা ভক্তিও করে না।" [বঙ্গসমাজে ইংরেজ পূজা, বিবিধপ্রবন্ধ, ২য় ভাগ]

কিন্তু মানবতাবাদের প্রচার হবার পরে মানুষ আত্মদর্শন করতেই শেখে—শুধু জাতিবুদ্ধি বিচারের মাপকাঠি হতে পারে না। জাতিভেদপ্রথা ও জাতীয়তাবাদ একই সঙ্গে দুটোই প্রবলভাবে সমাজে স্থান পেতে পারে না। অন্ততঃ প্রবল জাতীয়তাবাদ জাতিভেদের কঠোরতার ভিত্তিকে দুর্বল করে দেবেই। বাস্তবেও তা হয়েছে। সুতরাং এই আপাতঃ বিরোধী চিন্তার কথা স্মরণ রেখেও ভূদেবের উদার রাজনীতিকে প্রশংসা জানাতেই হয়। ভূদেব সম্মিলিত ঐক্যবদ্ধ একটি অখণ্ড ধর্মাশ্রয়ী মহাজাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন,—"স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" পাঠ করলে সেই ধারণা আরও দৃঢ় হবে। ভারতবর্ষের প্রাচীনসংস্কার রক্ষা করেও তিনি আধুনিক জাতীয়তাবোধের স্বপ্ন দেখেছিলেন। দুয়ের মিলন সম্ভব ছিল না।—কিছু ত্যাগ করেই কিছু পেতে হবে—কিন্তু ভূদেব এই আদর্শের বাণীটিই প্রচার করে গেছেন। রক্ষণশীলতার সঙ্গে উদারতার সমন্বয়েই ভূদেবের আদর্শ গড়ে উঠেছিল।

ভূদেবের আত্মবিশ্বাস ও স্বধর্মচেতনার ওপর গভীরতর আস্থার কতকগুলো যুক্তি-সংগত কারণ আবিষ্কার করা যায়। বিদেশীইতিহাস, ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করে ভূদেব আপন সামাজিক আচারব্যবহার ধর্ম ও সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠতা আবিষ্কার করেছিলেন। স্বধর্মনিষ্ঠার আত্যন্তিকতার মূলে এই চেতনাই কার্যকরী হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে ভূদেবের ধারণার পরিচয় পাওয়া যাবে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর সমালোচনা থেকেই। ভূদেব ও বিদ্যাসাগর এই উভয় মনীষীর আদর্শগত পার্থক্যটিও এতে স্পষ্ট হবে। এ সম্বন্ধে সমালোচক প্রমথনাথ বিশী নিখুঁত বিচার করে বলেছেন,—

"বিদ্যাসাগর ও ভূদেবের সমান্তরাল জীবনকথা মনে উদিত হওয়া অসম্ভব নয়, দুয়ে এত মিল আবার এত অমিল। একই বিধাতা দুই জনকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন বুঝিতে কষ্ট হয় না, কিন্তু এক মেজাজে নিশ্চয় সে সৃষ্টিকার্য হয় নাই।

বিদ্যাসাগরের আস্থা নব্যশিক্ষিতগণের উপরে, ভূদেব সে বিষয়ে নীরব। হিন্দু আচার সম্বন্ধে ভূদেব অসীম রক্ষণশীল, সেগুলি ঝাঁটাইয়া বিদায় করিবার জন্যই যেন বিদ্যাসাগরের জন্ম, তিনি কিছুই মানিতেন না।" [ভূমিকা, ভূদেবরচনা সম্ভার]

বিদ্যাসাগর ও রামমোহনকে জাতীয়তাবাদের অগ্রদূত,—প্রগতিবাদের সমর্থক বলে ব্যাখ্যা করেছি; ভূদেবকে সে তুলনায় রক্ষণশীল বলাই সঙ্গত। তবে স্বদেশচর্চার ক্ষেত্রে এই তিনজনকেই একই নামে অভিহিত করা যায়। এঁরা সকলেই স্বদেশ-

প্রেমিক, শুধু পথ ও মতের পার্থক্য রয়েছে মাত্র। দেশপ্রেমিক রামমোহন ও বিদ্যাসাগর প্রগতিকে সমর্থন করে সমগ্র দেশে যে প্রাণবন্যা সৃজন করেছেন—তাতে অবগাহন না করলে ভূদেব হয়ত এই অনড় রক্ষণশীলতাকে নতুন করে আঁকড়ে ধরতে পারতেন না। এই দুটি ভিন্ন আদর্শ সামনে ছিল বলেই স্বদেশচর্চার ক্ষেত্রে নব্যপন্থীদের অসুবিধে হয় নি। বিদ্যাসাগর ও রামমোহনের দেশেই ভূদেবের আবির্ভাব; এই বৈপরীত্য থেকেই সত্য উদ্ধার সহজতর হয়েছিল। ভূদেবের দেশাদর্শ সম্পূর্ণ প্রাচীন ভিত্তিকেই আশ্রয় করতে চেয়েছিল। এ দেশের মাটিতে এ দেশীয় মনোভাবই তিনি সমর্থন করেন। বিদ্যাসাগরকেও তিনি সমালোচনা করেছিলেন,—

"তাঁহার ভদ্রঘরে বিধবাবিবাহ প্রবর্তন চেষ্টা এবং স্কুলপাঠ্যগ্রন্থে এদেশীয় বালকদিগের নিকট শুধু বিদেশীয়দিগের চরিত্র ও ব্যবহারকে আদর্শভাবে দেখান, স্বসমাজের ক্ষতিকর এই দুইটি কার্য স্থায়ী হইবে না, অল্পকাল মধ্যেই এরূপ বিধবা বিবাহ ও ঐরূপ কয়েকখানি স্কুলপাঠ্যপুস্তক অপ্রচলিতপ্রায় হইয়া লোকের স্মরণপথের অতীত হইয়া যাইবে।" [ভূদেবচরিত, ১ম ভাগ]

ভূদেব পাশ্চাত্ত্য মহাত্মাদের আদর্শ এদেশীয় সমাজে অচল বলে মনে করতেন,—তার বিস্তারিত ব্যাখ্যাও উক্ত গ্রন্থে রয়েছে। এ জাতীয় আদর্শকে নিছক রক্ষণশীলতা বলা যায় না; আসলে ভূদেব প্রগতির সঙ্গে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গির সংযোগ সাধন করারই চেষ্টা করেছিলেন। যে বৈপ্লবিক সংস্কারব্রত নিয়ে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের সমগ্রজীবন সাধনা—ভূদেব সেখানে নিষ্ক্রিয় সমালোচক মাত্র। এঁদের মধ্যে সম্ভবতঃ তুলনামূলক আলোচনা চলতে পারে না।

ভূদেবের দেশপ্রেমের আদর্শ তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীতেই আবদ্ধ ছিল,—বাস্তবক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা তিনি করেন নি। তিনি প্রাবন্ধিক,—চিন্তাক্ষেত্রেই তাঁর অধিকার সীমাবদ্ধ ছিল। তবে এমন বিস্তারিত দেশপ্রেম সম্পর্কিত আলোচনা সে যুগে ভূদেবই করেছিলেন। দেশপ্রেম, জাতীয় চেতনা ইত্যাদি অনুভূতির বহুল আলোচনার প্রয়োজনও ছিল। সর্বত্রই ভূদেব প্রাবন্ধিকের মতই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন। "স্বপ্নলব্ধ ভারতবর্ষের ইতিহাস" যদিও প্রবন্ধগ্রন্থ নয় কিন্তু আভ্যন্তরীণ আলোচনায় প্রবেশ করলে দেখা যাবে ভূদেবের গতানুগতিক প্রবন্ধ রচনার রীতি এখানেও অনুসৃত হয়েছে। কাজেই রসসৃষ্টির তাগিদে নয়,—আপন বক্তব্যের যুক্তিপূর্ণ ব্যাখ্যাতেই ভূদেব সর্বদা ব্যস্ত।

"পুষ্পাঞ্জলি" ভূদেবের পৃথক স্বাদের রচনা। "পুষ্পাঞ্জলি"তে ভূদেবের স্বদেশ চিন্তায় নতুন একটি রূপ দেখি। জন্মভূমিকেও ভূদেব সাক্ষাৎ ঈশ্বরীদেহ বলেই মনে করতেন। "আর্যবংশীয়দিগের চক্ষুতে বাহান্ন পীঠ সমন্বিত সমুদায় মাতৃভূমিই সাক্ষাৎ

ঈশ্বরীদেহ”—একথা ভূদেব আগেই বলেছেন। ‘পুষ্পাঞ্জলিতে’ সেই পীঠস্থান দর্শন ও বর্ণনাই স্থান পেয়েছে। পুরাণ রচনার আদর্শ অবলম্বন করেই গ্রন্থটি লিখিত হয়েছে। কিন্তু এই গ্রন্থের চরিত্র লোকোত্তর হলেও বিষয়বস্তু বাস্তব। ভূদেব বলেছেন,—

‘কিন্তু মনে কর, বেদব্যাস স্বজাতি অনুরাগের মার্কণ্ডেয় জ্ঞানরাশির এবং দেবী মাতৃভূমির প্রতিরূপ স্বরূপ বর্ণনা করা গিয়াছে, তাহা হইলে আর ঐ সকল বর্ণনা লোকোত্তর বলিয়া বোধ হইবে না।…অনন্তর দেশের পুরাবৃত্তের স্মরণে আশা এবং প্রজ্ঞার সংস্কৃতির উপায় উদ্ভাবন, এবং প্রীতির উদারতা অনুভূত হওয়া সাহজিক ব্যাপার বলিয়াই প্রতীত হইবে…পরিশেষে নিজ সমাজের প্রতি ঐকান্তিক ভক্তির মূল নিরূপিত হইলে যে অপর কোন বিভীষিকার উপদ্রব থাকিতে পারে না, এবং স্বজাতীয়ানুরাগ তাহার প্রীতিভাজন পদার্থের সহিত তন্ময়তা প্রাপ্ত হইয়া আপন অভীষ্ট সাধনের উদ্দেশ্যে সঙ্গোপিত কার্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে পারে ইহাও লৌকিক যুক্তির বহির্ভূত বলিয়া বোধ হয় না।[৪২] [গ্রন্থের আভাস, পুষ্পাঞ্জলি]

ভূদেবের উদ্দেশ্য ঐ উদ্ধৃতিতেই ব্যক্ত হয়েছে। গ্রন্থটিতে এক একটি অধ্যায়ের শিরোনাম থেকেও রচয়িতার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়। যেমন সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম— “দ্বারাবতী—সৃষ্টির উপাদান—সম্মিলনোপায়—প্রীতি”—দ্বারাবতী দর্শনের প্রাক্কালে দর্শকচিত্তে যে মনোভাব জেগেছে—সেই অনুভবকে শিরোনামে ব্যক্ত করেছেন লেখক। দ্বারাবতী বন্দরে একটি বাষ্পীয় পোত থেকে আগত যে শুভ্রকায়, রক্ত পরিচ্ছদধারী সৈনিকদের ক্রিয়াকলাপ লক্ষ্য করলেন এবং সে প্রসঙ্গে যে আলোচনা করেছিলেন তার ভাবধারা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য অর্থ বহন করেছে। পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে এজাতীয় মন্তব্যের মধ্যে নীতিবিরোধী আলোচনা আছে— যেমন—

“এই জন্যই একজন পুরুষসিংহ সহস্র সহস্র সামান্য ব্যক্তির উপর কর্তৃত্ব করিতে পারেন—এই জন্যই একটি প্রবল জাতি বহুল দুর্বল জাতির প্রতি ক্ষমতা প্রয়োগে সমর্থ হয়। অধীন পুরুষেরা অথবা অধীন জাতীয়রা সম্মিলিত হইয়া বিপক্ষতা করিলে অবশ্যই কর্তৃত্বশালী পুরুষকে কিংবা জাতিকে পরাভূত করিতে পারে,”

[সপ্তম অধ্যায়—পুষ্পাঞ্জলি]

এ জাতীয় আলোচনা অত্যন্ত নিরপেক্ষ ভাবেই করা হয়েছে যদিও—তবু অর্থ বিশ্লেষণে দেখা যায় যে গুরুতর সত্যটিই প্রকাশিত হয়েছে।

‘পুষ্পাঞ্জলিতে’ সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে মৃন্ময়ী দেশকে নয়, চিন্ময়ী মাতাকেই

৪২. ভূদেব রচনা সম্ভার, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত। ১৩৬৪

প্রত্যক্ষ করেছি আমরা—সেদিক থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' বর্ণিত দেশমাতৃ রূপের সঙ্গে ভূদেব চিত্রিত তীর্থমহিমাময়ী ভারতমাতার ঐশ্বর্যময়ী মূর্তির সাদৃশ্য রয়েছে। "পুষ্পাঞ্জলি"র বর্ণনাভঙ্গী ও ভাষার জটিলতা ভেদ করে এবং রূপকার্থ অনুসন্ধান করা দুরূহ বলে—সে যুগে এবং এ যুগেও এ জাতীয় গ্রন্থ বহুলভাবে সমাদৃত হয় নি।

ভূদেবের স্বদেশচর্চা তাঁর লিখিত সাহিত্য থেকে অনুসন্ধান করা হলো কিন্তু ভূদেবের আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মবিশ্বাসের প্রসঙ্গও তাঁর রচনার অন্যত্র ধরা পড়েছে। শাসক ইংরেজকে তিনি অভ্রান্তভাবে চিনে নিয়েছিলেন;—তাঁর কোনো প্রবন্ধে বলেছেন,—

"ইংরাজ যতই ভোজখাউন, মদেরগ্লাস হাতে করিয়া যতই লম্বাচৌড়া বক্তৃতা করুন, উনি আপনার কাজ ভুলিবার লোক নহেন।···বীর প্রকৃতিক ইংরাজেরওরূপ পূজা নিতান্ত অফল পূজা।" [বঙ্গ সমাজে ইংরাজ পূজা,—বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ]

এই মূল্যবিচার ভূদেবের সচেতনতারই পরিচায়ক। আপন ক্ষমতার শক্তি সম্বন্ধে পূর্ণসচেতন ভূদেব তাই পরানুকরণের নিন্দা করেছেন,—

"ইংরাজেরা যেমন সকল কথাতে এবং সকল কাজে স্বজাতীয় লোকের সম্মান এবং মর্যাদা রক্ষা করিয়া চলেন, বাঙ্গালীদের এখনও সেরূপ শিক্ষাটা পাকিয়া উঠে নাই। কিন্তু ভাবিয়া দেখ দেখি, যে সকল বাঙ্গালী ইংরাজীভাষা এবং ইংরাজী বিদ্যা এমন উত্তমরূপে শিখিয়াছেন যে ঐ বিজাতীয় ভাষায় অনর্গল লিখিতে এবং বক্তৃতা করিতে পারেন, তাঁহাদের ক্ষমতা কি অল্প। অপর কোন ভাষায় ওরূপ লিখিতে অথবা বক্তৃতা করিতে কয়জন বড় ইংরাজ সমর্থ।

যে দেশে শিরোমণি এবং জয়দেব এবং চৈতন্যমহাপ্রভু জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সে দেশের লোক কখনই জন, চার্লস, হনরি, মাথু হইতে নিকৃষ্ট হইতে পারে না।

[ঈর্ষা প্রবণতা, বিবিধ প্রবন্ধ, ২য় ভাগ]

এই আত্মমর্যাদাবোধ বাঙ্গালীর প্রাণে সঞ্চারের বাসনা থেকেই উদ্ধৃত মন্তব্য করেছিলেন ভূদেব। তাঁর দেশপ্রেমের মূল কথাটিই এই ;—আত্মশক্তি নির্ভর করে, স্বধর্ম ও স্বসমাজের প্রতি আস্থা রেখে পূর্ণ মানবতার পথে এগিয়ে যাওয়া। স্বাধীনতা প্রাপ্তিকেই জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে মনে করেন নি বলেই তাঁর দেশপ্রেমের উপলব্ধি সে যুগের গতানুগতিক দেশপ্রেমের উপলব্ধি থেকে আলাদা কিন্তু নিজস্ব আদর্শ অবলম্বন করে ভূদেব যে বিশাল দেশপ্রেমমূলক প্রবন্ধসাহিত্য রচনা করেছিলেন,—তা তুলনারহিত। স্বজাতিপ্রীতি ও স্বধর্মনিষ্ঠাকে স্বজাত্যবোধ ও স্বদেশপ্রেমের নামান্তর বলে ব্যাখ্যা করেছি বলেই ভূদেবের স্বদেশচর্চার বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আমাদের বিস্মিত করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র সাহিত্যজীবনকে ব্রজেন্দ্রনাথ চারটি পর্বে বিভক্ত করেছেন—আদিপর্ব, উদ্যোগপর্ব, যুদ্ধপর্ব ও শান্তিপর্ব। প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রকে বিচার করতে গেলে ব্রজেন্দ্রনাথ নির্দেশিত যুদ্ধপর্বের অধিনায়ক বঙ্কিমচন্দ্রকেই আবিষ্কার করতে হবে। কিন্তু সাহিত্যসেবীর জীবনে "যুদ্ধপর্ব" কথাটির তাৎপর্য বিশ্লেষণে করলেই স্বদেশ-প্রেমিক প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করা সহজতর হবে। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিম জীবনীকারের ভাবাবেগপূর্ণ একটি মন্তব্য স্মরণ করি,—

"তুমিই একদিন তরবারি হস্তে মহারাষ্ট্র প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলে আজ কপালদোষে লেখনী হস্তে বঙ্গভূমে অবতীর্ণ হইলে। একদিন তোমাকে রাজপুতানার দুর্ভেদ্য গিরিমালার মধ্যে ঔরঙ্গজেবের সম্মুখীন হইতে দেখিলাম, আর একদিন বাঙ্গালার নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে অম্বরবিদারী তোপমুখে দাঁড়াইয়া "হরে মুরারে মধুকৈটভারে' গায়িতে শুনিলাম।"[৪৩]

জীবনীকার খুব বেশী অতিশয়োক্তি করেন নি,—স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এ শ্রেণীর উচ্ছ্বাস সব সমালোচকেরই আছে এবং তা অহেতুক নয়। উপন্যাস আলোচনাকালে দেশ সম্বন্ধে জাতি সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের যথার্থ ধারণার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছি। বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ধারাবাহিক আলোচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের স্থাননির্ণয় কালেও স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রকেই নতুনরূপে প্রত্যক্ষ করি। 'দুর্গেশ-নন্দিনী' থেকে 'সীতারাম'-এ বঙ্কিমচন্দ্রের দেশচর্চার প্রবহমান ধারাটিকে লক্ষ্য করেছি। কোথাও তার দেশপ্রেম প্রকাশ্য-সোচ্চার কোথাও তা পরোক্ষ-স্তিমিত। কিন্তু প্রবন্ধের পর্বভাগ করলে দেখা যাবে যে, প্রথম-যুগে দেশপ্রেমের যে তীব্র আবেগ ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে ফেটে পড়েছে পরবর্তী কালে সে তীব্রতা একটা পরম প্রশান্তির মধ্যেই বিলীন হয়ে গেছে।

প্রাক বঙ্কিমযুগের প্রবন্ধসাহিত্যে দেশধারণায় উচ্ছ্বাস আছে কিন্তু দেশপ্রেমের লক্ষ্য ও ভবিষ্যৎ নির্ণয়ের চেষ্টা নেই। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার ব্রতই কখনও ধর্মসংস্কার আন্দোলনে কখনও সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ আন্দোলনে পর্যবসিত হয়েছিল। এঁরাও স্বদেশপ্রেমিক-কিন্তু এঁদের স্বদেশভাবনায় ভাবী বিপ্লবের আসন্ন সংকেত ধ্বনিত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশচিন্তার প্রাথমিক স্তরে দেশপ্রেম ছিল এমন একটি আবেগাত্মক উপলব্ধিমাত্র। রাজনারায়ণের প্রবন্ধ আলোচনা করলেই প্রাকবঙ্কিমপর্বের স্বদেশপ্রেমাত্মক আলোচনার মূল সুরটি স্পষ্ট হয়। রাজনারায়ণ ভাষা-সংস্কৃতি, আচার-ব্যবহার ও শিক্ষাপদ্ধতির স্বদেশীয়ানা সঞ্চারের

৪৩. শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন চরিত। ১৯১১। পৃঃ ১৯-২০

আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। ভূদেব মূলতঃ স্বধর্মনিষ্ঠ ভাবুক, স্বাজাত্যবোধের-স্বধর্মনিষ্ঠার অতিরিক্ত কোন বিপ্লবাত্মক ভাবনায় তাঁর আস্থা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রই স্বদেশ-ভাবনার ক্ষেত্রে নতুন বক্তব্য ও নতুন ভঙ্গির প্রবর্তয়িতা।

নিছক ভাবাত্মক দেশপ্রেমের মধ্যে তিনি অতিরিক্ত এমন একটি শক্তি সঞ্চার করেছিলেন, যা ইতিপূর্বের প্রবন্ধে অভাবিত ছিল। পূর্বের প্রবন্ধসাহিত্যের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তাকে বঙ্কিমচন্দ্রই সংহত আকারে, বলিষ্ঠভাষায়, তীব্রঝংকারে ব্যক্ত করেছিলেন। আবেদন নিবেদনের ভাষাটি প্রথমাবধিই পরিত্যাগ করেছিলেন তিনি; পরিবর্তে একটা প্রচণ্ড দুঃখবেদনার অভিব্যক্তি তাঁর ভাষাকে-বক্তব্যকে অনেক বেশী শক্তিদান করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ উপন্যাসশিল্পী, প্রবন্ধেও সে তথ্য সহজেই উদ্‌ঘাটিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাসে দেশচিন্তার যে উপাদান পেয়েছি - সেই বাঙ্গালী প্রাণতাকে প্রবন্ধেও আবিষ্কার করি প্রথমেই। একটি সংঘবদ্ধ, অতীতস্মৃতি সচেতন, —আত্মনির্ভরশীল বাঙ্গালীজাতিকে বঙ্কিমচন্দ্র অনুসন্ধান করে গেছেন চিরকাল। এই কল্পনা বাস্তবের সংস্পর্শে এসে বারবার ভেঙ্গে গেছে, বঙ্কিমচন্দ্রও প্রচণ্ড হতাশায় ও ক্ষোভে অস্থির হয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতি পরোক্ষভাবে বাঙ্গালীপ্রীতিতেই পর্যবসিত—কিন্তু বৃহত্তর ভারতপ্রীতি কিংবা মহত্তর মানবপ্রীতিকে বাদ দিয়ে এই চেতনার কোন ভিত্তি থাকতে পারে না। তাই ভারতপ্রীতি ও মানবপ্রীতির স্থানিক সংস্করণ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালীপ্রীতিকে গণ্য করা দরকার। প্রথম যুগের প্রবন্ধে বাঙ্গালীপ্রীতিই পরিশেষে সর্বমানবতার বাণীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে ধীরে ধীরে,– সে প্রসঙ্গও যথাকালে আলোচিত হবে। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রবন্ধ-উপন্যাসে সর্বপ্রথম সমগ্র বাঙ্গালীজাতির মনে অখণ্ড ঐক্যবোধের সঞ্চার করেন। এ ব্যাপারে তাঁর পরিকল্পনাও ছিল বিচিত্র,—তিনি বর্তমানের বাঙ্গালীকে অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরাতে বলেছেন। ইতিহাসের আলোকে আত্মদর্শনের উপদেশ ইতিপূর্বে অন্য কোন মনীষীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্রই মনের নৈরাশ্য, ধর্মচেতনার অব্যবস্থিত ভাব ও হীনমন্যতার ব্যাধি থেকে বাঙ্গালীকে মুক্তির উপায় নির্দেশ করেছিলেন। উপন্যাসে মনোহর অতীতচিত্র রচনা করে আত্মবিশ্বাস অর্জনের পরিবেশও সৃষ্টি করেছিলেন তিনি। অতীত ঐতিহ্যের পটভূমিকায় নিজের অস্তিত্ব আবিষ্কারের পথটি ইতিপূর্বে বাংলাসাহিত্যে এমনভাবে কেউই বলেন নি। অবশ্য বিচ্ছিন্নভাবে এই অনুভূতি অন্যান্য প্রাবন্ধিকের রচনাতেও ধরা পড়েছে মাঝে মাঝে কিন্তু তা স্পষ্ট বক্তব্য হয়ে ওঠে নি। বঙ্কিমচন্দ্রই ঐতিহ্যাশ্রয়ী আত্মমর্যাদাবোধের চেতনাটি জাগিয়ে দিয়েছিলেন। সংঘবদ্ধ ও একপ্রাণ বাঙ্গালীর কণ্ঠেই সম্মিলিত সুরে মাতৃবন্দনার গান শ্রবণ করতে চেয়েছিলেন তিনি।

বঙ্কিমচন্দ্র চিন্তার ক্ষেত্রে সমসাময়িক স্বদেশপ্রেমী লেখকদের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন বলা যেতে পারে। কোথাও পরোক্ষ ব্যঙ্গে কোথাও প্রকাশ্য বিদ্রূপে কোথাও গভীর দুঃখে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীজাতির সুপ্ত চৈতন্যটিকেই জাগিয়ে দিতে চেয়েছেন। সামগ্রিক জাগরণ না ঘটলে আসন্ন আন্দোলনের যথার্থ তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করাই যে অসম্ভব বঙ্কিমচন্দ্রই তা গভীরভাবে অনুভব করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে কোনো সমালোচক বলেছেন,--

"কবিগণ সমাজের নবোদ্বুদ্ধ রাষ্ট্রীয় চৈতন্যকে একটা ধরিবার ছুঁইবার যোগ্য আকার দান করিয়া দেশমধ্যে একটা জাতীয় ভাবের বন্যা বহাইয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কবির কল্পনা অশরীরী হইলেও শক্তিহীন নহে। তাই তাঁহাদের কল্পিত situation-গুলি কৃত্রিম হইলেও তাহাদের উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল।"

[পৃঃ ৩১৩]

"বঙ্কিম বুঝিয়াছিলেন, বাঙ্গালী আগে বাঙ্গালী হউক, আগে আপনাকে চিনিয়া লউক, আপনাদের জাতীয়ত্ব ফুটাইয়া তুলুক, তারপর যদি সমগ্র ভারতবর্ষের চিন্তা করিতে যায় বা সমগ্র ভারতবর্ষকে সেবা করিতে চায়, তবেই তাহার চিন্তা বা সেবা ফলপ্রদ হইবে।"[৪৪]

[পৃঃ ৩২৪]

উদ্ধৃত উক্তিদ্বয়ের মধ্যে সাদৃশ্যটি স্পষ্ট হলে সে যুগের কাব্যের বক্তব্যের সঙ্গে বঙ্কিমের আদর্শের মিল খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু বাংলা প্রবন্ধসাহিত্যের ধারার সঙ্গে মিলিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান নির্ণয়কালে আমাদের একাট কথা মনে রাখা দরকার। বাংলা প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে দেশচিন্তার যে দুটি ধারা লক্ষ্য করেছি তার সঙ্গে বঙ্কিম মননের যোগ খুবই কম। রামমোহন—বিদ্যাসাগর ও রাজনারায়ণের নিছক সংস্কার ব্রত স্বদেশপ্রেমের চূড়ান্ত মহিমা পায় নি আবার ভূদেবের রাজনীতি-বিবর্জিত জাতীয় ভাবের আলোচনাতেও স্বদেশচিন্তার পূর্ণরূপ আভাসিত হয় নি। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র স্বতন্ত্র পথ অবলম্বন করেছিলেন। প্রত্যক্ষ দেশসেবার আহ্বান, আন্দোলন সৃষ্টির আবেদন বঙ্কিম প্রবন্ধে উচ্চারিত হয়েছিল—যা ইতিপূর্বে অব্যক্ত। বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের চেয়ে তাঁর উপন্যাসেই এই বক্তব্য অনেক বেশী জোরালো। শুধু প্রাবন্ধিক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের বিচার করাও অসুবিধেজনক, কারণ উপন্যাসশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের আবেগ প্রবন্ধেও ব্যক্ত হয়েছে। তাই প্রথম যুগের প্রবন্ধ সাহিত্যের সঙ্গে বঙ্কিম মননের যদি কোন সংযোগ না থাকে তাতে আশ্চর্য হওয়া যায় না।

৪৪. অক্ষয়চন্দ্র দত্তগুপ্ত—বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩২৭ সাল।

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের প্রথমযুগে সমাজ সংস্কার চেষ্টাই প্রধানরূপে দেখা যায়; —বঙ্কিমচন্দ্রও সমাজ-সংস্কারক। কিন্তু সমাজচেতনার চেয়ে দেশচেতনাই তাঁকে অধিকমাত্রায় চঞ্চল করেছিল। সমগ্রভাবে বিচার করলে দেখা যাবে—দেশচেতনাকে তিনি ধর্মচেতনা ও মানবতাবোধের সঙ্গে একত্রিত করে একটি শাশ্বত জীবনবাণীই প্রচার করেছেন অবশেষে। দেশপ্রেমের মূলে যে সক্রিয় মানবপ্রেম বর্তমান বঙ্কিমচন্দ্র সে তথ্য উদ্ঘাটন করেছেন। বঙ্কিম জীবনের শেষ পর্বে উদার মানবতাবাদের সঙ্গে ভগবৎচিন্তাও মিলিত হয়েছে—সে পর্যায়ে দেশ ও মানব সম্পর্কিত সমস্ত চিন্তাধারাই ভাগবতী মহিমায় লীন হয়েছে।

প্রাবন্ধিক বঙ্কিমের সমগ্র প্রবন্ধসাহিত্যকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করলে দেখা যাবে —প্রথম পর্যায়ের রচনায় সমাজসমালোচনা ও দেশপ্রেম উভয়ভাবই প্রবল। এই পর্যায়ের রচনা, লোকরহস্য [১৮৭৪], কমলাকান্ত [১৮৭৫] ও মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত [১৮৮৪]। বঙ্কিমপ্রতিভার একটি নতুন দিক এই পর্যায়ের রচনায় উদ্ঘাটিত। দেশপ্রেমিক বঙ্কিমের উচ্ছ্বাস এখানে যত প্রবল অন্যত্র তা নয়। ব্যঙ্গাত্মক রচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃত গ্রন্থত্রয়ের আলোচনা করেছি অন্য অধ্যায়ে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের যে জাতীয় রচনাকে নিঃসংশয়ে প্রবন্ধ বলা চলে—তা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার মূল সূত্রটি আবিষ্কার করার চেষ্টা করব এই অংশে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রবন্ধ হিসেবেই কিছু রচনা 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রচারে' প্রকাশ করেছিলেন। পরে তা 'বিবিধ প্রবন্ধে' [১ম ও ২য় ভাগ] সংগৃহীত হয়েছে। এই পর্যায়ের রচনায় প্রবন্ধশিল্পী বঙ্কিমের পূর্ণ পরিচয় মিলবে। প্রবন্ধের তথ্যনিষ্ঠতা ও যুক্তিধর্মিতা এ প্রবন্ধ সমষ্টিতে পাওয়া যাবে—তদুপরি দেশপ্রেমিক বঙ্কিমের জীবনজিজ্ঞাসার পরিচয়ও প্রবন্ধগুলিতে মিলবে। প্রথম পর্যায়ের রচনাভঙ্গিতে যে অভিনবত্ব রয়েছে—এ পর্যায়ের রচনায় তা অনুপস্থিত—কিন্তু বক্তব্যের উপস্থাপনায় প্রবন্ধশিল্পী বঙ্কিমের দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় ও বিশ্বাস এ জাতীয় রচনার সম্পদ বলে মনে করা যায়। তাছাড়া এ প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গলাদেশ ও বাঙ্গালির উৎপত্তি, বাঙ্গালীর ইতিহাস ও ও বাঙ্গালীর বাহুবল সংক্রান্ত কতগুলি অস্পষ্ট ও বিদ্বজ্জন অবহেলিত অতিপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে খোলাখুলি আলোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার জাগরণ লগ্নে আবির্ভূত হয়েছিলেন—কিন্তু জাগরণপর্বেও কোন কোন অতি আবশ্যকীয় বিষয় সম্বন্ধে আমাদের অপরিসীম অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে বিস্মিত করেছিল। তাই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু নির্বাচনে বঙ্কিমচন্দ্র গতানুগতিকতা বর্জন করে কিছু মৌলিক আলোচনার চেষ্টা করেছেন। দেশপ্রেম আবেগাত্মক অনুভূতি হলেও বিচার

বুদ্ধিকে তা যে আবৃত করে না—দ্বিতীয় পর্বের প্রবন্ধ পাঠ করলেই এ সত্য প্রমাণিত হয়। উচ্চশিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্র এ পর্বে সত্যবিচার করতে বসেছেন,—নিছক আবেগ তাঁকে চঞ্চল করে নি,—তীব্র বেদনা তাঁকে বিহ্বল করে নি। 'বিবিধ প্রবন্ধের' এ জাতীয় প্রবন্ধগুলি আলোচনা কালে বঙ্কিমচন্দ্রের যে মনোভাবটি স্পষ্ট রূপে আবিষ্কার করি তা হল এই,—১। অকপট সত্য প্রচারে তাঁর আগ্রহ, ২। বাঙ্গালী জাতি সম্পর্কে তাঁর সর্বাঙ্গীণ গবেষণা, ৩। পাশ্চাত্ত্য মতামত অভ্রান্ত বলে গ্রহণ না করে যুক্তিনিষ্ঠা প্রদর্শন, ৪। প্রাচীন ভারতবর্ষ সম্পর্কে অকুণ্ঠ শ্রদ্ধাপ্রদর্শন। কিন্তু এই সামগ্রিক মনোভাবের মূলে স্বদেশপ্রেমেরই প্রণোদনা বর্তমান।

'বিবিধ প্রবন্ধে' বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে। ইউরোপীয় সমাজ-ব্যবস্থার সঙ্গে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থা, জীবনযাত্রা ও চিন্তাধারার যে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য রয়েছে সেটুকু স্পষ্ট করলেই অনেক জটিল সমস্যার সরল মীমাংসা হওয়া সম্ভব। ভারতীয় সমাজব্যবস্থা মূলতঃ প্রাচীন ধর্ম ও অনুশাসন নির্ভর বলে ভারতবর্ষের রাষ্ট্রজীবনেও তার প্রভাব পড়েছে পুরোমাত্রায়। ইউরোপীয় ঐতিহাসিকরা ভারতবর্ষ সম্পর্কে গবেষণার ক্ষেত্রে অনেক সময় এই সত্যটিই বিস্মৃত হয়ে যান। দীর্ঘদিনের পরাধীনতা ভারতবাসীর চরিত্রে যে কলঙ্ক লেপন করেছে বিদেশী ঐতিহাসিকেরা সেই দৃষ্টান্তকেই অবলম্বন করে থাকেন। বিদেশী ঐতিহাসিকদের ভ্রান্ত ধারণা দূর করার জন্য যে বিপুল তথ্যজ্ঞান, পাণ্ডিত্য, বিচারশক্তি ও সর্বোপরি নির্ভীক সমালোচনার দক্ষতা প্রয়োজন—বঙ্কিমচন্দ্রের তা ছিল। পাশ্চাত্ত্য জ্ঞানের ভাণ্ডারে তাঁর অবাধ গতিবিধি ছিল। 'বিবিধ প্রবন্ধের' বিচিত্র বিষয়ের আলোচনায় তা প্রতিফলিত। পাশ্চাত্ত্য অগ্রগতির সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতির নবজাগরণকে মিলিয়ে দেওয়ার যথাসাধ্য সাধনাই প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত কাম্য ছিল। আমাদের আলোচনায় স্বদেশপ্রীতির প্রসঙ্গটিই গৃহীত হয়েছে—স্বদেশপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্র যা আপন স্বভাবের শক্তিতেই লাভ করেছিলেন এজন্য ঊনবিংশ শতাব্দীর অনুকূল পরিবেশের কাছেই তাঁর যা কিছু ঋণ। রাজনারায়ণ-দেবেন্দ্রনাথের মতো ডিরোজিওভক্তিই বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের একমাত্র অবলম্বন ছিলো না। অজস্র স্বদেশচর্চার পথ ও মতের সঙ্গে পরিচিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শেষ পর্যন্ত মৌলিক পন্থা নিজেই আবিষ্কার করে নিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবজগত থেকে স্বদেশপ্রেমকে তিনি ইতিহাসের ভিত্তির উপর স্থাপন করলেন। উপন্যাসে যে অনুভূতিকে তিনি অতীতচারী করেছেন—প্রবন্ধে তারই সুস্পষ্ট সমালোচনা পেয়েছি। মানবপ্রেমিক লেখকই স্বদেশপ্রেমিক হতে পারেন। ধর্মতত্ত্বের প্রীতিবিষয়ক প্রবন্ধসম্ভারে বঙ্কিমচন্দ্র প্রীতির স্বরূপনির্ণয় করেছেন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে। 'কমলাকান্তের দপ্তরের' 'একা' প্রবন্ধেও বঙ্কিমচন্দ্র

বলেছিলেন,—"প্রীতি সংসারে সর্বব্যাপিনী—ঈশ্বরই প্রীতি। প্রীতিই আমার কর্ণে এক্ষণকার সংসার সংগীত। অনন্তকাল সেই মহাসংগীত সহিত মনুষ্য হৃদয়তন্ত্রী বাজিতে থাকুক। মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে তবে আমি অন্য সুখ চাহি না।"

এই অকপট স্বীকারোক্তি মানবপ্রেমী বঙ্কিমচন্দ্রের। সমগ্র অন্তর জুড়ে যখন এই প্রীতিই রাজত্ব করছে—তার মাঝখানে স্বদেশপ্রীতির জন্য বঙ্কিমচিত্তের একটি ক্ষুদ্র প্রদেশকেই মাত্র নির্দেশ করতে পারি আমরা। স্বদেশপ্রীতি একটি সাময়িক উচ্ছ্বাস—যুগধর্মে যা অতিমাত্রায় ফেনায়িত হয়েছে। শাশ্বত মানবপ্রেমের সাধক বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস ও প্রবন্ধে আমরা যে স্বদেশপ্রীতির প্রসঙ্গ পেয়েছি—তা যে কেবল যুগ প্রয়োজনে সেকথা অনস্বীকার্য, কিন্তু যুগধর্মের উর্ধ্বে শাশ্বত নিত্যকালের মানবপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করা যত সহজ—যুগ প্রয়োজনে বিকশিত বঙ্কিমসত্তার একটি ভগ্ন খণ্ডাংশকে আবিষ্কার করা তত সহজ নয়। তাই পাশ্চাত্ত্য Patriotism-এর সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রই স্বদেশপ্রেমের প্রচারকার্য চালিয়েছেন। কোথাও তিনি মানবপ্রেমী—শত্রুমিত্র নির্বিশেষে সনাতন ভারতীয় প্রীতিবাদে বিশ্বাসী কোথাও আত্মরক্ষার প্রয়োজনে শত্রুদলনের প্রস্তুতির পরিকল্পনা করে চলেছেন। এর মধ্যে যে বিরোধের সম্ভাবনা রয়েছে—সেটুকু মীমাংসার অতীত। একই বঙ্কিমচন্দ্র 'ধর্মতত্ত্বে' নিষ্কাম প্রীতির সমর্থক। তিনিই আবার "কমলাকান্তের" কুক্কুর জাতীয় পলিটিশ্যনদের চরিত্র ঘৃণাভরে উদ্‌ঘাটন করেছেন। অবশ্য যুগধর্মের সঙ্গে শাশ্বতধর্মের প্রকাশ্য বিরোধ বঙ্কিমসাহিত্যে নেই। যথাসাধ্য ভারসাম্য বজায় রেখেই বঙ্কিমচন্দ্র শাশ্বত মানবধর্ম ও স্বদেশপ্রেম প্রচার করেছেন। কোন সমালোচক ঐ বিষয়টিই ব্যক্ত করেছেন,

বঙ্কিমচন্দ্র শাশ্বত দেবতার ন্যায় যুগদেবতার নিকটও মস্তক নত করিয়াছিলেন কিন্তু এই শাশ্বত দেবতার ধর্মের সঙ্গে যুগধর্মের প্রকৃতপক্ষে কোন বিরোধ নাই। বিশ্ব মৈত্রী শাশ্বত দেবতার ধর্ম, স্বদেশপ্রীতি ও স্বাজাত্যবোধ যুগধর্ম,—যখন আমাদের স্বদেশপ্রেমে পরপীড়ন থাকে না, যখন আমাদের স্বাজাত্যাভিমান সঙ্কীর্ণ 'পেট্রিয়টিজমে' পরিণত হয় না, তখনই যুগপৎ এই উভয় দেবতার উপাসনা করা হয়।[৪৫]

[পৃঃ ১১]

যে স্বদেশপ্রেমে পরপীড়নটাই মুখ্য কথা—সেই স্বদেশপ্রেমকে বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেন নি। পরপীড়নের প্রশ্নটাই পীড়িত ভারতবাসীর পরাধীনতার পরিপ্রেক্ষিতে

৪৫. ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী—বঙ্কিমচন্দ্রের দিগ্‌দর্শন, ১৯৩৯।

অবাস্তব কল্পনা। শাসকগোষ্ঠীর উদ্ধত অত্যাচারের প্রতিক্রিয়ারূপে যে স্বদেশাভিমান একদা সমগ্র জাতির জীবনে জেগেছিল—তাতে পরপীড়নের চেয়ে আত্মরক্ষার তাগিদ ছিল বেশী। ইউরোপীয় Patriotism এদেশে পূর্ণ অর্থে প্রয়োগ করার সুযোগও নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসীর স্বদেশপ্রেম সর্বদাই আত্মমর্যাদা রক্ষার অস্ত্র—আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়।

'বিবিধ প্রবন্ধে' বঙ্কিমচন্দ্র অকপট সত্য প্রচার করেছেন পরাধীনতার মূল কারণ অনুসন্ধানে। "ভারত কলঙ্ক" ও "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা" প্রবন্ধ দুটি এ প্রসঙ্গে আলোচ্য। ভারতবর্ষ পরাধীন কেন?—ভাবাবেগবর্জিত যুক্তি দিয়ে এর কারণ নির্ণয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার দায়িত্ব ছিল বিজয়ী শক্তির হাতে। তাঁদের বর্ণনা পক্ষপাতিত্ব দোষযুক্ত। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরাজ ও মুসলমান উভয় ঐতিহাসিকদের একই অভিযোগ করেছেন,

"মনুষ্য চিত্রকর বলিয়াই চিত্রে সিংহ পরাজিতস্বরূপ লিখিত হয়। যে সকল ইতিহাসবেত্তা আত্মজাতির লাঘব স্বীকার করিয়া, সত্যের অনুরোধে শত্রুপক্ষের যশঃকীর্তন করেন, তাঁহারা অতি অল্পসংখ্যক। অপেক্ষাকৃত মূঢ়, আত্মগরিমাপরায়ণ মুসলমানদিগের কথা দূরে থাকুক, কৃতবিদ্য, সত্যনিষ্ঠাভিমানী ইউরোপীয় ইতিহাস-বেত্তারা এই দোষে এরূপ কলঙ্কিত যে, তাঁহাদের রচনা পাঠ করিতে কখন কখন ঘৃণা করে।"[৪৬] এই মিথ্যা ইতিহাসের বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করেছিলেন নির্ভীক স্বদেশপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্র। "ইতিহাস চাই" বলে তিনিই প্রথম আন্দোলনের সূচনা করেন। নবজাগরণের লগ্নে অতীত ইতিহাস আমাদের যে শক্তি দান করবে—অন্য কিছু তা দিতে পারবে না। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের অনুরাগী হয়েছিলেন নানা কারণে। প্রথমতঃ বিদেশী লিখিত মিথ্যা ইতিহাসের প্রতিবাদ করার প্রয়োজনীয়তা তিনিই উপলব্ধি করেন—দ্বিতীয়তঃ শিক্ষিত বাঙ্গালীকে তিনি অতীতের দিকে দৃষ্টি ফেরাবার নির্দেশ দেন।

"যে জাতির পূর্ব মাহাত্ম্যের ঐতিহাসিক স্মৃতি থাকে, তাহারা মাহাত্ম্য রক্ষার চেষ্টা পায়, হারাইলে পুনঃপ্রাপ্তির চেষ্টা করে। ক্রেসী ও আজিনকুরের স্মৃতির ফল ব্লেনহিম্ ও ওয়াটার্লু—ইতালি অধঃপতিত হইয়াও পুনরুত্থিত হইয়াছে। বাঙ্গালী আজকাল বড় হইতে চায়,—হায়! বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক স্মৃতি কই?"

[বিবিধ প্রবন্ধ,—বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা—২য় খণ্ড]

৪৬. বঙ্কিম রচনাবলী। ২য় খণ্ড। সমগ্র সাহিত্য, যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত। সাহিত্য সংসদ, ১৩৭১।

এমন সুস্পষ্ট উপদেশ প্রবন্ধ শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র অন্য কোথাও উচ্চারণ করেন নি। নবজাগরণ লগ্নে বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছিলেন পৃথিবীর অন্যান্য জাতির অগ্রসরণের দৃষ্টান্ত দেখে। অবশ্য কাব্যে-নাটকে এই ইতিহাস চর্চা শুরু হয়েছে পুরোমাত্রায়। বঙ্কিমচন্দ্রের আগ্রহ ছিল—বাঙ্গালীর জীবনে বাঙ্গালীর ইতিহাসের আদর্শ গৃহীত হোক। সেই আদর্শের চিত্র আছে 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মৃণালিনীতে'।

"ভারতকলঙ্কে" সমগ্র ভারতবাসীর পরাধীনতার হেতু বিচক্ষণতার সঙ্গে নির্ণয় করেছিলেন তিনি।

"প্রথম, ভারতবর্ষীয়েরা স্বভাবতই স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা রহিত। স্বদেশীয় স্বজাতীয় লোকে আমাদিগকে শাসিত করুক, পরজাতীয়দিগের শাসনাধীন হইব না, এরূপ অভিপ্রায় ভারতবর্ষীয়দিগের মনে আইসে না।…হিন্দুরা স্বাধীনতাপ্রিয় নহে, শান্তিসুখের অভিলাষী, ইহা কেবল জাতিগত স্বভাববৈচিত্র্যের ফল, বিস্ময়ের বিষয় নহে।"

সুতরাং পাশ্চাত্ত্য 'স্বদেশপ্রেম' এদেশে নতুন কথা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রসঙ্গত স্পষ্টতভাবে তা স্বীকার করেন। "স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা, এ সকল নূতন কথা।" উনবিংশ শতাব্দীর ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষা লাভের ফলে যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করেছি আমরা স্বদেশপ্রেম সেই সূত্রেই পাওয়া। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য স্বদেশপ্রেম এদেশের মাটিতে রোপণ করার পক্ষপাতী ছিলেন না বলেই পরপীড়নকে স্বদেশপ্রেমের সীমানা থেকে নির্বাসিত করার উপদেশ দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। মহামনীষী বঙ্কিমচন্দ্র সনাতন ভারতীয় আদর্শের সর্বব্যাপক উদারতার মহিমায় আচ্ছন্ন ছিলেন তাই পাশ্চাত্ত্য স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসের চপলতাকে মানবজীবনের একমাত্র সাধনা বলে মনে করতে পারেন নি। বস্তুতঃ ভারতীয় স্বদেশপ্রেমিকদের পক্ষে নির্বিচারে পাশ্চাত্ত্য স্বদেশপ্রেমের জয়গান করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না—ভূদেব, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজীর জীবনবাণী ভারতীয় সনাতন আদর্শের ওপরেই দাঁড়িয়ে আছে। এঁরা ভারতীয় আদর্শের ধ্বজা বহন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন,—

"ইংরেজ ভারতবর্ষের পরমোপকারী। ইংরেজ আমাদিগকে নূতন কথা শিখাইতেছে। যাহা আমরা কখন জানিতাম না, তাহা জানাইতেছে, যাহা কখন দেখি নাই, শুনি নাই, বুঝি নাই, তাহা দেখাইতেছে, শুনাইতেছে, বুঝাইতেছে, যে পথে কখন চলি নাই, সে পথে কেমন করিয়া চলিতে হয়, তাহা দেখাইয়া দিতেছে। সেই সকল শিক্ষার মধ্যে অনেক শিক্ষা অমূল্য। যে সকল অমূল্য রত্ন আমরা ইংরেজের চিত্তভাণ্ডার হইতে লাভ করিতেছি, তাহার মধ্যে দুইটির আমরা এই প্রবন্ধে উল্লেখ

করিলাম—স্বাতন্ত্রপ্রিয়তা এবং জাতি প্রতিষ্ঠা। এই প্রবন্ধে জাতি শব্দে Nationality বা Nation বুঝিতে হইবে। ইহা কাহাকে বলে, তাহা হিন্দু জানিত না।"

[ভারত কলঙ্ক]

এই নবলব্ধ স্বদেশপ্রেমের আবেগে সমগ্র জাতি যখন আত্মহারা, বঙ্কিমচন্দ্রই তখন তার মূল্য বিচার করেছিলেন প্রবন্ধের মাধ্যমে। স্বদেশপ্রীতির এমন প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে আমরা পাই নি। কাব্যে-নাটকে-উপন্যাসে স্বদেশোচ্ছ্বাস প্রত্যক্ষ করেছি, সেখানে ব্যাখ্যা করার সুযোগও ছিল না। বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য বঙ্কিমের হাতেই পরিণতি লাভ করেছে। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমও নানা প্রবন্ধে সে যুগের উপযোগী এ জাতীয় বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করেছিলেন। 'ভারতকলঙ্কে' বঙ্কিমচন্দ্র ভারতবাসীর পরাধীনতার অন্য একটি মূল্যবান হেতু নির্ণয় করেছেন। ভারতবর্ষে জাতিগত, বর্ণগত, আচারগত পার্থক্য বর্তমান সুতরাং সর্বভারতীয় ঐক্য-চেতনা এদেশে কোনদিনই ছিল না। ভারতবাসীর দীর্ঘদিনের পরাধীনতার এটিই সম্ভবতঃ মূল কারণ। বঙ্কিমচন্দ্র কারণ নির্ণয়েও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন—

"এই ভারতবর্ষে নানাজাতি, বাসস্থানের প্রভেদে, ভাষার প্রভেদে, বংশের প্রভেদে, ধর্মের প্রভেদে নানা জাতি। বাঙ্গালী, পাঞ্জাবী, তৈলঙ্গী, মহারাষ্ট্রী, রাজপুত, জাঠ, হিন্দু, মুসলমান, ইহার মধ্যে কে কাহার সঙ্গে একতাযুক্ত হইবে।"

তবে বঙ্কিমচন্দ্র আগামী দিনের ভবিষ্যতের চিত্রটিও কল্পনা নেত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। গণজাগরণের দু' একটি ইতস্ততঃ ঘটনা থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র আশা প্রকাশ করেছিলেন।

এ প্রবন্ধে ভারতবর্ষের অতীত গণজাগরণের ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন,—

"ইতিহাস কীর্তিত কালমধ্যে কেবল দুইবার হিন্দু সমাজমধ্যে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয় হইয়াছিল। একবার, মহারাষ্ট্রে শিবাজী এই মহামন্ত্র পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার সিংহনাদে-মহারাষ্ট্র জাগরিত হইয়াছিল।

...দ্বিতীয় বারের ইন্দ্রজালিক রণজিৎ সিংহ, ইন্দ্রজাল খালসা। জাতীয় বন্ধন দৃঢ় হইলে পাঠানদিগের স্বদেশেরও কিয়দংশ হিন্দুর হস্তগত হইল। শতদ্রু পারে সিংহনাদ শুনিয়া নির্ভীক ইংরেজও কম্পিত হইল।"

এই বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের আশা ও আকাঙ্ক্ষার ক্ষীণ ঝংকার শুনতে পাই। পূর্ণ আশাবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের অভিলাষও ব্যক্ত হয়েছে—

"যদি কদাচিৎ কোন প্রদেশখণ্ডে জাতি প্রতিষ্ঠার উদয়ে এতদূর ঘটিয়াছিল, তবে সমুদয় ভারত একজাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হইলে কি না হইতে পারিত?"

বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ কল্পনা ব্যর্থ হয় নি। স্বদেশপ্রেমিকের মুক্তির স্বপ্নও সফল হয়েছিল।

"ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতা" প্রবন্ধটিতেও বঙ্কিমচন্দ্রের দেশচেতনার মনোভাব প্রতিফলিত। স্বাধীনতা ও পরাধীনতার মধ্যে মৌল পার্থক্যটি নির্ধারণে ভারতবাসী সক্ষম ছিল না বহুদিন। স্বতন্ত্রতা সম্বন্ধে ভারতবাসীর উদাসীনতা সম্পর্কে 'ভারত কলঙ্ক' প্রবন্ধে পূর্বেই আলোচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই মনোভাবকে তিনি প্রশংসনীয় গুণ বলে মনে করেন না বলেই প্রবন্ধটির নামকরণেই তাঁর আভাস রয়েছে। "ভারত কলঙ্কের" বক্তব্যের সঙ্গে "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতার" কিছু যোগসূত্র রয়েছে। ঐ প্রবন্ধে স্বাধীনতা ও পরাধীনতার অর্থ বিচার করেছেন প্রাবন্ধিক। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য পাঠ করেই যে নতুন শব্দ ও ভাব গ্রহণ করেছে শিক্ষিত বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্র সে প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"বাঙ্গালি ইংরেজি পড়িয়া এ বিষয়ে দুইটি কথা শিখিয়াছেন—'Liberty' 'Independence', তাহার অনুবাদে আমরা স্বাধীনতা এবং স্বতন্ত্রতা দুইটি কথা পাইয়াছি।"

পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাব স্বীকার করেই বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা শুরু করেছেন। স্বাধীনতা সম্বন্ধে ভারতবাসীর উদাসীনতা ভারতপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রের মনেও খানিকটা ক্ষোভ সঞ্চার করেছিল এ প্রবন্ধটিতে তার পরিচয় পাওয়া যাবে। তবে প্রচ্ছন্ন অভিযোগের অন্তরালে স্বদেশপ্রেমিকের আত্মগোপনচেষ্টা হিসেবে গণ্য করতে হবে তাকে। প্রাচীন ভারতের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্রতা বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টভাবেই বলেছেন,—

"আধুনিক ভারতবর্ষে দেশী বিলাতিতে যে বৈষম্য, তাহা প্রাচীন ভারতে ব্রাহ্মণ শূদ্রের বৈষম্যের অপেক্ষা কি গুরুতর?" এ জাতীয় বক্তব্যে সমালোচকের নিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে নিঃসন্দেহে। বঙ্কিমচন্দ্র অবশ্য স্বীকার করেছেন,—

"ভিন্নদেশীয় লোক, কোন দেশে রাজা হইলে একটি অত্যাচার ঘটে। যাঁহারা রাজার স্বজাতি, দেশীয় লোকাপেক্ষা তাঁহাদিগের প্রাধান্য ঘটে। তাহাতে প্রজা পরজাতিপীড়িত হয়। যেখানে দেশীয় প্রজা, এবং রাজার স্বজাতীয় প্রজার এইরূপ তারতম্য, সেই দেশকে পরাধীন বলিব। যে রাজ্য পরজাতি পীড়ন শূন্য, তাহা স্বাধীন।"

ইংরাজ রাজত্বে প্রজাপীড়ন চরমে উঠেছে বহু ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সিপাহী বিদ্রোহের অন্যতম কারণ যে পরজাতি পীড়ন বঙ্কিমচন্দ্রের হাতের কাছেই সে দৃষ্টান্ত ছিল। তবু বঙ্কিমচন্দ্র পরিশেষে প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণশক্তির পীড়নের প্রসঙ্গ

উত্থাপন করেছেন। এই প্রবন্ধে স্পষ্টবাদী বঙ্কিমচন্দ্র পরাধীন ভারতবাসীর মনে কিছু সান্ত্বনা দান করেছেন বটে কিন্তু এই সান্ত্বনায় মনের ক্ষোভ ঢাকা পড়ে নি। প্রবন্ধের উপসংহারেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে,

"অনেকে রাগ করিয়া বলিবেন, তবে কি স্বাধীনতা পরাধীনতা তুল্য? তবে পৃথিবীর তাবজ্জাতি স্বাধীনতার জন্য প্রাণপণ করে কেন? যাঁহারা এরূপ বলিবেন, তাঁহাদের নিকট আমাদের এই নিবেদন যে, আমরা সে তত্ত্বের মীমাংসায় প্রবৃত্ত নহি। আমরা পরাধীন জাতি - অনেক কাল পরাধীন থাকিব—সে মীমাংসায় আমাদের প্রয়োজন নাই।"

এই অংশটি পাঠ করলেই বঙ্কিমচন্দ্রের অভিপ্রায় স্পষ্ট হয়। এ জাতীয় প্রবন্ধের যুক্তিজাল ভেদ করলে দেখা যাবে স্বাধীনতার প্রকৃত অর্থই তিনি নির্ণয় করেছেন। কিন্তু পরাধীনতার পক্ষ সমর্থন করে কিছু আলোচনা আছে বলেই স্বাধীনতার মূল্য-বিচারে তিনি অসমর্থ এ কথা বলা চলে না। সে যুগের স্বাধীনতাপ্রিয় প্রাবন্ধিক যখন স্বদেশপ্রীতি আলোচনা করেন - উচ্ছ্বাসের আধিক্যে যুক্তি লাঞ্ছিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ অতি উচ্ছ্বাসের গতিরোধ করে কিছু নতুন কথা শোনাতে পেরেছিলেন।

'বাঙ্গালীর বাহুবল' প্রবন্ধটি আলোচনা করলেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের ধারণাটি স্পষ্টতর হবে। বাঙ্গালির জীবনে ও মনে যে নবভাবের আলো দেখা দিয়েছে—তাতে উৎসাহ সঞ্চার এ প্রবন্ধ রচনার উদ্দেশ্য বলে গণ্য করা খুব অসঙ্গত নয়। এখানেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত মতামত ভিত্তি করেই আলোচনায় অগ্রসর হয়েছেন। ঐতিহাসিকের বৃত্তান্ত অস্বীকার করতে গেলে কিছু যুক্তি প্রদর্শন করতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রও এখানে যুক্তিনিষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন। এ প্রবন্ধেও বিদেশী ঐতিহাসিকের মতামত স্বীকার করে সবিনয়ে কিংবা সক্রোধে তিনি বাঙ্গালীর চরিত্রে আরোপিত অপবাদের সত্যতা স্বীকার করেছেন। বল্লাল সেন, মহীপাল ও লক্ষ্মণ-সেনের বিজয় ইতিহাসের প্রসঙ্গ বর্ণনা করেই ঈষৎ বক্রোক্তি করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র,—

"অতএব পূর্বকালে বাঙ্গালিরা যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত কোন প্রমাণ নাই। পূর্বকালে ভারতবর্ষস্থ অন্যান্য জাতি যে বাহুবলশালী ছিলেন, এমত অনেক প্রমাণ আছে, কিন্তু বাঙ্গালিদিগের বাহুবলের কোন প্রমাণ নাই।"

এ অংশ পাঠ করলে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশাভিমানই অনুভব করি আমরা। বিদেশীর ইতিহাস সত্যকে বিকৃত করেছে আর নির্বিচারে সে সত্য গ্রহণ করেছি আমরা, স্বদেশপ্রেমী বঙ্কিমের অভিমান সেখানেই। বাঙ্গালির বাহুবল প্রমাণ করতে পারেন নি বঙ্কিমচন্দ্র, কিন্তু কৌশলে বাঙ্গালির সামনে কয়েকটি মূল্যবান তথ্য তুলে

ধরেছেন। বাহুবলই যে জগতে উন্নতির একমাত্র পথ নয়—সে কথা প্রমাণ করে তিনি বলেছেন,—

"আমরা যাহা বলিতেছি, বাঙ্গালার সর্বত্র, সর্ব নগরে, সর্ব গ্রামে সকল বাঙ্গালির হৃদয়ে তাহা লিখিত হওয়া উচিত। বাঙ্গালি শারীরিক বলে দুর্বল, তাহাদের বাহুবল হইবার সম্ভাবনা নাই—তবে কি বাঙ্গালির ভরসা নাই? এ প্রশ্নে আমাদিগের উত্তর এই যে, শারীরিক বল বাহুবল নহে।

...উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালির কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালির বাহুবল নাই।"

বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে মিথ্যা অপবাদের প্রতিবাদ করেছেন, অন্যদিকে আগামী ভবিষ্যতে আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ বাঙ্গালিকে পথ চিনিয়েছেন, এই দিক থেকে বিচার করলে বঙ্কিমচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের নেতৃত্ব করেছিলেন। বাঙ্গালি চেষ্টা করলেই মিথ্যা অপবাদের গ্লানিমুক্ত থেকে হতে পারে বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের দৃঢ় ধারণা। ইংরাজী শিক্ষার আলোকে আত্ম-আবিষ্কারের পালা সঙ্গে করে বাঙ্গালি যখন আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছে, সেই মুহূর্তে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দীপনাময়ী ভাষা ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের আবেদন কত গভীর হতে পারে সহজেই তা অনুমেয়। বাঙ্গালীর জীবনে এ সুযোগ পূর্বে কখনও আসে নি—বঙ্কিম সেকথাও বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। লঘু প্রবন্ধের ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপে তিনি যেকথা প্রচার করেছেন 'বিবিধ প্রবন্ধের' প্রকাশ বক্তব্যও প্রায় অনুরূপ। কিন্তু এখানে বঙ্কিমচন্দ্র উপদেষ্টা। বাঙ্গালির ভবিষ্যৎ গড়ে তুলবে বাঙ্গালিই—শুধু বঙ্কিমচন্দ্র দিশারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ,—

"যদি কখন ১। বাঙ্গালির কোন জাতীয় সুখের অভিলাষ প্রবল হয়, ২। যদি বাঙ্গালি মাত্রেরই সেই অভিলাষ প্রবল হয়, ৩। যদি সেই প্রবলতা এরূপ হয় যে, তদর্থে লোকে প্রাণপণ করিতে প্রস্তুত হয়, ৪। যদি সেই অভিলাষের বল স্থায়ী হয়, তবে বাঙ্গালির অবশ্য বাহুবল হইবে।"

বাঙ্গালির বাহুবল, প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে পথ নির্দেশ করেছেন—তার সূচনা হয়েছে ইতিপূর্বেই। কিন্তু এমনভাবে প্রবন্ধের বক্তব্য হিসেবে তা প্রচারিত হয় নি। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিটি বাঙ্গালির প্রাণে এই উৎসাহ এমনভাবে সঞ্চার করার চেষ্টা করেছেন যার ফলে বাঙ্গালি শুধু বাহুবলই অর্জন করবে না, একটি স্থায়ী জাতীয় মনোভাব গড়ে তুলবে। এবং জাতীয় মনোভাব সম্মিলিতভাবে আত্মপ্রকাশ করলে যে কোন বিপ্লব ঘটে

যাওয়াটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্ধৃত মন্তব্যে সেই বিপ্লবের আভাস সঙ্কেতিত হয়েছে বললে খুব অতিশয়োক্তি হয় না। প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে স্বদেশ-চিন্তাকেই সমগ্র জাতির প্রাণে সঞ্চারিত করেছেন—এই প্রবন্ধটি তারই নিদর্শন।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র [১ম খণ্ড] "প্রাচীনা ও নবীনা" প্রবন্ধটিতে গুরু প্রবন্ধের মোড়কে লঘু প্রবন্ধেরই রসসঞ্চার করেছেন। বিশেষ করে এই প্রবন্ধের শেষে যে তিনটি মহিলার প্রতিবাদ পত্র প্রকাশিত হয়েছে তাতে গুরুগম্ভীর প্রবন্ধের রস বিক্ষিপ্ত হয়েছে বটে কিন্তু উপভোগ্যও হয়েছে। বঙ্কিমের আলোচনা নারী প্রগতির স্বপক্ষে ছিল না বলেই প্রতিবাদ পত্র তিনটিতে বঙ্গীয় পুরুষ সম্প্রদায়ও আক্রান্ত হয়েছেন। পত্র রচনাতেও বঙ্কিমীরীতি অনুসৃত—বিশেষ করে তৃতীয় পত্রের শেষাংশে শ্রী রসময়ী দাসীর মোক্ষম মন্তব্যটিতে আমরা জাতীয় চরিত্র সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠস্বর শুনতে পাই। পরাধীন বাঙ্গালির কোন বিষয়েই গৌরবের অধিকার নেই এ ছিল বঙ্কিমের ধারণা। যারা স্বাধীনতাই বিসর্জন দিয়ে আত্মমর্যাদা হারিয়েছে—সেই বাঙ্গালি ক্ষমার অযোগ্য। বহু প্রবন্ধে এই ধিক্কারবাণী বঙ্কিমচন্দ্রের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে—এখানেও তাই,—

"যাহারা সাতশত বৎসর পরের জুতা মাথায় বহিতেছে, তাহারা আবার পুরুষ! বলিতে লজ্জা করে না?" এ তীব্র ভর্ৎসনা যে বঙ্কিমচন্দ্রের, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। এই অপবাদ থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বাঙ্গালি জাতি বঙ্কিমের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হবে। নিজে বাঙ্গালি হয়েও বঙ্কিমচন্দ্র যা অনুভব করতেন—প্রবন্ধে সে বক্তব্যই প্রচণ্ডভাবে বিস্ফোরিত হয়েছে মাত্র। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র [২য় ভাগ] বিষয়বস্তু মুখ্যতঃ বাঙ্গালীর ইতিহাস, বাঙ্গালীর অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের আলোচনায় সীমিত। কিছু কিছু অন্য প্রসঙ্গ আছে মুখ্যতঃ উদ্ধৃত প্রবন্ধ-গুলোকেই কেন্দ্র করে আমাদের আলোচনা। বিবিধ প্রবন্ধে 'ভারত কলঙ্ক' প্রকাশের প্রায় ১২ বৎসর পরে 'বাংলার কলঙ্ক' প্রকাশিত হয়। স্বদেশপ্রেমী বঙ্কিমের এই প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের উল্লেখযোগ্য মন্তব্য,—

"এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী হইতে কতকগুলি ঐতিহাসিক সত্য নিঃসৃত হইয়াছিল, বিগত অর্ধ শতাব্দীর শত শত নূতন আবিষ্কারেও তাহাদিগের সত্যতা সম্বন্ধে কাহারও সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। বঙ্কিমচন্দ্র এই ঐতিহাসিক সত্যগুলি মহাজন উক্তির মতন বলিয়া যান নাই, এখন আমরা যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সত্য প্রমাণ করিবার চেষ্টা করি, বহু সত্যাসত্যের মধ্য হইতে যেমন করিয়া ঐতিহাসিক সার সত্যটুকু বাছিয়া লইতে যত্ন করি, তিনিও তেমনি করিয়া সেইরূপ প্রণালী অবলম্বনেই তাঁহার উক্তিগুলির সত্যতা প্রতিপাদন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার 'ভারত

কলঙ্ক' প্রবন্ধ প্রকাশের পর বিয়াল্লিশ বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে এবং 'বাঙ্গালীর কলঙ্ক' প্রকাশের পরে ত্রিশ বৎসর অতীত হইয়াছে, কিন্তু অদ্যাবধি যে সমস্ত প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কোনটিই বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধবাদী বলিয়া বোধ হয় না।"

[শ্রীরাখালদাস বন্দ্যো, নারায়ণ, বৈশাখ ১৩২২]

"ভারত কলঙ্কের" সঙ্গে "বাঙ্গালীর কলঙ্ক"-এর আদর্শগত মিল আছে। 'বাঙ্গালীর 'কলঙ্কের' ভূমিকায় তিনি উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন।—

"যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়, তখন প্রথম প্রবন্ধে মঙ্গলাচরণস্বরূপ ভারতের চিরকলঙ্ক অপনোদিত হইয়াছিল। আজ প্রচার সেই দৃষ্টান্তানুসারে প্রথম সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধে বাঙ্গালার চিরকলঙ্ক অপনোদনে উদ্যত। জগদীশ্বরও বাঙ্গালার সুসন্তানমাত্রেই আমাদের সহায় হউন।" [বাঙ্গালার কলঙ্ক]

যে কলঙ্ক বাঙ্গালির চরিত্রে আরোপিত কিন্তু সত্য নয়—তার প্রতিবাদে বঙ্কিমচন্দ্র সমগ্র বাঙ্গালীর সাহায্য চেয়েছেন। বাঙ্গালীর ভীরুতার অপবাদ, দুর্বলতার অপবাদ, শক্তি দৈন্যের অপবাদ মিথ্যা ইতিহাসে বিস্তারিত বর্ণনায় পল্লবিত হয়েছে। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র সেকথা অস্বীকার করেছেন, উপেক্ষা করেছেন। ইংরেজ ইতিহাস লেখকের বর্ণনার প্রতিবাদ না করে তিনি সরাসরি তা উপেক্ষাই করেছেন। 'বিবিধ প্রবন্ধে' [১ম খণ্ড] তিনি কোথায়ও বিনীত প্রতিবাদ করেছেন—এখানে তিনি স্পষ্টতই বিরুদ্ধতার আশ্রয় নিয়েছেন,

"বাঙ্গালীর চিরদুর্বলতা ও চিরভীরুতায় আমরা কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ পাই নাই। কিন্তু বাঙ্গালী যে পূর্বকালে বাহুবলশালী, তেজস্বী, বিজয়ী ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাই।"

এখানে সত্য নির্ণয়ে তিনি নির্ভীক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। "বাঙ্গলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" প্রবন্ধে বঙ্কিমের বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত মনের পরিচয় পাই। এখানে তিনি ক্ষমাহীন সত্যসন্ধী। বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর সত্য ইতিহাস নির্ণীত না হলে বঙ্কিমচন্দ্র শান্ত হতে পারেন না। এ প্রবন্ধে, বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশানুরাগ ও সৎসাহস উভয়টিই প্রকাশ পেয়েছে। মুসলমান রচিত ইতিহাসকে তিনি ঘৃণাভাবে উপেক্ষা করেছেন, "যে বাঙ্গালী এ সকলকে বাংলার ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে সে বাঙ্গালী নয়। আত্মজাতি গৌরবান্ধ, মিথ্যাবাদী, হিন্দুদ্বেষী মুসলমানের কথা যে বিচার না করিয়া ইতিহাস বলিয়া গ্রহণ করে সে বাঙ্গালী নয়।"

বাঙ্গালীপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রের এ প্রচেষ্টায় অনেক সমালোচক সংকীর্ণতার গন্ধ আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র এ ব্যাপারে স্পষ্ট মতামত দিয়েছেন। প্রথমে

বাঙ্গালীকে বাঁচার পথ দেখাবেন তিনি—পরে সমগ্র ভারতবাসীর প্রসঙ্গ চিন্তা করবেন। যদিও "ভারত কলঙ্ক" প্রসঙ্গে তা বহু পূর্বেই আলোচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও পরাধীনতার কারণ নির্ণয় সমাপ্ত করেই তিনি বাঙ্গালার ইতিহাস অনুসন্ধান শুরু করেন।

বাংলার ইতিহাসের কলঙ্ক দূর করে নূতন ইতিহাস রচনার দায়িত্ব তিনি সমগ্র বাঙ্গালি জাতির স্কন্ধে ন্যস্ত করতে চান। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে এখানে,—

"তুমি লিখিবে আমি লিখিব, সকলেই লিখিবে। যে বাঙ্গালী তাহাকেই লিখিতে হইবে। মা যদি মরিয়া যান, তবে মার গল্প করিতে কত আনন্দ। আর এই আমাদিগের সর্বসাধারণের মা জন্মভূমি বাংলাদেশ ইহার গল্প করিতে কি আমাদিগের আনন্দ নাই?"

এখানে জননী জন্মভূমিকেই তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন সেই মৃতা জননীর সম্মান রক্ষার দায়িত্ব সম্পর্কে বাঙ্গালিকে সচেতন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের আবেদনের ভাষা অত্যন্ত মর্মস্পর্শী। দেশের ইতিহাসের প্রসঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রাণ হৃদয়টিকেই আবিষ্কার করি আমরা।

বঙ্কিমচন্দ্রের ভারতপ্রেম ও বঙ্গপ্রেমের নিদর্শন প্রবন্ধগুলিতে রয়েছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র সুপ্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার মহিমাই আবিষ্কার করেছেন। সুতরাং পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার পদতলে আত্মনিবেদনের সমালোচনা করা তাঁর পক্ষে সহজতর হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম এ সব প্রসঙ্গে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠেছে।

"ইউরোপ সভ্য কতদিন? পঞ্চদশ শতাব্দীতে অর্থাৎ চারিশত বৎসর পূর্বে ইউরোপ আমাদিগের অপেক্ষা অসভ্য ছিল।"

স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টভাষায় এ সত্য প্রচারে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেন নি। বঙ্কিমচন্দ্রই প্রবন্ধরচনাব প্রথমপর্বে পরোক্ষ রচনারীতির আশ্রয়ে আত্মরক্ষার উপায় খুঁজেছিলেন—কিন্তু ক্রমশঃ তাঁর ভাষা ও প্রকাশভঙ্গিতে অনেক বেশী নির্ভীকতা দেখা গেছে। বাঙ্গালীর প্রাচীন ইতিহাস বর্ণনায় তিনি বলেছেন,—

"আমাদের এই Renaissance কোথা হইতে? কোথা হইতে সহসা এই জাতির এই মানসিক উদ্দীপ্তি হইল? এর রোশনাইয়ে কে কে মশাল ধরিয়াছিল? ধর্মবেত্তা কে? শাস্ত্রবেত্তা কে? দর্শনবেত্তা কে? ন্যায়বেত্তা কে? কে কবে জন্মিয়াছিল? কে কি লিখিয়াছিল? কাহার জীবনচরিত কি? কাহার লেখায় কি ফল? এ আলোক নিবিল কেন?"

বাঙ্গালীর দৃষ্টিকে অতীতমুখী করে বঙ্কিমচন্দ্রই আত্মঅনুসন্ধানের নেশা জাগিয়ে দিলেন আমাদের চরিত্রে! অতীতচর্চ্চা বঙ্কিমচন্দ্রের আগেই শুরু হয়েছে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রই স্বদেশপ্রেম জাগানোর মুখ্য উদ্দেশ্য নিয়ে প্রবন্ধে সে আলোচনার সূত্রপাত করেছেন।—উপন্যাসে অতীতের কল্পিত মহিমার দিকে শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। দেশপ্রেমের উত্তাল তরঙ্গে সমগ্র জাতি যখন আন্দোলিত বঙ্কিমচন্দ্রই তখন যুক্তিধর্মিতা বজায় রেখে শিক্ষিত বাঙ্গালার পূর্ণ চৈতন্য জাগ্রত করেছেন। স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি যত তীব্র হয়েছে স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রও সেই অনুভূতি জাতির প্রাণে সঞ্চারিত করেছেন। 'বিবিধ প্রবন্ধের' 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধটিতে বঙ্কিমচন্দ্র বাক্যবলের ক্ষমতা প্রমাণ করেছেন। সাহিত্য রচনার উদ্দেশ্য যে লোককল্যাণ—এ কথা বঙ্কিমচন্দ্র পূর্বেই বলেছেন। সুতরাং প্রবন্ধের মাধ্যমে তিনি যে যথার্থই লোককল্যাণের চেষ্টাই করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। এ প্রবন্ধে বঙ্কিম বলেছেন,—"সাধারণ মনুষ্যগণ অজ্ঞ, চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ তাহাদিগকে শিক্ষা দেন। সেই শিক্ষাদায়িনী উপদেশমালা যদি যথাবিহিত বলশালিনী হয়, তবেই তাহা সমাজের হৃদয়ঙ্গমতা হয়। যাহা সমাজের একবার হৃদগত হয় সমাজ আর তাহা ছাড়ে না—তদনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। উপদেশবাক্য বলে আলোড়িত সমাজ বিপ্লুত হইয়া উঠে। [বাহুবল ও বাক্যবল]

সমগ্র প্রবন্ধ সাহিত্যের মাধ্যমে বঙ্কিমচন্দ্র এই লোককল্যাণ সাধনেরই চেষ্টা করেছেন। স্বদেশভাবাত্মক রচনাবলীরও উদ্দেশ্য সর্বসাধারণকে স্বদেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ ও জাগরিত করা। এই উদ্দেশ্যের সততা ও আদর্শের বিশুদ্ধতা বঙ্কিম-প্রবন্ধের বিশেষ মূল্য দান করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাই শুধু সাহিত্যিক হিসেবেই বন্দিত হন নি। সমালোচকের ভাষায়,—

বাস্তবিকপক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে সে যুগের বিক্ষিপ্ত চিন্তাধারা, সে যুগের আশা, আকাঙ্ক্ষা, সংহত ও কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, তাই তাঁহাকে আমরা 'যুগমানব' আখ্যা দিতে পারি। [বঙ্কিমদর্শনের দিগদর্শন—ত্রিপুরাশংকর সেন শাস্ত্রী পৃঃ ১১]

প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশচিন্তার পরিচয় বঙ্কিমপ্রবন্ধে যেমন পাওয়া যায় পরোক্ষভাবে সমাজের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধনের চিন্তাও তাঁকে নিরন্তর নতুন নতুন রচনার প্রেরণা দান করেছে! পাশ্চাত্ত্য সমাজতাত্ত্বিকদের আলোচনার সারাংশ বাংলা প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রচারের চেষ্টা বিশ্লেষণ করলেও দেখা যাবে বঙ্কিমচন্দ্র একটি আধুনিক প্রগতিবাদী বলিষ্ঠ জাতিগঠন করতে চান। সমাজবিপ্লবের মূল উপায় তিনিই আলোচনা করেছেন রূপকধর্মী রচনা 'বিড়ালে'। মিল এর সাম্যবাদ-এর সঙ্গে এদেশীয় সাধারণের পরিচয় ঘটাবার চেষ্টা করে তিনি অশেষ উপকার সাধন

করেছেন। যে কোন জাগরণই সমাজের সর্বস্তরে ব্যাপ্ত হওয়া প্রয়োজন। 'বঙ্গদেশের কৃষকে' তিনি বাংলার দুঃস্থ কৃষকের দিনযাপনের গ্লানি চিত্রিত করেছেন—সমাজবিপ্লবের পক্ষে এ সমস্ত প্রবন্ধের পরোক্ষপ্রভাব কেউই অস্বীকার করতে পারেন না। 'সাম্য' প্রবন্ধের বক্তব্যটিও স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনায় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র বাংলার সত্য ইতিহাস অনুসন্ধানের যে অনুরাগ সঞ্চার করেছেন—সেই আদর্শকেই মনে প্রাণে বরণ করে বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ক্ষেত্রে রজনীকান্ত গুপ্তের [১৮৪৯—১৯০০] আবির্ভাব হয়। স্বদেশীয়ানাই বঙ্কিমচন্দ্রকে সত্য ইতিহাস সন্ধানের প্রেরণা দিয়েছে—রজনীকান্তও দেশপ্রেমিক বলেই বঙ্কিমপ্রদর্শিত পথেই বিচরণ করেছেন। বাঙ্গলা প্রবন্ধের ক্ষেত্রে রজনীকান্ত সিপাহি যুদ্ধের ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বর্ণনা করেই স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। সমসাময়িক ইতিহাস অবলম্বন করে এমন নিষ্ঠার সঙ্গে সত্য উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস আমরা রজনীকান্তের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি। ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা ও দেশপ্রেমিকের আবেগ সম্বল করেই তিনি বাঙ্গলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সাহিত্য সরস্বতীর একনিষ্ঠ সেবক রজনীকান্ত সম্পর্কে 'সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসের' [তৃতীয় ভাগ] ভূমিকায় রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বলেছেন,—

"বাংলা সাহিত্যের জন্য রজনীকান্ত যে কার্য করিয়াছেন, তাহার মূলে একটা কথা পাওয়া যায়,—স্বজাতির প্রতি তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ। এই অনুরাগই প্রথমতঃ তাঁহাকে পুরাতত্ত্ব আলোচনায় প্রবৃত্ত করিয়াছিল। এই অনুরাগই তাঁহাকে পরে ভারতবর্ষের আধুনিক ইতিহাসের স্বাধীন সমালোচনায় প্রবৃত্ত করে।···রজনীকান্ত যেমন একদিকে আমাদের জাতীয় চরিত্রের কলঙ্ক কালিমা প্রক্ষালিত করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন, অন্যদিকে আমাদের প্রাচীনকালের মহাপুরুষগণের চরিত্রের চিত্র উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করিয়া, স্বজাতির গৌরব খ্যাপনের সহিত জাতীয় ভাবের উদ্দীপনা করিয়া আপনাকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিতে শিখাইতেছিলেন।[৪৭]

রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচনাতে রজনীকান্তের দেশচেতনার প্রসঙ্গটিই ব্যক্ত হয়েছে। 'এডুকেশন গেজেট' ও 'বঙ্গবাসী' পত্রিকার লেখকরূপেই রজনীকান্ত সাহিত্য জীবন শুরু করেন। বাঙ্গলা দেশের দুজন স্বদেশপ্রাণ সম্পাদক পত্রিকা দুটি পরিচালনা করতেন, তাঁরা রজনীকান্তের রচনার মূল্য স্বীকার করেছিলেন। 'বঙ্গবাসীতে' তাঁর

৪৭. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত, সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস। তৃতীয় ভাগ। ভূমিকা, ১৩১৭ সাল।

প্রথম রচনা 'আর্যকীর্তি' প্রকাশিত হয়। 'আর্যকীর্তি', রচনার উদ্দেশ্য ছিল বালকপাঠ্য গ্রন্থপরিকল্পনা। এই গ্রন্থের [১ম ভাগ] ভূমিকায় রজনীকান্ত বলেছিলেন,—

"বৈদেশিক সভ্যতা-স্রোতে আমাদের সমাজে অনেক বৈদেশিক ভাব ও বৈদেশিক রীতিনীতি আসিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে। পাঠশালার ছেলেরা এখন বিদেশের কথা ও বিদেশী লোকের জীবনচরিত পড়িয়াই নীতিশিক্ষা করে। ইহাতে তাহাদের কোমল হৃদয়ে স্বদেশহিতৈষণা বা স্বজাতিপ্রেমের আবির্ভাব হয় না। বালককাল হইতে বিদেশের কথা পড়িতে পড়িতে পাঠকের হৃদয় এমন বিকৃত হইয়া যায় যে, স্বদেশের বিষয় একবারও তাঁহার মনোযোগ আকর্ষণ করে না।··স্বদেশের দুঃখে স্বদেশের বেদনায় তাঁহার মনে দুঃখ বা বেদনার আবির্ভাব হয় না। সমাজের এই শোচনীয় অবস্থার মধ্যে আর্যকীর্তি প্রকাশিত হইল। ইহাতে ক্রমশঃ হিন্দু আর্যগণের কীর্তি-কলাপের কাহিনী বিবৃত হইবে।"[৪৮]

এই অংশ থেকেই রজনীকান্তের মনোভাব স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। স্বদেশীয়ানায় অভ্যস্ত হতে হবে নিতান্তই বাল্যকাল থেকে। সুতরাং বালকপাঠ্য রচনাতেং স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গটি আলোচিত হওয়া দরকার। ইতিপূর্বের বালকপাঠ্য রচনায় বিদেশী প্রসঙ্গের আধিক্য থাকায় স্বদেশের কাহিনী অবহেলিত হতো। রজনীকান্ত অবশ্য স্পষ্ট করে বলেন নি। বিদ্যাসাগরের "চরিতাবলী" বিদেশীদের জীবন অবলম্বনে উপদেশাত্মক ভঙ্গিমায় রচিত হয়েছিল। এতে শিক্ষণীয় বিষয়ের অপ্রাচুর্য ছিল না, কিন্তু স্বদেশের আদর্শের সঙ্গে ছাত্রদের পরিচয় ঘটার সুযোগ ছিল না বলে ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের 'চরিতাবলীর' সমালোচনা করেছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের উপরোক্ত রচনাকে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে বর্ণনা করেছেন। রজনীকান্তের বক্তব্যও ভূদেবানুগ। স্বদেশের দুঃখবেদনা জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টাই রজনীকান্তের এসব রচনার উদ্দেশ্য। স্বদেশের বীর পুরুষ ও নারী চরিত্রের বীরত্ব ও মহিমা সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার আয়োজন করেছেন লেখক। লেখক এখানে নিছক বর্ণনাকারী নন—তিনি উপদেষ্টা ও সমালোচক। অবশ্য এজন্য রজনীকান্তের খুব বেশী মৌলিকত্ব নেই—কাব্যে-উপন্যাসে-নাটকে বহুভাবে এসত্য ব্যক্ত হয়েছে। রজনীকান্তও বীরচরিত্র অনুসন্ধানের জন্য রাজস্থানের ইতিহাসের আশ্রয় নিয়েছেন। তারাবাঈ রচনাটিতে লেখক রাজপুত বীর সুরতন রাওএর মনোবল ব্যাখ্যা করেছেন। 'তারাবাঈ' এর পিতা সুরতন রাওএর মনোবল প্রকাশিত

৪৮. রজনীকান্ত গুপ্ত—আর্যকীর্তি। ১ম খণ্ড। বিজ্ঞাপন, কলিকাতা, ১৮৮৫।

হয়েছে তারাবাঈ-এর বিবাহপ্রার্থী জয়মল্লের প্রসঙ্গে। লেখক এখানে নিজের মনোভাব গোপন করেন নি। স্বদেশপ্রেমিক লেখক উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছেন,—

"বীরভূমি রাজপুতনা বাঙ্গালা দেশ নহে। রাজপুত বীর বাঙ্গালার ন্যায় পাত্র খুঁজিয়া বেড়ান না। এখনকার বাঙ্গালীর ন্যায় ধনশালির জড়পিণ্ডবৎ অকর্ম্মণ্য পুত্র বা বি, এ, এম, এ, উপাধিধারী বিলাসী যুবক পাইলেই রাজপুতবীর আহ্লাদে গলিয়া যায় না।

…প্রকৃত বীরের চরিত্র এইরূপ উচ্চভাবে পূর্ণ। প্রকৃত বীর এইরূপ মহাপ্রাণতা ও তেজস্বিতায় অলংকৃত। এই মহাপ্রাণতা ও তেজস্বিতার সমুচিত সম্মান করিতে পারেন, আজ এই বিশাল ভারতে এমন কয়টি প্রকৃত কবি বা প্রকৃত ঐতিহাসিক আছেন? আর কি চারণগণ অতীত গৌরবের গীতি গাইয়া চিরনিদ্রিত ভারতকে জাগাইবে না?" [তারাবাঈ]

এই অংশটিতে রজনীকান্তের দেশপ্রেম কতখানি উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে—ভাষায় ও প্রকাশভঙ্গিতেই তা ব্যক্ত হয়েছে। রাজপুত বীরের সঙ্গে বাঙ্গালীর তুলনাটিও অত্যন্ত সময়োপযোগী হয়েছে। স্বদেশপ্রেমী লেখক বাঙ্গালীর অধঃপতনের চিত্রটিই তুলে ধরেছেন। তথাকথিত উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত বঙ্গীয় যুবকদের চরিত্রে দেশানুরাগের অভাব লক্ষ্য করে লেখক দুঃখবোধ করেছেন। একদিকে স্বজাতির দুরবস্থা দেখে তিনি চিন্তিত, অন্যদিকে যথার্থ বীরত্বের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করে তিনি পরোক্ষভাবে দেশানুরাগ সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। রজনীকান্ত প্রকৃত স্বদেশপ্রেমী ছিলেন বলেই চারণের বৃত্তি গ্রহণে তাঁর অদম্য স্পৃহা লক্ষ্য করেছি। 'আর্যকীর্তির' কাহিনীগুলি মুখ্যতঃ অতীত ভারতের বীরনারী ও বীরপুরুষের চরিতচিত্রণ। মাঝে মাঝে উদ্দীপনা সঞ্চারের জন্য উত্তেজনাপূর্ণ স্বগতোক্তিরও অবতারণা করেছেন তিনি ;—

"বীরবালক ও বীররমণী" প্রবন্ধটিতে পুত্র, পুত্রের মাতা-পত্নী-বণিতার অসম-সাহসিক বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা করে অবশেষে লেখক মন্তব্য করেছেন,—

"এ অপূর্ব দৃশ্যের অনন্ত মহিমা আজ কে বুঝিবে? ভারত আজ নির্জীব, ভারত আজ বীরত্বরহিত, ভারত আজ জাতীয়জীবনশূন্য। ভারত আজ এ বীরবালক ও বীরাঙ্গনার পবিত্র বীরত্বের পূজা করিবে কি?"

এখানেও লেখকের স্বদেশপ্রেমী অন্তর ভারতের বর্তমান দুরবস্থায় ম্রিয়মান হয়ে পড়েছে। 'ভারত আজ জাতীয়জীবনশূন্য' এই আক্ষেপোক্তি উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমিকের। কিন্তু জাতীয় জীবনের জাগরণের লগ্নে সমগ্র দেশবাসীর অন্তরে যথার্থ স্বদেশপ্রীতি জাগিয়ে তোলার জন্যই তাঁরা এ জাতীয় উক্তি করেছিলেন। প্রাচীন ভারতের আদর্শের চিত্র মানসপটে স্থাপিত করে নবীন ভারত গঠনের সঙ্কল্পটি সমগ্র ভারতবাসীর মনে তীব্রভাবে অনুপ্রবেশ করিয়ে দেওয়াই লেখকের উদ্দেশ্য।

যদিও রজনীকান্তের এই ধরণের প্রচেষ্টাকে খুব কিছু অভিনব বলে মনে হয় না কিন্তু যে-কোন সাহিত্যেই প্রথমপর্বের মৌলিক ভাবনা পুনরাবৃত্তির ফলে একঘেঁয়ে মনে হয়। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক লেখকের দেশপ্রীতি প্রকাশের বিচিত্র ও বিভিন্ন উপায়ও খুব বেশী থাকে না,—পুনরাবৃত্তির আশ্রয়েই ফিরে আসতে হয় তাঁদের। রজনীকান্তের একেবারে প্রথম দিকের রচনাতেও তাই খুব বেশী মৌলিকত্ব নেই। কিন্তু ক্রমশঃ তিনি স্বকীয় বক্তব্য ও মৌলিক চিন্তাধারার পরিচয় দিতে সক্ষম হয়েছেন পরবর্তী রচনাগুলোতে। প্রবন্ধ মালা (১৮৭৭) কিংবা বীরমহিমা (১৮৮৬) ইত্যাদি গ্রন্থে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে রজনীকান্ত বীরচরিত্র অঙ্কন করেছেন। বহু আলোচিত এই ধরণের চরিত্ররচনায় মৌলিকত্ব দেখাবার সুযোগ নেই—কিন্তু মাঝে মাঝে প্রাবন্ধিক অত্যন্ত ভাবাবেগপীড়িত হয়েছেন। রাজস্থানের প্রতাপসিংহ উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমিক রূপে বন্দিত হয়েছেন কাব্যে-উপন্যাসে-নাটকে-প্রবন্ধে। ভারতবর্ষের পরাধীনতার কলঙ্ক মোচন করেছিলেন তিনি। হতাশা-পীড়িত ও জাগরণ-প্রয়াসী ভারতবাসীর মনে তিনিই অনির্বাণ উৎসাহ অগ্নি জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন। রজনীকান্তও দেশপ্রেমী প্রাবন্ধিকের কর্তব্য পালন করেছিলেন প্রতাপসিংহের মহিমা স্তব করে। রজনীকান্ত হলদিঘাটের নায়ক প্রতাপসিংহের উজ্জ্বল বর্ণনা দিয়েছেন।

"এইরূপে হলদিঘাট সমরের অবসান হয়, এইরূপে চতুর্দশ সহস্র রাজপুত হলদিঘাট রক্ষার্থ অম্লানবদনে, অসঙ্কুচিতচিত্তে আপনাদিগের জীবন উৎসর্গ করে। ইতিহাসের আদরের ধন ভারতবর্ষ এই লোকাতীত বীরত্বের জন্য চিরপ্রসিদ্ধ।···হলদিঘাট কিছু সামান্য যুদ্ধক্ষেত্র নহে, প্রতাপসিংহ কিছু সামান্য যুদ্ধবীর নহেন, যদি পৃথিবীতে কোন পুণ্যপুঞ্জময় মহাতীর্থ বর্তমান থাকে, যদি পবিত্র স্বাধীনতার, পবিত্র ধ্বজার কোন বিলাসক্ষেত্র থাকে, তবে তাহা সেই হলদিঘাট, যদি কোন বীরপুরুষ বীরেন্দ্রসমাজে প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া থাকেন, যদি কোন অদীন পরাক্রম মহাপুরুষ আলোক-সামান্য দেশানুরাগ জন্য অমর সমিতিতে স্তুত হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তিনি সেই প্রতাপসিংহ।"[৪৯]

উদ্ধৃত অংশ পাঠ করলে প্রাবন্ধিকের দেশপ্রেমিকতার পরিচয়টিই প্রকাশিত হয়। হলদিঘাট স্বদেশপ্রেমিকের তীর্থভূমি। স্বদেশপ্রাণ প্রাবন্ধিক সে তীর্থমহিমা কীর্তন করেছেন এখানে।

শিখ জাতির অস্ত্রশিক্ষাগুরু, গুরু গোবিন্দসিংহের চরিত মহিমাও ব্যাখ্যা

৪৯. রজনীকান্ত গুপ্ত—প্রবন্ধমালা, প্রতাপসিংহ, কলিকাতা, ১৮৭৮।

করেছেন লেখক। শিখের বীরত্ব ভারতবাসীর গর্বের বস্তু। স্বদেশপ্রেমিক হিসেবেই গুরু গোবিন্দসিংহ 'প্রবন্ধমালায়' আলোচিত হয়েছেন,—

"শিখ সমিতিতে হরগোবিন্দ অস্ত্রশিক্ষার প্রথম প্রবর্তক। কিন্তু গোবিন্দসিংহ এই মন্ত্রের সহিত এমনই তেজ প্রসারিত করিয়াছেন যে, তাহাতে সমস্ত শিখসমাজ তেজস্বী, সাহসী ও সুযোদ্ধা বলিয়া ইতিহাসের আদরণীয় হইয়াছে।

যাহা হউক, গোবিন্দসিংহ এই অল্প বয়সে অল্প সময়ের মধ্যে শিখসমাজে যে জীবনীশক্তি, যে তেজ, যে ওজস্বিতা প্রসারিত করেন, তাহারই বলে নির্জীব, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয় ভারতে শিখগণ আজ পর্যন্ত সজীব রহিয়াছে, তাহারই বলে রামনগর ও চিলিয়ানওয়ালার নাম আজ পর্যন্ত ইতিহাসহৃদয়ে বিরাজিত রহিয়াছে।"

রজনীকান্ত সাহসী-বীর্যবান-নির্ভীক ভারতবাসীর স্বপ্ন দেখেছেন,—তাই যেখানে শক্তি ও বীর্যের পরিচয় পেয়েছেন—তারই আলোচনায় আগ্রহী হয়েছেন। বীরমহিমা [১৮৮৬] রচনারও মূল উদ্দেশ্য বীরচরিত্রের আলোচনা করে পরোক্ষভাবে দেশ সচেতন হতে সাহায্য করা। 'বীরমহিমায়' যাঁরা আলোচিত হয়েছেন—"যুদ্ধবীর চরিতে ও নারী চরিতে" তাঁদের পৃথকভাবে ভাগ করা হয়েছে। প্রতাপসিংহ, গোবিন্দসিংহ, শিবাজী, রণজিৎসিংহ, কুমারসিংহ যুদ্ধবীর রূপে বন্দিত হয়েছেন। নারীচরিত্রে আছেন—মীরাবাঈ, সংযুক্তা, দুর্গাবতী ও লক্ষ্মীবাঈ। লক্ষ্মীবাঈ প্রসঙ্গে রজনীকান্ত "সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাসে" বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এখানে ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লক্ষ্মীবাঈএর আত্মত্যাগ ও স্বদেশ হিতৈষণার দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন তিনি। এ জাতীয় চরিত্রবর্ণনায় লেখকের ভাবাবেগ কতটা উদ্বেল হয়ে উঠত তার প্রমাণ মিলবে,—

"পরাধীনতার শোচনীয় সময়ে নির্জীব, নিশ্চেষ্ট ও নিষ্ক্রিয় ভারতবাসীর মধ্যে এইরূপ জ্বলন্ত পাবকশিখার আবির্ভাব হইয়াছিল। ভারতের যুবতী বীররমণী যৌবনের বিলাস পরিহার করিয়া এইরূপ ভয়ঙ্করী মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন।··· লক্ষ্মীবাঈয়ের জীবননাটকের শেষঅঙ্ক কি গভীর ভাবের উদ্দীপক! আপনার স্বাধীনতার জন্য যুবতী বীররমণীর এইরূপ অসাধারণ আত্মত্যাগ কি গভীর উপদেশের পরিপোষক।"

সর্বত্রই লেখকের স্বাধীনতাপ্রিয় মনের পরিচয়ই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশাত্ম-বোধের আবেগ এ জাতীয় প্রতিটি রচনার সঞ্চারিত। রজনীকান্তের ভাবাবেগপূর্ণ রচনা সম্পর্কে কোনো সমালোচক বলেছেন,—

"অক্ষয়কুমার দত্তের ওজস্বিতা ও বিদ্যাসাগরের মনোজ্ঞতা একত্র রজনীতে বর্তমান ছিল। অপরের ভাষা অন্যহিসাবে শ্রেষ্ঠ হইতে পারে, কিন্তু রজনীবাবুর ভাষা

ওজস্বিতা ও মনোজ্ঞতাগুণে বড়ই মনোরম। ঐতিহাসিক সাহিত্য লেখায় তিনিই পথপ্রদর্শক।"৫০

ঐতিহাসিকের দৃষ্টিভঙ্গিতে স্বদেশপ্রেমের আধিক্য ঘটলে যথার্থ ইতিহাস সম্ভবত রচিত হতে পারে না। রজনীকান্ত কিন্তু নিষ্ঠাবান স্বদেশপ্রেমিক হলেও ইতিহাস অবলম্বন করেছিলেন। তাঁর এ জাতীয় রচনার মধ্যে ভারতকাহিনী [১৮৮৩ ভারত প্রসঙ্গ [১৮৮৮] ও সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস [১৮৭৯—১৯০০] প্রধান।

"ভারত প্রসঙ্গের" লেখক বর্তমান ভারতইতিহাস অবলম্বন করেছিলেন। ইংরাজ অধিকৃত ভারতবর্ষের ইতিহাস ইংরাজ রাজত্বে বসে রচনা করার দুঃসাহসিকতা রজনীকান্তের ছিল। কিন্তু রজনীকান্ত সত্য ইতিহাস সম্পর্কে সমগ্র জাতিকে সচেতন করতে চেয়েছেন। ইংরেজ অধিকারের বিবরণ সম্পর্কে সচেতন হলে জাগরণের আলোকে আত্মদর্শনের কিংবা কর্তব্য নির্ধারণের সুবিধাই হবে। সেদিক থেকে এ জাতীয় গ্রন্থের মূল্য আছে। "ভারত প্রসঙ্গের" সূচীতে আছে—ভারতাক্রমণ, বঙ্গে ইংরেজাধিকার, ভারতে ব্রিটিশাধিকার, ভারতে ইংরেজরাজত্ব ও পরিশিষ্ট।

বিচক্ষণ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বিষয়টি আলোচনা করেছেন তিনি। স্বদেশপ্রেমিক হলেও যুক্তিহীন আত্মশ্লাঘা কোথাও নেই, কিংবা আত্মদোষ গোপনেরও কোথাও কোনো চেষ্টা করেননি লেখক, উপরন্তু ইংরেজ রাজত্বের প্রশংসনীয় দিকটিও বর্ণনা করেছেন। 'ভারতে ইংরাজ রাজত্ব' অংশটিতে লেখক বলেছেন,—

"সমগ্র ভারতবর্ষ জাতীয়ভাবে সম্বদ্ধ ছিল না। ইঙ্গরেজ কোনরূপ জাতীয়শক্তি বিনষ্ট করিয়া আপনাদের রাজত্ব স্থাপন করেন নাই। নানা কারণে ভারতবর্ষ পূর্বেই বন্ধনী বিযুক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। ইঙ্গরেজ এই বিচ্ছেদের চূড়ান্ত অবস্থায় ভারতবাসীর সাহায্যে আপনাদের অধিকার স্থাপন করেন। সুতরাং ইহাতে ইঙ্গরেজের অলৌকিক শক্তি বা অচিন্ত্যপূর্ব মহিমার পরিচয় পাওয়া যায় না।"৫১

বিচ্ছিন্ন জাতীয়ভাব শূন্য স্বদেশবাসীর চারিত্রিক অধঃপতনের সুযোগেই বিদেশীরা এদেশে এসেছে এবং সহজেই জয়লাভ করেছে। —এ সত্য যে-কোন সত্য-ইতিহাসেই স্বীকৃত। লেখক রজনীকান্ত জাগরণ ও ঐক্যের মহিমা সম্বন্ধে সচেতন জাতীয় আন্দোলন ও সংগঠনের পরিকল্পনা সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন বলেই এই অবস্থার সঙ্গে ভারতবর্ষের দুর্দশার চিত্রটি এমনভাবে উপলব্ধি করেছিলেন,

"ইঙ্গরেজের পদার্পণ সময়ে ভারতবর্ষ এমন কতকগুলি লোকের আবাসক্ষেত্র ছিল

৫০. রজনীকান্তের শোকসভায় হীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষণ। সাহিত্যসাধক চরিতমালা। ৬ষ্ঠ খণ্ড। রজনীকান্ত গুপ্ত থেকে সংকলিত।

৫১. রজনীকান্ত গুপ্ত—ভারত প্রসঙ্গ, ১২৯৪ সাল।

যে, একের ধারণা অন্যে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না, একের চিন্তায় অপরে চিন্তাশীল হইত না, একের স্বার্থ অপরের স্বার্থের সঙ্গে মিশিয়া যাইত না, একের অভাবে অপরের অভাববোধ করিত না। ইঙ্গরেজ পরের সাহায্যে এই বিচ্ছিন্ন, বিযুক্ত লোকদিগকে আপনাদের অধীন করিয়াছেন।"

এখানে সমগ্রজাতির চারিত্রিক ত্রুটির সমালোচনা করেছেন লেখক। ভারতবাসীর চরিত্রের এই দুর্বলতা বিচারের প্রয়োজনীয়তাও দেখা দিয়েছিল এই গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তটিতেই। রজনীকান্ত ধারাবাহিক ইতিহাস আলোচনা কালে এই ত্রুটির কথাই বার বার বলেছেন। সম্ভবতঃ ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত করে তোলাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল,—সংশোধনের সুযোগও ঘটবে এতে।

এই গ্রন্থের 'বঙ্গে ইঙ্গরেজাধিকার' অংশটিতে লেখক ইংরাজদের চাতুরী ও কপটতার কথাই প্রকাশ্যভাবে বলেছেন,—

"বাঙ্গালায় ইঙ্গরেজাধিকারের কথা কেবল চাতুরী, প্রবঞ্চনা ও অবাধ্যতায় পরিপূর্ণ। এই চাতুরীময়, প্রবঞ্চনাময় ও অবাধ্যতাময় কথার প্রসঙ্গে আমরা সিরাজউদ্দৌলার পরিচয় পাই। এই পরিচয়ে সিরাজউদ্দৌলার চরিত্রে যত দোষ দেখা না যায়, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ইঙ্গরেজের চরিত্রে ততোঽধিক দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।" [ভারতপ্রসঙ্গ]

রজনীকান্ত এখানে সিরাজউদ্দৌলার প্রতি সমবেদনা প্রদর্শন করেছেন। সত্যবিচার কালে এই সমবেদনা জাগাই স্বাভাবিক। রজনীকান্ত স্বদেশপ্রেমিক ঐতিহাসিক ছিলেন বলেই ইংরেজকে অযথা দোষারোপ করেন নি,—তিনি যুক্তিবাদী-সত্যনিষ্ঠ ঐতিহাসিকের কর্তব্যই পালন করেছিলেন। সেযুগের কাব্য-উপন্যাসে-নাটকে প্রত্যক্ষভাবে সত্যকথনের সুযোগ ছিল না;—বঙ্কিমচন্দ্রও সমালোচনার জন্য তির্যক ভঙ্গি অবলম্বন করেছিলেন,—রজনীকান্ত কিন্তু যথেষ্ট সাহসিকতারই পরিচয় দিয়েছিলেন। অবশ্য সত্যইতিহাস রচনার আবেদন জানিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রই, রজনীকান্ত সেই আদর্শটিই অনুসরণ করেছেন।

'ভারত কাহিনীতেও' রজনীকান্তের দেশপ্রেমের পরিচয় রয়েছে। 'ভারত কাহিনী' তিনি উৎসর্গ করেছিলেন দেশপ্রেমিকের হাতে,—

"ভারতহিতৈষী শ্রদ্ধাস্পদ সুহৃৎ শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহোদয়ের স্মরণীয় নামে "ভারত কাহিনী" উৎসর্গীকৃত হইল।"[৫২]

বিজ্ঞাপনের বক্তব্যেও লেখকের স্বদেশচেতনা স্পষ্ট,—"যাঁহারা ভারতবর্ষকে হৃদয়ের

৫২. রজনীকান্ত গুপ্ত—ভারত কাহিনী, ১৮৮৩ সাল।

সহিত ভালবাসেন, ভারতের ইতিহাসঘটিত কথা শুনিতে ইচ্ছা করেন, 'ভারত কাহিনী' যদি তাঁহাদের আমোদবর্ধনে সমর্থ হয়, তাহা হইলেই চরিতার্থ হইব।"

দেশপ্রেমিক লেখকের বাসনাটিতেও দেশপ্রেমেরই অকপট উচ্ছ্বাস ব্যক্ত হয়েছে। প্রাচীন ভারতের প্রতি শ্রদ্ধা ও বর্তমান ভারতের পরাধীনতায় গ্লানিবোধ ও ভবিষ্যতের জন্য আত্মপ্রকাশ গ্রন্থটিতে ক্রমান্বয়ে ব্যক্ত হয়েছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রবন্ধে লেখক এখানে তাঁর ব্যক্তিগত মতামতই প্রকাশ করেছেন। কোনো কোনো প্রবন্ধে ইংরেজের সৎকর্মকে সাধুবাদ দিয়েছেন, কোথাও বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করেছেন। স্বদেশপ্রীতি অবলম্বনে লেখা প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অনুসন্ধান করলে ব্যর্থ হতে হয়। মোটামুটি গতানুগতিক বিষয় অবলম্বনে কোথাও আক্ষেপ, কোথাও উৎসাহ সঞ্চারের চেষ্টাই এ জাতীয় প্রবন্ধে পাওয়া যায়।

"ভারতের ইতিহাস অধ্যয়ন"—প্রবন্ধটিতে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। ভারতের বর্তমান দুরবস্থার সঙ্গে ভারতের আর্যমহিমার চিরাচরিত তুলনা দিয়ে লেখক নৈরাশ্যবোধ করেছেন।

"ভারতের সে জ্ঞান, সে ধর্ম নাই, সে জীবনীশক্তি নাই, সে একতা, সে আত্মত্যাগ নাই। প্রাচীন ভারতের সভ্যতার স্রষ্টা আর্য মহর্ষিগণের বিলাসভূমি, গিরিকন্দর অবিকৃত রহিয়াছে, পুণ্যসলিলা সিন্ধু সরস্বতী যথাগতি প্রবাহিত হইতেছে, কিন্তু অদ্য ভারত শ্মশান। ভারতের সে গৌরবসূর্য এক্ষণে অনন্ত জলধিতলে ডুবিয়াছে। সে সাহস, সে বীর্যবত্তা, সে রণোন্মাদ, সে একতা, সে আত্মত্যাগ এক্ষণে কেবল আভিধানিক শব্দে পরিণত হইয়াছে। অদ্যতন ভারত এইরূপ দুরবস্থায় পতিত। অদ্যতন ভারতের সন্তানগণ এইরূপ নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয় ও নিস্পৃহ।"

ঐতিহাসিক রজনীকান্ত ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেছেন। কিন্তু সেইসঙ্গে দেশকে ভালবাসার কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,

"আর্যপূর্ব পুরুষগণ ঐতিহাসিক বলিয়া পরিচিত হউন বা না হউন, এক্ষণে তদ্বিষয়ের অনুশীলন অপেক্ষা আমাদিগের স্বদেশীয় ইতিহাসের অনুশীলনই অধিকতর আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। যদি কেহ স্বদেশের ব্যথায় নির্জন প্রদেশে নীরবে বসিয়া একবিন্দু অশ্রুপাত করিয়া থাকেন, যদি কেহ অত্যাচার পীড়িত জন্মভূমির সুখশান্তি বাড়াইতে যত্নপর হন, যদি কেহ মহাজন মুখবিনিঃসৃত 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' বাক্যের মর্মজ্ঞ হইয়া স্বদেশের হিতের তরে স্বীয় প্রাণ উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে সকলের আগে তাঁহার স্বদেশের ইতিহাস অধ্যয়ন করা উচিত। স্বদেশের ইতিহাস না পড়িলে তিনি স্বদেশের বেদনার প্রকৃত কারণ অনুভব করিতে পারিবেন না।"

স্বদেশহিতৈষণা জাগিয়ে তোলার একমাত্র কারণ ইতিহাস অধ্যয়ন, এ কথাটি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রত্যেক স্বদেশপ্রেমীরই বক্তব্য। তবে রজনীকান্তের দেশ প্রীতির আবেগ উদ্ধৃত মন্তব্যের মধ্যে উপদেশের মতো শোনায় নি—তা যেন দরদীর আবেদন। "ভারত কাহিনীর" "ভারতে মুদ্রণ স্বাধীনতা" প্রবন্ধটিতে ইংরেজের সৎকাজের প্রশংসা আছে—আবার সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর আরোপিত আইনের সমালোচনাও আছে। ইংরেজের দুরভিসন্ধির প্রকাশ্য সমালোচনা লেখকের নির্ভীক মনোভাবের পরিচয় দেয়। লর্ড মিণ্টোর আমলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ছিল না। এর কারণ বর্ণনাকালে লেখক বলেছেন,—

"সে সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগকে অজ্ঞানে ও কুসংস্কারে আচ্ছন্ন করিয়া রাখাই ইংরেজ গভর্নমেণ্টের একমাত্র নীতি ছিল। যদি স্বাধীন রাজ্যে অথবা সাধারণ প্রজাদের মধ্যে জ্ঞানের কোনরূপ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যাইত তাহা হইলে কিয়ৎপরিমাণে জ্ঞানোন্নতির সম্ভাবনা আছে দেখিয়াই, মিণ্টোর গভর্নমেণ্ট সংবাদপত্রের অবস্থা উন্নত করিতে কিছুমাত্র যত্ন করেন নাই।"

বিদেশী শাসন আমাদের যথার্থ প্রগতিতে বাধা দিয়েছে—এ সত্য প্রচার করাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। দেশের প্রতি অগাধ প্রেম যার আছে তিনি দেশের অনিষ্টকারীকে ক্ষমা করেন না। এই বিদ্বেষের ভাবকেই জাতিবৈর বলে। এক সময়ে বাংলাদেশে তুমুল আন্দোলন জমে উঠেছিল এই শব্দটিকে কেন্দ্র করে। বঙ্কিমচন্দ্র ও অক্ষয়চন্দ্র সরকার ছিলেন প্রধান আলোচক। দেশপ্রেমে জাতি-বৈরিতা থাকা উচিত কিনা—এ আলোচনার ভাবগত দিকটি নিয়ে আমাদের সমালোচকরা বাক্য-ব্যয় করেছিলেন—কিন্তু বাস্তবতাভিত্তিক আলোচনা কালে দেখা যাবে, যে দেশপ্রেমিক দেশের ক্ষতিসাধনকারীকে কখনও ক্ষমা করতে পারেন না। বঙ্কিমচন্দ্রও মিথ্যা ইতিহাসরচনা ও প্রচারের জন্য ইংরেজ ঐতিহাসিককে ক্ষমা করেন নি। 'সীতারামের' 'মার মার শত্রু মার' স্পষ্টতই শত্রু নিধনের ইঙ্গিত দেয়—সেখানেও জাতিবৈরিতাই প্রকাশ পেয়েছে। রজনীকান্ত মেটকাফের প্রশংসা করেছিলেন কিন্তু মিণ্টো গভর্নমেণ্টকে দোষারোপে করেছিলেন। বিদ্বেষের ভাবটি এখানেও গোপন করতে পারেন নি তিনি।

রজনীকান্তের শ্রেষ্ঠ ও যুগান্তকারী রচনা হিসেবে "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাসের" উল্লেখ করতে হয়। দীর্ঘ পাঁচ খণ্ডে লেখা এই গ্রন্থে স্বদেশপ্রেমিক রজনীকান্তের দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ও অপরিসীম দেশপ্রীতির পরিচয় মেলে। সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজ আমলে সর্বাপেক্ষা আলোড়নকারী ঘটনা। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে এই ঘটনা দাবাগ্নির মত ছড়িয়ে পড়েছিল। কিন্তু এই ঘটনার প্রামাণ্য বিবরণের জন্য যে

সব ইংরাজ ঐতিহাসিকের দ্বারস্থ হতে হয়—তাঁদের মত নির্বিচারে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। তাছাড়া বাংলাভাষায় সিপাহীযুদ্ধের প্রামাণ্য ইতিহাসও ছিল না—রজনীকান্ত সে অভাব দূর করতে চেয়েছিলেন। রজনীকান্তের দৃষ্টিভঙ্গি পুরোপুরি ঐতিহাসিকের, কিন্তু মনটি ছিলো স্বদেশপ্রেমিকের। রজনীকান্ত সিপাহী যুদ্ধের ঘটনা প্রসঙ্গে ইংরেজ ঐতিহাসিকের রচনাই অনুসরণ করেছিলেন, কিন্তু যেখানে ঐতিহাসিকের বক্তব্য মেনে নিতে দ্বিধাবোধ করেছেন সেখানে নিজের মতামতের ওপরেই নির্ভর করেছেন তিনি। সিপাহী যুদ্ধ সম্পর্কে সেযুগের সাধারণ লোকের ধারণার সঙ্গে আজকের গবেষণার পার্থক্য আছে। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় সিপাহি-বিদ্রোহের যে চিত্র পেয়েছি আমরা, তাতে সিপাহীদের স্বাধীনতার সৈনিক বলে কল্পনা করাও যায় না। একই শতাব্দীতে লেখা রজনীকান্তের গ্রন্থ পাঠ করলে সিপাহী বিদ্রোহ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হবে। রজনীকান্ত স্বদেশ-প্রেমিকের সহানুভূতি নিয়ে সিপাহীবিদ্রোহের ঘটনা ব্যাখ্যা করেছেন। ঈশ্বরগুপ্তের ধারণার মূলে সত্যনির্ণয়ের চেষ্টা ছিল না, ছিল রাজভক্তি ও আনুগত্য প্রদর্শনের বাসনা। এই স্বতোবিরোধ সে যুগের অনেক স্বদেশপ্রেমিকের চরিত্রেই দেখা গেছে। কিন্তু রজনীকান্ত যথাসাধ্য সত্য নির্ণয় করছিলেন। সিপাহী বিদ্রোহের তথ্যভিত্তিক আলোচনা কালে রজনীকান্ত দেখেছেন ক্রমাগত অত্যাচার ও অবিচারের ধূমায়িত প্রতিবাদরূপেই এ বিদ্রোহ অতি দ্রুতবেগে বিস্তারিত হয়েছে। একে হয়ত মুক্তির সংগ্রাম বলা চলে না, কিন্তু আত্মরক্ষা ও ধর্মরক্ষার সংগ্রাম বলা চলে অনায়াসে। রজনীকান্তের আলোচনাও আজকের পরিপ্রেক্ষিতে একটু প্রাচীন বলে মনে হবে। অতিরিক্ত ভাবাবেগ এ রচনায় যে স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি সঞ্চার করেছে—সেইটুকু আজকের ঐতিহাসিকের রচনায় হয়ত বর্জিত, কিন্তু রজনীকান্ত যুগোপযোগী ভাবের দ্বারা প্রাণিত হয়েছিলেন বলেই রচনাটিতে পৃথক বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েছে। রজনীকান্ত শুধু ইতিহাস বর্ণনা করেন নি,—তিনি প্রাপ্ত ইতিহাসের সমালোচনাও করেছেন।

সুদীর্ঘ পাঁচ খণ্ডে লেখা গ্রন্থটির প্রথমভাগে লেখক শুধু সিপাহী বিদ্রোহের কারণ নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন। এ দেশে ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের প্রথমাংশে নানা অজুহাতে রাজ্যগ্রাসের যে অবাধ লীলা চলেছে—লর্ড ডালহৌসীর নীতিই সেজন্য মুখ্যতঃ দায়ী। লেখক আবেগময়ী ভাষায় এই অন্যায় ঘটনাগুলি বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছেন। বিনাকারণে রাজ্যচ্যুত—সম্মানবঞ্চিত এই রাজন্যবর্গের অসন্তোষ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। সিপাহিদের অসন্তোষ যখন বিদ্রোহের আকার ধারণ করে তখন তা সমগ্র ভারতের সৈন্যাবাসগুলিতেই বিস্তারিত হয় নি—জনগণও এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত হয়েছে। অনেক জায়গায় রাজানুকূল্যও লাভ করেছে সৈনিকেরা। ইংরেজকে মান্য

করে, ইংরেজের আনুকূল্য ও অনুগ্রহ লাভ করে যে সব রাজা বা রাজপ্রতিনিধিরা বাঁচতে চেয়েছিল তারাও ব্যর্থ হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মরক্ষার জন্য বিদ্রোহী হয়েছে। প্রথম খণ্ডেপাঞ্জাব থেকে বাংলা—এই সমগ্র ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনা করে রজনীকান্ত আবেগময়ী ভাষায় বিদ্রোহের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করেছেন। ইংরেজের প্রতি বিরূপ মনোভাব শুধু সিপাহীদেরই ছিল না—যারা বঞ্চিত-অত্যাচারিত-নিগৃহীত প্রত্যেকেরই কিছু কিছু অসন্তোষ বর্তমান ছিল, যদিও তা প্রকাশের কোন উপায় ছিল না। কিন্তু সিপাহীদের মধ্যে যখন তা দ্রুতগতিতে বিস্তৃত হয়েছে -তারই সঙ্গে ব্যক্তিগত রোষ এসে মিলিত হয়েছে। কাজেই রজনীকান্তের দৃষ্টিতে এ আন্দোলন একেবারেই আকস্মিক বা অচিন্তিত নয়। মুক্তির সংগ্রাম হিসেবে চিহ্নিত করা না গেলেও সিপাহী বিদ্রোহ ইংরেজের বিরুদ্ধে ভারতের প্রথম সংঘবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রতিবাদ। রজনীকান্ত এই ঘটনাকে বিপ্লব বলেই চিহ্নিত করেছেন। সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে বিপ্লবের যে বর্ণনা পাই—লেখকও সিপাহী বিদ্রোহকে সেই জাতীয় গুরুত্ব দান করেছেন। ইংরেজের বর্ণনায় সিপাহী বিদ্রোহ ঠিক বিপ্লবের মহিমা লাভ করে নি। এই তথ্যটি ভিত্তি করেই রজনীকান্ত সমগ্র ইতিহাসটি লিপিবদ্ধ করেছেন.

"উপস্থিত বিপ্লবের সূচনা একদিনে বা একসময়ে হয় নাই। একদিনে বা একসময়ে সমগ্র সিপাহীদলে অসন্তোষ ও বিরাগ বদ্ধমূল হইয়া উঠে নাই। নিরক্ষর জনসাধারণও একদিনে বা একসময়ে কোম্পানির রাজত্বের উচ্ছেদের জন্য উত্তেজিত সিপাহিদিগের অনুবর্তী হয় নাই। বিপ্লবের বীজ বহুপূর্বে রোপিত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে উহার অঙ্কুরোদ্গম ও শাখাপ্রশাখার বিস্তার ঘটিয়াছিল। শেষে যখন উহার বিষময় ফল প্রত্যক্ষীভূত হইল, তখন ইংরেজগণ তীব্র জ্বালায় অধীর হইয়া পড়িলেন। তাহাদের ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অন্তর্হিত হইল।"[৫৩] [পৃঃ ১৫২ - ১৫৩]

রজনীকান্ত নিরপেক্ষ বিচার করেছেন—তার প্রমাণ গ্রন্থের অন্যত্রও রয়েছে। পঞ্চম ভাগের বিজ্ঞাপনে তিনি বলেছেন, --

"ইংরেজ লেখকগণ যেমন আপনাদের জাতীয়ভাবে আকৃষ্ট হইয়া, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস লিখিয়াছেন, উপস্থিত ইতিহাসে ইংরেজের সংগৃহীত উপাদানের প্রয়োগকালে, আমিও সেইরূপে আমাদের জাতীয় ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছি।

রজনীকান্ত আংশিক সত্য ও উপলব্ধ সত্যকে পাশাপাশি রেখে পূর্ণসত্য উদ্ধারের চেষ্টা করেছিলেন এ গ্রন্থে। জাতীয়ভাবের মুখরক্ষা করতে গিয়ে ইংরেজ যে আংশিক

৫৩. রজনীকান্ত গুপ্ত—সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস। ৪র্থ ভাগ। বেঙ্গল মেডিক্যাল লাইব্রেরী প্রকাশিত।

সত্য প্রকাশ করেছে—রজনীকান্ত ইংরেজইতিহাস আলোচনা কালে বারবার তা উপলব্ধি করেছেন। সিপাহীযুদ্ধের প্রকৃতি নির্ণয় করে একটি নিরপেক্ষ ইতিহাস রচনা করা ইংরেজ বা ভারতীয় উভয়ের পক্ষেই অসম্ভব। মনুষ্যচিত্রকর হলেই সিংহ চরিত্র লাঞ্ছিত হবেই—সিংহের অভিমত তাই। রজনীকান্তের পরেও সিপাহীযুদ্ধের নিরপেক্ষ ইতিহাস রচিত হয়েছে, কিন্তু ইংরেজীতে লেখা হলেও ইংরেজ ঐতিহাসিকের সঙ্গে তার মিল নেই সঙ্গত কারণেই। রজনীকান্তও জাতীয়ভাব রক্ষা করেই "সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস" রচনা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমের আবেগ রজনীকান্তের জীবনে প্রবলভাবে দেখা গেছে—জাতীয়ভাব উদ্দীপনের জন্যই তিনি মুখ্যতঃ সাহিত্য ক্ষেত্রে আবির্ভূত হন। তবু "সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের" নিরপেক্ষতা লঙ্ঘন করেন নি লেখক।

এই সুদীর্ঘ ইতিহাস রচনাকালে রজনীকান্তের স্বদেশপ্রেম নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। স্বাভাবিক মমত্ববোধ থেকেই লেখক সহানুভূতি প্রদর্শন করেছেন সিপাহী সম্প্রদায়কে। পরাধীনতার বেদনা লেখকচিত্তে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করেছে—বহু বর্ণনায় তা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

প্রথমভাগের সূচনা বর্ণনায় রজনীকান্তের ক্ষুব্ধ ও ব্যথিত চিত্তের পরিচয় পেয়েছি। ঐতিহাসিকের নিষ্ঠা দিয়ে অন্ধকূপহত্যার ঘটনাটি তিনি সমর্থন করেছেন, কিন্তু পাঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের পত্নী ঝিন্দনের নির্বাসনের বর্ণনায় তার দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়েছে,—

"পাঞ্জাব অবাতবিক্ষোভিত জলধির ন্যায় ধীরভাবে স্বীয় অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এই শোচনীয় নির্বাসন চাহিয়া দেখিল, একটি মাত্রও বারিবিন্দু তাহার নেত্র বিগলিত হইয়া দেহ অভিষিক্ত করিল না, যে বহ্নি ধীরে ধীরে শরীর দগ্ধ করিতেছিল, এ সময়ে তাহার একটি স্ফুলিঙ্গও উত্থিত হইয়া অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিল না. পঞ্জাব যোগনিদ্রাভিভূত বিরাট পুরুষের ন্যায় জাড্যদোষে আচ্ছন্ন হইয়া রহিল। কিন্তু এই জড়ত্ব প্রকৃত জড়ত্বের লক্ষণাক্রান্ত নহে, এই নির্জীবত্ব প্রকৃত নির্জীবত্বের পরিচায়ক নহে। ইহা গভীর ক্রোধ, গভীর আশঙ্কার গভীর নিস্তব্ধতা।"[৫৪] [পৃঃ ১৬, ১ম ভাগ]

এই অংশে রজনীকান্তের দূরদর্শিতা, স্বদেশপ্রেম ও ঐতিহাসিক সত্য নির্ণয়ের আগ্রহ দেখা যায়। সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন লেখক প্রত্যেকটি ঘটনার মধ্যে। সেতারা, ঝাঁন্সী, নাগপুর, নিজামের রাজ্য, অযোধ্যা, বাংলা জুড়ে এই অত্যাচার প্রতিটি মানুষের মনে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছে। রজনীকান্ত অত্যাচারের

৫৪. রজনীকান্ত গুপ্ত—সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস। ১ম ভাগ। সূচনা ১৮৮৬।

নিখুঁত বর্ণনা ও তার প্রতিক্রিয়ার আভাস দান করেছেন। সেতারার দত্তক পুত্রকে অস্বীকার করে ডালহৌসী সেতারার শাসনভার গ্রহণ করলেন,—রজনীকান্তের গভীর ক্ষোভ প্রকাশ পেয়েছে এখানে,—

"সেই অবধি যোগরত ভারতীয় আর্যতাপসগণের গভীরজ্ঞানের চিহ্নস্বরূপ ভারতমান্য শ্রুতি ও স্মৃতির হৃদয়ে কুঠারাঘাত আরম্ভ হয় এবং সেই অবধিই ইঙ্গলণ্ডীয় রাজপুরুষদিগের উদ্ভাবিত দত্তকগ্রহণের অসিদ্ধতাসমর্থক আইনের বলে মিত্র রাজ্য-সমূহ ভারত মানচিত্রে লোহিতরেখায় অঙ্কিত হইতে থাকে।" [পৃঃ ৬৫, ১ম ভাগ]

ইংরেজের রাজ্যগ্রাসের নীতির ফলেই এই অসন্তোষ বিশেষভাবে দেখা দেয়। ন্যায়নীতির কণ্ঠরোধ করে এবং ক্রমাগত শক্তিপ্রয়োগ করে ইংরেজ চাতুরীও কৌশলের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছিল এবং ভারতীয় মাত্রই ইংরেজের এই কৌশলের স্বরূপ চিনে ফেলেছে। নিজামের রাজ্য জোর করে দখল করার প্রসঙ্গে লেখকের ক্ষোভ ও দুঃখ উচ্ছ্বসিত হয়েছে,—

"দুরন্ত সাইলক অবলীলাক্রমে নিরীহস্বভাব আণ্টোনিওর দেহ হইতে মাংস কাটিয়া লইল, একটি পোর্সিয়াও এ সময়ে উপস্থিত হইয়া ন্যায়ের সম্মান রক্ষা করিতে সমর্থ হইল না।" [পৃঃ ৯৯, ১ম ভাগ]

এ ধরণের কাব্যোচ্ছ্বাস ইতিহাসে বেমানান, কিন্তু রজনীকান্ত অনেক জায়গায় আবেগ দমন করেন নি। ইতিহাসের দৃষ্টান্ত উদ্ধার করে বিষয়বস্তুকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতাও রজনীকান্তের ছিল। এক একটি অধ্যায়ে রজনীকান্তের মুগ্ধ মনোভাব প্রকট হয়ে উঠেছে - অযোধ্যারাজ্য অধিকারের প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন,

"অযোধ্যা অধিকার ভারতক্ষেত্রে লর্ড ডালহৌসীর শেষ ও সর্বপ্রধান কীর্তি। জনৈক ইতিহাস লেখক ডালহৌসীর এই কার্য রাজ্যাধিকারের ওয়াটারলু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যদি আমাদের মত জিজ্ঞাসা করা হয়, তাহা হইলে আমরা অম্লানবদনে উহা মহাপাতকের চরমসীমা স্মিথফিল্ডের অগ্নিকাণ্ড বলিয়া নির্দেশ করিব। মোহান্ধ মেরী নির্দোষ প্রোটেস্টাণ্টদিগকে জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করিয়া ধর্মের বিনিময়ে পাপরাশি উপার্জন করিয়াছিলেন, লর্ড ডালহৌসী নিরীহ ওয়াজিদ আলির হৃদয়ে তুষানল উৎপাদন করিয়া সুনামের বিনিময়ে অপকীর্তি সঞ্চয় করিলেন।"

[পৃঃ ১৩১, ১ম ভাগ]

রজনীকান্তের নির্ভীক সমালোচনার নিদর্শন হিসেবেই উদ্ধৃত অংশটিকে গণ্য করা যায়। সিপাহী বিদ্রোহের বর্ণনা গ্রন্থের দ্বিতীয় ভাগ থেকে শুরু হয়েছে। কিন্তু প্রথমভাগের সূচনায় সারা ভারতব্যাপী অত্যাচার ও অন্যায়ের নিদর্শন তুলে ধরেছেন লেখক। বাংলাদেশেও লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ায় প্রজাদের

মধ্যে অসন্তোষ তীব্রতর হয়েছিল। রজনীকান্ত বাঙ্গালীর চরিত্র বর্ণনা করেছেন এখানে,

"বাঙ্গালী চিরকাল রাজভক্ত, বাঙ্গালী চিরকাল বেদনাবোধহীন এবং বাঙ্গালী চিরকাল আপনাতে আপনি লুক্কায়িত। তাহারা নীরবে এই দণ্ড গ্রহণ করিল, নীরবে সংহারক বিধির নিকট অবনত মস্তক হইল এবং নীরবে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া পূর্বস্মৃতির সমুদয় চিহ্ন বিলুপ্ত করিয়া ফেলিল।" [পৃঃ ১৫৪, ১ম ভাগ]

বাঙ্গালীর চরিত্রে সাহস ও বীর্যের স্ফুরণ ঘটেনি তখনও—সত্য ইতিহাস গোপনের কোনো চেষ্টাও করেননি লেখক। কিন্তু এই আপাতঃ শান্ততা ভয়ঙ্কর ঘটনারই পূর্বাভাস মাত্র, সেকথাও লেখক বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। স্বভাবতই শান্তিপ্রিয়-নিরীহ হলেও পরিস্থিতি অনেক সময় মানুষের চরিত্রকে প্রভাবিত করে। বিপ্লবের পূর্বইতিহাস সংগ্রহ করলে দেখা যাবে, উন্মত্ততা কোনো মানুষের স্বাভাবিক চরিত্র লক্ষণ হতে পারে না। কিন্তু পারিপার্শ্বিক ঘটনাচক্র মানুষের চরিত্রে অকল্পনীয় দৃঢ়তা এনে দিতে পারে। রজনীকান্ত সমগ্র ভারতব্যাপী আন্দোলনের সূত্র অনুসন্ধান করেছেন বিচক্ষণতার সঙ্গে। সিপাহীবিদ্রোহের মূলে শুধু সিপাহীসম্প্রদায়ের অসন্তোষই যে একমাত্র কারণ নয় সম্ভবতঃ রজনীকান্ত সেকথা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেছেন,—বিস্তৃত পটভূমিকার চিত্র অঙ্কন করেছেন,—সিপাহীবিদ্রোহের ইতিহাস রচনায় তিনি যথার্থ সামর্থ্যেরই পরিচয় দিয়েছেন।

সিপাহীদের অসন্তোষ যে অনেকস্থলে ব্যর্থ হয়েছিল রজনীকান্ত তা স্বীকার করেছেন। সার্থক অভ্যুত্থানের মূলে যে সংগঠন ও পরিচালন শক্তির প্রয়োজন হয়—সিপাহীদের পরিচালনার জন্য সে জাতীয় কোন নেতার আবির্ভাব হয় নি ফলে সিপাহীরা পরাজিত হয়েছিল বৃটিশ শক্তির কাছে। রজনীকান্ত বলেছেন,—

"সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাসের আলোচনা করিলে আর একটি বিষয় জানিতে পারা যায়। উত্তেজিত সিপাহীরা ইঙ্গরেজদিগের সহিত প্রকৃষ্ট পদ্ধতিক্রমে ও ধারাবাহিক রূপে যুদ্ধ করে নাই। কোন কোন যুদ্ধে তাহারা অসাধারণ পরাক্রম দেখাইয়াছে। সাহস ও বীরত্বের যথোচিত পরিচয় দিয়াছে, কিন্তু তাহারা দেশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত, একজন সুদক্ষ সেনাপতির অধীনে পরিচালিত হয় নাই।"[৫৫]

[পৃঃ ২৪১, দ্বিতীয় ভাগ]

সিপাহীযুদ্ধের ঘটনাটি পলাশীর যুদ্ধের ঠিক একশ বছর পরের ঘটনা। লেখক

৫৫. রজনীকান্ত গুপ্ত—সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস। ২য় ভাগ। ২য় সংস্করণ, ১৮৮৬।

এই গ্রন্থে বারবার পলাশী যুদ্ধের ঘটনাটি স্মরণ করেছেন নিতান্ত ক্ষোভের সঙ্গে। পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের যে হেতুটি লেখক অকুতোভয়ে ব্যক্ত করেছেন—তাতে ইংরেজ পক্ষকে নানা অভিযোগে যুক্ত করা হয়েছে,—

"যেদিন পলাশীর প্রশস্ত ক্ষেত্রে শত্রুর ষড়যন্ত্রে হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার অধঃপতন হয়, লর্ড ক্লাইভের চাতুরীতে যেদিন বাঙ্গালার ব্রিটিশ কোম্পানির আধিপত্য বদ্ধমূল হইয়া উঠে, তাহার পর একশত বৎসরের মধ্যে আর কখনও এইরূপ ভয়ঙ্কর ঘটনার আবির্ভাব হয় নাই, আর কখনও ব্রিটিশ শাসনের মূলভিত্তি এইরূপ কম্পিত হয় নাই, ইংরেজগণ আর কখনও এইরূপ বিপদাপন্ন হইয়া মুহূর্তে মুহূর্তে সংহারিণী শক্তির ভৈরবমূর্তি দেখেন নাই।" [পৃঃ ১০৫-১০৬, ২য় ভাগ]

সিপাহীযুদ্ধের সঙ্গে জড়িত যে সব বিখ্যাত ব্যক্তির নাম পাওয়া যায় লেখক তাঁদের ইতিবৃত্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। নানাসাহেব, তাত্যাটোপে, লক্ষ্মীবাঈ, কুমারসিংহ, এঁদের সকলের বিস্তৃত বিবরণ খুব সতর্কতার সঙ্গে লিপিবদ্ধ হয়েছে। কাউকেই তিনি স্বদেশপ্রেমিক নেতা হিসেবে চিত্রিত করেন নি। কিন্তু যে পরিস্থিতির চাপে শেষ পর্যন্ত এঁরা ইংরেজ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছিলেন তার বর্ণনা অত্যন্ত যুক্তিনিষ্ঠ হয়েছে। সিপাহীবিদ্রোহকে স্বাধীনতার সার্থক সংগ্রাম হিসেবে গ্রহণ করেননি লেখক—সুতরাং নানাসাহেব কিংবা লক্ষ্মীবাঈকেও স্বাধীনতা সংগ্রামের নেতা হিসেবে বর্ণনা করেননি। এঁদের ইতিহাস পাঠ করলে দেখা যাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ রক্ষিত হয়নি বলেই এঁরা ক্ষুব্ধ, উত্তেজিত হয়ে শেষ পর্যন্ত প্রাণত্যাগ করে সম্মানরক্ষা করেছিলেন। নানাসাহেবের কার্যকলাপ পাঠ করলে জানা যাবে, সরকার তার বৃত্তি বন্ধ করা সত্ত্বেও তিনি ইংরাজআনুগত্য প্রদর্শন করছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত লাঞ্ছনার চরম সীমায় উপনীত হয়ে তিনি আত্মসম্মান রক্ষায় উদ্যোগী হয়েছিলেন। লক্ষ্মীবাঈ সম্পর্কেও এ তথ্য প্রচার করেছেন; আধুনিক ঐতিহাসিকও বলেছেন,—

Nana Sahib organised a big conspiracy was unreliable in character; the adopted son of Baji Rao seems to have played a part for himself alone. The available evidence also does not justify the view that the Rani of Jhansi instigated the sepoys to mutiny and to a certain extent this was also true of Kunwar Singh of Bihar.[৫৬]

৫৬. S. B. Chowdhury, Civil Rebellion in the Indian Mutinies, Calcutta, 1957, P—24.

কিন্তু রজনীকান্ত এঁদের আত্মদানের মহিমাকে অনেক বড়ো করে দেখেছেন। বিদেশী শাসকের অত্যাচারই এঁদের স্বদেশচিন্তা জাগিয়ে তোলে—মৃত্যুকে তুচ্ছ করে এঁরা জীবন দান করেছিলেন—এই মহিমাটুকুই স্বদেশপ্রাণ রজনীকান্তকে মুগ্ধ করেছে। লক্ষ্মীবাঈ, কুমারসিংহ প্রভৃতির কাহিনী তিনি অন্যত্রও বর্ণনা করেছেন স্বদেশপ্রেমিক চরিত্ররূপে। একদিকে ইংরাজশাসনের ত্রুটি বর্ণনায় তিনি অকপট অন্যদিকে এটি নিবারণে যাঁরা চেষ্টিত তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদনে তিনি তৎপর, উভয়টিই রজনীকান্তের তীব্র স্বদেশচেতনারই স্বাক্ষর। রজনীকান্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে সমালোচকের দায়িত্ব পালন করেছেন,—

"আপনার বৃত্তি বন্ধ হওয়াতে নানাসাহেব ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পরম শত্রু হন, ঝাঁনসী অধিকৃত হওয়াতে লক্ষ্মীবাঈর হৃদয়ে নিদারুণ ক্রোধাগ্নির সঞ্চার হয় এবং অযোধ্যা কোম্পানির মুল্লুক হওয়াতে বাঙ্গালার সিপাহিগণ দারুণ মর্মপীড়ায় অধীর হইয়া পড়ে। ডালহৌসী এইরূপে ধীরে ধীরে ভারতীয় ক্ষেত্রে ভবিষ্যবিপ্লবের বীজ বপন করেন, এবং অগৌরব ও অনুদারতায় ভারতসাম্রাজ্য ক্রমে ভারাক্রান্ত করিয়া তুলেন।" [পৃঃ ২২৬, ১ম ভাগ]

রজনীকান্তের অনুমান সঙ্গত ও যুক্তিনিষ্ঠ। সিপাহীদের অভ্যুত্থানের মূলে আকস্মিকতা ছিল না—ঘটনাপরম্পরা এই বিপ্লব সম্ভাবিত হয়েছিল—লেখক সেকথাই বোঝাতে চেয়েছেন। কিন্তু সিপাহীদের অসার্থক ও পরিকল্পনাবিহীন অভ্যুত্থানের প্রসঙ্গেও রজনীকান্ত যথার্থ মন্তব্য করেছেন। সিপাহীযুদ্ধ ভারতবর্ষের একটি অভিনব জাগরণ,--তা সুপরিকল্পিত না হলেও একেবারে অহেতুক নয়। তিনি বলেছেন,—

"তাহাদের স্বাধীনতাস্পৃহা থাকিতে পারে, দেশহিতৈষিতার জন্য একাগ্রতা থাকিতে পারে, স্বধর্মরক্ষার জন্য একপ্রাণতা থাকিতে পারে, কিন্তু তাহারা যে, অনেক সময়ে গভীর উত্তেজনায় সভ্যতার চিহ্ন সকল বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল তদ্বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই।...কিন্তু কেবল ভারতের ইতিহাসেই ভয়াবহ বিপ্লবের এইরূপ লোমহর্ষণ চিত্র পরিদৃষ্ট হয় না। এগুলি বিপ্লবের অবশ্যম্ভাবী ফল।"[৫৭] [পৃঃ ১১৫, তৃতীয় ভাগ]

রজনীকান্তের উদ্ধৃতি থেকে যেমন তাঁর বক্তব্য আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে—তাঁর রচনাভঙ্গিটিও তেমনি উপভোগ্য হয়েছে। সিপাহীযুদ্ধের ইতিহাস তাঁর বিশিষ্ট রচনা,—দেশপ্রেমিকতা ও ইতিহাসনিষ্ঠা এ রচনার সৌন্দর্যসঞ্চার করেছে। সিপাহী বিদ্রোহের সূচনা, বিস্তার ও সিপাহীবিদ্রোহের ফলাফলও তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে বর্ণনা

৫৭. রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী সম্পাদিত সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস। তৃতীয় ভাগ। ১৩১৭ সাল।

করেছেন। কিন্তু উচ্ছ্বাসের আবেগে সত্যকে অতিরঞ্জিত না করে অসাধারণ সংযমেরই পরিচয় দিয়েছিলেন। পরবর্তীকালের জাতীয় আন্দোলনে যাঁরা নির্বিচারে স্বদেশপ্রেমিক বলে কীর্তিত হয়েছিলেন—সেই নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ এবং কুমারসিংহ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তথ্যাশ্রয়ী বর্ণনা দিয়েছিলেন তিনি। লক্ষ্মীবাঈ সম্বন্ধে তাঁর অভিমত,—

"ইংরেজের অবিচার তাঁহাকে বিদ্রোহে প্রবর্তিত করিয়াছিল, তিনি তাঁহার দেশের জন্য প্রাণধারণ করিয়াছিলেন, দেশের জন্যই প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। রাণী প্রতিহিংসার আবেগে অস্ত্রধারণ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি যে শক্তি দেখাইয়াছেন, তাঁহার প্রতিপক্ষগণ বা তাঁহার চরিত্র সমালোচকগণের মধ্যে কেহই সেই মহাশক্তির প্রতি অসম্মান প্রকাশ করেন নাই।"[৫৮] [৫ম ভাগ, পৃঃ ৪২৫]

রজনীকান্তের ইতিহাসনিষ্ঠার এমন অনেক দৃষ্টান্ত এখানে মিলবে। নানাসাহেব বা তাত্যাটোপে সম্বন্ধেও তাঁর বর্ণনা ইতিহাসানুগ। এঁদের ব্যক্তিগত সংগ্রামসামর্থ্য ও শক্তির প্রশংসা করলেও এঁদের স্বদেশপ্রেমিক হলে বন্দনা করেননি কোথাও। যদিও তাত্যাটোপের মৃত্যু মুহূর্তটি বর্ণনায় লেখক অত্যন্ত বিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। কুমার সিংহের বিস্তৃত বিবরণটিতেও রজনীকান্ত যথাসাধ্য তথ্যানুগ ছিলেন। এতে রজনীকান্তের রচনার সংযম গুণটিই প্রকাশ পেয়েছে।—কারণ স্বদেশপ্রীতি যদি সত্য প্রকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াত, তবে গ্রন্থটির মূল্য নির্ধারণে অসুবিধার সৃষ্টি হোত। অথচ তথ্যনিষ্ঠতা বজায় রেখেও রজনীকান্ত যে স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছিলেন এমন প্রমাণও অজস্র রয়েছে।

কোন কোন বিষয়ে লেখকের স্বদেশপ্রীতির উচ্ছ্বাস ধরা পড়েছে যেমন, সিপাহীদের অসার্থক অভ্যুত্থানের বর্ণনা দানকালে লেখক যেন মর্মপীড়া অনুভব করেছেন। এ মর্মপীড়ার পরিচয় আছে সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের বর্ণনা উপলক্ষ্যে। সিরাজদ্দৌলার পরাজয়ের ঠিক শতবর্ষ পরে সংঘটিত ঐ অভ্যুত্থানের অর্থ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন লেখক—এখানেও তিনি খানিকটা উচ্ছ্বসিত।

"১৭৫৭ অব্দে ২৩শে জুন পলাশীর বিস্তৃত আম্রকাননে মীরমদন ও মোহনলালের অধঃপতনের সহিত হতভাগ্য সিরাজউদ্দৌলার সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইয়াছিল। ইংরেজ ঐ দিনে আপনাদের বিস্তৃত সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উহার শতবর্ষ পরের ২৩শে জুন ইংরেজেরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নিরতিশয় দুর্দশাগ্রস্ত হয়েন।" [পৃঃ ৭৯, ৪র্থ ভাগ]

সিরাজদ্দৌলার অধঃপতনের সঙ্গে স্বদেশপ্রেমিক মীরমদন ও মোহনলালের দুর্ভাগ্যের কথাটি যিনি স্মরণ করেছেন—তাঁর দেশপ্রেম তর্কাতীত।

৫৮. রজনীকান্ত গুপ্ত, সিপাহী যুদ্ধের ইতিহাস। ৫ম ভাগ। ১৯০০ সাল।

বঙ্কিমচন্দ্রের তীব্র স্বদেশানুভূতি বাংলা প্রবন্ধে প্রকাশিত ও প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশচেতনা অবলম্বন করে বহু প্রাবন্ধিক রচনা প্রকাশ করছেন। সে যুগের পত্রপত্রিকায় এজাতীয় প্রবন্ধ ছাপা হোত, সম্পাদকও উৎসাহ দান করতেন। এ ধরণের প্রবন্ধে অভিনবত্ব বা বৈচিত্র্য ছিল না—কিন্তু এর আবেদন ছিল। জাতীয় আন্দোলন তখন ঘনীভূত হয়েছে—রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষাও ক্রমশঃ তীব্রতা লাভ করেছে। প্রথমযুগের প্রবন্ধে যে প্রসঙ্গ শুধুমাত্র ব্যক্তিমনে স্বদেশচেতনা সঞ্চারের উদ্দেশ্যেই আলোচিত হয়েছে—ক্রমশঃ তার আবশ্যকতাও ফুরিয়ে গেছে। স্বদেশপ্রেমের আবেগাত্মক বক্তব্যটি কাব্যে-নাটকে-উপন্যাসে নানাভাবে পরিবেশিত হওয়ার ফলে প্রবন্ধে অভিনবত্ব সৃষ্টির কয়েকটি সুনির্দিষ্ট রীতি ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। ব্যঙ্গে-বিদ্রূপে, রূপকসৃষ্টিতে, সমালোচনার মাধ্যমে কিংবা উপদেশাত্মক ভঙ্গিমায় স্বদেশচেতনা জাগানোর ধ্রুপদীরীতির প্রায় প্রত্যেকটিই বঙ্কিমচন্দ্রের দ্বারাই অনুশীলিত। পরবর্তী প্রাবন্ধিকদের রচনায় বঙ্কিমপ্রজ্ঞার অভাব যেমন প্রকট—উদ্ভাবনীশক্তির দৈন্যও তেমনি পরিস্ফুট। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমিক প্রাবন্ধিকগোষ্ঠীর পুরোভাগের উজ্জ্বল গ্রহ বঙ্কিমচন্দ্রই অন্যান্য নক্ষত্রকে আবৃত করে আছেন। কয়েকজনের বিশিষ্টতা অবশ্যস্বীকার্য হলেও গ্রন্থাকারে এঁদের রচনা উনবিংশ শতাব্দীসীমায় প্রকাশিত হয় নি;—এঁদের মধ্যে আছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিবনাথ শাস্ত্রী ও স্বামী বিবেকানন্দ। দ্বিজেন্দ্রনাথের একটি রচনা এ প্রসঙ্গেও উল্লেখ করতে পারি—উনবিংশ শতাব্দীকালেই যে রচনাটি গ্রন্থাকারে প্রচারিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার স্বচ্ছপ্রবাহ রচনাটিতে ধরা পড়েছে।

"আর্যামি এবং সাহেবিআনা" প্রবন্ধটিতে দ্বিজেন্দ্রনাথ সে যুগের ভাবান্দোলন সম্পর্কে বিচক্ষণ মতামত দিয়েছেন। ঠাকুরবাড়ীর পরিবেশে স্বদেশীয়ানার ধারণাটি স্বতঃস্ফূর্তভাবেই বিকশিত হয়েছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের চরিত্রে। রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ স্বদেশসাধকদের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার ফলে দেশপ্রেমের উপলব্ধি তাঁর চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করেছিল। কিন্তু স্বকীয় চিন্তাধারার আদর্শ বজায় রেখেছিলেন তিনি। হিন্দুমেলার পৃষ্ঠপোষকতায় ঠাকুর পরিবারের অন্যান্যদের মতই দ্বিজেন্দ্রনাথও ছিলেন অগ্রণী। আত্মস্মৃতিতে তিনি স্পষ্টভাবে সমালোচনা করেছেন দেশপ্রেমিকদের,—

"আমি চিরকাল স্বদেশী। বিদেশী পোষাক পরিচ্ছদ, ভাব ভাষা আমার দু চক্ষের বালাই। রঙ্গলালই বল, আর রাজনারায়ণবাবুই বল, তাঁহাদের Patriotism-এর বার আনা বিলাতি, চার আনা দেশী। ইংরেজ যেমন Patriot আমিও সেইরকম Patriot হব—এই ভাবটা তাঁদের মনে খুব ছিল। বল দেখি, আমি তোমার মত

Patriot হইব কেন? আমি আমার মত Patriot হইতে না পারিলে কি হইল।"[৫৯]

এই সমালোচনা দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্যই নির্দেশিত করে। প্রখর আত্মস্বাতন্ত্র্য চেতনাই দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনার মূলে সক্রিয় ছিল। অবশ্য এ জাতীয় আত্মবুদ্ধি সম্পর্কে সচেতন করে তোলার অক্লান্ত প্রয়াস ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের। বিলিতি Patriotism-এর নিন্দা করে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ সেই আদর্শই অনুসরণ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তার অন্যান্য বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পাশ্চাত্ত্যসভ্যতার অভিমান বিবর্জিত প্রাচ্য ঐতিহ্যেই তাঁর বিশ্বাস ছিল। ভারতীয়ত্ব এবং সনাতন ভারতীয়আদর্শ তিনি অনুসরণ করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ স্বদেশী সাহিত্য আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয় বলেই আমরা সে সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি না। দ্বিজেন্দ্রনাথ বলিষ্ঠ আদর্শবাদ নিয়েই স্বদেশপ্রেমমূলক প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। 'আর্যামি এবং সাহেবি আনা' প্রবন্ধটি ১২৯৭ সালে চৈতন্য লাইব্রেরীর অধিবেশনে পঠিত হয়েছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটিতে লেখক নব্যপন্থী স্বদেশপ্রেমী ও প্রাচীনপন্থী দেশসাধকদের ত্রুটিগুলি বর্ণনা করেছেন—দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রবন্ধের নামকরণেই বিষয়বস্তুর আভাস দিয়েছেন। আর্যামির অহঙ্কার কিংবা সাহেবিআনার বড়াই—উভয়টিই প্রকৃত দেশচেতনার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অন্তঃসারশূন্যতা নিয়ে আর্যামির আস্ফালন কখনও ফলপ্রসব করতে পারে না, অন্যদিকে সাহেবিআনাও আর্যামির বিরোধিতা করে না। দ্বিজেন্দ্রনাথ যে-কোন অগভীর অনুভূতিকেই সমর্থন করেন নি। যে-কোন উদারনীতিই তিনি সমর্থনের পক্ষপাতী। দার্শনিক ও কবি হিসেবেও দ্বিজেন্দ্রনাথের পরিচয় আছে—তাঁর দেশপ্রেমেও সেই ভাবদৃষ্টির প্রলেপ লেগে আছে। তাঁর রচনার স্বচ্ছন্দতায় উদারস্বদেশচিন্তা বেশ উপভোগ্য হয়েছে। ঐ প্রবন্ধটিতে তিনি বলেছেন,

"কে বলে আর্যামি একটা রোগ, বরং তাহা একটা গুরুতর রোগের মহৌষধ—তা সাহেবিআনা রোগের মহৌষধ।...সাহেবিআনার ঔষধ স্বতন্ত্র,—ইংরাজদিগের বাহ্য আকার প্রকার ভাবভঙ্গীর অনুকরণই সাহেবিআনা, আর, ইংরাজদিগের বিজ্ঞান, শিল্প, কার্যনৈপুণ্য, কর্মনিষ্ঠতা, কর্তব্যনিষ্ঠা, তেজস্বিতা, এইগুলির নাম উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা। এই উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতাই সাহেবিআনা রোগের মহৌষধ,

৫৯. সাহিত্য সাধক চরিতমালা। ৬ষ্ঠ খণ্ড। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে উদ্ধৃত।

তা ভিন্ন আর্যামিও সাহেবিআনা রোগের ঔষধ নহে, সাহেবিআনাও আর্যামি রোগের ঔষধ নহে।”[৬০]

এই সমালোচনাটি উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশচর্চার ক্ষেত্রে বিশেষ অনুধাবনযোগ্য বক্তব্য বলেই মনে হয়েছে আমাদের। বস্তুতঃ বাংলাদেশের স্বদেশপ্রেমের জোয়ারে আর্যামির পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল সঙ্গত কারণেই—কিন্তু বৃথা আস্ফালন হলে এই অনুভূতিটি তার সুগভীর মহিমা হারাবে—এ ধারণা ছিল লেখকের। দ্বিজেন্দ্রনাথ আর্য মহিমা সচেতন হবার উপদেশ দিয়েছেন,

“সত্য সত্যই যদি তোমরা আর্য হইতে চাও, তবে পূর্বে আমরা যাহা করিতাম তাহাই কর, লৌকিক এবং পৌরাণিক ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে জ্ঞান ধর্মের জয়স্তম্ভ প্রতিষ্ঠিত কর। তোমাদের মধ্যে রামমোহন রায়ের ন্যায় প্রকৃত আর্যদিগের জন্মগ্রহণ যেন নিষ্ফল না হয়। আর্যামি করিলে কিছুই হইবে না। নিশ্চিত জানিও যে আর্যামি একটা সংক্রামক এবং মারাত্মক মহাব্যাধি, আর তাহার একমাত্র ঔষধ আর্যোচিত কার্য।” [ঐ]

দ্বিজেন্দ্রনাথের এই উপদেশ মূল্যবান কিন্তু এই ব্যাপক ও উদারদৃষ্টির অনুশীলন যে সহজসাধ্য নয়—তা সহজেই বোঝা যায়। সাহেবিআনার মধ্যেও গ্রহণযোগ্য অংশ আছে—কিন্তু সেই সারবস্তুর অনুসন্ধান সাধারণ লোকের বোধগম্য হয় না। আর্যামির বৃথা দম্ভটুকু বাদ দিয়ে শাশ্বত ধর্মের অনুশীলনও সেকারণেই সহজসাধ্য নয়। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রনাথ উদার স্বদেশধর্মের দীক্ষালাভ করেছিলেন—তার কাছে সাহেবি-আনার গ্রহণযোগ্য বিষয়টুকুও মর্যাদা পেয়েছে, অন্যদিকে আর্যামিও আস্ফালনশূন্য হলে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল। বস্তুতঃ উভয়ের মিলনই ছিল দ্বিজেন্দ্রনাথের কাম্য। এই পূর্ণতার সাধনায় উৎসাহিত করেছেন দ্বিজেন্দ্রনাথ।

বঙ্কিমোত্তর প্রবন্ধ সাহিত্যে স্বদেশচর্চা চলেছিল পুরোমাত্রায়—যদিও বৈচিত্র্য বা অভিনবত্ব এ ধরণের সাহিত্যে বিন্দুমাত্রও ছিল না। জন্মভূমির প্রতি প্রেমে যাঁরা আত্মহারা, তাঁরাই রচনার মাধ্যমে সেই মনোভাবটি সর্বসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান। এই প্রবণতা সব দেশে সব যুগেই ঘটে থাকে। অধ্যাত্ম সাধকদের মত স্বদেশ সাধকরাও একে কর্তব্য বলেই মনে করেছেন। গতানুগতিক আধ্যাত্মিক পদাবলীর সাময়িক প্রচার ও জনপ্রিয়তার মতই স্বদেশপ্রেমিকের লেখা প্রবন্ধও সে যুগে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এসব গ্রন্থের বক্তব্য আছে, অভিনবত্ব থাক বা না থাক। সর্বোপরি প্রাবন্ধিকের ব্যক্তিগত উপলব্ধির আন্তরিকতার গুণেও রচনার

৬০. দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর—আর্যামি ও সাহেবি আনা। প্রবন্ধমালা। ১৮৯০।

মূল্য বেড়েছে। এ জাতীয় কিছু প্রবন্ধগ্রন্থ আলোচনা করলে বঙ্কিমোত্তর প্রবন্ধ সাহিত্যে স্বদেশচর্চার সূত্রটি আবিষ্কার করা সহজ হবে।

চন্দ্রনাথ বসুর লেখা কঃ পন্থাঃ (১৮৯৮) কিংবা বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রকৃতি (১৩০৬) গ্রন্থ দুটিতেও গ্রন্থকর্তার স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পেয়েছি।

বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি আবিষ্কার করতে গিয়ে লেখক জাতিগঠনে সাহিত্যের দান সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। সাহিত্যের উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে তাঁর মতামত, "কোনো জাতির মধ্যে সাহিত্য লোকসাধারণের যত উপযোগী হয় উহা ততই জাতীয় ভাবাক্রান্ত হইতে থাকে এবং যাহাদিগকে লইয়া সেই জাতি তাহাদেরও মনে এক জাতীয়তার ভাব তত উদ্রিক্ত ও পরিবর্ধিত হইতে থাকে। সমগ্র জাতির মঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সাহিত্য রচনা করিলে সাহিত্যের সাহায্যে বড় বৃহৎ, বড় সুন্দর, বড় পবিত্র কার্য করিতে পারা যায়। সাহিত্য বড় সামান্য সামগ্রী নহে, বড় সহজ সামগ্রীও নহে। সুপ্রণালীতে রচিত হইলে, উহা জাতি গড়িবার কার্যে যেমন সহায়তা করে, কুপ্রণালীতে রচিত হইলে জাতি ভাঙ্গিবার পক্ষে তেমনই কার্যকর হয়, জাতি গঠনের তেমনিই প্রতিবন্ধকতা করে।...সে সাহিত্যের ফল কদর্য ও বিষময়, যে সাহিত্য জাতি ভাঙ্গে বা জাতি গড়িতে দেয় না, তাহা জাতীয় সাহিত্যও নহে, প্রকৃত সাহিত্যও নহে।"[৬১]

উদ্ধৃত আলোচনা থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয় যে সাহিত্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ণয়ে লেখক ভ্রান্ত ধারণার পরিচয় দিলেও স্বদেশপ্রেমের নিখুঁত পরিচয় এ অংশটিতে ব্যক্ত হয়েছে। সাহিত্যের উদ্দেশ্য জাতিগঠন, এ জাতীয় মতামত বঙ্কিমোত্তর প্রবন্ধ সাহিত্যে খুব অভাবিত কিছু নয়। স্বদেশপ্রেমের আলোকেই সাহিত্যবিচারের চেষ্টা করেছিলেন চন্দ্রনাথ বসু। স্বদেশপ্রেমিক লেখকের ধারণাটিই তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছেন।

এই প্রবন্ধগ্রন্থের অন্যত্রও চন্দ্রনাথ বসু বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। স্বদেশপ্রেম বাংলা সাহিত্যে অভিনবত্ব এনেছিল যদিও মানবমনের গভীরতম ভাবের রসরূপ স্বদেশচিন্তা হতে পারে না। যুগোপযোগী একটি আবেগই বাংলা সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছিল। এ সম্পর্কে চন্দ্রনাথ যে মতামত দিয়েছেন তাও লক্ষ্যণীয়।

"স্বদেশানুরাগ, স্বজনপ্রিয়তা, প্রীতি, ভক্তি, দয়া, পরোপকার-প্রিয়তা প্রভৃতি মানব হৃদয়ের উৎকৃষ্ট ভাব সকল আমাদের নাই। কিন্তু আমাদের লেখা পড়িলে

৬১. চন্দ্রনাথ বসু—বর্তমান বাংলা সাহিত্যের প্রকৃতি, পৃঃ ৫-৬, ১৩০৬

অপরে মনে করিতে পারে যে, আমাদের ন্যায় স্বদেশানুরাগী প্রীতিভক্তি পরায়ণ, দয়ালু, পরোপকার প্রিয় পৃথিবীতে আর কোথাও হয় নাই এবং হইবে না। যখন স্কুলে পড়িতাম তখনও কাহাকেও ভারতমাতার জন্য কাঁদিতে শুনি নাই, ভারতমাতার পূর্ব গৌরবের আস্ফালনে আকাশ পাতাল বিকম্পিত-প্রতিধ্বনিত করিতে দেখি নাই। কিছুদিন পরে দেখিলাম এক ব্যক্তি একটি কবিতা লিখিলেন এবং আর এক ব্যক্তি একটা মেলা বসাইলেন আর অমনি ভারতমাতার জন্য কান্নার রোল উঠিল এবং তাঁহার উদ্ধারের উদ্দেশে বীরত্বের বিকট চিৎকার শুনা যাইতে লাগিল। স্বদেশানুরাগের ঐ যে একটা ভান আরম্ভ হইল, উহা দেখিয়া ভক্তি, প্রীতি প্রভৃতি হৃদয়ের অন্যান্য শ্রেষ্ঠতম ভাবগুলির ক্রমে ক্রমে ঐরূপ ভান করা হইতে লাগিল।" [পৃঃ ৯-১০, ঐ]

সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের স্থান সম্পর্কে এমন সুস্পষ্ট সমালোচনা অন্যত্র পাই নি। স্বদেশপ্রেম সদ্যসৃষ্ট অনুভূতি হলেও যুগ প্রয়োজনে তা এতখানি বিস্তারলাভ করেছিল যে ঊনবিংশ শতাব্দীতে তা সর্বসাধারণের বক্তব্য হয়েছে,—সাহিত্যকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। বর্তমান গ্রন্থে প্রবন্ধকারের বিশ্লেষণ তার অন্যতম প্রমাণ। এ গ্রন্থের অন্যত্র চন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রসঙ্গই যে সাহিত্যে মুখ্যস্থান পাওয়া উচিত তার সমর্থনে বলেছেন,—

"বস্তুতঃ বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্যের যে লক্ষণের কথা কহিতেছি স্বদেশের লোক-সাধারণের সম্বন্ধে অবজ্ঞা, অনাস্থা ও সহানুভূতি শূন্যতাই তাহার উৎপত্তির অন্যতম কারণ এবং প্রবলতার প্রধান হেতু। আমরা স্বদেশানুরাগ বা স্বদেশবাসীর সহিত সহানুভূতির যতই আস্ফালন করি না কেন, প্রকৃতপক্ষে দুইয়ের একটাও আমাদের নাই। বর্তমান বাঙ্গালা সাহিত্য যে প্রকৃত সাহিত্য নহে, উহা যে জাতীয়ভাবে গঠিত ও অনুপ্রাণিত হইতেছে না, উহা যে একতা সাধন পক্ষে সাহায্য না করিয়া আমাদের ভিতর বিরোধ বিদ্বেষ, বৈষম্য বাড়াইতেছে ও পার্থক্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছে, ইহাই তাহার একটি প্রবল কারণ।" [পৃঃ ৩৯-৪০]

স্বদেশপ্রীতি চন্দ্রনাথের সমগ্র দৃষ্টিকে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ গ্রন্থটির সর্বত্র রয়েছে। স্বদেশাভিমানী সমালোচক সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড হিসেবে স্বদেশপ্রীতিকে গ্রহণ করেছিলেন বলেই স্বদেশপ্রসঙ্গের অধিকতর আলোচনার পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্রও এ জাতীয় আলোচনার সূত্রপাত করে গেছেন বহু পূর্বেই। বঙ্কিমচন্দ্রের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ প্রভাব সে যুগের প্রাবন্ধিকের ওপর গভীর ভাবে প্রতিফলিত—বিশেষতঃ স্বদেশপ্রেমী-প্রাবন্ধিক স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রকেই অবচেতন মনে গুরুর পদে বরণ করেছিলেন।

চন্দ্রনাথের মধ্যেও ভারতপ্রীতি লক্ষ্য করেছি। "হিন্দুত্ব" নামে একটি পৃথক প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করছিলেন তিনি। ভারতপ্রীতি চন্দ্রনাথের চরিত্রে কত গভীর মোহসঞ্চার করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যাবে 'কঃ পন্থাঃ' গ্রন্থটিতে। একশ্রেণীর পরাধীন ভারতবাসীর মনে আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার সান্ত্বনা ছিল—চন্দ্রনাথের মধ্যেও তা প্রবলভাবে বর্তমান। ইউরোপের ঐহিকতা ও জীবন উপভোগের তৃষ্ণাকে তিনি নিন্দা করেছেন। প্রাচীন ভারতের ত্যাগের আদর্শে অনুপ্রাণিত লেখক আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার আস্ফালনও করেছেন।—পাশ্চাত্ত্য দেশের অবস্থার পর্যালোচনা করে তিনি বলেছেন,—

"লোক বলে তাহারা বড় স্বাধীন। হিন্দুদিগের ন্যায় তাহারা বিদেশীয় রাজার অধীন নয় বটে, তাহাদের আপনাদের রাজা বা শাসক সম্প্রদায় তাহাদের চলাফেরা আহার বিহার আমোদ আহ্লাদ পড়াশুনা বেচাকেনা প্রভৃতি সম্বন্ধে তাহাদের ইচ্ছা স্বচ্ছাগতির এতটুকু সঙ্কোচ সাধন করিবার চেষ্টা বা উদ্যোগ করিলে তাহারা বিদ্রোহী পর্যন্ত হইয়া উঠে সত্য। কিন্তু প্রকৃত স্বাধীনতা যাহাকে বলে তাহা তাহাদের নাই। যে পৃথিবীর মোহে মুগ্ধ, পার্থিব বাসনায় বিহ্বল, তাহার আপনার উপর আপনার আধিপত্য নাই, সে নিজে নিজের রাজা নয়। সে নিতান্ত পরাধীন, পৃথিবীতে তাহার মত ক্রীতদাস আর নাই।"[৬২]

এ জাতীয় আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার আনন্দ নিয়ে লেখক উচ্ছ্বাস প্রদর্শন করেননি —এ ছিল তাঁর গভীর বিশ্বাস। স্বদেশপ্রেমের ঐহিক পটভূমিকাটি অগ্রাহ্য করে লেখক আধ্যাত্মিক জগতে প্রবেশ করে যে ভারতপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন নিঃসন্দেহে তা স্বদেশপ্রেমাত্মক প্রবন্ধের একটি নতুন বক্তব্য। আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার প্রসঙ্গ নিয়ে পরাধীন ভারতবাসীর গর্বের হেতু অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে হিন্দুর আধ্যাত্মিকতার প্রশংসায় স্ফীত হয়েই স্বদেশপ্রেমিক এই অহংকার গোপন করতে পারেন নি। যদিও আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার মত অচিন্তনীয় ও নিতান্ত ব্যক্তিক উপলব্ধি নিয়ে কোন জাতির অহংকার করার কারণ থাকতে পারে না। তবুও স্বদেশপ্রেমের আবেগ স্বাভাবিক চিন্তাধারাকে কতখানি প্রভাবিত করে তার প্রমাণ এতে মিলবে।

উনবিংশ শতাব্দীতে প্রকাশিত আরও কয়েকটি স্বদেশাত্মক প্রবন্ধগ্রন্থের আলোচনা কালেও কিছু কিছু নতুনত্ব দেখা যায়। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত এ জাতীয় একটি গ্রন্থের নাম—"জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা ও উন্নতি"। গ্রন্থকর্তা দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সাবিত্রী লাইব্রেরীর অধিবেশনে এই প্রবন্ধটি পাঠ করেছিলেন, পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

৬২. চন্দ্রনাথ বসু—কঃ পন্থাঃ, পৃঃ ৫১-৫২। ১৮৯৮।

বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ প্রাবন্ধিকের স্বদেশচর্চার মূলে জাতীয় চেতনা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থকার এ বিষয়টির ওপর আলোকপাত করেছেন,—

"যে জাতীয় দুর্গতি কীর্তন করিতে চায়, সে পরোক্ষভাবে জাতীয় উন্নতি চায়—অভ্যুত্থান চায়। নচেৎ সে দুর্গতির কথা কীর্তন করিতে যাইবে কেন?"[৬৩] [পৃঃ ১]

সমগ্র স্বদেশাত্মক প্রবন্ধরচনার মূলে যে জাতীয়উন্নতি কামনা রয়েছে—এই সত্য উপলব্ধি তিনি ব্যক্ত করেছেন। জাতীয়জাগরণ লগ্নে স্বদেশপ্রেমিক যখন সাহিত্যে দেশপ্রসঙ্গ উত্থাপন করেন—কোন না কোন উপায়ে স্বদেশপ্রেমে উদ্বোধিত করাই তাঁর আন্তরকামনা বলে মনে করা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র, রাজনারায়ণ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ স্রষ্টার এ জাতীয় রচনার মূল উদ্দেশ্য আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি,—আমাদের এ সিদ্ধান্তই সে যুগের কোন কোন প্রাবন্ধিকের রচনায় ব্যক্ত হয়েছে। সেদিক থেকেই আলোচ্য গ্রন্থটির বক্তব্য স্মরণীয়। প্রবন্ধকার দেবেন্দ্রনাথ বলেছেন,—

আমি স্বীকার করি, আমাদিগের জাতীয় সাহিত্য এখন শক্তি ও সম্পদাংশে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। তাহা হইলেও কি আমরা কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্র এবং মাইকেল ও হেমচন্দ্রের নামে স্পর্ধা করিতে পারি না? এবং রামমোহন, অক্ষয়-কুমার, বিদ্যাসাগর, কালীপ্রসন্ন, বঙ্কিমচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত ও দ্বিজেন্দ্রনাথ প্রভৃতির নামে আমাদের গৌরব পতাকা একবারের জন্যও আন্দোলিত করিতে সমর্থ হই না? অতএব বাঙ্গালি যদি জাতীয় গৌরব রক্ষা করিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কায়মনে জাতীয় সাহিত্যের সেবায় প্রবৃত্ত হও। [পৃঃ ২২—২৩]

এঁর বক্তব্যে যে আবেদন রয়েছে তা দেশবাসীকে স্বদেশাত্মক সাহিত্য সম্পর্কে সচেতন করে তোলারই প্রচেষ্টা। প্রকাশ্য কোনো অধিবেশনে লেখক যখন এ মন্তব্য করেন—লেখকের দেশচেতনা ও সদিচ্ছার পরিচয়টিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। জাতীয়সাহিত্য বহুল পরিমাণে রচিত হোক—এ ছিল তাঁর কামনা কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি জাতীয়সাহিত্যের বহুল প্রচারও কামনা করেছেন— এখানে তাঁর নিজস্ব দেশভাবনাই প্রতিফলিত। এই গ্রন্থটিতে লেখক জাতীয়সাহিত্য, জাতীয়ভাব, জাতীয়গৌরব ইত্যাদির ব্যাখ্যা করেছেন। জাতীয়সাহিত্যের সঙ্গেই জাতীয়ভাব মিশ্রিত থাকে। বিজাতীয় ভাবপ্রবাহ থেকে স্বদেশকে রক্ষা করার আবেদন জানিয়েছেন লেখক। Gibbon-এর একটি সার্থক উক্তি উদ্ধৃত করে লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে জাতীয় অভ্যুত্থান জাতীয় ভাবের অনুশীলন ছাড়া অসম্ভব। Roman Empire সম্বন্ধে

৬৩. দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, জাতীয় সাহিত্যের আবশ্যকতা ও উন্নতি,—১৮৯৫।

Gibbon বলেছিলেন –So Sensible were the Romans of the influence of the language over national manners, that it was their most serious care to extend with the progress of their arms, the use of the Latin tongue.

লেখকও এই আদর্শ অনুসরণের উপদেশ দিয়েছেন। জাতীয়ভাবের অনুশীলন ছাড়া জাতীয় অভ্যুত্থান অসম্ভব বলেই তিনি মনে করেন।

"আমাদিগের এই অধঃপতিত ও পরপদদলিত জাতির উদ্ধার করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্যের নিতান্ত প্রয়োজন। আমাদিগের এই বহু শতাব্দীর নিদ্রিত জাতির নিদ্রাভঙ্গ করাইতে হইলে,- ইহাকে একটা তেজোসম্পন্ন শক্তিসম্পন্ন জাতিরূপে পরিণত করিতে হইলে, জাতীয় সাহিত্যের যারপরনাই প্রয়োজন। [পৃঃ ২, ঐ]

এই 'অনুভব সেযুগের প্রতিটি দেশপ্রেমিকের অনুভব। স্বদেশপ্রাণতা জাতির মঙ্গলচিন্তায় অনুপ্রাণিত করেছে তাঁকে। উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয়চেতনা সম্পাদনের বিচিত্র আয়োজন হয়েছিল—তবু একশ্রেণীর জাতীয় চেতনাশূন্য মানুষ লক্ষ্য করেছিলেন তিনি। বিজাতীয় ভাব-ভাষা-আচারের অন্ধ অনুকরণকারী এই সম্প্রদায় স্বদেশপ্রেমী লেখকের নিন্দার পাত্র হয়েছেন সঙ্গত কারণেই। কখনও রূপকে, কখনও ব্যঙ্গে এঁদের চরিত্র মসীলিপ্ত। বঙ্কিমচন্দ্রই তীব্র লেখনী চালিয়েছিলেন এই সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে। দেবেন্দ্রনাথ আক্ষেপ করেছেন,—

"যে জাতীয়ভাবের অভাবে জাতীয় দুর্গতির অবসান হয় না,—যে জাতীয় ভাবের সম্বর্ধনা ও সমাদর ব্যতিরেকে জাতীয় অভ্যুত্থান কোন কালেই হইতে পারে না, নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, সেই জাতীয়ভাব আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ভিতর হইতে দিনদিনই অন্তর্হিত হইয়া যাইতেছে। আমার কণ্ঠ যতদূরে উঠিতে পারে, ততদূরে উঠাইয়া আমি বলিতেছি,—এই বিজাতীয় ভাবপ্রবাহ হইতে আমাদিগের দেশ ও সমাজকে রক্ষা করিতে হইলে—আমাদিগের মধ্যে জাতীয়তার উদ্বোধন ও আরাধনা আরও করিতে হইলে, আমাদিগের পক্ষে জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা যারপরনাই আবশ্যক।" [পৃঃ ২১—২২]

জাতীয় সাহিত্যের আলোচনার মাধ্যমে জাতীয়তাবৃদ্ধির উপায়টি তিনি জনসাধারণের অনুশীলনযোগ্য বলে মনে করেন।

বিজাতীয় ভাবানুসরণকে তিনি আন্তরিকভাবে নিন্দা করেন—এই মনোভাবটি স্বদেশপ্রেমিকের। বাংলা ভাষা অনুশীলনের প্রতি অধিক মনোযোগী হওয়ার উপদেশ দিয়েছেন লেখক। ভাবাবেগে প্লুত হয়ে তিনি বলেছেন,—

"আমি বলি বাঙ্গালীর নাম পর্যন্ত বিলুপ্ত হউক তাহাতে আমার আপত্তি নাই,

কিন্তু বাঙ্গালীর ভাষা ইংরাজি হউক, তাহাতে আমার ঘোর আপত্তি আছে।... বাঙ্গালীর ভাষা ইংরাজি হইয়া যাউক, তাহাতে আমার একান্ত আক্ষেপ আছে।”

ভারতবাসীর পক্ষে সর্বাপেক্ষা অপদার্থতার পরিচয় যদি কিছু থাকে, তবে তাহা এই যে, ভারতবাসী ইংরাজের লোহিত বর্ণ পতাকার নিম্নে আপনাদিগের হৃদয়ের চিন্তা ও মনের ভাব পর্যন্তও উৎসর্গ করিয়াছেন। ভারতবাসী বহির্দৃশ্যে হিন্দু হইলেও অন্তরে ইংরাজ হইয়াছেন। কেন হইয়াছেন? তাহার উত্তরে আমি বলি, ইংরাজি সাহিত্যের অবিশ্রান্ত আলোচনাই তাহার প্রধান কারণ।” [পৃঃ ৫৫]

দেবেন্দ্রনাথের এই স্বদেশপ্রীতি বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। ‘লোকরহস্যের’ ব্যঙ্গাত্মক রচনায় ইংরাজী আচারব্যবহারে অভ্যস্ত বাঙ্গালী সম্প্রদায় সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। এখানে দেবেন্দ্রনাথ অবশ্য অকপট সত্য ব্যক্ত করেছেন। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের আত্যন্তিক অনুরাগের নিন্দা করেছেন তিনি। স্বদেশপ্রেমের প্রথম উচ্ছ্বাস মাতৃভাষাপ্রীতিকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল। জাতীয় আন্দোলনের চরম লগ্নেও দেশপ্রীতি মাতৃভাষাকে অবলম্বন করেই ফেনায়িত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পর্ব থেকেই দেশপ্রেমমূলক প্রবন্ধ সাহিত্য রচিত হয়েছে —দেবেন্দ্রনাথ শুধু সেই সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। দেশপ্রেমমূলক সাহিত্য বহুল পরিমাণে প্রচার করার বাসনা নিয়ে বক্তৃতাকারে বিষয়টি তিনি প্রকাশ্য সভায় আলোচনা করেন। জাতীয় জাগরণের মুহূর্তে এ জাতীয় সাহিত্যের আলোচনা সুফল প্রসব করবে, —এই ধারণাটি যথার্থ। সম্ভবতঃ এই গ্রন্থটিতে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত মতটিকেই প্রচার করতে চেয়েছিলেন সে কারণেই তাঁর বক্তব্যে দেশসেবকের আদর্শ প্রতিফলিত হয়েছে।

এই শতাব্দীর প্রবন্ধ গ্রন্থে স্বদেশভাবনার যে অজস্র পরিচয় পেয়েছি—হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত ‘ভারতকাহিনী’ গ্রন্থটিতেও তার প্রমাণ মিলবে। ১৩০৭ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। দেশপ্রেম অবলম্বন করেই গ্রন্থকার “ভারত কাহিনী” গ্রন্থটির অবতারণা করেছেন। গ্রন্থটির আগাগোড়া লেখকের দেশপ্রীতির স্বাক্ষর বহন করছে। “জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী” উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক ভারতমাতার পাদপদ্মে গ্রন্থটি অর্পণ করেছেন। বিজ্ঞাপনে লেখকের উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে,—

“দেশের বিদ্বৎ সমাজে একজন লেখক কিংবা গ্রন্থকর্তা বলিয়া পরিচিত হইবার উচ্চকাঙ্ক্ষা আমাদের নাই এবং তদ্বিষয়ে সামর্থ্যেরও নিতান্ত অভাব, তবে এই পুস্তক, প্রণয়ন করিবার আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য এই যে ইহাতে যে সমস্ত বিষয় লিখিত হইল, আমাদের বঙ্গীয় কৃতবিদ্যগণ তাহার আলোচনা করুন এবং স্বদেশের উন্নতি

সাধন করিতে যত্নবান হউন। ইহা পাঠ করিয়া যদি একজনমাত্র বঙ্গীয় কৃতবিদ্যেরও মন আকৃষ্ট হয়,—তাঁহাদের একজনও স্বজাতি এবং স্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া দুঃখিনী জন্মভূমির সেবা করিতে কৃতসঙ্কল্প হয়েন, তাহা হইলেই আমাদের সমস্ত শ্রম সফল হইবে।"

এই মহৎ উদ্দেশ্য নিয়েই লেখক গ্রন্থ রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক দলিল প্রস্তুত করেছেন লেখক এবং জাতীয়ত্ব রক্ষার কিংবা বৃদ্ধির উপায়ও বর্ণনা করেছেন। গ্রন্থটি চিন্তাশীল রচনা। দেশের লোকের চৈতন্য সম্পাদনের ইচ্ছা থেকেই প্রবন্ধের জন্ম হয়েছে—সুতরাং দেশপ্রেমই রচনাটির মূল অবলম্বন। তাছাড়া গতানুগতিকভাবে বিচার না করে লেখক যুক্তিসঙ্গত কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন। বিদেশীপ্রভাব স্বীকার করার মনোবৃত্তি এদেশীয় লোকের চরিত্রে রয়েছে—যাকে আমরা জাতীয়চেতনার অভাব বলব। লেখক বলেছেন,—"আমাদের দেশে বিদেশীয় দ্রব্যাদির এত বহুল প্রচার যে কেবলমাত্র তাহা সস্তা এবং সুন্দর কিংবা কার্যোপযোগী বলিয়াই হইয়াছে, তাহা নহে, আমাদের মনুষ্যত্ব এবং স্বদেশহিতৈষীতার অভাবও তাহার একটা প্রধান কারণ।"[৬৪]

বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর ভাস্কর্য নিয়ে উচ্ছ্বাস প্রসঙ্গে আমাদের চীনাপুতুল প্রীতির নিন্দা করেছিলেন—এখানে লেখক সরাসরি অভিযুক্ত করেছেন। দেশচেতনার অভাবই আমাদের ব্যবহারে প্রতিধ্বনিত। এতদিন প্রকাশ্যে একথা অনেকেই বলেননি—লেখক অকপটে তা ব্যক্ত করেছেন। ভারতবাসী দেশসচেতন নয় বলেই অতি সহজে তারা প্রভাবিত হয়—জাতীয়চেতনা থাকলেই তারা আত্ম-মর্যাদা রক্ষায় সচেষ্ট হতে পারত। এই সমালোচনাকে পরোক্ষভাবে চরিত্রশোধনের চেষ্টা বলা যেতে পারে। লেখক বিশেষভাবে যা অনুভব করেছিলেন—তাই ব্যক্ত করেছেন,—

আমাদের আচরণ এইরূপ যে আমাদের নিজের দেশ পচুক, হাজুক মরুক—রসাতলে যাউক, তাহাতে ক্ষতি নাই, বিলাতী জিনিষে যে দুই এক পয়সা বাঁচে ও সুখ এবং সৌখিনীর প্রবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় পরিতৃপ্ত হয়, তাহার লোভ সম্বরণ করিতে আমরা সমর্থ নহি।" [পৃঃ ২৭ ঐ]

কোন জাতির দেশচেতনা দৈনন্দিন আচার ব্যবহার ও মনোভাবের মধ্যেই প্রতি-ফলিত হয়। ইংরেজ বা রোমান জাতির স্বদেশহিতৈষিতা জগদ্বিখ্যাত কিন্তু তার মূলকারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে সেখানে শুধু সমষ্টিগত ভাবেই নয় প্রতিটি

৬৪. হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারত কাহিনী, পৃঃ ২৬, ১৩০৭ সাল।

ব্যক্তির আচরণেই তা প্রকাশিত হয়। দেশপ্রেম একটি স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি, দেশপ্রেমী সাড়ম্বরে তা প্রচার করেন না; তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের মূলেই এই ভাবটি সক্রিয় থাকে। লেখকের অভিযোগ আমাদের চরিত্রের দীনতা সম্পর্কে। ইংরাজ চরিত্রের আদর্শটি লেখক হৃদয়ঙ্গম করেছেন কিন্তু দুঃখপ্রকাশ করেছেন ইংরেজের চারিত্রিক দৃঢ়তা ও স্বদেশপ্রেম আমাদের চরিত্রে নেই বলে। শিক্ষিত সম্প্রদায়ও গ্রহণযোগ্য সদ্‌গুণের দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে ব্যর্থ অনুকরণ করেছেন অবাঞ্ছিত গুণাবলীর। লেখকের এ অভিযোগ সেযুগের স্বদেশপ্রেমী মাত্রেরই অভিযোগ। একটি বলিষ্ঠ জাতিগঠনের স্বপ্ন যাঁরা দেখছেন তাঁদের পক্ষে এ জাতীয় মনোবেদনা প্রকাশ করাই স্বাভাবিক। লেখক বলেছেন, "আজকাল আমাদের কৃতবিদ্যদের মধ্যে এই প্রবৃত্তি কিছু বিশেষ বলবতী দেখা যায় বটে, কিন্তু আমরা বলি কি আমাদের যে কিছু হয় না কিম্বা হইল না, তাহাতে আমরাই সম্পূর্ণ দোষী। আমাদের আসলে কোন সামর্থ্য নাই, চেষ্টা নাই, উদ্যম নাই, স্বদেশহিতৈষণা নাই, আত্মসম্মানজ্ঞান নাই, নিজ দুর্দশায় ঘৃণা নাই, ভাল হইবার ইচ্ছা নাই, স্বাধীন হইয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করিব তাহার যত্ন নাই। মোট কথা আদৌ আমাদের স্বজাতীয়তা নাই, স্বজাতিপ্রিয়তা নাই অথবা প্রকৃত যোগ্যতা নাই, তাহাতেই আমাদের এরূপ দুর্দশা, তাহাতেই এমন রাজার অধীনস্থ হইয়া, সেই রাজচরিত্রে এমন বিপুল উদ্যমশীলতা, সাহস এবং স্বজাতীয়তার জলন্ত এবং জীবন্ত দৃষ্টান্ত সন্দর্শন করিয়াও আমরা কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। [ঐ। পৃঃ ৪৬]

প্রকাশ্যে এই জাতীয় দোষকীর্তনের মূলে লেখকের গভীর স্বদেশচিন্তাই প্রকাশ পেয়েছে। গতানুগতিক হলেও লেখকের বক্তব্যে যথেষ্ট দৃঢ়তা ও আন্তরিকতা রয়েছে। শিক্ষিত লোকের দৃষ্টিভঙ্গিকেও লেখক সমালোচনা করেছেন কারণ অশিক্ষিত দেশবাসীর মনে যাঁরা সত্যিকারের দেশপ্রীতি সঞ্চার করতে পারেন তাঁরাই পথভ্রান্ত হলে আক্ষেপের কারণ ঘটে। এ গ্রন্থে লেখকের সুগভীর দেশচিন্তার পরিচয় নানাভাবে প্রকাশ পেয়েছে। স্বদেশপ্রীতি স্বাধীন মনোবৃত্তি জাগিয়ে তোলে—কিন্তু অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের ওপরেই যথার্থ রাজনৈতিক স্বাধীনতা নির্ভর করে। স্বদেশপ্রেমের ভাবাত্মক আলোচনাই সাহিত্যে প্রধানভাবে স্থান পেয়েছে, কিন্তু 'ভারতকাহিনী' রচয়িতা হরিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় গঠনাত্মক পরিকল্পনার স্বপ্ন দেখেছিলেন। স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে দেশের যথার্থ পরিস্থিতি সম্বন্ধেও সচেতন করে তোলার দায়িত্ব পালন করেছেন লেখক,—

"এক্ষণে দেখ, তুমি তোমার পুত্রকে বি, এ পাশ করিয়াছে বলিয়া কৃষিকার্যে নিযুক্ত করিতে সংকোচ করিয়া থাক, মনে কর সেটা নীচ কর্ম, কিন্তু বিলাতে স্বয়ং

[স]ম্রাটপুত্রও সে কার্যে নিযুক্ত হইতে লজ্জা বোধ করেন না। সাধে কি ইংলণ্ড ইংলণ্ড [হ]ইয়াছে, আর আমাদের আজকালকার ভারত পথের কাঙ্গালিনী হইয়া উদরান্নের [জ]ন্য পরমুখাপেক্ষিনী হইয়া রহিয়াছে? হে ভারতবাসি ভ্রাতৃগণ। তোমাদিগকে [অ]ধিক কি বলিব, তোমাদিগকে ধিক্, শত ধিক্, তোমাদের বিদ্যাতেও ধিক্, বুদ্ধিমত্তাতেও ধিক্, মনুষ্যত্বেও ধিক্।" [পৃঃ ৫৩]

কোন স্বাধীন দেশের মনোবৃত্তির সঙ্গে পরাধীন ভারতবাসীর মনোভাবের তুলনা-মূলক আলোচনাকালে লেখক যে সত্য উদঘাটন করছেন—অন্য কোথাও এ আলোচনা পাওয়া যায় নি। এ অংশে লেখক জাতীয় মনোভাবের মূলে যে অনুদার দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে তারই সার্থক সমালোচনা করছেন। শিক্ষালাভ করেও এই মনোভাব দূর করা যায় নি—এটা আরও বেশী আক্ষেপের কথা। ভারতবর্ষের বর্তমান পরাধীনতার মূলে জাতীয় চরিত্রের কলঙ্কই মুখ্যতঃ দায়ী এ কথা বিশেষভাবে আলোচনার দিন এসেছে। জাতীয় আন্দোলন যখন ধীরে ধীরে রূপ লাভ করছে—আত্মদর্শনের জন্যও অন্ততঃ এ জাতীয় আত্মসমালোচনার প্রয়োজন রয়েছে। শুধু ভাবাত্মক আলোচনার সাহায্যে এ বিষয়টি স্পষ্ট করা সম্ভব নয়—লেখক এখানে যথার্থ গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন।

বাঙ্গালীর চাকুরীপ্রীতিকেও তিনি জাতীয় মনোভাববিরোধী বলে মনে করেছেন। স্বাধীনতার স্বপ্নকে একটি বাস্তবভূমিতে স্থাপন করার বাসনা নিয়ে লেখক বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছেন। দীর্ঘ আলোচনায় তিনি চাকুরীজীবী সম্প্রদায়ের মনোবিশ্লেষণ করেছেন—সর্বদাই যে সে বিচার যথার্থ হয়েছে—এমন বলা যায় না। চাকুরীপ্রাণ বাঙ্গালীর নিন্দা করে লেখক প্রমাণ করেছেন চাকুরী স্বদেশপ্রীতির অন্তরায় স্বরূপ।

"বাস্তবিক চাকুরী কার্যটা যে ঘোর দাসত্ব ইহাতে আজীবন নিযুক্ত থাকিলে মনুষ্যের সর্বপ্রকার মহৎ এবং উচ্চপ্রবৃত্তি নিয়ে যে একেবারে ডুবিয়া যায় তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তোমার সাহস উৎসাহ বুদ্ধি বিদ্যা এবং স্বদেশহিতৈষীতা খুব আছে, কিন্তু তুমি দিনকতক চাকুরী কর সে সমস্ত গুণ একটি একটি করিয়া ক্রমশঃ অদৃশ্য হইয়া যাইবে, তুমি মনুষ্য হইয়া একটি জড়যন্ত্রে পরিণত হইবে। চাকুরীতে হাজার তোমার পদোন্নতি হউক, পয়সা হউক, মান সম্ভ্রম হউক, তোমার দ্বারা আর দেশের কোন উপকার হইবে না।" [পৃঃ ১৯৫]

এই বক্তব্যের সত্যতা সন্দেহাতীত। তবে এর ব্যতিক্রম ঘটেছে শুধু প্রতিভাবানদের পক্ষেই। সে যুগের বুদ্ধিজীবী লেখকগোষ্ঠী চাকুরীজীবী ছিলেন কিন্তু চাকুরী এঁদের স্বদেশবোধ বিনষ্ট করে নি। এঁরাই সমগ্র জাতির জাতীয়চৈতন্য জাগিয়েছিলেন

শক্তিশালী রচনার মাধ্যমে। হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র বা বঙ্কিমচন্দ্রের নাম এ ব্যাপারে স্মরণযোগ্য। তবে এঁদের কেউই আন্দোলনের নেতৃত্ব করেন নি,—এ বিষয়টিও লেখকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। তিনি দুটি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন। রমেশচন্দ্র এবং সুরেন্দ্রনাথ উভয়েই বিলাত থেকে সিভিলিয়ান পরীক্ষান্তে দেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। লেখকের বক্তব্য,—

"সুরেন্দ্রনাথের জীবন পর্যালোচনা করিয়া দেখ। বাংলা অথবা সমগ্র ভারতবর্ষের সৌভাগ্য যে প্রথমাবস্থাতেই তাঁহার চাকুরী গিয়াছিল। কেন না, স্বাধীন হইয়া বিগত ২৫।৩০ বৎসর মধ্যে তিনি দেশের হিতের জন্য যে পরিমাণ কার্য করিয়াছেন, তাহার তুলনা হয় না।...যে অসামান্য বিদ্যাবুদ্ধি এবং সাহস উদ্যোগ কর্তৃক তাহার সচ্চরিত্র সুশোভিত চাকুরী করিলে সে সমস্ত চাপিয়া থাকিত, যেমন রমেশচন্দ্রের সম্পর্কে ঘটিয়াছে। [পৃঃ ১৯৫ এবং ১৯৭]

রমেশচন্দ্র আন্দোলনের নেতৃত্ব করেননি বলেই লেখকের আক্ষেপ কিন্তু রমেশচন্দ্রের অবদানও বড় কম ছিল না। দেশাত্মবোধের আবেগে প্রাণিত হয়ে তিনি যে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন—সক্রিয় আন্দোলনের নেতৃত্বদানের চেয়ে তা কম গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা যায় না। লেখক আন্দোলন পরিচালনাকেই শিক্ষিত বাঙ্গালীর প্রধান কর্তব্য বলে মনে করেছিলেন বলেই এই ভ্রান্ত ধারণা জন্ম নিয়েছিল।

এ গ্রন্থে লেখক আরও কিছু পরামর্শ দিয়েছিলেন যা পরোক্ষভাবে আমাদের দেশচেতনা বাড়িয়ে তুলবে। আত্মনির্ভর ও স্বদেশপ্রাণ জাতি বিদেশী দ্রব্যের প্রতি অনুরক্তি প্রকাশ করে না। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম স্তরে বিদেশীদ্রব্য বর্জনের আন্দোলন অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল—সেদিক থেকে হরিমোহনের এ আলোচনাটি অত্যন্ত মূল্যবান। লেখক একেই বলেছেন দেশহিতৈষিতা,

"বিলাতী জিনিষ ব্যবহারে আমাদের যে ভয়ানক আগ্রহ, তাহা কম হওয়া উচিত।...মোট কথা দেশজাত অথবা দেশীয় দোকানে বিক্রীত দ্রব্যাদি ব্যবহার করা সম্বন্ধে আমাদের জাতি সাধারণের একটু জিদ থাকা উচিত। তাহাই প্রকৃত দেশহিতৈষিতা। কিন্তু দুরদৃষ্টবশতঃ আমাদের ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত।... দেশীয় জিনিষ, হাজার সস্তা এবং মজবুত হউক, তাহা ঘৃণিত। একটা কোন নূতন জিনিষ খরিদ হইয়া আসিলে, ইহা বিলাতি বলিয়া আমরা গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকি, দেশী শুনিলেই শ্রোতারা বিমর্ষ হইয়া পড়েন।" [পৃঃ ২৩০]

আমাদের চরিত্রের এই লক্ষ্যণীয় ত্রুটির সম্বন্ধে ইতিপূর্বে এমন স্বচ্ছ আলোচনা চোখে পড়ে নি। স্বাধীনতা আন্দোলনের মূলমন্ত্র বিচক্ষণ চিন্তাবিদের মনে বহু পূর্বেই জেগেছিল, এ আলোচনা থেকে সেটুকুই প্রমাণিত হয়। বিদেশীয়ানায় অভ্যস্ত ও

সহজেই প্রভাবিত কোনজাতির চরিত্র থেকে এ জাতীয় দোষ ত্রুটি অপসারিত করা খুব সহজ নয়—কিন্তু সাহিত্যিক ও সমাজবিদ তাঁদের সাধ্যমত এ-প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন—'ভারত কাহিনী' গ্রন্থটি তার প্রমাণ। এই গ্রন্থটিতে সমাজচিন্তার গুরুতর কথাও লেখক ব্যক্ত করেছেন। ইংরেজ রাজত্বের অবসান আসন্ন, এমন ইঙ্গিত তাঁর রচনায় কোথাও কোথাও ধরা পড়েছে। সংঘবদ্ধ ও স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি একদিন স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়বে, এমন আভাসও তিনি দিয়েছেন। লেখকের উপদেশ,—

"অতএব আমরা বলি, তুমিও দল বাঁধিতে শিখ, যদি দেশের উন্নতি করিতে চাহ, পতিতা জন্মভূমিকে আবার উঠাইতে চাহ, তাহা হইলে দল বাঁধ। দল বাঁধিবার জলন্ত দৃষ্টান্তও তুমি আজকাল নিজ সম্মুখেই পাইয়াছ, খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দীর দেদীপ্যমান সভ্যতা ত তোমাকে তাহা সহস্র রকমে শিক্ষা দিতেছে, তোমার রাজা ইংরাজ ত আজ তোমাকে তাহা শিক্ষা দিবার জন্যই তোমার ঘরে বর্তমান, যদি খৃষ্টীয় উনবিংশ শতাব্দির ন্যায় এমন সুসময়ে এবং ইংরেজ হেন কৃতী অথচ প্রজাবৎসল এবং দয়াময় রাজার অধীনস্থ হইয়া তুমি আপনার কিছু করিয়া লইতে না পার, তবে আর তোমার আশা কোথায় ?" [পৃঃ ২৯৭—২৯৮]

এই সংঘবদ্ধতার প্রত্যক্ষ আহ্বান প্রবন্ধে সুকৌশলে ব্যক্ত করেছেন লেখক।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত এই প্রবন্ধগ্রন্থটিতে উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর মানসিক চিন্তাধারার যথার্থ অগ্রগতির সংবাদ রয়েছে। গ্রন্থকারের নির্ভীকতা পূর্বের প্রবন্ধে প্রকাশিত হতে পারে নি—তার বহু কারণ বর্তমান। হরিমোহন যে সংঘবদ্ধতার কথা প্রকাশ্যে বলেছেন—স্বাধীনতাকামীবাঙ্গালী সংগঠনের মাধ্যমে দেশোদ্ধারের চেষ্টা ইতিপূর্বেই করে চলেছিল—সে সংবাদ খুববেশী গোপনও ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' যে ইঙ্গিত ছিল—বাস্তবজীবনে তার রূপায়ণের জন্য একটা সচেষ্টতা জাতির চরিত্রে প্রত্যক্ষ করেছিলেন লেখক। তাই ঐক্য, পুনরুত্থান ও স্বাধীনতার সংগ্রামের আহ্বান প্রবন্ধে ধ্বনিত হয়েছে প্রকাশ্যভাবে। গ্রন্থটির বিশেষত্বও এখানে। তবে স্বদেশপ্রাণ লেখক আশাবাদ পোষণ করেছেন আবার জাতীয় চরিত্রের দৈন্যও তাঁকে পীড়া দিয়েছে। মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত লেখক অ্যানি বেশান্তের জীবনাদর্শের কথা শুনিয়েছেন,

"তিনি স্ত্রী, আর আমরা পুরুষ, তিনি পরদেশ এবং পরজাতির জন্য নিজের প্রাণ বিসর্জন করিতে প্রস্তুত, আর আমরা পুরুষ, গৃহে গৃহিণীর অঞ্চলের নিধি হইয়া, বাহিরে মুনীবের নিমকের চাকর হইয়া, পর প্রসাদলব্ধ অন্ন বস্ত্রের দ্বারা, ছার পাশবিক জীবন অতিবাহিত করিয়া, আপনার ধর্মকর্ম পরিত্যাগ পূর্বক মেটিয়াফুল সাজিয়া, ফ্লুট

হারমোনিয়ম বাজাইয়া এবং থিয়েটর সন্দর্শন করিয়া কালহরণ করিতেছি। হায় ভারত এবং হায় ভারতবাসির দেশহিতৈষীতা। [পৃঃ ৩০২]

সমালোচনা করে জাতীয় চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা স্বদেশপ্রেমিকের রচনায় দেখা যায়। হরিমোহনও স্বদেশপ্রেমিক—স্বদেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই তাঁর কাম্য—স্বদেশের উন্নতিতে তিনি আনন্দিত—স্বদেশবাসির অধঃপতনে তিনি মর্মান্তিক দুঃখিত। সুদীর্ঘ এই প্রবন্ধ গ্রন্থে হরিমোহন সমসাময়িক বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালীর জাগরণের যে তথ্য পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন তথ্যের দিক থেকে তা মূল্যবান। সামাজিক দুর্নীতি ও বাঙ্গালীর স্বভাবগত দুর্বলতার সমালোচনা করে লেখক পরোক্ষভাবে জাতীয় অনুরাগ বৃদ্ধি করার চেষ্টা করেছেন।

॥ চতুর্থ অধ্যায় ॥

কাব্য

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত—

যুগচিহ্নের সমস্ত লক্ষণ নিয়েই উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলা কবিতার চর্চা চলেছে। সাহিত্যের আসরে এই কাব্যকবিতাই ছিল এতদিন একচ্ছত্র রাজত্বের অধিকারিণী,—ধর্মতত্ত্ব থেকে শুরু করে নির্ভেজাল উপদেশামৃত কিংবা গভীরতম প্রেমতত্ত্ব থেকে চটুল হৃদয়াবেগের রহস্যকথাকে প্রকাশ করে কাব্য তখনও স্বচ্ছন্দগতি তটিনী—কলোচ্ছ্বাসে মুখর। রামায়ণ-মহাভারত-বৈষ্ণবপদাবলী—মঙ্গলকাব্যের সমস্ত গভীর সত্য, অগভীর চিত্রাঙ্কনে সাবলীল বাংলা কবিতার প্রকাশক্ষমতায় আমরা নিঃসন্দেহ। আলংকারিক যে কোন রস প্রকাশেরও কোন রকম বাধাই ছিল না। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের কবিকুলের সমস্ত হৃদয়াবেগ ধারণ করে বাংলা কাব্যসম্ভার এতদিন রসিক জনকে তৃপ্তি দিয়ে এসেছে।

কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে সৌন্দর্যসমৃদ্ধ কাব্যলক্ষ্মীর দৈন্যদশা আমাদের দৃষ্টি এড়ায়নি। বিষয়বস্তুর একঘেঁয়েমি, বক্তব্যের পৌনঃপুনিকতা, কল্পনার গতানুগতিকতায় আমরা প্রায় বিরক্ত আর প্রতিভাদীপ্ত কবির বদলে কাব্যব্যবসায়ী কবিওয়ালাদের সদর্প পদচারণায় কাব্যলক্ষ্মীর মুমূর্ষু মুহূর্ত প্রায় সমাগত। এমন সময়ে দৃষ্টিভঙ্গীর নতুনত্ব নিয়ে, বক্তব্যের বৈশিষ্ট্য নিয়ে ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাব। কবিওয়ালাদের উত্তরসাধকরূপে এঁর পরিচিতি থাকলেও বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এঁর বিশেষ বক্তব্য কিংবা বক্তব্যের নতুনত্ব মনকে না ভাবিয়ে পারে না। ইংরেজ রাজত্বের প্রতিষ্ঠাযুগে জন্মেছিলেন বলেই প্রাচীন ভাবধারার সঙ্গে নবলব্ধ রাজনৈতিক চেতনাকেও ইনি জন্মসূত্রেই লাভ করেছেন। পূর্বেই বলেছি রাজনৈতিক চেতনাশূন্য যে অতীত ইতিহাসের মধ্যে আমাদের সাহিত্যের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে উনবিংশ শতাব্দীতে তার অস্তিত্ব ভুলে থাকার কোন উপায়ই ছিল না। যে স্বদেশচেতনা এতদিন অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই নিরুদ্ধগতি ও স্তব্ধবাক হয়েছিল—ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার আলোকে নতুন ভাবে তাকেই সাহিত্যের উপজীব্য করে তুলতে আমরা প্রায় বাধ্যই হয়েছিলুম। বিশেষ করে সংবাদপত্রসংশ্লিষ্ট কোন সাহিত্যসেবীর পক্ষে স্বদেশচেতনা বিস্মৃত হয়ে কোন কিছু রচনা করা প্রায় অসম্ভবই ছিল। ঈশ্বরগুপ্তের সাংবাদিক সত্তায় জাতীয়-চেতনার উন্মেষ ঘটেছিলো আর তাঁর কবিতায় সেই চেতনাটিই প্রায় একাত্মরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। দৃষ্টিভঙ্গির এই বিশেষত্ব বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে প্রথম প্রয়োগ

করেছেন ঈশ্বরগুপ্তই --তাঁর স্বদেশপ্রেমসম্পর্কিত কবিতাবলীর আলোচনায় তাঁকে অন্ততঃ এক্ষেত্রে প্রথম আগন্তুক হিসেবে মেনে নিতে হবে।

যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায় কাব্য-সাহিত্যের জন্ম—দেশপ্রেম বা জাতীয় চেতনাকে সেই অলৌকিক, রহস্যময়, অনির্বচনীয় প্রেরণা বলে দাবি করা যায় না। সাহিত্যের মধ্যে দেশপ্রেম আসে সাময়িকতার দাবি নিয়ে আবার সাময়িকতার দাবিটুকুই একমাত্র সম্বল বলেই সাহিত্যে দেশপ্রেমের স্থান সঙ্কুচিত। সাহিত্যবিচারে একে খুব বড়ো মর্যাদাও দেওয়া হয় না। বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেম স্থান লাভ করেছে ঈশ্বরগুপ্তের যুগেই। বিশুদ্ধ সৌন্দর্যবোধের প্রেরণায়, অলৌকিক রহস্যবোধের হাতছানিতে নিশ্চিন্তমনে কলম ধরা সে যুগে প্রায় অসম্ভাবিত ছিল। রাজপোষকতায়, ধর্মচেতনায় আত্মসমাহিত হয়ে কিংবা জনগণের কাছে সংগীতাকারে কাব্য পরিবেশনের সেই নিরবকাশ সুযোগের পথ রুদ্ধ হয়েছিলো বহুদিন। রাজনৈতিক চেতনার ক্ষীণতম প্রভাবও সেদিন কবিচিত্তকে আলোড়িত করে নি, কারণ জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে শাসক সম্প্রদায়ের কোনরকম ভাববিনিময়ের প্রয়োজনও ছিল না। শাসক ও শাসিতের জীবনে কোন যোগাযোগ না থাকলেও অসুবিধা ছিল না, কিন্তু শাসকের প্রতি নিষ্ঠা ও আনুগত্যের অভাববোধ যে জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, বিপ্লব ঘটাতে পারে এ বিষয়ে কোন মানুষেরই জ্ঞানাভাব ছিল না। তাই নির্বিচার আনুগত্য, অপরিসীম রাজপ্রীতি প্রদর্শন করেই সে যুগের সাধারণ মানুষ অভ্যস্তজীবন নির্বাহ করেছে। মধ্যযুগের কাব্যসম্ভার রাজানুগত্যে আনত না হলেও রাজপ্রসঙ্গে অপরিসীম নিস্পৃহ মনোভঙ্গী প্রদর্শন করেছে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর সাংবাদিক ঈশ্বরগুপ্ত যখন কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হলেন তখন তিনি পূর্ণমাত্রায় দেশসচেতন। বাংলা কাব্যেও এই দেশসচেতনতার পরিচয় দান প্রসঙ্গে কোন সমালোচক মন্তব্য করেছেন,—

১৮৩০ হইতে ১৮৯৬ পর্যন্ত এ পর্বের বাংলা কাব্যকে জাতীয় আন্দোলনের কাব্য বলা যাইতে পারে। এ যুগের কাব্যের লক্ষ্য অনির্দেশ্য সৌন্দর্যলোকে নয়, জাতীয় আদর্শ প্রচারের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করিয়া এই যুগের কাব্যের লক্ষ্যকে ভিন্নমুখী করা হইয়াছে। যে কাব্য লঘুপক্ষ বিস্তার করিয়া শূন্যাভিমুখী হইবে সেই কাব্যের স্কন্ধে গুরু বস্তুভার ঝুলাইয়া দিয়া তাহাকে বাস্তব জগতের দিকে টানিয়া রাখা হইয়াছে।

[আধুনিক বাংলা কাব্যের ভূমিকা—তারাপদ মুখোপাধ্যায়]

ঈশ্বরগুপ্তের যুগে সমাজের প্রাচীন জীবনধারার বনিয়াদ অবিন্যস্ত বিপর্যস্ত। রাজা ও প্রজা এ যুগে মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। জীবনযাপনের কোন ক্ষেত্রেই রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ ভুলে থাকলে চলে না। বিশেষতঃ নগরজীবনে শাসক ও শাসিত

অনেক ক্ষেত্রেই ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে—সভাসমিতি, আইন সম্বন্ধে জনচেতনা সংগ্রহ, শিক্ষাদীক্ষাক্ষেত্রের সর্বত্রই শাসক জনগণের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে। বিশেষতঃ সংবাদপত্রই দেশের সর্বত্র শাসক ও শাসিতের সম্পর্ক সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছে মানুষকে। পল্লীগ্রাম সম্পর্কে একথা সত্য না হলেও নগরকেন্দ্রিক জীবনে এই সম্বন্ধকে নিস্পৃহ ভঙ্গিমায় ভুলে থাকার কোন উপায় ছিল না। ঈশ্বরগুপ্ত নগরজীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন বলেই তৎকালীন রাজনীতিতে তাঁর সক্রিয় চেতনা যুক্ত করেছিলেন। সাংবাদিকের দায়িত্বের সঙ্গে কবিমনের ভাবনাকে যুক্ত করতে তিনি দ্বিধা করেন নি।

সুতরাং প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভাবমগ্ন সৌন্দর্যসৃষ্টিতেই কবিরা আত্মনিমগ্ন। কাব্যসম্ভারের অতুলনীয় রস আস্বাদনে রসিকমন তৃপ্ত। ঈশ্বরগুপ্তের পরেও কবিচিত্তের একান্ত নিবিড় অন্তর্দৃষ্টির সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি—কিন্তু জীবন, বিশেষ করে নগর-জীবন সচেতনতা থেকে তা মুক্ত নয়। বাংলা কাব্যের অতি গাঢ় রহস্য প্রকাশের মধ্যেও কবিচিত্তের সেই চণ্ডীদাসী নিমগ্নতা কিংবা মুকুন্দরামী নিস্পৃহতা নেই। সমাজ ও রাষ্ট্র সচেতনতার ছায়াপাত কবিচিত্তকে দেশ-কাল নিরপেক্ষ নির্দ্বন্দ্ব-নিশ্চিন্ত মনে কাব্যরচনার অবসর দেয় নি। ঈশ্বরগুপ্ত অবশ্য রাষ্ট্রচেতনার বেদীমূলে কবিচিত্তের কোমল স্বপ্নবিহারীসত্তাকে বলি দিয়েছেন অথবা কোন কোন সমালোচকের মতে তাঁর মধ্যে স্বপ্নময় কবিসত্তা ও অলৌকিক কাব্যক্ষমতার অভাব ছিল। তবুও, কাব্যের ক্ষেত্রে নাগরজীবনচেতনার তীক্ষ্ণ অনুভূতিরসে তাঁর কবিতা আকীর্ণ। বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের কাব্য হিসেবে তাঁর সমগ্র কাব্যকে বিচার করা যায় না কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে, কাব্যের ক্ষেত্রে প্রথম রাষ্ট্রসচেতন ও দেশপ্রেমী কবি হিসেবেই ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যবিচার করব। এ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কিত আলোচনার কিয়দংশ উদ্ধার করি।

"যাঁহারা বিশেষ প্রতিভাশালী, তাঁহারা প্রায় আপন সময়ের অগ্রবর্তী। ঈশ্বরগুপ্তও আপন সময়ের অগ্রবর্তী ছিলেন। আমরা দুই একটি উদাহরণ দিই—প্রথম, দেশ-বাৎসল্য পরমধর্ম, কিন্তু এ ধর্ম অনেকদিন হইতে বাংলাদেশে ছিল না। কখনও ছিল কি না, বলিতে পারি না। এখন ইহা সাধারণ হইতেছে, দেখিয়া আনন্দ হয়, কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের সময়ে, ইহা বড়ই বিরল ছিল। তখনকার লোকে আপন আপন সমাজ, আপন আপন জাতি, বা আপন আপন ধর্মকে ভালবাসিত, ইহা দেশবাৎসল্যের ন্যায় উদার নহে—অনেক নিকৃষ্ট। মহাত্মা রামমোহন রায়ের কথা ছাড়িয়া দিয়া রামগোপাল ঘোষ ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে বাঙ্গালা দেশে দেশবাৎসল্যের প্রথম নেতা বলা যাইতে পারে। ঈশ্বরগুপ্তের দেশবাৎসল্য তাঁহাদিগেরও কিঞ্চিৎ পূর্বগামী। ঈশ্বরগুপ্তের

দেশবাৎসল্য তাঁহাদের মত ফলপ্রদ না হইয়াও তাঁহাদের অপেক্ষা তীব্র ও বিশুদ্ধ।”[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য থেকে এটুকু বোঝা যায় যে ঈশ্বরগুপ্তের দেশবাৎসল্য সে যুগের পটভূমিকায় প্রথম উচ্চারিত একটি বলিষ্ঠ অনুভূতি। ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে সে যুগের সক্রিয় রাজনীতিবিদদের তুলনা প্রসঙ্গেও একথা মেনে নেওয়া হয়েছে যে, ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর এই নতুনতম অনুভূতির ক্ষেত্রে এবং কাব্যে তা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রথম। এ যুগের সমালোচকও একথা মেনে নিয়েছেন বিনা দ্বিধায়।

“ঈশ্বরগুপ্তই প্রথম সমাজ, রাষ্ট্রসমস্যা এবং কাব্যকে একসূত্রে গ্রথিত করেন, কিন্তু বাহ্যত ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের পর হইতে কাব্য রসপ্রধান হইল।”

[ঐ, তারাপদ মুখোপাধ্যায়]

কখনও কখনও এই চেতনাপ্রকাশে তিনি তীব্র ও বলিষ্ঠ মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর দেশপ্রেমমূলক কবিতাগুলির মধ্যে নিবিড় আন্তরিকতারও অভাব ছিল না। গতানুগতিক ও ধারাবাহিক বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাবকে একদিকে যেমন অভিনব বলে মনে হয়, অন্যদিকে তাঁর এই অভিনব মনোভঙ্গিমাকে স্বাভাবিক বলে বিশ্লেষণ করা যায় সহজেই। এজন্য ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাবকে অনেকেই অবশ্যম্ভাবী ও অমোঘ বলে মেনে নিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যে ঈশ্বরগুপ্তের কবিকীর্তিকে অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে অভাবনীয় বলে মনে হয়।

ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রীতিকে সহজাত বলে মেনে না নিলেও সাহিত্যপ্রীতিকে সহজাত বলেই স্বীকার করতে হয়। দেশপ্রেমকে মানবহৃদয়ের গভীরতম অনুভূতির সঙ্গে এক করে দেখার উপায় নেই—কারণ দেশপ্রেমের অনুভূতির সঙ্গে আত্মিক দ্বন্দ্ব বা প্রীতির কোন স্বাভাবিক সংযোগ নেই। মানবচিত্তের আশা-নৈরাশ্য, প্রেম, ভালবাসার নিগূঢ় আনন্দবেদনাকে তাই গভীরতর উপলব্ধির সঙ্গে সহজেই মিশিয়ে দিতে পারি—কিন্তু দেশপ্রেমকে ঠিক ততখানি অন্তর্লীন ও আলোড়নসমর্থ অনুভূতির মর্যাদা দিতে পারি না। তবে দেশপ্রেম বা বিশ্বপ্রেম মানবচিত্তের চিন্তাভাবনার একটি প্রধান অংশ হয়ে উঠতে পারে কোন কোন ক্ষেত্রে। যেমন ঈশ্বরভক্তি কিংবা অধ্যাত্মচেতনাও—জীবনের অপরাপর অনুভূতিকে তুচ্ছ করে সম্পূর্ণরূপে বৃহৎ ভূমিকা নিয়ে, প্রচণ্ড আবেদন নিয়ে উপস্থিত হতে পারে ; এবং তা হয়েছেও।—বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে

১। বঙ্কিম রচনাবলী। সমগ্র সাহিত্য। ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব। সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা ১৩৭১।

বিশুদ্ধ দেশপ্রেম কিংবা অধ্যাত্মপ্রেমও সাহিত্যের বিষয় হয়েছে। তবু মনে হয়, হৃদয়ের নিগূঢ় রহস্যানুভূতি, সৌন্দর্যপ্রীতির সঙ্গে দেশপ্রেমচেতনা কখনই সাহিত্যের ক্ষেত্রে সমান স্থান দাবি করতে পারে না। খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করে এ প্রসঙ্গে একজন সমালোচক বলেছেন,—Patriotism, or love of country, is a theme that has been hardly less engaging to literature than the eternal inspiration of the seasons and beauty's passing, and the approach of death, or the love of woman itself.······

Sometimes it is true, the love of country takes on a strange and almost unrecognisable character.[২]

ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেমচেতনার বিশুদ্ধতার কতকগুলি নিঃসংশয় প্রমাণ আছে। সাহিত্যসৃষ্টির সহজাতশক্তি নিয়ে আবির্ভূত হয়ে তিনি সাহিত্যপ্রীতিরও পরিচয় দিয়েছেন নানাভাবে। মাতৃভাষার নিখাদ স্পর্শমণি দিয়ে তিনি শ্লথ ও অলংকার-পীড়িতা বাংলাভাষাকে সঞ্জীবিত করবার প্রয়াস করেছেন। তাই ঈশ্বরগুপ্তের বাংলা "খাটি বাংলা" এবং ঈশ্বরগুপ্তও 'খাঁটি বাঙ্গালী' কবি বলে পরিচিত। তৎকালীন যুগে মাতৃভাষার মর্যাদায় বিশ্বাসী ঈশ্বরগুপ্তের দেশচেতনার স্পষ্টতর প্রথম প্রমাণ এটি। তাছাড়া সাহেবীয়ানার প্রতি মোহ, স্বেচ্ছাচারের প্রতি দ্বিধাহীন কটাক্ষপাতে তিনি সর্বদাই মুখর। আপাতঃদৃষ্টিতে সামাজিক দোষ-ত্রুটির প্রতি ইঙ্গিতময় এই কবিতাগুলিকে নিছক সাংবাদিক মনোবৃত্তিসঞ্জাত বলেই মনে হতে পারে কিন্তু সামগ্রিক বিচারকালে এই সামাজিক কবিতাগুলির উৎসমূলে অপ্রচ্ছন্ন এবং সুস্পষ্ট দেশচেতনাও চোখে পড়ে বৈকি। তাছাড়া প্রাচীন কাব্যাঙ্গিকের আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়েও ঈশ্বরগুপ্ত সহৃদয়চিত্তে তাঁর পূর্বসূরীদের জীবন-বৃত্তান্ত প্রকাশের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তাঁকে কবিওয়ালাদের শেষ প্রতিনিধি বলে অভিহিত করলেও কবিওয়ালাদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে তাঁর কাব্যবিচার কিংবা কবিমানসের বিচার চলে না। কিন্তু সাহিত্যাকাশে ক্ষণকালের আগন্তুক এই কবি-গোষ্ঠীকে জনসমক্ষে প্রতিষ্ঠা করে ঈশ্বরগুপ্ত বাঙ্গালীপ্রীতি, বাংলাসাহিত্যপ্রীতির এক নতুন নিদর্শন স্থাপন করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গে তাঁর স্বাজাত্যপ্রীতির চরম নিদর্শন হিসেবে এ প্রসঙ্গটির ওপরই জোর দিয়েছেন। বলা বাহুল্য ঈশ্বরগুপ্তের প্রাপ্য সম্মানই তিনি লাভ করেছেন।

ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যবিচার প্রসঙ্গে তাঁর স্বদেশচেতনার পরিচয়দানই আমাদের

২। John Drinkwater, Patriotism in Literature, London, 1924, P-11.

উদ্দেশ্য। কিন্তু তাঁর মনোভঙ্গিমার বিশিষ্টতা থেকেই স্বদেশপ্রাণতার ছাপটি সুস্পষ্ট-রূপে আবিষ্কার করা যায়; সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেই প্রখ্যাতযশা ঈশ্বরগুপ্তের আবির্ভাব। সাংবাদিক-সাহিত্যিক হিসেবেই তাঁর অনন্য পরিচয়। সংবাদপত্র পরিচালনার ক্ষেত্রেই স্বভাবজ কবিপ্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত আত্মবিকাশপর্ব। তাঁর অগণিত কবিতা সংবাদপত্রে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে—কিন্তু 'কবিতা সংগ্রহে' যে কবিতাগুলি স্থান পেয়েছে তার বিচার করলেই মোটামুটি স্বদেশপ্রেমিক ঈশ্বরগুপ্তের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। বঙ্কিমচন্দ্রের সুনিপুণ সম্পাদনায় ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা সংগ্রহের প্রথম খণ্ডটি প্রকাশিত হয়, পরে সেই আদর্শেই দ্বিতীয় খণ্ডটিরও আত্মপ্রকাশ ঘটে। ঈশ্বর-গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহের মধ্যে যে বিচিত্র সম্ভার, তা আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নয়—কিন্তু স্বদেশপ্রেমের বাণীবহনকারী কবিতাগুচ্ছই আমাদের আলোচ্য। এ হিসেবে তাঁর কবিতাকে দুটি ভাগে ভাগ করা চলে।

১। বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমের কবিতা, ২। প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রেমের কবিতা।

১। বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমের কবিতা—যে কবিতা পড়লে সেই মুহূর্তের জন্য স্বদেশ-চিন্তার বিশুদ্ধতায় মন পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে—ঈশ্বরগুপ্তের সেই কবিতাগুচ্ছকেই আমরা বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমের কবিতার অন্তর্ভুক্ত করতে পারি। যে কবিতায় কবির আত্মপ্রকাশ কুণ্ঠিত নয়,—স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণাতে নির্ভীক কবিকণ্ঠ যেখানে দেশপ্রেমোচ্ছল হয়ে উঠেছে,—সেই কবিতাগুচ্ছই ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রেমের জ্বলন্ত নিদর্শন হয়েছে। এ ধরণের কবিতার সংখ্যা তাঁর বিপুল সৃষ্টির তুলনায় নগণ্য বলা যায়। সচেতন ভাবে দেশপ্রেমে উদ্বেল হয়ে ওঠার পক্ষে একজন পরাধীন সাংবাদিকের যত বাধা থাকে, ঈশ্বরগুপ্তেরও সেই বাধা ছিল। সুতরাং বিপুল আবেগে যে কথা বলবার জন্য স্বদেশপ্রেমিক ঈশ্বরগুপ্ত আকুল হয়েছিলেন—সাংবাদিক ঈশ্বরগুপ্তের সাবধানতায় তিনিই আবার সন্ত্রস্ত সংকুচিত হতে বাধ্য হয়েছেন। কবিকর্মের সিদ্ধির পথেও এই দ্বিধাখণ্ডিত চেতনা বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিশুদ্ধ স্বদেশচেতনার দ্রবরসে সিক্ত কবিচিত্তটি বারবারই বাস্তব চেতনার আঘাতে নির্জীব হয়ে গেছে। সুতরাং ঈশ্বরগুপ্তের বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমের কবিতাতেও সেই অজগর নির্ঘোষ নেই, নজরুলী হুহুংকার ত দূরের কথা। সেই যুগের প্রেক্ষাপটে স্বদেশচিন্তার নিবিড় আবেগ আশা করা অন্যায়। স্বদেশচিন্তার মধ্যে খানিকটা আক্ষেপ, খানিকটা হতাশা এই ছিল যথেষ্ট। এই জাতীয় কবিতার মধ্যেও যে জনচিত্ত আলোড়নের প্রচণ্ড শক্তি নিহিত থাকতে পারে—কবিরা অন্ততঃ সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। ঈশ্বর-গুপ্তের বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতার মধ্যেও দেখি একটা দৈন্যবোধ, হতাশা, নৈর্ব্যক্তিক নির্লিপ্তি। স্বদেশচিন্তার বিশুদ্ধতা সে কবিতায় মেলে—কিন্তু তার বেশী

কিছু নয়। স্বদেশপ্রেমের প্রসঙ্গ কবিতায় প্রকাশ করার ঐকান্তিক বাসনাটুকুই কবিতাগুলিতে সোচ্চার,—এ ছাড়া কবিমনের অন্যকোন পরিচয় স্পষ্ট হয়নি কোথাও। সমালোচকের ভাষায়,—"এ জাতীয় কবির কাব্যে—তাহাদের সমগ্র শক্তি যেন সুলভ উচ্ছ্বাসবহুল দেশাত্মবোধের বাণী প্রচারেই নিঃশেষিত হইয়াছে—"

[ঐ, তারাপদ মুখোপাধ্যায়]

যেন এই চিন্তা নিতান্তই আত্মকেন্দ্রিক-ব্যক্তিগত কিছু। স্বদেশপ্রেম ব্যক্তিগত অনুভূতি হতে পারে কিন্তু স্বদেশপ্রেমীর মধ্যে বহুচিত্তের চিন্তাভাবনা মিলিত হয়ে থাকে। ব্যক্তিগত নির্লিপ্তির মধ্যে আত্মনিমগ্ন থাকাটা সেখানে সম্ভব হয় না,—ব্যক্তি নির্বিশেষ আবেদনে তা ভাস্বর। ঈশ্বরগুপ্তের অনন্য দেশপ্রেম ও উদ্‌ভাবনী শক্তি থেকেই এই শ্রেণীর দেশপ্রেমের কবিতাগুলি জন্ম নিয়েছিল—কিন্তু কবি নিজেও এ জাতীয় কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না। ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেমের নিগূঢ় দ্রবরসে পরিষিক্ত কবিতাগুলির সংখ্যা খুব বেশী নয়। তার মধ্যে মাতৃভাষা, স্বদেশ, ভারতের ভাগ্যবিপ্লব, ভারতের অবস্থা, কুরীতি সংস্কার ইত্যাদির নামই উল্লেখযোগ্য।

মাতৃভাষা প্রসঙ্গে ঈশ্বরগুপ্ত আশাবাদী ও সশ্রদ্ধচিত্ত। ইংরাজীভাষার প্রসার ও প্রচারে বীতরাগ না হয়েও ঈশ্বরগুপ্ত মাতৃভাষার প্রেমে মগ্ন ছিলেন। ইতিপূর্বেও বিদেশী ভাষার সংস্পর্শে এসেছি আমরা;—ফারসী, আরবী, উর্দু শিক্ষার প্রচলন তখনও সর্বত্র। ভারতচন্দ্রের নিবিড় সংস্পর্শ ঘটেছিল আরবী, ফারসীর সঙ্গে। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষার প্রথম পর্ব থেকেই ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি যে আগ্রহ দেখা দেয়—ফারসী ও আরবীর তুলনায় তা অভূতপূর্ব বা অচিন্তিত বলা যায়। ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার যে বিপুল আয়োজন দেখা গেছে—তাতে প্রথমদিকে মাতৃভাষার প্রাধান্য বা মর্যাদা কোনটাকেই বড়ো বলে মনে করা হয় নি। বিশেষ করে ইংরাজসরকার প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থায় যেভাবে ইংরাজীর প্রচলন শুরু হয়েছিল তাতে মাতৃভাষা বাংলার দৈন্যাবস্থা বেশ স্পষ্টভাবেই দেখা যেত। ইংরাজীভাষায় কিছু জ্ঞান লাভ করে মাতৃভাষাকে অবজ্ঞা করার মতো বাচালতাও সেযুগে বিরলদৃষ্ট ছিল না। সুতরাং কবিদের মধ্যে মাতৃভাষাপ্রীতির নিদর্শন স্বরূপ মাতৃভাষার মহিমা প্রচারের প্রয়োজন তখন নিশ্চয়ই ছিল। দেশপ্রেমের সর্বপ্রথম স্তরে মাতৃভাষাপ্রীতি তাই কবিতার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়েছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কেউ কেউ আবার মাতৃভাষার মূল্যের উপর গুরুতর প্রবন্ধ বা প্রস্তাব রচনা করেছেন ঠিক সেই কারণেই। ঈশ্বরগুপ্ত বোধহয় মাতৃভাষার মর্যাদাবোধ জাগানোর জন্যই বলেছেন,—

"মাতৃসম মাতৃভাষা পুরালে তোমার আশা, তুমি তার সেবা কর সুখে।" [মাতৃভাষা] কিংবা 'স্বদেশ' কবিতায় বলেছেন, "বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা। পুরাও তাহার আশা, দেশে কর বিদ্যাবিতরণ।" ঈশ্বরগুপ্ত মাতৃভাষা ও সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক ছিলেন। বহু ব্যঙ্গকবিতায় তিনি আধা ইংরাজী বুলির নিন্দায় পঞ্চমুখ। আর সেজন্যই মাতৃভাষার মহিমা প্রচারের দায়িত্ব, স্বদেশের মহিমা প্রচারের কর্তব্য তাঁদের ওপরে ন্যস্ত ছিল। অবশ্য ঈশ্বরগুপ্ত খাঁটি বাঙ্গালা ব্যবহারেই স্বচ্ছন্দ,—তাঁর কৃতিত্বও সেখানে। স্বদেশের প্রতি ভালবাসার নিখাদ অনুভূতি থেকেই তাঁর 'স্বদেশ' কবিতার জন্ম।

"জান নাকি জীব তুমি, জননী জনম ভূমি,
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে
কে কোথায় এমন দেখেছে ?

মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা,
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥

হৃদয়াবেগের নিবিড়তার মধুর স্পর্শ হয়ত নেই—কিন্তু মাতৃভূমির প্রতি শান্ত ও সশ্রদ্ধচিত্ত ঈশ্বরগুপ্তকে এখানে অত্যন্ত স্পষ্টরূপে দেখি। কোন গুরুতর ন্যায়নীতি সম্পর্কিত বক্তৃতা নয়, আত্ম উপলব্ধির গভীরতায় মণ্ডিত একটি নিবিড় অভিব্যক্তিই এ সমস্ত কবিতার প্রাণকেন্দ্র। তাই পাঠকচিত্তও সহজেই রসাবেশে মুগ্ধ হয়। ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রীতির এই অকুণ্ঠিত প্রকাশকে অভিনন্দন জানিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন,—

"মাতৃসম মাতৃভাষা সৌভাগ্যক্রমে এখন অনেকেই বুঝিতেছেন, কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের সময়ে কে সাহস করিয়া একথা বলে ?"—বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমের কবিতা রচনার পথে যে ভীতির বাধা ছিল এ কথা কবি মর্মে মর্মে জানতেন—তাই দেশের প্রতি ভালবাসায় অবিচল হয়েও তার অকুণ্ঠ প্রকাশে যথেষ্ট তৎপর। কবি অত্যন্ত সচেতন ভাবেই তাঁর দেশপ্রীতি প্রকাশ করেছেন এখানে। কোনো কোনো কবিতায় কবি নিখাদ স্বদেশ-প্রেমের বাণী প্রচার করতে গিয়েও তা করেন নি ;—প্রসঙ্গ থেকে প্রসঙ্গান্তরে চলে যাওয়ার এই সযত্ন প্রয়াস তাঁর সতর্ক মনোভঙ্গীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। 'স্বদেশ' কবিতায় এই সাবধানী দেশপ্রেমিককে প্রত্যক্ষ করি।

স্বদেশের প্রতি ভালবাসাকে কবি অমূল্য একটি রত্নের সঙ্গে তুলনা করেছেন—কিন্তু স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গ উল্লেখ করেই মুহূর্তের মধ্যে প্রসঙ্গান্তরে চলে গেছেন তিনি,

মিছা মণি মুক্তা হেম, স্বদেশের প্রিয় প্রেম,
তার চেয়ে রত্ন নাই আর।
সুধাকরে কত সুধা, দূর করে তৃষ্ণা ক্ষুধা
স্বদেশের শুভ সমাচার ॥
কতরূপ স্নেহ করি, দেশের কুকুর ধরি
বিদেশের ঠাকুর ফেলিয়া ॥ [স্বদেশ]

'স্বদেশপ্রেম' স্বদেশের শুভ সমাচারেই পর্যবসিত—এখানে কবির বক্তব্যও কিঞ্চিৎ অস্বচ্ছ বলে মনে হয়। দেশপ্রীতিই যে বড়, দেশপ্রীতির প্রাবল্যে সামান্ত কুকুরকেও যে নিতান্ত আপন মনে হয়—এ একটা নিখাদ অনুভূতির মত সত্য। প্রকাশ ভঙ্গিমার অন্তরালেও কবির দেশপ্রীতির জলন্ত স্বাক্ষর রয়েছে এখানে। এই বিষয়টির সঙ্গেই কবির মাতৃভাষা প্রসঙ্গ উল্লেখে খানিকটা বিষয়ান্তরে যাওয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করি। মাতৃভাষা প্রসঙ্গের অবতারণার সঙ্গে সঙ্গে কবি যেন তার উত্তাপহীন দেশপ্রীতিকেই জনসমক্ষে প্রচারের জন্য ব্যগ্র। অনুভূতির গাঢ়রসে নিমগ্ন হওয়ার আগেই কবি আসল বক্তব্যের গভীরতাকে খানিকটা গতানুগতিক ভাবাবেগের প্রলেপ দেবার চেষ্টা করেছেন। না হলে, দেশকে ভালবাসার কথা এত দরদ দিয়ে বলেই যেখানে কবিতার সমাপ্তি হতে পারত—সেখানে মাতৃভাষা প্রসঙ্গটি আনার সার্থকতা কি? পরিশেষে যেন খানিকটা উপদেশের মতো ব্যক্ত করেছেন,

বৃদ্ধি কর মাতৃভাষা, পূরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ। [ঐ]

মাতৃভাষার মহিমা বর্ণনায় কবি খানিকটা গতানুগতিকতার আশ্রয় নিলেন, অথচ এ প্রসঙ্গে তাঁর উল্লেখযোগ্য অন্য কবিতা আছে। মাতৃভাষাপ্রীতি দিয়ে দেশপ্রেমের নির্মল ও নিখাদ অনুভূতিকে আবৃত করা যায় না, তাই 'স্বদেশ' কবিতার শেষাংশের তুলনায় প্রথমাংশটি অত্যন্ত আবেদনশীল; প্রথমারম্ভে কবি দেশপ্রেমকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ করেছেন।

জান নাকি জীব তুমি, জননী জনমভূমি
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে। [ঐ]

এই দেশের প্রতি অকৃপণ ভালবাসায়ই কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন।

কোন কোন কবিতায় [ভারতের ভাগ্যবিপ্লব, ভারতের অবস্থা] কবি দেশের দুর্দশায় ম্লান। ভারতের দুর্দশায় কবি মুহ্যমান;—এমন কোন আশার বাণীও নেই যা

কবিকে খানিকটা স্বস্তি দিতে পারে। প্রচণ্ড হতাশার বেদনায় ঈশ্বরগুপ্তের আক্ষেপাকীর্ণ দেশপ্রেম এখানে উচ্ছ্বসিত হয়েছে।

"দেশের দারুণ দুঃখ, ভাবিয়া বিদরে বুক,
চিন্তায় চঞ্চল হয় মন।
লিখিতে লেখনী কাঁদে ম্লান মুখ মসী ছাঁদে
শোক অশ্রু করে বরিষণ ॥
কি ছিলো কি হলো, আহা. আর কি হইবে তাহা ?
ভারতের ভব ভরা যশ। [ভারতের ভাগ্যবিপ্লব]

বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমে কবির সমগ্র অন্তর এক প্রচণ্ড বেদনায় ম্লান হয়ে আছে। ভারতের দুর্দশায় কবির ক্ষোভের হয়ত ব্যক্তিগত কোন হেতু নেই—কিন্তু যে কোন স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তিই দেশের সুখদুঃখের মধ্যে ব্যক্তিগত সুখদুঃখ অনুভব করেন। কিন্তু সেযুগের বাংলা সাহিত্যে এই অনুভবের প্রকাশ এতই অচিন্তিত যে, ঈশ্বরগুপ্তের আগে আর কোন বাঙ্গালী কবির রচনায় ঠিক এ জাতীয় উপলব্ধি খুঁজে পাওয়া যায় না। সাহিত্যে দেশপ্রেম যে অভিনবত্ব সঞ্চার করেছিল—ঈশ্বরগুপ্তই তার প্রথম বক্তা। দেশের এই দুর্দশার হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে জাগতে হবে সমগ্র দেশবাসীকে, ঈশ্বরগুপ্তই সে কথা বলেছেন,—

ভারতভূমির মাঝে, হিন্দু আছে যত।
অলস অবশ হোয়ে, রবে আর কত ?
এখনো ভাঙ্গেনি ঘুম, করিছ শয়ন ?
এখনো রয়েছে সবে, মুদিয়া নয়ন ? [কুরীতি সংস্কার]

এ আহ্বানও বাংলা সাহিত্যের অভিনব। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় এ জাতীয় বিশুদ্ধ দেশপ্রীতির প্রকাশ ঘটেছে খুব অল্প এবং সম্ভবতঃ দেশপ্রীতির পূর্ণ আলোচনাও ইতিপুর্বে হয় নি, তাই ঈশ্বরগুপ্তের দেশভাবনার পূর্ণ স্বরূপ এখনও উদ্‌ঘাটিত হয়নি; বরং বিরূপ সমালোচনায় তিনি জর্জরিত। কিন্তু এমন বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের প্রকাশ বাংলা সাহিত্যে ছিল না বলেই ঈশ্বরগুপ্তকে অভিনন্দিত করার সময় এসেছে।

ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেম সম্পর্কিত কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়ের নাম দেওয়া হয়েছে—প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রেমের কবিতা। প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রেমই কবিতাগুলির রচনার উৎস অথচ স্পষ্টভাবে সেকথা প্রকাশ করার পথেও প্রচণ্ড বাধা। সুতরাং কখনও ব্যঙ্গে, কখনও রঙ্গে, কখনও হাসির চাবুকে, কখনও উপহাসের মৃদুতায় কবি দেশপ্রীতির বিপুল অন্তরাবেগকে দমিত করেছেন। এ ধরণের সৃষ্টির পরিমাণও বিপুলতম। স্বদেশ-প্রেমের প্রসঙ্গ ব্যঙ্গের ও রসিকতার শাণিত অস্ত্রে ঝিকমিক করে উঠেছে যেন। সে

যুগের রাজনৈতিক আবহাওয়ার স্পর্শ অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে বাঁচিয়ে চলেছেন কবি। অথচ একটু বিশ্লেষণ করে দেখলে কবির মনোভাবের ঘোমটাটি খসে পড়ে সহজেই। আপাতঃ হাস্যরসের আড়ালে সমালোচনার চেহারাটি আত্মগোপন করে আছে সেখানে। সুতরাং রঙ্গব্যঙ্গের মধ্যেই যে কবিতার শুরু, তা সারা হয়েছে প্রচণ্ড আক্ষেপে-হতাশায়-বেদনায়। কিন্তু এই বেদনাবোধের পশ্চাতে অন্য কোন সহানুভূতি-সিক্ত মনের সঙ্গ পান নি বলে কবিচিত্ত নিঃসঙ্গতায় ম্লান। পাঠকসমাজ যখন তার মধ্যে বিদূষকের চপলতা প্রত্যক্ষ করেছে কবির অন্তর সেই সমাদর গ্রহণে নিতান্তই বিমুখ। কবির উদ্দেশ্যকে আড়াল করে বিদূষকসত্তাই যদি সমাদর পায় কবির পক্ষে তার চেয়ে বেদনাময় অনুভূতি আর কি থাকতে পারে? ঈশ্বরগুপ্তের প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রেমের কবিতার বিষয়বস্তুও অত্যন্ত নিপুণভাবে আবৃত;—সমাজের প্রত্যেকটি কোণ থেকে আলোকিত রাজপথ কিছুই এ আলোচনা থেকে বাদ যায় নি—রাজনীতি, সমাজনীতি, সংকীর্ণতা ও উদারতা, অনুদার শাসননীতি ও বিচারের নামে অবিচারের প্রহসন। সুবিপুল সম্ভারে স্তরে স্তরে সে যুগের সামগ্রিক সমাজচিন্তাকে সাংবাদিকের সুনিপুণতা দিয়ে পরিবেশন করেছেন ঈশ্বরগুপ্ত। সামাজিক ও ব্যঙ্গ পর্যায়ের বহু কবিতার মধ্যেই প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রেম রয়েছে। তাছাড়া যুদ্ধ, রাজনৈতিক প্রসঙ্গেও তার অনেক চিন্তা আপাতঃ অসংলগ্ন হলেও গভীরতর চিন্তাধারাপ্রসূত। তাঁর রাজনৈতিক চিন্তার সঙ্গে স্বদেশপ্রেমের যোগ কবিতায় নেই;—যাও বা আছে বিশুদ্ধ চাটুকারিতার মতো শোনায় সে কথা। অথচ রাজনীতি সম্পর্কে কিছু স্বাধীনচিন্তা যে ঈশ্বরগুপ্তের ছিলো সে কথাও স্বীকার্য। কোন কোন সময় ঈশ্বরগুপ্ত প্রত্যক্ষভাবে রাজবন্দনা করেছেন। ইংরাজী রাজত্বের প্রথম পর্যায়ের গঠনমূলক চিন্তাধারার মধ্যে মানবকল্যাণের সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করে কবি অনেক সময়ই পুলকিত হয়েছেন, উচ্ছ্বসিত হয়েছেন এবং সেই উচ্ছ্বাসের বহু স্বাক্ষর কবিতায় স্পষ্টভাবেই দেখা যায়—যা আপাততঃ ইংরেজস্তুতির মতই শোনায়, পরিশেষে কবি সম্বন্ধে ধারণাই পালটে দেয়। ইংরেজপ্রশস্তির এই সুবিপুল স্বাক্ষর দেখেই ঈশ্বরগুপ্তের গভীর দেশপ্রেম উপলব্ধি করতে আমাদের অসুবিধা হয়। ঈশ্বরগুপ্তের এই রাজনীতিক সত্তাটি নিয়েই যত বিরোধের সৃষ্টি। একদিকে কবি স্বদেশপ্রেমে উদ্বেল অন্যদিকে শাসক ইংরেজের প্রতি অকৃপণ প্রশংসায় পঞ্চমুখ। এই দ্বিধাখণ্ডিত কবিভাবনা থেকে ঈশ্বরগুপ্তের সঠিক মূল্যবিচার বিপর্যস্ত হওয়াই স্বাভাবিক। কবি সেই যুগের স্বাধীনতা সংগ্রামের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারেন নি;—নানা-সাহেব, তান্তিয়াটোপী, ঝাঁসীররাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের সম্মিলিত স্বাধীনতাযুদ্ধের সঠিক ব্যাখ্যা কবি কোথাও দেননি। ঈশ্বরগুপ্তের ভাবনায় এরা ঠিক বিপরীত চরিত্র

রূপেই অঙ্কিত হয়েছে। নানাসাহেব ও লক্ষ্মীবাঈ—স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে প্রথম দুটি উজ্জ্বল নাম; স্বদেশপ্রেমিক ঈশ্বরগুপ্তের তুলিকায় নিতান্তই নগণ্য দেশদ্রোহী বলে আখ্যাত হয়েছে। অবশ্য এর জন্য ঈশ্বরগুপ্তের চিন্তাধারার অদূর-দর্শিতাই দায়ী, তাঁর স্বদেশপ্রেম নয়। সেযুগের সাংবাদিক ঈশ্বরগুপ্ত যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে শুধু ক্ষমতা লোভকেই প্রত্যক্ষ করেছেন।—যুদ্ধবিক্ষত ভারতবর্ষের শেষ সক্ষম প্রতিনিধি ইংরেজ। ঈশ্বরগুপ্তের যুগে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত ইংরেজরাজত্ব দেখে অনেকেই নিশ্চিন্ত হয়েছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-মুক্তির স্বপ্ন দেখাটা অন্ততঃ ঈশ্বরগুপ্তের যুগে ভাবাই যেত না,—কল্পনাতেও বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারত। সুতরাং স্বাধীনতার সংগ্রামে এগিয়ে আসা এই দুই বীর-সৈনিককে যথোপযুক্ত ভাবে বিচার করার ক্ষমতা কি সেযুগে সম্ভব ছিল?, ঈশ্বরগুপ্ত যুগাতিক্রমী দূরদর্শিতা দেখাতে পারেন নি কোথাও, আপাত ফলাফল ও তার প্রতিক্রিয়ার বর্ণনাই তাঁর কবিতায় মুখ্য। তিনি দৃষ্ট ও প্রত্যক্ষ সত্যউপলব্ধিকেই কবিতায় স্থান দিয়েছেন। সিপাহীযুদ্ধের মর্মার্থ উদ্ধারে সেযুগে কজনই বা সক্ষম ছিলেন? ঈশ্বরগুপ্ত দেশচিন্তার সমস্ত গভীরতা দিয়েও সেই যুদ্ধের স্বরূপ ব্যাখ্যা করতে পারেন নি। এবং যুদ্ধের হাত থেকে আত্মরক্ষার অন্যকোন পথ না দেখে সক্ষম শাসকগোষ্ঠীর জয় প্রার্থনা করে ঈশ্বরগুপ্ত অনেকখানি স্বাভাবিক ও যুক্তিসঙ্গত পথই অবলম্বন করেছিলেন। ইংরাজপ্রশস্তি ছাড়া এ ক্ষেত্রে করণীয়ই বা কি ছিল? দেশপ্রেম—তা যত গভীর হোক না কেন সাধারণ মানুষ সিপাহীদের সঙ্গে যোগ দিয়ে একত্রে ইংরেজকে রাজ্যচ্যুত করবে এমন কথা চিন্তাতীত ছিল বলেও অত্যুক্তি হয় না। ঈশ্বরগুপ্ত অবশ্য সরাসরি ইংরেজপক্ষ অবলম্বন করেছেন,—

এদেশের বড় ফের পাপীদের দাপে।
টলটল, টলমল, ধরাতল কাঁপে॥
হও মূল অনুকূল, শ্বেত কুল পক্ষে।
সমুচয়, শত্রুক্ষয়, তবে হয় রক্ষে॥

[সিপাহীযুদ্ধে শান্তি প্রার্থনা]

এখানে ঈশ্বরগুপ্ত ভগবানের কাছে কাতর প্রার্থনা করেছেন। এদেশের এই নিত্য সংগ্রামের হাত থেকে মুক্তি পেতে হলে ভগবানের কাছে কবি এই প্রার্থনাই জানাতে পারেন। দেশকে স্বাধীন করার যে সুমহান ব্রতে আমরা একদিন দীক্ষিত হয়েছিলাম—ঈশ্বরগুপ্তের অনুভাবনার কোথাও তার স্পর্শ নেই—এজন্য সেযুগের মানসিক প্রস্তুতির অভাবকেই দায়ী করতে পারি মাত্র। সে যুগের দেশভাবনার অবিকৃত রূপটি পাই ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায়। তিনি নানাসাহেবকে দোষারোপ করেছেন,—লক্ষ্মীবাঈয়ের

বীরত্ব তাঁকে মুগ্ধ করেনি। স্বাধীনতাকামী এই সৈনিকের প্রতি কবি অসন্তুষ্ট ছিলেন—শুধু তাই নয় এঁদের সম্পর্ক নিয়ে কদর্য ইঙ্গিত করতেও ছাড়েন নি। ঈশ্বরগুপ্তের এই অদূরদর্শিতার সঙ্গে তাঁর দেশভাবনাও লাঞ্ছিত হয়েছে,—সেজন্যই বহু সমালোচক ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কে একটি সত্য আবিষ্কার করেই থেমেছেন,—ইংরেজ প্রশস্তির এই বর্ণচ্ছটার মধ্যে তাঁর নির্ভেজাল মনের অকৃপণ সত্য প্রমাণের জন্য আর ব্যস্ত হন নি। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর দূরদর্শিতার প্রশংসা না করে পারা যায় না। ইংরেজের বিরুদ্ধে নানাসাহেব ও লক্ষ্মীবাঈয়ের দ্বৈত সংগ্রাম-প্রচেষ্টার মধ্যে তিনি উল্লেখযোগ্য সংবাদের মালমশলা পেয়েছেন। এঁদের নিন্দা করেই হোক, ভৎর্সনা করেই হোক, গুরুত্ব না দিয়ে পারেন নি। স্বাধীনতা সংগ্রাম ইতিহাসের যাঁরা প্রথম নায়কনায়িকা তাঁদের সম্পর্কে কবি নীরব থাকেন নি, কবিতায় স্থান দিয়েছেন। এঁদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মূল্যবিচারে হয়ত তিনি যুগাতীত দূরদৃষ্টির পরিচয় দেন নি কিন্তু এঁদের জনপ্রিয়তার দ্বারা কবিও কম আলোড়িত হন নি। এঁদের নিয়ে প্রথম কবিতারচনার কৃতিত্ব তাঁরই। 'কানপুরের যুদ্ধে জয়' শীর্ষক দীর্ঘ কবিতায় নানাসাহেবের সম্পর্কে কবির চিন্তাধারার পরিচয় পাওয়া যায় ;—আশ্রিত নানাসাহেব ইংরেজের বিরোধিতা করলেও তাঁর আশ্রয়দাতা সম্পর্কে কবির কোন রোষ নেই,—

> "বাজীরাও পাসা যিনি,
> বাজীরাও পাসা যিনি, সাধু তিনি,
> মান্য নানা মতে।
> মহারাষ্ট্র, মহারাষ্ট্র পূজ্য এ জগতে!
> ছেড়ে সে নিজ দেশ,
> ছেড়ে সে নিজ দেশ, রাজবেশ,
> বাঁচিবার তরে।
> আত্মসমর্পণ করে ব্রিটিসের করে॥ [কানপুরের যুদ্ধে জয়]

কারণ 'বাঁচিবার তরে' তিনি ইংরেজের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। যেখানে বাঁচার অন্য পথ খোলা নেই,—বাধা দেবার শক্তি বিলুপ্ত, সেখানে আত্মসমর্পণ ভীরুতা ও কাপুরুষতা হতে পারে কিন্তু নান্য পন্থা বিদ্যতে। শুধু প্রাণে বেঁচে থাকার ব্যগ্রতা দেখি এখানে। এ বাঁচার মধ্যে কোন অগৌরব দেখিনি সেদিন। শাসনের শোষণের যন্ত্রে পিষ্ট হতে হতেই আমাদের আত্মবোধ,—মূল্যবোধ জেগে উঠেছে, এ সত্য ইতিহাসের। তার আগে শুধু প্রাণেই বেঁচেছি আমরা। ঈশ্বরগুপ্তের যুগে নিছক বাঁচার জন্য এর চেয়ে উৎকৃষ্ট কোনো পন্থা আবিষ্কৃত হয় নি। সুতরাং ঈশ্বরগুপ্ত বাজীরাও পাসার আত্মসমর্পণের মধ্যে নিন্দনীয় কিছু খুঁজে পাননি। কিন্তু

তারই আশ্রিত নানাসাহেব যখন আত্মসমর্পণে অনিচ্ছুক তখন তাঁর বিস্ময়ের সীমা নেই। দীর্ঘ এ কবিতাটিতে তিনি নানাসাহেব প্রসঙ্গ নিয়ে সমালোচনা করেছেন—কিন্তু বাজীরাও এর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবার জন্ত এই একটি স্তবকই যথেষ্ট। এ কবিতায় কুমারসিংহ, মানসিংহ, অমরসিংহ প্রসঙ্গে কবির কিছু কিছু উক্তি আছে। কিন্তু নানাসাহেবই এ যুদ্ধের নায়ক—এবং লক্ষ্মীবাঈ তাঁরই সহযাত্রিনী—একই আদর্শের ধ্বজাধারী; এ কথাটিতে কবি জোর দিয়েছেন। নানাসাহেব প্রসঙ্গে কবি বলেন,

কোথাকার মহাপাপ,
কোথাকার মহাপাপ, বলে বাপ,
পুত্র হল নানা।
কাকের বাসায় যথা কোকিলের ছানা॥

আর লক্ষ্মীবাঈ প্রসঙ্গে—

হাদে কি শুনি রাণী?
হাদে কি শুনি রাণী, ঝাঁসির রাণী,
ঠোঁটকাটা কাকী।
মেয়ে হয়ে সেনা নিয়ে, সাজিয়াছে না কি? [ঐ]

এখানে নারী প্রগতিবিরোধী ঈশ্বরগুপ্তের পরিচয় প্রকট।

অথচ লক্ষ্মীবাঈয়ের মৃত্যু প্রসঙ্গে তার উক্তির মধ্যে কাতরতা আছে,—

হয়ে শেষ নানার নানী, মরে রাণী,
দেখে বুক ফাটে।
কোম্পানীর মুলুকে কি বর্গিগিরী খাটে?

অজস্র অশ্রদ্ধেয় উক্তির মধ্যেও রাণীর মৃত্যুতে কবির বুকফাটার কথা শোনাতে ভোলেন নি? নিছক অন্ত্যানুপ্রাসের খাতিরে কবির এতটা কাতরতা প্রকাশেরও কোনো যুক্তি নেই। এই কবিতাটি পড়তে পড়তে বারবারই কবিচিত্তের অস্থিরতা লক্ষ্য করেছি। রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের যুদ্ধ কাহিনীর বর্ণনায় কবি নিতান্তই গতানুগতিক, কিন্তু অকস্মাৎ তারই মৃত্যুতে এতটা শোকাবিষ্ট হওয়ার কোনো সঙ্গত যুক্তিও নেই। আরও একটি প্রসঙ্গে কবি বলেছেন,—

লেখনী থাকো থেমে
লেখনী থাকো থেমে, নিত্য প্রেমে,
মত্ত হতে হবে। [কানপুরের যুদ্ধ]

এ আক্ষেপ কিসের? এই কবিতায় কবি কি তবে ইচ্ছার লাগাম টেনে ধরেছেন? অথচ স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিতের অভাবে এ সমস্ত পংক্তিগুলো প্রায় অর্থহীন।

কুমারসিংহ প্রসঙ্গেও কবি নিজের কথা বলেন নি, সকলের কথাই তুলে ধরেছেন ; শুধু রাজদ্বেষী বলেই শিশুহত্যা না করেও নারীহত্যা না করেও, কুমারসিংহকে অত্যাচারী বলতে হবে ; কারণ এটাই প্রথা—

তবু ত অত্যাচারী,
তবু ত অত্যাচারী, হত্যাকারী,
বোলতে তারে হবে।
রাজদ্বেষী মহাপাপী কবেই কবে সবে। [কানপুরের যুদ্ধ]

কবিতাটির সর্বত্রই এ ধরণের ক্ষুব্ধ মনোভাবের স্বাক্ষর আছে। কবি যা বলতে চান নি তাই তাকে বলতে হয়েছে—কারণ এটাই প্রথাসিদ্ধ। অথচ নানাসাহেব, লক্ষ্মীবাঈ সম্পর্কিত উল্লেখযোগ্য সমস্ত সংবাদই এ কবিতায় মিলবে। এখানে ইংরেজ প্রশস্তি আছে, রাজানুগত্য আছে কিন্তু সবই যে প্রাণহীন সেটাও অত্যন্ত স্পষ্ট।

কোম্পানির মুলুকে কি বর্গিগিরী খাটে ? [ঐ]

তাই সংগ্রাম অসামর্থ্যে এঁরা সবাই পরাজয় বরণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁদের প্রচেষ্টার মধ্যে কিছু বক্তব্য ছিল—এবং ঈশ্বরগুপ্ত তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সময়োচিত বৈশিষ্ট্য নিয়ে কবিতাটি রচিত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের এই দুই শহীদকে কবি প্রচ্ছন্নভাবে তাঁর কাব্যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন। অন্ততঃ 'সংবাদ প্রভাকরের' পাঠকবর্গের কাছে কানপুর যুদ্ধের এক দর্পিত শক্তির, এক ইংরেজবিরোধী নেতার চিত্র, এক পরম সাহসিকা নারী সৈনিকের সংগ্রাম কাহিনী বর্ণনা করেছেন। এ কবিতাটি তার প্রচ্ছন্ন অনুভূতির প্রকাশ্য আত্মনিগ্রহের বেদনান্বিত প্রতিরূপ।

যুদ্ধ পর্যায়ের আর যে সমস্ত কবিতা আছে—কোনটিতেই নতুনত্ব কিছু নেই। ইংরেজ প্রশস্তির চূড়ান্ত রূপ এ সব কবিতায় এত স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে রাজভক্তির পরাকাষ্ঠার আড়ালে অন্য কিছু কটাক্ষপাত যদি থাকেও তবে তা প্রাণবন্ত হতে পারে নি। "শিখযুদ্ধে ইংরাজের জয়" বার্তা কবি সাড়ম্বরে দিয়েছেন কিন্তু শিখের প্রতি অনুকম্পার ভাবটুকুই স্পষ্ট।

"পাঞ্জাবীয় শিখদের আশা ছিল মনে।
ব্রিটিশ বিনাশ করি জয়ী হব রণে॥
সমুদয় অস্ত্র লয়ে হয়ে অগ্রসর।
করি শিবিরে আসি সম্মুখ সমর॥

এই প্রচেষ্টাকে অনুকম্পায় লিপ্ত করতেও কবি দ্বিধা করেন নি।—বিদ্রূপের সুরে কবি উচ্চারণ করেছেন,—

"বাসুকি করিতে বধ বাঞ্ছা করে বক। [ঐ]

এবং প্রজাদের উৎসাহিত করেছেন সেইসঙ্গে,—

এ দেশের প্রজা সব ঐক্য হয়ে সুখে।
রাজার মঙ্গল গীত গান কর মুখে॥ [ঐ]

ঈশ্বরগুপ্তের সহজ বুদ্ধিতে যুদ্ধভীতির চেয়ে নিরুপদ্রব শান্তি অধিকতর লোভনীয়। এই মনোভাবের অনুবর্তী হয়েই শক্তিহীনতার সহজ সত্যটুকু মেনে নিয়েই কবি ব্রিটিশ পক্ষপুট আশ্রয় না করে পারেন নি। শক্তির দৈন্যকে লৈখিক আস্ফালনে রঞ্জিত না করে কবি তাঁর সহজ সরল মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। আত্মপ্রকাশের ছলনা কিংবা দৈন্যের কুণ্ঠাকে লোভনীয় করে সর্বসমক্ষে প্রচার করার লোভ তিনি সংবরণ করেছিলেন। অন্ততঃ মানসিক কোন অস্থিরতার [যা সেযুগে প্রায় অস্পষ্টই ছিল] চাপে দেশপ্রেমের প্রগাঢ় অনুভূতিকে জটিল করে তোলেন নি। তিনি দেশকে ভালবাসেন, বিপক্ষীয় শাসনের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ কবি মর্মপীড়ায় আহত হন কিন্তু দেশের কাছে, দেশবাসীর কাছে বলবার মত কোন সত্য তাঁর ছিল না, কিন্তু এই সহজ সত্যটি বলবার মত সৎসাহস তাঁর ছিল। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁদের দেশ ছাড়া করবেন এমন কথা কল্পনাতেই হাসির উদ্রেক করতে পারত। শক্তি সামর্থ্যে, অনৈক্যে, বিদ্বেষে, আত্মকলহে খণ্ডিত ভারতবাসী সম্বন্ধে কবি কোন কাল্পনিক আশাও করতে পারেন নি, তাই ইংরেজবিরোধী যুদ্ধপ্রচেষ্টার কোন সমর্থন তাঁর কবিতার কোথাও নেই। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ বস্তুটির সামগ্রিক কল্পনা সে যুগে অস্বাভাবিক বলেই মনে হোত। বুদ্ধি ও চাতুরী সম্বল করে যারা এদেশের মানুষকে বশীভূত করেছে তাদের সাম্রাজ্যবিস্তারের পথে বাধাসৃষ্টি করার শক্তি ছিল না কারোই। ইংরাজের এই চাতুরীটুকু কবি ধরতে পেরেছিলেন—তাই আত্মসমর্পণ ছাড়া জীবনধারণের সহজ পথ তিনি দেখতে পাননি। 'শিখযুদ্ধে ইংরাজের জয়' প্রসঙ্গে কবি একটি স্তবকে তাঁর মনোভাবটি স্পষ্ট করেছেন,—

আমাদের সেনাদল বাহুবল বাড়ে।
বিকট বদনে ঘোর সিংহনাদ ছাড়ে॥
বেঁধে হোপ করে কোপ দিলে তোপ দেগে।
নাহি রব পরাভব গেল সব ভেগে॥
যতদল হতবল প্রতিফল পেলে।
রেজিমেণ্ট করে সেণ্ট তাঁবু টেণ্ট ফেলে॥
দ্বেষ ছেড়ে দেশে গিয়া মানে পরাজয়।
গেল বিপক্ষের ভয় গেল বিপক্ষের ভয়॥

এখানে যুদ্ধ-বর্ণনাটি অতি বাস্তব।—"আমাদের সেনাদল" যদি এদেশীয় সৈন্য হয় তবে শক্তি ও সংগ্রামের অসামর্থ্যে "নাহি রব পরাভব" কথাটি কি আস্ফালনের মত শোনায়নি? পরাভবের হাত থেকে মুক্তি সংগ্রহ করতে গেলে যে গভীর জীবনাদর্শ জাতির সামনে জীবন্ত হয়ে ওঠে তারই অভাবে এই সমস্ত খণ্ড খণ্ড যুদ্ধবিগ্রহে এসেছে নতুনতর পরাভব, তা নির্মম ও হাস্যকর। আর "দ্বিতীয় যুদ্ধ" কবিতায় ইংরেজ প্রশস্তির আরও একমাত্রা বাড়িয়ে কবি আমাদের ইংরেজের স্বপক্ষে এবং শিখদলের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়েছেন,—

অধিকার যদি পাই শিখদের ক্ষিতি।
আমাদের প্রতি হবে ভূপতির প্রীতি॥
সাহসে করিবে যুদ্ধ যত বুদ্ধি ঘটে।
কোন ক্রমে নাহি যাবে গোলার নিকটে॥

আমাদের শক্তিহীনতা, দুর্বলতা, জীবনপ্রীতির প্রতি নির্মম কটাক্ষপাতে ঈশ্বরগুপ্ত এখানে স্বমহিমাভাস্বর। যুদ্ধ-বিষয়ক কবিতায় ঈশ্বরগুপ্তের স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গরঙ্গ রসিকতাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই ইংরাজপ্রশস্তির সঙ্গে আত্মসমালোচনা মিলিয়ে তিনি এক অনবদ্য যুদ্ধচিত্র ফুটিয়েছেন। "দিল্লীর যুদ্ধে" তাঁর ইংরাজপ্রশস্তির নতুনতর পরিকল্পনা,—

ভারতের প্রিয়পুত্র হিন্দু সমুদয়।
মুক্তমুখে বল সবে ব্রিটিসের জয়॥
জয় জয় জগদীশ করুণা নিধান।
কৃপাময় কেহ নয়, তোমার সমান॥

কাবুলের যুদ্ধ, ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম শুধু বর্ণনায় নয়—ঐতিহাসিক সত্যতায় সিদ্ধ। কাবুলযুদ্ধে কাবুলীদের শক্তি ইংরাজদের প্রতিহত করেছিল—সেখানে কবি অকপটে সেই সত্য চিত্রটি তুলে ধরেছেন,—

"কাপ্তেন কর্ণেল কত, বিপাকে হইল হত,
স্বর্গগত ডবলিউ এম।
রাজদূত যাঁরে কয়, কোথা সেই এনবয়,
কোথায় রহিল তার মেম?
দুর্জয় যবন নষ্ট, করিলেক মানভ্রষ্ট
সব গেল ব্রিটিসের ফেম।
কেড়ে নিলে তাঁর টেণ্ট, হতবল রেজিমেণ্ট,
হায় হায় কারে কব সেম॥

শুকাইল রাঙ্গামুখ ইংরাজের এতদুখ,
ফাটে বুক হায় হায় হায়॥ [কাবুল যুদ্ধ]

ইংরাজপ্রশস্তি এখানেও, কিন্তু অশ্রুসিক্ত চিত্তের বেদনা এখানে নির্মম রসিকতার মত শোনায়।' তবে যবনের এই স্পর্ধাকেও কবি সমর্থন করেন নি—কারণ হিন্দুপ্রীতির প্রলেপ দিয়ে যাবনী ক্ষমতার প্রতি কবির স্বভাবসিদ্ধ বিরাগ প্রকাশ করেছেন। আর সেজন্যই সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন,—

ফলে কিছু নহে অন্য নিশ্চয় মরণ জন্য,
উঠিয়াছে পিপীড়ার ডেনা॥
যবনের যত বংশ, একেবারে হবে ধ্বংস
সাজিয়াছে কোম্পানির সেনা॥ [ঐ]

"যুদ্ধ শান্তি" কবিতাটির মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তের ইংরাজপ্রশস্তির আর একটি পরোক্ষ কারণ চোখে পড়ে। মোঘলশাসনের অত্যাচারের ইতিহাস সম্বন্ধে কবি সদাসচেতন—আর সেজন্যই মোঘলশক্তির দুর্দশায় কবি এতটুকু দুঃখ প্রকাশ করেননি।

বস্তুতঃ মোগলশক্তিকে নিছক মিত্রপক্ষ হিসেবে চিন্তা করার কোন হেতু ছিল না। পরাধীনতার মার এসেছে যাদের দিক থেকে—একযুগে যারা ভয়ঙ্করের মতো আমাদের শান্তিসাচ্ছন্দ্য কেড়ে নিয়েছে তাদের প্রতি দীর্ঘদিনের রোষই কবি প্রকাশ করেছেন। দিল্লীর বাদশাহের অন্তিম হাহাকারের চিত্রটি রচনা করতে বসে কবি যদিও সহানুভূতি পুরোপুরি হারাননি, যদি হারাতেন তাহলেও সাধারণ দেশপ্রেমিকের স্বাভাবিকত্বই প্রকাশ পেতো। ঈশ্বরগুপ্তের যবনবিদ্বেষের মূলে প্রত্যক্ষ কিছু কারণ নির্ণয় করা যায় সহজেই। মোঘলসম্প্রদায় দীর্ঘদিন বাংলাতে বসবাস করে আসছে এবং বাঙ্গালীত্ব যাদের অর্জন করা হয়েছে বলেই ধরে নিতে হবে। তবু হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষরা একাত্ম হয়ে ওঠেনি কখনও। উনবিংশ শতাব্দীর গণজাগরণের মুহূর্তেও মুসলমান সম্প্রদায় সাড়া দেয়নি প্রথমাবধি। এই সময়েই মুসলমানদের মধ্যে আত্মবোধ ও আত্মাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা আসে। ওয়াহাবী বিদ্রোহীদের দ্বারা পরিচালিত ক্ষিপ্ত, উন্মত্ত কিছুসংখ্যক মুসলমানকে দুর্ধর্ষ নেতা তিতুমীরের নিয়মাধীনে জাগ্রত হতে দেখি। তিতুমীরের নেতৃত্বে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যসৃষ্টি হয়নি, বরং বিভেদটাই প্রকট হয়ে ওঠেছিল। একে গণজাগরণ, আত্মজাগরণ কোনো নামেই অভিহিত করা চলে না,—নিছক সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ফলাফল বলেও এ বিদ্রোহকে ব্যাখ্যা করা ঠিক নয়। বস্তুতঃ সমগ্র ভারতের মুসলিম গণ-জাগরণের ঢেউ এসে সুদূর বাংলার একটি শক্তিমান নেতাকে উত্তেজিত করেছিল।

ধনী ও সম্ভ্রান্ত মুসলমান সম্প্রদায়ের সহায়তা না পেয়েও বাংলায় মুসলিম ধর্মপ্রতিষ্ঠা ও রাজ্যপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখে গেছেন তিনি। পরবর্তী পর্যায়ে হিন্দু জমিদারের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধার ফলে হিন্দুনিধনেও তিনি উৎসাহী হয়ে ওঠেন। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত রেনেসাঁর আন্দোলনে এর ভূমিকা নেই—কিন্তু মুসলমান সম্প্রদায়ের সঙ্গে হিন্দুর ভীতির সম্পর্কটা নতুন করে তিতুমীরই সৃষ্টি করেন। তবে লক্ষ্য করতে হবে যে, ইংরাজ বিতাড়নের স্বপ্নটাও সেই সঙ্গে প্রকাশ্য ভাবে দেখা দিয়েছিল। এদেশীয় হিন্দুকে শাসনক্ষমতাচ্যুত করে, আগন্তুক ইংরাজকে বিতাড়িত করে নবীন উৎসাহে নূতন সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নটি কাল্পনিক হলেও মুসলমানরা এ চিন্তা করত বিগত শতাব্দীর প্রাচীন ইতিহাসের নজীর থেকে। ঈশ্বরগুপ্তের পর থেকে রঙ্গলালেও যবন বিদ্বেষ প্রসঙ্গ তাই বারংবার দেখা দিয়েছে। এঁরা আবার সমগ্রভারতে হিন্দু সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্নটাই দেখেছিলেন। মুসলমান অত্যাচারের হাত থেকে আত্মরক্ষার প্রশ্নটি তাই স্বাদেশিকতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্তস্বরূপ গৃহীত হয়েছিল।

ইংরাজশক্তির প্রতি কবি যে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন তার মূলেও অবচেতনভাবে পূর্বনিগ্রহের ইতিহাসই পরোক্ষ প্রেরণা। শক্তির ব্যবহাররীতিই ত এই, ক্ষমতাবানের অত্যাচার আমাদের চিরদিনের প্রাপ্তি। সুতরাং যবনশাসনের নাগপাশ থেকে মুক্তি পেয়ে কবি খানিকটা নিশ্চিন্ত। দিল্লী অধিকারের সেই জীবন্ত চিত্রটি বর্ণনা করে তিনি পরিশেষে সনাতন সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছেন,—

> "অদ্যাপিও ধর্ম এক করেন বিহার।
> তিনি কি কখনো সন এত পাপভার? [যুদ্ধশান্তি]

বাদশা বেগমের লাঞ্ছনায় সমব্যথী হয়েও কবির ক্ষুব্ধ কণ্ঠ শোনা যায়,

> কোথা সেই আস্ফালন কোথা দরবার?
>
> * * *
>
> একেবারে ঝাড়ে বংশে হল ছারখার। [ঐ]

যুগে যুগে যে দীর্ঘ অত্যাচারের ইতিহাসে আমরা নীরব দর্শক, এই মুহূর্তে শাসক ইংরেজকে খুশী রাখার এই প্রচেষ্টাকে তাই আর অসঙ্গত বা অর্থহীন বলা যায় না। ইতিহাসের অত্যাচারের দৃষ্টান্তে আমরা শিহরিত, ভবিষ্যতের শান্তির আশায় কবি তাই দিল্লীর নতুন সম্রাটকে স্বাগত জানিয়েছেন,—

> ভয় নাই আর কিছু ভয় নাই আর।
> শুভ সমাচার বড় শুভ সমাচার ॥
> পুনর্বার হইয়াছে দিল্লী অধিকার।
> বাদশা বেগম দোঁহে ভোগে কারাগার ॥ [ঐ]

ইংরেজশাসনে ঈশ্বরগুপ্তের খুশীর কতকগুলি সঙ্গত কারণ আমরা অতি সহজেই পেয়ে যাই এবং এজন্যই তাঁর ইংরাজপ্রশস্তিকে দেশপ্রেমের বিরোধী বলে মনে করার কোনো সংগত কারণ নেই। দেশকে ভালবেসেও তিনি ইংরাজ প্রশস্তির নিশ্চিন্ততায় মগ্ন হয়েছেন। আর সেখানেই তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য, আত্মপ্রকাশে অকুণ্ঠ, সহজ সারল্যে উচ্চকিত।

কিন্তু প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রেম বিষয়ক যে কবিতা তিনি রচনা করেছেন—ব্রিটিশ শাসনের আলোচনা সেখানে লক্ষ্য করার মত। ব্রিটিশ শাসনেও অত্যাচারের মাত্রা কমে নি, —নানাভাবে আমাদের স্বাধীন জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে,—কবি তা অকপটভাবে প্রকাশ করেছেন। "ব্রিটিস শাসন" কবিতাটিতে কবির এ ধরণের মনোভাব—আক্ষেপ ও হতাশা একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে। ব্রিটিশ শাসন;তাঁকে যে খুশী করেনি, গভীর মনোবেদনায় কবি তা ব্যক্ত করেছেন। একশ্রেণীর অনুগত রাজার প্রতিও ব্রিটিশদের অন্যায় সর্তারোপ দেখে কবি বিস্মিত ;—আত্মবিক্রয়ের লাঞ্ছনা ত আছেই কিন্তু তার ওপরেও অত্যাচারের কোন যুক্তি নেই। ঈশ্বরগুপ্ত জ্বালা ও যন্ত্রণায় দোলায়িত হয়ে সে উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন,—

> ইঙ্গিত করিলে যারা ওঠে আর বসে।
> নত হোয়ে সন্ধি করে, সদা আছে বশে॥
> তাদের নিগ্রহ করা উচিত কি হয় ?
> রাজধর্ম নয় সে তো রাজধর্ম নয়। [ব্রিটিশ শাসন]

বিচার প্রার্থনায় এর চেয়ে গভীর আর্তি সে যুগে অন্য কেউই জানাতে পারেন নি ঈশ্বরগুপ্ত ছাড়া। একই সঙ্গেই শাসন ও বাণিজ্যের বোঝা মাথায় চাপিয়ে ইংরাজ আমাদের জীবনে যে হাহাকার সৃষ্টি করেছে ক্ষুব্ধ কবিচিত্ত সেখানে মর্মাতুর।

> যে দেশের রাজা করে বাণিজ্য ব্যাপার।
> সে দেশের প্রজাগণ, করে হাহাকার॥
> প্রমাণ প্রত্যক্ষ তার এদেশে এখন।
> কোম্পানীর একচেটে আফিম লবণ॥
> রাজার অন্যায় লোভে প্রজা যায় মারা। [ঐ]

ইংরেজ শাসনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসে দিনে দিনে আমাদের মগ্নচৈতন্য জাগরিত হয়েছে। শাসনের নামে শোষণের এই নিষ্ঠুর পীড়নে কবি যে মর্মান্তিক আঘাত পেয়েছেন কবিতাটির ছত্রে ছত্রে তার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। এ যেন 'বণিকের মানদণ্ড দেখা দিল রাজদণ্ডরূপে'—র মত রবীন্দ্রবানীর উচ্চারণ। ইংরাজ বিদ্বেষী হয়ে সশস্ত্রসংগ্রাম-কল্পনা অসহায় ভারতবাসীর কাছে যখন নিতান্তই দুরাশা তখন

ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর অসহায়ত্বের কথা সোচ্চারে না বলে পারেন নি। অথচ কিছু করার মত শক্তি, বিদ্রোহী হবার মত মনোবল সে যুগে অসম্ভাবিত। দেশচেতনা বা রাজনৈতিক জাগরণ কোন সময়েই আকস্মিকতা থেকে আসে না। বহুচিত্তের সুপ্ত দাবানল যখন অকস্মাৎ স্ফুলিঙ্গ হয়ে দেখা দেয়, তখন আমরা ধরেই নিতে পারি এর গভীরে যে অন্তর্দাহ চলছিল তার প্রস্তুতিপর্ব অনেকদিনের। আইরিস গণজাগরণ কিংবা ফ্রান্সের আত্মজাগরণ অথবা রাশিয়ার জনবিদ্রোহের মূলেও বহুযুগ সঞ্চিত গ্লানির কালিমা। জলে ওঠার মুহূর্ত যখন আসে তখন দেখা যায় সমিধসম্ভার বহনের দায়িত্বটি পূর্বসূরীরা অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গেই সম্পন্ন করেছেন। যজ্ঞ সমাপ্তির জন্য সমস্ত আয়োজন তারাই করেছেন অলক্ষ্যে। আমাদের জীবনে রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে উঠারও বহু আগে ঈশ্বরগুপ্ত আন্দোলনযজ্ঞের সমিধসম্ভারই বহন করেছেন। ক্ষুব্ধ চিত্তের সমস্ত গ্লানি দিয়ে তিনি শুধু মৌখিক দুঃখ প্রকাশই করেছেন— পরাধীনতার গ্লানিতে কবি ম্লান, ঘৃণা ও বেদনায় কবি যেন সংকুচিত। কবিতাটির এক স্থানে ঈশ্বরগুপ্তের আত্মধিক্কার বাণী উচ্চারিত হয়েছে,—

> ধিক্ ধিক্ অধীনতা, ধিক্ তোরে ধিক্।
> ফুকরে কাঁদিতে হয়, লিখিতে অধিক॥
> বোধ আর কোনোরূপে, প্রবোধ না ধরে।
> হৃদয় বিদীর্ণ হয়, মনে হোলে পরে॥ [ঐ]

সেযুগীয় বাংলা কবিতায় দেশচেতনার এই আত্মধিকৃত কাব্যরূপ কোথাও দেখা যায়নি। কৃত্রিম ও প্রথাসিদ্ধ রচনায় অভ্যস্ত ঈশ্বরগুপ্তের লেখনীতে এ যেন এক অসম্ভাবিত অনন্য বিস্ময়। অধীনতায় কবি যে কতখানি বিমূঢ়চিত্ত হয়েছেন— উপরোক্ত ছত্রগুলিতে তার সমৃদ্ধ অথচ অতলান্ত গম্ভীর স্পষ্ট অভিব্যক্তি। রাজরোষ অনায়াসেই এই পীড়িত, ক্ষুব্ধ মর্মস্থানটির ওপর শাসনাঘাত প্রয়োগ করতে পারতো। হেমচন্দ্রের কবিতায় যে প্রকাশ্য রাজবিদ্রোহিতা শাসক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় বহু আগেই তা অশ্রুজলে, আত্মধিক্কারে, ক্ষোভে, দুঃখে একটি অপূর্ব রূপ গ্রহণ করেছে। প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রেমের কবিতার মাঝে মাঝে এ ধরণের গভীর দেশপ্রীতি কবিধর্মের মৌল চেতনাকে চিনিয়ে দেয়। ঈশ্বরগুপ্তকে স্বদেশপ্রেমিক কবি বলে চিহ্নিত করার জন্য এই কবিতাগুলির সাহায্য নিতে হবে। রাজনীতির সমালোচনার সঙ্গে পীড়িত ও অত্যাচারিত দেশবাসীর জন্য কবির সমবেদনাও উচ্ছ্বসিত।

> এইমত ভয়ংকর রাজ অত্যাচারে।
> দুঃখী প্রাণী প্রজা আর বাঁচিতে না পারে। [ঐ]

এবং সুগভীর আন্তরিকতায় কবি এই পীড়ন ও অত্যাচারের আঘাত ও বেদনা

প্রকাশ করেছেন নির্ভীকভাবে। প্রজার পীড়নে কবি অস্থিরচিত্ত হয়েছেন, বেদনায় মূক হয়েও কবি কাব্যে তা বাঙ্ময় করে প্রচার করেছেন ঘরে ঘরে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত সুনিপুণ ও তীক্ষ্ণধী সমালোচক বোধকরি ঈশ্বরগুপ্তের কবিচিত্তের এই বেদনাঘন অন্তরাত্মাটি প্রত্যক্ষ করেই উচ্ছ্বসিত হয়েছেন,—প্রশংসা করেছেন তাঁর অমলিন দেশপ্রেমকে। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের প্রসঙ্গে যে কথাটি বলেছেন—তাঁর প্রচ্ছন্ন স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতার প্রসঙ্গে তা অতিসত্য, "মূলকথা, তাঁর কবিতার অপেক্ষা তিনি অনেক বড় ছিলেন। তাঁহার প্রকৃত পরিচয় তাঁহার কবিতায় নাই।" ঈশ্বর-গুপ্তের সাহিত্যচর্চায় তাঁর চিন্তা-ভাবনার যথাযথ প্রতিলিপি মেলে না, নতুবা সে যুগের সমস্ত আর্তি মর্মে মর্মে অনুভব করেও তিনি তার সংহত রূপদানে অসমর্থ হলেন কেন? ব্যঙ্গে, বিদ্রূপে, ইয়ারকি ও তামাসায় তিনি তাঁর অপরিসীম সম্ভাবনাকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিয়েছেন,—কেন্দ্রবদ্ধ করে কাব্যে তা রসমণ্ডিত করতে পারেন নি। অন্ততঃ তাঁর দেশপ্রেমচিন্তা সম্পর্কে একথা সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র আক্ষেপ করেছিলেন তাঁর সম্ভাবনার বিনষ্টি দেখে। চিন্তার ক্ষেত্রে প্রাগ্রসর হয়েও শুধু ভাব ও ভাষায় জনমনোরঞ্জন করেই কবি ক্ষান্ত হয়েছেন। তাঁর চিন্তাভাবনা থেকে প্রতিভাশালী কবিসম্প্রদায় কিছুই গ্রহণ করতে পারেন নি—না আঙ্গিক, না ভাষা, না রীতি; ঈশ্বরগুপ্ত রইলেন প্রাচীন ও আধুনিকের মাঝখানে প্রণালী হয়ে কিন্তু তাঁর ভাবনা সমুদ্রের এক বিন্দুবারিও পরবর্তী যুগসমুদ্রের সঙ্গে মিশতে পারল না—এ আক্ষেপ আমাদেরও।

ঈশ্বরগুপ্তের সমগ্র সাহিত্যের নিখুঁত বিচার না করে তার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত মনোভাব পোষণ অসঙ্গত কিন্তু দেশচিন্তার ক্ষেত্রে তাঁর স্থান নির্ণয় করা খুবই সহজ। অন্ততঃ এই একটি ক্ষেত্রে তাঁর দান উল্লেখযোগ্য ভাবেই আধুনিকতার পর্যায়ে পড়ে। ঈশ্বরগুপ্তের আগে রাজনীতি কিংবা রাজনীতির খুঁটিনাটি নিয়ে আর কেউই কবিতা-রচনার কথা চিন্তা করেননি,—সামাজিক চিত্র বর্ণনার মধ্যেও রাজনীতির পরোক্ষ প্রভাব অনুভব করেননি সে যুগের কোন মানুষ। রাজনীতি ও সমাজনীতিকে মিশ্রিত করে সমাজচেতনার আধুনিক ব্যাখ্যাও তাঁর কবিতা থেকেই মিলবে। অথচ দীর্ঘদিন সাহিত্যে যে সমাজচিত্র পেয়েছি রাজনীতির সঙ্গে তার সম্পর্ক বিন্দুমাত্র নেই। কোন কোন ক্ষেত্রে নিছক নিসর্গ বর্ণনাতেও সমাজ ও রাজনীতি এসে দাঁড়িয়েছে পাশাপাশি। অথচ শক্তি ও শিক্ষার দীনতায় ঈশ্বরগুপ্তের কবিসত্তার মৌলিকত্ব কৌলিন্যের জয়টীকা পায়নি—পাবেও না।

ঈশ্বরগুপ্তের প্রচ্ছন্ন দেশপ্রেমমূলক কবিতার মধ্যে তার সামাজিক ও ব্যঙ্গকবিতার আলোচনা করতেই হয়। এ প্রসঙ্গের কবিতাগুলি উপভোগ্যতায় অনেক কবিতাকেই

টেক্কা দিতে পারে। নীলকর, দুর্ভিক্ষ, বড়দিন, এণ্ডাওয়ালা তপসে মাছ, বাবু চণ্ডীচরণ সিংহের খ্রীষ্টধর্মানুরক্তি, ছদ্ম মিশনরি, বিধবা বিবাহ আইন, ইংরাজী নববর্ষ, বর্ষবিদায় ইত্যাদি কবিতা অভিনব ভাবরসের, চিন্তা-ভাবনার কৌতুককর প্রকাশ। কথার ফোয়ারা সৃষ্টি করে কবি তাতে আনন্দে অবগাহনের আকাঙ্ক্ষা মিটিয়ে নিচ্ছেন। হাস্যকর পরিস্থিতি, উদ্ভট শব্দপ্রয়োগে অচঞ্চল কবিচিত্ত যেন অবাধ ও দুর্বার। এসব কবিতায় কাব্যরস নেই কিন্তু চিত্রকল্প আছে—আর সেইসঙ্গে সমাজের বিক্ষিপ্ত মনোভাবটিকে কবি কয়েকটি কথায় অনবদ্যভাবে ফোটাতে পেরেছেন। শব্দ প্রয়োগে শ্লীলতা-অশ্লীলতা একাসনে বসেছে,—গ্রাম্যতা একচ্ছত্র আধিপত্য করেছে,—সর্বোপরি বক্তব্যপ্রকাশের জন্য কবি যে কোন শব্দসাহায্য গ্রহণ করেছেন; শুধু যেন কিছু বলতে হবে বলেই কাব্যলক্ষ্মীর শরণাপন্ন হওয়া। কাব্যসৌন্দর্য সৃষ্টির কোন তাগিদ নেই, সে ক্ষমতাও কবির আয়ত্তাধীন নয়, শুধু বলবার জন্য বলা আর বলার নেশায় পাওয়া কবি যত্রতত্র থেকে বাক্যসংগ্রহ করেছেন। কবিজনোচিত মনোভঙ্গিমা ও গাম্ভীর্য নেই, ভাবসমুদ্রের অনাস্বাদিত আনন্দ এখানে সৃষ্টির পক্ষে অপরিহার্য নয়—তবু ত বক্তব্য। আর সমাজনীতি, রাজনীতি, স্বদেশীয়ানা, বিদেশীয়ানা মিশিয়ে এ এক বিমিশ্র কথামালা। ইংরাজী নববর্ষ বর্ণনায় ইংরেজীয়ানার প্রতি হিন্দুদের সতৃষ্ণ মনোভাবটি কথার আঁচড়ে মূর্ত করা কবির পক্ষে অত্যন্ত সহজ এবং এ ধরণের পদ্য-রচনায় কবি সিদ্ধহস্ত, কিন্তু চিত্রকল্পনাটি প্রাণবন্ত,—

> রাঙামুখ দেখে বাবা টেনে লও হ্যাম।
> ডোণ্ট ক্যায় হিন্দুয়ানী ড্যাম ড্যাম ড্যাম॥
> পিঁড়ি পেতে ঝুরো লুসে মিছে ধরি নেম।
> মিসে নাহি মিস খায় কিসে হবে ফেম॥

সে যুগের ইংরেজীয়ানার প্রতি লুব্ধ দৃষ্টিপাতের সঙ্গে অর্থহীন বীরত্বের চমৎকার মিশ্রণে চিত্রটি জীবন্ত কিন্তু ব্যঙ্গের ঝাঁঝে মিশে আছে একটি নির্মম সত্য—'মিসে নাহি মিস খায় কি সে হবে ফেম' দুটি বিপরীতধর্মী মনোভাবের প্রতি কটাক্ষপাত। ধর্মত্যাগে তৎপর সে যুগের ক্রীশ্চানী মনোভাবাপন্ন হিন্দুসম্প্রদায়ের প্রতি কবির নির্মম হাস্যোক্তি—

> দিশীকৃষ্ণ মানিনেক ঋষিকৃষ্ণ জয়।
> মেরিদাতা মেরিসুত বেরি গুড বয়॥

যীশুর এই ব্যাখ্যাটিও অভিনব।—ক্রীশ্চানী হুল্লোড় দেখে যীশুকে 'মেরি দাতা' বলে ব্যাখ্যা করার লোভ সামলাতে পারেননি কবি। পরিহাসরসিকতার মধ্যে সমাজ, ধর্ম, নীতিরক্ষার জন্য এই ব্যঙ্গরঙ্গের হাতিয়ার প্রয়োগ করে ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর

সমাজপ্রীতি ও জাতিপ্রীতির পরোক্ষ পরিচয় দিয়েছেন। 'সামাজিক ও ব্যঙ্গ' পর্যায়ে এ ধরণের অজস্র কবিতার মধ্যে ঈশ্বরগুপ্তের ক্ষমাহীন মনোভাব অক্ষম আক্রোশে গর্জন করে উঠেছে মাত্র।

সমাজ, ধর্মরক্ষার জন্য ঈশ্বরগুপ্ত প্রগতিকে অস্বীকার করে নির্মম অনুদারতারও পরিচয় দিয়েছেন। এসবক্ষেত্রে দূরদর্শিতার অভাবে—সমাজের প্রগতির যথার্থ প্রবণতা হৃদয়ঙ্গম না করে ঈশ্বরগুপ্ত নিন্দিত হয়েছেন। সে যুগের সমাজচেতনার মূলে সংস্কারবৃত্তির বৈপ্লবিক প্রকাশ ঘটেছিল রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক শক্তিতে। যুগোত্তীর্ণ মনীষা ও সংগ্রামের অবিচল নিষ্ঠায় তাঁরা পর্বতসম, দেশপ্রেম তাঁদের দৃষ্টিকে নতুন প্রেরণা ও সংগ্রামসামর্থ্য দান করেছিল। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের স্বভাবে ঠিক তার বিপরীত বৃত্তি লক্ষ্য করেছি। তাঁর ধারণা ও জীবনচর্যা চিরাগত সংস্কারকেই মেনে নিয়ে তৃপ্ত। এটি নিজস্ব সংস্কৃতির প্রতি আত্যন্তিক নিষ্ঠা ও দেশপ্রীতির সাবেকী ভঙ্গিমা। ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রেম সংস্কার চায় নি;—নিজের সমাজের সমস্ত ত্রুটিকেও মহনীয় করে দেখার মধ্যে একটা আত্মগরিমা আছে, সেই অহমিকাই তাঁকে কোথাও কোথাও অনুদার করে তুলেছে। শ্রীসুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন—"বাঙ্গালীর সংস্কৃতির প্রতি ঈশ্বরগুপ্তের টান ছিল আন্তরিক। তাঁহার গোঁড়ামীরও প্রধান মূল ইহাই।"—সেজন্যই তিনি আভ্যন্তরীণ সংস্কারকে অভিনন্দন জানাতে পারেননি, বিরূপতায় মুখ ফিরিয়েছেন। অথচ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সার্থক মিলনের মধ্যে আমাদের ভাবীযুগের উদ্বোধন অপেক্ষমান,—সে যুগের এই সহজপ্রবণতাটি ঈশ্বরগুপ্তের দৃষ্টিভঙ্গিতে ধরা পড়েনি। যুগকে অতিক্রম করে রামমোহন সুদূর ভবিষ্যতের ছবি দেখেছিলেন,—তাঁর প্রকাশ্য বক্তৃতার একটি অংশের বক্তব্য,—From my personal experience, I am impressed with the conviction that the greater our intercourse with European gentlemen, the greater will be our improvement in literacy, social and political affairs; a fact which can be easily proved by comparing the condition of those of my countrymen who have enjoyed this advantage with that of those who unfortunately have not had that opportunity".[৩]

ঈশ্বরগুপ্তের প্রতি কোন কটাক্ষপাত এখানে আছে কি না জানি না কিন্তু যদি এটা সে যুগের আচারসর্বস্ব কোন দেশপ্রেমিকের প্রতি আরোপ করি তাহলেও খুব বেশী

৩. J. C. Ghose, 'The English Works of Raja Rammohan Roy' Lecture given on 15th Dec. 1829 at Town Hall of Calcutta.

ভুল হবে না। ঈশ্বরগুপ্ত "সংবাদ প্রভাকরের" মধ্যে যে দেশপ্রেমিকতার বন্যা বহিয়েছিলেন তাতে এই আচারসর্বস্বতা কতক পরিমাণে ধরা পড়েছে। বিশেষ করে, বিধবাবিবাহের প্রসঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের এই গোঁড়ামী বড় বেশী প্রকট হয়েছে। দেশপ্রীতির যে প্রলেপে এই গোঁড়ামীও সমর্থনযোগ্য হয়ে ওঠে, বিধবাবিবাহের প্রতি কদর্য কটাক্ষপাতে তা অনেক সময়ই অসহনীয় মনে হয়। কিন্তু এ প্রসঙ্গ ছাড়া অন্যত্র এই ধরণের গোঁড়ামী সত্যিই চোখে পড়ে না। "বিধবা বিবাহে" ঈশ্বরগুপ্তের অসম্ভব প্রস্তাব যে একদিন কালের দাবীতে সত্য ও বাস্তব হয়ে উঠবে এই ধারণা থাকলে হয়ত চ্যালেঞ্জ করার দুঃসাহসকে তিনি দমিত করতেন। বিধবাবিবাহ আইন প্রসঙ্গে তার চ্যালেঞ্জ,—

"গোপনেতে এই কথা বলিবেন তারে।
জননীর বিয়ে দিতে পারে কি না পারে॥
যদি পারে তবে তারে বলি বাহাদুর।
এমনি করিলে সব দুঃখ হয় দূর॥
সহজে যদ্যপি হয় এরূপ ব্যাপার।
করিতে হবে না তবে আইন প্রচার॥

এই চ্যালেঞ্জের জবাব বিদ্যাসাগরপন্থীদের একজন দিয়েছিলেন জননীর পুনর্বিবাহ দিয়ে। বাহাদুরীর খেতাবও হয়ত লাভ করেছিলেন—কিন্তু আইন করেও যে দেশাচার, সংস্কার রোধ করা যায় না—এ সত্যও অবধারিত। সুতরাং উনবিংশ শতাব্দীর প্লাবনবন্যার পলিমাটিতে দীর্ঘদিন ধরে যে সভ্যতা গড়ে উঠেছে, যুগচাঞ্চল্য স্তিমিত হয়ে যে সহজসত্য আত্মপ্রকাশ করেছে, সেখানে ঈশ্বরগুপ্তের চ্যালেঞ্জ এখনও এক বিরাট প্রশ্ন। বাহাদুরী পাবার লোভ থেকে মুক্তি পেয়ে আমরা দেখেছি গোঁড়ামীর মধ্যেও, আচারসর্বস্বতার মধ্যেও জাতিচরিত্রের একটি অনির্বাণ মৌলিকত্ব আছে—যুগ যুগ ধরে যা সমাজ লালন করে আসে—চাঞ্চল্যে তা স্থানচ্যুত হয় বটে কিন্তু অপসৃত হয় না। সুতরাং এই আচারসর্বস্বতার মধ্যেও দেশপ্রীতির সুন্দর স্পর্শ আছে—তা অস্বীকার করা চলে না। এই প্রসঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের গোঁড়ামি সমর্থন না না করেও উদারতারও অসংখ্য নিদর্শন দেখানো যায়। কৌলিন্যের অসার গর্ব, সামান্য ধর্মীয় আচার উৎসব নিয়ে অহেতুক ও অসংগত মাতামাতির হুবহু চিত্র তিনিই লোকসমক্ষে তুলে ধরেছেন। "কৌলীন্য" কবিতায় দেশাচারের-লোকাচারের প্রতি কবির বীতরাগের সুন্দর নিদর্শন আছে,—

মিছা কেন কুল নিয়া কর আঁটাআঁটি।
এ যে কুল কুল নয় সারমাত্র আঁটি॥

কুলের গৌরব কর কোন অভিমানে।
মূলের হইলে দোষ কেবা তারে মানে॥

*   *   *   *

কুলের সম্ভ্রম বল বলিব কেমনে।
শতেক বিধবা হয় একের মরণে॥
বগলেতে বৃষকাষ্ঠ শক্তিহীন যেই।
কোলের কুমারী লয়ে বিয়ে করে সেই॥
দুধে দাঁত ভাঙ্গে নাই শিশু নাম যার।
পিতামহী সম নারী দারা হয় তার॥ [কৌলীন্য]

নিতান্ত অশোভন, অসঙ্গত, যুক্তিহীন দেশাচারকে কবি কখনও সমর্থন করেননি। এই দেশাচারের প্রতি তাঁর অভিযোগও অন্তহীন। সে যুগের 'স্নানযাত্রার' পর্বটি কবি চমৎকারভাবে চিত্রিত করেছেন,—

আমাদের এই বঙ্গ কোন ক্রমে নহে ভঙ্গ
নানারাগ রঙ্গরসভরা

*   *   *   *

উচ্চ আর নীচ জাতি বাবু হোয়ে রাতারাতি,
মাতামাতি করে কত রূপ।
ফুলায় বুকের ছাতি যেন নবাবের নাতি
হাতি কিনে হোয়ে বসে ভূপ।

এবং স্নানযাত্রার অতিপরিচিত একটি জীবন্তচিত্র তুলে ধরে কবি তার শেষ মনোভাব প্রকাশ করেছেন এভাবে,—

আমি যে অভাগা অতি, স্বভাবতঃ ক্ষীণমতি,
কোন কালে মাহেশে না যাই।
ইচ্ছা হেন থাকে জ্ঞান, করিয়া বিভুর ধ্যান,
ঘরে যেন মুক্তিস্নান পাই॥

'পাঁটা' কবিতায় নানা প্রসঙ্গের অন্তরালে বৈষ্ণব ধর্মের নিতান্ত দৃষ্টিকটু রূপটিও চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন।

কোপ্নীধারী প্রেমদাস সেবাদাসী নিয়ে।
দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে খঞ্জনী বাজিয়ে॥

হিন্দু কলেজের পঠনপাঠনরীতির সঙ্গে কলেজের নামকরণের কি নিদারুণ পার্থক্য। কবি এ নিয়ে রসিকতা না করে পারেননি।

নগরে অনেক কেলে হিন্দুর কালেজ।
গেল তার হিন্দুনাম ঘুচিয়াছে তেজ।

এরপরে মিসেনরি, রেতে জেলে সেজ।
খুলিবেন থিয়েটার বাইবেলের পেজ॥
কাজ নাই নিয়ে আর ইংলিস নালেজ।
কালেজের নাম হোলো, খিচুরি কালেজ॥

হিন্দু কলেজে খ্রীষ্টান ছাত্র ভর্তি উপলক্ষ্যে কবির এই ব্যঙ্গ কবিতাটিও অনবদ্য। আবার হিন্দুয়ানীর জগাখিচুড়ি দেখেও সখেদে কবি আক্ষেপ করেছেন,—

পিতাদেয় গলে সূত্র পুত্র ফেলে কেটে।
বাপ পূজে ভগবতী বেটা দেয় পেটে॥

*　　　*　　　*　　　*

বুড়া বলে রাধাকৃষ্ণ ছোঁড়া বলে ঈশু।
হাসি পায় কান্না আসে কব আর কাকে?
যায় যায় হিঁদুয়ানী আর নাহি থাকে॥　　　[আচারভ্রংশ]

সুতরাং ঈশ্বরগুপ্তের গোঁড়ামীর মূলে আন্তরিকতার অভাব ছিল না। দেশাচারের বিকৃতিকে প্রশ্রয় না দিয়ে সমাজের সনাতন নীতিনিয়মের প্রতি তাঁর অগাধ আস্থাই প্রমাণ করে সমাজের কল্যাণচিন্তাই তাঁর মূল ভাবনা। সমাজচিন্তা তাঁর কবিতার একটি বিরাট অংশ জুড়ে আছে এবং সে কবিতাতে তাঁর অনায়াসপটুত্বও সহজেই ধরা পড়েছে।

নীলকর প্রসঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তের বৃহৎ আয়তনের কবিতাটি এ প্রসঙ্গে আলোচনার যোগ্য। নীলকরসাহেবের অত্যাচারে বাংলাদেশ জর্জরিত মুমূর্ষুপ্রায়। বাঙ্গালীর স্বপক্ষে এই সময়ে যাঁরা কিছু বলেছেন—তাঁরা নমস্য। নীলকর সাহেবদের অত্যাচার প্রসঙ্গটি আমাদের নিপীড়নের ইতিহাসের এক চাঞ্চল্যকর অধ্যায়; সাহিত্যে স্থান পেয়েই তার গুরুত্ব পরবর্তীকালে আরও লক্ষণীয় হয়েছে। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' সংগ্রামী মানুষের মনে প্রেরণা এনেছে,—আন্দোলনের অর্থকে আরও ব্যঞ্জিত করেছে,—সে ইতিহাস আলোচনারই যোগ্য। ঈশ্বরগুপ্তের সমাজদরদী হৃদয় এই অত্যাচারচিত্র রচনায় যে কতটা সংবেদনশীল হয়ে উঠেছিল—তার প্রমাণ এই সুবৃহৎ কবিতাটি। ঈশ্বরগুপ্তের সমাজচেতনার প্রসঙ্গে দেখেছি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপের ভঙ্গিমা। প্রতিটি মুহূর্তেই তিনি সচেতনভাবে সমাজকে সমালোচনা করেছেন,—এ ব্যাপারে তার দ্বিধা নেই, মন্থরতা নেই। তিনি স্পষ্টবাক্ ও ঋজু, নির্ভীক ও সত্যবাদী। রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে জনজীবনের পিষ্ট-দলিত-নিপীড়িত চিত্র তুলে

ধরতেও তাঁর বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই,—তবে লক্ষ্যণীয় এই যে সমাজসমালোচনায় ব্যঙ্গ আর বিদ্রূপের কষাঘাত যত তীব্র, রাজনৈতিক প্রসঙ্গে সেই ব্যঙ্গ সম্পূর্ণ অন্তর্হিত। রাজনীতির সমালোচনায় ঈশ্বরগুপ্তের আর্জিতে যেন অনুনয়ের মৃদুস্পর্শ ; সমালোচনার তীব্রতা এখানে আর্তিরূপে প্রকাশিত। রাজনীতি, শাসননীতির সমালোচনায় স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের অনুপস্থিতির হেতু সন্ধানে বেশীদূর যেতে হবে না। রাজ-নীতির নাগপাশে শৃঙ্খলিত আত্মার গর্জনধ্বনি সাময়িক রোষটুকু এড়াবার জন্যই মৃদুতায় পর্যবসিত হয়েছে। বক্তব্যকে জনগণের সামনে তুলে ধরতে গেলে এই নতির কলঙ্ক স্বীকার না করাটাও ব্যর্থতারই নামান্তর। ঈশ্বরগুপ্তের রাজপ্রীতির নিদর্শনরূপে এই বাগ্‌ভঙ্গিমাকে সাক্ষী রাখা চলে কি না বিচার্য, কিন্তু বক্তব্যের গভীরে ঘনীভূত বেদনাও পীড়নের মর্মন্তুদ আর্তনাদ অতিসহজেই মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। বাগ্‌ভঙ্গিমার বিনতি দিয়েও অন্তরাত্মার আর্তক্রন্দন প্রতিহত হয়েছে কি ? 'নীলকর' কবিতাটির মধ্যে একাধারে শাসন সমালোচনা, অত্যাচারের অনাবৃত বর্ণনা, বক্তব্যের তির্যক ব্যঞ্জনার বিমিশ্ররূপ দেখা যায়। নীলকর অত্যাচারের হুবহু চিত্রটি অঙ্কন করে ঈশ্বরগুপ্ত জনচিত্তকে অন্ততঃ দেশের আভ্যন্তরীণ শাসন সম্বন্ধে সতর্ক করেছেন। দীর্ঘ কবিতাটি তিনি কবিগানের ভঙ্গিতে রচনা করেছেন। জানি না গায়েনের কণ্ঠে এই অত্যাচার কাহিনীর বহুল প্রচারের কোন উদ্দেশ্যমূলক প্ররোচনা এতে ছিল কি না। কিন্তু অনুনয়ে, ক্ষোভে, দুঃখে-বেদনায়, কটাক্ষে ও হাহাকারে কবিতাটিকে একটি আশ্চর্য সৃষ্টি বলে মনে হয়। নীলকর অত্যাচার সম্ভব হয়েছিল আমাদের দুর্বলতার ও অসহায়তার রন্ধ্রপথে। পরাজিত-আত্মবিক্রীত জাতির জীবনে অত্যাচারের ঘটনায় নতুনত্ব কিছু নেই ; শাসকগোষ্ঠীর স্বেচ্ছাচারের অধিকারের সনদ আমরাই তাদের হাতে তুলে দিয়েছি। জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতা, অসহায়তার জীবন্ত সত্যকে এ কবিতায় তুলে ধরেছেন কবি,—

নামেতে নীলের কুটি হতেছে কুটি কুটি
দুঃখী লোক প্রাণে মারা যায়।

* * * *

নীলকরের হদ্দ লীলে নীলে নিলে সকল নিলে,
দেশে উঠছে এই ভাষ
যত প্রজার সর্বনাশ।
কুটিয়াল বিচারকারী, লাঠিয়াল সহকারী,

* * * *

হলে ভক্ষকেতে রক্ষাকর্তা ঘটে সর্বনাশ। [নীলকর]

উত্তেজনা সঞ্চারের পক্ষে এই চিত্রই অনবদ্য ;—কিন্তু উত্তেজনার আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ার আবেগ তখনও জাতীয় চরিত্রে আসেনি। যখন 'নীলে নিলে সকল নিলে'—মান, সম্ভ্রম, সুখশান্তি, নিরাপত্তা হারালো ক্লান্ত মন তখনও বিদ্রোহী হয়ে ওঠেনি, অসহায়ভাবে মাথা পেতে নিয়েছে অত্যাচারের আঘাত। ঈশ্বরগুপ্ত আমাদের সর্বহারার আর্তনাদ শুনিয়েছেন এবং সকাতর অনুনয়ে এ জাতির এই দুঃখবেদনা লাঘবের আবেদন জানিয়েছেন। হাস্যকর ও অচিন্ত্যনীয় হলেও সেযুগে এই আর্তি প্রকাশ ছাড়া আর কিই বা করা যেতো। যে সংঘবদ্ধ চেতনা ও দেশভাবনা মানুষকে বিদ্রোহী করে—সেই চিন্তাভাবনার ক্ষেত্র তখনও অপ্রস্তুত। ব্যঙ্গের চাবুকে ঈশ্বরগুপ্ত জাতীয় চরিত্রের এই সহজ মর্মান্তিক সত্যটি তুলে ধরেছেন,—

বাঙ্গালী তোমার কেনা, এ কথা জানে কে না ?
হয়েছি চিরকেলে দাস ॥
তুমি মা কল্পতরু আমরা সব পোষা গরু
শিখিনি শিং বাকানো,

* * * *

আমরা ভুসি পেলেই খুসি হব,
ঘুসি খেলে বাঁচব না ॥ [ঐ]

নির্মম হলেও এতে মিথ্যাভাস নেই এতটুকু। জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতাকে এমন যথাযথ ভাবে তুলে ধরেছেন খুব কম কবিই। আমাদের দাসত্ব প্রবণতার সঙ্গে পোষা গরুর প্রভেদ কোথায় ? ঈশ্বরগুপ্তের এ কবিতায় মর্মান্তিক আঘাত পেয়ে কেউ কবির কাছে প্রতিবাদপত্র পাঠিয়েছিলেন কি না জানা যায় নি। সত্য ও অবিকৃত সত্য বলে বাঙ্গালী তা শিরোভূষণ করেছে। এরও অনেক পরে স্বাধীনতা আন্দোলনের উদ্দেশ্য ও উৎসাহ প্রচারের জন্য স্বদেশপ্রেমী নাট্যকার আত্মশ্লাঘায় ও আত্মবিশ্বাসে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘোষণা করেছিলেন,—

মানুষ আমরা নহি ত মেষ।

মেষত্ব অস্বীকারের স্পর্ধা নিয়েই জাতিকে আন্দোলনের অর্থ সম্বন্ধে সচেতন করেছিলেন তিনি, কিন্তু মেষের সঙ্গে উপমার যে আভাস এখানে স্পষ্ট হয়েছে—তা তো অস্বীকার করা যায় না। ঈশ্বরগুপ্ত জাতীয় চরিত্রের সূক্ষ্মতম হৃৎস্পন্দন ধরতে পেরেছেন—এটা কৃতিত্বেরই কথা। অথচ নীলকরের সর্বনাশা অত্যাচারে মুমূর্ষু বাংলা, কবিও নিরুপায়। সখেদে কবি বলেন,

তোমার সাধের বাংলা, হল কাংলা
সয় না অত্যাচার।

বেগারে হয় রেয়োৎ সারা, জমিদার পড়ে মারা,
লাটের দিন খাজনা হয় না তার। [ঐ]

অথচ দেশের এই অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশায় আমরা নীরব সাক্ষী। শক্তিহীনতায়, আত্মরক্ষার মূলমন্ত্র আমরা বিস্মৃত হয়েছি, আমাদের মেরুদণ্ড অত্যাচারে ভগ্নপ্রায়, চিত্ত অবসন্ন। ঈশ্বরগুপ্ত ব্যঙ্গ ও বেদনায়, হতাশা ও ক্রন্দনে আক্ষেপ করেন,—

রাজবিদ্রোহিতা কারে বলে, স্বপ্নে জানিনে,
কেবল ঈশ্বরের নিকটে করি,
তোমার জয়ের বাসনা। [ঐ]

আত্মসমালোচনার এমন দুঃসাহসিক স্বীকারোক্তি সাহিত্যে প্রায় দুর্লভ, আর সচেতন মানবিকতায়, দেশপ্রেমে মগ্ন হয়ে যিনি প্রথম এই মর্মান্তিক আত্মসত্য উদ্ঘাটন করতে সক্ষম তিনি প্রতিভাশালী কবি না হলেও পরমাত্মীয়, ক্রান্তদর্শী, দেশপ্রেমী, জাতিপ্রেমী। নীলকর প্রসঙ্গ নিয়ে সাহিত্যে যে যুগান্তকারী আন্দোলন জনচিত্তকে আলোড়িত করেছিল—সেই 'নীলদর্পণ' নাটকের নাট্যকার ঈশ্বরগুপ্তের ভাবশিষ্য ছিলেন। অন্ততঃ ঈশ্বরগুপ্তের এ কবিতা একটি মহৎ সৃষ্টির প্রেরণা যে দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ঈশ্বরগুপ্ত যে শব্দটিতে ভাবী যুগের ইঙ্গিত দিয়েছেন সেই রাজবিদ্রোহিতা সম্বন্ধে তাঁর অন্ততঃ মানসিক অজ্ঞতা ছিল না। অথচ কি নিদারুণভাবে বদ্ধাঞ্জলি হাতে মহারাণীর কৃপাভিক্ষা করেছেন তিনি,—

এই রাজ্যটি করেছ মা খাস।
এসে এ দেশেতে বসৎ কর অন্নপূর্ণা মূর্তি ধর,
অন্নদানে বাঁচাও প্রজার প্রাণ।
সব অন্নভূমি কর তুমি, তুলে নিয়ে নীলের চাষ,
হয়ে রাজরাজেশ্বরী কোথা মা পায়ে ধরি
সন্তানে পূরাও অভিলাষ॥ [ঐ]

কিন্তু এই কৃপাভিক্ষা চাওয়ার মধ্যেও আত্মগ্লানির দ্রবরস না মিশিয়ে পারেন নি কবি;—সুতরাং কবিভাবনার সম্পূর্ণতা ভিক্ষার্থীর কাতরোক্তিতে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না, সমগ্র কবিতাটির অন্তর্নিহিত ভাবসত্যের আলোকে তার সন্ধান করতে হবে। কবি যখন কথার কথা হিসেবেও বলেন,

আমার ধন গিয়েছে মান গিয়েছে
এখন মা প্রাণ নিয়ে সংশয়॥ [ঐ]

তখন ধনের সঙ্গে মানের উল্লেখ না করে পারেন না;—অথচ মানের সঙ্গে ধন-প্রাণের সংযোগ নিতান্তই অল্প। ধন প্রাণের অর্থ বুঝি, মান গিয়েছে বল্লে আমাদের

ভাবের ঘরে, আশার ঘরে শূন্যতা যেন অট্টহাস্য করে ওঠে। ঈশ্বরগুপ্তের নিতান্ত অচঞ্চল উক্তির মধ্যেও এধরণের আত্মঘাতী হাহাকার স্পষ্টভাবেই শোনা যায়।

অনেক শব্দতরঙ্গের মাঝখানেও অত্যাচারিতের আর্তনাদ ভেসে আসে কবির লেখনীতে,—

বঙ্গবাসী শত শত বিদ্রোহেতে হল হত
পরিবার ছিল যত,
ধনে প্রাণে হল কাঙ্গালী

নীলকর অত্যাচারে সরকারের নিষ্ক্রিয়তা কবি বারবারই উল্লেখ করেছেন,—

নীলকরের করেতে হোল,
মেজিষ্টরি ভার।
এর বাড়া মা প্রজা লোকের বিপদ নাইক আর।

এবং সরকারের উদাসীনতায় অত্যাচারী নীলকর আমাদের ঘরে ঘরে যে ক্ষুধার্তের আর্তনাদ সৃষ্টি করেছে কবি তার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন স্পষ্টভাবে,—

অন্ন বিনে ঘরে
অনাহারে প্রাণে মরে,
পরস্পরে উচ্চস্বরে,
করে হাহাকার।
দিনান্তরে উদর পূরে অন্ন মেলা ভার।
এ আইন হয়েছে জারি,
মার্তে আমাদের।

ইংরাজশাসনের গলদ ও শাসকসুলভ হৃদয়হীনতার পরিচয় পেয়েই কবি স্তম্ভিত। সভ্যতার ও সংস্কৃতির অন্তরালে হৃদয়হীন বর্বরোচিত শাসকমনোভাবটি গোপন করার কোন ইচ্ছাও ছিল না। শাসকের ধর্ম শক্তির দম্ভপ্রদর্শন, আমরা হয়েছি তারই অসহায় বলি। নীলকর অত্যাচারের মধ্যেই ইংরেজদের শাসকবৃত্তির চরম নগ্নরূপটি প্রত্যক্ষ করেছি। নিরীহ গ্রামবাসীদের অত্যাচারের আর্তনাদে ইংরেজ শাসক নীরব থেকেছেন, শাসনের ভার তুলে নিয়েছে নীলকর সাহেব সম্প্রদায়। উদাসীনতা ও ক্ষমতার যথেচ্ছাচারিতা দিয়ে ইংরেজ তার ক্ষমতালোভী বর্বর অন্তরাত্মাটি আমাদের সামনে মেলে ধরেছে। সমসাময়িক ঘটনা হলেও ঈশ্বরগুপ্ত ইংরেজ শাসনের এই সত্যচিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন অকপটে, চরম দুঃসাহসিকতায়। অন্ততঃ সে যুগের আর কোন লিখিত দলিলে এমন স্পষ্ট ও ঐতিহাসিক চিত্র পাই না। ঈশ্বরগুপ্ত দেশকে ভালবেসেই দেশবাসীর এই মর্মবার্তা প্রকাশ করেছেন,—কোন

ভয়েই তিনি নীরব থাকেন নি। মাঝে মাঝে করজোড়ে ভিক্টোরিয়ার দোহাই পেড়েছেন ;—সাগরপারে রাণী ভিক্টোরিয়ার কানে সে বার্তা অশ্রুতই রয়ে গেছে। এই বিনতিটুকুর আশ্রয় গ্রহণ না করলে সে যুগের অত্যাচারের এই নগ্নতাকে ব্যক্ত করার কোন উপায় ছিল না। নীলকর সাহেবদের অত্যাচারের হেতুনির্দেশেও নির্ভুল সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন, — সন্দেহে সংশয়েও তা অনবদ্য ও যুক্তিনিষ্ঠ।

'সেফায়ে অবাধ্য হয়ে, যুদ্ধ করে বাহুবলে,
দিয়ে উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে,
বাঙ্গালীকে কাটতে বলে।

১৮৫৭ সালে সিপাহীবিদ্রোহের অসম্ভাবিত ঘটনায় সমগ্রভারতে সংগ্রামী সিপাহীদের সুপরিকল্পিত যুদ্ধশক্তির কথা প্রকাশিত হয়ে পড়ে,—ইংরেজশাসক অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে তা দমন করলেও এদেশীয় মনোভাবের সঙ্গে তাঁদের একটা ক্ষণিক পরিচয় ঘটেছিলো। বিদ্রোহী সৈনিক সম্প্রদায় স্ফুলিঙ্গের আভাস দিয়েছিলো মাত্র, কিন্তু দাবানলের প্রতিশ্রুতি সুপ্ত ছিল। শাসকোচিত দূরদৃষ্টি দিয়ে ঠিক তার পরে ১৮৫৯ সালেই সম্মিলিত নীলচাষী-বিদ্রোহকে ইংরেজ শাসক অন্য ব্যাখ্যা দিয়েছে। সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে নিপীড়িত নীলচাষীরা বিদ্রোহী হয়ে সুবিচার প্রার্থনা করেছিল। ঈশ্বরগুপ্ত খুব সংক্ষিপ্ত আকারে তারই প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এখানে। ঈশ্বরগুপ্তের অমলিন দেশপ্রীতির পরিচয়টুকু উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং তাঁর ইংরাজ তোষণব্রত পালনের অর্থটিও ব্যাখ্যা করেছি। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের মত রক্ষণশীল দেশপ্রেমীও মহাত্মা ইংরাজদের প্রশংসা করেছেন,—এটুকু তাঁর স্বচ্ছদৃষ্টির পরিচয় বহন করছে।

মহাত্মা ইংরেজসম্প্রদায়ের প্রসঙ্গে তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা, কিন্তু অত্যাচারী ইংরেজের বিরুদ্ধে তিনি রুষ্ট ; 'নীলকর' কবিতায় তাঁর দেশপ্রেমের উদার মহিমা ধরা পড়েছে। —অসহায় জাতির সামনে এই মহাত্মা ইংরেজদের কথা তিনি অকপটে ব্যক্ত করেছেন, এঁদের প্রতি দোষারোপ যে কতখানি অনুদারতা তাও ব্যক্ত করেছেন,—

বাজে সাহেব দ্বেষী যারা,
কত কটু কহে তারা, মাগো।
কেবল তোমার চরণ করে স্মরণ,
ভাসতে থাকি নয়নজলে।

ইংরেজ মহাত্মার প্রসঙ্গে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা,

হ্যালিডে আর বিডন আদি,
ধর্মবাদী সত্যবাদী, মাগো।

ওমা, আমরা কেবল বেঁচে আছি,
এরা দেশে আছে বলে।

এদের গুণে আছে রাজ্য,
এদের গুণে চলছে কার্য, মাগো
এখন এমন বিধি কর ধার্য,
রাজ্যে যেন সোনা ফলে। [ঐ]

পরবর্তী কালে বহু মনীষী ইংরেজমহাত্মাদের গুণকীর্তন করেছেন কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের মত অপবাদের বোঝা তাঁদের বহন করতে হয় নি।—বস্তুতঃ উদার দৃষ্টিভঙ্গির অধিকারী না হলে সেযুগে শাসক ইংরাজদের স্বপক্ষে অকুণ্ঠ গুণকীর্তন করার সাহসও খুব কম লোকের ছিল। কিন্তু এ যুগেও ঈশ্বরগুপ্তের সঠিক মূল্যবিচার হয়নি এটা আক্ষেপেরই কথা। একমাত্র সাহিত্যপ্রেমী বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে সাহিত্য জগতে স্রষ্টার আসনে সাদরে বরণ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বরগুপ্ত সম্পর্কিত অমূল্য আলোচনাটি না থাকলে ঈশ্বরগুপ্তের স্থান সাহিত্যইতিহাসে যথাযথ নির্ণীত হোত কি না সন্দেহ। ঈশ্বরগুপ্ত একঘরে হয়ে থাকতেন,—তাঁর সত্যিকারের আন্তরিকতার মূল্য না পেলেও আশ্চর্য হবার কিছু ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্তের খাঁটি কবিস্বভাবটি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন বলেই তার জন্য দুঃখ করেছিলেন। কবিস্বভাবের যে বিরাট ঐশ্বর্যে তিনি ধনী ছিলেন, উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তা আত্মপ্রকাশের পথ পায়নি কিংবা যেভাবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেছেন তা তাঁর কবিভাবনার উপযুক্ত ছিল না। কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসের ও সমসাময়িক ঘটনাবৈচিত্র্যের যে নিখুঁত বিবরণ তিনি রেখে গেছেন, এক হিসাবে তা অমূল্য ঐতিহাসিক দলিল বলে বিবেচিত হতে পারে।

ব্যঙ্গে-রঙ্গেও ঈশ্বরগুপ্ত তার স্বমত স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করেছেন। কবিচিত্তের দ্বিধাখণ্ডিত মনোভাব এসব কবিতায় দেখা দেয় নি। একদিকে ইংরাজশাসনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশে অকপট, ইংরাজী সভ্যতা ও অগ্রগতিতে সমর্থন জানিয়েছেন কবি, অন্যদিকে সেই শিক্ষা সভ্যতা যখন দেশীয় আচার আচরণে অসঙ্গতি সৃষ্টি করছে —ঈশ্বরগুপ্ত তখন ব্যঙ্গের আঘাত হেনেছেন;—একই সঙ্গে ঋজু ও স্পষ্টবাক কবির স্বভাবটি বারবারই উঁকি দিয়েছে। দেশীয় শিক্ষাসংস্কৃতির অনুকূলে তিনি কখনও গভীর বিশ্বাসী আবার কখনও বিদেশীয় সংস্কৃতিমুগ্ধতায় আত্মমগ্ন। কিন্তু চিন্তাশক্তির দুঃসাহসিক প্রকাশে তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলি যেন নির্মম চাবুকের মতো। সর্বব্যাপী নৈতিক শিথিলতার এক বীভৎস রূপ দেখে ঈশ্বরগুপ্ত নির্মম ভাবে সমালোচনা করেছেন,

কিন্তু জাতীয় চরিত্রের শিথিলতার প্রতি তাঁর কটাক্ষপাতের বিচার হয়েছে সম্পূর্ণ অন্য অর্থে। ঈশ্বরগুপ্ত প্রগতিবাদী নন বলেই ধিক্কৃত হয়েছেন। সমাজচিন্তার উদার আদর্শ সে যুগে আদৃত হয় নি তার বহু প্রমাণ আছে।—কিন্তু ঈশ্বরগুপ্ত ব্যঙ্গের চাবুকে সামাজিক বিশৃঙ্খলার এই নগ্নরূপ প্রকাশ করে তার নিঃসীম সমাজপ্রীতির পরিচয়ই দিয়েছেন, প্রগতিবাদের পরিপন্থী বলে তাঁর এই আন্তরিক সদিচ্ছাটুকুর অমর্যাদা করা অসঙ্গত। 'দুর্ভিক্ষ' কবিতায় ঈশ্বরগুপ্ত ইংরেজী সভ্যতার সংস্পর্শে আসা হঠাৎবিমূঢ় এই আধুনিকতার বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন.—

হোয়ে হিঁদুর ছেলে টঁ্যাসের চেলে
টেবিল পেতে খানা খাবে।
এরা বেদকোরাণের ভেদ মানে না
খেদ কোরে আর কে বোঝাবে ?
ঢুকে ঠাকুর ঘরে কুকুর নিয়ে
জুতো পায়ে দেখতে পাবে। [দুর্ভিক্ষ]

অতিসামান্য আচারআচরণের এই অসঙ্গতিটুকু কবির মনোজগতে এক বিপুল আলোড়নের সৃষ্টি করেছে। সমাজচেতনার মর্মমূলে বসে কবি যেন পুরাতনের সঙ্গে নবীনের এই বাহ্য পরিচয়টুকুর মধ্যে এক পীড়াদায়ক অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছেন। অথচ ইংরাজী সভ্যতা ও ক্ষমতার প্রতি তাঁর পূর্ণ স্বীকৃতি আমরা দেখেছি। ঈশ্বরগুপ্তের কবিতা বিচার করে তাঁকে গোঁড়া কিংবা সেকেলে বলা কতদূর সঙ্গত সে প্রশ্ন থেকেই যায়—কিন্তু দেশপ্রীতির বিচারে তাঁর মৌলিকত্ব সে যুগের পক্ষে বিস্ময়কর বলে মনে হয়েছে। একদিকে অসহায় কবি ইংরাজশাসনের প্রতি তাঁর আনুগত্য প্রকাশ করছেন অন্যদিকে পরাধীনতার অন্তর্জ্বালা তাঁর বেদনাহত চিত্তটিকে তুলে ধরেছে। একদিকে অশ্রুজলে তিনি তাঁর অসহায়তা প্রকাশ করেছেন, অন্যদিকে সমসাময়িক ইতিহাস বিচারে তিনি যুগোচিত বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন করেছেন। তবু তাঁর সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে যে মর্মবাণীর পরিচয় পেয়েছি অপরিসীম বেদনায় অধীনতার কারাগারে সে যেন তাঁর আর্তক্রন্দন। ব্রিটিশ শাসনের যথার্থ উদ্দেশ্য তাঁর মত সে যুগে আর কেই বা বুঝেছে ? কেই বা বলেছে,—

ধিক ধিক অধীনতা, ধিক্ তোরে ধিক্।
ফুকরে কাঁদিতে হয় লিখিতে অধিক॥ [ব্রিটিশ শাসন]

অনেক প্রশস্তি দিয়েও সে যুগে পরাধীনতার মর্মজ্বালাকে তিনি কোনমতেই নিরুদ্ধ করে রাখতে পারেন নি,— লেখার মধ্যে তা কতটুকুই বা বলা যায় ? তাই কবির এই ক্রন্দনসিক্ত অন্তরটির মধ্যে দেশপ্রেমের এক অমলিন সত্য সাহিত্যের সত্য হয়ে

উঠেছে। দেশপ্রেম সাহিত্যের এক নতুন দিক পরিবর্তনের আভাস দিচ্ছে। আত্মউপলব্ধির সেই মহিমায় ঈশ্বরগুপ্ত প্রোজ্জল। Ruskin যেভাবে ব্যাখ্যা করেছেন "The spectacle of the man who finds it a sweet and comely thing to lay down his life for his country in distress has inevitably been a constant theme of literature.[৪]

ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রেমও ঠিক সেভাবে সাহিত্যের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। দেশভাবনার সাহিত্যরূপ দিয়ে ঈশ্বরগুপ্ত সাহিত্যের পরিসর বিস্তৃত করেছেন,—সেই সঙ্গে আগামী দিনের পাথেয় সঞ্চিত করেছেন। দেশপ্রেমী কবি ঈশ্বরগুপ্ত সম্বন্ধে ওয়ার্ডসওয়ার্থের এ কবিতাংশ যদি প্রয়োগ করি তবে তা খুব অসঙ্গত হবে না।

> Who whether praise of him must walk the earth
> For ever, and to noble deeds gave birth,
> Or he must fall, to sleep without his fame,
> And leave a dead unprofitable name—
> Finds comfort in himself and in his cause ;
> And while the mortal mist is gathering, draws
> His breath in confidence of Heaven's applause :
> This is the happy warrior.[৫]

যুদ্ধসংগতি নিয়ে দেশের জন্য আত্মদানের মহিমাকে সেযুগে কল্পনা করতেও পারিনি তবু ঈশ্বরগুপ্তকে যেন সংগ্রামী সৈনিকের মতই অস্থির মনে হয়। দেশ-ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ঈশ্বরগুপ্তের কবিসত্তাকে চিনে নেওয়া যায় না। নিতান্ত ব্যক্তিগত হলেও এই চিন্তা যেন সে যুগের পীড়িত আত্মার প্রতিধ্বনি। ঈশ্বরগুপ্তের এই দেশপ্রীতিকে ব্যক্তিগত আখ্যা দেওয়ার কারণ, এই চিন্তাভাবনার সঙ্গে বৃহত্তর জনসমাজের যোগাযোগ নেই,—এখানেই তাঁর অপরিসীম মৌলিকত্ব। কোন আদর্শের কাছ থেকে এই চিন্তার সম্পদ তিনি লাভ করেননি; এ তাঁর স্বকীয় সম্পদ। পরবর্তী যুগের দেশভাবনার সঙ্গে এর বৈসাদৃশ্য প্রচুর। ইংরাজী সাহিত্যে Private Patriotism বলে যা ব্যাখ্যা করা হয়েছে, ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রীতি বোধ হয় তাই। শুধু ভালবাসার জন্য ভালবাসা, যা প্রতিটি নাগরিকের ধর্ম, "স্বর্গাদপি গরীয়সী"

৪. Quoted from 'Patriotism in Literature' London, 1924, P-43.

৫. Quoted from 'Character of the Happy Warrior', 'The Patriotic Poetry of Wordsworth', Arthur H. D. Acland, Oxford, 1915.

জন্মভূমির জন্য সার্বজনীন দেশপ্রেম যা প্রতিটি মানুষের মনে অপূর্ব এক ভাবানন্দ সৃজনে সক্ষম। ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেম তাই উদ্দেশ্যহীন উপলব্ধি, গভীরতর অথচ শান্ত। একে ব্যাখ্যা করা যায় এভাবেও,—"The love of country may have many occasions and it cannot be said that one is ampler than another. This mood is unconditional ardour, asking and offering nothing, is neither more nor less worthy than the moods of service and sacrifice ; it is different "[৬]

ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর দেশবাসীকে আত্মউপলব্ধির বিষণ্নতা, ভাগ্যবিড়ম্বনার করুণ কাহিনী শুনিয়েছেন পরবর্তী যুগে তা পল্লবিত, সঞ্চারিত, বিধূমিত হয়েছে অতি-সহজেই। দেশপ্রেম জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে,—দেশভাবনার মূল্য স্বীকৃত হয়েছে। ঈশ্বরগুপ্তের সাহিত্যশিষ্যদের শিরায় শিরায় দেশপ্রেমের যে মাদকতা সঞ্চারিত হয়েছিল তাঁর প্রত্যক্ষ ভাবশিষ্য রঙ্গলালের কাব্যালোচনায় তা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। "সংবাদ প্রভাকরের" পৃষ্ঠায় যাঁদের সাহিত্যজীবনের সূত্রপাত পরবর্তী-কালের সেই স্বনামধন্য সাহিত্যসেবীদের মধ্যে রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়ের নাম করা যায়। 'সংবাদ প্রভাকর' সেযুগের শীর্ষস্থানীয় মুখপত্র, স্বয়ং সম্পাদক ঈশ্বরগুপ্ত রঙ্গলাল প্রসঙ্গে সংবাদ প্রভাকরের পৃষ্ঠায় লিখেছিলেন,—

"রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় অস্মদ্দিগের সংযোজিত লেখকবন্ধু, ইঁহার সদ্‌গুণ ও ক্ষমতার কথা কি ব্যাখ্যা করিব।"[৭]

সাহিত্যক্ষেত্রে রঙ্গলালের কৃতিত্বের বিচার না করে শুধু দেশপ্রেমী সাহিত্যস্রষ্টা হিসাবে বাংলা সাহিত্য তাঁর কাছ থেকে কী পেয়েছে সে বিচার করব। সে প্রসঙ্গে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ঈশ্বরগুপ্তেরই ভাবশিষ্য। ঈশ্বরগুপ্তের কবিচিত্তে যুগপ্রভাব যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে—পরবর্তী কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে একমাত্র মধুসূদন ছাড়া প্রায় প্রত্যেকেই সমসাময়িক জীবনচেতনা ও রাজনীতির নিষ্পেষণে পীড়িত,—তাঁদের কবিতায় সমকালীন জীবনযন্ত্রণার প্রকাশ সুস্পষ্ট। মধুসূদনকে বাদ দেওয়ার কারণ, আমাদের সমকালীন জীবনযন্ত্রণার প্রভাব তাঁর জীবনে পড়বার অবসরই পায় নি,—তিনি নিজের জীবনের সঙ্গে সে যুগকে মেলাতেই পারেন নি। যে দুর্দমনীয় প্রতিভায় তিনি উদ্ভাসিত সেযুগের সংকীর্ণ পটভূমিকায় তাকে প্রকাশ করার জন্যই তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করে গেছেন। কিন্তু রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র তাঁদের সীমিত

৬. John Drinkwater, Patriotism in Literature, London,1924, P-102.

৭. সাহিত্যসাধক চরিতমালা। তৃতীয় খণ্ড। রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে উদ্ধৃত।

প্রতিভা নিয়ে সেযুগের পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপবিশ্লেষণের চেষ্টা করেছেন। এই দিক দিয়ে ঈশ্বরগুপ্ত তাঁদের পথপ্রদর্শক, সাময়িক জীবনযন্ত্রণার সঙ্গে সাহিত্যের সেতু বন্ধন করে তিনি বাংলা সাহিত্যে রাজনীতির হাওয়া ঢুকিয়ে দিলেন,—সাহিত্যসাধনার নিরালম্ব মনোভাব চিরদিনের মত অন্তর্হিত হল।—ঈশ্বরগুপ্তের পরবর্তী কবিসম্প্রদায় সেই অর্থে জীবনসচেতন-যুগসচেতন-আত্মসচেতন কবি। সমালোচকের ভাষায় "সম-সাময়িক সমাজের অনাচার, ব্যভিচার, চরিত্রদৈন্য, আদর্শহীনতা ঈশ্বরগুপ্তকে যেমন পীড়িত করিয়াছে রঙ্গলাল, বিহারীলাল, হেমচন্দ্রকেও ঠিক তেমনি পীড়িত করিয়াছে।[৮]

ঈশ্বরগুপ্ত প্রত্যক্ষভাবে যে প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন রঙ্গলালে তার পূর্ণ প্রকাশ। ঈশ্বরগুপ্তের সমগ্র সাহিত্যসৃষ্টির একাংশে তীব্র উত্তেজনায় তিনি দেশপ্রেমকে মুখ্য করে তুলেছিলেন কিন্তু রঙ্গলালের সাহিত্যসৃষ্টির মূলসত্য দেশপ্রেম রূপেই বিকশিত। তাঁর প্রথম কাব্য বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের প্রেরণাকীর্ণ, দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই তিনি স্বাধীনতাস্বপ্নের উপাদান সংগ্রহ করার জন্য রাজপুত ইতিহাসের প্রতি আকৃষ্টচিত্ত। রঙ্গলালের সাহিত্যসাধনার মূলে অকৃপণ দেশভাবনার স্বাক্ষর রয়েছে প্রমাণ পরিচয় সমেত। 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' ভূমিকারম্ভে রঙ্গলাল যে কথা বলেছেন, "১২৫৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে একদা বীটন সমাজের নিয়মিত অধিবেশনে কোন কোন সভ্য বাংলা কবিতার অপকৃষ্টতা প্রদর্শন করেন। কোন মহাশয় সাহস পূর্বক এরূপও বলিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকাতে তাহাদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই।"[৯]

এই উক্তির ভৎর্সনা রঙ্গলালকে বিদ্ধ করেছিল ; তিনি একটি প্রবন্ধের মাধ্যমে সে যুগের কবি সম্প্রদায়ের প্রতি এই অন্যায় কটাক্ষপাতের যোগ্য প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন—সেই প্রবন্ধটিও আমাদের আলোচ্য। কিন্তু 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' তিনি সচেতনভাবে বাঙ্গালী কবিদের প্রতি আরোপিত এই যুক্তিহীন অভিযোগ স্খালনের চেষ্টা করেন। পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ থাকলেও কবি সমাজ যে সুপ্ত নন তারই প্রমাণ দেবার জন্য 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' তিনি দেশপ্রেমকেই মুখ্যভাবে অবলম্বন করেছেন। সুমহান রাজপুতঐতিহ্য, রাজপুতজাতির স্বাধীনতাস্পৃহা সমগ্র ভারতবাসীকেই আকৃষ্ট করেছে। বহু বাঙ্গালী সাহিত্যিকও পরবর্তীকালে রাজপুতইতিহাস অবলম্বন করেছেন—কিন্তু রঙ্গলালের মধ্যে তা উত্তেজনা সঞ্চার করেছে পূর্ণমাত্রায়। জাতিগত

৮. তারাপদ মুখোপাধ্যায়, আধুনিক বাংলা কাব্য, কলিকাতা, ১৩৬১ সাল, পৃঃ—২।

৯. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, ১৮৫২।

ভাবে কবিসম্প্রদায়ের প্রতি এই কটাক্ষপাতের বেদনায় রঙ্গলাল বিমূঢ় হয়েছেন। সচেতন গরিমায় রাজপুত ঐতিহ্যের এই বীরত্বপূর্ণ বিষয়কেই কাব্যের উপাদানরূপে গ্রহণ করেছেন। পরাধীনতার শৃঙ্খলে বদ্ধ হয়ে কবিচিত্তের যে সুগভীর আর্তি কবিতাকারে প্রকাশ পেয়েছিল—এ সংবাদ না জেনেই যাঁরা কবিসম্প্রদায়কে অভিযুক্ত করেছিলেন তাঁদের সীমিত দৃষ্টির প্রশংসা করা যায় না। বিশেষ করে, 'সংবাদ প্রভাকরের' পাতায় ঈশ্বরগুপ্ত যে ভাবে দেশপ্রেমের বাণীকেই আকারে ইঙ্গিতে স্পষ্ট করে তুলছিলেন,—সে সম্বন্ধে অজ্ঞতা না থাকলে প্রকাশ্য সভায় বাঙ্গালী কবিকুলের প্রতি অমর্যাদাকর এই উক্তি করা হয়ত সম্ভব হোত না। রঙ্গলাল তারই প্রতিবাদ করেছেন। স্বাধীনতার আদর্শে যে জাতি একদা আত্মত্যাগের চরমচিহ্ন স্থাপনা করেছে—সেই রাজপুতজাতির ইতিহাস কাব্যাকারে প্রকাশ করে রঙ্গলাল একই সঙ্গে বাঙ্গালী কবির মুখরক্ষা করেছেন। সুতরাং 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনার মূলে রঙ্গলালের উত্তেজনা-উদ্দীপনা, ক্ষোভ ও দুঃখকে যেন একই সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেয়। রঙ্গলালের অকৃপণ ও উদার দেশপ্রেমকে স্মরণ করেই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,—

"যে জাতীয়তাবাদী ওজস্বী কবিতা পরবর্তীকালে হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রকে সারা দেশময় প্রতিষ্ঠা দান করিয়াছিল, প্রকৃতপক্ষে রঙ্গলালই তাহার প্রবর্তক।"

[সাহিত্য সাধকচরিতমালা]

"পদ্মিনী উপাখ্যান"কে সেই হিসেবে এক উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি বলেই অভিহিত করতে হয়। রঙ্গলাল পরাধীন দেশের কবি—কিন্তু স্বাধীনতার মূল্য তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেন,—স্বাধীনতা হীনতায় জীবন যে কী দুঃসহ সে সত্য তিনিই প্রথম শুনিয়েছেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' রচনাপ্রসঙ্গে রঙ্গলাল যে প্রবন্ধটি রচনা করেছেন তা এই প্রসঙ্গেই আলোচ্য। রঙ্গলাল প্রাবন্ধিক নন, বাংলা সাহিত্যে কবি হিসেবেই তাঁর প্রতিষ্ঠা। কিন্তু প্রয়োজনে তিনি যে প্রবন্ধটি রচনা করেছিলেন তা শুধু বক্তব্যকেই তুলে ধরার উদ্দেশ্যে নয়,—সমগ্র দেশবাসীর কাছে এ যেন তাঁর ক্ষুব্ধ প্রতিবাদ। কবিকুলের মধ্যে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র তখনও আসেননি, রঙ্গলালই বাঙ্গালী কবিকুলের স্বপক্ষে এই প্রতিবাদের ঝড় তুলেছেন। কবিজনোচিত আস্ফালনেই শুধু নয়,—রঙ্গলাল অত্যন্ত যুক্তি সহকারেই সে যুগের মানসিক দৈন্যের সত্যকে তুলে ধরেছিলেন। "বাংলাকবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ" গ্রন্থটি সে হিসেবেই রঙ্গলালের একটি বিশেষ মনোভাবকে তুলে ধরেছে। পরাধীনতা কবিপ্রতিভার অন্তরায় হয় কি না কবির জবানিতে সে কথার বিশেষ মূল্য আছে।

মদাত্মীয় বন্ধু বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু গত সভায় কহিয়াছিলেন "স্বাধীনতা সুখ

বিহীনতায় মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বিরহ হয়, সুতরাং প্রমোদপরিচ্যুতচিত্ত জাতির মধ্যে যথার্থ কবি কোনরূপেই কেহ হইতে পারেন না, অতএব বাঙ্গালীরা বহুকাল পর্যন্ত পরাধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধবিধায় তাহারদিগের মধ্যে প্রকৃত কবি কেহই জন্মগ্রহণ করেন নাই এবং কোন কালে জন্মিবেন, এমত বোধ হয় না, তিনি আরো কহিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষে যখন স্বাধীনতা সম্পদ ছিল, তখন বাল্মীকি, ব্যাস, কালিদাস, জয়দেব প্রভৃতি বিরাজ করিয়াছিলেন।···যেহেতু স্বাধীনতা সহচরী বিরহে যদ্যপি কবিতা সমুদিতা ও প্রমুদিতা না হন, তবে মোঘল সাম্রাজ্যের সময় জয়দেব কবি অগ্রদ্বীপে জন্মগ্রহণ করিতেন না, আমার প্রিয়বর বন্ধু তাঁহাকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কালে প্রস্থাপিত করিয়াছেন, কিন্তু জয়দেব কবি প্রাচীন কবি নহেন, ইহা অনায়াসে সপ্রমাণ হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত সুরদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি কবিগণ যাঁহারদিগের কবিত্ব ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় মনুষ্যগণ বিশিষ্টরূপে স্বীকার করিয়াছেন, তাঁহারাও মোসলমান-দিগের রাজ্যকালীন বিরাজমান ছিলেন। অপিচ স্বাধীনতা বিহীনতা এবং অন্ন-দীনতা ও মানসী মলিনতাজন্য যদ্যপি প্রকৃত কবির অভাব হইত, তবে কোন দেশেই প্রসিদ্ধ ২ কবি প্রভূত হইতেন না, যেহেতু প্রায় কোন যথার্থ কবিই স্বাধীন অথবা অন্নচিন্তাহীন তথা প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন না।[১০]

···রঙ্গলালের প্রধান বক্তব্যে অভিমান ও গ্লানি যুগপৎ আত্মপ্রকাশ করেছে। দেশপ্রেমী কবি হিসেবে সর্বজনীন বিরূপতার সঙ্গে তার পরিচয় শুধু তাঁকে বেদনাবিদ্ধ করেনি, তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। রঙ্গলালের কবিচিত্তের এই নিখাদ দেশপ্রেম তাঁর প্রতিভার পরিচায়ক নয়—কিন্তু দেশপ্রেমের স্বাক্ষর। দেশকে ভালবাসেন বলেই অযথার্থ এই মন্তব্য তিনি মেনে নিতে পারেননি। সাহিত্য বিচারে তিনি তখন দ্বিধাগ্রস্ত - কিন্তু উপলব্ধির গভীরতায় তিনি দুঃখিতচিত্ত।

"যে জাতি পরাধীনতা শৃংখলে চিরদিনের জন্য বদ্ধ, যে জাতি আহার বিহার ব্যতীত সভ্যতার উচ্চাভিপ্রেত সকল সিদ্ধিকরণে অজ্ঞাত, যে জাতি জন্মভূমিকে গরীয়সী মানিয়া কূপমণ্ডূপকবৎ অবরুদ্ধ আছে, তাহারদিগের মনোমধ্যে উচ্চতর ভাবোদয় হওনের বিষয় কি ? [ঐ, পৃঃ ১১]

—এই অভিযোগ তিনি মেনে না নিয়ে পারেন নি। সমগ্র জাতির বহুধাবিভক্ত দৈন্যের মাঝখানে তাঁর পীড়িত আত্মার ক্রন্দন মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। পরাধীনতার শৃংখলে যাঁরা বদ্ধ তাঁরা দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও সভ্যতা বিস্মৃত হয়,—বীরত্ব সম্বন্ধে তাঁদের নিস্পৃহতা দেখা দেয়। রঙ্গলাল "পদ্মিনী উপাখ্যানে" আত্মবিস্মৃত

১০. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ, ১৩৫২।

জাতির সামনে শৌর্য, বীর্য বীরত্বের জয়গান শোনাবার দায়িত্ব তুলে নিয়েছেন। জাতির সামনে তিনি অতীত মহিমা প্রচার করে সুপ্ত আত্মবোধ জাগাবার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং রঙ্গলাল-এর উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই কাব্যরচনার মর্মমূলে সাহিত্য সৃষ্টির মৌলিক প্রেরণা অনুপস্থিত। দেশভাবনার নিবিড় অনুভূতিকেই এ কাব্যসৃষ্টির আদি উৎস বলা যেতে পারে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই আত্মোপলব্ধির মুহূর্তে আমরা এমন একজন কবিরও সাক্ষাৎ পাই—যিনি শুধু সাহিত্যসৃষ্টির জন্যই সাহিত্য সৃজন করেন নি,—দেশচিন্তাকে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরার বাসনা নিয়েই সাহিত্য জগতে প্রবেশ করলেন। সুতরাং রঙ্গলালের কাব্যবিচারের মানদণ্ড প্রচলিত কাব্যবিচারের মাপকাঠিতে নয়, সাহিত্যসৃষ্টির সমস্ত অনুভাবনা বিচার না করে তাঁকে বিচার করা বিভ্রান্তিকর হবেই। সৃষ্টিক্ষমতার চূড়ান্ত বিকাশ তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়নি বলে আক্ষেপ করার অবসর তাঁর কাব্যবিচাবে নেই। তিনি যুগের সৃষ্টি, ঊনবিংশ শতাব্দীর দেশপ্রেমমূলক কাব্যধারার উদ্বোধনের সাড়ম্বর আয়োজন তিনি সুন্দরভাবে সম্পন্ন করেছেন—একথা স্বীকার করতেই হবে। ঈশ্বরগুপ্তের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত, অস্পষ্ট বাক্, দ্বিধাখণ্ডিত, বিক্ষিপ্ত চিন্তাভাবনাকে রঙ্গলাল ধীরতায়, উদাত্ততায়, উপলব্ধির অখণ্ডতায় একটি মাত্র পরিচয়ে প্রকাশ করেছেন। ঈশ্বরগুপ্তের বোধি ও উপলব্ধির মধ্যে অস্বচ্ছতা ছিল, কিন্তু ইংরাজীশিক্ষিত রঙ্গলাল সচেতন উপলব্ধিতে উদ্দীপিত হয়েই তাঁর জীবন-সত্যকে কাব্যাকারে প্রকাশ করেছেন। সিদ্ধি ও সাফল্যের মূল্যায়ন না করে যুগচেতন কবি রঙ্গলালের কাব্যসাধনার বিচারই এখানে মুখ্য। রঙ্গলাল সম্বন্ধে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই সুচিন্তিত উক্তিটি এখানে উল্লেখ করা যাক,—

"রঙ্গলালের প্রকৃত কবিত্ব হইল যে তিনি সর্বপ্রথম বাংলা সাহিত্যে বীরযুগের সিংহদ্বার উন্মুক্ত করিয়াছেন।"[১১]

রঙ্গলালের যুগোচিত চিন্তাধারার এই মৌলিকত্ব সত্যই প্রশংসনীয়। বীরযুগের উদ্বোধনকালে রঙ্গলাল যে কতটা প্রাণিত হয়েছিলেন তাঁর প্রথম কাব্য "পদ্মিনী উপাখ্যানের" ভূমিকায় তার উচ্ছ্বাসের পরিচয় আছে।

রঙ্গলালের কবিভাবনার মুখ্যপরিচয় দেশপ্রেমভাবনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। জাতীয় চরিত্রের অবনতিতে তিনি বিক্ষুব্ধচিত্ত, রুষ্ট এবং 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' সেই পতিত জাতির সম্মুখে এক মহিমময় ঐতিহ্যের চিত্র তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টায় রঙ্গলাল মগ্ন। অবশ্য বীরযুগের দ্বারোদ্ঘাটন করার মুহূর্তে ভারতইতিহাসের শৌর্যবীর্য-বীরত্বের জলন্ত অধ্যায় থেকে তিনি যে কাহিনী সংগ্রহ করেছেন, যেভাবে তাঁকে

১১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত ভূমিকা, আধুনিক বাংলা কাব্য।

আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে যুক্তি বা পারম্পর্যের, ঘটনাবিন্যাস ও আদর্শপ্রচারের মধ্যে অনেক অসঙ্গতি এসেছে, কাব্যবিচারে যা প্রথমেই নজরে পড়ে। কিন্তু উদ্দেশ্যের অমলিন সৌন্দর্য 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' অনেক অসঙ্গতিও ঢেকে দিতে পারে। রঙ্গলালের সচেতনতা 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' ভূমিকায় ব্যক্ত;—কবির কোন উৎসাহদাতা কবির কাছে দুঃখ করে লিখেছিলেন,—

"আধুনিক যুবজনে, স্বদেশীয় কবিগণে
ঘৃণা করে নাহি সহে প্রাণে।
বাঙ্গালীর মনঃপদ্ম, কবিতা সুধার সদ্ম
এইমাত্র রাখ হে প্রমাণে॥

রঙ্গলাল অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন কাব্যটি রচনা করে। রাজপুত ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়টি থেকে কাব্যের উপাদান গ্রহণেও তিনি যুক্তিসিদ্ধ কারণের অবতারণা করেছেন।—"ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অন্তর্দ্ধানকালাবধি বর্তমানসময় পর্যন্তয়েই ধারাবাহিক প্রকৃত পুরাবৃত্ত প্রাপ্তব্য। এই নির্দিষ্ট কালমধ্যে এ দেশের পূর্বতন উচ্চতম প্রতিভা ও পরাক্রমের যে কিছু ভগ্নাবশেষ, তাহা রাজপুতানা দেশেই ছিল। বীরত্ব, ধীরত্ব, ধার্মিকত্ব প্রভৃতি নানা সদগুণালঙ্কারে রাজপুতেরা যেরূপ বিমণ্ডিতা ছিলেন তাঁহাদিগের পত্নীগণও সেইরূপ সতীত্ব, বিদুষীত্ব এবং সাহসিকত্বগুণে প্রসিদ্ধ ছিলেন। অতএব স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য পদ্যপাঠে লোকের আশু চিত্তাকর্ষণ এবং তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণে প্রবৃত্তি প্রধাবন হয়, এই বিবেচনায় উপস্থিত উপাখ্যান রাজপুত্রেতিহাস অবলম্বন পূর্বক মৎকর্তক রচিত হইল।"

রঙ্গলাল দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করে, দেশের গরিমাকে পুনর্জীবিত করে, মানুষের লুপ্ত ঐতিহ্যবোধ জাগ্রত করতে চেয়েছেন। "স্বদেশীয় লোকের গরিমা প্রতিপাদ্য ও তদ্দৃষ্টান্তের অনুসরণ প্রবৃত্তি প্রধাবন"—এই উভয় উদ্দেশ্য নিয়েই এই কাব্য রচিত হয়েছে। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' দেশপ্রেমের বাণী কিভাবে জাতীয়ভাব উদ্দীপিত করেছে—সেটুকু বিচার আবশ্যক। ঈশ্বরগুপ্তের দেশ-ভাবনা আত্মপ্রকাশ-কুণ্ঠ—আত্মরক্ষার তাগিদে বক্তব্য অকুণ্ঠচিত্তে বলার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। রঙ্গলালের পদ্মিনী উপাখ্যানের অন্ততঃ একটি অংশের মধ্যে নির্ভীকভাবে তিনি তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করেছেন। চিতোরের ঐশ্বর্য ও বীরত্বের কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি বারংবারই পুলকিত হয়েছেন, অতীত কাহিনীর গৌরবে তাঁর সমস্ত সত্তা আচ্ছন্ন.—

"যেদিন ভারতভূমি ছিলেন স্বাধীন॥
অসংখ্য বীরের যিনি জন্মপ্রদায়িনী।
কত শত দেশে রাজ বিধি বিধায়িনী॥

এমন দুর্ভাগ্যে পরভোগ্যা পরাধিনী।
যাতনায় দিন যায় হয়ে অনাথিনী॥
কোথা সে বীরত্ব আর বিক্রম বিশাল?
সকলি করেছে গ্রাস সর্বভুক কাল॥"

ভারতের এই অতীতগৌরব তাঁকে ভবিষ্যতের প্রতি আশান্বিত করে তোলেনি হয়ত—কিন্তু বর্তমানের গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে আশার আলোক দেখা গেছে। বিগতদিনের শক্তি ও শৌর্যের মধ্যে পরাভূত বর্তমানের দুঃখ-মোচনের প্রয়াসও এখানে দেখা যায়। চিতোরের রানী পদ্মিনীর আত্মবিসর্জন কাব্যের বিষয় হলেও রানা ভীমসিংহ ক্ষত্রিয় যোদ্ধাদের উৎসাহ দেবার উদ্দেশ্যে যে প্রসঙ্গটি অবতারণা করেছেন—কাব্যবিচ্ছিন্নভাবে বিচার করে দেখলে এই অংশটিকে একটি বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমের কবিতারূপেই গণ্য করা যায়। পরাধীন ভারতের দুঃখ ও দৈন্যের চেতনায় জর্জরিত কবিচিত্তের আক্ষেপ-ব্যথা-বেদনা যেন এই অংশটিতে মূর্ত হয়ে উঠেছে। রঙ্গলালের স্বদেশপ্রেমের স্বাক্ষররূপী এই কাব্যাংশটি থেকেই কবিচিত্তের আর্তনাদ-এর ব্যাখ্যা করতে হবে। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনার মূলীভূত প্রেরণা দেশ-প্রেম এবং সমগ্র কাব্যের মধ্যে ইতস্ততঃভাবে দেশপ্রেমের মহিমা বারবারই প্রকাশ পেয়েছে। দস্যু আলাউদ্দীনের হাত থেকে চিতোর রক্ষার দায়িত্ব, নারী পুরুষ নির্বিশেষে সমস্ত চিতোরবাসীই তুলে নিয়েছে,—এই কল্পনাটিই আগাগোড়া দেশপ্রেমাত্মক। সেই প্রসঙ্গেই ক্ষত্রিয়দের যুদ্ধপ্রীতি ও তাদের আত্মত্যাগের মহিমাও কীর্তন করা হয়েছে। দুষ্ট যবনের আক্রমণে চিতোরের স্বাধীনতা বিপন্ন কিন্তু রাজা জানেন,—

"পরম পৌরুষ ধর্ম দেশ হিতৈষিতা।
ক্ষত্রিয়ের বীরবৃত্তি চির প্রশংসিতা॥

সুতরাং ক্ষত্রিয়ের চিরাচরিত ধর্ম পালনে রাজা ও তাঁর সন্তানগণ আত্মত্যাগে উন্মুখ। রঙ্গলালের দেশাত্মবোধের চরম প্রকাশ হয়েছে প্রবাদতুল্য তাঁর এই অনবদ্য কাব্যাংশটিতে,—

স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব শৃংখল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়।
* * * *
দিনেকের স্বাধীনতা স্বর্গসুখ তায় হে,
স্বর্গসুখ তায়।

অই শুন! অই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে
ভেরীর আওয়াজ।
সাজ সাজ সাজ বলে, সাজ সাজ সাজ হে,
সাজ সাজ সাজ।

সার্থক জীবন আর বাহুবল তার হে,
বাহুবল তার।
আত্মনাশে যেই করে দেশের উদ্ধার হে,
দেশের উদ্ধার॥
*   *   *   *
পরহিতে, দেশহিতে, ত্যজিল জীবন হে,
ত্যজিল জীবন॥
স্মরহ তাঁদের সব কীর্তিবিবরণ হে,
কীর্তিবিবরণ॥

এই অংশটুকুতে রঙ্গলাল যেন তাঁর দেশপ্রেমের সমস্ত আর্তি ঘনীভূতভাবে প্রকাশ করেছেন। আত্মনাশে দেশের উদ্ধার যে কত পুণ্যকর্ম রঙ্গলাল তা কল্পনা করতে পেরেছেন—এটাই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে আত্মনাশের মাধ্যমেই দেশমাতৃকার বেদীতলে আমরা আমাদের দেশপ্রেমের পরখ করেছি,—রঙ্গলালের কাছে তার মহিমা কত আগেই না ধরা পড়েছে! ভারতের স্বাধীনতার রাজসূয়যজ্ঞ সমাপন করতে যে বিপুল আত্মোৎসর্জন করতে হয়েছিল রঙ্গলালের যুগেও তার তাৎপর্য ধরা পড়েছিল। স্বাধীনতা-চেতনার অগ্রসরণের ইতিহাসে এই অংশের গুরুত্ব অপরিসীম। রঙ্গলাল বলেছেন,—

দেশহিতে মরে যেই তুল্য তার নাই হে,
তুল্য তার নাই।

গণচিত্তের কাছে এই বক্তব্যের আবেদন স্বীকৃত হয়েছিল এমন প্রমাণ আছে। ঈশ্বরগুপ্ত আত্মউপলব্ধির জ্বালা প্রকাশ করেছিলেন—কিন্তু আত্মত্যাগের মহিমায় দেশের স্বাধীনতা অর্জনের কথা তিনিও চিন্তা করেননি। পরাধীনতার অপরিসীম জ্বালা তাই ঈশ্বরগুপ্তের ক্রন্দনে ধ্বনিত,—

ধিক্ ধিক্ অধীনতা ধিক্ তোরে ধিক্।
ফুকরে কাঁদিতে হয় লিখিতে অধিক॥

ক্রন্দন ব্যতীত ঈশ্বরগুপ্ত তাঁর অনুভূতিকে অন্যভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। রঙ্গলালের চাতুর্য তাঁর ছিল না। রঙ্গলাল কাব্যাকারে তাঁর নিজস্ব বক্তব্যকেই তুলে

ধরেছেন ; ঈশ্বরগুপ্ত খণ্ড কবিতায় শুধু ক্রন্দনই করে গেছেন। সুতরাং ঈশ্বরগুপ্তের কবিতায় নিতান্তই যা statement রঙ্গলালের কাহিনীতে তা সংকেতিত সত্য। ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রেম প্রতীকারের আশা দেখতে পায়নি, কিন্তু রঙ্গলাল আত্মোৎসর্জনের আহ্বান এনেছেন। দেশপ্রেমচেতনাই ধীরে ধীরে ক্রমপরিণতির পথে কিভাবে এগিয়ে গেছে—ঈশ্বরগুপ্ত ও রঙ্গলালের কাব্যালোচনায় তা সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে।

ইতিহাসের সত্য থেকে রঙ্গলাল আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন,—পৌরাণিক বলে যার সত্যতায় সন্দেহ করা চলবে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতাসূর্য শেষবারের মত কিরণ বিস্তার করেছে চিতোরেই। চিতোরের গৌরব তাই ভারতবাসীরই গৌরব। স্বাধীনতার মূল্য দিতে আত্মত্যাগের পথই যারা বেছে নেয় তারা দেশপ্রেমীদের আদর্শ। রঙ্গলাল বলেছেন,

হিন্দুর প্রতাপ লেশ, যাহা কিছু অবশেষ,
ছিল মাত্র চিতোর নগরে।

আমাদের পরাধীনতার মধ্যেও আত্মত্যাগের আদর্শেরই পুনরুজ্জীবন প্রয়োজন, রঙ্গলাল এ সত্য বুঝেছিলেন। তাই 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' মধ্যে বীরত্বের-আত্মত্যাগের মহিমাকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে অন্ততঃ সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের মনোজীবনে বীরযুগের উদ্বোধন তিনিই করলেন। রাজপুতানার ইতিহাসের এই জ্বলন্ত অধ্যায়টি তার মনে নানা কারণেই ছায়াপাত করেছে,—

সেরূপ ভারত দেশে, স্বাধীনতাসুখ শেষে,
ছিল মাত্র রাজপুতানায়॥
কি হইল হায় হায় সে নক্ষত্র লুপ্তকায়,
নিবিল সে আলোক উজ্জ্বল।

স্বাধীনতা শব্দটি রঙ্গলাল তাঁর কাব্যে অত্যন্ত সচেতনতার সঙ্গে প্রয়োগ করেছেন। ঈশ্বরগুপ্ত অধীনতার জ্বালা বর্ণনা করেছেন—স্বাধীনতার মহিমা সম্বন্ধে তাঁর নীরবতা লক্ষ্য করার মত। রঙ্গলাল স্বাধীনতার সুখের চিত্র অঙ্কন করে পরাধীনতার দুঃখ বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। অন্ততঃ স্বাধীনতাকে আলোক হিসেবে কল্পনা করে পরাধীনতার কালিমার প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি শব্দ দুটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেছেন। পরাধীনতার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রঙ্গলাল স্বীয় অভিজ্ঞতা দিয়েই বর্ণনা করেছেন,—

কি আছে এখন আর, দাসত্ব শৃংখল সার,
প্রতি পদে বাঁধা পদে পদে।
দুর্বল শরীর মন, ম্রিয়মান হিন্দুগণ,
তত্বহীন মত্ত দ্বেষমদে॥

রঙ্গলাল ইংরাজ শাসনের প্রসঙ্গেই একথা বলেছেন,— জাতির অধঃপতনের চিত্রটি তিনি আমূল তুলে ধরেছেন।

'পদ্মিনী উপাখ্যানেই' রঙ্গলালের উচ্ছ্বসিত দেশপ্রেমের পূর্ণ প্রকাশ। এই কাব্যের রচনার মূলেও দেশপ্রেম—কিন্তু 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' শেষ স্তবকটির মধ্যে রঙ্গলাল কী প্রকাশ করতে চেয়েছেন—বিচার করা যাক। চিতোরের রানী ভীমসিংহের পতনে স্বাধীনতার বিলুপ্তি হয়েছে,—

"পরম পৌরুষ বল, সাহস সুখের স্থল,
স্বাধীনতা আনন্দ আকর।

সেই স্বাধীনতা বিসর্জনের পর রঙ্গলালও চিরাচরিত প্রথায় আশাবাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।—ভারতের সৌভাগ্যসূর্য চিতোরের পতনের সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্হিত হয়েছে কিন্তু বিদেশীশক্তির পদানত ভারতবর্ষের পরাধীন মানুষ রঙ্গলাল এই মুহূর্ত দুটিকে একাকার করে ফেলেছেন। এই আচ্ছন্নতা দূর হবার কোন আশা তিনি প্রত্যক্ষ করেন নি—কিন্তু স্বাধীনতার জন্য ব্যাকুলতাটুকু ব্যক্ত করেছেন,—

ভারতের ভাগ্যজোর— দুঃখবিভাবরী ভোর,
ঘুমঘোর থাকিবে কি আর?

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তরাংশ হিসেবে যে কয়েকটি পংক্তির অবতারণা করেছেন,— রাজনৈতিক চিন্তাধারার সমস্ত সংকেতিত অর্থ সেখানে সুস্পষ্ট।—

ইংরাজের কৃপাবলে, মানস উদয়াচলে,
জ্ঞানভানু প্রভায় প্রচার॥
হে বিভো করুণাময়। বিদ্রোহ বারিদচয়
আর যেন বিষ না বরিষে॥

সমগ্র কাব্যের মূল কাহিনী রাজপুতের বীরত্বে ও শৌর্যে উদ্ভাসিত, সেই প্রসঙ্গে ম্লান ও শক্তিহীন বর্তমানের কথা চিন্তা করে কবি দুঃখিত। কিন্তু কাব্যের শেষাংশে ইংরাজ রাজত্বের আগমনে কবি অপরিসীম আনন্দ লাভ করেছেন। কারণ "জ্ঞান ভানু প্রভায় প্রচার"—এ প্রভা যারা বিতরণ করছেন তাঁরা শাসক ইংরেজ। ইংরাজী শিক্ষিত ও ইংরেজী কাব্যের অনুরাগীপাঠক রঙ্গলালও শাসক ইংরাজের কাব্য-সাহিত্যের সুদূরপ্রসারী ফলাফল সম্পর্কে অবহিত। দেশপ্রেমী কবি রঙ্গলাল সখেদে স্বাধীনতা হীনতার কথা বলেছেন কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যের রসাস্বাদন করে তিনি এতই মুগ্ধ যে ইংরেজবিদ্বেষ পোষণ করতে পারেননি। ইংরেজী সাহিত্যের প্রতি অনুরাগই তাঁকে শাসক ইংরেজের প্রতি অনুরাগী করে তুলেছে।

রঙ্গলালের প্রিয় কবি স্কট-বায়রণ,—তিনি তাঁদের দ্বারা অনুপ্রাণিত এ সত্য

অস্বীকার করা যায় না। স্কট স্বদেশপ্রেমী কবি বলেই খ্যাত। শাসক ইংরেজ আমাদের উপর অত্যাচারের অভিযান চালিয়ে যাবে, দুঃখ-লাঞ্ছনায় অধীর হয়ে আমরা স্বাধীনতার জয়গান করব অথচ স্বাধীনতা লাভের জন্য অনুপ্রাণিত হব না,—এই ধরণের দেশপ্রেমের মহিমা প্রচার সে যুগের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ঈশ্বরগুপ্তেও আমরা হুবহু এই মনোভাব প্রত্যক্ষ করেছি,—আপাত-বিরোধী এই মনোভাব ঈশ্বরগুপ্তকে একই সঙ্গে রাজানুগত অথচ ব্যথিতচিত্ত করে তুলেছে,—রঙ্গলালেও প্রায় সেই একই মনোভঙ্গিমা প্রত্যক্ষ করি। ইংরেজশাসনের প্রতি আনুগত্য নেই—কিন্তু শিল্পী ও সাহিত্যিক হয়ে তিনি সাহিত্যপ্রেমী ইংরেজের জয়গান না করে পারেননি। বিশেষতঃ রঙ্গলাল ইংরেজী সাহিত্যের বিমুগ্ধ পাঠক 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' ভূমিকায় তা স্বীকার করেই তিনি বলেছেন, "আমি সর্বাপেক্ষা ইংলণ্ডীয় কবিতার সমধিক পর্যালোচনা করিয়াছি এবং সেই বিশুদ্ধ প্রণালীতে বঙ্গীয় কবিতা রচনা করা আমার বহুদিনের অভ্যাস।···উপস্থিত কাব্যের স্থানে স্থানে অনেকাংশে ইংলণ্ডীয় কবিতার ভাবাকর্ষণ আছে···ইংলণ্ডীয় বিশুদ্ধ প্রণালীতে যত বঙ্গীয় কাব্য বিরচিত হইবে, ততই ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতাকলাপ অন্তর্ধান করিতে থাকিবে এবং তত্তাবতের প্রেমিক-দলেরও সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিবে।"

সুতরাং দেখা যাচ্ছে একদিকে স্বাধীনতাবিহীন কবিসম্প্রদায়ের চিন্তাভাবনার উৎকৃষ্টতা প্রমাণের জন্য, অপরদিকে ব্রীড়াশূন্য কদর্য কবিতাকলাপের অন্তর্ধান কামনা করেই রঙ্গলাল এ কাব্য প্রণয়ন করেন—সুতরাং বিষয়বস্তুতে স্বদেশচিন্তার প্রাধান্য ও পরিশেষে কাব্যপ্রেরণা যাদের কাছ থেকে এসেছে সেই ইংরাজ শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি উচ্ছ্বসিত আনুগত্য দেখানো হয়েছে। ঈশ্বরগুপ্ত অবশ্য ইংরাজী সাহিত্য-পাঠ করেননি—কিংবা রঙ্গলালের মত উৎকৃষ্ট পর্যালোচক বলে আত্মপ্রচার করেননি তবু ইংরাজ শাসকের কঠোর নীতির কথা স্মরণ করেই তিনি আনুগত্য প্রকাশ করেছেন। সুতরাং রঙ্গলালের "পদ্মিনী উপাখ্যান" মিশ্র উদ্দেশ্য সাধন করেছে। রঙ্গলালের শেষ আর্তি—বিদ্রোহেরই বিপক্ষে। "বিদ্রোহ বারিদ চয় আর যেন বিষ না বরিষে"—বিদ্রোহই ইংরেজশাসনের অগ্রগতির পথে একমাত্র বাধা,—সুতরাং বিদ্রোহ তিনি সমর্থন করেন না। যে বিদ্রোহকে পরবর্তী যুগে স্বাধীনতার প্রথম চেতনা-মূলক সংগ্রাম বলে অভিহিত করা হয়েছে—সেই সিপাহীবিদ্রোহই সমসাময়িক সাহিত্যে নিন্দিত-অসমর্থিত। ঈশ্বরগুপ্ত যে বিদ্রোহীদের ব্যঙ্গের চাবুকে, বিদ্রূপে, উপহাসে ধূলিস্মাৎ করার চেষ্টা করেছেন, সেই নানাসাহেব-লক্ষ্মীবাঈকে ইতিহাস স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম বরেণ্য শহীদরূপে বর্ণনা করেছে। ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলালের বিদ্রোহ প্রসঙ্গে মতামত একই। এখানেই রঙ্গলাল ঈশ্বরগুপ্তের ভাবশিষ্য। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, সিপাহীবিদ্রোহ

সম্পর্কে যে চেতনা নিতান্তই আধুনিক সমালোচনার ফলাফল, তার ওপর অধিক গুরুত্ব দিয়ে রঙ্গলাল বা ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রেমকে ভুল ব্যাখ্যা করে লাভ নেই। এঁদের দেশপ্রেম সম্পূর্ণরূপেই ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যমভাগে সদ্যবিকশিত স্বদেশচেতনার আদিরূপের বাহক ও পরিচায়ক। দেশচেতনাই যেখানে অনুপস্থিত সেই ক্ষেত্রে ও সেই পরিবেশে ঈশ্বরগুপ্ত ও রঙ্গলাল স্বাধীনতার কথা, স্বদেশের মাহাত্ম্য, মাতৃভাষার মহিমা, দেশের প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধমনোভাব জাগ্রত করেছেন এটুকুই যথেষ্ট। ঈশ্বরগুপ্তের ভাবশিষ্য রঙ্গলালেও গুরুর আদর্শ ও দেশচিন্তা প্রবাহিত হয়েছে। কালক্রমে পরবর্তী সমস্ত সাহিত্যে দেশপ্রেম মুখ্য হতে পেরেছে,—এইভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের মধ্যে দেশচেতনা ও দেশভাবনা অঙ্গাঙ্গীভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে।

রঙ্গলালের মহৎ আদর্শ তাঁর 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' সুন্দরভাবেই ব্যক্ত হয়েছে, রঙ্গলাল এ ব্যাপারে সচেতন স্রষ্টা। কবিতার অসীমশক্তি সম্পর্কে অবহিত রঙ্গলাল ভূমিকায় আরও বলেছেন,—

"প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে এই এক রীতি ছিল, তাহারা বিগ্রহব্যসনাদিসমুদায় উৎসাহকর ব্যাপারে কবিদিগের সাহচর্য রাখিতেন। কবিগণ উক্ত জাতিদিগের শৌর্যবীর্য, গুণসম্পন্ন পূর্বপুরুষদিগের গুণানুবাদ গান করিতেন। তাহাতে শ্রোতৃবর্গের-মানসে বীর, শান্তি, রৌদ্র প্রভৃতি ভাব সকলের সমুদ্ভবে বিশেষোপকার হইত।"

স্পষ্টতঃ বোঝা যায় রঙ্গলাল এই নীতির সাহায্যেই দেশচিন্তা জাগ্রত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি যে সাফল্যঅর্জন করেছেন তার অজস্র প্রমাণ মিলবে। স্বাধীনতার মূল্যবোধ প্রচারের জন্য তাঁর বীররসাত্মক কাব্যাংশটি অনবদ্য হয়েছে বলা যায়। 'পদ্মিনী উপাখ্যানে'র কাব্যিক মূল্যবিচারের ক্ষেত্রে নানা ত্রুটি আবিষ্কার করা যেতে পারে কিন্তু বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করলে বীররসাশ্রিত এই কাব্যাংশের মূল্য অসাধারণ। স্বাধীনতার জন্য আকুলতা দেশপ্রেমীর মূলধন,— রঙ্গলালের অকৃত্রিম দেশপ্রেম এই কবিতায় ঝংকৃত হয়েছে। সমগ্র 'পদ্মিনী উপাখ্যান' বিস্মৃত হলেও দুঃখ করার কিছু নেই—কিন্তু এই অপূর্ব কাব্যাংশটির একটি শব্দও আমরা হারাতে রাজী নই। ভাবের গভীরতায়, শব্দসম্পদে, বীররসপ্রকাশে, সর্বোপরি আন্তরিকতায় কবিতাটি নিখুঁত সৃষ্টি বলা যেতে পারে। পরবর্তীকালে সমৃদ্ধদেশপ্রেমমূলক কবিতার পাশেও রঙ্গলালের এই সৃষ্টিকে অভিনন্দন জানাতে হয়। রঙ্গলাল তাঁর এই একটি কবিতার জন্য সাহিত্যজগতে শ্রদ্ধার আসন পাবেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম যুগে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত কবিকণ্ঠের এই আন্তরিক উপলব্ধিকে আমরা Herbert Fisher-এর মন্তব্যটি দিয়েও ব্যাখ্যা করতে পারি

—"The patriotic man in so far as he is patriotic, acts and thinks not for himself but for his country".[১২]

রঙ্গলালের দেশচেতনার অন্তরালে সৎচিন্তার প্রেরণা যে ছিল রঙ্গলাল নিজেই তা ব্যাখ্যা করেছেন। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান' অন্ততঃ কবির শুভপ্রচেষ্টার ধারক। বিশুদ্ধ কাব্যপ্রেরণার আদর্শ থেকে সাহিত্য সৃষ্টি হয় কিন্তু বিশুদ্ধ দেশপ্রেম যে কাব্যের আদর্শ সে কাব্যকে সমালোচনা সহ্য করতে হয় অনেকদিক থেকেই। 'পদ্মিনী উপাখ্যান' সেযুগের কাব্যপ্রেমীদের ক্ষুণ্ণ করেছে কিনা জানি না কিন্তু সাহিত্যাদর্শের বিশুদ্ধতা দিয়ে আজকের মানুষ 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' রস আহরণ করতে পারে না। কিন্তু যুগবিচারে এ কাব্যকে অস্বীকার করাও যায় না। মধুসূদনের আগে রঙ্গলালই কবিকুলের মুখ রক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন,—কবি-সম্প্রদায়ের প্রতি আরোপিত অপবাদ তুচ্ছ করে তিনিই প্রথম একই সঙ্গে দেশপ্রেম ও সাহিত্যপ্রীতির স্বাক্ষর রেখেছিলেন। 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' জনপ্রিয়তার মূলে ছিল রঙ্গলালের আন্তরিকতার আবেদন,—দেশপ্রেমের প্রলেপে যা একান্ত সময়োপযোগী হয়েছিল। সেজন্যই রঙ্গলাল নিজেই পরবর্তী কাব্যের ভূমিকায় 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' সমালোচনা করেছেন, একে নিছক আত্মপ্রশংসা বলা যায় না। 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' রচনাগত উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছিল বলেই কবির ধারণা। তিনি সাধারণের উৎসাহ সম্বল করেই দ্বিতীয়বার যে কাব্যের সূচনা করলেন—তাতেও বীররসের আধিক্য। নারীর চরিত্রগত মাধুর্যের সঙ্গে অচিন্তনীয় কাঠিন্যের সমন্বয়ের ধারা 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' পর 'কর্মদেবী'তেও দেখা গেল। 'কর্মদেবীর' ভূমিকায় রঙ্গলাল বলেছেন,—

এক্ষণে পরম আহ্লাদসহকারে বক্তব্য এই যে, যে লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া উক্ত কাব্যকুসুম বিক্ষেপিত হইয়াছিল, সেই লক্ষ্য ব্যর্থ হয় নাই। সাহসপূর্বক বলিতে পারি পদ্মিনী প্রকাশের পর গতবৎসর-ত্রয় মধ্যে আমাদিগের দেশীয়ভাষায় ভাষিতা বিমলানন্দদায়িনী কবিতার প্রতি কথঞ্চিৎ দেশীয় লোকের অনুরাগ জন্মিয়াছে। কোন কোন প্রচুর মানসিক শক্তিশালী বন্ধু, যাঁহারা প্রথমোদ্যমে ইংলণ্ডীয় ভাষায় কবিতা রচনা অভ্যাস করিতেন, তাঁহারা অধুনা মাতৃভাষায় উত্তমোত্তম কাব্যপ্রণয়ন করিয়াছেন, অতএব ইহাও সাধারণ আনন্দের বিষয় নহে।"[১৩] 'কর্মদেবীর' ভূমিকায় রঙ্গলালের এই উচ্ছ্বাস সঙ্গত;—কারণ বাংলা-

১২. Herbert Fisher, The Common Weal', Oxford, 1924, P-98.

১৩. রঙ্গলাল গ্রন্থাবলী, বসুমতী সাহিত্য মন্দির।

কাব্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন রঙ্গলালের উত্তরসাধক। রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' প্রকাশকালের সঙ্গে সঙ্গেই মধুসূদন কাব্যক্ষেত্রে তাঁর প্রচণ্ড সৃজনীশক্তি নিয়োগ করলেন—রঙ্গলালের উচ্ছ্বাস তাই সঙ্গত। কিন্তু মধুসূদনের আত্মপ্রকাশ যে রঙ্গলাল প্রভাবিত নয়—এও সত্য। রঙ্গলালের উক্তিকে তাই অবিমিশ্র আত্মশ্লাঘা বলে মনে হতে পারে। পরবর্তী সাহিত্যে রঙ্গলালের প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় সহজেই, তাই তাঁর কাব্যসম্পর্কিত ধারণাকে দুঃসাহসিক উক্তি বলে মনে হয়। কিন্তু নানাদিক দিয়ে বিচার করলে রঙ্গলালের উচ্ছ্বসিত উক্তিকে নিতান্ত অসঙ্গত বলা চলে না। রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যানে' কাব্যচেতনার জড়ত্বকে মুক্তি দিয়েছিলেন। বাংলাকাব্যে দীর্ঘকাল অবহেলিত বীররস ব্যবহার করে বীররসের উন্মাদনায়, শৌর্যবীর্যের উচ্ছ্বসিত বর্ণনায়, আত্মনিগ্রহের স্পষ্টোচ্চারণের মধ্যে সত্যিই রঙ্গলাল বাংলাসাহিত্যে উন্মাদনার জোয়ার এনেছিলেন। উচ্চাঙ্গের কবিত্বশক্তির প্রকাশ তাতে ছিল না হয়ত, কিন্তু শ্লথ জীবনযাপনের গতানুগতিকতায় রঙ্গলালই প্রথম শুনিয়েছিলেন,—

ওই শুন! ওই শুন! ভেরীর আওয়াজ হে
ভেরীর আওয়াজ!

অন্ততঃ ভেরীর তূর্যনিনাদ শ্রবণ করার জন্য আমাদের কাব্যামোদী মনকে তিনি আকৃষ্ট করেছিলেন। রঙ্গলালের 'কর্মদেবীর' বিচারেও আমরা একই বিষয়ের আয়োজন দেখি। এখানেও ভেরীর আওয়াজ শোনাতেই কবি তৎপর। দীর্ঘদিন লালিত জড়ত্বের হাত থেকে মুক্তি পাবার বাসনায় আমরা অস্থির হয়েছিলাম তবু কাব্যাঙ্গিকের নতুনত্ব, ভাষার ওজস্বিতা ও শব্দৈশ্বর্যের উন্মাদনাকে আমরা অভিনন্দিত করিনি। মধুসূদনের কাব্য সম্ভারের যথার্থ মূল্য সে যুগের জনসমাজ নির্ধারণ করতে পারেননি,—বহু বাগ্‌বিতণ্ডার মধ্যে শুধু সেযুগের জনচেতনার অস্থিরত্বই ধরা পড়েছে। কিন্তু 'পদ্মিনী উপাখ্যান'কার রঙ্গলালের কাব্যেই শুধু যে বীররসাধিক্য ছিল তা নয়, মানসিক শক্তিতেও তিনি তেজস্বী সাহিত্যসাধক ছিলেন। সুতরাং প্রচণ্ড উদ্যমে তিনি কর্মদেবী, শূরসুন্দরী রচনায় মগ্ন হলেন। রঙ্গলাল সাহিত্যবিচারের ভার নিজেই নিলেন,

"সৎকাব্যের যে দিন দিন সমাদর বৃদ্ধি হইতেছে, তাহাতে আর সন্দেহ মাত্র নাই, অতএব কর্মদেবী স্বীয় অগ্রজা পদ্মিনীর ন্যায় সাধারণের কিয়ৎ অনুগ্রহের পাত্রী হইবেন, এমত বিশ্বাস হইতেছে।"—"পদ্মিনী উপাখ্যানে" বীররস কাব্যপ্রেরণাই দিয়েছে কিন্তু পদ্মিনীর চরিত্রচিত্রণে এই বীররস দানা বাঁধেনি।—কর্মদেবী কিংবা শূরসুন্দরীতেও কাব্যরচনার এই মৌলিক ত্রুটি ধরা পড়ে। কিন্তু স্বদেশচিন্তার যে

বিশুদ্ধতা থেকে কবি প্রেরণা পেয়েছেন, সেই প্রেরণাই তাঁকে একই ভাবে পরবর্তী কাব্যরচনায় উৎসাহ দিয়ে আসছে। সাহিত্য সমালোচকের বিরূপতাকে রঙ্গলাল গ্রাহ্য করেননি কিংবা তাঁর কাব্যের বিরূপ সমালোচনা তাঁর যুগে হয়নি—কোনটাই সত্যি হয়ত নয় কিন্তু "পদ্মিনী উপাখ্যানের" অসংখ্য দোষত্রুটি, কবিত্বের শূন্যতা কোনটাই পরবর্তী কাব্যরচনার বাধা সৃষ্টি করেনি, এটাই আশ্চর্য। সুতরাং ধরে নেওয়া যেতে পারে রঙ্গলাল অবিচ্ছিন্ন আত্মমগ্নতা নিয়েই কাব্য সাধনায় রত হয়েছিলেন ;—তাঁর অমলিন কাব্যাদর্শ একইভাবে তাঁর পরবর্তী কাব্যেও আত্মপ্রকাশ করেছে। "কর্মদেবীর" শৌর্যগাথা শোনাতে বসে কবি আবার অতীত ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যস্বপ্নে মগ্ন হয়ে বীররসের সূচনা করলেন,—বর্তমান গ্লানির বেদনাও সেখানে আছে—

হায় কোথা সেই দিন, ভেবে হয় তনু ক্ষীণ,
এ যে কাল পড়েছে বিষম।
সত্যের আদর নাই, সত্যহীন সব ঠাঁই,
মিথ্যার প্রভুত্ব পরাক্রম ॥

* * * *

হায় কবে দুঃখ যাবে, এ দশা বিলয় পাবে,
ফুটিবেক সুদিন প্রসূন।
কবে পুনঃ বীর রসে, জগৎ ভরিবে যশে,
ভারত ভাস্বর হবে পুন ? [কর্মদেবী]

ভারতের লুপ্ত গৌরবস্মৃতি কবিচিত্তে বেদনা সঞ্চার করেছে।—বীররসের অভাব জাতিকে দুর্বল, শক্তিহীন করে—কবি বারংবার সেই খেদ প্রকাশ করেছেন। পাঠান যখন সাধুর কাছে বাণিজ্য প্রস্তাব এনেছে, সাধুর যুক্তির মধ্যে যেন ভারতের সমস্ত বিদেশী অত্যাচারীদের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে। বাণিজ্যের ছলে এসে অবশেষে যারা রাজ্যপাটের অধিকারী হয়েছিল, উনবিংশ শতাব্দীর পরিপ্রেক্ষিতে কাব্যের মধ্যে এ যুক্তি যেন বড়ো বেশী দুঃসাহসিক বলে মনে হয়। আত্মনিগ্রহের অন্তরালে নির্যাতিতের মর্মজ্বালা কবি যেন উদ্ঘাটিত করেছেন, যে চেতনা একদিন আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে উৎসাহী করে তুলেছে, রঙ্গলাল সাধুর উক্তির মধ্যেই সেই প্রশ্ন তুলে ধরেছেন,

কে হরিল সেই সব অমূল্য রতন ?
কে হরিল এ সকল কুবেরের ধন ?
কে করিল পুণ্যভূমি দুঃখেতে নিক্ষেপ ?
কে দিল তাহার দেহে যাতনা প্রলেপ ?
অনুপমা ভারতের পতিব্রতাগণ।

কে করিল তাহাদের মর্যাদা হরণ ?
কে করিল নগর নিকর শোভা নাশ ?
তোমরা জান নাকি হে সেই ইতিহাস ? [ঐ]

রঙ্গলালের ক্ষুব্ধ অন্তরের সঞ্চিত ব্যথা যেন গর্জন করে উঠেছে এখানে। অত্যাচারী লুণ্ঠনকারীদের নির্মম নিপেষণে আমরা হৃতসর্বস্ব, সোনার ভারত এরাই শতধাবিচ্ছিন্ন করেছে। রঙ্গলাল স্পষ্টতই জানেন,—

এরূপ বাণিজ্যছলে কত জাতি এসে।
করিলেন প্রভুত্ব স্থাপন নানাদেশে॥
অতএব কিবা প্রীতি তোমাদের প্রতি ?

অত্যাচারীর স্বরূপ রঙ্গলাল আবিষ্কার করেছেন এমন একটি মুহূর্তে যখন অত্যাচারী শাসকের স্বরূপ জনচিত্তে গভীর বেদনার সঞ্চার করেছে। নীলকর অত্যাচারে জর্জরিত মানুষ অন্ততঃ শাসকগোষ্ঠীর স্বরূপ চিনে নিতে ভুল করেনি। রঙ্গলাল ভারতের পুরাতন মর্মব্যথার কাহিনীকে নতুন ভাষায়, নতুন কথায় ব্যক্ত করলেন—কিন্তু তা নির্মম হুঙ্কারের মতই শোনাল যেন। 'কর্মদেবীর' কাহিনীতে আমরা যেন চিরদিনের দুঃখকেই নতুনভাবে দেখতে পেলাম।—আশ্চর্যের কথা, আমরাও সেই একই দুঃখের অংশভাগী। এখনও ভারতের বুকে বাণিজ্যের ছলে বিদেশী দস্যু এসেছে, একই কৌশলে শোষণ করেছে সর্বস্ব। রঙ্গলালের সচেতন চিন্তাধারায় ঐতিহাসিক সত্য অত্যন্ত নির্মম বর্তমান হয়ে দেখা দিয়েছে। 'কর্মদেবীর' কাহিনীতেও নারীচিত্তের কোমল-কঠোর বীর্য একাকার হয়ে গেছে।—পতিপ্রেমের সনাতন আদর্শ নারীকে বিপদে সাহস এনে দিয়েছে, আত্মোৎসর্জনের মহিমায় পদ্মিনীর মত কর্মদেবীও মহিয়সী। রঙ্গলালের কাব্যের কাহিনী পরিকল্পনায় নারীমহিমা সর্বাগ্রে স্থান পেয়েছে—বীররস প্রকাশ পেয়েছে এই কুলবালা নারীদের আত্মত্যাগের শক্তিতে। ফলশ্রুতি হিসেবে শুধু সনাতন নারীত্বের আদর্শই যদি মুখ্যভাবে এ কাব্যে পাওয়া যেত তবে এ প্রসঙ্গে রঙ্গলালের আলোচনার কোন সার্থকতাই থাকত না। কিন্তু রঙ্গলালের গভীর দেশপ্রীতি বীররসের কল্পনায় উৎসারিত হয়েছে,—কাব্যবিচ্ছিন্ন অনেক অংশেই তিনি তার নিখাদ দেশচিন্তাকে মুখ্যভাবে প্রকাশ করেছেন। 'কর্মদেবী'র উদ্ধৃত অংশটুকুর মধ্যে আমরা সেযুগীয় দেশচেতনার স্পষ্টরূপ প্রত্যক্ষ করেছি,—কাব্যাংশ হিসেবে যার বক্তব্য হয়ত সামান্যই।

রঙ্গলাল প্রসঙ্গের আলোচনায় কবির বিশুদ্ধ দেশপ্রেমচিন্তাই আলোচিত হয়েছে। রঙ্গলাল ঈশ্বরগুপ্তের মত খণ্ড কবিতায় তাঁর দেশপ্রেমাদর্শ প্রচার করতে চাননি বলেই কাব্য থেকে তাঁর মানসচিন্তার আলোচনা করতে হয়েছে। ঈশ্বরগুপ্তের ভাবশিষ্যরূপেই

রঙ্গলালের পরিচিতি এবং দেশপ্রেমের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত চিন্তাও রঙ্গলাল ও ঈশ্বরগুপ্তে প্রায় সমধর্মিতা লাভ করেছে। বাংলা সাহিত্যে একদা দেশপ্রেম প্রবলভাবে চিন্তার বিষয় বলে গৃহীত হয়েছিল; কাব্যে নাটকে-সংগীতে গীতিকবিতায় প্রবলভাবে যা বিকশিত হয়েছিল তারই অস্বচ্ছ ও আদিরূপ অনুসন্ধান করতে গেলে ঈশ্বরগুপ্ত ও রঙ্গলালের অস্ফুট ও অর্ধবিকশিত এই কাব্যাংশের সাহায্য নিতেই হয়। কবিমানসের যে বিশেষ প্রতিফলন যুগমানসের আর্তিরূপে একদা আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজেছে—তার অনুসন্ধান করতে হবে এখান থেকেই।

ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে রঙ্গলালের দেশচিন্তার যে সাধর্ম লক্ষ্য করেছি—পরবর্তী যুগে মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের কাব্যে ঠিক সেই বস্তুটি মিলবে না। কিন্তু দেশচিন্তা এঁদের কাব্যচিন্তায়ও স্থান পেয়েছে যুগপ্রয়োজনেই। যুগানুগ চিন্তাভাবনার প্রতিফলনই সাধারণতঃ সাহিত্যের বিষয় হয়ে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর এই বিশেষ ভাবান্দোলন সেযুগের প্রতিটি বিদগ্ধ মনেই চিন্তার ঢেউ তুলবে এটাই ত স্বাভাবিক! মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র—এরা প্রত্যেকেই মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে কাব্যক্ষেত্রে পদার্পণ করেছেন,—যুগের উচ্ছ্বাসই এঁদের কাব্যকে স্ফীত, বিশিষ্ট করেছিল। দেশপ্রীতির আলোকে বাংলার কবিকুলের মহিমা বিচার করার প্রসঙ্গে রঙ্গলালের আলোচনায় শুধু এ সত্যটিই স্বীকৃত হবে যে, দেশপ্রেমিকতা রঙ্গলালের প্রধান অবলম্বন হলেও পরবর্তীযুগের স্বদেশপ্রেমিক কবিগোষ্ঠীকে তিনি খুব বেশী প্রভাবিত করেননি। কিন্তু স্বদেশচিন্তার খাতটি তিনি খনন করেছিলেন বলেই সেই খাতে জলপ্রবাহের গতি একদা দুর্নিবার হয়ে উঠেছিল।

কাব্যসাহিত্যে আধুনিক যুগের সন্ধিসীমানায় যদিও ঈশ্বরগুপ্তকে স্থাপন করা হয়েছে তবু আধুনিকত্ব বা সে যুগীয় প্রাণস্পন্দনের তুচ্ছতম সংবাদ মধুসূদনের কাব্যেই স্পষ্টোচ্চারিত হয়েছিল। চিন্তার ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্ত যে কত সংকুচিত ছিলেন তাঁর কাব্যে উচ্ছ্বসিত মনোবেদনার অবগুণ্ঠনই তা প্রমাণ করে দেয়। দেশচিন্তার অকৃত্রিম-মৌলধারণা উপলব্ধি করেও শুধু দ্বিধা ও সংশয় তাঁকে স্পষ্টবাক্ হতে দেয় নি। মধুসূদন সম্পর্কে আলোচনা করতে বসে ঈশ্বরগুপ্তের এই কুণ্ঠা বড়ো বেশী স্পষ্টায়িত হয়ে দেখা দেয়। মধুসূদনের দেশপ্রেম অবশ্য বাহ্যিক বিচারে খানিকটা অসঙ্গতিমূলক—কিন্তু দ্বিধা ও সংশয়ে কম্পিত হয়ে মানসিক আবেগকে তির্যক ভঙ্গিমায় প্রকাশ করার দীনতা মধুসূদনের কোনদিনও ছিল না। মধুসূদন আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে সূর্যশৌর্যের অধিকারী। উজ্জ্বল কিরণে বঙ্গসাহিত্যের তিমির তমসাকে আলোকিত করাই ছিল তাঁর আদর্শ। সুতরাং তাঁর কাব্যচর্চার মূলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্যের প্রভাবের প্রশ্ন বাদ দিয়েও কাব্য বিচারকালে মধুসূদনের স্বকীয়ত্ব অন্বেষণ খুব অসহজ

নয়। যে প্রতিভা নিয়ে মধুসূদন কুয়াশাচ্ছন্ন মাতৃভাষা ও সাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন—সে এক আশ্চর্য প্রতিভা। সব কবি ও সাহিত্যপ্রেমিকই মাতৃভাষার মহিমাঞ্জন মেখেই চোখ মেলেছেন—কিন্তু ব্রহ্মসাধনার মত নেতিবাদী পথ দিয়েই মধুসূদন সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। অনাগ্রহ নিয়ে যাত্রা শুরু করেও অবশেষে বাংলাসাহিত্যেই তিনি আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পেলেন। সুতরাং মধুসূদনের মাতৃভাষা ও সাহিত্যপ্রীতির মধ্যে বৈপ্লবিক চিন্তা ও দর্শনের যে পরিচয় পাওয়া যায়—বাংলাভাষায় আর কোন সাহিত্যসেবীর জীবনে সে অভিজ্ঞতা নেই। তাই মধুসূদনের মাতৃভাষা ও সাহিত্যপ্রীতির মূল্য নির্ধারণ স্বাভাবিক রীতিতে করাই কষ্টকর। মাতৃভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগের পূর্বমুহূর্তেও কী প্রচণ্ড অনাস্থা দেখেছি তাঁর মধ্যে।—অবিশ্বাস্য রকমের নিস্পৃহতা দিয়ে তিনি মাতৃভাষাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। যদিও এই অনাস্থা ও অবিশ্বাস পরে গভীর বিশ্বাসে পরিণত হয়েছিলো। সুতরাং মাতৃভাষাপ্রেমিকরূপে মধুসূদনের যে পরিচয় মেলে সেইক্ষেত্রে তিনি একক: তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী আমরা আর কোন বাঙ্গালী কবি ও সাহিত্যিকের মধ্যে খুঁজে পাব না। সুতরাং কী গভীর মাতৃভাষাপ্রেমে ও স্বদেশপ্রেমে তিনি মগ্ন ছিলেন—তাও ঠিক অন্যান্য সকলের মাপকাঠি দিয়ে বিচার করা যাবে না। মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মতই অভিনব, আকস্মিক, অচিন্তিত, অনন্য। তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির মূলে যে অমিত ভাবাবেগ, স্বদেশপ্রীতির মূলেও তারই পরিচয় মেলে। মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম, মাতৃভাষাপ্রীতি, সাহিত্যসত্যের মর্মমূলে তাঁর জীবনের উত্তরণপর্বের যে পরিচয় নিহিত আছে,—অবিশ্বাস থেকে সমৃদ্ধ বিশ্বাসমার্গে উন্নীত হওয়ার সেই পর্বটি নানা কারণেই বৈশিষ্ট্যময়। মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম এই অর্থেই নিখাদ—জীবনলব্ধ সত্য। কথার বুদবুদের মত তা শুধু কণ্ঠোচ্চারিত নয়,—মর্মোৎসারী। মধুসূদনের আত্মোপলব্ধির গভীরতা তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মে বিধৃত হয়ে আছে,—শুধু স্বদেশপ্রেমাত্মক অংশটি তা থেকে বেছে নিতে হবে।

মধুসূদনের সাহিত্য জীবনের স্থায়িত্বকাল দীর্ঘ নয় নিতান্তই স্বল্পকালের। কিন্তু তার প্রস্তুতিপর্বটি বহুদিনের ও বহুসাধনার। দেশবিদেশের রত্নসাগরে ডুব দিয়ে উপলব্ধির নিবিড়তম আনন্দে তিনি মগ্ন হতে পেরেছিলেন,—এই দুর্লভ সৌভাগ্য লাভ করতে তাঁকে প্রস্তুত হতে হয়েছে। সাহিত্যক্ষেত্রে অবতরণের আগে সাধকোচিত এই প্রস্তুতিই তাঁকে সাফল্য এনে দিয়েছিল। বাল্মীকির মতই ধ্যানলব্ধ মহিমায় মধুসূদনও উনবিংশ শতাব্দীর মহাকবি। মাতৃভাষার সেবক হিসেবে যে মধুসূদনকে পাই, মনে রাখতে হবে সেই মধুসূদন অভিজ্ঞতা ও ঐশ্বর্যের সমন্বয়ে এক আশ্চর্য যুগপুরুষ। অলৌকিক ক্ষমতা ও অনুভবে তিনি সে যুগের এক উল্লেখযোগ্য

ব্যতিক্রমী মানুষও। আর এও সত্য যে, সাহিত্যজগতের মধুসূদনের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক জগতের মধুসূদনের মিল নেই,—সাহিত্যক্ষেত্রে তিনি একটি নির্জন ভাবলোক সৃজন করেছেন। সুতরাং খ্রীষ্টান মধুসূদন, বিদেশী আদবকায়দাদুরস্ত মধুসূদন, বাঙ্গালী কৃষ্টিবিচ্ছিন্ন,—সমসাময়িক ঘটনাবিচ্ছিন্ন মধুসূদনের সঙ্গে 'মেঘনাদবধে'র কবি মধুসূদনের, 'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা কাব্যের' মধুসূদনের কিংবা 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচয়িতা মধুসূদনের কোন বাহ্য সাদৃশ্য নেই। মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম আলোচনার আগে স্বদেশ সম্পর্কে ধারণার পরিচয় নিতে গেলে দেখা যাবে, মধুসূদন সাময়িক ঘটনা সম্পর্কে অচেতন ছিলেন পুরোমাত্রায়। সমালোচক প্রমথনাথ বিশী এ বিষয়টি সম্পর্কে বলেছেন,—

মধুসূদন ১৮৫৬ সালে মাদ্রাজ হইতে কলিকাতায় ফিরিলেন, আর ইংলণ্ড যাত্রা করিলেন ১৮৬২ সালে। এই কয় বৎসরে তিনি বন্ধুবান্ধবকে বহু পত্র লিখিয়াছেন কিন্তু ১৮৫৭-৫৮ সালে যে সিপাহীবিদ্রোহ ঘটিয়া গেল কোথাও তাহার উল্লেখ নাই। আজ আমরা ঘটনাটির উপরে যত রঙ চড়াই না কেন, তৎকালীন ইংরাজীশিক্ষিত বাঙ্গালীর চোখে উহার একমাত্র রঙ ছিল রক্তিম, তাহাও আবার অবাঞ্ছিত। মধুসূদনের চিঠিগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারা যায় যে, তিনি ইতিহাস সচেতন [আজকার ভাষায় সমাজ সচেতন] মনীষী ছিলেন, তাঁহার প্রধান প্রধান রচনাগুলির তলে ইতিহাস-চৈতন্যের অন্তঃসলিলা ধারা প্রবাহিত ছিল। তৎসত্ত্বেও যে তিনি এতবড় ঘটনাটাকে দেখিতে পান নাই, তার কারণ তাঁহাদের কাছে ঘটনাটা এত বড় ছিল না। খুব সম্ভব তাঁহাদের কাছে ইহা ইতিহাসের সাময়িক পিছন ফেরা মনে হইয়াছিল। যাঁহারা Rama and his rabbles-কে ঘৃণা করিতেন, তাঁহারা Nana and his rabbles-কে নিশ্চয় অভিনন্দনযোগ্য মনে করিতে পারেন না, যাঁহাদের কাছে অনার্য Ravana ও Indrajit হইতেছে Glorious ও noble, Nicholson, Havelock ও Outram তাহাদের কাছে অবরেণ্য হইবে না ইহাই তো স্বাভাবিক। সেকালের তরুণবঙ্গ বজ্রাহত অন্তঃসারশূন্য মুঘল সম্রাটের বা বর্গীর হাঙ্গামা দ্বারা স্মরণীয় পেশবার শাসনকে বিধাতার আশীর্বাদ মনে করিতে পারে নাই। তাহারা কায়মনোবাক্যে ইংরাজের শিক্ষা, সভ্যতা ও শাসনকে গ্রহণ করিয়াছিল। [মাইকেল রচনাসম্ভার, ভূমিকা, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী]

এই আলোচনা থেকে মধুসূদনের ইংরেজ সভ্যতানুরাগ যেমন প্রমাণিত হয়—তেমনি সাময়িকতা সম্পর্কে তাঁর নীরবতার হেতুটিও নির্ণীত হয়। শুধু সিপাহী-বিদ্রোহই নয়—সে যুগের নীলআন্দোলনের প্রসঙ্গ নিয়ে সমগ্র শিক্ষিত বাঙ্গালী যখন বিদেশী শাসকের প্রতি বিরূপ তখনও মধুসূদন নির্বিকার। এর কারণ সে যুগের প্রচণ্ড উত্তেজনার চেয়েও বড়ো উত্তেজনা ছিল তাঁর নিজের সাহিত্যজীবনেই। সাধকের

মত আপন অন্তরের সেই সংগ্রামেই রত ছিলেন সৈনিক মধুসূদন। ধর্মগত ঐক্যসীমা, সমাজগত সাধর্ম্য সীমায় না থেকেও মধুসূদন কাব্যের ক্ষেত্রে এক অপূর্ব ভাবলোক সৃজন করেছিলেন। তাই দেখি "মেঘনাদবধ কাব্য" রচনা করতে গিয়ে সীতা ও সরমা পর অঙ্কনে তিনি মহাকবিসুলভ ক্ষমতার অধিকারী. মন্দোদরী, রাবণ, ইন্দ্রজিত মনুষ্যত্ব ওমানবত্বের আদর্শে বলীয়ান। মধুসূদন ভাবলোকে যে সত্য সন্ধান করেছেন—হোমার, মিল্টন সেখানে তাঁর পদপ্রদর্শন করেছেন, বাল্মীকি তাঁকে প্রেরণা দিয়েছেন। তাঁর মহাকাব্যের নানাবিচার হয়েছে—কিন্তু এই মহাকাব্যের উপস্থাপনার অন্তরালে দেশপ্রেম ধারণার স্বচ্ছতা না থাকলে মেঘনাদের বীরত্ব, রাবণের শৌর্য, বীরবাহুর আত্মোৎসর্জন, লঙ্কার বীরত্বগৌরব প্রমাণ করা যেত না। এই দেশপ্রেম ধারণাটি দিয়েই 'মেঘনাদবধ কাব্যের' শুরু—সমগ্র কাব্যটিতে বীররসের শৌর্য ও বীর্যের অন্তরালে দেশপ্রেমের ফল্গুধারা প্রবহমান। মিল্টন ও হোমার দু'য়ের কাছ থেকে আদর্শলাভ করেছিলেন বলেই দেশপ্রেমের মহান নেতৃত্ব বহন করেছে মেঘনাদবধের দুই মহান চরিত্র।

এখানেও দেখি উনবিংশ শতাব্দীতে শিক্ষিত বাঙ্গালীর দেশভাবনার সঙ্গে মধুসূদনের যোগ নেই, কিন্তু পাশ্চাত্যের দেশপ্রেমাদর্শের দ্বারা তিনি অনুভাবিত। 'মেঘনাদবধ কাব্যে" বীররসের আরোপ কিংবা ইন্দ্রজিতের চরিত্রে দেশপ্রেমের আবেগ পুরোপুরি পাশ্চাত্ত্য মহাকাব্য থেকে আহৃত। কিন্তু এই সংগৃহীত ভাবনা কিভাবে আন্তরিকতার দ্বারা অভিষিক্ত হয়ে একটি সুগভীর দেশচিন্তার মহিমা অর্জন করেছিল 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রসঙ্গে সে কথা আলোচনা করব।

মধুসূদনের দেশচেতনার মূলে প্রত্যক্ষভাবে সেযুগের দেশচেতনার প্রভাব আছে কি না বলা অবশ্যই কঠিন। ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় বা ডিরোজিও শিষ্যবৃন্দ দেশপ্রেমের নতুন আবেগে যখন উন্মত্ত হয়ে আছেন—মধুসূদন তা থেকে কি ভাবে আত্মরক্ষা করেছিলেন জানা যায় না ;—কারণ কোন প্রামাণ্য দলিল নেই তার। রাজনারায়ণের দেশহিতৈষিতার অকপট স্বীকারোক্তি "সেকাল আর একালে" লিপিবদ্ধ হয়েছে,—মধুসূদনের কোন স্বলিখিত আত্মজীবনী থাকলেও সে কথা স্পষ্টভাবে জানা যেত। তবে মধুসূদনের সাহিত্যজীবনের দিকে তাকালে বারবারই মনে হয়, আত্মসমস্যা-পীড়িত মধুসূদনের কাছে সাময়িক দেশের সমস্যা বা দেশপ্রেম কোনটাই বড়ো চিন্তা হতে পারেনি। চেতনার প্রথম মুহূর্ত থেকেই মধুসূদন বড়ো বেশী আত্মকেন্দ্রিক। মধুসূদনের কাব্যে আমরা যে আন্তরিকতা সমৃদ্ধ দেশপ্রসঙ্গ পেয়েছি তাতে মনে হয় গভীরতর অনুভূতির ক্ষেত্রে কবিচিত্তের সাময়িক মত্ততা বা উত্তেজনার পরিচয়টুকুই সর্বাপেক্ষা গৌণ—শান্ত ও জীবনলব্ধ সত্যই স্বপ্রকাশিত। বাংলাদেশের নবজাগরণের-

বিচার করলে আত্মজাগরণের সঙ্গে এর মৌল বিভেদটুকু সহজেই ধরা পড়ে। বাংলাদেশের ভাবের জমিতে ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার বীজ বপনের প্রত্যক্ষ ফলাফলই তৎকালীন নবজাগরণরূপে চিহ্নিত,—যার ধ্বজাধারণ করেছিলেন ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়। সমস্ত দেশের চিত্তভূমিতেই এদের পদধ্বনির সাঙ্গীতিক রেশটুকু ধরা পড়েছে। কিন্তু তৎকালীন রেনেসাঁকে যদি আত্মজাগরণের পূর্ণ প্রতিরূপ বলে ধরে নিই—তবে আমাদের স্বকীয় প্রবণতার সঙ্গে বিদেশীয় সংস্কৃতির অপূর্ব মিশ্রণের আশ্চর্য সত্য আবিষ্কার করা যাবে না। তাই দেখি, সে যুগেও বিমিশ্র ভাবাবেগ বিভিন্ন ভাবে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করেছে। মাইকেলী ঔদ্ধত্য ও ভূদেবীয় নিষ্ঠার পাশাপাশি বিদ্যাসাগরীয় আত্মগর্ব—একই সঙ্গে এই ত্রিধাবিভক্ত মনোভাব মিলিয়েই সেযুগীয় নবজাগরণের পূর্ণ পরিচয়। মধুসূদনের অসহযোগী মনোবৃত্তির মধ্যেও উনবিংশ শতাব্দীর স্পর্ধিত অবনমিত জাগরণ চিহ্ন বর্তমান। মধুসূদনের সমগ্র সাহিত্য বিচারকালেও স্পর্ধা ও আত্মসমর্পণের মিশ্র অভিনবত্ব চোখে পড়ে। দেশ-প্রেম প্রকাশ করতে গিয়েও সনাতন পথের পথিক হতে পারেননি মধুসূদন। ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল দেশভাবনার সঙ্গে আত্মসম্পর্ক অনুভব করেছিলেন,—মধুসূদনের মধ্যে সেজাতীয় দেশসম্পর্কিত কোন সুদৃঢ় আত্মঅনুভব ছিল না—অথচ 'শ্যামা জন্মদে' বলে যখন দেশজননীকে সম্বোধন করেছেন তখন তাঁর দেশচিন্তার অকৃত্রিম উচ্ছ্বাসে আমরা মগ্ন হয়ে যাই। এই ধরণের আপাতঃ বিরোধ থেকেই মধুসূদনের কবিমানসের চিন্তাভাবনার বিচার করতে হবে। মধুসূদন সাময়িকতা সচেতন ছিলেন না,—এ অভিযোগ নয়—সিদ্ধসত্য। আসলে সমসাময়িকতার সঙ্গে মধুসূদনের নিজ জীবনের যোগাযোগ এত ওতপ্রোত যে তা থেকে সাময়িক ঘটনাবলীকে আলাদা করে বেছে নেওয়া চলে না। বাংলা দেশের চিত্তভূমিতে যে পরিবর্তনের প্লাবন এসেছিল—মধুসূদন তাতে এতই মগ্ন ছিলেন যে, বহির্জগতের ঘটনার প্রভাব সেখানে পৌঁছতে পারেনি অথচ মধুসূদনের যুগের আলোড়নের ইতিহাস দীর্ঘ। ১৮২৪ সালে মধুসূদনের জন্ম। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সংবাদপত্র প্রচলন হয়েছে,—'সংবাদ প্রভাকরে' কবিযশপ্রার্থী কবিকুল যখন তাঁদের সৃষ্টিকে অক্ষয় করার সাধনায় আপ্রাণ মগ্ন, মধুসূদন তখন হিন্দু কলেজের অধ্যয়নে নিবিষ্টমনা—ইংরেজী সাহিত্যবোদ্ধারূপে তাঁর বিশিষ্ট পরিচয় তখন কলেজ চৌহদ্দির বাইরেও ছড়িয়ে পড়েছে। সাময়িকতা অচেতন কবি হিসেবে মধুসূদনকে প্রতিষ্ঠা করতে গেলে সে যুগের রাজনৈতিক উত্তেজনার সঙ্গে অসম্পৃক্ত অথচ সে যুগের আন্তর আকুতির ধ্যানে মগ্ন মধুসূদনের কথাই মনে পড়ে আমাদের। তবে তাঁর মনোজগতের অন্তর্লীনতাই তাঁকে যুগবিচ্ছিন্ন করেছিল। ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহ যখন সারা ভারতে দাবানলের মত ছড়িয়ে

পড়েছে—মাদ্রাজ প্রত্যাগত মধুসূদন তখন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নতুন কিছু সংযোজন চেষ্টায় মগ্ন। বলাবাহুল্য তাঁর সাহিত্য জীবনের প্রারম্ভ মুহূর্তের এই উত্তেজনার লগ্নে দেশব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলনের উত্তেজনাও অর্থহীন হতে বাধ্য হয়েছে। আত্মস্থ মধুসূদন [মাদ্রাজবাসের অভিজ্ঞতার পর] তখন ভাষার আঙ্গিক সম্পর্কে উত্তেজিত। 'It is the language of Fisherman, unless you import largely fiom Sanskrit'—'আলালের ঘরের দুলালে'র ভাষা সম্পর্কে প্যারীচাঁদের সঙ্গে মধুসূদনের বিতর্ক। নাটক রচনার নতুন রীতি প্রবর্তনে মগ্ন তিনি—I-promise you a play that will astonish the old rascals in the old shape of Pandits.

১৮৫৯-১৮৬২ পর্যন্তই মধুসূদনের সৃষ্টির চূড়ান্ত মুহূর্ত;—রাজনৈতিক উত্তেজনা মুহূর্তের প্রায় একই সঙ্গে আত্মপ্রকাশ করেছে। স্বাভাবিক ভাবেই মধুসূদনের আত্ম-মগ্নতায় রাজনৈতিক ঘটনা বিন্দুমাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। পারিপার্শ্বিক জীবন ও জগতের সমস্যার চেয়ে তাঁর অন্তর্লোকের ভাবলোকের সমস্যার পরিমাণ কি বড়ো কম ছিল? তাঁর একটি জীবনে যত সংঘাত, যত দ্বন্দ্ব ও উত্তেজনার স্পর্শ লেগেছে—সাময়িক সমস্যা সমগ্র জাতির জীবনে ততখানি উত্তেজনা সঞ্চার করেনি।

মধুসূদনের সাময়িক ঘটনার প্রতি অমনোযোগের অভিযোগ হয়ত আরও অনেক যুক্তির অবতারণায় খণ্ডিত হতে পারে। সাহিত্য সৃষ্টির যে বিপুল আবেগ মধুসূদনের সমস্ত অন্তরাত্মা অধিকার করেছে,—কাব্যের মাঝখানে রূপময় হয়ে দেখা দিয়েছে সেই সত্যহ। কাব্যবিচারের পর্বে সেই আত্মপরিচয় স্পষ্টান্বিত হবে। কিন্তু দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' অনুবাদের যোগ্যতার পেছনে আন্তর অনুভূতির প্রচ্ছন্ন সমথন না থাকলে তৎকালীন বাংলাদেশে পাদ্রী লংএর কাঠগড়ায় দাঁড়ানোর প্রয়োজন হোত না। মধুসূদনের এই অনুবাদ সুদূর ইংলণ্ডেও আলোড়ন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছে, শুধু কি অনুবাদের জোরে? সমাজচেতনা ও স্বদেশপ্রেম কবিচিত্তে প্রেরণা না যোগালে অনুবাদের শক্তিতে তা হতে পারত না।

মধুসূদনের জীবনের সঙ্গে গতানুগতিক জীবনের পার্থক্য থাকায় সে যুগের মানুষ তাঁকে সহজে চিনে নিতে পারে নি;—সেজন্য মধুসূদনের যথার্থ ব্যাখ্যা হয়েছে আরও অনেক পরে। সাহিত্যস্রষ্টা হিসেবে তাঁর বিচার হয়েছে হয়ত, কিন্তু ব্যক্তি মধুসূদন সম্বন্ধে বিচার প্রায়শঃই একটার পর একটা ভ্রান্তি ও সংশয় বৃদ্ধি করেছে। কেউ তাঁকে বিজাতীয় বলে অপাংক্তেয় করেছে—ব্যঙ্গ করেছে তাঁর কাব্যকে, কেউ তাঁকে পানপাত্র দিয়ে উপহাস করেছে। "বিদ্যোৎসাহিনী সভার" পক্ষ থেকে "মেঘনাদবধ কাব্যের" মহাকবি মধুসূদনের সম্বর্ধনা উপলক্ষ্যে রজতময় সুরম্য পানপাত্র উপহার দেওয়ার

পরিকল্পনাটি কোন দিক দিয়েই উচ্চাঙ্গের পরিকল্পনা হয়নি। যদিও মধুসূদন সেই সভায় প্রদত্ত ক্ষুদ্র বক্তৃতায় তাঁর স্বদেশবাসীকে বলেছিলেন,

"স্বদেশের উপকার করা মানবজাতির প্রধান কর্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসম্ভবনীয়।

[মধুস্মৃতি—পৃঃ ১৩২]

নানাদিক দিয়ে এই বক্তৃতাংশটি লক্ষণীয়। স্বদেশের উপকার করাই যে মানবজাতির প্রধান কর্ম—একথা মধুসূদনের সমসাময়িক যুগে সর্বত্র শ্রুত সত্য। মানবজাতি ও স্বদেশের উপকার সম্পর্কে মধুসূদনের ধারণা যে কত স্বচ্ছ তা উক্তিটির গভীরেই নিহিত। তথাকথিত স্বদেশের উপকার বলতে আমরা যা বুঝি,- যা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট, সশব্দে প্রচারিত, মধুসূদন জানতেন এর বাইরে স্বদেশচিন্তা যদিও বা থাকে— তার স্বীকৃতি তখনও প্রথাসিদ্ধ হয় নি। মোটামুটি স্বদেশপ্রেম সম্বন্ধে একটা সর্বজনগ্রাহ্য ধারণা অনেক আগেই গড়ে উঠেছিল। রামমোহন থেকে ঈশ্বরগুপ্ত পর্যন্ত সকলেই যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন এর মর্মবাণী জনগণের সামনে তুলে ধরার। মধুসূদনও যে এ সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতন তার আভাস পাই এই ধরণের আত্মবিশ্লেষণে। মধুসূদনের মধ্যে একদিকে এই জাতীয় সমাজ সচেতনতা অন্যদিকে সমাজ সম্পর্কিত ঔদাসীন্য ধরা পড়েছে। সে যুগের মানুষ তাঁকে কোন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করছে— এটুকু তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন।

কাব্য যদি কবির মনের মুকুর হয়—তবে আন্তর অনুভূতির সত্য চিনে নেবার জন্য তার সহায়তা গ্রহণ করাই বিধেয়। স্বদেশপ্রেম কোন কোন মুহূর্তে শুধু পরিস্থিতির অবদান না হয়ে গভীরতর উপলব্ধির পর্যায়ে পৌঁছতে পারে। প্রকৃতিপ্রেম কিংবা অধ্যাত্মচিন্তার মতই কবিসত্তার সবটুকু স্থান সে অনায়াসেই গ্রহণ করে। মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম বিচার করতে বসেই এই সত্য স্পষ্ট হয়। ঈশ্বরগুপ্ত বা রঙ্গলালের স্বদেশপ্রেম যদি সে যুগীয় উন্মাদনার তরঙ্গায়িত সাগর হয় মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সাগরের শান্ত-স্নিগ্ধ অন্তঃস্থল। সচেতনভাবে যুগদাবীকে কাব্যে স্থান দিতে পারেননি বলেই মধুসূদন তাঁর মর্মজাত অনুভূতি ও জীবনবাণীকেই কাব্যরূপ দিয়েছেন। যুগের বিরুদ্ধে, সাময়িকতার বিরুদ্ধে, গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। প্রতি পদক্ষেপে শুধু অনিশ্চিতকে বরণ করার দুঃসাহস, অবলম্বনকে না পাওয়ার অঙ্গীকার। কোন প্রতিভান্যূন কবির পক্ষে এই অনিশ্চিত পথযাত্রার অর্থ অবধারিতভাবে শুধু নিশ্চিতবিলুপ্তির প্রহরগোনা। দীপ্তশক্তির সদম্ভ আত্ম-ঘোষণা শুধু মধুসূদনের পক্ষেই সম্ভব হয়েছিল।

সাহিত্যসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতিকূলতার আঘাতে মধুসূদন আরও স্বপ্রকাশিত হতে

পেরেছেন। সৃষ্টি যেখানে গতানুগতিকতারই নামান্তর, আত্মপ্রকাশের অনির্বচনীয় আনন্দ সেখানে সীমাহীন হতে পারে না। মধুসূদনের সৃষ্টির উল্লাস তাই অভিনব—আত্মপ্রকাশের বাণী এখানে এত স্পষ্ট ও আন্তরিক যে কাব্য পাঠকের সন্ধানী চোখ সমবেদনাসিক্ত না হয়ে পারে না। মধুসূদনের মত আন্তরিক আত্ম-উপলব্ধি সেযুগীয় সাহিত্যে দৈবাৎ দৃষ্ট। তাই স্বদেশপ্রেমের যদি কোন প্রকাশ তাঁর কাব্যে মেলে, মধুসূদনের গভীরতর উপলব্ধির সত্য সেখানে ধরা পড়বেই।

ঈশ্বরগুপ্ত যখন মাতৃভাষার গুণগান উদ্দেশ্যে বলেন,

বৃদ্ধিকর মাতৃভাষা পুরাও তাহার আশা,
দেশে কর বিদ্যাবিতরণ।

তখন উপদেশামৃত হিসেবে তার যুগোপযোগী আবেদন হয়ত অগ্রাহ্য করা যায় না, কিন্তু মাতৃভাষার প্রতি গভীরতর অনুভূতি ব্যঞ্জিত হয় না। এরই সঙ্গে তুলনায় মধুসূদনের "বঙ্গভাষা" যেন গভীরতর উপলব্ধির সত্য, ভাষাপ্রেমিকের আন্তর অনুভূতির অভিব্যক্তি,

হে বঙ্গ, ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি!) অবহেলা করি,
পরধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ
পরদেশে ভিক্ষাবৃত্তি কুক্ষণে আচরি।

মধুসূদনের আত্মমগ্ন-ভাবগম্ভীর উপলব্ধির কাব্যিক রূপ তাই অনেক বেশী আন্তরিক। এ শুধু কথার কথা নয়, শুধু সাময়িকতার যোগফল নয়, সেকালীন পটভূমিকায় অন্যান্যদের কাব্য-কবিতার পাশাপাশি মধুসূদনের কাব্যসম্ভার এক বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। ভাবে, ভাষায়, প্রকাশে, রসসঞ্চারে সুকাব্যোচিত গুণসম্পন্ন মধুসূদনের এই কাব্য কিন্তু অচিন্তিত বা অস্বাভাবিক কিছু নয়। নাটকীয়ভাবে যুগচেতনা যদি কবিসত্তাকে নাড়া দিত তবে তা থেকে মাইকেলী সাহিত্যসৃষ্টি হওয়াটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু যুগোচিত সংস্কারের অবলম্বন আঁকড়ে ধরতে হলে মধুসূদনের মত প্রতিভা চাই। মধুসূদনের মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর একটি খাঁটি নব্যবঙ্গীয় যুবক আত্মপ্রকাশ করেছিলো। প্রাচ্যসাহিত্যবিমুখ, প্রাচ্যসভ্যতা বীতরাগী একটি যুবক উনবিংশ শতকীয় প্রাণচাঞ্চল্যের সমস্ত স্বাদ অন্তরভরে গ্রহণ করেছিলো,—সে শুধু স্বকীয় ইচ্ছায় নয়। কোন ছলনার আশ্রয় না নিয়েই সে চাঞ্চল্যের সত্যতা যাচাই করেছে। সুতরাং খাঁটি অখাঁটি বিচারের নিখুঁত সামর্থ্য-সঞ্চয়ের সমস্ত গৌরব তাঁকে অভিনন্দিত করেছে। রত্নাকাঙ্ক্ষী মন ছিল এরই

পশ্চাতে, ডুবুরীর মত দুঃসাহসিকতায় ঝাঁপ দিতে তাই এতটুকু কুণ্ঠা ছিল না তাঁর। সেজন্যেই বলেছি, ঊনবিংশ শতাব্দীর গরলামৃত পান করে যে মধুসূদন আত্মস্থ হয়েছিলেন—তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ বক্তব্যের অপরিসীম মূল্য রয়েছে। তাঁর কাব্যের কথা তাঁরই বিচিত্র জীবনচর্যার কথা, তাঁর আত্মবিলাপ শুধু কল্পনার ভাবাতিরেক নয়, আত্মোপলব্ধির কথা।

মধুসূদনের কাব্যজীবনের মধ্যে কোন একটি বিশেষ ভাবসত্য মুখ্য নয়, উপলব্ধির বিচিত্রতায় তা সমৃদ্ধ। ঈশ্বরগুপ্ত বা রঙ্গলালে যে দেশপ্রেম—বিশেষ বক্তব্য হয়েছে মধুসূদনের সমগ্র কাব্যে তা ওতপ্রোত হয়ে আছে; কারণ উপলব্ধির বিচিত্রতা থেকে সেই বিশেষ ভাবটিকে কিছুতেই বিচ্ছিন্ন করা যায় না। দেশপ্রেম প্রচারের দায়িত্ব তিনি নেননি—কিংবা তথাকথিত দেশপ্রেমিকের ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেননি—তবু তাঁর সমগ্র উপলব্ধির ক্ষেত্রে দেশপ্রেম প্রাধান্য পেয়েছে। আগেই বলেছি, এই স্বদেশপ্রেম যেমন আন্তরিক তেমনি বিচিত্র। দুর্জ্ঞেয় রহস্যের মত বিধর্মী, বিজাতীয় মনোভাবাপন্ন মাইকেলের মধ্যে স্বদেশপ্রাণ, স্বভাষাপ্রেমিক, স্বসাহিত্যঅনুরাগী মধুসূদন লুকিয়ে ছিলেন। এজন্যই তাঁর কাব্যবিচার করতে বসে অনেক সমালোচকই মোহিতলালের সঙ্গে একমত হয়েছেন,—

"পাশ্চাত্য আদর্শ ও পাশ্চাত্য কাব্যকলার অনুকরণে তিনি যে নব্য বাংলা কাব্যের সৃষ্টি করিলেন, পরবর্তী বাংলা কাব্যে তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট কলাকুশলতা ও কল্পনা গৌরব লক্ষিত হইলেও, খাঁটি বাঙ্গালীর কাব্যহিসাবে কেহ তাহাকে অতিক্রম করিতে পারে নাই।" [কবি শ্রীমধুসূদন—মোহিতলাল মজুমদার]

কিংবা ভাবাবেগ মিশ্রিত সমালোচনাতেও যখন বলা হয়,—

"চণ্ডীদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরগুপ্তের পর এমন হিন্দুভাবানুপ্রাণিত কবিতা আর শ্রুত হইল না"— [মধুস্মৃতি, নগেন্দ্রনাথ সোম। পৃঃ ২১৬]

তখন খুব বেশী বাড়িয়ে বলা অতিরঞ্জনের মত শোনায় না। যে কোন একজন কবির স্বদেশপ্রাণতা বিচারের ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রশংসাই তার যথার্থ প্রমাণ।—কিন্তু মধুসূদনের স্বদেশপ্রাণতার মধ্যে যে সৌন্দর্য আছে—তা যে কোন প্রশংসার চেয়েও বেশী মূল্যবান, বেশী সত্য। কোনো উত্তেজনা যখন কোনো বিশেষভাবের বাহন হয়, তখন যথার্থ সত্য সেখানে সর্বদা প্রতিবিম্বিত হয় না। মধুসূদনের স্বদেশপ্রাণতার মধ্যে উত্তেজনার চেয়ে হৃদয়ানুভূতির স্বচ্ছধারাই প্রবহমান—সেজন্য স্থায়ীমূল্য দাবী করেছে অকুণ্ঠিতচিত্তে।

প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক সম্বন্ধে একটি সমালোচনায় বলা হয়েছে—"First, your

love of country is not to be presented in the light of a yearning for occasional acts of heroism but as a daily sober loyalty". [১৪]

মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম তাহলে পাশ্চাত্য সমালোচনার মানদণ্ডেও স্বীকৃতি পাবে, কারণ "daily sober loyalty"-র অভাবে তাঁর কাব্যের মধ্যে নেই বললেই চলে। স্বদেশপ্রেমের ক্ষেত্রে অন্ততঃ নেই। মধুসূদন দেশকে শুধু ভৌগোলিক সীমার আধাররূপে চিন্তা করেন নি; সংস্কৃতসাহিত্যে চিন্ময়ী সত্তারূপে দেশকে অভিহিত করা হয়েছে, চিন্তাগভীর মধুসূদনও দেশের চিন্ময়ীমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ব্যাকুল সম্বোধনে তা বারবারই ধ্বনিত হয়েছে। কৈশোর ও যৌবনের সীমারেখায় মধুসূদনের মনে এক আকস্মিক ভাবের প্লাবন এসেছিলো, ঘর ছেড়ে মায়ের স্নেহ অস্বীকার করে তিনি আকস্মিককে বরণ করার দুর্বার প্রেরণা পেয়েছিলেন কিন্তু তারপরই ঘরে ফেরার আকুতি নানাভাবে তাঁর কবিতায় করুণ সংগীতের মতই ধ্বনিত হয়েছে বারংবার। একান্ত আপনজনের মতো সমস্ত দেশ তাঁর অন্তরে উজ্জ্বল মাতৃমূর্তিরূপেই প্রতিভাত হয়েছে। বাংলাদেশ, বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে মধুসূদন তাঁর কাব্যে-কবিতায় বারবারই এ প্রসঙ্গ এনেছেন। দেশবন্দনা স্বভাষাপ্রেম ও স্বজাতিপ্রীতি মধুসূদনের কল্পলোকের ভাবনা ও অনুভূতিকে এতখানি নিবিড়তায় ভরিয়েছে। তাই সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টিতে আমরা ঘুরে ফিরে কয়েকটি শব্দ প্রয়োগের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করি। 'গৌড়জন' 'গৌড় সুভাজন' মধুসূদনের আত্মজন, তাঁদের কাছে "সুবঙ্গ" "শ্যামা জন্মদ" "সুশ্যামাঙ্গ" "সুবরদ" বঙ্গভূমির মনের কথা সাশ্রুনয়নে ব্যক্ত করেছেন মধু কবি।

স্বদেশপ্রেমের সুগভীর ধারণাটি মধুসূদন পৃথকভাবে কোথাও প্রকাশ করেন নি,—কাব্যসৃষ্টির মূলসত্য হিসেবে স্বদেশপ্রেমকে স্থাপনা করার কোন সচেতনতাও কোথাও দেখা যায়নি—তবু স্বদেশচেতনার গভীরতা অতি সহজেই প্রকাশিত হতে পেরেছে—এটাই আশ্চর্য। রঙ্গলালের মতে স্বাধীনতার বাণীপ্রচার মধুসূদনের মূলোদ্দেশ্য নয়—মধুসূদন আরও অনেক সমৃদ্ধ জীবনবাণীর কথা শোনাতে চেয়েছিলেন, নূতনের আলোকে পুরাতন কাব্যসাহিত্যের নবায়নই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' যুগজীবনের সমস্ত আর্তিই রূপায়িত হয়েছে,—স্বদেশপ্রেম সেখানে প্রস্ফুট নয়,—অস্ফুটই রয়ে গেছে। রাবণের মহিমা, মেঘনাদের অমলিন চরিত্রাংকণ যেখানে মুখ্য স্বদেশচেতনার মত আংশিক একটি উপলব্ধির বাণী সেখানে স্থান পাবে কি করে? কিন্তু রাবণ ও ইন্দ্রজিতের চরিত্র মহিমার পশ্চাৎপট হিসেবে কিভাবে মধুসূদন স্বদেশ চেতনাকে স্থাপনা

১৪. Quoted from 'Patriotism in Literature' P-39

করেছেন তাও লক্ষ্যণীয়। এই একটি মাত্র পটভূমির অভাবেই রাবণ ও ইন্দ্রজিতের মহিমাও বোধ হয় ম্লান হয়ে যেতে পারত। স্বদেশচেতনার মহান লক্ষ্যই পৌরাণিক রাবণের সহস্র নিন্দাকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে,—ইন্দ্রজিতকে একটি আদর্শ নায়করূপে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছে। আবার নিতান্ত আত্মগত অনুভূতি ও চিন্তার কথা যখন তিনি 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে প্রকাশ করেছেন সেখানেও শুধু দেশপ্রেমই সেই রচনাকে অনন্যতায় মণ্ডিত করেছে; তাঁর অন্যান্য কাব্যের মধ্যে মেঘনাদবধ কাব্য ও চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেই দেশপ্রেম সম্পর্কিত ধারণার স্বচ্ছ প্রতিরূপ পাওয়া যায়। আবার এ দুটি কাব্যেই মধুসূদনের কবিসামর্থ্যের শ্রেষ্ঠতাকেও আমরা পেয়েছি। অনেকের মতে "মেঘনাদবধ কাব্যের" কবিকে যথার্থ স্বরূপে আবার আবিষ্কার করা যায় "চতুর্দশপদী কবিতাবলীর" মধ্যেই। "তিলোত্তমা সম্ভবের" পর 'মেঘনাদবধ কাব্যে' মহাকবি মধুসূদনের কবিত্বশক্তির চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে, এই আকস্মিক শক্তিরই বিচ্ছুরণ ঘটেছে 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনায়'। চতুর্দশপদী কবিতাবলীর সঙ্গে পূর্বতন সৃষ্টির বিন্দুমাত্র সংযোগ নেই—তবু মধুসূদনের কবিচিত্তের সম্পূর্ণতা সাধন করেছে এই সমস্ত খণ্ড কবিতাবলীই। মনন ও চিন্তনকে এমন অনাবৃতভাবে কোন কাব্যে মেলে ধরেননি কবি। দেশপ্রেম শুধু কাব্যজগতের উপলব্ধি নয় বাস্তব জগত ও জীবনের সঙ্গে এর যোগাযোগ রয়েছে, মনন ও চিন্তনের সমন্বয়ে সে সত্য রূপ নেয় অপরূপ হয়ে। 'মেঘনাদবধ কাব্যে' দেশপ্রেম কাব্যের স্থায়ীভাবের উদ্দীপন বিভাব কিন্তু "চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র মূলভাবই স্বদেশচিন্তন—স্বদেশপ্রেমের স্বচ্ছ আবেগের তরঙ্গই যেন এক একটি কবিতার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। মধুসূদনের স্বদেশপ্রেমের আলোচনায় এ দুটি বিখ্যাত কাব্যেরই সাহায্য নিতে হবে আমাদের। মধুসূদনের কাব্যসাধনার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চমৎকারিত্ব নিয়ে "মেঘনাদবধের কাব্যের" জয়যাত্রা; এটি শুধু মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি নয়—মধুসূদন-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র সে যুগের ক্রান্তদর্শী এই তিন কবির যে কোন সৃষ্টির তুলনায় বিশিষ্ট। সুতরাং এ কাব্যের বিশিষ্টতার মধ্য দিয়ে সে যুগকে চিনে নেবার যত সুযোগ এসেছে—অন্য কাব্যে তা আসে নি। দেশপ্রেমের অস্ফুট উচ্ছ্বাস দিয়ে রঙ্গলাল বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে বীরযুগের উদ্বোধন করেছেন –'মেঘনাদবধ কাব্যে'র আঙ্গিক ও উপস্থাপনায় তা মুখ্যভাবে স্থান পেয়েছে। "মেঘনাদবধ কাব্যে" পরিকল্পনার বিভিন্নমুখী অভিনবত্বের মধ্যে দেশপ্রেম ধারণার অভিব্যক্তিও অন্যতম। পৌরাণিক সংস্কার বিচ্ছিন্ন মধুসূদন এ কাব্যের মর্মমূলে তাঁর নিজস্ব ধ্যানধারণাকে স্থাপনা করেছেন,—সোচ্চারে ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্বীয় উপলব্ধি ও অনুভববেদ্য সত্যকে। এ কাব্যে রামায়ণী কথা কাব্যের আদর্শ লঙ্ঘিত হয়েছে একথা যত বেশী সত্য– তার চেয়ে বেশী যুগসত্য এ

কাব্যের মধ্যে রয়েছে। রামায়ণের কোথাও রাম-রাবণের যুদ্ধকে গর্বোদ্ধত আক্রমণকারী ও আত্মরক্ষায় সচেষ্ট দুটি বিরোধী শক্তির সংঘর্ষ বলে দেখানো হয় নি। রাম যে সুদূর অযোধ্যা থেকে স্বর্ণলঙ্কার বৈভব হনন করতে আসেন নি এ ধারণা অর্জনের জন্য 'মেঘনাদবধের' প্রথম সর্গই যথেষ্ট। বীরত্ব, শৌর্য, বীর্য দিয়ে লঙ্কার সংগ্রামী সেনাপতিরা যখন একে একে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন স্বাধীনতা সংগ্রামের বীর শহীদ বলে তাদের অভিনন্দন জানিয়েছে লঙ্কাবাসী - এ ধারণাও অনন্যতায় সমৃদ্ধ। 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র উপস্থাপনায় স্বদেশচেতনা ওতপ্রোত থাকার হেতু অনুসন্ধান করলে সেযুগীয় উন্মাদনার প্রকাশ্য প্রভাব অস্বীকার করা যাবে না.—তবে মধুসূদন নিজেকে নিরপেক্ষ রেখেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন,—সাময়িক উত্তেজনার সঙ্গে সংযোগ না রেখেও সে যুগের সর্বজনীন আর্তি তাঁর কাব্যেই যথার্থ আন্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত হয়েছে। অবরুদ্ধ লঙ্কার সঙ্গে পরাধীন ভারতের রূপক খুঁজে পাওয়া হয়ত অতি কল্পনা হবে - কিন্তু আধুনিক মন নিয়ে যিনি রামরাবণের সংগ্রামকে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্বের ঊর্ধে স্থাপনা করেছেন, তিনিই আবার নবতর ব্যাখ্যারোপের প্রয়োজনে সেই আত্মদ্বন্দ্বকে দেশপ্রেমের মহিমায় ভূষিত করেছেন। পাশ্চাত্ত্য প্রভাব বীররসের প্রস্ফুটনে উদ্দীপিত করেছিল কবিকে কিন্তু স্বাধীনতা ও পরাধীনতার ব্যঞ্জনাটি মধুসূদনেরই পরিকল্পনা ;—দেশপ্রেমমূলক সাহিত্যে এই কল্পনাটি অভিনব ও তাৎপর্য-পূর্ণ। রাম ও রাবণের যুদ্ধ এখানে স্থানিক আক্রমণ ও প্রতিরোধের চেষ্টা মাত্র। অসংখ্য বীরদের আত্মোৎসর্জনের মধ্যে শুধু দেশপ্রেমেরই প্রেরণা সক্রিয় হয়েছে। রাবণের সীতাহরণ এখানে কোন অপরাধমূলক ঘটনাই নয় যেন, রামের লঙ্কা আক্রমণই সবচেয়ে বড়ো ঘটনা। লঙ্কাবাসীরা রাবণের অপরাধ বড় বলে মনে করতে পারেনি —ওতো শুধু রাজকীয় পৌরুষের একটা নমুনামাত্র, আর মধুসূদনও সুর্পনখার প্রসঙ্গটি প্রথমসর্গে অবতারণা করেই রাবণের অপরাধের বোঝা লাঘব করার চেষ্টা করেছেন।

সুতরাং রামের লঙ্কা আক্রমণ অপরাধ বলেই মনে করতে হবে এবং সেইজন্যই সমুদ্রের বন্ধনদশা দেখে রাবণের খেদ,—

"কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ! হা ধিক্ ওহে জলদলপতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য অজেয়
তুমি? [মেঘনাদবধ কাব্য, প্রথমসর্গ]

রামের:কাছে আত্মসমর্পণের মধ্যে রাবণ এক প্রচণ্ড দুর্বলতারই আভাস পেয়েছে, —এ যে বীরোচিত রীতি নয়। তাই সমুদ্রকে অপবাদ দূর করার উৎসাহ

দেয় রাবণ—কারণ বীর রাবণ, মানীর অপমান, বীরত্বের গ্লানি সহ্য করবে কেমন করে ?—

উঠ, বলি, বীরবলে এ জাঙ্গাল ভাঙ্গি,
দূর কর অপবাদ।

রামের লঙ্কা আক্রমণের প্রত্যক্ষ কারণটির অন্ত ব্যাখ্যাই 'মেঘনাদবধ কাব্যে' প্রাধান্ত পেয়েছে—এবং এই সুযোগে অবরুদ্ধ, লঙ্কাবাসীর স্বদেশপ্রেম প্রতিষ্ঠা সহজতর হয়েছে। মধুসূদনের কল্পনাশক্তির অভিনবত্ব এখানে যত বেশী স্পষ্ট, তাঁর নিজস্ব দেশচেতনা বোধ হয়ত ততখানি নয়। দেশচেতনার যে প্রত্যক্ষ প্রকাশ ঈশ্বরগুপ্ত ও রঙ্গলালে অনাবৃতরূপে দেখেছি মধুসূদনের কাব্যের কোথাও তা নেই। রঙ্গলাল "পদ্মিনী উপাখ্যানের" মর্মমূলে দেশচেতনাকে স্থাপন করেছেন, মধুসূদনের 'মেঘনাদবধে' তা নেই। মধুসূদনের মহাকাব্যের মধ্যে আরও অনেক জীবন নির্ভর সত্যানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে—এর মহাকাব্যত্ব সুবিশাল ক্ষেত্রে আপন মহিমায় ভাস্বর।

কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র প্রথম সর্গের মূলসত্য যে ভিত্তিকে আশ্রয় করেছে তা নিঃসন্দেহে লঙ্কাবাসীদের দেশাত্মবোধের অকৃত্রিম প্রেরণা। এই প্রেরণাই বীরবাহুর আত্মদানের মহিমা আবিষ্কার করেছে, এই প্রেরণাই রাবণকে আত্মশোক ভুলিয়েছে, যুদ্ধসাজে উৎসাহিত করেছে, এই প্রেরণাই ইন্দ্রজিতকে সচেতন করেছে এবং চিত্রাঙ্গদার যুক্তিসংগত অভিযোগকে একটা বিশেষ মহিমার প্রলেপে অর্থহীন বলে প্রমাণ করতে সমর্থ হয়েছে। চিত্রাঙ্গদার উদ্যত আক্রমণ রাবণকে তার ঐশ্বর্যের, মহিমার আসন থেকে নামাতে পারে নি, সে শুধু রাবণের সুপ্তশৌর্যবীর্যকে জাগরিত করেছে। পুত্রশোকাকুল রাবণ চিত্রাঙ্গদার অভিযোগ মেনে নিয়েই যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়েছে,—

"বীরশূন্য লঙ্কা মম। এ কাল সমরে
আর পাঠাইব কারে, 'কে আর রাখিবে
রাক্ষসকুলের মান ? যাইব আপনি।
সাজহে বীরেন্দ্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ॥

রাবণের যুদ্ধসজ্জার মধ্যেও লঙ্কার মান, রাক্ষসকুলের মানরক্ষার প্রশ্নটিকে মধুসূদন সুকৌশলে আরোপ করতে সক্ষম হয়েছেন;—সেজন্যই বলা যায় 'মেঘনাদবধের' প্রথম সর্গের দেশপ্রেম ব্যঞ্জনার মাধ্যমে ঘটনা ও চরিত্র চিত্রণের অভিনব দক্ষতা দেখাতে পরেছেন মধুসূদন।

দেশাত্মবোধের প্রেরণাতেই বীরবাহুর আত্মদান, লঙ্কাবাসীর মুখে এই আত্মদানের স্বীকৃতি। ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর আত্মত্যাগের মহিমা শ্রবণে উন্মুখ রাবণ, কারণ এ মৃত্যু বীরোচিত। ভগ্নদূতও জানে বীরবাহুর জীবনাহুতির মহিমা,—

হায়, লঙ্কাপতি,
কেমনে কহিব আমি অপূর্ব কাহিনী ?
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?

*　　　　*　　　　*

ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু !
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে ?

ভগ্নদূতের আক্ষেপাংশটিতেও দেশাত্মবোধের চরমপ্রকাশ।

"কেননা শুইনু আমি শরশয্যোপরি,
হৈমলঙ্কা—অলঙ্কার বীরবাহুসহ
রণভূমে ?

রাবণ পুত্রশোকাতুর, কিন্তু বীরপুত্রের বীরত্ব কাহিনী শ্রবণে তিনি উল্লসিত,

সাবাসি, দূত। তোর কথা শুনি,
কোন বীর হিয়া নাহি চাহেরে পশিতে
সংগ্রামে ?

রাবণ সার্থক জন্মদাতা, বীর পুত্রের জনক হিসেবে রাবণের গৌরবও বড় কম নয়। তাই মৃত্যুশয্যাশায়ী বীরবাহুকে দেখে রাবণের সগৌরব উক্তি,

"যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ, কুমার
প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে
সদা। রিপুদল বলে দলিয়া সমরে,
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ় ; শতধিক্ তারে।"

রাবণের এই শোকোচ্ছ্বাসের মূলেও যেন একটা সোচ্চার সান্ত্বনা,—"জন্মভূমি রক্ষা হেতু কে ডরে মরিতে ?"—বীরবাহু জন্মভূমির মানসম্ভ্রমকে জীবন দিয়ে রক্ষা করেছে,—দেশপ্রেমিকতার এর চেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত প্রাক মধুসূদন সাহিত্যে হয়ত আছে কিন্তু 'মেঘনাদবধ কাব্যে' এই দৃষ্টান্ত যতটা উজ্জ্বল মহিমা লাভ করেছে অন্যত্র তা নেই। "মেঘনাদবধ কাব্যে" বীরবাহুর আত্মদানই লঙ্কাবাসীর অতীত গৌরব ইতিহাস তুলে ধরেছে,—আমরা রাবণের মুখেই শুনেছি কুম্ভকর্ণ ও অন্যান্য রাক্ষস-কুল-রক্ষণ যোদ্ধাদের বীরত্ব কাহিনী ; আত্মদানের বিনিময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামকে যাঁরা উদ্দীপিত করেছে, প্রমাণ করেছে স্বাধীনতার মূল্য। বীরবাহুর মৃত্যু সেই রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্য একটি অমূল্য বিনষ্টি এবং ভবিষ্যৎ যোদ্ধাদের সামনে আর একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। রাবণও বীর কিন্তু আত্মজদের-প্রাণপ্রিয় সন্তানদের নির্ভীক আত্মদানের

সংবাদ যখন তাঁর কানে এসে পৌঁছয় সে মুহূর্তে শোক ও দুঃখে ভেঙ্গে পড়েন বটে কিন্তু পরমুহূর্তে তিনিও আত্মস্থ,—

কোন বীর হিয়া নাহি চাহেরে পশিতে
সংগ্রামে ?

সাহিত্যে যথার্থ বীররসের ঝংকার মধুসূদনই সৃষ্টি করলেন এক অপূর্ব বিপরীতমুখী ভাবসৃষ্টির মাধ্যমে। বীরবাহুর মৃত্যুতে রাবণের নিঃশব্দ ক্রন্দন শুধু পটভূমিকা মাত্র। অনন্ত শক্তিমান রাবণের সুপ্ত ও বিচলিত শৌর্যবীর্য জাগিয়ে তোলার একটা অতুলনীয় মহাকাব্যিক ভঙ্গিমা এটি। করুণরসের সিঁড়ি বেয়ে যে বীররস জাগরিত হবে সেই সম্মিলনের মধ্যে বক্তব্যটি গভীরতর মহিমা লাভ করবে। আত্মশক্তির বিশ্বাসে, বিনষ্টির বেদনায়, আত্মজ ও প্রিয়তমের মৃত্যুমুহূর্ত স্মরণ করে প্রতিহিংসায় প্রতিজ্ঞায় উন্মাদ সেই শক্তির উজ্জ্বলচিত্র অঙ্কনের পূর্বে মধুসূদন তাঁর কবিত্ব শক্তি প্রকাশের চূড়ান্ত মুহূর্তে এসে পৌঁচেছেন। বাংলা সাহিত্যে যথার্থ বীররস সৃজনের এই সুযোগ সৃষ্টি করতে আর কাউকে দেখা যায়নি। নিহত পুত্রের সামনে দাঁড়িয়ে পিতার প্রতিহিংসা ও বেদনা তাঁকে উন্মাদ করেছিল,—সাহিত্যে এই চিত্র যেমন বিরলদৃষ্ট তেমনি এই চিত্রাঙ্কনকে সার্থক করার প্রতিভাও কোটিকে গোটিক। মধুসূদন এই চরম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ; তাঁর মহাকাব্যে বীররস সৃজনের প্রতিজ্ঞাও সার্থক। দেশপ্রেমই প্রত্যক্ষভাবে এই বীরত্বের প্রেরণা এনে দিয়েছে।

মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্যের" ইন্দ্রজিৎ চরিত্রপ্রসঙ্গটি এখনও আলোচিত হয়নি, স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস এ চরিত্র প্রসঙ্গে আরও স্পষ্টভাবে দেখা যায়। ইন্দ্রজিৎ এ কাব্যের নায়ক,—মধুসূদন তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেছেন এ চরিত্রটি প্রস্ফুটনের জন্য। ইন্দ্রজিতের অমলিন ব্যক্তিত্ব, শৌর্যবীর্য, তেজ, নিষ্ঠার তুলনা নেই,—'লঙ্কার পঙ্কজ রবি', ইন্দ্রজিৎ স্বদেশপ্রেমের মূর্ত বিগ্রহ। কিন্তু মেঘনাদ প্রসঙ্গে আসার আগেই এ কাব্যের প্রথম সর্গে মধুসূদন দেশপ্রেম ভাবনাকে অনাবৃত ভাবে প্রকাশ করেছেন। মধুসূদন প্রথম সর্গেই রাবণের স্বর্ণলঙ্কার বিপদের আভাস দিয়েছেন,—ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও অপরাধের প্রশ্নটি দেশের বর্তমান পরিস্থিতি ভেদ করে কোথাও মুখ্য হতে পারে নি—যদিও চিত্রাঙ্গদা প্রকাশ্য রাজসভায় এসে লঙ্কা ও অযোধ্যার এই সংগ্রামের যুক্তিগ্রাহ্য সত্যপ্রকাশের আপ্রাণ চেষ্টা করেছে কিন্তু বোঝাই যায় এর চেয়ে নিষ্ফল অরণ্যে রোদনের দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে। চিত্রাঙ্গদা তাঁর সমস্ত শক্তি সাহস সঞ্চয় করে রাজা রাবণকে অভিযুক্ত করছে,—কোনো আদর্শের মহিমা তার কাছে মূল্যহীন। পুত্রশোকের বেদনা তাকে দুঃসাহসী করেছে,—অন্তঃপুরের আগল

ভেঙ্গে পুত্রশোকাতুরা মাতা প্রতিকার ভিক্ষা করেছেন,—নির্মমভাবে আদর্শের মুখোশ খুলে দিয়েছেন জনসমক্ষে,—

দেশবৈরী নাশে যে সমরে,
শুভক্ষণে জন্ম তার ; ধন্য বলে মানি
হেন, বীরপ্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী।
কিন্তু ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্কা তব ;
কোথা সে অযোধ্যাপুরী ? কিসের কারণে,
কোন লোভে, কহ, রাজা, এসেছে এ দেশে
রাঘব ?

শুনেছি সরযূতীরে বসতি তাহার—
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন আশে
যুঝিছে কি দাশরথি ? ....
.....................তবে দেশরিপু—
কেন তারে বল, বলি ?

দেশপ্রেমের যে প্রলেপ দিয়ে রাবণের সীতাহরণের অন্যায় গোপনের চেষ্টা চলেছে—চিত্রাঙ্গদা তারই স্বরূপ তুলে ধরেন কিন্তু আগেই বলেছি এ শুধু চিত্রাঙ্গদার নিস্ফল অরণ্যে রোদন,—সমগ্র লঙ্কাবাসী সে অপরাধ বিস্মৃত হয়েছে, চিত্রাঙ্গদার দর্পিত সত্য উক্তি শুধু নির্মম পরিহাসে পরিণত হয়েছে। মধুসূদন সত্য প্রকাশে অকুণ্ঠিত,—তাঁর নব্যমহাকাব্যের মধ্যে আর যাই থাক না কেন সত্যের বিকৃতি নেই ;— শুধু কল্পনা ও প্রকাশভঙ্গির অনন্য বলিষ্ঠতায় তা সমৃদ্ধ জীবননির্ভর কাব্য। চিত্রাঙ্গদার দেশপ্রেমের মোহ নেই, মাতৃস্নেহের শক্তিই রাবণের যথার্থ স্বরূপ নির্ণয় করেছে অভ্রান্তভাবে। রাবণ বিরোধিতার কোন ইচ্ছাও তাকে প্রণোদিত করেনি,— তাহলে বিভীষণপন্থী চিত্রাঙ্গদা এ কাব্যের বিশেষ একটি চরিত্র হয়ে উঠত। কিন্তু চিত্রাঙ্গদা পুত্রহারা জননীর মতই জ্ঞানশূন্যা,—কোন মিথ্যা সম্মানের মোহ দিয়ে সত্যকে ঢাকবার চেষ্টা করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল ;—এখানেই চরিত্রটির স্বাভাবিকত্ব। রাবণের বীরবাহুপ্রশংসায় অবিচলিত চিত্রাঙ্গদা তাই ক্রুদ্ধা ফণিনীর মত গর্জন করে ওঠেন। মিথ্যা সম্মান কি মাতৃস্নেহের চেয়েও বড় ? সমগ্র লঙ্কাবাসী চিত্রাঙ্গদার বক্তব্যের সুবিচার করে নি, চিত্রাঙ্গদা নীরবে যথাস্থানে ফিরে

গেছে। কিন্তু এ প্রসঙ্গে রাবণের সান্ত্বনা বাক্য যেন খানিকটা আত্মশোধনের চেষ্টা,—

বীরশূন্য লঙ্কা মম। এ কাল সমরে,
আর পাঠাইব কারে ? কে আর রাখিবে
রাক্ষস কুলের মান ?

চিত্রাঙ্গদা 'এ কালসমর' আয়োজনের প্রশ্নটি তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন প্রাণ-পণে, কিন্তু রাবণমহিমা মুগ্ধ লঙ্কাবাসীরা এ নিয়ে মাথা ঘামায়নি। এইভাবে 'মেঘনাদবধ কাব্যে' একটা পুরাণসম্মত অপরাধও নতুন একটা যুক্তির আলোকে পরিশুদ্ধ সত্য হতে পেরেছে। মধুসূদনের রাবণের মতই আমরাও যেন মনে প্রাণে বিশ্বাস করছি যে, সত্যিই লঙ্কার স্বাধীনতার প্রসঙ্গ ছাড়া প্রথম সর্গে অন্যান্য সমস্ত প্রশ্নই অবান্তর।

মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' প্রসঙ্গে কোন একজন সমালোচকের সঙ্গে একমত হয়ে এ বিষয়ে সত্যিই বলতে পারি,—

আমাদের পর শাসনপীড়িত, অদৃষ্ট বিড়ম্বিত ব্যাহত জীবনের সঙ্গে 'মেঘনাদবধ কাব্যের' মানবীয় চরিত্রগুলির কোথায় যেমন মিল আছে—কাব্যটির সকরুণ গীতধর্মী অংশ যেমন মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনের, তেমনি জাতীয় জীবনের রোমান্টিক মর্মসংগীত। [পৃঃ ১৬-১৭, মধুসূদনের কাব্যবৃত্ত—জীবেন্দ্র সিংহরায়]

মেঘনাদের চরিত্র চিত্রণেও বীরত্বই মুখ্যকথা,—কিন্তু কোথাও কোথাও মেঘনাদ আমাদের জাতীয় জীবনের মর্মার্তিকে, শক্তি ও বীরত্বের মধ্যে মুক্তি দিয়েছেন। সাহিত্যেও অন্ততঃ একটি সজীব শক্তির মূর্তি দেখতে পেয়েছি। মেঘনাদ মধুসূদনের মানসপুত্র,—শক্তি ও সৌন্দর্য দিয়ে তিল তিল করে তিনি এই তিলোত্তম চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস পেয়েছেন।—কিন্তু মেঘনাদের দেশাত্মচেতনা, আত্মদান স্পৃহা, বীরপণা তাঁর অন্যান্য সুকোমল গুণকে অতিক্রম করেছে সহজেই। মেঘনাদ বীর,—বীর রাবণের যোগ্য পুত্র—এ পরিচয়টুকুই বোধহয় এ কাব্যে মুখ্য।

প্রথম সর্গে প্রমোদকাননে উৎসবমগ্ন ইন্দ্রজিতের প্রথম চেতনাসঞ্চার মুহূর্তের চিত্র,—

হা ধিক্ মোরে! বৈরিদল বেড়ে
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি রামাদল মাঝে ? [১ম সর্গ]

এখানেও শত্রুর হাত থেকে স্বর্ণলঙ্কা উদ্ধারের আকুলতাই তাঁকে উদ্দীপিত করেছে,—মেঘনাদ বলীর আবির্ভাব ঘটেছেও ঐ একই চেতনা থেকে। ইন্দ্রজিত অভিষেকের মুহূর্তেও বন্দীদের সময়োচিত বন্দনাগীতি,—

নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি,
অশ্রুবিন্দু ; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি ;
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট,
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি,
তোমার ! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি !
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয় অচলে ।
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী । [প্রথম সর্গ]

পরাধীনা-শত্রুবেষ্টিতা লঙ্কাপুরীর এই দুর্দশাচিত্র অঙ্কনের মধ্যে পরাধীনা ভারত মাতার দুরবস্থার রূপক অনুসন্ধান হয়ত অসমীচীন কিন্তু রঙ্গলাল বা ঈশ্বরগুপ্ত স্পষ্ট ভাবে যা ব্যক্ত করেছেন—মধুসূদন তা করেননি বলেই একে স্পষ্টভাবে আরোপিত রূপক বলে মনে হয়না কোথাও। মধুসূদন অলংকারে, রূপকে তাঁর মহাকাব্যকে সমৃদ্ধ করেছিলেন কিন্তু রচনাগুণে তা স্থানিকতা বা সাময়িকতার ঊর্ধ্বে এক অভিনব জাতীয়স্বপ্নের সম্ভাবনাকে সূচিত করেছে। মধুসূদনের যুগে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ দেশপ্রেমিকদের আবির্ভাব ঘটেনি বটে, মেঘনাদ শুধু কাব্যের মধ্যে তাঁর দেশপ্রেম ও স্বাধীনতার জন্য জীবন বিসর্জন দিলেন। কাব্যের যদি পরোক্ষভাবেও মানুষের মনে প্রভাব বিস্তার করার সামর্থ্য থাকে তবে ইন্দ্রজিতের এই আত্মত্যাগও নিশ্চয়ই ব্যর্থ হয়নি। স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির জন্য আত্মদান ইন্দ্রজিতের আজীবনের স্বপ্ন, তাই ষড়যন্ত্রের ফলে লক্ষণের হাতে তাঁর অসহায় মৃত্যুতে বীরত্বপূর্ণ খেদোক্তি,—

কিন্তু তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি,
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে।
দৈত্যকুলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ? [৬ষ্ঠ সর্গ]

ইন্দ্রজিতের মধ্যে স্বদেশনিষ্ঠা যেন বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে,—এ তাঁর সুগভীর দেশ-প্রেমের কথা। বিভীষণকে ইন্দ্রজিৎ সেকথাই শুনিয়েছে,—

তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে
বনবাসী !.........................
............কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি,—ভ্রাতৃপুত্র তব ?
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে ? [৬ষ্ঠ সর্গ]

দেশপ্রেমিক মেঘনাদের কাছে বিভীষণের বিরুদ্ধাচরণ যেন এক স্বপ্নাতীত, কল্পনাতীত বিস্ময়। ইন্দ্রজিতের শক্তি ও বীরত্বের সংবাদ এখানে অপ্রত্যক্ষ। ষষ্ঠ

সর্গে অসহায় ও নিরস্ত্র ইন্দ্রজিতকে সশস্ত্র নির্মম শত্রুর কাছে শক্তিপরীক্ষা দিতে হয়েছে মাত্র। কিন্তু এই অংশেই মেঘনাদ তাঁর শক্তির চরম পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ—মৃত্যুবরণের পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত অমিতবিক্রমে তিনি আত্মরক্ষা ও সর্বোপরি লঙ্কার মুখরক্ষা করার সংগ্রাম করে গেছেন। বিশ্বাসঘাতক শত্রুসমর্থক বিভীষণের ষড়যন্ত্রে বিস্ময়াহত মেঘনাদ শুধু একবারই মরমে মরে গিয়েছিলেন—,

হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে।
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে একথা, তাত, কহ তা দাসেরে।

ইন্দ্রজিৎ শত্রুর ষড়যন্ত্রের তাৎপর্য বোঝেন কিন্তু লঙ্কার স্বাধীনতাকে আক্রমণকারীর হাতে তুলে দিয়ে তারই দাসত্ব স্বীকারের কথা তাঁর স্বপ্নেরও অগোচর। কিন্তু বিভীষণ সেই হীনতম কাজ করতেও দ্বিধাবোধ করেননি, ইন্দ্রজিতের পক্ষে এ যে কত বড় স্বপ্নভঙ্গ, তা বুঝি তাঁর খেদোক্তিতে। মৃত্যুমুহূর্তেও ইন্দ্রজিৎ জ্ঞাতিত্ব-ভ্রাতৃত্ব ও দেশপ্রেমেরই মহিমা কীর্তন করে গেছেন। কিন্তু বিশ্বাসহন্তা-দেশদ্রোহী বিভীষণকে শোধন করার মুহূর্ত যে অতিক্রান্ত ইন্দ্রজিৎ তা জানতেন না—তাই শাস্ত্রবাক্য, আপ্তবাক্য শুনিয়েছেন,—

কোন ধর্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি,—এ সকলে দিলা
জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান যদি
পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুণ স্বজন শ্রেয়ঃ পর পর সদা। [৬ষ্ঠ সর্গ]

কিন্তু বিভীষণের কাছে এই শাস্ত্রবাক্যও মূল্যহীন। রামায়ণের বাল্মীকি কৃপাধন্য বিভীষণ এখানেও ধর্ম প্রসঙ্গেরই অবতারণা করেছে। বাল্মীকি রামায়ণের পাঠকরা বিভীষণের মহত্ত্বই অনুসন্ধান করেছে কিন্তু মেঘনাদবধের পাঠক সম্প্রদায় বিভীষণের মধ্যে বিন্দুমাত্র মহত্ত্ব খুঁজে পায়নি। শুধু তিরস্কার ও ঘৃণা, লাঞ্ছনা ও গ্লানি বিভীষণকে ক্ষতবিক্ষত করতে চেয়েছে। বিভীষণের অপরাধের কোন যুক্তি নেই, ক্ষমা নেই। আত্মপক্ষ সমর্থনের যত কথাই বিভীষণ শোনাতে চেয়েছে—লঙ্কাবাসী তা ঘৃণাভরে অবহেলা করেছে। বিভীষণ বিশ্বাসঘাতক, 'মেঘনাদবধ'কাব্যে' এ পরিচয় তাঁর পৌরাণিক সমস্ত মহিমাকে চূর্ণ করে দিয়েছে। রাবণ, মন্দোদরী, মেঘনাদ, মেঘনাদ-পত্নী প্রমীলা, সকলেই ধিক্কৃত করেছে বিভীষণকে। রক্ষ-কুলাঙ্গার, রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক, দয়াশূন্য বিভীষণ—এই তার বিশেষণ। বিভীষণ সম্পর্কে লঙ্কার সাধারণের মনোভাবও মধুসূদন সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন। প্রমীলাসখী নৃমুণ্ডমালিনীও বিভীষণকে লঙ্কার চির শত্রুরূপেই দেখে, বিভীষণকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেছে,—

ডাক সীতানাথ হেথা, লক্ষ্মণঠাকুরে,
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক বিভীষণে!

রাম লক্ষ্মণ শত্রুপক্ষ হলেও নৃমুণ্ডমালিনী তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দিতে কার্পণ্য করেনি কিন্তু দেশদ্রোহী বিভীষণ তা থেকে বঞ্চিত। সমগ্র লঙ্কাবাসীর অভিশাপ বিভীষণকে লাঞ্ছিত করেছে। এ বিভীষণ 'মেঘনাদবধের' স্রষ্টা মধুসূদনেরও সহানুভূতি বঞ্চিত।

স্বদেশপ্রেমী ইন্দ্রজিতের আত্মদানের মহিমাবর্ণনা যেমন এ কাব্যরচনার প্রধান কারণ তারই পাশে দেশদ্রোহিতার—বিশ্বাসঘাতকতার প্রতি ঘৃণাবোধ জাগিয়ে তোলাও অন্যতম গৌণ উদ্দেশ্য। রঙ্গলালের কাব্যেব বীরত্ব, 'মেঘনাদবধ কাব্যের' দেশপ্রেম বিচারই একমাত্র বিচার নয়,—চিতোর কিংবা লঙ্কার স্থানিক শৌর্যবীর্যের ঘটনা ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে বাঙ্গালীর অন্তরের দুঃখ-বেদনা-পরাজয়ের গ্লানিতে মিলেমিশে অদ্ভুত একটা রসের সৃষ্টি করেছে,—শুধু বীররস বললে তার সবটুকু বোঝানো যায় না। এ রসের আকাঙ্ক্ষা এসেছে জাতির অন্তরের সঞ্চিত তৃষ্ণার পথ বেয়ে। তাই সে যুগের মানুষ মধুসূদনের সঙ্গে অসহযোগিতা করেও 'মেঘনাদবধের' রস সামর্থ্যকে অভিনন্দিত করেছে। যে দেশপ্রেম ইন্দ্রজিতকে আত্মদানে উদ্বুদ্ধ করেছে,—ইন্দ্রজিতপত্নী প্রমীলার মধ্যেও সেই একই চেতনা প্রত্যক্ষ করি। শত্রুবেষ্টিত লঙ্কাপুরীতে প্রবেশের মুহূর্তে প্রমীলাও তাঁর শক্তি ও দেশপ্রেমের পরীক্ষায় অবতীর্ণা। যুদ্ধকে প্রমীলা ভয় পাবে কি করে? ইন্দ্রজিৎ পত্নী প্রমীলা যে বীরাঙ্গনা নারী। মধুসূদন নারীর কোমল অন্তরেও শত্রুর প্রতি প্রচণ্ড বীতরাগ সৃজন করেছেন,—শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে, শক্তি পরীক্ষাক্ষেত্রে অবতরণেও প্রমীলার পূর্ণ সম্মতি রয়েছে। অথচ পতিদর্শনের আকুলতাই তাঁর সংগ্রামসামর্থ্যের মূলে, ইন্দ্রজিতের বীরত্বের আদর্শই তার উৎসাহ। প্রমীলার যুদ্ধসজ্জা সাহিত্যের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে,—কিন্তু বাস্তবেও তা কি অসম্ভব? সিপাহী বিদ্রোহের নেত্রী ঝান্সির রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর বীরত্বের ঘটনা ত মধুসূদনের সমসাময়িক ঘটনা। মধুসূদন তা থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন কি না জানি না, কিন্তু প্রমীলা সদম্ভে বলেছে,—

পশিব নগরে
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে
রঘুশ্রেষ্ঠে, এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম,
নতুবা মরিব রণে—যা থাকে কপালে। [তৃতীয় সর্গ]

মৃত্যুকে অস্বীকার করেই এই জয়যাত্রা। ইন্দ্রজিৎ পত্নীর এই বীরত্বটুকু মহাকাব্যের

সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করেছে। মৃত্যুপণে সংগ্রামপ্রার্থনা জানিয়ে প্রমীলাও ইন্দ্রজিতের মত আত্মশক্তির কথা বলে,—

নাগপাশ দিয়া
বাঁধি লব বিভীষণে—রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে !
দলিব বিপক্ষদলে, মাতঙ্গিনী যথা
নলবন। [ঐ]

বিভীষণকে প্রমীলাও ক্ষমা করে নি—কারণ স্বামীর আদর্শের অনুগামিনী প্রমীলা জানে বিশ্বাসঘাতকতা-দেশদ্রোহিতার শাস্তি কি হতে পারে !

"পদ্মিনী উপাখ্যানে"—বীরত্ব ও শৌর্যে রানী যথার্থ পরীক্ষার সম্মুখীন কিন্তু রানী পদ্মিনী অন্তঃপুরিকাই। মধুসূদনের প্রমীলা যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণা—মধুসূদনের কল্পনায় শক্তি ও বীর্য্যবতী নারীর এ এক অনন্যরূপ। আত্মসচেতন নারী চিত্রাঙ্গদার মধ্যেও যুক্তিনিষ্ঠ বিচারশক্তি প্রত্যক্ষ করি. প্রমীলার ভাবাবেগ ও দেশচেতনা আরও তীব্র। যুদ্ধপ্রার্থনা করে শত্রু-বিনাশের জন্য প্রমীলাও সুসজ্জিতা।

মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্যের" সঙ্গে দেশ ও জাতির সম্পর্ক আপাতঃ দৃষ্ট নয়। কিন্তু 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' সম্পর্কে এত দ্বিধা নেই। জাতীয়তাবাদ কিংবা দেশচেতনা মাতৃভূমির প্রতি আন্তরিক ভালবাসা থেকেই জন্ম নেয়। কোথাও তা স্বপ্রকাশিত কোথাও তা স্বতঃস্ফূর্ত। দেশপ্রেমের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি সাহিত্যের শাশ্বত সত্য হতে পারে। মধুসূদনের দেশপ্রেম ঠিক গতানুগতিক মাতৃভূমিপ্রীতি নয়,—স্বদেশপ্রেমী হওয়ার জন্যও মধুসূদনকে প্রস্তুত হতে হয়েছে। জীবনসংগ্রামের এক একটি পর্বে মধুসূদনের এক একটি সত্তা বিকশিত হয়েছে। সাহিত্যসৃষ্টির প্রথম পর্ব থেকেই তিনি জীবনযুদ্ধের সৈনিক। এক হাতে কলম অন্য হাতে জীবনসংগ্রামের অস্ত্র তাঁকে তুলে নিতে হয়েছে। ধর্মগত বাধা, এদেশীয় সংস্কৃতি, সভ্যতা ও গতানুগতিকতার প্রতি প্রচণ্ড অনাস্থা নিয়ে তিনি আপন পরিধিতে নিজেই একটি রণক্ষেত্র প্রস্তুত করে নিয়েছিলেন। সমসাময়িক উত্তেজনার স্পর্শমুক্ত হয়েও তিনি কত অবিশ্রাম আত্মসংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। "মেঘনাদবধ" রচনার মুহূর্তে—'বীরাঙ্গনা', সৃষ্টিলগ্নে মধুসূদন যে কতটা অস্থির হয়েছিলেন বন্ধুবান্ধবকে লেখা কোন কোন পত্রাংশে তার উল্লেখ আছে। একই সঙ্গে, "মেঘনাদবধ কাব্য" "কৃষ্ণকুমারী" নাটক "ব্রজাঙ্গনা কাব্য" ও "নীলদর্পণের" অনুবাদ করে—অক্লান্ত পরিশ্রমে সাহিত্যের এক একটি বিচিত্র সত্তার সৃজন করেআত্মসংগ্রামে নিরন্তর ক্ষতবিক্ষত করেছেন নিজেকে।

এই অস্থিরতার মধ্যেই "নীলদর্পণ" নাটকের ইংরাজী অনুবাদটি সাফল্যের সঙ্গে

সমাপ্ত করেন তিনি। মধুসূদন সমসাময়িক ঘটনার সঙ্গে জড়িত হওয়ার মত অবসরই হাতে পাননি। এই নাটকটি একসময়ে সমগ্র দেশবাসীকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল, মধুসূদনের মত খ্রীষ্টানও ইংরাজ পক্ষ অবলম্বন না করে এই বিদ্রোহে পূর্ণ সম্মতি জানিয়ে ছিলেন। নীলকর অত্যাচারের অভিজ্ঞতা এতই বাস্তব ও নির্মম যে সমগ্র দেশবাসী নিজেদের অসহায়তাকে প্রত্যক্ষ করে শিহরিত হয়েছিল। আন্তরিকতা ও প্রতিভাই অনুবাদটিকে সার্থকতা এনে দেয়। সমসাময়িক ঘটনায় জানা যায়—মধুসূদন আত্মগোপন করেও আত্মরক্ষা করতে পারেননি—কিছু লাঞ্ছনা তাঁকেও পেতে হয়েছে। কিন্তু এ ঘটনা এতই নিঃশব্দে সমাপ্ত হয়েছে যে মধুসূদনের নাম এ প্রসঙ্গে প্রায় অনুচ্চারিত। পাদরী লং ও স্বদেশপ্রেমী কালীপ্রসন্ন সিংহের নামের পাশে মধুসূদনের নামোল্লেখটুকুই যথেষ্ট নয়, তাঁর অনুবাদের শক্তিই ত দেশ ও বিদেশে চাঞ্চল্য এনেছে। স্বদেশপ্রেমী মধুসূদন এখানে নীরব দেশপ্রেমিক। তাঁর যোগ্য আলোচনা হওয়া দরকার।

মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম সর্বত্রই প্রকাশকুণ্ঠ এক আন্তর উপলব্ধি। 'মেঘনাদবধ কাব্যের' উপস্থাপনায় স্বদেশচেতনা এই আন্তর উপলব্ধির জন্যই সাহিত্যের সত্য হতে পেরেছে। সমসাময়িক উত্তেজনাকে বহন না করেও মহাকবি মধুসূদন দেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে' মধুসূদনের প্রকাশকুণ্ঠ অনুভূতিগুলি আরও মর্মস্পর্শী; অতিভাষণের দোষে-গুণে, নভোচারী কল্পনার রং-এ যা আপাতঃগম্ভীর সুন্দর, সহজ-সরল প্রকাশভঙ্গিতে তা অতি মনোরম আকৃতি হতে পেরেছে। দেশকে মধুসূদন ভালবেসেছিলেন, আর সে ভালবাসা নীরব নিঃশব্দ। ধর্ম ও আচারে যিনি দেশেরসংস্কৃতি অস্বীকার করেছেন, পোষাক পরিচ্ছদে যিনি দেশীয়সংস্কারকে মেনে নেননি, মাতৃভাষা ব্যবহারের বিপক্ষে কৈশোরে যিনি রীতিমত উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলেন, স্বদেশকে যিনি কোন এক ভাবাবেগের মুহূর্তে প্রবাসবলে মনে করেছেন সেই মধুসূদনের মাতৃভূমিপ্রীতি, স্বভাষাপ্রীতি, আপাতঃ বিরোধিতায় পূর্ণ হতেই পারে। পাঠ্যজীবনের অসংখ্য রচনা তাঁর ইংরাজীতেই রচিত। কে না জানে ইংরাজী ভাষাতেই দ্বিতীয় বায়রণ বা মিলটন হওয়ার জন্য তাঁর আন্তরিক বাসনার কথা? নিজেকে অন্তর বাহিরে একজন বিদেশী করে তোলার নিখুঁত প্রচেষ্টায় তিনি দুঃসাহসিকতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন কোনসময়ে। মুখে মুখে ইংরাজী কবিতা রচনা যাঁর পক্ষে নিতান্তই সাধারণ ঘটনা সেই মধুসূদনের ভাবীজীবনের স্বপ্ন যে কিছু বিচিত্র ও অসাধারণ হবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। খ্রীষ্টান হওয়া, বিদেশিনীকে জীবন-সঙ্গিনীরূপে বরণ করার ঘটনাগুলি যেন সেই প্রবণতারই প্রামাণ্য নিদর্শন। মোটামুটি ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিভু, হিন্দুকলেজের সেরা ছাত্র মধুসূদনের

বাহ্যিক পরিচয় এই ঘটনাগুলোর মধ্যেই মিলবে, কিন্তু সাহিত্যস্রষ্টা মধুসূদন—মহাকবি মধুসূদনের যথার্থ স্বরূপের সঙ্গে এসব ঘটনার যোগাযোগ নিতান্তই বাহ্য।

"চতুর্দশপদী কবিতাবলীর" কবি মধুসূদন স্রষ্টা হিসেবে প্রবীণ ও অভিজ্ঞ। কিন্তু প্রথমদিককার রচনাতেও খ্রীষ্টান মধুসূদন কেন যে অদৃশ্য হলেন ভাবতে অবাক লাগে। সামান্যতম উপমা ও অলঙ্কারের জন্য তিনি যে সম্পূর্ণই বাঙ্গালীয়ানার দ্বারস্থ সেকি শুধু রচনাকে একটা সঙ্গতি ও সৌষ্ঠব দেবার জন্য? কাব্যসৃষ্টির মুহূর্তে মধুসূদন তাঁর কৈশোর ও যৌবনের অভ্যস্থ অভ্যাসগুলোকে ভুলবেন কি করে? মধুসূদনের ইংরাজী কবিতাগুলোর মধ্যে তাঁর ভাবপ্রবণতার সঙ্গে মগ্নচৈতন্যের যোগাযোগ খুব দুর্লক্ষ্য নয়;—কিন্তু ইংরাজী কবিতা আলোচিত হয়নি বলেই সে সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনো যায়নি।' যে কোন কবির সৃষ্টির আদিমুহূর্ত রহস্যময়,—প্রতিভাধর স্রষ্টাদের ক্ষেত্রে এই বৈচিত্র্যময় মুহূর্তগুলোর প্রতিটি স্তরেই নানা রহস্যের সন্ধান ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকে। মধুসূদনের পরিণত জীবনের ফলশ্রুতির বহু অস্ফুট সত্য তাঁর এই ইংরাজী কবিতাগুলিতে মিলবে। যেমন ১৮৪১ সালে হিন্দু কলেজের ছাত্র হিসেবে মধুসূদনের কল্পনার চিত্র,

My father, mother, sister all
Do love me and I love them too
Yet off the tear-drops rush and fall
From my sad eyes like winter's dew.
And, oh! I sigh for Albion's stand
As if she were my native land![১৫]

ছাত্রজীবনের রঙ্গীন স্বপ্নের পাশাপাশি তাঁর মনোবিকলনের বিশ্লেষণই এ কবিতায় একই সঙ্গে বাঙ্গালী ও চঞ্চলমনা মধুসূদনকে চিনিয়ে দেয়।

"Albion's distant shore"—এর স্বপ্নমগ্ন কবির মগ্নচৈতন্যের ক্রন্দন দূরশ্রুত হলেও অস্পষ্ট নয়। আবার শৈশবের স্বপ্নমগ্ন কবির সৌন্দর্য বর্ণনাতেও স্থান পেয়েছে অনাবৃত প্রকৃতি প্রেম,—স্বদেশের প্রকৃতিকেই বন্দনা করছেন তিনি,

I love the beauteous infancy of day,
The garlands that around its temples shine;
I love to hear the tuneful matin lay
Of the sweet Kokil perched upon the pine:[১৬]

১৫. 'মধুস্মৃতি'—নগেন্দ্রনাথ সোম থেকে উদ্ধৃত। ১৩৬১ সাল, পৃঃ ১৩।
১৬. ঐ। পৃঃ ১৭।

মধুসূদনের প্রথম জীবনের সৃষ্টিতেই উচ্ছ্বাস ও স্বপ্নের আধিক্য নয়,—তাঁর সমগ্র সৃষ্টিতেই তা ওতপ্রোত। তবে প্রথম সৃষ্টির লগ্নে মধুসূদন কল্পনা ও শক্তিকে অভ্রান্ত পথে চালিত করেননি—যা পরিণত মধুসূদনের একটা বিশেষ গৌরব। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে' তিনি প্রথমযুগের ভ্রান্ত জীবনদর্শনের সঙ্গে অভ্রান্ত সত্যকথনের একটা ঐতিহাসিক সংযোগ স্থাপন করেছেন। একদা কলকাতায় বসে তিনি 'Albion's distant shore'-এর জন্য ক্রন্দন করেছিলেন, ঘটনাচক্রে সেই সুযোগ যখন হাতে পেলেন দুচোখ ভরা অশ্রুজল নিয়ে তিনি তখন ফেলে আসা স্বদেশভূমির জন্যই ক্রন্দন করছেন। দুটোই আর্তি—তবে দুটি অবস্থার মধ্যে অসীম ব্যবধান। তবে "চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে," মধুসূদনের জীবনলব্ধ সত্যের সঙ্গে সাহিত্যিকসত্তার এক নিবিড় যোগাযোগ দেখতে পাই—যা তাঁর অন্যান্য রচনাতে প্রায় দুর্লভ। স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম একটি ভালবাসার সম্পর্ক মধুসূদনের বিচিত্র জীবনধারার প্রতিটি পর্বেই সমভাবে দেখা যায়। নিতান্ত কৈশোরে যা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন জীবনের ঘাটে ঘাটে খেয়াতরী ভিড়িয়ে যে জীবনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছে—সেখানেও সর্বত্র সেই অকৃত্রিম উপলব্ধির সত্য উদ্ভাসিত। মধুস্মৃতিকারের মন্তব্যটি এক্ষেত্রে যথার্থ। "মধুসূদনের আজন্ম অন্তর্নিহিত, অকৃত্রিম স্বদেশানুরাগ কি স্বদেশে, কি বিদেশে, কখনও হ্রাস হয় নাই।...স্বজাতি ও স্বদেশপ্রেমের চিরকরুণ নির্ঝরিনী তাঁহার হৃদয়ে বাল্য হইতেই সকল অবস্থাতেই প্রবাহিত হইত।" [মধুস্মৃতি পৃঃ ৬৭]

দেশেরপ্রতি, জন্মভূমিরপ্রতি একটা সহজাত আকর্ষণ নিয়েই মানুষ জন্মায়—সুতরাং সর্বজনীন অনুভূতির স্বতঃসিদ্ধতাকেই কবিরা যখন কাব্যে প্রকাশ করেন তাতে নতুন করে দেশপ্রেমিকতা আরোপ করা চলে কি না বিচার্য বিষয়। মানুষ মাত্রই সে হিসেবে দেশপ্রেমিক। কবিসম্প্রদায়কে আলাদা করে নিয়ে দেশ-প্রেমিকতা যাচাইয়ের প্রয়োজন হয় সেইকারণেই যেখানে কবি দেশসম্বন্ধে তাঁর নিজের উপলব্ধিকে সাহিত্যে স্থান দিয়েছেন। দেশ সম্বন্ধে বিশেষ কোন বক্তব্য যখন সাহিত্য-পদবাচ্য হবে তখন কবিকেও সেই কাব্যালোচনার মধ্য থেকে নতুন করে আবিষ্কার করা সম্ভব হবে। সুতরাং জন্মভূমিকে স্মরণ করার গৌরব স্মরণাতীত কালের—কিন্তু প্রকাশভঙ্গির বৈচিত্র্যে প্রতিটিই পৃথক। এ ব্যাপারে ঈশ্বরগুপ্তের সঙ্গে রঙ্গলালের, মধুসূদনের সঙ্গে হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা যাবে। ইংরাজীতে স্বদেশপ্রেমমূলক সাহিত্য বিচারের ক্ষেত্রে যাকে Patriotism of Place বলা হয়েছে—জন্মভূমির প্রতি প্রেমের কথাই সে কাব্যের বিষয়বস্তু। সহজাত দেশপ্রীতি হলেও স্থানিক মহিমাকে কাব্যে অমর করার গৌরব তাদেরই প্রাপ্য। ইংলণ্ড তাই কোন কোন কবির স্বপ্ন ও কল্পনাকে আচ্ছন্ন করেছে, মুহূর্তের অদর্শন যারা

সহ্যাতীত দুঃখ বলে মনে করেছেন। বহু ইংরেজ কবি শুধু ইংলণ্ড মহিমা, লণ্ডন নগরীর প্রেমের কথা সোৎসাহে বলেছেন—তাঁরা Patriotism of Place-এর কবি। আমাদের সাহিত্যেও মাতৃভূমির বন্দনাগান কবিদের কাব্যের বিষয় হতে পেরেছে সেই নিয়মেই। এ ব্যাপারে সব কবিরাই সমান প্রেমী,—মাতৃভূমির সৌন্দর্যই কবিদের কল্পনাশক্তি পালন করে। সুতরাং জন্মভূমির গৌরব প্রকাশে কবিরা সর্বত্র অকুণ্ঠিত-উচ্ছ্বসিত-আনন্দিত। জন্মভূমিকে তারা শুধু জীবনদাত্রীর সম্মানই দেয় না ভালোবাসার গভীরতর প্রকাশ তাঁদের উচ্ছ্বসিত করে তোলে। এ প্রেম যে আন্তরিক, এ যে সাময়িক চাঞ্চল্য নয়,—এমন প্রমাণ ইতিহাসে সংখ্যাতীত। সেই প্রেমই কবিকে প্রেরণা দেয়, যোদ্ধাকে আত্মবিসর্জনের উৎসাহ দেয়, সাধককে আধ্যাত্মিকশক্তি জোগায়। এই প্রেমের স্বরূপ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, "Earth worship is the one religion that survives all changes and it means something more than man's gratitude to earth for her life giving fruits. Meditating upon this principle so common in mankind, we are prompted to question sometimes the character that is often, and persuasively said to distinguished patriotism."[১৭]

এই স্বদেশপ্রীতি জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে, কবি তাঁর কাব্যে যখন সেই সিদ্ধসত্যকেই রূপ দান করেন—কবির দেশপ্রেমিকতাও যাচাই হয়ে যায়। এক্ষেত্রেও দেখা যায়, কাব্যই কবি স্বভাবের একমাত্র প্রামাণ্য দলিল, কাব্য দিয়ে কবির আন্তর সত্তার সত্য ও অসত্য যাচাই করা যত সহজ,—কবির ব্যক্তিজীবনের খুঁটিনাটি ঘটনাও-তত সহজে সত্য চেনাতে পারে না। সৃষ্টির মধ্যেই কবি একাত্ম হয়ে থাকেন,—কবিসত্তাকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার করা সেখানে সম্ভব নয়। সুতরাং যে কবিরা কাব্য রচনার হাজারো উপাদান থাকা সত্ত্বেও জননী-জন্মভূমিকেই কাব্যের বিষয়রূপে নির্বাচন করেছেন তাদের স্বদেশপ্রেমী কবি বলতে বাধা নেই। কবিজীবনের ঘটনা প্রবাহ দিয়ে কবিস্বভাবকে যাচাই করতে গিয়ে সাহিত্যকে গৌণ করা চলে না। মধুসূদনের কবি জীবনের সঙ্গে তাঁর বাস্তব জীবনের বিরোধিতা এত প্রকট যে, মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম যাচাই করার পক্ষে এক বিরাট প্রশ্ন এসে যায়। কিন্তু ব্যক্তি মধুসূদন কখনই কবি মধুসূদনকে আড়াল করতে পারেন নি, -এমনকি পর্বতপ্রমাণ প্রতিকূলতা নিয়েও নয়। কৈশোর থেকে যৌবনে, যৌবন থেকে প্রৌঢ়ত্বে যে কবিকে আমরা কাব্যের মধ্যে পেয়েছি—স্বদেশচেতনা সেখানে সমপ্রবাহিত,—কোথাও তা স্পষ্ট-উচ্ছ্বসিত, কোথাও তা রূপকায়িত।

---

১৭. John Drinkwater, 'Patriotism in Literature' P—141.

"চতুর্দশপদী কবিতাবলী"তে মধুসূদনের স্বদেশপ্রেম যত স্পষ্ট ও উচ্ছ্বসিত অন্যত্র তা নয়। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র রচনাকাল ১৮৬৫-৬৬। ১৮৬২ সালে কবি য়ুরোপ প্রবাসে যাত্রা করেন, ব্যারিষ্টারী পড়ার উদ্দেশ্যেই তাঁর ইংলণ্ড যাত্রা। ইংলণ্ড যাওয়ার বাসনা তাঁর বহুদিনের কিন্তু স্বপ্নভঙ্গের পর সেই প্রচণ্ড আগ্রহ [I sigh for Albion's distant shore] যে কতটা স্তিমিত তা যাত্রাকালে রাজনারায়ণ বসুকে লেখা পত্রাংশ থেকে অনুমান করা যায় সহজে। যে যুগে মধুসূদন ইংলণ্ড যাওয়ার জন্য অকস্মাৎ ধর্মান্তিরত হতে পারতেন [তাঁর ধর্মান্তরণের অন্যতম কারণ যদি তা হয়] সেই ১৮৪৩ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীর সঙ্গে ১৮৬২ সালের ৯ই জুনের কত পার্থক্য। দীক্ষা গ্রহণের পর বন্ধুকে পত্র লিখছেন তিনি,

"I won't go to England till December next. I am now about to come and live with or rather near to my father. I am not going to England with Mr. Dealtry, my father won't allow that.[১৮]

ইংলণ্ড যাওয়ার প্রথম উন্মাদনা বাধা পেয়েছিলো নানা দিক থেকে,—আর সেই বাধার সঙ্গে, প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই করেই মধুসূদন স্রষ্টা মধুসূদন হয়েছেন। কিন্তু ১৮৬২ সালে যাত্রার অব্যাবহিত পূর্ব মুহূর্তে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে লিখছেন,—
"Perhaps I shall go to England next month. If I live to come back we shall meet ; if not, what will my countrymen say a hundred years hence !

Far away far away
From the land he loved so well,
Sleeps beneath the colder ray", [মধুস্মৃতি—পৃঃ ২৪৫]

এই পত্রাংশের মধ্যে মধুসূদন তাঁর প্রতিষ্ঠা ও গৌরব সম্পর্কে সচেতন। নিজেকে স্বদেশপ্রেমিকরূপে প্রতিষ্ঠা করার কোন সচেতন চেষ্টা তাঁর কোনদিনও ছিল না, কিন্তু তবু তিনি জানেন সমগ্র দেশবাসী তাঁকে দেশপ্রেমিক রূপে স্বীকার করেছে। বন্ধুকে লেখা পত্রে তিনি; তাঁর সেই গৌরবেরই উল্লেখ করেছেন। না হলে এ পংক্তিটির কল্পনা খানিকটা অতিগৌরবীর সংলাপের মত শোনাত। মধুসূদন জানতেন তাঁর দেশপ্রেম স্বীকৃতি পেয়েছে। সম্ভবতঃ তাই তিনি লিখেছিলেন,—"he loved so well"

এখানে তাঁর আনন্দিত মনেরই অভিব্যক্তি। ইংলণ্ড যাওয়ার লগ্নে দেশকেই তাঁর মনে পড়েছে, যে দেশ তাঁর মাতৃভূমি, যে দেশ তাঁর কবিত্বকে পূজা করেছে—স্বীকৃতি

১৮. 'মধুস্মৃতি'—নগেন্দ্রনাথ সোম থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ৪০।

দিয়েছে তাঁর আন্তরিক সৃষ্টিকে। তাই দেখি, বিদায়ের প্রাক্‌কালে তাঁর অশ্রুসজল নিবেদন, "বঙ্গভূমির প্রতি" কবিতাটি। এ কবিতাটিতে দেশের প্রতি ভালবাসায় যেন তাঁর বেদনামগ্ন অন্তরের অনবদ্য শ্রদ্ধাজ্ঞাপন। বঙ্গভূমি যেন সত্যিই জননী—তাঁর কাছেই মধুসূদনের কাতর আবেদন। বঙ্কিমচন্দ্র 'বন্দেমাতরম' কবিতায় যে দেশজননীকে বন্দনা করেছেন 'বঙ্গভূমির প্রতি' সেখানেও যেন প্রথম পথপ্রদর্শন করেছে। মাতৃনামের মহিমা মধুসূদনই জানাতে চেয়েছেন যেন "My native land, Good Night!" Byron উক্তিটির উদ্ধৃতিতেও। কবি মধুসূদনের জীবনের এ যেন, এক করুণ বিদায়ের আভাস। দেশের কাছে, জন্মভূমির কাছে বিদায়পর্বে তাই তাঁর কাতর প্রার্থনা,—

রেখো, মা, দাসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে।

দেশ এখানে যেন চিন্ময়ী দেশমাতৃকা, সমস্ত মানুষকে যিনি স্নেহময়ী মাতার মত লালন করেছেন। মধুসূদনের মন-গলানো কবিতাটি মাতারই উদ্দেশ্যে। মৃত্যু কি বড়ো? মধুসূদন অন্ততঃ মনে করেন শুধু মনে রাখার ঐ অস্বীকারটুকু সম্বল করে ঐ মৃত্যুকে হাসিমুখে বরণ করা এমন কিছু অসম্ভব নয়। তাই স্থির বিশ্বাসে মধুসূদন বলেছেন,—

"প্রবাসে, দৈবের বশে, জীব-তারা যদি বসে
এ দেহ আকাশ হ'তে—নাহি খেদ তাহে,
জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায়রে, জীবননদে?
কিন্তু যদি রাখ মনে, নাহি, মা, ডরি শমনে,"

মৃত্যুকে জয় করে মধুসূদন শুধু অমর কবি হতে চেয়েছেন তা নয়,—সর্বদা তাঁর এই প্রার্থনা 'রেখো, মা, দাসেরে মনে।'

এই দেশমাতৃকার সঙ্গে মধুসূদনের নিবিড়তর পরিচয় লাভের দুর্যোগময় মুহূর্তটি স্মরণ করেই বলতে হয়—অভিজ্ঞতার সেতু বেয়ে মধুসূদন আসল রত্নটি চিনে নিতে পেরেছিলেন। কারণ অপরাধী পুত্রকে শুধু মা-ই পারেন পরম আদরে অভ্যর্থনা জানাতে। মধুসূদন সে অভ্যর্থনা পেয়েছেন। মধুসূদন-এর আন্তরিকতা সেযুগীয় কাব্যে এক বিস্ময়কর প্রাপ্তি।

"চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে" মধুসূদনের করুণ বিলাপ—দীর্ঘশ্বাস চিহ্ন তাঁর প্রতিটি কবিতায় প্রকাশিত। ইংলণ্ড গমনের পূর্বমুহূর্তেও তাঁর বেদনার্ত মনোভঙ্গিমারই পরিচয় পাই। স্বদেশপ্রিয় মধুসূদনের এই নিবিড়তর পরিচয় হয়ত স্বদেশভূমি পরিত্যাগ না করলে, আকস্মিক বিপদের মুখোমুখি হওয়ার অভিজ্ঞতা না থাকলে পাওয়া যেত না। ইংলণ্ড যাত্রার পূর্বেই স্বদেশপ্রেমী মধুসূদনের পরিচয় স্পষ্টায়িত—

প্রবাসে শুধু সেই মাতৃভূমিপ্রীতি গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র উপক্রমের মধ্যে আত্মপরিচয় দিচ্ছেন মধুসূদন,—

সেই আমি, ডুবি পূর্বে ভারত-সাগরে,
তুলিল যে তিলোত্তমা—মুকুতা যৌবনে ;—
কবিগুরু বাল্মীকির প্রসাদে তৎপরে,
গম্ভীরে বাজায়ে বীণা, গাইল, কেমনে
নাশিলা সুমিত্রা-পুত্র লঙ্কার সমরে,
দেবদৈত্য—নরাতঙ্ক—রক্ষেন্দ্র নন্দনে ;—
কল্পনাদূতীর সাথে ভ্রমি ব্রজধামে
শুনিল যে গোপিনীর হাহাকার ধ্বনি,
(বিরহে বিহ্বলা বালা হারা হয়ে শ্যামে ;)
বিরহ-লেখন পরে লিখিল লেখনী
যার, বীরজায়া পক্ষে বীর পতিগ্রামে,
সেই আমি, শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি !

তিলোত্তমা সম্ভব-মেঘনাদবধ—ব্রজাঙ্গনা-বীবাঙ্গনার কবি মধুসূদনকেই এ কাব্যে অনুসন্ধান করতে হবে, যদিও জন্মভূমিচ্যুত মধুকবি প্রবাসে বসে সাহিত্য সৃজনে মগ্ন ; —তবুও তিনি, "সেই আমি শুন, যত গৌড়-চূড়ামণি।"

সুতরাং "চতুর্দশপদী কবিতাবলী" আলোচনার কোন সমস্যা নেই। স্বদেশপ্রেমী কবি এখানে সমগ্র গৌড় সুভাজনের কাছে বিনীতভাবে সে প্রস্তাব পূর্বেই উথাপন করেছেন। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' সনেটগুচ্ছে পেতরার্কা কবির পথানুসরণ করেও কবি গৌড় সুভাজনের সমর্থনাকাঙ্ক্ষী।

সমগ্র "চতুর্দশপদী কবিতাবলী বিশ্লেষণ করলে আমাদের প্রথমেই মনে হয়, স্বদেশীয় ভাব ও কল্পনায় মগ্ন মধুসূদন ফ্রান্সের ভার্সাইতেই অনুরূপ ভারতভূমি সৃজনে সক্ষম হয়েছিলেন। সনেটগুচ্ছের বিষয়নির্বাচনেও আশ্চর্যজনক বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। ইংলণ্ড পৌঁছোনোর মুহূর্তে বন্ধু গৌরদাস বসাককে তিনি লিখছেন,— "I assure you, I can scarcely believe that I am every minute nearing that land of which I have thought so much even from my boyhood. But truth is stranger than fiction"[১৯]

গভীর পরিবর্তনই মধুসূদনকে আমাদের সাহিত্যে অনুরাগী করে তুলেছিল—আর

১৯. 'মধুস্মৃতি'—নগেন্দ্রনাথ সোম থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ২৪৯।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে মধুসূদন সম্পূর্ণভাবেই বাঙ্গালী মধুসূদন। যে ইংলণ্ড তাঁকে কৈশোরে কাব্য প্রেরণা দিয়েছিল,—মধুসূদন চাক্ষুষ দর্শন করেও কেন সেই ইংলণ্ডের মহিমাজ্ঞাপক একটি কবিতাও রচনা করলেন না—ভাবতে অবাক লাগে। শুধু তাই নয়,—য়ুরোপ ভ্রমণরত মধুসূদন বিদেশের মনোমুগ্ধকর পরিবেশে কালযাপন করেও স্বদেশচিন্তায় মগ্ন। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র ১০২টি সনেট তিনি ফ্রান্সেই রচনা করেছেন কিন্তু মাত্র চারটি সনেটে বিদেশী কবি সম্পর্কে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন ও একটিতে ফ্রান্সের ভরসেলস নগরীর বর্ণনা স্থান পেয়েছে—ইংলণ্ড সম্পর্কে কোন কবিতা তিনি রচনা করেননি।

'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে মধুসূদনের স্বদেশপ্রীতির নিবিড়তর পরিচয় আছে। কল্পনানেত্রে তিনি স্বদেশভূমিকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং অতি সামান্য বিষয়বস্তুও কল্পনানেত্রে সুন্দর হয়ে উঠেছে। "নিশাকালে নদীতীরে বটবৃক্ষ-তলে শিবমন্দির" কিংবা "বউ কথা কও" পাখীটিও যে মধুসূদনের কল্পনায় স্থায়ী আসন পেতে পারে, সনেটের বিষয়বস্তু হতে পারে, এ আশ্চর্য তথ্যটি প্রবাসী স্বদেশপ্রেমী মধুসূদনই ব্যক্ত করেছেন। 'পরিচয়' কবিতায় কবি জন্মভূমির প্রশংসায় ও আত্মগর্বে পঞ্চমুখ—

যে দেশে উদয়ি রবি উদয়—অচলে,
ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে—
প্রভাতে ; যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে,
ধাতার প্রশংসা-গীত, বহেন সাগরে
জাহ্নবী ;

* * * *

সে দেশে জনম মম, জননী ভারতী ;
তেঁই প্রেমদাস আমি, ওলো বরাঙ্গনে !

জন্মভূমিপ্রীতির এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত মধুসূদন স্থাপন করেছেন যা তাঁকে নির্ভুলভাবে চিনিয়ে দেয়। উনবিংশ শতাব্দীতে রঙ্গলাল-মধুসূদনের সম্মিলিত স্বদেশসাধনার ফলশ্রুতি ইতিহাসের নব অধ্যায়কে এমনি করেই রূপময় করে তুলেছিল।

"চতুর্দশপদী কবিতাবলী"র প্রত্যেকটিতেই কোন না কোন ভাবে মধুসূদন তাঁর স্বদেশানুরাগেরই স্বাক্ষর রেখেছেন। কোথাও কোথাও তা এত বেশী আন্তরিক যে স্বদেশপ্রেম সাহিত্যের স্থায়ীভাবের মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। প্রেম-প্রীতি কিংবা আত্মবিশ্লেষণের স্তরপর্যায়ে স্বদেশচিন্তাকে স্থাপনা করতে গেলে কবিচিত্তের আলোড়ন

মুহূর্তটি ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন ; মধুসূদনের বিচিত্র জীবনানুভূতি তাঁর স্বদেশচিন্তাকে গভীরতর উপলব্ধির পর্যায়ে টেনে নিয়ে গেছে,—সেখানে কবি ভাবমুগ্ধ স্বদেশোপাসক এবং এর চেয়ে স্পষ্টতর কোন পরিচয় আপাততঃ অনুপস্থিত। এই হিসেবে "চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে" মধুসূদনের প্রথমতম পরিচয় স্বদেশপ্রেমিকরূপেই, অন্যান্য পরিচয় তাঁর প্রথমতম পরিচয়েই বিধৃত হয়ে আছে। নানাবিধ বিপর্যয়ে কবিচিত্ত স্বদেশের প্রিয়ভূমির জন্য ব্যগ্র হয়েছিল এ সত্য জীবনালোচনাতেও সমর্থিত। তাই দেখি,—স্বদেশভূমির স্মৃতি কবিকে চঞ্চল করেছে,—

"হায়, গতিহীন আমি দৈব-বিড়ম্বনে,—
নিকুঞ্জ বিহারী পাখী পিঞ্জর ভিতরি।" [কল্পনা]

"কি আনন্দ! পূর্বকথা কেন কয়ে, স্মৃতি,
আনিছ হে বারিধারা আজি এ নয়নে?" [আশ্বিন মাস]

"তেঁই গো প্রবাসে আজি এই ভিক্ষা করি,
দাসের বারতা লয়ে যাও শীঘ্রগতি।" [মেঘদূত]

"সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে।
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে ;
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে
শোনে মায়া-যন্ত্রধ্বনি) তব কলকলে
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে!—
বহুদেশে দেখিয়াছি বহুনদ-দলে,
কিন্তু এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে?
...এ প্রবাসে মজি প্রেমভাবে
লইছে যে তব নাম বঙ্গের সঙ্গীতে। [কপোতাক্ষ নদ]

শুধু যে জন্মভূমির আকাশ-বাতাস নদ-নদীর স্বপ্নে তিনি বিভোর তা নয়,—বাঙ্গালা সাহিত্যের কোন কোন বিখ্যাত গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের প্রতি সপ্রেম শ্রদ্ধানিবেদনও একই সঙ্গে সম্পন্ন করেছেন। কৃত্তিবাস, কাশীরামদাস, জয়দেব, ভারতচন্দ্রের প্রতি অকুণ্ঠ প্রশংসাবাণীর সঙ্গে সমসাময়িকযুগের ঈশ্বরচন্দ্রগুপ্তের প্রশংসাও তাঁরই কণ্ঠে প্রথমোচ্চারিত। মধুসূদন মহাভারত-রামায়ণ কাহিনী, সীতা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, অর্জুন, অভিমন্যু বধ, ভীমসেন প্রসঙ্গ নিয়ে একাধিক কবিতা লিখেছেন ; দুঃশাসন, হিড়িম্বাও বাদ পড়েনি। মহাভারত ও রামায়ণ মধুসূদনকে যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে,—রামায়ণের সীতা চরিত্র চিত্রিত করেও অতৃপ্ত কবি আরও একাধিক সনেটের অবতারণা করেছেন। তিনি "সীতা বনবাসে" কবিতায়

সীতার দুঃখে আত্মহারা হয়েছেন। সীতাদেবী কবিতায় শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে বিনম্র কবিচিত্ত—

"অনুক্ষণ মনে মোর পড়ে তব কথা,
বৈদেহি!"

বহুভাষাবিদ,—বহুসাহিত্য রসগ্রাহী মধুসূদন সনেটের বিষয়বস্তু নির্বাচনে গতানুগতিকতারই আশ্রয় নিয়েছেন,—নতুনভাবে নিসর্গ বর্ণনা কিংবা দেশভ্রমণের অভিজ্ঞতার আনন্দ তাঁর সনেটে অব্যক্ত। অথচ সনেটে বিষয় বৈচিত্র্য সৃষ্টির অফুরন্ত অবসর এ সময়েই তিনি লাভ করেছিলেন। কিন্তু কাব্যে স্থান পেয়েছে—তাঁর স্বদেশের অতিতুচ্ছ ও অতি আলোচিত প্রসঙ্গগুলি।

পরাধীন ভারতবর্ষ প্রসঙ্গেও মধুসূদনের মনোভাব স্পষ্ট, রাজনৈতিক স্বাধীনতার অভাববোধ এ সমস্ত কবিতায় সুব্যক্ত। 'ভারতভূমি' কবিতায় কবি বলছেন,—

'কে না লোভে, ফণিনীর কুন্তলে যে মণি
ভূপতিত তারারূপে, নিশাকালে ঝলে?
কিন্তু কৃতান্তের দূত বিষদন্তে গণি,
কে করে সাহস তারে কেড়ে নিতে বলে?
হায় লো ভারতভূমি! বৃথা স্বর্ণজলে
ধুইলা বরাঙ্গ তোর, কুরঙ্গ নয়নি,
বিধাতা!'

স্বাধীনতার আনন্দবঞ্চিত কবিচিত্তের এ আক্ষেপ কিন্তু পরাধীনতার তীব্র জ্বালায় উচ্চকিত নয়—তবু আক্ষেপটুকুকে আন্তরিক বলা চলে। পরাধীন ভারতবর্ষ শুধু ইংরেজদের কাছেই আত্মসমর্পণ করেনি,—দীর্ঘ ইতিহাসে তার পরিচয় রয়েছে। সেই ইতিহাস পাঠেই অভ্যস্ত ছিলাম আমরা, কিন্তু গভীর দীর্ঘশ্বাসে আত্মসচেতন মধুসূদন এ সমস্ত কবিতায় তাঁর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন। লক্ষ্যণীয় এই যে, পরাধীন ভারতবর্ষে এ চিন্তা আসেনি; স্বাধীন ফ্রান্স, স্বাধীন ইংলণ্ডের প্রত্যক্ষ রূপই স্বাভাবিকভাবে কবিকে ব্যথিতচিত্ত করেছে। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে 'ভারতভূমি' সনেটের মধ্যে পরাধীন ভারতের দৈন্যের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন কবি এবং 'আমরা' কবিতাটি আত্মগ্লানিতে পূর্ণ দুঃখ-জর্জরিত কবিকণ্ঠের মর্মভেদী হাহাকার চিত্র বলে গণ্য করা যেতে পারে।

আকাশ-পরশী গিরি দমি গুণ-বলে,
নির্ম্মিল মন্দির যারা সুন্দর ভারতে;
তাদের সন্তান কি হে আমরা সকলে?—

আমরা—দুর্বল ক্ষীণ কুখ্যাত জগতে,
পরাধীন, হা বিধাতঃ, আবদ্ধ শৃঙ্খলে ?—

স্বাধীনচেতনা যা মধুসূদনের চরিত্রশক্তির মধ্যে ওতপ্রোত, আত্মসংগ্রামে তার সবটুকুই প্রায় নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল, তবু দেখি, দেশের জন্য নিবিড় অনুভূতির মধ্যেও স্বাধীনসত্তার বিলাপ। এ বিলাপ আত্মবিলাপ নয়, কিন্তু সর্বজনীন আর্তিকেই কবি স্বকীয় বেদনায় রূপান্তরিত করেছেন। জীবনের আদিপর্বে সংস্কৃতিবিচ্ছিন্ন হলেও আপাতঃদৃষ্টিতে ভিন্নধর্ম, ভিন্নসংস্কারানুরাগী মনে হলেও, মধুসূদন ভাব ও চিন্তার জগতে সম্পূর্ণ ভাবেই আমাদের মধুসূদন—সে কথা সনেটের মধ্যেই বোধকরি প্রমাণিত হয়েছিল। 'চতুর্দশপদীর' সনেটে মধুকবি যেন অজানিতেই আত্মচিত্র প্রকাশ করেছেন যা কবি মধুসূদন-স্বদেশপ্রেমী মধুসূদনের কোন ভুল ব্যাখ্যার বলিষ্ঠ অন্তরায়স্বরূপ। স্বদেশপ্রেম তাঁর অন্তরের নিভৃত কোণ জুড়ে এতদিন শুধু প্রবাহিত হয়েছে—কিন্তু অস্থিরচিত্ত কবি তাঁর মৃদু কলকল ধ্বনি শুনতে পাননি,—কিন্তু বিদেশগমনই এ সুযোগ করে দিয়েছে। 'কপোতাক্ষ নদ' কিংবা 'বিজয়া-দশমী' কিংবা 'আমরা' বোধকরি ভারতবর্ষে লেখা অসম্ভব ছিল। আর কবিচিত্তের প্রেম বা অনুরাগ কাব্যাকারে না পাওয়া গেলে তাকে বিচারে স্থান দেওয়া যেত না;—সুতরাং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র সনেটগুচ্ছে কবি দেশপ্রেম বা দেশানুরাগ প্রকাশ করে কবিসম্পর্কিত ধারণা অনুসরণের সুযোগদান করেছেন। 'বঙ্গভাষা' কবিতায় ভাষাপ্রেম (যা দেশপ্রেমেরই নামান্তর) প্রত্যক্ষ করেছি—কিন্তু 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীর' 'ভাষা' কবিতায় তিনি আরও বেশি আন্তরিক,—

মূঢ় সে, পণ্ডিতগণে তাহে নাহি গণি,
কহে যে, রূপসী তুমি নহ, লো সুন্দরি
ভাষা!—শত ধিক্ তারে! ভুলে সে কি করি
শকুন্তলা তুমি, তব মেনকা জননী ?
রূপহীনা দুহিতা কি, মা যার অপ্সরী ?—

এখানে মধুসূদনের বঙ্গভাষাপ্রীতি তাঁকে দৃঢ় করেছে। সংশয় নয়, গভীরতর বিশ্বাসে তিনি মগ্ন। তাই বলতে পেরেছেন, 'শত ধিক্ তারে।' ভাষাপ্রেমী মধুসূদনের কণ্ঠে ভাষাপ্রেমের এ নিদর্শনটুকু সত্যি যেন অপরূপ। —এখানে মাতৃভাষাপ্রেম কবিকে শক্তি দান করেছে। বঙ্গভাষার নিন্দাবাদ শুধু মধুসূদনই করেননি—সেযুগের তির্যক দৃষ্টিভঙ্গিতে এ দেশীয় রীতি ও সংস্কারের প্রতি কটাক্ষপাতই শুধু ছিল না, ভাষা ও সাহিত্যও পেয়েছে অকারণ লাঞ্ছনা—অযোগ্যের সমালোচনা। কিন্তু অগ্নিশুদ্ধ অন্তর দিয়ে ভুলবিচারের প্রায়শ্চিত্ত করেছিলেন একা মধুসূদনই। এ প্রেমের উদাহরণ

বিরল—'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র এ সমস্ত কবিতা তাই কাব্যাবেদনের মাপকাঠিতেই উত্তীর্ণ নয়—কবিচিত্তের পরিচয়স্বাক্ষরিত অনন্য সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন সর্বপ্রথম মাতৃপূজাই প্রবর্তন করেন নি; মাতৃভাষায় অগাধ আস্থা স্থাপন করে মাতৃভাষাপ্রেমে মগ্ন হয়েছিলেন। বাংলাভাষাও সাহিত্যের ভবিষ্যৎ যাঁর চিন্তার একমাত্র বিষয় হয়েছিলো,—"Believe me, my dear Fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is a rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation".[২০]

এ পত্রটি ১৮৬৫ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভার্সাই থেকে বন্ধু গৌরদাস বসাককে লেখা—তাঁর উজ্জ্বল আদর্শ, অকৃত্রিম স্বদেশপ্রাণতারই নামান্তর। 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র "সমাপ্তে" কবিতাতেও মধুসূদনের সকাতর আত্মবিলাপ সাহিত্যপ্রেমের একটি পরিচিত আন্তরিক নিদর্শন।

বিসর্জিব আজি, মা গো, বিস্মৃতির জলে
(হৃদয়মণ্ডপ, হায়, অন্ধকার করি!)
ও প্রতিমা! নিবাইল, দেখ হোমানলে
মনঃকুণ্ডে অশ্রুধারা মনোদুঃখে ঝরি!
শুখাইল দুরদৃষ্ট সে ফুল্ল কমলে,
যার গন্ধামোদে অন্ধ এ মনঃ, বিস্মরি
সংসারের ধর্ম, কর্ম! ডুবিল সে তরি,
কাব্যনদে, খেলাইনু যাহে পদ বলে
অল্পদিন! নারিনু, মা, চিনিতে তোমারে
শৈশবে, অবোধ আমি! ডাকিলা যৌবনে;
(যদিও অধমপুত্র, মা কি ভুলে তারে?)

অন্তরজয়ী একটি অতিবিনীত অশ্রুনত ভঙ্গি মধুসূদনের এ সমস্ত মনোভঙ্গির মধ্যে প্রকাশমান—সাহিত্যিকের আর্তনাদও যে উৎকৃষ্ট সাহিত্য হতে পারে প্রতি ক্ষণে এ সমস্ত কবিতা সেই সত্যই তুলে ধরে—বিশেষতঃ আতির প্রসঙ্গ যেখানে কল্পিত কিছু নয়, জীবনলব্ধ সত্য।

২০. 'মধুস্মৃতি'—নগেন্দ্রনাথ সোম থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ৩১১।

মধুসূদনের পর বাংলা সাহিত্যে হেমচন্দ্রের আবির্ভাব নানাদিক দিয়েই সম্ভাবিত ও প্রত্যাশিত। প্রথম মহাকাব্য সৃষ্টি করে মধুসূদন সাহিত্যে যে অভিনবত্বের স্বাদ নিয়ে এলেন—হেমচন্দ্রের মতো স্বদেশপ্রেমী কবিও অভ্রান্ত নিয়মে মহাকাব্যের বৃত্তে বিঘূর্ণিত না হয়ে পারেননি। শুধু এই একটি কারণেই মধুসূদনের সঙ্গে হেমচন্দ্রের যুগল আলোচনা বাদপ্রতিবাদে জটিল হয়ে অবশেষে বিবাদে পরিণত হয়—কিন্তু শেষ মীমাংসায় পৌঁছনোর আগেই খুব লক্ষ্য করলে বোঝা যায় যে, এই দুই কবির কাব্যে কোন দিক দিয়েই কোন সমধর্মিতা নেই,—না অনুভূতির ক্ষেত্রে, না তার প্রকাশ-ভঙ্গিতে। হেমচন্দ্রের কাব্যশক্তির বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে প্রথমাবধি তিনি মৌলিক সৃজনী প্রতিভাশক্তির পরিচয় দিয়ে আসছেন। স্বাধীনতার জন্য হেমচন্দ্রের যে সুগভীর আকাঙ্ক্ষা আদ্যন্ত তাঁর সমগ্র কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে—যে কারণে তাঁকে সমালোচকমণ্ডলী একবাক্যে স্বদেশপ্রেমী কবি বলে বরণ করেছেন, সেক্ষেত্রে তিনি একক, মৌলিক ও অনন্য। হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম বাংলাসাহিত্যের এক অমূল্য সংযোজন। ঈশ্বরগুপ্ত থেকে মধুসূদন পর্যন্ত স্বদেশপ্রেমের বিচিত্র ধারার পরে হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম উজ্জ্বলতায় সন্ধ্যাকাশের শুক্রগ্রহের মতোই বিশিষ্ট, প্রভাতের শুকতারার মতো উজ্জ্বলতম একক সৌন্দর্য।

বস্তুতঃ হেমচন্দ্র যে যুগে এসেছেন দেশের জনমনের চিত্ত তখন আর নিস্তেজ নিদ্রায় জড়ীভূত হয়ে নেই,—নানা ঘটনাবর্ত জনগণের চিত্তের বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছে। স্বদেশচেতনা নামক তীব্র উত্তেজনাকর অনুভূতির রসে বাঙ্গালী মন দ্রব-পরিষিক্ত। রঙ্গলালের স্বদেশপ্রেমবারি সিঞ্চনে আমরা দেশপ্রেমের গভীরতাকে অন্ততঃ উপলব্ধি করেছি—এ কথা সত্য। হেমচন্দ্রের আবির্ভাব, তাঁর প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনবাণীর মধ্যে এমন কোন জটিলতা নেই যা বিস্ময়কর বা অভিনব, যা অচিন্তিত বা অদৃষ্টপূর্ব। হেমচন্দ্রের আখ্যান কাব্যের বীররস, দেশবন্দনা, জন্মভূমিপ্রীতি ইতিপূর্বে একাধিক কাব্যে স্থান পেয়েছে।—হেমচন্দ্রের মহাকাব্যের বক্তব্য, আত্মত্যাগের মহিমাদর্শ অশ্রুত বা অভিনব বলে মনে করার হেতু নেই,—এমন কি 'কবিতাবলী-তে খণ্ড খণ্ড কবিতাকারে হেমচন্দ্র যে বিশুদ্ধ দেশচেতনার, গভীর আন্তরিকতার কথা বলেছেন—তাও ইতিপূর্বে ঈশ্বরগুপ্তের খণ্ড কবিতায় পেয়েছি। মধুসূদনের মহাকাব্য অনুসৃতির ক্ষেত্রেও হেমচন্দ্রের সাফল্য সাময়িক স্বীকৃতির মানপত্র পেয়েও যুগবিচারে স্থানচ্যুত। তবু হেমচন্দ্রকে জাতীয় কবির মর্যাদায় ভূষিত করার যথোচিত যুক্তি আছে। বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে হেমচন্দ্রের অসামান্য জনপ্রিয়তা—সে যুগের মনীষী ও সমালোচক-বৃন্দের সম্মিলিত অভিনন্দনের হেতু অনুসন্ধান করলে খুব সহজেই বোঝা যাবে, এ সম্মান তাঁর প্রাপ্য। পরাধীন ভারতবাসীর দীর্ঘ দেশসাধনার ব্রতে আমরণ নিযুক্ত

ছিলেন কবি হেমচন্দ্র। এই দেশপ্রেমিকতা বহু কাব্যে বহুরূপে শ্রুত হলেও হেমচন্দ্র তাঁর কবিজীবনের প্রারম্ভ থেকে পরিশেষ পর্যন্ত এই একটি জীবনাদর্শের কথাই কাব্যে প্রকটিত করেছিলেন।—সেযুগের স্বাধীনতাকামী দেশপ্রেমী সমালোচকগণ তা আবিষ্কারে ব্যর্থ হননি। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়জীবনে দেশদার্শনিকতা আমাদের অন্যান্য চিন্তাকে যেভাবে আচ্ছাদিত করেছিল তার যুক্তিসিদ্ধ কতকগুলি কারণ ছিল। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের অনমনীয় চারিত্রিক শক্তির মধ্যে একদা যে জাতীয়চেতনা বিকশিত হয়েছিল—সমস্তজাতির জীবনে তা সঞ্চারিত হয়েছিল, এটা আমাদের সৌভাগ্য। এটুকু পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালীর সার্বিক চিত্তোন্নতিরই প্রমাণ তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। দেশচিন্তা ছাড়া অন্যান্য মূল্যবান চিন্তাকে হৃদয়ে স্থান দেওয়ার মত অবসর বা বিলাস সে যুগে ছিল না। এ সমস্ত লক্ষণই আমাদের সাহিত্যের মধ্যে প্রকাশিত না হয়ে পারে নি। তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর আড়াগোড়াই বাংলা সাহিত্যের মধ্যে যদি একটি মাত্র চিন্তার প্রাধান্য ঘটে থাকে সেটা যেমন প্রতিভার বৈচিত্র্যহীনতার প্রমাণ নয়, আবার যথার্থ প্রতিভাবান কোন কবির রচনায় অজ্ঞাতসারে যদি স্বদেশচিন্তাই মূর্ত হয়ে থাকে সেটাও যুগপ্রভাবেই ঘটেছিল বলতে হবে। সুতরাং ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাহিত্যের স্বদেশপ্রেমাত্মক বিচিত্র সম্ভারকে ও স্বদেশপ্রেমী স্রষ্টাসম্প্রদায়কে যদি অভিনন্দিত করতে না পারি তবে তাকে যথার্থ সাহিত্য সমালোচনা বলা যাবে না। অবশ্য সে যুগের কবিদের কাব্য সমালোচনাতেও এই বিষয়টিই প্রাধান্য পেয়েছিল তার প্রমাণও রয়েছে। রমেশচন্দ্র একদা হেমচন্দ্রের সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন,—

His spirited verse, full of fire and of feeling, won the admiration of the reading public even when the fame of Madhusudan was in the ascendant; his patriotic Lyric on India is known by heart to a large circle of readers.[২১]

এ যুগের স্রষ্টারা সব সত্যকে বিস্মৃত হয়ে শুধু একটি সত্যকেই প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন—সে সত্য দেশচেতনার ভিত্তিকে আশ্রয় করেই গড়ে উঠেছে। রঙ্গলাল, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের রচনার মধ্যে অজস্র ভাবনা থাকতে পারে কিন্তু সব চিন্তাকে আবৃত করে স্বাদেশিকতার সত্য অনুভূতি আমাদের আকৃষ্ট করেছে এর কারণটি অনুধাবনযোগ্য। হেমচন্দ্র 'চিন্তা তরঙ্গিনী', 'আশাকানন', 'বৃত্রসংহার' ও 'দশমহাবিদ্যার' মধ্যে প্রত্যক্ষতঃ কোন স্বদেশপ্রেমের কথা বলেন নি—কিন্তু তাঁর বিচিত্র ভাবনার

২১. Romesh Chandra Dutta, The Literature of Bengal, 1895, P-218.

স্বাক্ষর রেখেছেন। একমাত্র 'বৃত্রসংহার' ছাড়া প্রতিটি কাব্যেই তার নতুন উদ্ভাবনী ক্ষমতা, নতুন চিন্তার দান রয়েছে কিন্তু হেমচন্দ্র সম্পর্কিত আলোচনায় এসব কাব্যের উল্লেখমাত্রই স্থান পায়,—বিস্তৃততর আলোচনা কিংবা ভাবাবেগ কম্পিত প্রশংসায় হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমাত্মক অংশটুকুই সব স্থান দখল করে নেয়। হেমচন্দ্র সম্পর্কে প্রথমতম প্রশংসা কিংবা শেষকথা তাঁর স্বদেশচিন্তাকেই কেন্দ্র করে হয়ে থাকে। এ হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে নিরবচ্ছিন্ন দেশসাধক হেমচন্দ্র-এর স্থান সর্বোচ্চে। স্বদেশপ্রেমকে উপজীব্য করেই তিনি দেশবরেণ্য কবি—সমালোচকের শ্রদ্ধার পাত্র। 'হেমচন্দ্র' জীবনীকার মন্মথ নাথ ঘোষ বলেছেন,…"বাংলার সেই সন্ধিযুগে দেশবাসী 'ভার॰ সংগীতের' স্বদেশপ্রেমিক কবির প্রতীক্ষা করিতেছিল যে কবির তূর্যনিনাদে মৃতপ্রাণ সঞ্জীবিত হইয়া ওঠে, যে কবির বীণার স্বরতরঙ্গ জাতীয় সুখে উচ্ছ্বসিত, জাতীয় দুঃখে বিমূর্চ্ছিত, জাতীয় গর্বে উদ্বেলিত, জাতীয় দৈন্যে সংক্ষোভিত হইয়া পড়ে, দেশবাসী সেই জাতীয় কবির প্রতীক্ষা করিতেছিল"[২২]

হেমচন্দ্রকে 'জাতীয় কবির' আসনে বসিয়েছেন তাঁর জীবনীকার এবং যতদূর জানা যায় সেযুগে ও এযুগের সমালোচনায় তা সমর্থিত হয়েছে কারণ সত্যিই তা সমর্থনযোগ্য। 'Nitional poet' বা 'জাতীয় কবি' হওয়ার পূর্ণ যোগ্যতা নিয়েই হেমচন্দ্রের আবির্ভাব এবং তিনি যেভাবে এই দায়িত্ব পালন করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। ভারতপ্রেম কবির জীবনে দুর্যোগ এনেছে,—রাজরোষ তাঁর কণ্ঠরোধ করেছে,—কিন্তু যে বিশুদ্ধ দেশচিন্তা একদা তাঁর সমস্ত চিত্তকে আলোড়িত করেছিল আগাগোড়া তিনি সেহ ভাবটিই অবলম্বন করেছিলেন। হেমচন্দ্রের কাব্য সাধনার প্রথমপব থেকেই তাঁর এ প্রবণতা ধরা পড়েছে। 'চিন্তাতরঙ্গিনীর' মত নিতান্তই বিষাদপূর্ণ ও ব্যক্তিগত শোককেন্দ্রিক কাব্যেও কবি দেশের পটভূমিকায় তাঁর চিন্তাকে বিস্তৃত—ফেনায়িত-উচ্ছ্বসিত করে প্রকাশ করতেই অভ্যস্ত। সাহিত্য-জীবনের পূর্ণপ্রেরণা যদি দেশ ও জাতির চিন্তাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়, কোন কবি সজ্ঞানে বা অজ্ঞাতসারে দেশবাসীর প্রতি আন্তরিকতা প্রকাশে উন্মুখ হয়ে ওঠেন—তাঁকে 'জাতীয় কবি', জাতির কবি, বলে মেনে নিতে দ্বিধা থাকার কথা নয়। তবে এই অনুভূতির মধ্যে কৃত্রিমতা থাকলে কিংবা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মেকি সহানুভূতি দেখিয়ে প্রতিষ্ঠা অর্জনের আয়াস কবিকে যদি উৎসাহিত করে থাকে তবে তা বুঝেও সম্মানের মাল্যে কবিকে ভূষিত করার যুক্তি নেই। সুতরাং হেমচন্দ্রের আন্তরিকতাই তাঁর দেশভাবনার কষ্টিপাথর। হেমচন্দ্রর প্রতিভা সম্পর্কে

২২. মন্মথনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র। ১ম খণ্ড। ১৩২৬, পৃঃ ৩৪-৩৫।

সন্দেহ প্রকাশ করে কেউ কেউ বলেছেন—যশোলাভই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কবি ও সাহিত্যিক-এর পক্ষে যে আকাঙ্ক্ষা থাকাটাই স্বাভাবিক—তাকে নিন্দা না করে কবিপ্রতিভার সামর্থ্য বিচার সবার আগে দরকার। হেমচন্দ্রের সামর্থ্যবিচার না করে তাঁর সাফল্য-অসাফল্যের বিচারই পূর্বযুগের সমালোচকেরা করে আসছেন। আমরা দেখেছি এই সাফল্যের মূলে আছে কবির সানুরাগ দেশপ্রীতি। দেশবাসীর শ্রদ্ধা নিবেদন-প্রশস্তি কীর্তনও হেমচন্দ্রের এই দেশপ্রেমের মহিমাকে কেন্দ্র করেই।

হেমচন্দ্রের দেশপ্রেম সম্পর্কে পূর্বসূরীদের সমালোচনার মধ্যে দুটি বিরোধী মত গড়ে উঠেছে। হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমের পরিচয় প্রসঙ্গ ধরে এক পক্ষ তাঁকে অতিবিনীত দেশভক্ত রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন,—অন্যপক্ষ হেমচন্দ্রের মনোভঙ্গিমার মধ্যে দেশ-বৈরিতার বীজ দেখেছেন। ব্যক্তিজীবনের ব্যর্থতা ও কবিজীবনের সার্থকতার সন্ধিসূত্রযোজনার সাহায্যে অনেকসময়ই যথার্থ সত্য আবিষ্কৃত হয়না। কারণ দেখা গেছে দুঃখ, দারিদ্র্য, সমস্যার চাপে ব্যক্তিজীবন যখন লাঞ্ছিত—কবিজীবনের সাফল্যের চূড়া তখন গগনস্পর্শী হয়ে উঠতে পারে। বহু কবির জীবনেই এ সত্য বার বার পরীক্ষিত হয়েছে। সর্বোপরি প্রতিভার দৈবীস্পর্শ অলৌকিকতার পরিবেশ ছেড়ে যখন মর্ত্যভূমিকে নেমে আসে তখন কবি অন্যমনের মানুষ। অবশ্য হেমচন্দ্রের জাতিপ্রীতি বা বিজাতি বৈরিতা তাঁর ব্যক্তিজীবনের অশান্তির কারণ হয়েছিল কি না তা আলোচনা বহির্ভূত। হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমের স্বরূপ বিচারে অক্ষয়চন্দ্র সরকার আলোচনা বহির্ভূত এই প্রসঙ্গটির উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের ব্যাখ্যাটিও অভিনব বলে মনে হয়েছে। 'কবি হেমচন্দ্র' গ্রন্থে তিনি বলছেন,—

"হেমচন্দ্রের কাব্যে স্বধর্মপালন ও স্বজাতিবাৎসল্য নাই বলিলেও চলে। কিন্তু হেমচন্দ্র জাতিবৈরজনিত দেশভক্তিতে ভোরপূর। তাঁহার সমস্ত প্রসিদ্ধ কাব্যে, এই দেশভক্তির উজ্জ্বলা ছায়া ঝক্ ঝক্ করিতেছে। ইহা হৃদয়ের ভক্তি, সখের নহে। প্রাণের-পরিচ্ছদের নহে।"[২৩]

'স্বধর্মপালন' ও 'স্বজাতি বাৎসল্য'-হীন হেমচন্দ্র বিজাতিবিদ্বেষ নিয়ে দেশভক্ত হয়েছিলেন,—ঠিক এ ধরণের আপাতঃ অর্থহীন সমালোচনায় যেমন কবি সম্পর্কে সুবিচার করা হয় না তেমনি পাঠক সাধারণও কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন না। পরিশেষে সেই 'স্বজাতিবাৎসল্য' হীন হেমচন্দ্রকেই হৃদয় ও প্রাণধনে ধনী বলে অভিহিত করে সমালোচক নতুন জটিলতার সৃষ্টি করেছেন। যিনি দেশভক্ত, তিনি দেশকে ভালবাসেন এটাকে স্বতসিদ্ধ বলে মেনে নিয়ে যদি কবিসত্তার গভীরে হৃদয়জাত

২৩. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কবি হেমচন্দ্র। ১৩১৮, পৃঃ ২৬।

অনুভূতির সন্ধান মেলে তবে কবির দেশপ্রীতি সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। আগেই বলা হয়েছে, স্বদেশপ্রেম ব্যক্তি অনুভূতি অসম্পৃক্ত একটি বাহ্যিক আবেগ,—এটুকু জেনেই স্বদেশপ্রেমিক কবিকে বিচার করতে হবে। যদি তা নিতান্তই সাময়িক উচ্ছ্বাস বা সুলভ যশাকাঙ্ক্ষার হেতু না হয়ে দীর্ঘদিনের সাধনার স্তরে স্তরে কবিচিত্তকে অনুপ্রেরণা দিয়ে থাকে—অন্ততঃ সেই অনুভূতিকে আর বাহ্যিক বলে অগ্রাহ্য করা চলে না। হেমচন্দ্রের কাব্যধারার আলোচনায় আমরা এই সিদ্ধান্তেরই সাহায্য গ্রহণ করব। কিন্তু একই সঙ্গে দুটি বিরোধী ভাব—'স্বদেশপ্রেম' ও 'স্বজাতি বাৎসল্যবিহীনতাকে' একজন কবির হৃদয়ে আবিষ্কার করা যায় কি? স্বদেশপ্রেমে প্রকার ভেদ থাকা স্বাভাবিক, স্বজাতির প্রতি বিদ্বেষী হয়ে স্বদেশপ্রেমী হওয়াটা হয়ত অসম্ভব নাও হতে পারে কিন্তু স্বজাতিবিদ্বেষী হয়ে যিনি স্বজাতি সমালোচনা করেন তিনিও ত স্বজাতিপ্রেমকেই প্রকারান্তরে ব্যক্ত করছেন। সুতরাং আপাতঃ স্বজাতি-বিদ্বেষ আমাদের সুপরিচিত—কিন্তু তাকেই বঙ্কিমচন্দ্র খাঁটি বলে চিনে নিয়েছেন। হেমচন্দ্রের স্বজাতিবিদ্বেষও ঠিক সেই ভাবে জনগণের অন্তর জয় করেছিল, একে ঠিক বিদ্বেষ না বলে প্রেমেরই তির্যক প্রকাশ বলে মেনে নেওয়া সঙ্গত। বিজাতিবিদ্বেষ অবশ্য স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক কি না তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, বাংলাদেশে জাতীয় জাগরণ মুহূর্তে বিজাতিবিদ্বেষ যে অন্যতম প্রধান অবলম্বন হয়ে উঠেছিল—তার কারণও রয়েছে। ১৮৫৭ সাল থেকে ১৮৬০ মাত্র এই তিন বৎসরের মধ্যে সমগ্র জাতি শাসক ইংরাজদের সত্যকারের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রায় স্থির সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ষষ্ঠ দশকের মধ্যেই সমগ্র জাতি একটি বিষয়ে অন্ততঃ একমত হতে পেরেছে যে পরাধীনতার হাত থেকে মুক্তি না পাওয়া পর্যন্ত মুক্তিসংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। ইংরেজের শুভপ্রচেষ্টার স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করেও শিক্ষিত বাঙ্গালী বুঝেছিল স্বাধীনতাবিহীন কোন জাতি কখনও সগর্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না। সিপাহীবিদ্রোহ বা নীলবিদ্রোহ শিক্ষিত ও সাধারণ মানুষকে যে অভিজ্ঞতা দান করেছে তার মূল্য অপরিসীম। ঊনবিংশ শতাব্দীর যে পাদে হেমচন্দ্রের আবির্ভাব তখন এ ভাবনা প্রায় স্থির সিদ্ধান্তে দাঁড়িয়ে গেছে। পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার মূল্য সম্পর্কে সে যুগের কবি যে কত সচেতন হেমচন্দ্রের কাব্যই তার প্রমাণ। ১৮৬৪ সালে হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্য' রচনার মুখবন্ধে স্পষ্টতঃই হেমচন্দ্র জানিয়েছেন,—"পুরাকালে হিন্দুকুলতিলক বীরবৃন্দ স্বদেশরক্ষার্থ কি প্রকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন কেবল তাহারই দৃষ্টান্ত স্বরূপ এই গল্পটি রচনা করা হইয়াছে।"[২৪]

---

২৪. হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী। ১ম খণ্ড। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ১৩৬১।

সুতরাং স্বদেশচিন্তার প্রথমস্তরেই কাব্যরচনার মূল বিষয় হিসেবে তিনি দেশোদ্ধারের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছেন। দেশোদ্ধারের কল্পনাই যেখানে সর্বস্ব বিজাতি-বৈরতা সেখানে সঙ্গত ও যৌক্তিক। ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলালেও বিজাতিবিদ্বেষ প্রকটভাবে দেখা গেছে—এবং হেমচন্দ্রের কাব্যেও বিজাতিবিদ্বেষ সঙ্গত ও স্বাভাবিক ভাবেই মুখ্য হয়ে উঠেছে। পরাধীনতার বেদনা প্রকাশের পথ যেখানে অবরুদ্ধ, রূপকের অন্তরালে তীব্র বেদনার প্রচণ্ড বিস্ফোরণ তাই স্বাভাবিকভাবে কাব্যে মুখ্য হয়ে উঠেছে। হেমচন্দ্রের দেশপ্রেম বিশ্লেষণের প্রসঙ্গে সমালোচনায় বলা হয়েছে,—"স্বজাতিপ্রেমে হেমবাবু পৌঁছিতে পারেন নাই, বিজাতিবৈর পর্যন্ত তাঁহার কবিত্বের সীমা।"[২৫]

উপরোক্ত সমালোচনায় আপাতঃ বিরোধের বহু দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও স্বদেশপ্রেমিক হেমচন্দ্রের কাব্যকে একটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করার স্বকীয় সাহস সর্বত্র মেলে। স্বদেশপ্রেমের কবিতারচনার গতানুগতিক পদ্ধতি হেমচন্দ্রের যুগে সুলভ কবিত্ব প্রকাশের বাহন রূপে দেখা দিয়েছিল,—সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র তা উপলব্ধি করেছিলেন।—দেশভাবনার পবিত্রতা স্বল্প কবিত্বে বিলীন হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখেই সমালোচনায় নির্মম মত প্রকাশ করেছিলেন তিনি। তদানীন্তন স্বদেশপ্রেমের ও স্বদেশপ্রেমিকদের বহু ব্যবহৃত শব্দগুলির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নতুন করে সচেতন করার উদ্দেশ্যে সমালোচক অক্ষয়চন্দ্রের মূল্যবান এ মন্তব্যগুলি উদ্ধৃতিযোগ্য বলে মনে হয়।

"আসল কথা 'জাতীয়তা', 'জাতীয় জীবন', 'দেশহিতৈষিতা' প্রভৃতি বাক্যগুলি একটু বুঝিয়া সুঝিয়া ব্যবহার করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে···কেহ কিছু বুঝিবার চেষ্টা করিবে না—সেটা কিছু নয়। মরা কথার ওরূপ ব্যবহার চলে, তাহাতে কিছু আসে যায় না।"[২৬] এই বক্তব্যের সাহায্যে আমরা সেযুগের স্বদেশপ্রেমের খাঁটি রূপ আবিষ্কারের শুভ প্রচেষ্টাটি দেখতে পাই। সমালোচক সম্প্রদায়ও স্বদেশ সম্পর্কিত যে কোন রচনাকেই যথার্থ স্বাদেশিকতার পরিচায়ক বলে মনে করতে পারেন নি। অবশ্য জাতীয়তা বা জাতীয় জীবনের মধ্যে সূক্ষ্মপার্থক্য নির্ণয় যেমন সেযুগে সম্ভব ছিল না,—তেমনি জাতীয়তা ও দেশহিতৈষিতার পৃথক পৃথক অর্থ নিয়ে কেউ বিশেষ মাথা ঘামাননি। আসল কথা, দেশের প্রতি মমত্ববোধ নিয়ে, দেশের মানুষের সুখদুঃখের অংশভাগী হয়ে, বিদেশীশক্তির অত্যাচার হৃদয়ঙ্গম করে, পরাধীনতার নাগপাশমুক্ত হবার বাসনা যাঁরা লালন করতেন সেই কবিসম্প্রদায়ের কাব্যেই জাতীয়তা, দেশহিতৈষিতার প্রতিফলনই দেখা যেতো। অর্থপার্থক্য নিয়ে সূক্ষ্ম তার্কিকতার কথা চিন্তারও অতীত ছিল। দেশ, জাতি, সেখানে একাকার হয়ে গেছে

২৫. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কবি হেমচন্দ্র ১৩১৮, পৃঃ ৮২।
২৬. ঐ। পৃষ্ঠা ৫৯।

এমন কি বঙ্গ বা ভারতের মধ্যেও কোন অর্থগত পার্থক্য অনুসন্ধান অনেক সময়ই নিরর্থক হয়েছে। বাংলা দেশের ধর্ম, সংস্কৃতি ও চিন্তার মধ্যে বৃহত্তর ভারতের চিন্তা যেন ওতপ্রোত হয়েছিল সে সময়ে।

হেমচন্দ্রের যুগে সাহিত্যে, সাংবাদিকতায়, সঙ্গীতে, নাটকে, ছড়ায়, পাঁচালীতে কবিগানে, সাংস্কৃতিক জগতে, সামাজিক জীবনে, স্বদেশপ্রেম বা দেশহিতৈষিতা সর্বত্র পরিচিত। বহুলপ্রচারিত, বহুশ্রুত এই বিশেষ চেতনায় কিছু অভিনবত্ব আশা করা স্বাভাবিক। সমালোচক গতানুগতিকতা চাননা, তিনি নতুনত্ব অনুসন্ধানে ব্যর্থ হলে দেশপ্রেমিক কোন কবিকে অনেক সময়ই বিরূপতার মুখোমুখি হতে হয়। হেমচন্দ্রকেও এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের চেষ্টা হয়েছে। সে বিচার অনেক সময়ই অযথার্থ প্রচেষ্টা বলে মনে কবার হেতু নেই।

হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম সম্পর্কিত ধারণার মধ্যে অভিনবত্বের অভাব রয়েছে। সে যুগের বহুআলোচিত, বহুকথিত বিষয় নিয়েই তাঁর রচনা। সুতরাং এ সম্পর্কে সমালোচকের এ ধরণের মতামত সঙ্গত। ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেমাঙ্কিত রচনাবলীর মধ্যে বহু পূর্বেই আমরা সাময়িক ঘটনাবলীর ওপর আলোকপাতের চেষ্টা দেখেছি। বাংলাসাহিত্যে এযে কতখানি আবিষ্কার--ঈশ্বরগুপ্তপূর্ব যুগের সাহিত্যের সঙ্গে ঈশ্বরগুপ্তেব বচনাবলী আলোচনা করলেই তা ধরা পড়বে। অথচ ঈশ্বরগুপ্তই "সংবাদ প্রভাকরের" পৃষ্ঠায় কবিতা রচনার বিচিত্র উপাদানের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম সম্পর্কিত রচনার একটি বৃহৎ অংশ সাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক খণ্ড খণ্ড কবিতাবলী। তাঁর সুবিখ্যাত 'ভারতবিলাপ' 'ভারত ভিক্ষা' 'ভারতসংগীতের' মতো কবিতার উপাদান সে যুগের সমসাময়িক ঘটনা-প্রবাহেরই বিবরণ। বক্তব্যের বৈশিষ্ট্যে ও আন্তরিকতার আবেদনে এসব কবিতাই হেমচন্দ্রের তিলোত্তমা সৃষ্টি। সে প্রসঙ্গ যথাস্থানে আলোচিত হবে কিন্তু সমসাময়িক ঘটনাকেন্দ্রিক কবিতা রচনা ধারায় এ মূল্যবান সংযোজন ছাড়া অন্য কিছু নয়। ঈশ্বরগুপ্তের প্রাথমিক অনুশীলন হেমচন্দ্রের ক্ষেত্রে পূর্ণতর হয়ে দেখা দিয়েছে মাত্র।

স্বদেশপ্রেমমূলক রচনাধারায় হেমচন্দ্র যে শুধুমাত্র গুপ্তকবিরই অনুসরণ করে-ছিলেন তা নয়—পূর্বসূরীদের পূর্ণ প্রভাব তাঁর রচনাবলীর সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। স্বদেশপ্রেমকেন্দ্রিক রচনার ক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা কোন মৌলিকতা অনুসন্ধান করে নি—তার কারণ অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে প্রথমতঃ হেমচন্দ্রের এ ব্যাপারে পৃথক এষণা ছিল না। স্বদেশচিন্তা তাঁর হৃদয়কে আলোড়িত করেছিল, সমস্ত সত্তাকে আশ্রয় করেছিল—গীতিকবিতার মধ্যে তারই রূপ প্রতিবিম্বিত। গীতিকবিতাকে এ ব্যাপারে শ্রেষ্ঠতম বাহন বলা যেতে পারে। আত্মচিন্তার বাহনই গীতিকবিতা। বহু পূর্বেই

কবিরা আত্মপ্রকাশের অধীরতায় গীতিকবিতাকেই বেছে নিয়েছিলেন। স্বদেশপ্রেমভাব চিত্তে যখন সুগভীর উপলব্ধিতে পরিণত হয়—গীতিকবিতার মধ্যেই তা সুষ্ঠুভাবে রূপায়িত হতে পারে। হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমকেন্দ্রিক বিশিষ্ট কবিতাগুলি তাই খণ্ড খণ্ড গীতিকবিতায় পরিবেশিত। রঙ্গলালের দেশপ্রেম যদিও গীতিকবিতা অপেক্ষা গীতিকাব্যেই রূপলাভ করেছিল তবুও দেশাত্মবোধের গভীরতর উপলব্ধির মুহূর্তগুলিকে কাব্যবিচ্ছিন্ন গীতিকবিতা রূপে অনায়াসেই আবিষ্কার করা সম্ভব। সুতরাং এ ব্যাপারে হেমচন্দ্রের পক্ষে নতুন কিছু আবিষ্কারের পথ খোলা নেই। খণ্ড গীতিকবিতার মধ্যেই দেশ প্রেমোচ্ছ্বাসের সংহত-সংযত-বহুবিচিত্র প্রকাশ। মধুসূদনও অন্তরের নিবিড়তর উপলব্ধির আনন্দকে প্রকাশের জন্য সনেটের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন।—হেমচন্দ্র অবশ্য সনেট রচনা করেননি—সনেট রচনা হেমচন্দ্রকে কেন আকৃষ্ট করেনি তা আলোচনাসাপেক্ষ। বাংলা সনেটের সাফল্যের সংবাদ তাঁর দৃষ্টি বর্হিভূর্ত থাকতে পারে কিন্তু ইংরাজী শিক্ষায় শিক্ষিত হেমচন্দ্র সনেট সম্পর্কে অজ্ঞ ছিলেন একথা সত্য হতে পারে না। বস্তুতঃ কাব্যের আঙ্গিকচর্চার কোন সচেতন চেষ্টা হেমচন্দ্রের কাব্যে অনুপস্থিত, ছন্দ সংক্রান্ত কিছু কৌতূহল ছাড়া হেমচন্দ্রের কাব্যে অঙ্গচর্চার অন্য কোন নতুন পরিচয় পাওয়া যায় না। সুতরাং স্বদেশপ্রেমধারায় হেমচন্দ্র গীতিকবিতাকেই অবলম্বন করেছিলেন।

হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্যে' স্বদেশচিন্তার উৎকৃষ্ট প্রকাশ হয়েছে বলে মনে করা যায়,—কারণ শুধু স্বদেশোদ্ধারের চিন্তাই কাব্যটির রচনা উৎস। এ ধরণের কাব্যের পূর্বপথিকৃৎ রঙ্গলাল, একাধিক কাব্যে একই উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। 'বীরবাহু কাব্য' হেমচন্দ্রের প্রথমযুগের রচনা ; কাব্য বিচারের নানা পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর অভিজ্ঞানপত্র লাভে অসমর্থ হলেও কাব্য রচনার উদ্দেশ্যের মহত্ত্বই স্বদেশপ্রেমিকরূপে কবি হেমচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে।

স্বদেশপ্রেমিক কবিরূপে হেমচন্দ্রের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ পরিচয় হলেও মহাকাব্যের কবি হেমচন্দ্রকে নিয়ে বাংলাসাহিত্যে সমালোচনার ক্ষেত্রে বিতর্কের ঝড় বয়ে গেছে। হেমচন্দ্রের প্রতিভার অমর অবদান হিসেবে গণ্য করে, মহাকবির আসনে হেমচন্দ্রকে প্রতিষ্ঠা করে, এক যুগের সমালোচকেরা উনবিংশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ লেখকের আসনে হেমচন্দ্রকে স্থাপন করে মাল্যভূষিত করেছিলেন। 'বৃত্রসংহার' যে হেমচন্দ্রের সর্বাপেক্ষা বিতর্কিত রচনা সন্দেহ নেই। আলোচ্য কাব্যটির সঙ্গে হেমচন্দ্রের মহাকাব্যিক প্রতিষ্ঠা জড়িত থাকলেও এ কাব্যের স্বদেশপ্রেমাত্মক উদ্দেশ্যের অন্বেষণ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। স্বদেশপ্রেমিক হেমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তনের কিছু আভাষ যদি সেই মহাকাব্যে থাকে শুধু সেটুকুই এখানে আলোচিত হবে। হেমচন্দ্রের মহাকাব্য সে

যুগের বিস্ময় উৎপাদন করেছিল কিন্তু ফেনায়িত উচ্ছ্বাসের পলিমাটিতে হেমচন্দ্রের পুনর্বিচারে দেখা গেছে বহু আলোচনা, বহু তর্কবিতর্ক সত্য আবিষ্কারের প্রতিবন্ধকতা করে না। তাই এ যুগের মনস্বী আলোচক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় হেমচন্দ্র সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন,—

"হেমচন্দ্রকে নানা সমালোচক নানাভাবে দেখিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। তিনি ভাষা ও ছন্দে উচ্চশ্রেণীর শিল্পী ছিলেন না, তাঁহার কাব্যের কোনও অন্তর্নিহিত স্বাভাবিক প্রেরণা ছিল না, বিলাতী কাব্যপাঠে যাঁহারা অভ্যস্ত, তিনি বৈদেশিক কাব্য-সাহিত্য হইতে মালমশলা সংগ্রহ করিয়া প্রধানতঃ তাহাদেরই চিত্তবিনোদন করিয়াছেন, তিনি সুলভ ভাবুকতায় গা ভাসাইয়া চলিতেন, ইত্যাদি প্রত্যেক উক্তিই কোন না কোন দিক দিয়া তাঁহার সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইলেও সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে, হেমচন্দ্র তাঁহার কাব্যে ও কবিতায় বাংলার জাতীয়তাবোধ উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।"[২৭]

হেমচন্দ্রের মহাকাব্য 'বৃত্রসংহারেও' জাতীয়তাবোধের প্রকাশ আছে—বস্তুতঃ দেশচেতনার ফল্গুধারা হেমচন্দ্রের অন্তর্জগতে এমন ভাবে প্রবাহিত হয়েছিল যে এখানে দেশচিন্তা প্রধানতম অবলম্বন না হয়ে পারেনি। হেমচন্দ্রের অন্যান্য স্বদেশ-প্রেমমূলক কাব্যে পূর্বসূরীদের প্রভাব যেভাবে দেখানো হয়েছে,—'বৃত্রসংহারে'র মধ্যেও তা অপ্রচুর নয় বরং অফুরন্ত বলা যেতে পারে। মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্যে'র সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যেই 'বৃত্রসংহারের' পরিকল্পনা, সুতরাং 'মেঘনাদবধের' দেশপ্রেমাত্মক আদর্শটুকুও এ কাব্যের পরিকল্পনাকে প্রভাবিত না করে পারেনি। দুটি বিরোধী শক্তির দ্বন্দ্ব যে ভাবে "মেঘনাদবধ কাব্যে" প্রতিবিম্বিত—"বৃত্রসংহারের" আখ্যানভাগেও সেই একই বিষয়ের অবতারণা করা হয়েছে।

হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমমূলক কাব্য ও কবিতার বিষয়বস্তু, আঙ্গিক, কল্পনায় পূর্ব-সূরীর প্রভাব আছে সত্য কিন্তু প্রভাবকে অতিক্রমণের সামর্থ্য না থাকলে হেমচন্দ্রের মূল্যায়ন বোধ করি অর্থহীন হোত। বাংলাসাহিত্যে দেশপ্রেমাদর্শ হেমচন্দ্রের যুগে সর্বজনবন্দিত ও আলোচিত কিন্তু হেমচন্দ্রের কাব্যে তারই অকুণ্ঠিত প্রকাশ জনগণকে মুগ্ধ করেছিল। পূর্বসূরীদের অনুগমন করে এবং একই উদ্দেশ্য নিয়েই তাঁর পথযাত্রা শুরু হলেও, এ পর্যটন ক্ষেত্রে তিনিই একমাত্র কবি—কাব্যের আদি থেকে অন্ত-পর্যন্ত যিনি দেশের কথা একভাবে সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হলে অবশ্য এর অন্য ব্যাখ্যা হোত—কিন্তু কবি বলেই হেমচন্দ্রের দেশানুভূতি-

২৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়—সাহিত্য সাধক চরিতমালা। তৃতীয় খণ্ড। হেমচন্দ্র ও বাংলা সাহিত্য।

সর্বস্ব আদর্শ তাঁকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। কবিপ্রাণতার সঙ্গে স্বাদেশিকতার যুগ্ম সম্মিলনে হেমচন্দ্রের কাব্য নির্ভুলভাবে সে যুগের প্রাণস্পন্দনের ইতিহাস, উত্তেজনা ও বিষাদের প্রামাণ্য দলিল। সব দেশেই যেমন হয়েছে, দেশপ্রেমিকতার মাটিতেই স্বাধীনচেতনার ভিত্তিস্থাপন হয়েছে, ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্বদেশচেতনার প্রথম অস্পষ্ট আভাসই যখন দ্বিতীয়ার্ধে পুরোপুরি উপলব্ধিতে পরিণত হয়েছে—হেমচন্দ্রের মত "জাতীয় কবিরাই" সেই উপলব্ধির সত্য দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিয়েছেন। নানাভাবেই দেশসেবার পুণ্যঅর্জন সম্ভব, কিন্তু আন্তর উপলব্ধির বেদনায়িত বাণীকে জাগরণউন্মুখ জাতির সামনে তুলে ধরার কৃতিত্বে কবিরাই সবদেশে সবযুগে চরমতম শক্তির পরিচয় দিয়ে গেছেন। রাজনীতিক বা সমাজ-সংস্কারক কবির বাণী সংগ্রহ করেই দেশের মানুষকে দেশপ্রেমের দীক্ষা দিয়েছেন। হেমচন্দ্রের অসামান্য জনপ্রিয়তা সে কথাই প্রমাণ করেছে নতুন করে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত যত মূল্যবান সৃষ্টির জন্ম হয়েছে—তার মূলে পরিবেশের দাম বড়ো না কবিপ্রতিভার শক্তিই যথেষ্ট তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে—তবু একথা সত্য যে কালিদাস, সেক্সপীয়র রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন সৃষ্টির চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়েও সাময়িকতার সাহায্য না নিয়ে পারেন নি,—পরিবেশের প্রভাব গ্রহণ করেও বিশ্বজনীনতার বিচারে তারা যুগোত্তীর্ণ। কিন্তু দেশপ্রেমিক বা রাজনৈতিক আন্দোলনের কবিরা সাময়িকের জয়ঢাক বাজাতে এতই মগ্ন হয়ে থাকেন যে সেই বক্তব্যের গূঢ়ার্থ দেশ ও কালকে অতিক্রম করে যুগাতীত সত্যকে স্পর্শ করতে পারে না। হেমচন্দ্রের কাব্যের মর্মোদ্ধার কালে আমাদের শুধুমাত্র সেই যুগেই ফিরে যেতে হবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর "জাতীয় কবি" হওয়ার সৌভাগ্য হেমচন্দ্রের ঘটেছিল শুধু যুগসত্য প্রচারকের দায়িত্বটি নিখুঁতভাবে পালনের ক্ষমতায় তিনি অদ্বিতীয় বলেই। সেজন্য হেমচন্দ্র প্রসঙ্গে বার বার আমাদের ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয় জাতীয় জাগরণের প্রসঙ্গগুলির স্মরণ করতে হবে। তাঁর এক একটি কবিতার জন্ম এক একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যা সেযুগে ঘটা স্বাভাবিক হয়েছিলো। ইলবার্ট বিল সিবিল সার্বিস সভা, ব্ল্যাক এ্যাক্ট ও নীলবিদ্রোহের পরোক্ষ প্রভাব হেমচন্দ্রের যাবতীয় দেশপ্রেমমূলক রচনার মূলে। তাছাড়া সে যুগের বাংলায় যত অভ্যুত্থান ঘটেছে হেমচন্দ্রের কাব্য-কবিতার সর্বত্র সে বিষয়ের উল্লেখে পূর্ণ। এক একটি ঘটনায় কবি দেশের জনগণের অসহায় অবস্থার চিত্রটি অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন, অন্যদিকে বিদ্রোহী হওয়ার মতো মনোবলের সাহায্য না পেয়ে কবির বক্তব্য হয়েছে আর্তনাদের মতো।

১৮৭৬ সালের মধ্যেই এমন কতকগুলো আইনগত ব্যাপার ঘটে গেলো যার ফলে ভারতবাসী নতুন করে উপলব্ধি করল তারা ইংরেজের হাতের পুতুল মাত্র। দীর্ঘদিনের অধীনতার ইতিহাসে অন্যায়ের বিরোধিতার ইতস্ততঃ ও বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলো তখনও খবর হয়ে ওঠে নি—কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী তাঁর পূর্বসূরীদের তুলনায় অনেক বেশী দুঃসাহসী হতে পেরেছিলো বলে ভারতবর্ষের বাইরে যে বিপুল বিশ্বের জীবনযাত্রা চলছে তার কিছু ইতিহাস তাঁরা ইতিমধ্যেই জেনে ফেলেছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যের সহায়তায় স্বদেশপ্রেমের সুবিখ্যাত পংক্তিগুলির অর্থ অনুধাবনের ক্ষমতা শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে দেখা দিয়েছিলো—আর প্রতিমুহূর্তে ইতিহাসের নির্মম সত্যের আলোকে তাঁরা ভবিষ্যতের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্বন্ধে প্রায় নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন। ইংরেজ কবির বন্দনা গান তাঁদের উৎসাহিত করেছে,—

Glory, glory, glory.
To those who have greatly suffered and done !
Never name in story
Was greater than that which ye shall have won.
Conquerors have conquered their foes alone,
Whose revenge, pride. and pride they have overthrown.
Ride ye, more victorious, over your own.[২৮]

১৮৭৭ সালের ২৪শে মার্চ 'ভারতসভার' সম্পাদক আনন্দমোহন বসু আয়োজিত সভার উদ্দেশ্য ছিল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় যে অন্যায় নীতি [১৯ বৎসরের মধ্যে পরীক্ষা দিতে হবে] আরোপিত হয়েছিল তার প্রতিবাদ করা। হেমচন্দ্র মাত্র একবারই প্রকাশ্য সভায় লিখিত বক্তৃতা পাঠ করেন—কিন্তু ঐ বক্তৃতাংশ পাঠ করে আমরা হেমচন্দ্রের মধ্যে রাজনৈতিক দূরদর্শিতার সঙ্গে নিপুণ বক্তার গুণ দেখে বিস্মিত না হয়ে পারি না। হেমচন্দ্রের বক্তৃতারপ্রথমে ভারতীয়দের অনৈক্য ও দলাদলির প্রতি কটাক্ষপাত রয়েছে; শেষাংশে তিনি বলেছেন,

"Let the light of education and Western Culture spread, let it reach those dark corners of prejudice and ignorance, and these jealous feelings will melt and vanish away as melts the snow under

২৮. P. B. Shelley—An Ode, Written October 1819, before the Spaniards had recovered their Liberty (Published 1820). The Complete Poetical Works of P. B. Shelley by Thomas Hutchinson, Oxford, 1904.

the rays of the sun. And gentlemen, it is my hope, my belief, nay, firm conviction, that then united India will throb with one heart".[২৯]

হেমচন্দ্রজীবনীকার খুব সযত্নে হেমচন্দ্রের মূল্যায়ন করেছেন—কিন্তু অন্যান্য সমালোচকদের মত তিনিও মধুসূদনের শক্তির দীনতা প্রমাণে এত বেশী চিন্তা ব্যয় করেছেন যে মধুসূদনের নিন্দা ও হেমচন্দ্রের প্রশংসা যেকোন আলোচনার মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারেও এ মনোভাব দেখা যায়।

"কিন্তু আমাদের মনে হয়, কেবলমাত্র এক হিসাবে হেমচন্দ্রকে মাইকেলের নিকট ঋণী বলিতে পারা যায়। যেমন মাইকেলের বিলাসিতা ও আড়ম্বরপ্রিয়তা, উচ্ছৃঙ্খলতা ও স্বেচ্ছাচার, কদাচার ও অসংযতেন্দ্রিয়তা, জাতীয় আদর্শে অবজ্ঞা ও বিজাতীয় আদর্শের অন্ধ অনুকরণ অনেকের চক্ষু ফুটাইয়াছিল এবং তাঁহার জীবনের শোচনীয় পরিণাম অনেককে জীবন গঠনে সহায়তা করিয়াছিল, সেইরূপ হয়ত মাইকেলের কাব্যের অনাবশ্যক শব্দাড়ম্বর, অসংযত ভাব ও ভাষা, স্থানে স্থানে কদর্য রুচির পরিচয়, জাতীয়তার অভাব এবং পাশ্চাত্ত্য কবিগণের অন্ধ অনুকরণ, হেমচন্দ্রকে সাবধান ও সতর্ক করিয়াছিল।"[৩০]

এই সমালোচনা থেকে মাইকেলের ব্যক্তি চরিত্রের প্রতি দোষারোপ ও সাহিত্যের প্রতি বিতৃষ্ণা প্রকাশ যে কত নির্মম হতে পারে তারই পরিচয় পাওয়া যায়। মধুসূদনের জাতীয়তাবোধের অভাব দেখে হেমচন্দ্র যদি জাতীয়তাবোধ অর্জনের সুযোগ পেয়ে থাকেন তবে তাতে মধুসূদনেরই পরোক্ষ প্রভাব সূচিত হয়। হেমচন্দ্রের জাতীয়তাকে এভাবে অপব্যাখ্যা করায় হেমচন্দ্র সম্পর্কে সাধারণের ধারণা ক্রমাগতই অস্বচ্ছ হয়ে উঠেছে। হেমচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের নামে এঁরাই হেমচন্দ্রকে অশ্রদ্ধেয় করেছেন এবং মধুসূদনের প্রতিও অযথা কটূক্তি করেছেন। বস্তুতঃ মধুসূদনের স্বদেশপ্রেমের সুগভীর মহিমা উপলব্ধির ক্ষেত্রে হেমচন্দ্র নিজে যেমন ব্যর্থ হয়েছেন—সে যুগীয় সমালোচক সম্প্রদায়ও সুবিচারের আদর্শ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে হেমচন্দ্র 'A real B. A.'-র অভিমান নিয়ে "মেঘনাদবধ কাব্যের" ভূমিকা রচনায় কাব্যের অন্যান্য সব গুণাগুণ নিয়ে সামর্থ্যসম্ভব সমালোচনা করেছেন বটে, কিন্তু স্বদেশপ্রেমী হয়েও "মেঘনাদবধ" কাব্যের স্বাধীনতার মহিমা, জাতীয়তার মহৎ আদর্শের প্রতিফলন বিন্দুমাত্র লক্ষ্য করেননি কেন সেটাই পরমাশ্চর্য। দেশের পরাধীনতার চিন্তা যাঁকে ব্যাকুল করেছে—মেঘনাদের দেশাত্মবোধ তাঁকে বিস্মিত

২৯. হেমচন্দ্র। ২য় খণ্ড। মন্মথনাথ ঘোষ থেকে উদ্ধৃত। ১৩২৭, পৃঃ ৭৫।

৩০. ঐ। পৃঃ ২১০।

করে নি,—রাবণের বীরত্বব্যঞ্জক ও দেশাত্মবোধক উৎসাহবাণীতে তিনি কেন ভাবী যুগের মূলমন্ত্র আবিষ্কার করতে পারেননি—ভাবতে গেলে বিস্ময় লাগে। জন্মভূমি-রক্ষা যে জীবনরক্ষার চেয়েও বেশী মূল্যবান এ বাণীর মধ্যে কি আত্মোৎসর্জনের ভীষণ কল্লোল গর্জন করে উঠছে না ?

'রিপুদলবলে দলিয়া সময়ে
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে ?
যে ডরে, ভীরু সে মূঢ়, শত ধিক তারে।'

হেমচন্দ্রের আলোচনায় "মেঘনাদবধ কাব্যের" এই যুগোপযোগী আবেদন উপেক্ষিত হয়েছে বলেই যে 'মেঘনাদবধ কাব্যের' সমালোচনা অসম্পূর্ণ থেকে গেছে তাই নয়,—সবচেয়ে বড়ো সত্য—যে সত্যের সাধনায় হেমচন্দ্রের জীবন উৎসর্গিত—সেই সত্যই তিনি চিনে নিতে পারেননি। মধুসূদনের কাব্যবিচারে হেমচন্দ্রের এই ভ্রান্তি কিন্তু ক্ষমাহীন। শুধু তাই নয়,—মধুসূদনের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হেমচন্দ্র যে প্রশস্তিমূলক বিশাল কবিতা রচনা করেছেন তাতেও কবির আন্তরিক দেশবন্দনা বা দেশভাবনার স্বীকৃতি নেই। এতে অবশ্য হেমচন্দ্র যে অপরাধ করেছেন তাতে স্পষ্টতঃ এসত্য প্রমাণিত হয়েছে যে, অন্যান্য সমালোচকের চোখে মধুসূদনের আন্তরসংবাদ যেমন অ-দৃষ্ট থেকে গেছে—স্বদেশপ্রেমী মধুসূদনকে যেমন তারা হ্যাটবুটের মধ্যে খুঁজে পাননি—সেই মত হেমচন্দ্রও মধুসূদনের কাব্যধারার গহন গভীরে সত্যসন্ধানের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। হেমচন্দ্রের মধুসূদন বিচারের অপরিসীমমূল্য স্বীকার করা যেত কিন্তু স্বয়ং হেমচন্দ্রই তাতে বাদ সেধেছেন। আবার 'বৃত্রসংহার' রচনায় হেমচন্দ্র যেখানে মধুসূদনের আদর্শ অনুসরণের চেষ্টা করেছেন সেখানেই তিনি নিতান্ত ব্যর্থ হয়েছেন,—যেখানে তাঁর মৌলিকত্ব সেখানেই সিদ্ধিলাভ ঘটেছে। একই সময়ে, একই যুগচ্ছায়ায় জন্মগ্রহণ করেও চিন্তাভাবনায়,—বক্তব্যপ্রকাশের মধ্যে আকাশজমিন পার্থক্য সব যুগেই সম্ভব। ঊনবিংশ শতাব্দীতে মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের কাব্যানুশীলনকালে একমুহূর্তেই তা আবিষ্কার করা যায়। মধুসূদন যেমন সম-সাময়িকতাকে অগ্রাহ্য করেও তাঁর দেশপ্রেমের কথা, জন্মভূমিপ্রীতির কথা অত্যন্ত নিজেরাকরে বলেছেন এবং সেজন্য কোন স্বীকৃতি পাননি, হেমচন্দ্র ঠিক তাঁর বিপরীত। সে যুগের তুচ্ছতম সংবাদ কাব্যে পরিবেশন করে, স্বদেশপ্রেমের কথা সাড়ম্বরে, বিচিত্রবর্ণে ব্যক্ত করে হেমচন্দ্র পেয়েছেন জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন। ঈশ্বরগুপ্তের মূল্যায়ন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র ;—হেমচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্রের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয় নি,—সৌভাগ্যের জয়মাল্য খুব সহজেই হেমচন্দ্রকে ভূষিত করেছিল এবং বঙ্কিমচন্দ্র সেই অভিনন্দনের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন। "মধুসূদনের ভেরী নীরব হইয়াছে,

কিন্তু হেমচন্দ্রের বীণা অক্ষয় হউক। হেমচন্দ্র থাকিতে বঙ্গমাতার ক্রোড় সুকবিশূন্য বলিয়া আমরা কখন রোদন করিব না।"—সাহিত্যে দেশচিন্তার বিভিন্ন ধারা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। হেমচন্দ্রের দেশভাবনায় নতুনত্বের অভাব আছে সত্য কিন্তু মৌলিকতার অভাব নেই। ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গ কবিতাগুলি যেমন শুধু ব্যঙ্গের আধার নয়—অশ্রুসিক্ত অন্তরবেদনার বহিঃপ্রকাশমাত্র—হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গ ও রঙ্গের কবিতার আদর্শ প্রায় ঈশ্বরগুপ্তানুসারী। আখ্যানকাব্যে স্বদেশপ্রেম পরিবেশন রীতির জনক রঙ্গলালের কাছেও হেমচন্দ্রের ঋণ অল্প নয়। হেমচন্দ্রের সমগ্র দেশপ্রেমমূলক কাব্যকে কয়েকটি ধারায় বিভক্ত করা চলে।

১। আখ্যান কাব্যে বর্ণিত স্বদেশপ্রেম - 'বীরবাহু'।

২। মহাকাব্যে বর্ণিত স্বজাতিপ্রীতি ও বিজাতি বিদ্বেষ,—'বৃত্রসংহার',

৩। বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমভাবনা সম্বলিত গীতিকবিতা—ভারতবিলাপ, ভারতভিক্ষা, ভারতে কালের ভেরী, কুহুস্বর, ভারতসঙ্গীত, তুষানল, গঙ্গা, ইউরোপ ও আসিয়া ইত্যাদি।

৪। অতীত যুগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন—দেবনিদ্রা, পদ্মের মৃণাল, ভারতকামিনী, কালচক্র, ভারত সংগীত, বিন্ধ্যগিরি।

৫। সামাজিক ঘটনা অবলম্বনে স্বদেশপ্রেমমূলক ব্যঙ্গ রচনা—রেলগাড়ী, আজি কি আনন্দবাসর!, হায় কি হলো? রীপন উৎসব, ভারতের নিদ্রাভঙ্গ, ভারতেশ্বরীর জুবিলী উৎসব উপলক্ষ্যে, মন্ত্রসাধন, বঙ্গরমণীর উপাধি প্রাপ্তিতে, সাবাস হুজুক আজব সহরে, রাখিবন্ধন, বাঙ্গালীর মেয়ে, খিদিরপুর দাঁতভাঙ্গা কাব্য।

[১] আখ্যান কাব্যে বর্ণিত স্বদেশপ্রেমের প্রথম সূত্রপাত হেমচন্দ্রের 'বীরবাহু কাব্যে।' হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলীর ভূমিকায় সম্পাদক সজনীকান্ত দাস বলেছেন,—"যে কারণে হেমচন্দ্রের খ্যাতি, সেই দেশপ্রেম ইহাতেই সর্বপ্রথম উদ্বুদ্ধ হইয়াছে। অবশ্য কোনও ইতিবৃত্তমূলক কাহিনীকে অবলম্বন করিয়া নহে, সম্পূর্ণ কাল্পনিক অবাস্তব একটি গল্পকে আশ্রয় করিয়া, ইহাতে বিষয়বস্তু ও ভাষার দিক দিয়া তাঁহার পরীক্ষার আরম্ভ মাত্র হইয়াছে—পরিণতি বা সঙ্গতির সুষমা নাই।"[৩১] "বীরবাহু কাব্যের" দীর্ঘ সমালোচনার অবতারণা হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের প্রাথমিক রূপের বিশদ আলোচনা মাত্র। মুক্তিসংগ্রামের আহ্বান দেশবাসীর কর্ণে পৌঁছে দেবার অসার্থক ও দুর্বলতম প্রচেষ্টা হিসাবেই "বীরবাহু কাব্যের" গুরুত্ব। "চিন্তাতরঙ্গিনীতে" যে চিন্তা ব্যক্তিগত শোক ও দুঃখের পটভূমিকায় ফেনায়িত দীর্ঘশ্বাস হয়েছে,—দ্বিতীয়

৩১. হেমচন্দ্র গ্রন্থাবলী। ১ম খণ্ড। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত বীরবাহু কাব্যের ভূমিকা ১৩৬১।

কাব্যেই ব্যক্তিচিন্তা ও দেশচিন্তা কবির অন্তরে একটি ঘনীভূত উপলব্ধি হতে পেরেছে। বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রাণতারই আদর্শে হেমচন্দ্র যে কাহিনী সৃষ্টি করেছেন,—তাতে কোন বক্তব্যই নতুন নয়, অচিন্তিত নয়,—কিন্তু আদর্শ সৃষ্টির প্রেরণাটিই অভিনব। হেমচন্দ্র ইতিহাসের নায়ক অনুসন্ধানে ব্যস্ত হননি, তিনি কল্পনায় ভবিষ্যতের বীর চরিত্র সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছেন মাত্র। রঙ্গলালের আখ্যান কাব্যের নায়ক ইতিহাসের পথ বেয়ে চলেছে,—হেমচন্দ্র এই অনুসরণের মধ্যে মৌলিকত্ব প্রকাশের ক্ষেত্র খুঁজে পাননি; অথচ অনৈতিহাসিক একটি বীরচরিত্র সৃজনের উপযুক্ত ক্ষমতার অভাবে বীরবাহু চরিত্রের আগাগোড়াই নানা অসঙ্গতিময়। বীরবাহু হেমচন্দ্রের স্বপ্ন নায়ক। জলন্ত দেশপ্রেমাদর্শ ও আত্মত্যাগেচ্ছু সংগ্রামী দেশনায়কের কল্পনাই এ চরিত্রসৃষ্টির মূলে বিকশিত হয়েছে। স্বদেশরক্ষার মহান ব্রত ভিন্ন জীবনের অন্যান্য দাবীকে বীরবাহু অগ্রাহ্য করেছে। পত্নীপ্রেম বা রাজ্যলাভের বাসনাকে দমন করে বীরবাহু শত্রু ও বিধর্মী শাসকের কাছ থেকে বহুমূল্য স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টায় প্রাণ-মন সমর্পণ করেছে। যে কোন চরিত্রের মধ্যেই এসব গুণের প্রকাশ পাঠকচিত্তের সহানুভূতি দাবীর পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টি করে। বিশেষতঃ কল্পিত চরিত্রের আদর্শ ও আত্মদান যদি যুগোপযোগী চাহিদার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়—তাহলে কবি তাঁর সৃষ্টির সাফল্য সম্পর্কে প্রায় নিশ্চিত হতে পারেন। হেমচন্দ্রের বীরবাহুর পরিকল্পনা সেদিক থেকে অত্যন্ত অর্থময়—কবি পরাধীন ভারতবাসীর সামনে "স্বদেশ রক্ষার্থ" "দৃঢ়প্রতিজ্ঞ" বীরচরিত্রের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন—এবং কবির মনোগত অভিলাষের ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে, দেশপ্রেমাদর্শই তাঁকে প্রেরণা দান করেছে। রঙ্গলালের উত্তর সাধকরূপে হেমচন্দ্রের চিন্তাধারায় এই সত্যই প্রকাশিত হয়েছিল যে, দেশপ্রেম কবিকে যদি অনুপ্রাণিত করে থাকে তবে তাঁকে এমন কাব্য লিখতে হবে যাঁর মূলে দেশবাসীকে উৎসাহিত করার মত কিছু বক্তব্য থাকবে। হেমচন্দ্র রঙ্গলালের পূর্বসূরীত্ব মেনে নিয়েও প্রমাণ করলেন যে ইতিহাসের অনুগামী না হয়েও স্বাধীন কল্পনা থেকেই বীর চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব।

'বীরবাহু কাব্যে' একদিকে হেমচন্দ্রের স্বকীয় কল্পনা ও অন্যদিকে দেশপ্রেমাদর্শের প্রথমতম প্রকাশ দেখি। সুতরাং আদর্শ বিচারে "বীরবাহু কাব্যের" গুরুত্ব স্বীকার করেই কল্পনাশক্তির দীনতাকে মেনে নিতে হবে। আদর্শের জয়যাত্রা পথে "বীরবাহু কাব্য" অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য, কিন্তু সৃষ্টি হিসাবে "বীরবাহু কাব্যের" অসংখ্য ত্রুটি বিচ্যুতি হেমচন্দ্রের প্রতিভার দীনতাকে সূচিত করে। দেশপ্রেমিক স্রষ্টা হিসেবে হেমচন্দ্রের কাব্যালোচনা করলেও এই দুটি তথ্য ছাড়া 'বীরবাহু কাব্যে' আর কিছুই মেলে না। তবে কবির প্রথম বয়সের রচনার দৈন্যই কাব্যবিচারে মুখ্য স্থান পেলে

আগামী সৃষ্টির প্রতি পূর্ণমর্যাদা অর্পণ করা সম্ভব হয় না; সুতরাং দেশপ্রেমের কবি হেমচন্দ্রের প্রথম যুগের নিষ্ফলতম রচনাটির মধ্যেও কোন বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায় কি না সেটাই বিচার্য।

"বীরবাহু কাব্যের" প্রারম্ভে যোগিনী চরিত্রটি লক্ষ্যণীয়। ভাগ্যদোষে তাড়িত অম্বরমহিষী আজ দেশে দেশে যোগিনী বেশে ভ্রমণ করছেন—যবন অত্যাচারের ফলভাগিনী বলেই দেশবাসীর কাছে তিনি তাঁর অন্তরের খেদ ও আকাঙ্ক্ষার কথা ব্যক্ত করেন। নিরুৎসাহকে উৎসাহিত করাই তাঁর ব্রত। দেশপ্রেমের অগ্নিশিখা তাঁর অন্তরে নিরন্তর প্রজ্জ্বলিত,—সেই পূতশিখায় ভারতের ভাবী তরুণদের দীক্ষা দেবার সংকল্প নিয়েই তাঁর পথপরিক্রমা। বীরবাহু যখন কনোজের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী রূপে বিলাস-ব্যসনে কাল যাপনে রত তখন যোগিনীর ভৎ'সনাই তাঁর সুপ্ত দেশপ্রেম জাগ্রত করেছে। সুতরাং কনোজ রাজপুত্রকে স্বাধীনতারমূল্য সম্পর্কে সচেতন করে যোগিনী এ কাব্যের সূত্রপাত করেছে বটে কিন্তু সমগ্র কাব্যের সঙ্গে এ চরিত্রের কোন সংযোগ না থাকায় চরিত্রটি উদ্ভাবনার পরমুহূর্তেই অদৃশ্য হয়েছে। কাব্যের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাঠকের ধারণা সৃষ্টির জন্য এই কবি এই দুর্বল কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, কাব্যের সৌন্দর্যসৃষ্টির চেষ্টামাত্র করেননি। এ ধরণের দুর্বল গ্রন্থনা পাঠককে পীড়িত করে। শুধু যেন দেশপ্রেমের জন্য প্রস্তুত হবার আহ্বান জানিয়েছেন কবি, সৃষ্টির সাফল্যের দিকে বিন্দুমাত্র দৃকপাত করেন নি অথবা তাঁর সে সাধ্য ছিল না।

"বীরবাহু কাব্যে" যোগিনীর খেদোক্তি যেন কবির অন্তরেরই এক বেদনাঘন প্রকাশ,—

পাপিষ্ঠ যবন নাশ,
করিতে অন্তরে আশ,
পাণ্ডুপুত্র নাম ধরি কতই যে কাঁদিনু।
সব হৈল অকারণ,
না আইল কোন জন,
ডুবেছে ভারত-ভাগ্য তবে সত্য জানিনু॥
তখন বুঝিনু সার,
ভূ-ভারতে কেহ আর,
ক্ষত্রিকুল মহাধর্ম নাহি কিছু লভেছে।
জানিলাম বীর বংশ
কুরুক্ষেত্রে হয়ে ধ্বংস
বীর নাম জন্মশোধ ভূমণ্ডলে ঘুচেছে

আজি বুঝিলাম মর্ম,
কেন ক্ষত্রিয়ের ধর্ম,
ভারত ভিতরে আর দরশন হয় না।

যোগিনী ভারতের স্বাধীনতা বিলুপ্তির পূর্ণ বিবরণ দিয়েছে এবং পরাধীনতার গ্লানি ও অতীত গৌরবের স্মৃতি সে যেন আত্মবিস্মৃত ভাবে ব্যক্ত করে চলেছে। মোঘল শাসনেও অত্যাচার-উৎপীড়নের নানা পরীক্ষা বারংবার আমাদের শক্তির দীনতাকেই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। তারই মাঝখানে বলিষ্ঠ প্রতিবাদের যে দু-একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে—স্বাধীনতাকামী কবিদের সেটুকুই সম্বল। সেই গৌরবের কাহিনীকেই আশ্রয় করে পরাধীন ভারতবাসী আশা ও সান্ত্বনা লাভ করেছে, উৎসাহিত হয়েছে। রঙ্গলালের রাজস্থানপ্রীতির মূলেও ঐ একটিই কারণ। হেমচন্দ্র যদিও ইতিহাস অবলম্বন করেননি কিন্তু ইতিহাসের দৃষ্টান্তই বীরবাহুকে স্বাধীনতাধর্মে দীক্ষা দিয়েছিল,—

যে ভারতে বীরবৃন্দ সমর কৌশল।
দেখিতে বিমানে দেব বসিত সকল॥
সে ভারতে আমা হেন কাপুরুষদল।
আজি জনমিয়া ধরা করে রসাতল॥

বীরবাহুর এ উপলব্ধিই তাঁর সংগ্রাম ও আত্মদানের প্রেরণা। বিলাস-ব্যসনের ঘোর কাটিয়ে এই আদর্শই তাঁর ভাবীজীবনের পথনির্দেশ করেছে।

"জনম সফল তাঁর ধন্য বীর সেই।
বিক্রমে বৈরীর মুণ্ড খণ্ড করে যেই॥"

এই বীরবাহুই হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমাদর্শের প্রতীক। জন্মভূমির স্বাধীনতার জন্য জীবন আহুতি দেবার প্রতিশ্রুতিই কবির ঈপ্সিত। ব্যক্তিগত শোক ও বেদনার উর্ধ্বে এই অঙ্গীকার দেশপ্রেমিককে অবিচল রাখবে,—প্রতিজ্ঞা পালনে সে হবে সাধকের মত দৃঢ়-বলিষ্ঠ। বীরবাহু চরিত্রের পরিকল্পনার মূলে কবিচিত্তের এই স্পষ্ট ধারণাটি সে যুগের পটভূমিকায় এক মূল্যবান শপথ। আত্মদানের আদর্শে স্বদেশের জন্য সর্বস্ব পণ করে এগিয়ে যাবার কথাই বীরবাহু চরিত্রে ব্যক্ত হয়েছে। তবে কাব্যটির পরিকল্পনার অসঙ্গতি অত্যন্ত প্রকট। বীরবাহুর বীরত্ব অধিকাংশ স্থলে অর্থহীন আস্ফালনের মতো। যুদ্ধক্ষেত্রে বীরবাহুর পরাজয় ছিল অবধারিত—কারণ মৌখিক আস্ফালনে আর যাই হোক না কেন, যুদ্ধ জয় হয় না। আরও আশ্চর্য এই যে যুদ্ধক্ষেত্রে পরাজিত ও আহত হওয়া সত্ত্বেও কবি তাঁর মানসপুত্রটিকে আশ্চর্যভাবে বাঁচিয়ে দিয়েছেন। 'বীরবাহু বক্ষদেশ বানে বিদ্ধ করে রে॥'—শোনানোর পরও

দেখা গেল আহত সৈনিককে নিরাপদ দূরত্বে এনেছে অশ্ব। বীরবাহুর আদর্শ ও কার্যক্ষেত্রে তার প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেক অসঙ্গতি রয়েছে। এই বাকসর্বস্ব দেশ-প্রেমের কোন সার্থকসিদ্ধি কল্পনাতীত। কবির যুদ্ধবর্ণনার অক্ষমতাও অবশ্য এজন্য দায়ী হতে পারে; কারণ সম্মুখসমরে অপরিসীম শৌর্য প্রদর্শনের সুযোগ পেলে পরাজয়ের গ্লানিও কোন কোন সময়ে সহানুভূতিতে সিঞ্চিত ও অভিনন্দিত হয়ে থাকে। কিন্তু বীরবাহুর বীরত্ব শ্রুত সত্য মাত্র—কার্যক্ষেত্রে তা ব্যর্থ। তবে বীরবাহু পরাজয়ের মুহূর্তেও দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে পূর্ণ সচেতন। সমরক্ষেত্রে বিতাড়িত হয়েও প্রাচীন ভারতের বীরত্ব ও আত্মদানের আদর্শ স্মরণ করেছে বীরবাহু—ক্রন্দন করেছে মহাদুঃখে,—

এই কি কপালে ছিল জগন্মান্যা ভূমি।
আমি হৈনু দেশত্যাগী বন্দী রৈলে তুমি॥

পাঠকের সহানুভূতি লাভের জন্য এই আন্তরিক দেশপ্রাণতাই বোধ হয় যথেষ্ট। দেশত্যাগী ও পরাজিত হয়েও বীরবাহু পুনর্বার শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছে,—

যবনে করিয়া ছিন্ন তোমার মোচন।
কতদিন মনে মনে করিয়াছি পণ॥
পুনশ্চ হিন্দুর রাজ্য স্থাপন করিব।
পুনর্বার অলঙ্কারে তোমারে ভূষিব॥

এসব অংশের বাস্তবমূল্য উপেক্ষিত হতে পারে কিন্তু ভাবমূল্য অপরিসীম। স্বাধীনতার আদর্শে উদ্দীপিত হয়েও কনোজ রাজপুত্রের পক্ষে একাকী ভারতসম্রাট যবনাধিপতিকে বিতাড়নের কল্পনাই ত অসম্ভব। কিন্তু শক্তি ও সাহসের অভাবনীয় দৃঢ়তায় তা যে একান্তই অসম্ভব—একথা মনে করারও হেতু নেই। তাহলে রাণাপ্রতাপ বা শিবাজীর প্রচেষ্টাকেও অসম্ভব বলতে হয়। মেবারের স্বাধীনতার জন্য আজীবন সংগ্রাম করে রাণাপ্রতাপ আমাদের বিস্ময় উৎপাদন করেছেন, একটি মানুষের দুর্জয় আত্মত্যাগের এ এক উজ্জ্বল উদাহরণ কিন্তু সমগ্র ভারতের পরাধীনতার পটভূমিকায় এ সিদ্ধি যে কত ক্ষণস্থায়ী তাও প্রমাণিত হয়েছে। সমগ্রভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে একটি মানুষের [সে মানুষ যত শক্তিমান—যত বড় বীরই হোন না কেন,] একক প্রচেষ্টায় কখনও সম্ভব হতে পারে না, রাণাপ্রতাপের নিঃসঙ্গ সংগ্রামেই এ সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা যাঁর সমস্ত সত্তাকে বিদ্রোহী করে তুলেছে তিনিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। রাণাপ্রতাপ মেবারকেই তাঁর পৃথিবী বলে ধরে নিয়েছিলেন,—শিবাজীর মহারাষ্ট্র তাঁর সুবিশাল পরিকল্পনার প্রথমে স্থান লাভ করেছে। সুতরাং ভারতবর্ষের সামগ্রিক স্বাধীনতার কথা চিন্তা করা সেযুগে,

খণ্ডবিচ্ছিন্ন ভারতবর্ষে প্রায় অসম্ভব হয়েছিল। বিশাল ভারতে অসংখ্য খণ্ড রাজ্যের একক প্রচেষ্টা কখনও সম্মিলিত ও একত্রিত হয় নি – তাই স্বাধীনতার স্বপ্ন মধ্যযুগের ভারতে কখনও কখনও দেখা দিয়েই বিলীন হয়েছে। হেমচন্দ্রের যুগে ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার ফলেই দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপকতা দেখা দিয়েছিল,—তাই অখণ্ড ভারতের স্বার্থকে সম্মিলিত ভাবে চিন্তা করার চেষ্টা এ যুগেই প্রথম দেখা যায়। সমগ্র ভারত-বাসীকে স্বজাতি ও সমগ্র ভারতবর্ষকে মাতৃভূমি কল্পনা করার মধ্যেই যথেষ্ট আধুনিক মনোভাবের পরিচয় রয়েছে। বীরবাহু যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেছে, দেশত্যাগী হয়ে ক্রন্দন করেছে—

বিদায় জনম ভূমি জনম মতন।
বিদায় ভারতবাসী স্বজাতীয়গণ॥

এ সমস্ত অংশে কাব্যের উৎকর্ষ বিচার অনর্থক,—উদ্দেশ্যের সার্থকতাই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। হেমচন্দ্রের দেশপ্রেম ধারণার প্রথম গুঞ্জরণ 'বীরবাহু কাব্যের' উল্লিখিত অংশগুলিতেই প্রকাশ পেয়েছে। জাতিবৈরের কবি হিসাবে হেমচন্দ্রের যে পরিচয়—দেশপ্রেম ধারণার আদিতেই তা বর্তমান। তার সঙ্গে জন্মভূমির প্রতি ঐকান্তিক মমতায় বিগলিত, দেশের দুর্দশায় ভগ্নমন কবির আর্তস্বর শোনা যায়। 'বীরবাহু কাব্যের' একটি মুহূর্তে কবি যেন আত্মগত উপলব্ধিকেই স্মরণ করেন,—

মাগো ও মা জন্মভূমি! আরো কত কাল তুমি,
এ বয়সে পরাধীনা হয়ে কাল যাপিবে।
পাষণ্ড যবনদল, বল আর কতকাল
নিদয় নিষ্ঠুরমনে নিপীড়ন করিবে॥

হেমচন্দ্রের দেশপ্রেমাকুতির এমন সোচ্চার-বলিষ্ঠ নিদর্শন তাঁর প্রথম দিকের দেশপ্রেমাত্মক কাব্যেই পাওয়া যাচ্ছে। কাব্যের যে অংশে এই মর্মাতুর অভিব্যক্তি কবি বর্ণনা করেছেন,—বর্ণনাশক্তির অভাবে ও ঘটনাংশের দুর্বল গ্রন্থনায় কাব্যে তা মোটেই সার্থক হয়ে ওঠেনি, কিন্তু কাব্যবিচ্ছিন্ন অংশরূপে এর অন্তর্নিহিত আবেদন আমাদের কাছে আরও বেশী অর্থময় হয়ে উঠেছে। রঙ্গলালের "পদ্মিনী উপাখ্যানের" কোন কোন অংশেও এ ধরণের সত্য সন্ধান করতে হয়েছে ; – হেমচন্দ্রের মানসিকতার ব্যাখ্যা কালেও কাব্য থেকে বিচ্ছিন্ন করেই এই কাব্যাংশগুলির সার্থকতা আবিষ্কার করতে হবে। "বীরবাহু কাব্যের" কাহিনী উদ্ভাবনের, চরিত্রের সঙ্গতি আবিষ্কারের ব্যর্থতাকে কবির আন্তর দেশপ্রেমাদর্শ দিয়ে অনুভব না করলে কবিকে অনেক সময়ই অপ্রশংসার সম্মুখীন হয়ে নীরবে আত্মগোপন করতে হবে। তাতে আমরাই বঞ্চিত হবো। কিন্তু কিছুমাত্র সৎ উদ্দেশ্যের ছায়াপাত যদি কাব্যের কোথাও থাকে তার

আলোচনাই কবি সম্পর্কে আমাদের শ্রদ্ধাবোধই জাগিয়ে তুলবে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আত্মজাগরণের সংবাদগুলি আমরা সর্বদাই অতিপ্রত্যক্ষ রূপে আবিষ্কারে অসমর্থ হই ; —অনেক সময়ই দেখি, বঙ্কিমচন্দ্রকে কমলাকান্তের বকলমে আত্মপ্রকাশ করতে হয়,—পাঠককে তার স্বরূপ আবিষ্কারে সাহিত্যের রাজপথ ছেড়ে চোরাগলিতে প্রবেশ করতে হয়। হেমচন্দ্র প্রমুখ কবিরাও তাঁদের দেশপ্রেমানুভূতির গভীর উপলব্ধি প্রকাশের জন্য সার্থক ও অসার্থক কত কিছুই পরিকল্পনা করেছেন। কেউবা ইতিহাসের সত্যকে সক্রিয় সিদ্ধির কাজে ব্যবহার করেছেন, -কেউবা সম্ভব-অসম্ভব কাহিনী কল্পনা করে নিজস্ব অনুভূতির সত্যটুকু পরিবেশন করেছেন। উভয় ক্ষেত্রেই কবির আত্মদর্শন, জীবনাকুতিই প্রধান বক্তব্য হয়ে উঠেছে। 'বীরবাহু কাব্যের' অনেক অংশেই হেমচন্দ্রের স্বাদেশিকতার আহ্বান বাণী শোনা যায়। বীরবাহুর পরাজয় বর্ণনা যেমন কাব্যের দিক থেকে প্রয়োজন, বীরবাহু যে অস্বাভাবিক উপায়ে দিল্লীর বাদশাহকে পরাজিত করেছে আদর্শরক্ষার দিক থেকে এরও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আদর্শের মুখরক্ষা ও সাহিত্যের মুখরক্ষার যুগ্মদায়িত্ব পালনের অক্ষমতায় হেমচন্দ্র অভিযুক্ত একথাও সত্য। কিন্তু "বীরবাহু কাব্যের" কোন কোন অংশে দেশপ্রেম ভাবনা সুন্দর ভাবে প্রতিবিম্বিত,—

কতই ঘুমাবে মাগো— জাগো গো মা জাগো জাগো।
কেঁদে সারা হয় দেখ পুত্র কন্যা সকলে।
ধূলায় ধূসর কায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়,
একবার কোলে কর ডাকি গো মা মা বলে।

দেশভক্তির অঙ্কুর কবির চিত্তে কাব্য রচনার পূর্বেই দেখা গেছে—'বীরবাহু কাব্যের' কল্পনার মূলে তা সক্রিয় ভাবে কাজ করেছে—আখ্যাপত্রের কবিতাটিই কবির উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে,—

আর কি সেদিন হবে, জগৎ জুড়িয়া যবে,
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।
যবে কবি কালিদাস, শুনায়ে মধুর ভাষ
ভারতবাসীর মন নানারসে তুষিত ॥
যবে দেব অবতংস, রঘু কুরু পাণ্ডুবংশ,
যবনে করিয়া ধ্বংস ধরাতল শাসিত।
ভারতের পুনর্বার, সে শোভা হবে কি আর।
অযোধ্যা হস্তিনা পাটে হিন্দু যবে বসিত ॥

আখ্যাপত্রের কবিতাটিতে হেমচন্দ্র স্বকীয় মনোভাব গোপনের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেন

না।—যা স্বাভাবিক অনুভূতি, যা কবির আত্মোপলব্ধি, তাকেই প্রকাশ করেছেন। বেদনাবোধ ও হতাশার স্বরও এখানে অস্পষ্ট নয়।

আর কি সেদিন হবে, জগৎ জুড়িয়া যবে
ভারতের জয়কেতু মহাতেজে উড়িত।

এ সংশয়ই কবির বিষাদ এনেছে—আশার বাণী শোনাবার লগ্ন তখনও দুরাগত। কাব্যকে অর্থবহ করার উদ্দেশ্যে Byron-এর পংক্তিও তিনি উদ্ধৃত করেছেন—তাও লক্ষ্যণীয়।

Italia! Oh Italia! thou who lost
The fatal gift of beauty, which became
A funeral dower of present woes and past.

কাব্যালোচনার শেষেও দেখা যায় আঙ্গিক, চরিত্র, কাহিনী রচনার অসাফল্যের পরেও একটু সান্ত্বনা পাই যখন কাব্যরচনার উদ্দেশ্যগত আদর্শ এ কাব্যে পুরোপুরি রক্ষিত হতে দেখি। বর্তমান আলোচনায় স্বদেশপ্রেমের, জাতীয় আদর্শের কবি হেমচন্দ্রের সম্পর্কে এটাই প্রধানতম কথা।

হেমচন্দ্রের দেশাত্মবোধ খণ্ড কবিতাকারেই স্ফূর্তি পেয়েছে বেশী। "বীরবাহু কাব্যে'র কোন কোন অংশে কবির বক্তব্য কাব্যবিচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড উপলব্ধির সত্যই প্রকাশ করেছে। পরবর্তীকালে কবির বিশিষ্ট স্বদেশপ্রেমমূলক কোন কোন রচনার আদি ও অস্বচ্ছরূপ এ কাব্যের উল্লিখিত অংশে মিলবে। পরে এই মূলভাবের বিস্তৃত রূপই খণ্ড খণ্ড কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছে।

[২] কবিযশপ্রার্থী না হলে কবিরা কাব্যের ধ্যানলোকে নীরব সাধনায় মগ্ন হতেন কি না সন্দেহ। কবিমাত্রই বিদগ্ধ পাঠকগোষ্ঠীর স্বপ্নে মগ্ন হয়ে থাকেন। ভবিষ্যের আশায় সৃষ্টির উৎসাহও সেই লোলুপ রসিকেরই কামনায় মগ্ন। কাজেই সমসাময়িক সিদ্ধির দৃষ্টান্ত কবিচিত্তের গোপনস্তরে সংক্রামিত হয়ে যেতে পারে সহজেই,—হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার কাব্যের" জন্ম ইতিহাসে এই সত্যেরই প্রতিফলন দেখি। মধুসূদনের কাব্য সংস্কার মানসে হেমচন্দ্রকে 'বৃত্রসংহারের' পরিকল্পনা করতে হয়েছে—এ কথার যোগ্য ও যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা নেই। আসলে মধুসূদনের মহাকাব্যের অমিত সম্ভাবনা, প্রচণ্ড সাফল্যের সংবাদ সেযুগের শিক্ষিত কবি হেমচন্দ্রকে চঞ্চল করেছিল—সুতরাং তাঁকে "বৃত্রসংহার" লিখতে হল। এ কাব্যে পূর্বসূরীর অতি প্রত্যক্ষ প্রভাবকে যেমন কোন সমালোচকই অস্বীকার করতে পারেন না—তেমনি হেমচন্দ্রের মৌলিকত্ব অস্বীকারের কোন চেষ্টাই শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে না। এ দু'য়ের

সম্মিলনে সেযুগে হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহার' কাব্য বিলাসীদের কাছে প্রচণ্ড আবেদনের ও আলোড়নের সূত্রপাত করেছে।

মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্যে" দেশচেতনার প্রতিফলন কিভাবে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল সেকথা পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহারে" দেবদৈত্যের সংগ্রামচিত্রনই মুখ্য। স্বর্গ বিতাড়িত দেবসমাজের দুর্দশাচিত্র বর্ণনাই প্রাধান্য পেয়েছে এবং অপ্রাকৃত উপায়ে বৃত্রনিধন যজ্ঞ সমাপ্ত করে স্বপ্রতিষ্ঠ হয়েছে দেবতা সম্প্রদায়। পুরাণ ও প্রাচীন কাব্যের বহু কাহিনীতেই দেব সমাজের এ ধরণের অধঃপতনের সংবাদ পাওয়া যায়। বস্তুতঃ স্বর্গরাজ্যের অধিকার দেবতাদের একচেটিয়া কি না, স্বর্গের সুখসমৃদ্ধির একচ্ছত্র মালিক হিসাবে দেবতাদের দাবী অগ্রগণ্য কি না—এ নিয়ে প্রশ্নের অবকাশ থেকেই যায়। অধিকাংশ স্থলে দেখা যাচ্ছে ইন্দ্রত্ব নিয়ে শক্তির লড়াই ; দুর্বল ইন্দ্রকে সরিয়ে দিয়ে ইন্দ্রপদে অধিষ্ঠিত অন্য শক্তির উল্লেখ অন্যত্র পাওয়া যাচ্ছে। এখানে বৃত্রও শক্তি ও সামর্থ্যে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, ইন্দ্রত্ব লাভ করেছে, আর স্বর্গাধিপতি স্বদেশভূমি পরিত্যাগ। করে মর্ত্য পৃথিবীতে বিচরণ করছেন। অন্যান্য দেবতারাও স্বক্ষেত্রবিচ্যুত উল্কাপিণ্ডের মতোই রোষ ও ক্রোধাগ্নি নিয়ে নিষ্ফল দম্ভ প্রদর্শন করছেন। মোটামুটি দুর্বল ও শক্তিমানের দ্বন্দ্বই "বৃত্রসংহারের" মূল কাহিনীভাগ গড়ে তুলেছে।

হেমচন্দ্রের সচেতন দেবতাপ্রীতি ও দৈত্যবিদ্বেষ দিয়েই এ কাব্যের শুরু ; মর্মাহত দেবতাদের সঙ্গে মর্মাহত কবিও তাই স্বদেশোদ্ধারের [হেমচন্দ্র স্বর্গে দেবতাদেরই আদি অধিকার মেনে নিয়েছেন] চিন্তায় মগ্ন। 'পরাজিত দেবতাকুল রোষে-অপমানে কিভাবে অস্থিরচিত্ত হয়েছেন "বৃত্রসংহারের" প্রথমেই কবি তার আভাষ দিয়েছেন—

বসিয়া পাতালপুরে ক্ষুব্ধ দেবগণ,
নিস্তব্ধ বিমর্ষ ভাব চিন্তিত, আকুল ;
নিবিড় ধূমান্ধ ঘোর পুরী সে পাতাল,
নিবিড় মেঘডম্বরে যথা অমানিশি। [১ম সর্গ]

স্বর্গচ্যুত দেবতাদের পাতালে অবস্থিতি ও গোপন বৈঠকের একপ্রান্তে বসে কবিও যেন মহাচিন্তামগ্ন। বস্তুতঃ স্বর্গবাসী দেবতাদের আত্মপ্রতিষ্ঠার ও আত্মমর্যাদার সংগ্রামে তুচ্ছ মর্তবাসী মানুষ হিসেবে আমাদের করণীয় যে কি তা বুঝে ওঠাই মুস্কিল। দেবতাদের মৃত্যুঞ্জয়ী, সর্বপারঙ্গম রূপে কল্পনা করে যে স্বস্তি ও নির্ভরতা পাই তাদের লাঞ্ছনা ও নিপীড়নের মুহূর্তগুলি আমাদের অস্বস্তির মাত্রাই বৃদ্ধি করে শুধু। অথচ সান্ত্বনা বা উৎসাহ দেবার মত স্পর্ধা আমাদের নেই। দেব-সমাজকে মাথার মধ্যমণি করে রাখাটা সব দিক দিয়েই নিরাপদ—তাঁদের সুখ-দুঃখের

সঙ্গে মানুষের সুখ-দুঃখকে এক করে দেখার রীতি নেই। সুতরাং দেবসমাজের এই চরমতম দুর্দিনের চিত্রাঙ্কনে কবি দেবোচিত গাম্ভীর্য বজায় রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। দেবতারা স্বর্গোদ্ধারের জল্পনায় যখন পূর্ব ঐতিহ্য স্মরণ করেন, তখন পাঠক সম্প্রদায়ের অনুভূতির সমর্থন পাননা। দেবতাদের দুর্দশায় আমরা দর্শক মাত্র। দেবতাদের মুখেই তাঁদের পূর্বগৌরবের স্মৃতি রোমন্থন-চিত্র,—

"চির-যোদ্ধা – চিরকাল যুঝি দৈত্যসহ
জগতে হইলা শ্রেষ্ঠ, সর্বত্র পূজিত ;
আজি কি না দৈত্যভয়ে ত্রাশিত সকলে
আছ এ পাতালপুরে অমরা বিস্মরি।

কিংবা দেব সেনাপতি স্কন্দের সখেদ উক্তি,—

কি প্রতাপ দনুজের, কি বিক্রম হেন,
শঙ্কিত সকলে যাহে স্ববীর্য্য পাশরি ?
কোথা সে শূরত্ব আজ বিজয়ী দেবের
শতবার রণে যারা দনুজে জিনিলা ?

কোথাও পাঠক বিষয়েব গৌরবে বা বর্ণনার শক্তিতে আত্মনিমগ্ন হতে পারেননা। "বৃত্রসংহারের" এই সংগ্রামচিত্র এমন একটি পৌরাণিক দৈবদুর্দশার চিত্র যে পাঠক চিত্তের কাছে এর বক্তব্যের আবেদন খুব স্বল্প। অথচ হেমচন্দ্রের 'বৃত্রসংহারের' মধ্যেই এক যুগের সমালোচকেরা জাতিবৈরিতার উৎকৃষ্ট নিদর্শন অনুসন্ধান করেছেন। দেব ও দানব—পারস্পরিক বৈরিতা নিয়েই এঁদের আবির্ভাব ও অস্তিত্ব। এ বৈরিতা যুগ যুগান্তরের স্বীকৃতি পেয়ে আসছে,—এ বৈরিতা চিরদিনই দ্বন্দ্বমূলক। দেব ও দানবের যুদ্ধে দেবশক্তির দানবনিধনের মধ্যেই শক্তিপরীক্ষার চরম নিদর্শন অনুসন্ধান প্রথাসিদ্ধ। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদকে সেই সনাতন দ্বন্দ্বের প্রতিরূপ বলে মনে করে আমরা শুধু এটুকু সান্ত্বনা পাই যে, পরাধীনতা বা জাতীয় দুর্বলতা প্রভৃতি শব্দগুলি শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীরই কতকগুলি ঘৃণিত শব্দ নয়। সনাতন কাল থেকে শুধু মানুষের জীবনেই নয়—দেবতাদের জীবনেও এর পরীক্ষা হয়ে গেছে—এ একটা শাশ্বত প্রথা। হেমচন্দ্র "বৃত্রসংহারের" মধ্যে দেব ও দানবের পারস্পরিক সংগ্রামচিত্র বর্ণনা করে আমাদের মনে ঠিক কোন ভাবের সঞ্চার করেছেন বলা শক্ত। স্বর্গচ্যুত দেবসমাজ স্বর্গবিহারী দৈত্যদের প্রতি বৈরভাব পোষণ করতে বাধ্য এবং এ কাহিনী যে যুগেই লিখিত বা পুনর্লিখিত হোক না কেন,—বৈরিতার ওপর বিশেষত্ব আরোপ করাকে কোন ক্ষেত্রেই বিশিষ্ট চিন্তা বলে দাবী করা যায় না। হেমচন্দ্র অবশ্য সেই সনাতন সত্যকেই সময়োপযোগী রূপ দিয়েছেন। দেবসমাজের স্বর্গপ্রীতি ও স্বর্গলাভের

আকাঙ্ক্ষা এ কাব্যে প্রকাশ করে পরাধীন ও ভাগ্যহীন ভারতবাসীর সামনে সাময়িক সত্য প্রকটিত করেছেন। অবশ্য কবিচিত্তের স্বাভাবিকী বৃত্তি স্বদেশপ্রাণতা বলেই হেমচন্দ্র সম্পর্কে এটুকু কল্পনা করে নিতে বাধা নেই। কিন্তু জাতিবৈরিতার বিশিষ্ট কবি হেমচন্দ্রকে 'বৃত্রসংহারের' আখ্যানভাগ থেকে আবিষ্কার করা কঠিন। দৈত্য-কুলের প্রতি ঘৃণা ও নিন্দা কোনটাই এ কাব্যের মুখ্য কথা নয়। আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা ও দেবসমাজের কলঙ্ক মোচনের ঐকান্তিক আগ্রহই এ কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে। অন্যজাতি বিদ্বেষ স্বজাতিপ্রীতিরই অন্যতম লক্ষণ, সুতরাং হেমচন্দ্রকে এ ক্ষেত্রে জাতি-বৈরের কবি বলে অভিহিত করার সার্থকতা কই? বিশেষতঃ শব্দটি যখন কোন সুস্পষ্ট অর্থ বহন করে না, তখন এর চেয়ে অর্থময় কোন বিশেষণে কবিকে ভূষিত করাই শ্রেয়। হেমচন্দ্রের "বৃত্রসংহার" কাব্যের কাহিনী ও উপস্থাপনা রীতির আলোচনা শেষে হেমচন্দ্রকে স্বদেশপ্রাণ কবি বলাই সঙ্গত;—কারণ সব নদী যেমন সমুদ্রে মেশে তেমনি দেশপ্রেমিক কবির সব কৌশলের মূলেই তাঁর একটি আদর্শই বড়ো হয়ে দেখা দেয়। হেমচন্দ্রকে জাতিবৈরের কবি হিসেবে সমালোচনা করা হয়ে থাকে—কিন্তু এই সঙ্গে আরও একটি কথা যোগ করে দিতে হবে যে, সেই জাতি-বৈরিতার সঙ্গে হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রাণতার একটা ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল।

"বৃত্রসংহার" প্রসঙ্গে শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার বলেছেন, "দেবারাধনা ও পরহিতব্রত 'বৃত্রসংহারের' আসল কথা হইলেও ঐ দুটি কথা লুকান ছাপান আছে। কিন্তু জাতিবৈর কাব্যে ওতপ্রোত, জ্বালা জ্বলন্ত, জ্বালা নিবারণের পালা নিস্তেজ।...এই জাতিবৈরে আমরা যেরূপ জ্বালাতন, পাতালপুরে প্রচেতা ব্যতীত আমাদের দেবতারাও সেইরূপ জ্বালাতন।"[৩২]

হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রাণতাই পরাধীন, রাজ্যহীন, স্বর্গবিতাড়িত দেবতাদের পক্ষানু-সরণে উৎসাহিত করেছে। 'মেঘনাদবধের' কবি মধুসূদনও বিপন্ন মানুষের দুঃখে দুঃখিত হয়েছেন। মধুসূদন প্রতিপক্ষ হিসেবে রাবণকে অধিকতর যোগ্য ব্যক্তি বলেই মনে করতেন সুতরাং সহানুভূতির অংশভাগী হয়েছে রাক্ষসাধিপতি। হেমচন্দ্রও বৃত্রের ক্ষমতা অস্বীকার করেননি—কারণ অস্বীকার করার কোন হেতু ছিল না; বৃত্র নিজেই নিজের সামর্থ্য প্রমাণ করেছে। হেমচন্দ্র দেবসমাজের উৎসাহ ও দৃঢ়তা বৃদ্ধির জন্য প্রচেতাকেও আত্মনিষ্ঠ ও দৃঢ় করে অঙ্কন করেছেন,—

"সাহস যাহার,—সদা সেই ভাগ্যধর।"

এবং কবির বিশ্বাস স্বদেশ উদ্ধারের মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে সাহসিকতার ও

৩২. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কবি হেমচন্দ্র, ১৩১৮ পৃ ৭৫।

সম্মিলিত শক্তির অভাব মারাত্মক। প্রথম খণ্ডে দেবতাদের শক্তির ও আত্মবিশ্বাসের মধ্যে যোগ ছিল অল্প—অথচ অপমান ও পরাজয়ের গ্লানিতে তাঁরা ভরপুর। কারণ বৈশ্বানরের উক্তিতেই সে সত্য প্রতিবিম্বিত,—

নিয়তি সতঃ কি কভু অনুকূল কারে ?
দেব কি দানব কিম্বা মানব-সন্তানে ?
সাহসে যে পারে তার কাটিতে শৃঙ্খল,
নিয়তি কিঙ্কর তার শুন দেবগণ।

শক্তি ও সাহস দেবতা, দানব কিংবা মানুষ সকলেরই ঐশ্বর্য, যে কোন দুঃসাধ্য সাধন এর দ্বারা সম্ভব। আত্মলীন, দুর্বল জাতির সামনে এ সমস্ত অংশের অপরিসীম মূল্য অনস্বীকার্য।

"বীরবাহু কাব্যের" কোন কোন অংশ যেমন কবির নিজস্ব বক্তব্যকেই প্রকাশ করেছে—এ কাব্যেও তা মেলে। ঘটনাংশের সঙ্গে সংগতি রেখেই কবি বলেন,—

"চিন্তিত সতত, ভয়ে কুণ্ঠিত সদাই,
পরের আশ্রয়ে বাস প্রাণের বালাই!
স্ববশে স্বাধীন চিত্ত, স্বাধীন প্রয়াস,
স্বাধীন বিরাম, চিন্তা স্বাধীন উল্লাস,
সসর্প গৃহেতে বাস, পরবশ আর,
দুই তুল্য জীবিতের, দুই তিরস্কার!

* * * *

যেইখানে পরবশ, সেইখানে খেদ।"—এই খেদ স্বর্গচ্যুত দেবতাদের—এই খেদ পরাধীন ভারতবাসীর, এই খেদ জাতীয়তাবাদী কবি হেমচন্দ্রের।

দেবারাধনার প্রসঙ্গ অথবা পরহিতব্রত প্রসঙ্গ এ কাব্যে খুব উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে,—দেবসমাজের মঙ্গলের জন্য দেবোত্তর চরিত্র দধীচির আত্মোৎসর্গের বর্ণনা এ কাব্যের গৌরব বৃদ্ধি করেছে—সন্দেহ নেই। অনেকের মতে 'বৃত্রসংহার কাব্যের' শ্রেষ্ঠাংশ বা সারাংশ এই পরহিতব্রতের ও আত্মত্যাগের মহিমাময় চিত্র। সনাতন ভারতীয় সত্যকেই কবি উনবিংশ শতাব্দীর নবচেতনার সম্মুখে স্থাপিত করেছেন। বস্তুতঃ দধীচির আত্মোৎসর্গ লাঞ্ছিত-পীড়িত-পরাধীন দেবতাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্যই ;—দধীচির আত্মদানের মধ্যে এটাই মুখ্য বক্তব্য—পরার্থে জীবনদান। দেশপ্রেমিকের সামনে এই দৃষ্টান্তের মূল্য কম নয়—পরার্থে জীবনদানের ব্রতে তাঁরা অভীক সৈনিক। তবে দেশপ্রেমিকের সামনে স্বার্থবোধের প্রশ্ন নিশ্চয়ই আছে—দেশের স্বার্থ, জন্মভূমি, মাতৃভূমির স্বার্থই তাঁর আত্মদানের প্রত্যক্ষ প্রেরণা। মৃত্যু বা

লাঞ্ছনাভোগ কতই না তুচ্ছ সেখানে। বৃত্রসংহারে দেবসমাজ আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য যে পথ অবলম্বন করেছে—তা বোধ হয় আমাদের বিচারে অভ্রান্ত পথ নয়। দধীচির অমূল্য প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য দেব সমাজের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই।—এই অমানবোচিত স্বার্থপর দৃষ্টান্তটিকে কোনমতেই সমর্থন করা যায়না। সেজন্যই বলেছি, পরাজিত বা লাঞ্ছিত সমাজের সঙ্গে আমাদের সাধর্ম্য বা সহানুভূতির সংযোগে "মেঘনাদবধ কাব্যের" আবেদন যত তীব্র ও সংহত 'বৃত্রসংহারে' তার একান্তই অভাব। আত্মপ্রতিষ্ঠার যে দুর্মদ আকাঙ্ক্ষায় লঙ্কাবাসীদের সংগ্রাম ও আত্মবিসর্জনের প্রেরণা এসেছে—'বৃত্রসংহারের' দেবসম্প্রদায়ের চিত্তে তার একাংশও নেই। অথচ এঁরা দেবতা; দানবের সঙ্গে সংগ্রাম সামর্থ্যেই যে এঁরা হীন তাই নয়,—চিত্তশক্তির দুর্বলতা এঁরা কোথাও গোপন করেননি। অথচ স্বর্গচ্যুত হওয়ার বেদনায় এঁরা সকলেই বিষন্ন। দানব বৃত্রাসুর ও তার সম্প্রদায়ের স্বর্গ অধিকারে দেবসমাজ ক্ষুন্ন। এরই নাম যদি জাতিবৈর বা জাতিবিদ্বেষ হয় তবে তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা চলে কি? হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের গভীর উপলব্ধির প্রকাশ এ কাব্যের মধ্যে অনুসন্ধান না করাই সঙ্গত। জাতিবিদ্বেষের মধ্যে স্বদেশভাবনার একটা পঙ্গু মনোভাবেরই বিকাশ, আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ সেখানে অনুপস্থিত। হেমচন্দ্র মনে প্রাণে আত্মপ্রতিষ্ঠার সমর্থন করেছেন,—বিদ্রোহবহ্নির কল্পনা হয়ত সেখানে নেই, কিন্তু মনঃক্ষোভে অস্থির কবিচিত্তের ক্রন্দন তাঁর মহাকাব্যে নেই। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে তা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে আছে। "বৃত্রসংহার কাব্যে" আত্মদানের পৌরাণিক আদর্শই প্রাধান্য পেয়েছে কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার আবেগে উন্মুখ জাতির চিত্তে এর প্রত্যক্ষ আবেদন কোথায়?

'বৃত্রসংহার কাব্যের' একটি অংশে হেমচন্দ্রের আত্মগত ভাবোচ্ছ্বাসের অপূর্ব প্রকাশ দেখা গেছে। দেশপ্রীতির ফল্গুধারা কবিচিত্তের স্তরে স্তরে প্রবাহিত—শুধু প্রকাশের অপেক্ষায় ব্যগ্র। দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্দশ সর্গে হেমচন্দ্র জন্মভূমি বন্দনা করেছেন—কাব্যবিচ্ছিন্ন অংশরূপেও এর আবেদন অপরিসীম। হয়ত স্বর্গচ্যুত দেবতাদের মনোকষ্টই এখানে দেখানো হয়েছে—কিন্তু কবির আত্মগত উচ্ছ্বাসের প্রাধান্যও লক্ষ্য করা যায়। এ অংশটির আবেদন পরাধীন জাতির চিত্তে প্রত্যক্ষ রূপে অনুভূত হয়েছে বলেই মনে হয়।

কে আছ ত্রিলোক মাঝে প্রাণী হেন জন
সুদূর প্রবাস ছাড়ি স্বদেশে ফিরিয়া,
[কি পঙ্কিল, কিবা মরু, কিবা গিরিময়
সে জনম ভূমি তার,] নিরখি পূর্বের
পরিচিত গৃহ মাঠ, তরু, সরোবর,

নদী, খাত, তরঙ্গ, পর্বত, প্রাণিকুল,
নাহি ভাসে উল্লাসে, না বলে মত্ত হয়ে
'এই জন্মভূমি মম!' কে আছে রে, হায়,
ফিরিয়া স্বদেশে পুনঃ না কাঁদে পরাণে
হেরে শত্রু পদাঘাতে পীড়িত সে দেশ।
বিজেতা-চরণতলে নিত্য বিদলিত
বলিতে আপন যাহা—প্রিয় এ জগতে।

এ অংশটিতে হেমচন্দ্রের জন্মভূমিপ্রীতি যেন অজস্রধারায় উচ্ছ্বসিত। এ যেন বৃত্রসংহারের কোন উল্লেখ্য অংশ নয়—কবি হেমচন্দ্রের আন্তরিক ভাবনারই সংহত-সংযত সনেটীয় রূপ। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলীতেও' এই ঝংকারই বহু-ভাবে বহুরূপে শ্রুত। এ অংশটির মহাকাব্যিক মূল্যবিচার আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু এর পৃথক আবেদন অতলান্ত গভীর। জাতিবৈরিতার উত্তপ্ত সংবাদের চেয়েও কবির মনের নিভৃত কোণে লাঞ্ছিতা-পরাধীনা মাতৃভূমির জন্য যে সমবেদনা সংগীত এখানে ধ্বনিত হয়েছে, সেটুকুই অমূল্য প্রাপ্তি। তবে দুঃখের বিষয় এই যে, এমন অভাবিত আন্তরিকতা মহাকাব্যটিতে প্রায় দুর্লভ বললেই চলে। দেব-দানবের ক্রোধ-দ্বেষ ও দুঃখ প্রকাশেই কবি তৎপর।

হেমচন্দ্র দেবতাদের দুঃখে বিগলিত চিত্ত হলেও দানব চরিত্রে অযথা কলঙ্কলেপনের চেষ্টা মাত্র করেননি। বৃত্রাসুর সম্পর্কে কবির উচ্ছ্বাসও অস্পষ্ট, আক্রোশও অগভীর। মোটামুটি বৃত্র চরিত্রে হেমচন্দ্র স্বাভাবিকত্ব আরোপের চেষ্টা করেছেন। বৃত্রের বীরত্ব ও শক্তির মধ্যে দম্ভ আছে বটে তবে প্রকাশভঙ্গি বীরোচিত। বৃত্রনিধনে কবির সমবেদনা অনুচ্চার—আপাতঃদৃষ্টিতে দেবতাদের সাফল্য সংবাদের ওপরই তিনি যেন অধিক মনোযোগী। কিন্তু কাব্যের যে অংশে বৃত্রের বীরত্ব বা শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন, সেখানে বৃত্র অত্যন্ত উজ্জ্বল মহিমায় চিত্রিত। বৃত্রের উক্তিতে আত্মবিশ্বাস, বীরোচিত দম্ভ, নির্ভীক আত্মবিচার আমাদের মুগ্ধ করে। মৃত্যুভয়েও অভীক-স্থিরচিত্ত বৃত্রের সদম্ভ উক্তি,—

জনম বীরের কুলে মরণ [ই] সফল
শত্রুঘাতি রণস্থলে। হে সচিবোত্তম,
কে কোথা রাজত্ব ভুঞ্জে বিনা যুদ্ধ পণে—
মৃত্যুভয়ে সমরে বিরত কবে শূর,
কবে সে বীরের চিত্তে কৃতান্তের ভয়

হানিতে সমরে শত্রু ? ত্যাজিতে পরাণ
যুঝি রঙ্গে রিপু সঙ্গে সমর-প্রাঙ্গণে ?

এই উক্তিতে বৃত্রের বলিষ্ঠ অন্তরের সঙ্গেই পাঠকের পরিচয় সুদৃঢ় হয়—দেবতাদের ষড়যন্ত্র বৃত্রের প্রাণটুকু ছিনিয়ে নিতে পারে বটে কিন্তু তার মৃত্যুভয়শূন্য বলিষ্ঠ আত্মাকে স্পর্শ করতে অক্ষম। বৃত্র মৃত্যুঞ্জয়ী—তার আত্মদানও এক গৌরবময় অধ্যায়। সুতরাং বৃত্রসংহারের শেষকথার সঙ্গে কাব্যের ব্যঞ্জনার যোগ নেই। দেবতারা স্বর্গে প্রতিষ্ঠিত হলেন কি না সে সংবাদ বৃত্রবধের সঙ্গে জড়িত কিন্তু বৃত্রের বীরোচিত আত্মদান সৈনিককে প্রেরণা দেবে আত্মবিসর্জনের। এ মৃত্যুতে অগৌরব নেই, জয়ের মুকুট শিরে নিয়ে মৃত্যু এখানে যোদ্ধাকে শহীদের বেদীতে বসায়। 'বৃত্রসংহারের' কবি হেমচন্দ্র বৃত্রের আত্মদানের মহিমা বর্ণনাতেও পরোক্ষভাবে বীরোচিত মৃত্যুর মহিমা বর্ণনা করেছেন। দেশের জন্য আত্মদানের মধ্যে এই মহিমাটুকু আবিষ্কারের চেষ্টা চলেছিল উনবিংশ শতাব্দীতেই। হেমচন্দ্র পরোক্ষভাবে সেই প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন বলে মনে হয়।

৩। বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমভাবনা সম্বলিত গীতি কবিতা—

হেমচন্দ্রের যুগে রাজনীতি ও দেশচিন্তা যে কোন চিন্তাশীল মানুষের চিত্তবৃত্তিকে প্রভাবিত করেছিল—সাময়িক পত্রে ও সাহিত্যে এই যুগভাবনাই নানাভাবে বিকশিত। হেমচন্দ্রের সাহিত্যসাধনা ও তাঁর দেশচিন্তা প্রায় অচ্ছেদ্য। সাহিত্যচিন্তার সঙ্গে দেশভাবনার যুগ্ম আবেদনে হেমচন্দ্র সাড়া দিয়েছেন, লেখনী হয়েছে এই উভয় ভাবপ্রকাশের যোগ্যমাধ্যম। প্রথমদিকের কাব্যে হেমচন্দ্র কাহিনীকাব্য বা আখ্যান-কাব্যকে আশ্রয় করেই তাঁর বিশুদ্ধ দেশভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু সেখানে কবির চিন্তাভাবনা কাহিনীর নায়কের চিন্তাভাবনার সঙ্গে জড়িয়ে আছে—কত সহজেই যে তা আবিষ্কার করা যায় পূর্বে তা আলোচিত হয়েছে। কিন্তু খণ্ড কবিতায় এই আড়ালটুকু সরে গেছে,—কবির বক্তব্য এখন অকপট, তাঁর মনোবেদনা, আশা, আকাঙ্ক্ষা, হতাশা বা উচ্চাশার সঙ্গে পাঠক এখন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। সুতরাং হেমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার স্পষ্টতা আবিষ্কার করতে হলে এই খণ্ড কবিতাগুলিকেই সর্বাগ্রে আলোচনা করতে হবে। অজস্র কবিতায় হেমচন্দ্র তাঁর আত্মপরিচয় চিহ্নিত করেছেন—সুতরাং দেশপ্রেমিক কবি হেমচন্দ্রকে আবিষ্কার করতে হবে এই সময়ে রচিত কবির সমগ্র খণ্ড 'কবিতাবলী'তে। কোথাও কোথাও চিন্তার স্রোত কবিকে আত্মবিস্মৃত করেছে,—যুগবিস্মৃত করেছে, দুঃখে, ক্ষোভে, কবি তাই দিশাহারা। পরাধীনতার অপমানে কবির শৃঙ্খলিত আত্মা বারবার ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। বাধা এসেছে—দুর্বার শক্তিতে সে বাধা অতিক্রম করার অক্ষমতায় কবি যখন বিমূঢ়—বেদনার

অশ্রুজলে সকরুণ আর্তি জানিয়েছেন তখন। এ বেদনাই কবিকে শক্তি দিয়েছে—সে শক্তি প্রকাশের অপেক্ষায় কবিচিত্তের গোপন স্তরে এতদিন দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। এ সময় 'এডুকেশন গেজেটে' ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় হেমচন্দ্রের প্রথম প্রকাশিত গীতিকবিতা 'হতাশের আক্ষেপ' নানাদিক দিয়েই গুরুত্বপূর্ণ। নামকরণ থেকেই বোঝা সহজ যে, কবিচিত্তের হতাশার দীর্ঘশ্বাসে কবিতাটি মুখর। সে যুগের স্বাধীনতাকামী, দেশপ্রেমিক স্রষ্টাদের চিত্তে এ হতাশা জাগাটা খুবই স্বাভাবিক ছিল। সংঘবদ্ধ শক্তির সুযোগ্য পরিচালনায় বিদ্রোহী হয়ে ওঠার পূর্বলগ্নে চিন্তাবিদ—দেশপ্রেমী কবিচিত্তের নিদারুণ হতাশার যুক্তিও ছিল অনেক। এ প্রসঙ্গে সেযুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই পরিচিত মানসিকতার ব্যাখ্যা করার চেষ্টায় সমালোচক শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র সরকার যা বলেছিলেন, তা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য,—"শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই অবিশ্বাস হইতে জন্মিয়াছে—দারুণ হতাশা, সেই হতাশা শিক্ষিত বাঙ্গালীকে ছাড়াইয়া ক্রমে ক্রমে সমগ্র বাঙ্গালীকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে। সেই বাঙ্গালীর কবি হেমচন্দ্র দুঃখের কাহিনী গাহিয়া জীবনব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন।"[৩৩]

হেমচন্দ্রের 'হতাশের আক্ষেপ' সেই দিক থেকে একটি উল্লেখযোগ্য অনুভাবনাকে ব্যক্ত করেছে। হেমচন্দ্রের হতাশাবোধ ঊনবিংশ শতাব্দীর একটি লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা যেতে পারে। কারণ আক্ষেপ বা হতাশায় মুহ্যমান হয়ে কবিকে এ যুগে শুধুই ক্রন্দন করতে হয়েছিল। হেমচন্দ্রের হতাশার মূলেও দেশচেতনার স্পষ্ট উপলব্ধি রয়েছে। দেশকে নিবিড়ভাবে ভালোবাসতে পেরেছিলেন বলেই পরাধীনা শ্রীহীনা দেশমাতৃকার মূর্তি কবিচিত্তকে বিচলিত করেছে। অথচ কোনো নির্দিষ্ট পথে এই অবস্থার অবসান ঘটানোর উপায় জানা ছিল না। সাধ ছিল, ছিল না সাধ্য। সেই অসহনীয় মূহূর্তে শুধু জেগে ওঠে একটা প্রচণ্ড হতাশা-আক্ষেপ-বিলাপ। হেমচন্দ্রের এ সময়ের কবিতাকে বিশুদ্ধ স্বদেশচিন্তাজাত কবিতা বলতে পারি। কবির গভীর দেশপ্রীতির স্বাক্ষর কবিতাগুলিকে গৌরবান্বিত করেছে। কবিতাগুলির নামকরণও তাই লক্ষ্যণীয়—ভারত বিলাপ, ভারতসংগীত, ভারতভিক্ষা, ভারতে কালের ভেরী, তুষানল, কুহুস্বর, ইউরোপ ও আসিয়া ইত্যাদি। 'ভারত ভিক্ষায়' হতাশা জড়িত ভারতের চিন্তাই কবিকে অধিকার করেছে। ভারতের বর্তমান অবস্থার মধ্যে কবি দেখেছেন একটা প্রাচীন সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের জীর্ণ কঙ্কাল—ঐতিহ্যে, সৌন্দর্যে যা একদা দ্যুতিমান ছিল। হতাশাবোধের ভিত্তি হিসেবে এই চিন্তাটির আনাগোনা লক্ষ্য করলেই বোঝা যায়। বর্তমানের রিক্ততা অতীতের সুখস্মৃতি মন্থন করে ভোলার

৩৩. অক্ষয়চন্দ্র সরকার, কবি হেমচন্দ্র, ১৩১৮, পৃঃ ৩৫।

চেষ্টা করেননি কবি। সে মনোবৃত্তির মধ্যে ভাবালুতা আছে, বলিষ্ঠতা নেই। তাই অতীতের স্বাধীনতার স্বাদ ফিরে পাওয়ার বাসনাই বারংবার ঝংকৃত হয়েছে, সে মুহূর্তে আত্মগ্লানি ও ধিক্কারে তিনি প্রায় উচ্চকণ্ঠ। শুধু সান্ত্বনা বা প্রেরণা হিসেবেই নয়, অতীত স্মৃতির স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের একটা সুযোগ্য সময় ছিল এ যুগের উদ্বেলিত আবহাওয়া। আত্মদর্শনের মধ্যেই সুপ্ত থাকে আত্মজ্ঞান,—দেশদর্শনের মধ্যেও দেশপ্রেমেরই আভাস। সুতরাং এই শ্রেণীর কবিতাগুলোকে পৃথক একটা মর্যাদা দেওয়ার প্রয়োজন আছে। অতীতযুগের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের নিদর্শন রূপে এ কবিতাগুলির পৃথক আলোচনা দরকার।

কিন্তু প্রত্যক্ষ চেতনা দিয়ে স্বদেশভাবনার বাণীরূপ প্রকাশ পেয়েছে বিশুদ্ধ স্বদেশ-প্রেম শীর্ষক কবিতাবলীর মধ্যেই। সেখানেও অতীতস্মৃতি বা অতীতের ঐশ্বর্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন কবি কিন্তু বর্তমানের সঙ্গে তার আকাশ পাতাল পার্থক্যটির ইঙ্গিতও কোথাও অস্পষ্ট হয়ে নেই, বরং সোচ্চার। কবি যে পরাধীন—হৃতগৌরব ভারতের এক হতভাগ্য নাগরিক এ বোধই যেন কবিতাগুলির মুখ্য বক্তব্য হয়ে উঠেছে। এর আবেদন রূপকাশ্রিত নয়, অতিপ্রত্যক্ষ। তাই হেমচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেমাত্মক কবিতাগুলি প্রকাশে নানা বাধা উপস্থিত হয়েছিল। 'এডুকেশন গেজেটের' সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায় হেমচন্দ্রের কবিতা প্রকাশের দায়িত্ব নিয়েছিলেন অনেক দুঃসাহস সঞ্চয় করে। সরকারী মুখপত্রে স্বাধীনচেতনার প্রমত্ত উচ্চারণের অপরাধ বিষয়ে সবাই সচেতন। কিন্তু হেমচন্দ্র তখন প্রায় উন্মাদ দেশপ্রেমিক "ভারত সংগীত" এর মর্মকথায় সেই উন্মাদনার পরিচয় পাই। এ উন্মাদনা ভাঙ্গার কি গড়ার সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার অবকাশ রয়েছে; শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'কবি হেমচন্দ্র' আলোচনায় এ প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—"হেমবাবুর জন্মসময়ে কোন কিছু ভাঙ্গিতে পারিলেই কৃতবিদ্য আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করিতেন। সমাজ ভাঙ্গিতে হইবে, ধর্ম ভাঙ্গিতে হইবে, প্রথা ভাঙ্গিতে হইবে, চরিত্র ভাঙ্গিতে হইবে, সদাচার ভাঙ্গিতে হইবে। এমন কি, অনাচারে, অত্যাচারে স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া অকালে কাল-স্রোতে ডুবিতে পারাও যেন সেই সময়ে গৌরবের বিষয় বলিয়া ধারণা হইত।"[৩৪]

হেমচন্দ্রের "ভারত সঙ্গীতে" স্বাধীন চিন্তার উন্মাদনা—স্বদেশচিন্তার উচ্চকিত আহ্বানে আমরা সুগভীর হৃদয়ানুভূতি প্রত্যক্ষ করি—তা অবশ্য স্বাদেশিক মনোভঙ্গী গঠনের একটা উল্লেখযোগ্য উদ্যম। দেশমাতৃকার বন্দনায় কোন বাধা এলেই কবি ক্ষুব্ধকণ্ঠে তার প্রতিবাদ জানিয়েছেন। হেমচন্দ্র এ ব্যাপারে দুঃসাহসের পরিচয়ই

৩৪. অক্ষয়চন্দ্র সরকার। উপক্রমণিকা।

দিয়েছেন। চিন্তার স্বাধীনতা ব্যাহত হওয়ার বেদনায় কবির "ভারত সঙ্গীত" হয়ে উঠেছে, "ভারত বিলাপ"। পরাধীন স্বদেশপ্রেমিকের অবলম্বন হয়েছে সংগীতের স্বতঃস্ফূর্ততা নয়, বিলাপের করুণ রাগিণী। ভূদেব মুখোপাধ্যায় 'ভারত সংগীত' প্রকাশে আপত্তি করেছিলেন,—হেমচন্দ্রের "ভারত বিলাপ" মুদ্রণে তাঁর আপত্তি করার কারণ ছিল না,—কিন্তু হেমচন্দ্রের মনোজগতের বৈপ্লবিক সংগ্রামের মুহূর্তগুলি এই অবসরে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। "ভারত সঙ্গীতের" বক্তব্য যে কোন স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর প্রাণের উপলব্ধি। এ কবিতার মধ্যে উচ্ছ্বসিত হৃদয়াবেগ আছে—এই এই উচ্ছ্বাসকে কবি দমন করতে অক্ষম। কবির ক্ষোভ, দুঃখ, বেদনা ও উত্তেজনা 'ভারত সংগীতে' শত ধারায় উচ্ছ্বসিত।

ধিক্ হিন্দুকুলে! বীরধর্ম ভুলে,
আত্ম অভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু করতলে,
সোনার ভারত করিতে ছার

কবির এ আক্ষেপই সমস্ত আবেদনের অন্তরালে প্রকাশিত।

প্রাচীন ঐতিহ্যবিস্মৃত এই নির্জীব জাতির সামনে পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙ্গেফেলার আহ্বান জানাতে কবি বিন্দুমাত্র সংশয়িত নন। এ তিরস্কারে যেন সংগ্রামী নেতার ভর্ৎসনা।

তবে ভিন্ন-জাতি-শত্রুপদতলে,
কেনরে পড়িয়া থাকিস সকলে
কেন না ছিঁড়িয়া বন্ধন শৃঙ্খলে
স্বাধীন হইতে করিস মন?

এ কবিতা যদি রাজরোষে না পড়ত তবেই আমরা আশ্চর্য হতাম।* হেমচন্দ্রের বক্তব্যে কোন স্পষ্ট নির্দেশ হয়ত ছিল না কিন্তু পরাধীনতার জ্বালা তাঁর অন্তরে যে বিক্ষোভবহ্নি জাগিয়ে তুলেছিল সে সত্য তিনি নির্ভীকভাবেই প্রকাশ করেছেন। সম্ভবতঃ বাংলা কাব্যের মসীতে অসির ঝংকার এই প্রথম শোনা গেল। হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রাণতার উজ্জ্বল পরিচয়ই কবিতাটির ললাটে জয়টিকা পরিয়েছে—সে যুগের পাঠক হেমচন্দ্রকে অভিনন্দন জানিয়েছে এ কারণেই। "ভারত সঙ্গীত" পরাধীন ভারতীয়ের জ্বালা ও বিক্ষোভের নিখুঁত চিত্র। হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের কষ্টিপাথর এই কবিতা। উচ্চাঙ্গের কবিকল্পনা কিংবা অতীন্দ্রিয় ভাবব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে অক্ষম হয়েও সময়োচিত সর্বজনীন একটি উপলব্ধিকে যিনি অগ্নিক্ষরা ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন তিনি নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদী স্বদেশী কবি। কোথাও কোথাও তাঁর ভাষা অত্যন্ত

অ-কাব্যিক কিন্তু যুগোপযোগী ভাবকে সঠিক ভাবে ভাষায়িত করার শক্তি ও সাহস অন্য কোন কবির রচনায় পাইনি বলেই এ কবিতার বক্তব্য উপেক্ষণীয় নয়। জাতীয় দুর্বলতার প্রতি কবি অঙ্গুলি সংকেত করেছেন বিক্ষুব্ধ চিত্তে,—

হয়েছে শ্মশান এ ভারত ভূমি।
কারে উচ্চৈস্বরে ডাকিতেছি আমি,
গোলামের জাতি শিখেছে গোলামী।
আর কি ভারত সজীব আছে?

অতীত-ঐশ্বর্য প্রশংসার মাঝখানেও ইতিহাসের নগ্ন সত্য হেমচন্দ্র উদ্‌ঘাটন করেছেন, "গোলামের জাতি শিখেছে গোলামি"—এর প্রতিবাদ করার মত সত্যিই কোন যুক্তি আমাদের নেই। অথচ স্পষ্টভাষণের-আত্মদোষস্বীকৃতির সাহসও আমাদের ছিল না। হেমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী কবি বলেই আত্মপ্রশংসার সঙ্গে আত্ম-বিচারের সঙ্গতিটুকু তাঁর স্বদেশপ্রেমের কবিতাকে সমৃদ্ধ করেছে। এ ত অহেতুক আত্মনিন্দা নয়—যুক্তিসিদ্ধ ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। তবু এই সত্য যখন দেশপ্রেমিকের কণ্ঠে উচ্চারিত হতে দেখি,—তখন তা দাবানল জ্বালাতে পারে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাবী প্রস্তুতির কিছু কিছু মূল্যবান সঞ্চয় হেমচন্দ্রের কবিতার এসমস্ত অংশে ছড়িয়ে আছে। অন্ধ আত্মপ্রশংসা কিংবা সনাতন সংস্কার কোনটাই আমাদের স্বাধীনতা ফিরিয়ে দেবে না, এ উপলব্ধিও 'ভারত সঙ্গীতে' ধ্বনিত হয়েছে,—

এখন সেদিন নাহিকরে আর,
দেব আরাধনে ভারত উদ্ধার
হবে না, হবে না,—খোল তরবার,
এ সব দৈত্য নহে তেমন।

রাবীন্দ্রিক ঐক্যচেতনার বাণী ও সর্বজাতি সমন্বয়ের আহ্বান হেমচন্দ্রের 'ভারত সংগীতেই' দৃষ্ট হয়,—

একবার শুধু জাতিভেদ ভুলে
ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, বৈশ্য, শূদ্র মিলে,
কর দৃঢ় পণ এ মহীমণ্ডলে,
তুলিতে আপন মহিমা ধ্বজা।

স্বাধীনতা আন্দোলনের ঘনঘটার লগ্নে আমরা নজরুল কিংবা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় কিংবা দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশী নাটকে এ বক্তব্যই নতুনভাবে শুনেছি—হেমচন্দ্রের যুগে এ ছিল তার একক উপলব্ধি। হেমচন্দ্রের কবিতার ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গির ত্রুটিটি না থাকলে এ সমস্ত অংশের ভাবমূল্য হয়ত সমালোচকের দৃষ্টি

আকর্ষণে সমর্থ হোতো। উপলব্ধির বিশিষ্টতাকে বিশিষ্ট কাব্যরূপে সৃষ্টি করার শক্তি হেমচন্দ্রের ছিল না তাই সমালোচকের দৃষ্টিতে এ সব কবিতার কাব্যমূল্য স্বীকৃত হয় নি। বাগর্থের সার্থক সংযোজনায় তাঁর অনুভূতি প্রথম শ্রেণীর কবিতা হয়ে ওঠেনি সত্য কিন্তু যুক্তিনিষ্ঠ আত্মসমালোচনায়, আন্তরিকতায়, দেশপ্রেমের নিষ্ঠায় পরিপূর্ণ এ সব কবিতার সাময়িক মূল্য অপরিসীম। স্বাদেশিক মনোভাবই কবিকে শক্তি দিয়েছে—উৎসাহ ও উত্তেজনায় এ কবিতা তাঁর বিশুদ্ধ স্বদেশভাবনার বাহক,—

বাজরে শিঙ্গা বাজ এই রবে,
শুনিয়া ভারতে জাগুক সবে,
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে,
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রবে ?

এই প্রসঙ্গে 'আর্যদর্শনের' কোন সমালোচকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসাটি লক্ষ্যণীয়, "যাঁহারা বাংলা ভাষা দুর্বল ও নিস্তেজ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেন, যাঁহাদিগের সংস্কার ছিল বঙ্গভাষাতে হৃদয়ভেদী ও জালাময়ী কবিতা লেখা যাইতে পারে না, তাঁহাদের হেমচন্দ্রের "ভারত সংগীত" ও "ভারত বিলাপ" পড়িয়া সে ভ্রম দূরীকৃত হইয়াছে। কোন জাতির মধ্যে, কোন ভাষাতে, কোন কালে, কোন পুস্তকে এই দুই কবিতার অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বিনী কবিতা আছে বলিয়া বোধ হয় না।"[৩৫]

একে অতি প্রশংসা বলা যায় না। 'ভারত সংগীতের' মতো বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমের কবিতা অন্য ভাষাতে আছে কি না জানি না—কিন্তু বাংলাতে নেই। হেমচন্দ্রের "ভারত সংগীত"ই স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম দিতে সক্ষম, বক্তব্যের বলিষ্ঠতায় এ কবিতা সত্যিই নির্জীব ও আত্মমগ্ন জাতিকে সৈনিকের শৌর্য এনে দিয়েছিল। সমগ্র কবিতাটি একই সঙ্গে অতীত ভারতের মর্যাদার ও আধুনিক ভারতের বিপর্যয়ের একটি মূল্যবান দলিল। ভারতপ্রেমিক হেমচন্দ্রের প্রতিভানুকূল এ এক আশ্চর্য সৃষ্টি। "ভারত সংগীতে" অন্তর্নিহিত যে জালাময়ী চেতনা সম্পাদক ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে সচকিত করেছিল "ভারত বিলাপে" তা বিন্দুমাত্র প্রশমিত হয়নি। কিন্তু অগ্নিক্ষরা উত্তাপকে বিলাপের কারুণ্যে শীতল করার একটা ব্যর্থ প্রচেষ্টা এ কবিতায় লক্ষণীয়। বস্তুতঃ "ভারত সংগীতের" মতো একটি কবিতার স্ফুলিঙ্গ যদি যথেষ্ট না হয় তা হলে অসংখ্য কবিতায় বাংলা কাব্য মুখরিত হলেও কবির উদ্দেশ্য সার্থক হবে না। কিন্তু সে যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে "ভারত সংগীতই"

৩৫. হেমচন্দ্র। ১ম খণ্ড। মন্মথনাথ ঘোষ থেকে উদ্ধৃত। ১৩২৬, পৃঃ ২৩২।

দাবানল সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট ছিল। পরে হেমচন্দ্র নামকরণ পরিবর্তন করলেন কিন্তু "ভারত বিলাপ"—"ভারত সংগীতেরই" শান্তরূপ। এ কবিতায় হেমচন্দ্র অনুত্তেজিত বিষাদ সঞ্চার করেছেন মাত্র। কবির সংকুচিত মনোভাবের অনবদ্য প্রকাশ দেখি 'ভারত বিলাপে',—

ভয়ে ভয়ে যাই ভয়ে ভয়ে চাই,
গৌরাঙ্গ দেখিলে ভূতলে লুটাই,
ফুটিয়ে ফুকারি বলিতে না পাই,
এমনি সদাই হৃদয়ে ত্রাস॥

এই নির্মম পরিস্থিতির কাছে মাথা নত করতে হেমচন্দ্র শোকে-দুঃখে ভেঙ্গে পড়েছেন—কিন্তু এ ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। সাগর পেরিয়ে দেশান্তরের শত্রুরা স্বাধীনশক্তির বিক্রম প্রকাশ করেছে,—অথচ নিজ ভূমে আমরা পরবাসী। এ ভাবটি হেমচন্দ্রের কবিতায় মুখ্য হয়ে উঠেছে,—

অদূরে বাজিয়ে "রুল ব্রিটানিয়া"
শকটে শকটে মেদিনী ছাইয়া
চলেছে দাপটে ব্রীটন বাসীরা
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব আছে কোথায়!
হায়রে কপাল, ওদেরি মতন
আমরাই কেন করিতে গমন
না পারি সতেজে বলিতে আপন
যে দেশে জনম, যে দেশে বাস?

এ দুঃখ তাই সীমাহীন। দুর্বলতার রন্ধ্রপথে পরাধীনতার নাগপাশ যখন সমগ্র জাতির কণ্ঠের ভাষা, বাঁচার আনন্দ গ্রাস করেছে তখনও আমরা অচেতন। হেমচন্দ্র সম্ভবত ১৮৫৯ সালে "ভারত সঙ্গীত" রচনা করেন—উদ্বেলিত গণচেতনার সংঘবদ্ধতার আদি পর্বের আয়োজন চলছে তখন বাংলাদেশে। হেমচন্দ্রের আত্ম আবিষ্কারের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় চেতনার পূর্ণরূপ ধরা পড়েছিল। রাজশক্তির চোখে এ প্রায় অমার্জনীয় অপরাধ। কিন্তু উপলব্ধির বন্যারোধ করা যে সহজ নয়—'ভারত বিলাপে' হেমচন্দ্র সে আভাষ দিয়েছিলেন,—

ভয়ে ভয়ে লিখি কি লিখিব আর,—
নাহিলে শুনিতে এ বীণা ঝংকার
বাজিত গরজে উথলি আবার
উঠিত ভারতে ব্যথিত প্রাণ॥

ভয়ে ভয়ে তিনি যে বক্তব্য তুলে ধরেছেন—তাতেই স্বাধীনচেতনার ক্ষুব্ধ গর্জন ধ্বনিত হয়েছে। অব্যক্ত হলেও সে গর্জন অশ্রুত নয়; তার আবেদনও আমাদের মন প্রাণ অধিকার করেছে। হেমচন্দ্রের প্রথম সংস্করণে গৃহীত ও পরে বর্জিত এ অংশটুকু তাই পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারেনি। বর্জিত পাঠের প্রতি উৎসাহী পাঠক নিষিদ্ধ ফলের আকর্ষণের মতোই প্রধাবিত হন। বস্তুতঃ গ্রহণ ও বর্জনের মধ্যে কাব্যাংশটি আরও বেশী অর্থময়তা লাভ করেছে। "ভারত সঙ্গীত"—ও দ্বিতীয় সংস্করণ "কবিতাবলীতে" বর্জিত হয়েছিল। "পশুপতি সম্বাদ"—এ ব্যঙ্গ উপন্যাসিক চন্দ্রনাথ বসু আক্রমণ করেছিলেন,—"সে কবিতা এখন কোথায়? তিনি কি দুষ্ট, দুর্দান্ত, দুর্মতি, দুরভিসন্ধি, দুর্বল সাহেবের ভবে তাহা চুরি করিয়া লুকাইয়া রাখেন নাই? চুরি করিয়া না রাখিলে হেমবাবুর দ্বিতীয় সংস্কারে তাহা দেখিতে পাই না কেন?"৩৬

এ আক্রমণে উল্লিখিত বিশেষণগুলির মধ্যে নতুনত্ব আছে। অবশ্য হেমচন্দ্রকে দোষারোপ করার স্পষ্ট কোন কারণ ছিল না, তিনি যে রাজশক্তির ভয়ে ভীত নন সে প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও রাজদ্রোহিতার সাহস তাঁর ছিল না। একক শক্তি দিয়ে রাজশক্তির বিরোধিতা কল্পনাতেও হাস্যকর। জাতীয় আন্দোলনের প্রথমতম সূত্রপাত হয়েছিল হিন্দুমেলাতে। সম্মিলিত জনসমাবেশে সংঘগঠনের প্রাথমিক চেষ্টা এটি। হেমচন্দ্রের উদাত্ত স্বদেশচেতনায় সজীবতার অভাব ছিল; সাংগঠনিক মনোবৃত্তির অভাব ছিল, তাই একক যোদ্ধা উত্তেজনায় ক্লান্ত। "ভারত বিলাপে" হেমচন্দ্রের আক্ষেপ ও হতাশার পেছনে যথেষ্ট যুক্তি আছে। যে ভবিষ্যতের দিকে তিনি দৃকপাত করেছেন, সেখানে আশা পোষণের মত কোন প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া তিনি দেখেননি, কংগ্রেসের আবির্ভাব কিংবা হিন্দুমেলার উত্তেজনা তখনও কবিকে আশ্বস্ত করেনি। স্বভাবতই হতাশায় কবিচিত্ত ম্লান, - কাব্যে তারই প্রতিধ্বনি।

'ভারত সঙ্গীত' 'ভারত বিলাপের' পরই 'ভারতভিক্ষা' কবিতাটির উল্লেখ করতে হয়। অনেকের মতে এ কবিতাটিতে 'ভারতসঙ্গীত' রচনার প্রায়শ্চিত্ত করেছেন কবি। ১৮৭৫ সনের ডিসেম্বরে ভিক্টোরিয়া পুত্র প্রিনস অব ওয়েলস-এর কলিকাতা আগমন নানাদিক দিয়েই উল্লেখযোগ্য। প্রিনস রাজশক্তির প্রতীক—সুতরাং সে সময় চারণ কবিদের রীতিতে রাজবন্দনার সাড়া জেগেছিল। স্বদেশদ্রোহীরা যেমন এ অনুষ্ঠানে আনুগত্যের ভারে অবনত—স্বাদেশিকেরাও তাঁদের বিশেষ বক্তব্য নিবেদন করে এ অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য বজায় রেখেছিলেন। রাজানুগত্যের অসংখ্য দৃষ্টান্তে সে যুগের ইতিহাস মুখরিত।

৩৬. হেমচন্দ্র। ১ম খণ্ড। মন্মথনাথ ঘোষ থেকে উদ্ধৃত। ১৩২৬, পৃঃ

হেমচন্দ্রের "ভারতভিক্ষা" রচনার উদ্দেশ্য প্রথমেই জেনেছি। কবিতায় যিনি একদা বজ্রনিনাদ সৃজনে সক্ষম হয়েছিলেন—অশ্রুজলের তর্পণে সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন ভিক্ষাপাত্র হাতে। হেমচন্দ্রের রাজানুগত্যের নিদর্শন হয়ে আছে কবিতাটি। অজস্র অপবাদ ও দুর্বল মানসিকতার নিন্দা হয়েছে এ কবিতা লিখে। কিন্তু কবিতাটিতে আত্মশোধনের কোন চেষ্টা আছে বলে মনে হয়না। এতে হেমচন্দ্রের উদ্দেশ্য যতই নিন্দিত হোক না তাঁর আদর্শ লাঞ্ছিত হয়েছে বলে মনে হয় না। হেমচন্দ্র সেই দ্বিধাগ্রস্ত-ভীত রাজনৈতিক আবহাওয়ার কবি,—রাজানুগত্য প্রদর্শন না করে যাঁর কোন উপায় ছিল না। হেমচন্দ্র কবিতাকারে এই জীবন্মৃত মুহূর্তগুলির চমকপ্রদ বর্ণনা দিয়েছেন। তাঁর আদর্শ এখানে স্পষ্টোচ্চারিত, পরাধীনতার বেদনা এ কবিতারও মুখ্য বক্তব্য। ভারতমাতার কাছে যে আবেদন ব্যক্ত করেছেন, রাজপ্রশস্তির মধ্যেও তা অভিনব।

কেঁদোনা কেঁদোনা আর গো জননী
আচ্ছন্ন হইয়া শোকের ধূমে।
চিরদুঃখী তুমি, চির পরাধীনা,
পরের পালিতা আশ্রিতা সদা,
তুমি মা অভাগী অনাথা, দুর্বলা,
ভজন-পূজন-যোগ মুগধা।

কিংবা কবির আক্ষেপোক্তির নতুনত্ব।

হায়, পাণিপথ, দারুণ প্রান্তর
কেন ভাগ্য সনে হলি নে অন্তর?
কেন রে, চিতোর, তোর সুখনিশি
পোহাইল যবে, ধরণীতে মিশি
অচিহ্ন না হলি কেনরে রহিলি
জাগাতে ঘৃণিত ভারত নাম?

প্রাচীন সৌভাগ্যের মুহূর্তগুলিতেও ধিক্কার দিয়েছেন নিজেকে, আত্মগ্লানির এ এক সুন্দর নিদর্শন।

বৃটিশ শক্তির প্রতি দৃষ্টিপাতের মধ্যেও দেখি সুচিন্তিত ইতিহাসেরই বর্ণনা; —এ যেন ব্যাজস্তুতির মতো প্রশংসাচ্ছলে কূটকৌশল ও নির্মমতার চূড়ান্ত নিদর্শনের নির্ভীক বর্ণনা,—

হেলায়ে তর্জনী লইল অযোধ্যা
রাজোয়ারা যার কটাক্ষে কাঁপে,

প্রচণ্ড সিপাহী-বিপ্লবে যে বহ্নি
নিবাইল তীব্র প্রচণ্ড দাপে,
যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে
হিমগিরি হেঁট বিন্ধ্যের প্রায়
পড়িয়া যাহার চরণ-নখরে
ভারত-ভুবন আজি লুটায়—

এ কবিতাকে ইংরাজস্তুতি বললে এর মর্মসত্যকেই অবহেলা করা হয়। এ যেন অক্ষমতার, বিফলতার, নিষ্ফল পাথরে মাথা কোটার চেষ্টা। "যার ভয়ে মাথা না পারি তুলিতে"—এ ত আনুগত্যের বাণী নয়,—আত্মচেতনার আলোকে শক্তিমানের করুণ উপলব্ধি।

"ভারতসঙ্গীত", "ভারতবিলাপ", "ভারতভিক্ষায়" হেমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার স্বচ্ছতা ধারাবাহিক নিয়মে প্রকাশিত। দেশপ্রেমের গান গাওয়ার নিতান্ত ব্যক্তিগত আনন্দটুকু থেকেও বঞ্চিত হয়ে কবি হেমচন্দ্রকে রাজবন্দনার আশ্রয় নিতে হয়েছিল একথা সত্য—কিন্তু বক্তব্যের গভীরতায়, আবেদনের ভঙ্গিমায় পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। এ প্রসঙ্গে "তুষানল" কবিতাটি আলোচ্য। হেমচন্দ্রের "কবিতাবলীর" [১ম খণ্ড] তৃতীয় সংস্করণে দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত "ভারত সঙ্গীত" কবিতাটি পুনর্যোজিত হয়—'তুষানল' কবিতাটিও মুদ্রিত হয়। গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারগুলি এত অল্প সময়ের মধ্যে হয়েছে বলে ব্যাপারটির গুরুত্ব বেড়েছে। ১৮৭০ সালে কবিতাবলীর [১ম খণ্ড] মুদ্রিত হয়েছে। মাত্র ছয় বছরেই এই কাব্যগ্রন্থটির তিনটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। দেশপ্রেমের উদ্দীপনামূলক এ কবিতাগুলির আবেদন ব্যর্থ হয়নি। সাময়িকতার দাবীতে কবিতাগুলির জন্ম। সে যুগে কবিতাগুলি সমাদরও লাভ করেছিল। শেষপর্যন্ত রাজরোষ তাঁর কণ্ঠরোধ করতে পারেনি, কারণ উত্তেজনাকে আবেদনে, ভিক্ষায় রূপান্তরিত করে হেমচন্দ্র রাজশক্তির সঙ্গে আপোষ রক্ষা করেছিলেন, এ ছাড়া দেশপ্রেমের আবেদনমূলক কবিতা রচনার কোন সুযোগ তাঁর ছিল না। কবিচিত্তের দুর্বলতা বলেও যদি এ বিনতিকে সমালোচনা করি—তবু বলা যায়, অক্ষম আক্রোশে নির্বাক না হয়ে তিনি যে তাঁর দীনতাকে উচ্চরবে প্রকাশ করেছেন—এতে তাঁর আদর্শচ্যুতি ঘটেনি। যে দুর্বলতা সমগ্র জাতির জীবনে প্রকাশিত—হেমচন্দ্রের কবিতায় তার ক্রমবিকাশ পর্বে পর্বে ধরা পড়েছে। 'ভারত সঙ্গীতের' বজ্রনিনাদ রাজশক্তির শাসনে চিরতরে স্তব্ধ হয়ে যেতই,—'ভারতবিলাপে', 'ভারত ভিক্ষায়' অন্ততঃ দুঃখপ্রকাশের পথ আবিষ্কৃত হয়েছে।

হেমচন্দ্র 'তুষানল' ও 'ভারত সঙ্গীত' পৃথকভাবে প্রকাশ করে বিতরণ করেছিলেন

পরিচিত অন্তরঙ্গ মহলে। "তুষানলের" আগুনে কবির অন্তর দগ্ধ—ভস্মীভূত কিন্তু মুক্তির কোন প্রত্যাশা সুদূরপরাহত। "তুষানলে" দুঃখিনী ভারতমাতার কাতর আর্তি শোনা যায়।

"আজি বসুন্ধরা হাসিছে হরষে
ভাসিছে আনন্দে ভারতভূমি
কি শোক-হুতাশে বসিয়া একাকী
বিরলে এখানে কাঁদিছ তুমি?
"বাছা এ দুখিনী ভারত জননী"
বলিল অমৃত মধুর বোলে,
বাঁচাও আমারে আর নাহি পারি
সহিতে যাতনা হৃদয় ফাটে;

মুমূর্ষু ভারতজননীর কাতর বিলাপোক্তি এ কবিতার বিষয়বস্তু হলেও কবি কোন অভ্রান্ত আদর্শের কথা এ কবিতায় ব্যক্ত করেননি। ভবিষ্যতের কোন আশ্বাসই ভারত জননীর বিলাপকে প্রশমিত করেনি—'তুষানলের' অগ্নিতে দগ্ধচিত্ত কবি শুধু সখেদে বলেছেন,

"ভারত ভূমিতে জননী যন্ত্রণা
অন্তরে ভাবনা কিসে ঘুচাই॥

জন্মভূমির দুর্দশাটি ব্যক্ত করে এবং উপলব্ধিগম্য সত্যরূপে তা অনুভব করার একটা চেষ্টাই এখানে লক্ষ্য করি। কোন বৈপ্লবিক চিন্তা কবিকে উল্কার গতি দেয়নি—কবি তাই নির্জীব—বেদনাবোধে অনড়।

হেমচন্দ্রের বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমের কবিতাগুলির আলোচনা থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয়েছে যে, সে যুগে পরাধীনতার গ্লানির কথা, দেশের দুর্দশার কথা, ছন্দোবদ্ধ গীতি-কবিতাকারে প্রকাশ করাই একটা প্রচণ্ড দুঃসাহসিকতারই নামান্তর ছিল। "ভারত সঙ্গীতের" কোথাও কোথাও আহ্বান বাণী যখন প্রায় গর্জনে পরিণত হয়েছে তখনই কবিকণ্ঠকে থামিয়ে দেবার পরোক্ষ আদেশ এসেছে প্রকাশকের ওপর। প্রকাশক থেকে লেখকের লেখনীর ওপর আদেশের খড়্গ ঝুলিয়ে রেখে যে কঠিন অতন্দ্র পাহারার ব্যবস্থা করা হোলো—তার মধ্যে কবিকণ্ঠ শুধু ক্রন্দন করতে পারে, গর্জন করতে পারে না। তাই দেখি, হেমচন্দ্রের রুদ্ধকণ্ঠের বেদনা কবিতার স্তরে স্তরে উৎসারিত। কখনো বিলাপে, কখনো আবেগে, দেশপ্রেমের স্বতোৎসারিত ভাবকে তিনি ভাষায় বন্দী করেছেন। পাঠকের সঙ্গে হেমচন্দ্রের আসল বক্তব্যের সরাসরি সংযোগ তাই দুঃসাধ্য। বিশুদ্ধ স্বদেশচেতনাজাত কবিতা হিসাবে যে কবিতাকে

চিহ্নিত করা হোলো, সে কবিতাও কবিচিত্তের স্বতস্ফূর্ত আবেগকে রূপায়িত করেনি। যা বলা হয়নি, যেই অনুক্ত, অশ্রুত, বন্দিনী ভাষার কান্না হেমচন্দ্রের এ কবিতাগুলিকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

ভারত-নামাঙ্কিত বিশুদ্ধ স্বদেশভাবনাজাত কবিতাগুলি ছাড়াও কয়েকটি কবিতায় কবি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশের মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমকেই তুলে ধরেছেন। "গঙ্গা" কবিতাটি এর সুন্দর দৃষ্টান্ত। স্বাধীনতাহীন, শক্তিহীন, নির্জীব বাঙ্গালীদের কবি ভৎর্সনা করেছেন—

বাঙ্গালায় প্রাণী নাই,
প্রাণিদেহে প্রাণ নাই,
অস্থি নাই, শিরা নাই,
মেদ নাই, মজ্জা নাই
অন্তঃহীন চিন্তাহীন,
স্বাদাহ্লাদ—দার্ঢ্যহীন
জীবন-সঙ্গীত-হীন নর-নারী বঙ্গে
সেখানে চলেছ কোথা এ আহ্লাদে গঙ্গে ?

আত্মসমালোচনা—আত্মজাগরণের একটি বলিষ্ঠ মাধ্যম। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই স্বদেশসম্পর্কিত কবিতাবলীর একটি বৃহৎ অংশে আত্মসমালোচনা ও নিষ্ঠুর বিদ্রূপাঘাত লক্ষ্য করা যায়, "গঙ্গা" কবিতাটি তার প্রমাণ। সে যুগের কোন কোন কবি ও সাহিত্যিক নিছক বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গকেই ভাবপ্রকাশের জোরালো মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বস্তুতঃ আত্মজাগরণের মুহূর্তে উপায় বড়ো হয়ে ওঠেনি কিন্তু উদ্দেশ্যের সার্থকতার প্রতি সকলেরই লক্ষ্য ছিল। অন্যান্য কবিতা প্রসঙ্গে দেখা যাবে হেমচন্দ্রও ব্যঙ্গাশ্রয়ী স্বদেশপ্রেমের কবিতা রচনা করেছেন। "গঙ্গাকে" ঠিক ব্যঙ্গাত্মক স্বদেশী কবিতা বলা চলে না। এ আঘাত এ সত্য ও প্রত্যক্ষ। তাই পরবর্তী অংশে কবি পতিতোদ্ধারিনী গঙ্গাকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,—

উদ্ধার বঙ্গেরে মাতা
শিখাইয়া এই কথা
ত্যজ স্বার্থ আরাধনা
সাধুক নিজ-সাধনা
বঙ্গের চিন্তার ধারা
ঘুচুক চিত্তের কারা
উদ্ধার-উদ্ধার, ওগো, জীব দিয়া বঙ্গে !

এ অংশে কবির একান্ত কামনা "ঘুচুক চিত্তের কারা"। মুক্তি আন্দোলনের ভিত্তি ভূমি আমাদের চিত্তের কারামুক্তির সঙ্গে যুক্ত—সে যুগের দেশসাধকের কাছে এ সত্য সর্বাগ্রে ধরা পড়েছে।

"ইউরোপ এবং আসিয়া" কবিতাতেও কবির আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে। আত্ম-মুক্তির আকাঙ্ক্ষাই যে একদিন দেশমুক্তির আকুতিতে রূপান্তরিত হবে এ উপলব্ধিই কবিকে শান্তি দিতে পারে। জড়চিত্তের জাগরণের সঙ্গে বাধাবন্ধহীন ঝরণাধারার অভিযানের প্রসঙ্গ মনে পড়ে। গিরিপর্বত সম জড়ত্বকে দূরে সরিয়ে বাঙ্গালী জেগে উঠুক, এই তার কামনা। সম্মুখে সাগরের কলধ্বনি, দুর্বার নদী নিজেই শুনতে পাবে। বাঙ্গালীর স্বতঃসিদ্ধ দুর্বলতাকে কবি তাই নিন্দা না করে পারেননি।

তোমাদের দিবা সন্ধ্যা প্রাতঃকাল রজনী
সকলি সমান জ্ঞান!
আছে কি না আছে প্রাণ,
অন্ধ অথর্বের প্রায়
ডাক খালি বিধাতায়,
বলিলে অদৃষ্টে দোষি তুষ্ট হবে তখনি?

* * * *

সকলি দিয়াছে বিধি অভাব যা কেবলি
আমাদেরি হৃদিতলে
সে স্রোত নাহিক চলে .
আশ্রয় করিয়া যায়
পাশ্চাত্ত্য আগুয়ে ধায়—
বাঁচিতে মরিতে, হায়, জানি নারে কেবলি!

দেশপ্রেমের শক্তিই কবিকে জাতিগত দৌর্বল্যের সমালোচনায় প্রণোদিত করেছে। সেযুগে অতীতচর্চা ও বর্তমান সমালোচনা সাহিত্যের একটি পরিচিত ভঙ্গী। ব্যঙ্গ ও নিন্দার চাবুকে এ জাতিকে প্রায় বিধ্বস্ত করে ফেলেছিলেন সে যুগের একদল দেশহিতৈষী। ব্যঙ্গলেখক হিসেবেই আবির্ভূত হয়েছেন, ব্যঙ্গকেই উপজীব্য করে সাহিত্য সৃষ্টি করে গেছেন আজীবন এমন লেখকেরও আবির্ভাব হয়েছে এযুগেই। ঈশ্বরগুপ্ত এ পথের দিশারী; তাঁর স্বদেশপ্রাণতার মূলে রয়েছে স্বসমাজপ্রীতি ও সমাজবিরোধীদের প্রতি কটাক্ষপাত। হেমচন্দ্রও সমাজ সমালোচনা করেছেন—কিন্তু এখানেও স্বদেশপ্রীতির প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়। বর্তমান ভারতের শক্তিহীনতা-বীর্যশূন্যতা দেখে কবি দুঃখিত, চিত্তের শক্তিবৃদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়েই এ ধরণের কবিতা

রচনা করেছেন। সে যুগের সামাজিক পরিবর্তনগুলি কবির সমালোচনার বিষয় নয় —কিন্তু সেযুগের মানুষের চারিত্রিক দুর্বলতা ও জড়ত্ব কবির রূঢ় সমালোচনার উৎস। হেমচন্দ্র যেমন অতীত মুগ্ধতায় মগ্ন তেমনি কঠোর বাস্তবের শ্রীহীনতায় চমকিত। দুটি অবস্থার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারেন নি বলেই তাঁর বেদনা—তাঁর হতাশা। ব্যঙ্গের মূলেও এই বেদনাই সক্রিয়। "কুহুস্বর" কবিতাটি নিছক আত্মভাবনার বাহক হয়েও কবির স্বদেশপ্রাণতারই নামান্তর হয়েছে। কবি ভাব থেকে ভাবান্তরে নয়, যেকোন একটি বাস্তব রূপকে অবলম্বন করেই তাঁর আক্ষেপ ও হতাশার জগতে উত্তরণ করে থাকেন। এ ধরণের কবিতাগুলিতে কবির ভাবতন্ময়তা ও দেশচিন্তা ওতপ্রোত হয়ে আছে। "পদ্মের মৃণাল" শুধু অবলম্বন—এ থেকে হতাশার উদ্দীপনা যে জাগাতে পেরেছেন—তা শুধু ভারত চিন্তায় কবি প্রায় বাহ্যজ্ঞানশূন্য বলেই। 'কুহুস্বর' ও 'পদ্মের মৃণাল'-কে তাই বিশুদ্ধ স্বদেশচিন্তার কবিতা বলেই মেনে নিতে হয়। কবি যে তাঁর বিশিষ্ট দেশ ভাবনাকেই প্রকাশ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তা কবিতাগুলির কয়েক ছত্র পড়েই ধরে ফেলা যায়। 'কুহুস্বরের' অংশটি লক্ষ্যণীয়,—

নাহি কি এ বঙ্গে হেন কোন প্রাণী হায়।
সঞ্চারি আশার লতা শুনায় অমনি কথা?
অমনি নিগূঢ় ভাবে?—নাহি কি অমন
হৃদয়-খেপানো কথা কাহার [ও] গোপন।

'হৃদয় খেপানো' কথাগুচ্ছটি হয়ত অতি সাধারণ কবিত্ববর্জিত দুটি শব্দ কিন্তু বোঝাই যায় কবি এখানে একটি উচ্চ আদর্শের আশায় অধীর। সাহিত্যে উত্তেজনা সঞ্চারের অক্ষমতায় তিনি ম্লান। সজীবতা ও প্রাণচঞ্চল্য সৃজনের যুগ এসেছে শুধু স্রষ্টা অনাগত।

অসার নিঃস্রোত এই বঙ্গের হৃদয়!
হাসিতে কাঁদিতে প্রাণে গভীরতা নাহি জানে,
না জানে উৎসাহ বানে প্রাণের প্রলয়।
জগৎ-ভাসানো বেগ বঙ্গেতে কোথায়? [কুহুস্বর]

কিন্তু বজ্রনির্ঘোষের আকুলতায় অধীর হলেও রাজরোষের উদ্যত আক্রমণ থেকে তিনিও আত্মরক্ষা করতে পারেন নি।

'পদ্মের মৃণালে'ও কবিচিত্তের একই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পদ্মহীন মৃণালের মত শক্তিহীন এ জাতিকে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন—এই অগৌরবের বেদনায় তিনি ভাব প্রকাশের পথ খুঁজে পান,—

আজি এ ভারতে হায়, কেন হাহাধ্বনি।
কলঙ্ক লিখিতে যার কাঁদিছে লেখনী।

তরঙ্গে তরঙ্গে নত পদ্মমৃণালের মত
পড়িয়া পরের পায় লুটায় ধরণী।
আজি এ ভারতে কেন হাহাকার ধ্বনি।

হেমচন্দ্রের খণ্ড কবিতায় উজ্জ্বল স্বদেশচিন্তার এমন অসংখ্য দৃষ্টান্ত এক যুগের রসিক ও জাগরোন্মুখ মানুষের চিত্ত জয় করেছিল। কাব্যবিচারের মানদণ্ড দিয়ে এ সব স্বদেশপ্রেমের কবিতার বিচার হয়ত চলে না। চিরন্তনত্ব দাবী না করেও জনচিত্ত জয়ের ক্ষমতা এসব কবিতার আছে। পরাধীনতার গ্লানিতে সমগ্র মানুষ যখন আকণ্ঠ মগ্ন—সে যুগের সামনে আশার বাণী, নির্ভরতার সংগীত নিবেদন করে তাঁরা শাশ্বত বাণী নয়, —সংগত সংগীত অন্ততঃ শোনাতে পেরেছেন; এ কৃতিত্ব বড়ো কম নয়। হেমচন্দ্রের আন্তরিকতায় অশ্রুজলে দেশপ্রেমের উপলব্ধিগুলি কবিতাকারে প্রকাশিত হয়েছিল বলে এ যুগের সমালোচকেরা আক্ষেপ করে থাকেন। চিরন্তনত্ব নেই বলেই এই অমূল্য সৃষ্টিকে সনাতন আদর্শের মাপকাঠিতে বিচার করা সঙ্গত নয়। সে বিচারে উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র সাহিত্যই বা কতটুকু গৌরব দাবী করতে পারে?

স্বদেশপ্রেমের উত্তাল ঢেউ এসে একদিন আমাদের ব্যক্তিগত-আত্মনিষ্ঠ সমস্ত চিন্তাগুলিকেই বিপর্যস্ত করেছিল—সেটা বোধ হয় এ জাতির গর্ব করে বলার মতই একটি সংবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তাবাদী কবিরা এ ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন—এ যুগ তাঁদের অমূল্য চিন্তায়-আন্তরিকতায় প্রকাশিত। ঈশ্বরগুপ্ত থেকে নবীনচন্দ্র পর্যন্ত উনবিংশ শতাব্দীর কবিরা অন্ততঃ কাব্য সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ ইতিহাসের স্রষ্টা। হেমচন্দ্র এ যুগের জাতীয় কবি। বিংশ শতাব্দীর রক্তাক্ত বিপ্লবেরও বহু আগে, ঐক্যবদ্ধ হওয়ারও বহু আগে হেমচন্দ্র তাঁর স্বদেশপ্রেমের এই খণ্ড কবিতাগুলিতে আত্মগঠনের উপদেশ দিয়েছেন। 'জীবন সংগীত' হেমচন্দ্রের দৃষ্টিতে বলিষ্ঠ আত্মদানের সংগীত—জীবন-পণের সংগীত।

কর যুদ্ধ বীর্যবান যায় যাবে যাক প্রাণ—
মহিমাই জগতে দুর্লভ।

ভাবনাহীন-দুর্বলচিত্ত-পরশাসনে অভ্যস্ত এ জাতির জন্য তাঁরা আজীবন চিন্তা ব্যয় করেছেন,—দুঃখবোধ করেছেন,—স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনা করেছেন,—একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এইসব জাতিচরিত্রসংগঠক দেশহিতৈষী স্রষ্টাদের সৃষ্টিকে বিচার করতে হবে। সাহিত্য বিচারের মাপযন্ত্রে এ কবিদের হৃদয়োত্তাপের সংবাদ না মেলে যদি—সেই সমালোচনাকেই অভ্রান্ত বলে মানতে পারি না। ঐক্যবোধের নতুন প্রেরণা সঞ্চারে হেমচন্দ্রের দান কম নয়। "দেবনিদ্রা" কবিতায় কবি ঐক্যের জয়গান শুনিয়েছেন,—

এ মর্ত্যপুরীতে সেই ধন্য জাতি
একতার জ্যোতি বদনেতে ভাতি,
তেজোগর্ব ধরি থাকে নিজ বাসে,
হেরে পুত্র দারা প্রাণের হরষে
হাসিতে কাঁদিতে করে না ভয়,
করে না কখন পাদ্যঅর্ঘ দান,
পরপদতলে হয়ে ম্রিয়মাণ,
কৃতাঞ্জলি ভারে, ভীরুতার স্বরে,
বলে না কখন ঘাতকে জয়।

হেমচন্দ্রের মনোদর্পণে ভবিষ্যতের এই অতি মূল্যবান চিন্তা ও আত্মশক্তি উদ্বোধনের মন্ত্রটি ধরা পাড়েছে,—'দেবনিদ্রায়' সেই চিত্রটি পাই। এ চিন্তায় অভিনবত্ব আছে,—বৈশিষ্ট্য আছে, কাব্যে এই সঙ্ঘশক্তির বাণী-ঐক্যের মহিমা হেমচন্দ্রপূর্ব কাব্যসাহিত্যের কোথাও মিলবে না।

অতীতমহিমা উপলব্ধিতে হেমচন্দ্র সেযুগীয় ধারারই অনুসরণ করেছেন। রঙ্গলালের অতীতচর্চা ইতিহাসাশ্রিত ও সত্যনির্ভর। হেমচন্দ্র আর্যমহিমার গৌরব উপলব্ধির জন্য ইতিহাস অতিক্রম করে সুদূর পৌরাণিক যুগের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। আর্যসংস্কৃতির সমৃদ্ধময় যুগে কবি বিচরণ করেছেন, অসংখ্য কবিতায় সে মুগ্ধতার কথা সোচ্চারে ব্যক্ত করেছেন।

দেশচিন্তার বিশিষ্টতাই এই যে, তা দেশের অতীত মহিমা স্মরণে সর্বদাই পুলকিত হয়। হেমচন্দ্র যে অতীতপ্রেমী হয়ে উঠেছিলেন তা শুধু বর্তমানের জ্বালা ও দৈন্যের হাত থেকে ক্ষণিক মুক্তি পাওয়ার লোভেই। অতীতগরিমায় যে কোন দেশপ্রেমীই আন্দোলিত না হয়ে পারেন না—অথচ ঐতিহ্যধারণ করার শক্তি হারিয়ে আমরা পৃথিবীর সামনে উপহসিত ও লাঞ্ছিত জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়েছি, হেমচন্দ্রের কবিতায় এ বেদনা শত ধারায় নির্গত হয়েছে। ভারতপ্রেমই কবিকে অতীত ইতিহাস সন্ধানী করে তুলেছে। তাঁর "বীরবাহু কাব্য" অনৈতিহাসিক ও অলীক কল্পনা হলেও অতীতপ্রেমই কবিকে এ কাব্য রচনায় প্রেরণা দিয়েছিল। ভারতবর্ষের অধুনাতন পতনের ও দুর্দশার প্রত্যক্ষ পরিচয় কবির ছিল তবু তিনিই সাহস ভরে তাদের সামনে আদর্শের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন। দেশপ্রেম সৃজনের নানা উপায় আমরা নানা কবির চেষ্টার বিভিন্নতা দেখেই বুঝেছি—কিন্তু অতীত স্মৃতি যে বর্তমানের মানুষের চেতনাবিকাশের একটি শক্তিশালী মাধ্যম—এ বিশ্বাস ও উপলব্ধি হেমচন্দ্রের। "কবিতাবলীর" অসংখ্য কবিতায় অতীত দৃষ্টান্ত তুলে ধরার বিন্দুমাত্র সুযোগ

পেলেই কবি তা ব্যবহার করেছেন। অবশ্য অতীত ভারতের গরিমার প্রসঙ্গ এসেছে শক্তি ও বীর্যবত্তার কথায়—যা অতীত ভারতবাসীদের ছিল এবং বর্তমান ভারতবাসীরা যা হারিয়েছে। নিতান্তই গতানুগতিক ও বহুব্যবহৃত দৃষ্টান্ত হেমচন্দ্রের নানা কবিতায় ঘুরে ফিরে এসেছে। এসব দৃষ্টান্ত প্রকাশে কবিচিত্ত সর্বদাই যে উচ্ছ্বাস ও আনন্দে ভরপুর হয়ে উঠেছে তা নয়—বরং নিষ্ঠুর বর্তমানের গ্লানি কবিকে খানিকটা ম্লান করেছে। "ভারত বিলাপ" কবিতায় বিলাপাকারে তিনি অতীত ভারতবন্দনা করেছেন,—

যখন ক্ষত্রিয় অতীত সাহসে,
ধাইত সমরে মাতি বীররসে,
হিমালয় চূড়া গগন পরশে
গাইত যখন ভারত-নাম।
ভারতবাসীরা প্রতি ঘরে ঘরে
গাইত যখন স্বাধীন অন্তরে
স্বদেশ-মহিমা পুলকিত স্বরে
জগতে ভারত অতুলধাম॥

পৌরাণিক মহিমার সঙ্গে ঐতিহাসিক সত্যের সংযোগ কিছুমাত্র না থাকলেও ঐতিহ্যবোধ সর্বদা ইতিহাসনির্ভর নয়। তাই পুরাণের ও শাস্ত্রের অজস্র দৃষ্টান্তের সঙ্গে সহজেই আমরা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠি—ক্ষত্রিয়ের মহিমা আমাদেরই একান্ত নিজস্ব গর্ববোধের সামগ্রী বলে মনে করি কিন্তু এর পেছনে কোন যুক্তি নেই। স্বাধীনতাবোধই অতীত নিষ্ঠার জন্ম দিয়েছে—তাই দৃষ্টান্তের খুঁটিনাটি ইতিহাস তুলে ধরার কোন চেষ্টা নেই—শুধু বুদ্ধি-বীর্য ও শক্তির কথাই কবি উল্লেখ করেন—'পদ্মের মৃণাল" কবিতায়,

বুদ্ধি বীর্য বাহুবলে স্বধন্য জগতী তলে,
ছিল যারা আজি তারা অসার তেমনি।

ভারতবাসীর দেশপ্রেমের উল্লেখযোগ্য ইতিহাস সব যুগেই ছিল। দেশপ্রীতি কাব্যাকারে প্রকাশের বস্তু হয়ে উঠেনি হয়ত কিন্তু দেশপ্রেম যে সহজাত একটি অনুভূতি তাত স্বীকৃত। যে দেশপ্রীতি অন্তঃসলিলা উপলব্ধিমাত্র দেশের দুর্দিনে সেইটিই প্রকাশ্য বক্তব্যে পরিণত হয়েছে। হেমচন্দ্রের যুগে দেশের দুর্দিনের সংবাদ সর্বজনবোধগম্য একটি বিশিষ্ট চিন্তায় পরিণত হয়েছিলো বলেই অতীত ইতিহাসের তুচ্ছতম সংবাদই কবিতার বিষয় হতে পেরেছে। আর্য ঐতিহ্যের উল্লেখে ভারতবাসীর চিত্তে যে উত্তেজনা সঞ্চার সম্ভব হেমচন্দ্রের কবিতায় সে সত্য ধরা পড়েছিল। "ভারত সঙ্গীতের" একটি অংশে কবি বলেছেন ধিক্কারের সঙ্গে,—

বিংশতি কোটি মানবের বাস
এ ভারত ভূমি যবনের দাস ?
রয়েছে পড়িয়া শৃংখলে বাঁধা !
আর্যাবর্তজয়ী পুরুষ যাহারা
সেই বংশোদ্ভব জাতি কি ইহারা ?

* * *

ধিক্ হিন্দুকুলে ! বীর ধর্ম ভুলে,
আত্মঅভিমান ডুবায়ে সলিলে,
দিয়াছে সঁপিয়া শত্রু করতলে
সোনার ভারত করিতে ছার ।

এ ধিক্কার আত্মবোধ জাগিয়ে তোলে নিশ্চয়ই। "ভারতসংগীতের" মধ্যে হিন্দু-মহিমার প্রতিষ্ঠা চেয়েছিলেন কবি কিন্তু যবনলাঞ্ছিত ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার স্থযোগ কোথাও ছিলনা। ভারতবর্ষের প্রামাণ্য ইতিহাস জুড়ে এই আছে বিদেশী শাসকের কাহিনীতে—তাঁদের কাছে হিন্দু গৌরবের অর্থ ছিলনা। কিন্তু এখানে যবন ইংরাজ—এবং এ যুগের কাছে লুপ্তপ্রায় ও নিস্তেজ অতল অতীতের স্মৃতি মন্থন করেছেন হেমচন্দ্র।

"হয়েছে শ্মশান এ ভারত ভূমি।"—বলে হেমচন্দ্র যখন আক্ষেপ করেন তখন বুঝে নিতে হবে স্মরণাতীত কাল থেকেই ভারতের এই শ্মশানদৃশ্য ভয়াবহরূপে সত্য হয়ে উঠেছিলো—কিন্তু তা কখনও আক্ষেপের বা বিলাপের বস্তু হয়ে উঠেনি। উনবিংশ শতাব্দীতেই কোন কোন স্পর্শকাতর মানুষের কাছে ভারতের এই বিভীষিকাময় রূপটি ধরা পড়েছিলো।

ব্যঙ্গ কবিতায় হেমচন্দ্রের দক্ষতা সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছে,—সুতরাং এ আলোচনায় অসুবিধা কম। প্রথমতঃ ব্যঙ্গ কবিতার রকমফের নিয়ে ধরাবাঁধা আলোচনা ইতিপূর্বেই হয়েছে। বাংলা কবিতায় ব্যঙ্গের ব্যবহার ইতিপূর্বেই হয়েছে,—হেমচন্দ্রও সমসাময়িক জীবনযাত্রার খুঁটিনাটি নিয়ে অসংখ্য ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করেছেন। কিন্তু যেসব ব্যঙ্গ কবিতার প্রেরণা নিঃসন্দেহে সমাজকল্যাণ কিংবা আত্মউদ্বোধন সেসব কবিতাই হেমচন্দ্রের স্বদেশচেতনার পরিচয়বাহী। স্বাধীনচিন্তাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করার অধিকার যেখানে লাঞ্ছিত ব্যঙ্গের সুতীক্ষ্ণ শরনিক্ষেপের তির্যক ভঙ্গীতে সে ক্ষোভ খানিকটা মিটিয়ে নেওয়া যায়। হেমচন্দ্র অবশ্যই সে সুযোগ গ্রহণ করেছেন। ব্যঙ্গ কবিতায় স্বদেশাত্মক অনুভূতিগুলি যেন উৎসারিত হয়েছে নির্ঝরিনীর মতই স্বচ্ছন্দগতিতে। কিন্তু ব্যঙ্গ কবিতা রচনার আগে তাঁর

স্বদেশাত্মক কবিতাগুলিতে শুধু বিলাপধ্বনি ও অসহায় ক্রন্দনই মুখ্য হয়ে উঠেছিলো—তাতে আবেগ ছিল কিন্তু ছিল না স্বচ্ছন্দতা। কবি এবার যেন মুক্তি পেলেন পুরোপুরি ভাবে। ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ কবিকে যে অস্বস্তি এনে দিয়েছিলো—তার হাত থেকে এ যেন তাঁর আকাঙ্ক্ষিত পলায়ন। আড়ষ্ট কাব্যভঙ্গীকে আশ্রয় করে কবিচিত্ত স্বাচ্ছন্দ্য হারাতে বাধ্য - যেমন মৃত পাদপ কোন সজীব স্বর্ণলতিকার বাহন হতে পারে নি কোনদিন। হেমচন্দ্রের বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমাত্মক কবিতার মধ্যে বক্তব্যের সমুদ্রকল্লোল যেন স্তব্ধ হয়েছিল—ব্যঙ্গ কবিতায় আবেদন ও বক্তব্যে মোটামুটি রসসম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে। হেমচন্দ্রের কবি-প্রতিভার মধ্যে শক্তির দীনতা নেই—কিন্তু স্বচ্ছন্দতার অভাব আছে। জীবনউপলব্ধ মৌলিক অনুভূতিগুলি যেন কবিতায় নিষ্প্রাণ উচ্চারণমাত্র হয়েছে, সংগীতধর্মিতা লাভ করেনি। অথচ আত্মগত ভাবের অবাধ-অকুণ্ঠ প্রকাশের জন্য যে কবিচিত্তে আকুলতা ছিলো সে সত্য অস্বীকার করা যায় না। অন্ততঃ স্বদেশপ্রেমচেতনার মৌলিক উপলব্ধিগুলির মধ্যে যে বলিষ্ঠতা, আন্তরিকতা ও আবেগধর্মিতা ছিলো তা ত সত্য। অথচ তা সার্থক সৃষ্টি হয়ে ওঠেনি। ব্যঙ্গ কবিতায় বিষাদ ও বৈরাগ্যের হাত থেকে মুক্তি পেয়ে কবি যেন আত্মস্থ হলেন।

ব্যঙ্গ কবিতায় হেমচন্দ্রের বিষয় নির্বাচন গতানুগতিক; পূর্বসূরীদের মতো সে যুগীয় উন্মাদনাই কবিতার বস্তু হয়ে উঠেছিলো—তাতে তির্যক ভঙ্গিমার রস মিশিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে মাত্র। হেমচন্দ্রের "বিবিধ রচনা" কাব্য পুস্তিকায় যে ব্যঙ্গ কবিতার সংকলন করা হয়েছে—মুখ্যতঃ সেগুলি তৎকালীন নানা পত্র পত্রিকায় নানা উত্তেজনামূলক ঘটনাবলম্বনে রচিত। কবিতাগুলির মধ্যে হেমচন্দ্র বেশ সজীবতা প্রকাশ করেছিলেন,—রসসৃষ্টির দৈন্য সেখানে কম ছিলো বলে মনে হয়। সে যুগের অস্থিরতা, উন্মাদনা ও চাঞ্চল্যের মাদকতায় কবিও যোগ দিয়েছিলেন।—প্রতিটি কবিতার সূচনায় আছে সেযুগীয় কোন না কোন ঘটনার ছায়াপাত। কিন্তু ঘটনার নিছক বিবরণই কবিতা নয়,—এখানে দেশপ্রেমের প্রেরণাই কবিকে আত্মসমালোচনার শক্তি এনে দিয়েছে। হেমচন্দ্র জানেন আত্মদৈন্যের কথা,—জাতীয় চরিত্রের দুর্বলতার কথা। দেশপ্রেমমূলক কবিতায় আত্মনিন্দার আধিক্য বড়ো কম নয়,—কারণ প্রশংসা দাবী করার মত কোন যুক্তি বা দৃষ্টান্তের অভাব সর্বজনবিদিত। আত্মশক্তির হীনতা দিয়ে যে পরাধীনতার বীজ এদেশে রোপণ করা হয়েছিলো আত্মসমালোচনার গঙ্গাজলেই তাকে পবিত্র করে নিতে হবে। দেশপ্রেমী কবিরা তাই আত্মসমালোচনা করেই মগ্ন চৈতন্যের বন্ধ দুয়ারে করাঘাত করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে-প্রবন্ধে-সমালোচনায় এই আদর্শটি গ্রহণ করেছিলেন। হেমচন্দ্র অবশ্য অতীত প্রশংসায় মুখর

ছিলেন,—আত্মসমালোচনার অবাধ সুযোগ পেলেন ব্যঙ্গ কবিতার মাধ্যমে। আত্ম-সমালোচনা তীব্রতর হয়েছে যখন আমাদের ক্লীবত্ব, জড়ত্বকে অন্যের সাহসিকতা ও ক্ষমতার সঙ্গে তুলনা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বিদেশীদের শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন কবি। এতে তাঁর চিন্তাশক্তির উদারতাই লক্ষ্যণীয়। দেশপ্রেমের আদর্শই এ আত্মনিন্দার মূলে বিরাজমান। সুতরাং হেমচন্দ্র দেশাত্মবোধের ভারে ভারসাম্যহীন হয়ে পড়েননি—সেযুগের সমাজ সংস্কারক মনীষীদের মত পরপ্রশংসা ও আত্মনিন্দাকে উচ্চকণ্ঠে প্রকাশ করে তিনি তাঁর শক্তি ও নির্ভীকতারই পরিচয় দিয়েছেন। ইংরেজ বন্দনা স্বদেশপ্রীতির পরিচয় নয়, এ নিয়মে কাব্য বিচার হয়েছে বটে কিন্তু বলিষ্ঠ স্বাদেশিকতাই ইংরেজ বন্দনার ছদ্মবেশে আত্মজাগরণের পরোক্ষ প্রেরণা দান করে—সে সত্য তলিয়ে বিচার করা হয়নি। হেমচন্দ্র জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষের উক্তিটি এ ব্যাপারে গ্রহণযোগ্য,—"ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেম যে গভীর সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনো কারণ নাই, কিন্তু স্বদেশের কুকুরদিগকে মধ্যে মধ্যে কশাঘাত করিয়াছেন এবং বিদেশের মহাত্মগণকে শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়া শিক্ষিত হেমচন্দ্রের স্বদেশবাৎসল্য বা স্বজাতিপ্রেম যে ঈশ্বরগুপ্তের স্বদেশপ্রেম হইতে নিকৃষ্ট এরূপ অনুমান করা একান্ত অনুচিত।" [পৃঃ ২৩৮, হেমচন্দ্র, দ্বিতীয় খণ্ড, মন্মথনাথ ঘোষ]

হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির বিচিত্র ও সার্থক প্রকাশ হয়েছে ব্যঙ্গ কবিতায়। কবি এখানে সংস্কারমুক্ত প্রগতিবাদী, ভবিষ্যৎদ্রষ্টা। অমৃতবাজারে প্রকাশিত "খিদিরপুর দাঁত ভাঙ্গা কাব্যে" কবির আত্মদর্শনের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে পাঠকের। ছদ্মনামী কবির কবির পরিচয় সেখানে খোগলা চন্দ্র বন্দীয়ান। উপাধিটি বহু করুণস্মৃতির কথা মনে করিয়ে দেয়—বাস্তবিকই এ কবি যেন বন্দীয়ান—এ শৃঙ্খল যেন কবিকে তাড়িত করেছে কাব্যজীবনে। "পলাশী যুদ্ধের" স্মৃতি ব্যঙ্গাকারে ব্যক্ত ;—হাস্যকর স্বাধীনতা পাওয়ার চেষ্টার বিরুদ্ধে কবির নির্মম ব্যঙ্গ,—

"পলাশী পাদুকা ভুলে উঠানে পতাকা তুলে
ভারত উদ্ধার করে হায়।"

কারণ সত্যিকারের মুক্তির পথ যে কত সাধনা ও আয়াসসাধ্য সে সম্বন্ধে জাতি অচেতন। বাঙ্গালীর শক্তির পরিচয় দিচ্ছেন কবি।

বাঙ্গালি অপূর্ব জাতি বিষম বুকের ছাতি
সাহসে সম্বাদ পত্র লেখে,
মল্লভূমি মুদ্রালয় একাকী অকুতোভয়
কল্পনায় কত যুদ্ধ দেখে।

নিছক হাস্যরসের কবিতা হিসেবে মুদ্রিত হলেও সচেতন সমালোচনার সূক্ষ্ম কৌশল

দৃষ্টি এড়ায় না। অবশ্য স্বদেশপ্রেমিকতার এই পরিচিত ভঙ্গিটি সে যুগের বহু কবিরই আয়ত্ত।

এ ধরণের হাস্যরস কিন্তু রসিকতার নামান্তর না হয়ে গুরুভার আত্মদর্শনেই পর্যবসিত হয়েছে অবশেষে। অথচ কবি যেন ধরাছোঁয়ার উর্ধ্বে অবস্থান করছেন। 'বাজীমাতে' নিছক সংস্কারাকীর্ণ মনেরই উত্তেজিত উক্তি রয়েছে, অথচ নারীপ্রগতির বিরোধিতা করা যে কবির আন্তরিক উদ্দেশ্য নয় অন্য কবিতাতে সে সত্য প্রতিফলিত। এধরণের হালকা চালের ব্যঙ্গকবিতার মধ্যে 'হায় কি হলো' কবিতাটিতেই সার্থক হেমচন্দ্রী রীতির সাক্ষাৎ মিলবে। তৎকালীন রাজনৈতিক উত্তেজনার সংবাদ এতে পরিবেশিত হয়েছে ব্যঙ্গাকারে কিন্তু হেমচন্দ্রের স্বদেশচিন্তার বিশিষ্ট ধারাটিও অনুপস্থিত নয়। শক্তিহীন বাঙ্গালীর স্বাধীনতা লাভের চেষ্টাকে কবি লক্ষ্য করেছেন বেদনার সঙ্গে, কংগ্রেসী নেতার আবির্ভাবে যে আশা জেগেছে—তা দুরাশায় পরিণত হতে দেরী হয়নি। কারণ রাজদণ্ডাঘাত নেমে এসেছে নির্ভুলভাবে ;—স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে দমিয়ে দিতে তারা কখনও ভুল করেনি।

হায় কি হলো—কথার দোষে সুরেন গেলো জেলে !
"ইংলিসম্যানে" "কনটেম্পট" ও 'সিডিসন'ও চলে :
ফিনকি ছুটে ভারত জুড়ে আগুন গেলো লেগে,
হায় কি হলো—ছেলে গুলো পুলিশ দিলে দেগে !

হেমচন্দ্রের কবিতাতেই ভারত জুড়ে আগুন লাগার সংক্ষিপ্ত আভাস পাচ্ছি,—যদিও সর্বভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন আরও পরের ঘটনা—কিন্তু সর্বভারতীয় অসন্তোষ তখনই ধরা পড়েছিল। ইলবার্ট বিলের বিপরীত পরিণাম দর্শনে ভারতবাসী ক্ষুব্ধ না হয়ে পারেনি। "টেনেন্‌সি বিলে" অসংখ্য কারচুপি ছিল। এ কবিতায় সে উল্লেখও রয়েছে। জাগ্রত গণচেতনার দ্বারে এরা করাঘাত করেছিল,—শাসনের বীভৎসতায় স্তম্ভিত ভারতবাসীর দৃষ্টি স্বচ্ছ হয়ে এসেছিলো সে যুগেই। এ কবিতায় সেই সংবাদ পরিবেশনের নিখুঁত আয়োজন করেছেন হেমচন্দ্র,—

হায় কি হোলো কলম ছুঁতে হাসি এলো দুখে।
ভেবেছিলুম মনের কথা বলবো ছাতি ঠুকে।
এলো হাসি—হাসিই তবে, ঢেউ খেলিয়ে চল্যে,
ছড়াক খানিক রসের কথা—'হায় কি হলো' বল্যে। [ঐ]

তবু এ কবিতায় কবির দুঃখ অগোচরে থাকেনি, স্বভাবতই প্রকাশিত হয়েছে। 'হায় কি হলো'—নামকরণেই ত বেদনাবোধের চূড়ান্ত প্রকাশ হয়েছে। এ ত ব্যঙ্গের নয়, এ দুঃখেরই অভিব্যক্তি।

পরের অধীন দাসের জাতি 'নেসেন' আবার তারা ?
তাদের আবার 'এজিটেসন'—নরুন উঁচু করা !

এ ক্ষোভের অগ্নি ধিকিধিকি জ্বলতে শুরু করেছিল সে যুগেই। হেমচন্দ্র 'দাসের জাতি' কে মুক্তির উপায় নির্দেশ করবেন বলে আসেননি বটে কিন্তু কটু হলেও সত্য কথনের সামর্থ্য তাঁর ছিল। সাহিত্যরথীদের ক্ষমতা তাঁর অজানা ছিল না, বঙ্কিমচন্দ্রের নায়কত্ব স্বাদেশিকের চিন্তাশক্তিকে শতগুণ বাড়িয়েছিলো—তাঁর অভাবেও হেমচন্দ্র ক্ষোভে বলেছিলেন,—

"হায় কি হলো—বঙ্গদর্শন, বঙ্কিম দেছে ছেড়ে !
হায় কি হলো —দেশটা গেছে "সাপ্তাহিকে" জুড়ে।
হায় কি হলো—ভূদেব গেলো, ছেড়ে গুরু—গিরি।
হায় কি হলো—হেম নবীনের নাইকো জারিজুরি।"

ব্যঙ্গে তীক্ষ্ণতা আরোপিত হতে পারে তখনই কবি যখন তীক্ষ্ণতম শায়কটি বিদ্ধ করার উদ্দেশ্যেই প্রয়োগ করে থাকেন—বঙ্কিমী ব্যঙ্গ যাঁর উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তস্থল। হেমচন্দ্রের ব্যঙ্গে আত্মদর্শনের স্তরভেদ স্পষ্ট হলেও কবির আক্ষেপ ও বেদনার সংবাদ ব্যঙ্গের তীব্রতার হানিকারক হয়েছে। দেশপ্রেম কবিকে প্রায় অবশ করে ফেলেছে,—আত্মসমালোচনার তীব্র চাবুকে বিদ্ধ করার পূর্বে কবির খেদোক্তিই একটা কারুণ্যের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। জাতীয় দুর্বলতার প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে তাঁর বহু কবিতায়—কিন্তু বিদেশী শক্তি কিভাবে জগদ্দল পাথরের মত চেপে বসে আছে জাতির বুকে,—সে চিন্তা প্রাধান্য পেয়েছে বলেই কবিচিত্ত ম্লান। ব্যবসা বাণিজ্য কেড়ে নেবার বিচিত্র বণিকীবুদ্ধি প্রকারান্তরে আমাদের সর্বনাশ ডেকে আনছে, হেমচন্দ্র শুধু সেই চিত্রগুলির উপর ক্ষুব্ধ অন্তরের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন,—

দেশের শিল্পী কারিগুরি শিখবে বিলাতীরা—
অন্নাভাবে দুদিন বাদে মরবে এদিশীরা।

এই চিত্রটির মধ্যে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আর উপস্থিত নেই—কিন্তু সর্বনাশের সংবাদই কবিকে ব্যথিত করেছে। হেমচন্দ্রকে জাতীয় কবি ও স্বদেশপ্রেমিক বলে মনে করার হেতু এখানেই। নিতান্ত বাহ্যিক অনুভূতিকেও কবি স্বদেশপ্রেমরসে ডুবিয়ে পরিবেশন না করে পারেন না। তাই Satire—এর তীব্রতা হারিয়ে কবিকে বেদনাহত চিত্তের প্রতিবিম্বকেই প্রকাশ করতে দেখি। "বিবিধ কবিতা" রচনার যুগেও হেমচন্দ্র স্বতঃস্ফূর্ত স্বদেশচিন্তাকে লক্ষ্য করেই অগ্রসর হয়েছেন। ঘুরে ফিরে কবি নিজের মন্ময় উপলব্ধির জগতেই ফিরে আসেন বারংবার।

কবি সেযুগের কতগুলি রাজনৈতিক ঘটনাবলম্বনে যে কবিতা রচনা করেন তার

মধ্যে, রীপন উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ, ভারতেশ্বরীর জুবিলী উৎসব উপলক্ষ্যে, সাবাস হুজুক আজব সহরে, নেভার—নেভার, রাখিবন্ধন, জয়মঙ্গল গীত বিখ্যাত। কবিতাগুলিতে যেমন সমসাময়িক ঘটনার ছায়াপাত আছে তেমনি স্বাধীনতা আন্দোলনের ভাবী স্বচনার ছায়াপাতও রয়েছে। যে সমস্ত ঘটনায় দেশের আপামর জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়েছিল কবি তা কবিতাকারে গেঁথে রেখেছেন। 'স্বাধীনতা আন্দোলন', শব্দটির জন্ম হয়নি সেযুগেও, কিন্তু 'আন্দোলন' কিংবা 'স্বাধীনতা' এ দুটি শব্দের পৃথক পৃথক শব্দগত অর্থ সম্বন্ধে সে যুগের প্রতিটি মানুষ সচেতন—মিলিত অর্থটির স্বগভীর আহ্বান তখনও এসে পৌঁছয়নি এই যা। কিন্তু স্বাধীন কবিচিত্তে সে ডাক এসে পৌঁছেছিল। হেমচন্দ্রের এ ধরনের কবিতায় বিশ্বাস ও সত্যের সম্মিলন ঘটেছে। "মন্ত্রসাধন" কবিতাটিতে স্পষ্টতঃই কবি আহ্বান জানিয়েছেন,—অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার সম্মিলিত চেষ্টার দৃষ্টান্ত দেখিয়ে কবি যেন ভারতবাসীকে অভয়বাণী শোনাচ্ছেন। কিন্তু এখানে দৃষ্টান্তটি ইংরাজী ইতিহাস থেকেই সংগ্রহ করেছেন তিনি,—

দিলে শিক্ষাদান ভারত নন্দনে
দিব্যচক্ষু দিয়া—কি মন্ত্র সাধনে
পরাধীন জাতি, পরাধীন জনে
বাসনা সফল করিতে পায়।
শিখিবে ভারত শিখিবে এ কথা
চিরদিন তরে না হবে অন্যথা—
একদিকে কোটি প্রাণী কাতরতা
শ্বেতাঙ্গ কজন বিপক্ষ তায়; [মন্ত্র সাধন]

এর পরই কবি, তদানীন্তন সরকারকে আহ্বান করে বলছেন—'দিন আগত ঐ'। স্বাধীনতার মূলমন্ত্র ঐক্যের চেতনায় উদভাসিত। স্বতরাং—

শুন হে রিপন—ভারতের লাট
আর নাহি ক'রো এ তাণ্ডব নাট
বিষময় ফল—বিষম বিরাট
মনুষ্য হৃদয় সহিত খেলা! [ঐ]

এ সাবধান বাণী যেন স্বগভীর আত্মবিশ্বাসেরই বাণী—ঐক্যবদ্ধ ভারতবাসীর কাছে স্বাধীনতা অর্জনের রহস্যকথাই ত প্রচার করেছেন কবি—স্বতরাং এ বিশ্বাস নিষ্ফল হবে না বলেই কবি ধরে নিয়েছেন।

'মনুষ্য হৃদয় সহিত খেলার' ফল যে বিষময়ই হয়ে থাকে, ইতিহাস সে সত্যই প্রচার

করে আসছে, এ সত্য যেমন অভ্রান্ত তেমনি অমোঘ। কবিরও তাই সংশয় ঘুচেছে,—হেমচন্দ্রের দিব্যদৃষ্টি প্রায় খুলে গেছে। তাই জাতিকে শাশ্বত বাণী শোনাতে তাঁর দ্বিধা নেই। এ কবিতাটির শেষাংশে কবি উৎসাহদাতার কাজটি পালন করেছেন,—

না হৈও নিরাশ—ভারতসন্তান,
সাহস উৎসাহে সে গর্ব নির্বাণ
করিলে অনার্যে—আজও সে বিধান
এ মহামন্ত্রের সাধন প্রথা। [ঐ]

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে ভারতেশ্বরীর জুবিলী উৎসব উপলক্ষ্যে হেমচন্দ্রের কবিতা "আজি কি আনন্দ বাসর"। বৃটন জাতির প্রশংসা ও আত্মলীন জাতির সামনে মহৎ দৃষ্টান্ত তুলে ধরার কৌশলে এ কবিতাটিও অনবদ্য।

সার্থক-জনম, হে 'বৃটন' জাতি,
সার্থক ভূতলে তব সুখ ভাতি,
কি আনন্দ সদা হৃদয়ে তোর।

* * *

কবে গো আমরা হবে কি সেদিন?
ওদেরি মতন সহাস্য মুখে
অমনি করিয়া সদর্পে আসিয়া
দাঁড়াবো, জননি, তব সম্মুখে?

এখানে কবি প্রায় উৎকণ্ঠিত—দিন গোনার লগ্ন এসেছে যেন। অথচ রাজবন্দনার ষোড়শোপচার কবিতাটির আয়তন বৃদ্ধি করেছে,—নীর থেকে ক্ষীর তুলে নেওয়ার কৌশল দেশবাসীর কাছে আজ অনায়ত্ত নয় আর। কারণ এ বিশ্বাস না থাকলে হেমচন্দ্র এ কবিতা লিখতেন না। রাজবন্দনা কবির যে উদ্দেশ্য নয়,—'ভারতসংগীতের কবি হেমচন্দ্র সম্বন্ধে সেকথা আর নূতন করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে না। সাময়িক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবাসীকে কর্তব্য স্মরণ করানোর কঠিন দায়িত্বটি কবি পালন করেছেন মাত্র।

"রীপণ-উৎসব—ভারতের নিদ্রাভঙ্গ" কবিতাটিতেও একই উদ্দেশ্য দেখা যায়। ১৮৮৪ খৃঃ ভারতের বড়লাট রীপণের বিদায় উপলক্ষ্যে—গণজাগরণের দৃশ্যটি ক স্বচক্ষে দেখেছিলেন,—একদিকে আশা ও ভবিষ্যৎ কবিকে উদ্বেলিত করেছে অন্যদি সাময়িক চিত্রটিকে কবিতায় ধরে রাখার চেষ্টা করেছেন কবি। এ প্রসঙ্গে খানিব বিরোধী ভাবের অবতারণা করেছেন কবি। রীপণের আবির্ভাবে সে যুগের জন

খুশী হয়েছিলো ;—কিন্তু কবি রীপণ বিদায়ে সে যুগের উচ্ছ্বসিত মানুষের অভিনন্দনের মধ্যে সচেতন দৃষ্টির উদারতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, – রীপণ বিদায়ে কৃতজ্ঞ দেশবাসী একদিকে প্রশংসা অন্যদিকে স্বচ্ছ বিচার-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিলো। বস্তুতঃ আত্মসচেতনতার এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবি এর গভীরে প্রবেশ করে ভারতের ভাবী জনগণের মধ্যে আশার বীজ দেখতে পেয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সমালোচক ও জীবনীকার মন্মথনাথ ঘোষের মন্তব্য,—

"কবিবর স্বয়ং দেশবাসীর নিদ্রাভঙ্গ দেখিয়া যে কবিতা রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করাই কি সঙ্গত নহে ?[৩৭] জাতির বিচার বুদ্ধির ওপর আস্থা স্থাপন করার সুযোগ পেয়েছেন কবি এ অবসরে। রীপণ-বিদায়ের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের মূলে আছে সচেতন কৃতজ্ঞতা। কবি জানেন স্বাধীনতা পাওয়ার লগ্ন সেদিনই সমাগত হবে যে মুহূর্তে জাতির জীবনে আবেগমথিত উচ্ছ্বাস আসবে সচেতনতার পথ বেয়ে। আবেগের স্বরূপ বিভাগ করলে দেখা যাবে সচেতনতা জাত আবেগই সিদ্ধির সুযোগ এনে দিয়েছে। অচেতন আবেগের মত মারাত্মক আর কিছু নেই। বিশেষতঃ পরাধীন জাতির জীবনে সচেতন উচ্ছ্বাসের ফল যেমন শুভ হতে পারে—আবেগ তাড়িত, লক্ষ্যহীন, অচেতন উচ্ছ্বাসের ভয়ঙ্কর পরিণতিও স্বতঃসিদ্ধ সত্য। সুতরাং স্বাধীনতা পাওয়ার পূর্বে সচেতন আত্মপ্রস্তুতিই ছিল সে যুগীয় মনীষীদের কাম্য। উন্মত্ততা কিংবা অপরিকল্পিত উচ্ছ্বাসে ভেসে যাওয়ার প্রবণতা অনেকবারই দেখা দিয়েছে,—অর্থহীন বহু উত্তেজনা অহেতুক চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছে, এমন দৃষ্টান্তেরও অভাব নেই। সুতরাং হেমচন্দ্র এই দৃষ্টান্তটি দেখে আনন্দিত হয়েছিলেন। সচেতন আত্মবিচারের এই ঘটনাটির গুরুত্ব তিনি স্বীকার করেছিলেন ; এতে বিরোধিতা নেই। রীপণ বিদায়ে হেমচন্দ্র ভারতের নিদ্রাভঙ্গের সূচনা দেখতে পেলেন। এই বৃহৎ কবিতাটিতে রীপণ উৎসবের চিত্রটিই অনুপস্থিত—কিন্তু ভারতের নিদ্রাভঙ্গের বিস্তারিত বর্ণনা স্থান পেয়েছে। লক্ষ্যই হয়েছে গৌণ—উপলক্ষ্য পেয়েছে প্রাধান্য। মনে প্রাণে স্বদেশময় কবির এর চেয়ে বড়ো আনন্দ আর নেই। তাই কবি বলেন,

"মনে ক'রো সবে নিভৃতে-উৎসবে
"রীপণ বিদায়" নহে এ খালি,
সম আশা ভয় ভারত অন্তরে
এ মিলন তার প্রকাশ্য ডালি॥

৩৭. মন্মথনাথ ঘোষ, হেমচন্দ্র। ৩য় খণ্ড। ১৩৩০, পৃঃ ৩৪।

ভারতের জাগ্রতরূপ কবি লক্ষ্য করেছেন—তাঁর একান্ত কামনা, এই জাগৃতিই জয়ের চেষ্টা হয়ে উঠুক।—সেই ব্রতপালনের আগে এ জাগরণ যেন নিস্তেজ হয়ে না যায়।

"আর ঘুমাইও না" ডাকি মা আবার
ভাবী আশাফল ভাবিয়া দেখো,
"রীপণ-উৎসব" সোনার অক্ষরে
হৃদয়ের মাঝে লিখিয়া রেখো।

এর চেয়ে কোন গভীর আকুতি কবির নেই—এই দৃষ্টান্ত ভাবী আশা দ্যোতনা করেছে,—এ সত্য কাব্যিক সত্য হয়ে উঠেছে। হেমচন্দ্র স্বাধীনতা উপাসক কবি—এ আশাই আশাহত-নৈরাশ্যপীড়িত কবির মনের একমাত্র সান্ত্বনা। এর পরবর্তী ঘটনা কিংবা ফলপ্রাপ্তির সংবাদ হয়ত অশ্রুতই থেকে যাবে শুধু স্বাধীনতাকামী কবি এই আশ্বাসটুকু নিয়েই শান্ত হবেন। কারণ এরি মাঝে আছে কালপুরুষের সেই নির্মম নির্দেশ। প্রাপ্তির চেয়েও সম্ভাবনার শান্তিই কবির কাছে মূল্যবান। "রীপণ উৎসব" কবিতায় হেমচন্দ্র প্রায় আত্মহারা,—

ভাঙ্গিল কি তবে এত দিন পরে
ভাঙ্গিল কি ঘুম ভারত মাতা?
জরাজীর্ণ শীর্ণ শরীরে তোমার
ফিরে কি জীবন দিল বিধাতা?

এবং পরিশেষে সমৃদ্ধবিশ্বাসে কবির সঞ্চিত মনোক্ষোভ যেন শান্ততায় মণ্ডিত,—

"আজি আর কালি পাবো রে সকলি
আর এ ভারত নিদ্রিত নয়।

এ কবিতাটিতে হেমচন্দ্রের দূরায়ত দর্শন চোখে পড়ে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পূর্ব প্রস্তুতির মধ্যে হেমচন্দ্র যুক্তিসিদ্ধ সম্ভাবনা দেখেছিলেন—নিছক উচ্ছ্বাসের কলরোল নয়,—সংগঠনমুখী মনোবৃত্তির নিশ্চয়তা হেমচন্দ্রকে তাই আবেগাতুর করেছে।

'বিবিধ কবিতার' রচনাকাল কবির জীবনের সায়াহ্নকাল। রাজনৈতিক অবস্থায়ও তখন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা যায়। আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রাথমিক আয়োজন প্রায় সারা। রামমোহনের যুগ থেকেই আত্মাধিকারের দাবীতে বাঙ্গালী প্রায়ই উত্তেজিত হয়েছে—১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাঙ্গালীর সে দাবী প্রায় স্বাধীনতালাভের অঙ্গীকারে দৃঢ়। হেমচন্দ্র ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে মারা যান। ১৯০৫ সালের আন্দোলনটি দেখার সৌভাগ্য তাঁর হয়নি। রাষ্ট্রগঠনের দায়িত্ব নিয়ে রাষ্ট্রগুরুর আবির্ভাব দৃশ্যটি তিনি শুধু কল্পনানেত্রেই দেখেছিলেন। কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান আশা

উত্তেজনায় তিনি শেষ জীবনেও যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৮৬ খৃঃ কলিকাতায় অনুষ্ঠিত ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন উপলক্ষ্যেই তাঁর কবিতা 'রাখী বন্ধন' রচিত হয়। স্বাধীনতা সূর্যটিকে পূবাকাশে অভিনন্দন জানিয়ে রেখেছিলেন কবি বহু আগেই,—

আর কেন ভয় হের তেজোময়
ভারত আকাশে নব সূর্যোদয়
নবীন কিরণ ঢালিল,
ভারতের চিরঘোর অমানিশি
তরুণ কিরণে ডুবিল।

হেমচন্দ্রের কবিতাধারার শেষপর্বে কবির অতি আশ্চর্য মানসপরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। সম্ভাবনা এবং নিশ্চিতসিদ্ধির মধ্যে কোন অর্থগত ভেদরেখা যে থাকতে পারে হেমচন্দ্রের অতি উচ্ছ্বসিত বক্তব্য থেকে তা উদ্ধার করা কঠিন। স্বাধীনচেতনার নির্মম অভিশাপ কবিকে যেদিন দিশাহারা, বিভ্রান্ত-নৈরাশ্যপীড়িত করে তুলেছিল,—কবিতার ছত্রে ছত্রে সেই মর্মবেদনা ক্রন্দন করেছে। তাই দেখেছি, কবিতাবলীতে হেমচন্দ্র ম্রিয়মান ও বেদনাক্ষুব্ধ। সেই বিলাপ ও আশাভঙ্গের হাত থেকে কবি যদি মুক্তি না পেতেন বাঙ্গালী কাব্য-পাঠকের মনে একটা স্থায়ী ক্ষোভ থেকে যেতো। সমসাময়িক কবিদের মধ্যে স্বদেশচিন্তার নিবিড়তা ও আন্তরিকতা হেমচন্দ্রেই লক্ষ্য করেছি, এও দেখেছি কবির স্বদেশপ্রেমের কবিতামাত্রই বিলাপ। বঙ্কিমচন্দ্রের সমবয়সী হলেও হেমচন্দ্র বেঁচেছিলেন তাঁর তুলনায় বেশীদিন। শেষ জীবনে অন্ধতার যন্ত্রণা ভোগ করেও হেমচন্দ্র সাধনা বজায় রেখেছিলেন। স্বদেশচেতনার পরিণতিপর্বের দুঃখ যে নির্বাণপর্বের আশাবাদে পরিণত হতে পেরেছিলো—এতে অন্ততঃ আমাদের খানিকটা স্বস্তি। হেমচন্দ্রের উচ্ছ্বসিত উপলব্ধি মাঝে মাঝেই ব্যঙ্গাকারে পরিবেশিত। "সাবাস হুজুক আজব সহরে"—ব্যঙ্গাকারে পরিবেশিত এ কবিতাটির মধ্যেও হেমচন্দ্রের স্বচ্ছন্দ মনোবৃত্তি লক্ষ্যণীয়। বিলাপ ও দুঃখের সাধনায় শেষ পর্যন্ত সান্ত্বনাটুকু তিনি লাভ করেছিলেন। এ কবিতায় ব্যঙ্গরসিক ঈশ্বরগুপ্তকে স্মরণ করেছেন সখেদে,—'ফ্রেমবাধা' "ফ্রানচাইসে" নেটিভ স্বাধীন" হবে,—আপাতঃ বিচ্ছিন্ন এই প্রয়াসের স্বরূপ উপলব্ধি করে কবিও প্রায় উৎসুক জনতায় প্রবেশ করেছেন।

কোথায় ঈশ্বরগুপ্ত তুমি এসময়।
চতুর রসিকরাজ চির রসময়॥
দেখিলে না চর্মচক্ষে হেন চমৎকার।
বঙ্গের গোগৃহ রঙ্গব্যঙ্গের বাজার॥

কিছু কাল যদি আর থাকিতে হে বেঁচে।
লিবার্টির জন্ম দেখে কলম নিতে কেঁচে॥

এখানে ব্যঙ্গের তীক্ষ্নতা নেই, কিন্তু রসিক মনোবৃত্তিটুকু ধরা পড়েছে। বিলাপের-আক্ষেপের স্তর পার হয়ে আশাবাদের আনন্দলাভ পর্যন্ত মোটামুটি কবিচিত্তের পারম্পর্যের ধারা রক্ষিত হয়েছে। রঙ্গব্যঙ্গের নির্ভেজাল আবহাওয়ায় কবিকে আমরা আরও শান্ত-স্বচ্ছন্দ-সস্মিত দেখেছি। নিছক ভোটরঙ্গ নিয়ে দীর্ঘ এ কবিতায় কবির অনাবিল হাস্যরস বিতরণের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগই মূর্ত হয়ে উঠেছে। "নেভার—নেভার" কবিতায় ইলবার্ট বিলের বিরোধিতার প্রসঙ্গ নিয়ে 'ইংলিসম্যানের' স্বপক্ষে কবির ভূমিকাটি চমৎকার। নিছক রঙ্গব্যঙ্গের উদ্দেশ্যে রচিত বলেই কবিচিত্তের স্বচ্ছন্দতা হেমচন্দ্রী নৈরাশ্যবোধে পীড়িত পাঠকচিত্তকে খুশী করে। ইলবার্ট বিলের বিরোধিতা করে ব্রান্‌সন, কেশুয়িক মিলার যে দাবী পেশ করেছিলেন তা কবির কাছে ব্যঙ্গের উৎস বলেই মনে হয়েছে। ইলবার্ট বিল প্রণয়নে যে আশা বা ন্যায্য দাবীর জয় ঘোষিত হয়েছিল—তার বিরোধিতায় মনঃক্ষুণ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক, হেমচন্দ্র তা থেকে ব্যঙ্গের উপাদান আবিষ্কার করেছেন। এ অংশটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়েছে,—

আয়রে ফিরিঙ্গি ভাই সিন্ধুপারে চলে যাই
যেখানে 'লিবার্টি হল' আমাদের সভা।
পাত্র মিত্র যতজন সকলেই গবা।
বুঝাইব খাঁটি হাল আছিলাম এতকাল
হিন্দুদেশে ভালবেসে হিন্দুর সন্তানে,
সিংহ যেন মৃগ কোলে স্বর্গের উদ্যানে॥

অন্তর্নিহিত খোঁচাটি আর অস্পষ্ট নয়—তবে শাসকগোষ্ঠীর উদ্দেশ্য হেমচন্দ্রে মতো সে যুগের প্রতিটি সচেতন মানুষেরই আর অজানা ছিল না—এটাই আমাদে একমাত্র মূলধন। সংঘবদ্ধচেতনাজাত এই অভাবিত উপলব্ধির আলোকেই কবিতাটি রঙ্গব্যঙ্গ স্থাপনা করা হয়েছে। 'মন্ত্রসাধন'-এ প্রকাশ্যভাবেই কবি ইলবার্ট বিলে প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন।

হেমচন্দ্রের শেষ পর্যায়ের কবিতার প্রেরণা সেযুগীয় সমাজের আন্দো আলোড়িত ঘটনাবলী। বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যু কবিকে অত্যন্ত বিচলি করেছিল। বিদ্যাসাগরের মূল্যায়ন ভঙ্গিমাটুকুও লক্ষ্যণীয়,—স্বাধীনচিত্ত ব বিদ্যাসাগরের চারিত্রিক তেজ ও স্বাধীনতাস্পৃহা দর্শনে আনন্দিত হয়েছিলে

বিদ্যাসাগর সম্পর্কে এ উপলব্ধি যদিও সর্বজনীন হেমচন্দ্র এ কবিতায় তারই সার্থক রূপ দেন,—

স্বাধীন স্বতন্ত্র চিত্ত কাহার তেমন ?
দর্প, নির্ভীকতা, বীর্য—যে কিছু লক্ষণ
তেজীয়ান পুরুষের—সবই ছিল তায় !
তৃণজ্ঞান পদমান অবজ্ঞা যেথায়,
শ্বেতাঙ্গ প্রসাদ [ও] গর্বে ঠেলিত হেলায় ।

স্বাধীনতার উপাসক বলেই স্বাধীনচিত্ততায় তিনি প্রায় আত্মহারা হন, বিদ্যাসাগর শ্রদ্ধাঞ্জলিতে তারই উচ্ছ্বাস। 'হায় কি হলো'-তে বঙ্কিমহীন 'বঙ্গদর্শন' দেখে কবির আক্ষেপবাণী শুনেছি, এ কবিতায় কবি বিদ্যাসাগরহীন বাংলাদেশের অবস্থা ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা কাব্যে আন্তরিক ভাবে সাড়া দিয়েছিলেন সব কবিরাই —সুতরাং নবীনচন্দ্রের কাব্যালোচনার ভূমিকাতেও স্বদেশচিন্তনের প্রসঙ্গটাই বড়ো কথা। মধুসূদন ও হেমচন্দ্রের পরে বাংলা কাব্যের আসরে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব কিছুমাত্র আকস্মিক বলে হয় না—তার কারণ মোটামুটিভাবে তিনি পূর্বসূরীদের আদর্শই গ্রহণ করেছিলেন। বাংলাকাব্যের ধারাবাহিক ইতিহাসে নতুন কিছু সংযোজন করার থেকে পুরাতনের অনুশীলনেই তিনি বেশী তৎপর। হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতার প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা যে কোন আগন্তুক কবির মনে প্রেরণা জাগানোর পক্ষে যথেষ্ট ছিল, সে যুগের সাধারণ-অসাধারণ কবিরা এ প্রলোভন জয় করতে পারেননি। সুতরাং নবীনচন্দ্রের মতো সম্ভাবনাসম্পন্ন কবিও যে স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবিত হয়েছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রান্তসীমায় সার্থক স্বদেশপ্রেমী কবি হিসেবে নবীনচন্দ্রের যে পৃথক পরিচয় রয়েছে শুধু সেটুকুই আমাদের আলোচ্য।

পূর্ব আলোচিত কবিদের স্বদেশচিন্তার স্বরূপ নির্ণয়ে আমরা মোটামুটি একটা সুবোধ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলাম কিন্তু নবীনচন্দ্র আলোচনায় আমাদের কিছু অসুবিধায় পড়তে হয়। নবীনচন্দ্রের যুগে বাংলাদেশে স্বদেশপ্রেমের আবহাওয়া এতই প্রবল যে সে যুগের মানুষ আত্মআবিষ্কারের পালা সাঙ্গ করে আত্মপ্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে। নবীনচন্দ্র এসেছিলেন সারবান জমিতে বীজ বপনের দায়িত্ব নিয়ে। দেশের স্বাভাবিক অবস্থা বর্তমান থাকলে স্বদেশপ্রেম একটি সমৃদ্ধসভ্যতা ও সুস্থ সংস্কৃতির জন্ম দিতে পারে—পরাধীনতার মত একটি অস্বাভাবিক অবস্থায় দেশচেতনা প্রথমেই পথ খোঁজে মুক্তির। নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব লগ্নে বাংলা দেশ সেই মুক্তির স্বপ্নে মগ্ন। স্বদেশ-

প্রেমের প্রচণ্ড আবেগে জনমন আন্দোলিত,—আত্মবিশ্বাসের শক্তিতে ও আত্মপ্রতিষ্ঠার শপথে সকলেই কম্পমান। সুতরাং নবীনচন্দ্রের কাব্যে স্বদেশোচ্ছ্বাসের আতিশয্য থাকলে আমরা কিছুমাত্র অবাক হইনা বরং স্বস্তিবোধ করি। যুগানুগ সত্যকে প্রকাশ করেই কবিরা অমর হতে পারেন,—তার জন্য কোন কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। নবীনচন্দ্র সাড়ম্বরে 'আমার জীবনে' তাঁর স্বদেশচর্চার ইতিহাসটি ব্যাখ্যা করেই যত কিছু অসুবিধের সৃষ্টি করেছেন। কবিপ্রদত্ত স্বদেশচর্চার বিশদ ব্যাখ্যাটিকে অগ্রাহ্য করার উপায় নেই বলেই সমালোচক শুধু অসহায় বোধ করেন। 'আমারজীবনের' কৈফিয়ৎ কবির কাব্য কিংবা কবিকে শুধুজনমানসের সামনে অপ্রস্তুত করে ফেলেছে। নবীনচন্দ্রের কাব্য কিংবা নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের আলোচনায় কবিলিখিত আত্মজীবনীটি অপ্রয়োজনীয় হয়ে রইল—এটি যে কোন অনুরাগী গবেষকেরই আক্ষেপের কথা। এদেশে কোন কোন মহৎ ব্যক্তিকে শুধু আত্মজীবনীর মত একটা মূল্যবান দলিলের অভাবে আমরা বুঝতে পারিনি—বোঝাতেও পারিনি—নবীনচন্দ্রের সুবৃহৎ আত্মজীবনীটি কখনও কখনও কবিকে বোঝার পক্ষে প্রচণ্ড বাধা হয়ে দাঁড়ায়। নবীনচন্দ্রকে পৃথকভাবে আলোচনা করার স্বাধীনতা আমরা হারিয়েছি—অথচ "কবিরে যেথায় খুঁজিছ সেথা সে নাহিরে"—প্রবচনটিও ভুলতে পারছি না। এই অসুবিধা থেকেও নবীনচন্দ্রের দীর্ঘ সমালোচনা হয়েছে। নানা আলোচনায় শুধু একটি সত্যই ধরা পড়েছে নবীনচন্দ্র সেযুগের স্বদেশপ্রেমিক কবিদের মতই কাব্য ও স্বদেশচিন্তাকে পৃথক আধারে স্থাপন করতে পারেননি। কখনও স্বদেশচিন্তাই তাঁর বক্তব্যকে কাব্যের পর্যায়ে নিয়ে গেছে কখনও তাঁর বক্তব্যই স্বদেশভাবনা প্রকাশ করেছে। মোটামুটি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দশকের স্বদেশপ্রেমী কবি হিসেবেই নবীনচন্দ্রের আলোচনা করা যেতে পারে—এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর এই বিশেষ ধারাটিতে নবীনচন্দ্রের সযত্ন সৃষ্টির অমূল্য প্রয়াসকে অভিনন্দন জানাতেই হবে।

বাংলা কাব্যের আদিতে যে খণ্ড কবিতারই আধিপত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ মুহূর্তে গুপ্তজার রচনামাত্রই যে খণ্ড কবিতা এই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল সত্যকে অস্বীকার করেও নবীনচন্দ্র স্বাভাবিক প্রবণতা থেকে খণ্ড কবিতাই লিখেছিলেন। "অবকাশ রঞ্জিনীর" কবিতা সম্পর্কে তাঁর উক্তি,—

—"প্রথমতঃ আমি "এডুকেশন গেজেটে" লিখিতে আরম্ভ করিবার পূর্বে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র বিষয়ে খণ্ড কবিতা, বঙ্গভাষায় ছিল না।......দ্বিতীয়তঃ আমি 'এডুকেশন গেজেটে' লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয়, স্বদেশপ্রেমের নামগন্ধ বাংলার কাব্যে কি কবিতায় ছিল না।"[৩৮]

৩৮. নবীনচন্দ্র সেন—আমার জীবন। ১ম ভাগ। পৃঃ ৩১৯—৩২৬

কবি হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ পর্বটি নিতান্তই যে সাধারণ ঘটনামাত্র নয়—একথার ওপর অযথা গুরুত্ব প্রদান করতে গিয়েই অসাবধানী উক্তির অসংখ্যতায় তাঁর দিনলিপি কণ্টকিত হয়েছিল। বাংলা কাব্যে স্বদেশভাবনাজাত খণ্ড কবিতার অভাব যিনি দেখেছিলেন সেই নবীনচন্দ্র সম্পর্কে সহানুভূতিবিহীন না হয়েও এ সিদ্ধান্তে আসা যায় যে, কবি সেই অভাব পূরণের জন্যই সচেতনভাবে বাংলা খণ্ড কবিতায় দেশাত্মবোধ আরোপ করেছিলেন। এ ব্যাপারে পথিকৃৎ হওয়ার সচেতন ইচ্ছাটি কবিমনে দেখা দিয়েছিল, পল্লবিত হয়েছিল এবং সেই ইচ্ছার পথ ধরেই নবীনচন্দ্র বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। দেশানুরাগের আবেগে এ কবিতার জন্ম হয়নি—বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে একটা অভাবের উপলব্ধি থেকেই দেশানুরাগ উচ্ছ্বসিত কবিতাগুলি কবি লিখেছিলেন—একথা প্রমাণিত হলো। কোনো কবির প্রথম আত্মপ্রকাশ পর্বে বিশুদ্ধ ভাবাবেগের দৈন্য প্রমাণিত হলে কবি সম্বন্ধে আমাদের সুউচ্চ ও প্রশংসনীয় মনোভাবটি পীড়িত হয়—আমরা হতাশ হই। নবীনচন্দ্র বাংলা কবিতায় তাঁর স্বকীয় দানকে বিকৃত ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বলেই আত্মপ্রকাশ পর্বের এই অকুণ্ঠ বিকৃতভাষণকে বর্জন করতে হবে। নবীনচন্দ্রের কাব্যোন্মেষ পর্বকে একটু তলিয়ে বিচার করলেই কবি ও কাব্যের যথার্থ সম্বন্ধটি স্বচ্ছ হয়ে উঠবে।

সংজাত রচনাশক্তি ও অনুভব ক্ষমতা নিয়েই বাংলা সাহিত্যে নবীনচন্দ্রের আবির্ভাব। ১৮৬৩ খৃঃ যৌবনের অনুভূতি ও স্বতস্ফূর্ত বিচারবোধ নিয়ে এই চট্টলী কবি কলকাতায় এসেছিলেন—বিদ্যাভ্যাসের ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে। অভিজ্ঞতা ও কবিত্ব দুটোই যেদিন বয়ঃপ্রাপ্ত হল কবিতা না লিখে তখন উপায় নেই। আগুন যেমন পতঙ্গকে টানে নবীনচন্দ্রকেও আন্তরিক ভাবাবেগ টেনেছিলো। ইতস্ততঃ ছড়ানো চিন্তাকে রূপ দেবার প্রচণ্ড তাড়নায় কবি যখন লিখলেন তাতে সচেতন প্রয়াস থেকে গভীর আকুতির প্রকাশ যে বেশী থাকবে সন্দেহ নেই। আঠারো থেকে তেইশ বছরে লেখা নবীনচন্দ্রের "অবকাশরঞ্জিনী" ১ম ভাগের কবিতায় তার পরিচয় আছে। চট্টগ্রাম স্কুলের তৎকালীন ছাত্রটির মধ্যে যে খাঁটি চট্টগ্রামপ্রেমিক যুবকটির মূর্তি প্রত্যক্ষ করি, পরবর্তী কালের স্বদেশপ্রেমিক কবির যথার্থ স্বরূপটি সেখানেই নিহিত রয়েছে। চট্টগ্রামের প্রতি তাঁর আন্তরিক ভালবাসা তিনি কখনও গোপন করতে পারেননি। নবীনচন্দ্রের স্বদেশানুরাগের আন্তরিকতার সবচেয়ে বড়ো এবং মূল্যবান তথ্য এটি। কবি অবশ্য জন্মস্থানপ্রীতির প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের অবারিত পর্বত সমুদ্রের প্রাকৃতিক রূপের কথাই বলেছেন। পাঠ্যাবস্থায় চট্টগ্রামের শৈল সমুদ্র-নদ-নদী-নির্ঝরিনী শোভিতা মাতৃভূমির কথা তাঁর মুখে শোনা যেত। চট্টগ্রাম কবির দেশপ্রীতির উদ্বোধন ঘটিয়েছিল এবং এই সৌন্দর্য্যমুগ্ধতাই পরিণত হয়েছিল অনাবিল দেশোপলব্ধিতে।

সুতরাং পূর্বতন সাহিত্যের স্বদেশপ্রেমের উচ্ছলিত নামগন্ধে অবশিত হতে পারেননি বলে নবীনচন্দ্রকে আমরা অন্ততঃ নিন্দা করতে পারি না। উনবিংশ শতাব্দীর আদি থেকেই কবিরা যে আর্তিকে একমাত্র বক্তব্য করে তুলেছিলেন—উনবিংশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তের কবি নবীনচন্দ্র যে ক্ষেত্রে অনায়াস প্রবেশাধিকার লাভ করেছিলেন—শুধুমাত্র অসতর্ক একটি উক্তির প্রসঙ্গ দিয়ে এর সঠিক ব্যাখ্যা হয় না। "আমার জীবনে" বর্ণিত বহু উক্তির অসত্যতা প্রমাণের জন্য কোন যুগের সমালোচককেই বেশী পরিশ্রম করতে হয়নি। তাই নবীনচন্দ্রের সেই ভ্রান্ত প্রমাণিত উক্তিটি নতুন করে সমালোচনা করার প্রয়োজন নেই। শুধু এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে স্বদেশপ্রেমের সৌরভে বাংলা সাহিত্যের দশদিক যখন আমোদিত তখন নবীনচন্দ্রও অজানিতে স্বদেশসচেতন কবিরূপেই আত্মপ্রকাশ করলেন। এ প্রসঙ্গে কবির নিজস্ব আরও একটি উক্তির সাহায্য নিতে পারি। উক্তি মাত্রই অসত্য নয়, স্বীকার করেই জানতে পারি কবির কবিত্ব উন্মেষ পর্বের কথা,—

"আমার বয়স যখন ১০।১১ বৎসর, যখন আমি ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ি, তখন হইতেই গুপ্তজীর অনুকরণ করিয়া কবিতা লিখিতে চেষ্টা করিতাম।"

[আমার জীবন, ১ম ভাগ, কবিতা প্রকাশ]

এই ঋণ স্বীকার করেই নবীনচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ সম্ভবপর হয়েছিলো। স্বদেশপ্রাণ ঈশ্বরগুপ্তের ভাবাদর্শ যদি নবীনচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়ে থাকে তবে সে দীক্ষা দেশহিতব্রতের। নবীনচন্দ্রের পরবর্তী জীবনে এই দেশপ্রীতি উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেছিল। গুপ্তজীর প্রসঙ্গটি আমাদের সামনে তুলে ধরে নবীনচন্দ্র বোধহয় একধরণের অসতর্কতারই পরিচয় দিয়ে ফেলেছেন—কারণ আত্মপ্রকাশপর্বের কথা বাদ দিলেও ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশ কালেও কবি পূর্বসূরীদের কাব্যপ্রসঙ্গ সম্বন্ধে নীরব থেকেছেন। রঙ্গলালের বীররসাশ্রিত "পদ্মিনী উপাখ্যান" কিংবা মধুসূদনের "মেঘনাদবধ কাব্যের" অন্তর্নিহিত তত্ত্ব সম্পর্কে তিনি উদাসীন। কিন্তু আলোচনা কালে দেখা যায় ঐতিহাসিক নিয়মেই তিনি পূর্বসূরীদের ভাব-ভাষা-ছন্দ ও প্রকাশভঙ্গীর দ্বারা সমাচ্ছন্ন।

নবীনচন্দ্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'অবকাশ রঞ্জিনীর' কবিপ্রদত্ত উচ্ছ্বসিত আলোচনার সারসংগ্রহ করলে দেখা যাবে, নব প্রকাশিত এ কাব্য সম্পর্কে তাঁর সহপাঠীরা একদা এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে, "এ মধু মধুসূদনের না হইয়া যায় না"—এই মন্তব্যকে পরিণত বয়সেও কবি দুর্লভ ও প্র্যাপ্যসম্মান বলে মনে রেখেছিলেন। কিন্তু "অবকাশ রঞ্জিনী"র প্রথম ভাগেই নবীনচন্দ্রকে দেশপ্রেমিক রূপে আবিষ্কার করা খুব কঠিন নয়। আত্মচিন্তাকে ইতস্ততঃভাবে খণ্ড কবিতাকারে প্রকাশ করেছিলেন এ কাব্যে।

অথচ মধুসূদনের কাব্য সাহিত্যের কোথাও উদ্দেশ্যবিহীন আত্মমন্থনের উচ্ছ্বাস নেই। মধুসূদন আপাতঃসৌন্দর্য নিয়ে কোনদিনই কালক্ষেপ করেননি, সেই সাধকোচিত গভীরতা নবীনচন্দ্রের নিতান্ত প্রথম বয়সের রচনায় আশা করাও যায়না। কলেজীয় পঠন পাঠনের অবসরে সাহিত্য সমালোচনা ক্রীড়ায় যোগদানরত সেযুগীয় সহপাঠীদের কৌতুককর উক্তিকে শিরোধার্য করেই নবীনচন্দ্র বলেছিলেন, "এ নবীনমধু নবীন কবির।" "অবকাশ রঞ্জিনীর" [১ম ভাগ] বহু কবিতায় নবীনচন্দ্রের যথার্থ স্বদেশচিন্তা প্রকাশিত হয়েছিলো—তাতে পূর্বসূরীদের প্রভাবের সঙ্গে কবির স্বকীয় চিন্তাধারাও যুক্ত ছিলো। নবীনচন্দ্র দেশানুরাগের দ্বারা আচ্ছন্ন না হলে "অবকাশ রঞ্জিনীর" স্বদেশাত্মক খণ্ড কবিতাগুলি রচিত হোত না। বাল্যকালের জন্মস্থানপ্রীতিই ছাত্রজীবনে উচ্ছ্বসিত দেশবন্দনায় বিকশিত হয়েছে। আবার সেযুগীয় কুসংস্কারের প্রতি শিক্ষিতজনের সাধারণ মনোভাবকেও তিনি গোপন করেননি। ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে বৃহত্তর বাংলার দুঃখ দুর্দশাকেও তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, ভাবুকতা ও সহৃদয়তা দিয়ে সেযুগের সমাজ জীবনকে যাচাই করে নিয়েছিলেন। "অবকাশ রঞ্জিনীর" প্রথম ভাগে কাব্যোন্মেষের লগ্নেও নিছক কবিতা নয়, যুগানুসারী কবিতা লেখারই চেষ্টা করেছিলেন তিনি। এই দৃষ্টিভঙ্গীর সজীবতা নবীনচন্দ্রের কবিমনে নিহিত হয়েই ছিলো, শুধু স্ফুরণের জন্যই যার জন্ম। তবু বলব, যে কারণে হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমাত্মক খণ্ড কবিতার একটা অপরিসীম আবেদন রয়েছে, নবীনচন্দ্রের উন্মেষ পর্বের স্বদেশচিন্তায় সে আবেগ কিংবা বিশুদ্ধ আর্তি নেই, সে অভাবনীয় প্রত্যাশা সমগ্র নবীনকাব্যেই অনুচ্চারিত। মধুসূদনীয় মহিমাস্পর্শে পরিশুদ্ধ জীবনবেদনাই যেখানে দেশপ্রেম, নবীনচন্দ্রে তা উচ্ছ্বসিত কলরোলমাত্র। জীবনবোধ ও দেশবোধ যেখানে অমিলিত ছন্দ সেখানে বিশুদ্ধ ভাবগাম্ভীর্য আশা করা যায় না। হেমচন্দ্র আঘাতের আলোকে দেশপ্রেমকে নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন। নবীনচন্দ্রের কাব্যজীবনের উন্মেষ পর্বে লেখার বিষয়বস্তু হিসেবেই এসেছে স্বদেশভাবনা। নবীনচন্দ্রও জাতির পতনে বিমূঢ়চিত্ত কিন্তু উত্থানের নবমন্ত্র আবিষ্কারের কল্পনা মাত্রও তার পক্ষে অসম্ভব ছিলো, এখানে তিনি অনুগামীমাত্র।

নবীনচন্দ্রের পূর্বসূরীদের স্বদেশাত্মক কবিতার স্বরূপবিচারে আমরা যে ক্রমবিবর্তন বা ক্রমপরিণতির আভাস পেয়েছি নবীনচন্দ্রেই তার ব্যতিক্রম লক্ষ্যণীয়। অন্যান্য কবিরা দ্বিধা সংশয় থেকে শেষ পর্যন্ত সমৃদ্ধ ভালবাসার বাণী রচনা করেছেন—নবীনচন্দ্রের স্বদেশচিন্তা পরিশেষে আধ্যাত্মিকতায় পর্যবসিত হয়েছে। উনবিংশ শতকীয় মোহপাশ থেকে ধীরেধীরে কাব্যসাহিত্য মুক্তি পেতে চাইছে যেন নবীন কাব্যের মধ্যেই। শুধু দেশপ্রেমকথা প্রচারই নয়,—রূপময় ভাব থেকে জীবনময় উদ্দীপনা

সৃষ্টির সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়ে নবীনচন্দ্রের কাব্য যেন আগামী কবির দিকে অঙ্গুলি সংকেত করেছে দিক পরিবর্তনের। স্বদেশচেতনা যতদিন অস্পষ্ট ছিল, আলোকে আসার দুর্মদ প্রাণাবেগই ছিল তার আকাঙ্ক্ষিত। কিন্তু দেশাত্মক ভাবটিকে আরও অধিক যত্নে লালন করার প্রয়োজন ফুরিয়েছে,—কারণ কবিদের কথা তখন সমস্বরে আবৃত্ত হচ্ছে,—হিন্দুমেলার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে সমবেত স্বদেশীসংগীত প্রাণমন চঞ্চল করেছে। নবীনচন্দ্রের কাব্যসাধনার প্রথমাংশেই তাঁর স্বদেশাত্মক রচনা সৃজনের পর্ব, দ্বিতীয়াংশে সে ভাবটিই নির্বাসিত। ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে 'অবকাশ রঞ্জিনীর' প্রথম ভাগের প্রকাশকাল থেকে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত 'রঙ্গমতী কাব্যে'ই স্বদেশাত্মক মনোভাবটি কবি নিঃশেষে প্রকাশ করে ফেলেন। সুতরাং নবীনচন্দ্রের স্বদেশাত্মক মনোভঙ্গিমা বিশ্লেষণের জন্য এই সময়টুকুই বেছে নিতে হবে। তবে স্বাদেশিকতা ও স্বধর্মচর্চার মধ্যে বস্তুতঃ কোনো বিরোধ নেই বলেই এই আধ্যাত্মিকতার মূলে কবির স্বদেশ ভাবনার প্রচ্ছন্ন প্রকাশকেও মেনে নেওয়া যায়। সাহিত্যসাধক চরিতমালাকার নবীনচন্দ্র বিচারে এই দুটি সুরকে পৃথক বলে ব্যাখ্যা করেছেন,—"স্বদেশপ্রেম এবং আধ্যাত্মিকতা, এই দুইটি মূল সুর নবীনচন্দ্রের কাব্যগ্রন্থাবলীর মধ্যে অনুস্যূত।"—স্বদেশভাবনার সঙ্গে ঈশ্বরোপাসনার বাহ্যিক বা অন্তরঙ্গ মিল না থাকতেও পারে কিন্তু স্বদেশভাবনার পরে স্বধর্মবিচারের আধুনিক পন্থানুসরণের মধ্যে প্রত্যক্ষ যোগসূত্র রয়েছে। সুতরা নবীনচন্দ্রের স্বদেশভাবনা ও স্বধর্মভাবনা মূলতঃ একটি রাগিনীরই বিভিন্ন স্ব সাধনা।

জাতীয় ভাবের উদ্দীপনব্রত নিয়েই হেমচন্দ্রের আবির্ভাব, নবীনচন্দ্রের আগমন বিদেশীশাসনের সঙ্গে নিবিড় পরিচয় পালা সাঙ্গ করে সেদিনের বুদ্ধিজীবী মানুষে আত্মবিশ্লেষণে মগ্ন হয়েছে আর গভীর হতাশায় ও আক্ষেপে ধূসরতর অতীতে বর্তমানে প্রতিষ্ঠা করে এসেছে প্রাণপণে। অধুনাতন আমরাই কেবল অন্তর্দ্বন্দ্বে পীড়ি হইনি, সনাতনী আমরা বিক্ষুব্ধও হয়েছি। আত্মপ্রকাশ পর্বের স্তরে স্তরে প্রধূমি অগ্নিশিখাকে প্রোজ্জ্বল করেই অবশেষে নিশ্চিত বিশ্বাসের দাবানল জ্বলেছি হেমচন্দ্রের উপলব্ধিতে যে প্রদাহ—যে বিক্ষুব্ধ মনোভাবের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নবীনচন্দ্রে একই মনোভাব অভিযোগে-অভিমানে মথিত। হেমচন্দ্র যখন "ভা সঙ্গীতের" বিলাপধ্বনিতে বাংলাদেশের আবহাওয়াকে উত্তপ্ত করে তুলছিে নবীনচন্দ্রের বেদনাঘন উপলব্ধি তখন খণ্ড কবিতাকারে অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে নবীনচন্দ্রের উৎসারিত স্বদেশভাবনা মুমূর্ষু দেশবাসীর তিক্ত অভিজ্ঞতাকে ে করেই সৃষ্ট হয়েছে। মাতৃভূমির জন্য অশ্রুমোচন করে সঞ্চিত গ্লানিকে ধুয়েমুছে করার এই পদ্ধতিটি সেকালীন কবিতায় বহু দৃষ্ট হলেও এর উদ্দেশ্যের সততায় স

করা অনুচিত। উদ্দেশ্যের অকৃত্রিম মহত্ত্ব দিয়েই এসব কবিতার বিচার সম্ভব। আর হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্র যে যুগে জন্মেছিলেন তখন বেঁচে থাকার সর্বজনীন সুবিধাগুলিও আমাদের অনায়ত্ত ছিল। সাধ্য ছিল না বলেই অধিকারবঞ্চিত সে যুগের মানুষরা বাঁচার সাধ ও স্বপ্নকে নির্বাসন দিতে পারেনি। অসহায় কবিরা তাই ক্রন্দনের সহজও সুলভ পন্থাটি আবিষ্কার করেছিলেন। বস্তুতঃ বহু মানুষের অশ্রুজলকে এঁরা সুবোধ্য বা সর্বজনবোধ্য রূপ দিয়ে ছিলেন কাব্যে-কবিতায়। নবীনচন্দ্র তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক কবিতায় "স্বাধীনতার জন্য নিঃশ্বাস ও মাতৃভূমির জন্য অশ্রুবিসর্জন করেছিলেন"—স্বীকারোক্তির সাক্ষ্যই তা জানিয়ে দেয়। হেমচন্দ্রের কবিতায় এই ক্রন্দন যথার্থ ট্র্যাজিক মহিমা লাভে সক্ষম হয়েছে, কারণ ব্যক্তিগত চিন্তাকে দেশচিন্তায় পরিণত করে কবি হতাশা ও বিষাদের গভীরে ডুবে গেছেন। রাজশক্তি যেদিন কবির কণ্ঠরোধে উদ্যত হল, এই বিষাদ শতধাবিদীর্ণ আর্তনাদে বাংলার আকাশ বাতাস আকুল করে তুলেছিল। নবীনচন্দ্রের কবিতাতেও সে যুগীয় ঝটিকা সংকেত, বিক্ষুব্ধ গর্জন সমভাবে প্রতিবিম্বিত। শিক্ষিত-পরিমার্জিত চিন্তাশীলতা নিয়ে পরাধীনতার দাসত্ব গলাধঃকরণ করে নীলকণ্ঠের ভূমিকায় অভিনয় করাটা সেযুগে সম্ভব ছিল না। যুগবোধ ব্যক্তি-বোধকে এমনি করেই গ্রাস করে সব দেশে ও সব যুগে, চেষ্টা করেও আত্মরক্ষা করা যায়না সেদিন। তাই নবীনচন্দ্র কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেলেন স্বাদেশিকতার অনুভবকে সর্বসাধারণ্যে ছড়িয়ে দিয়েই। এমনি করেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তের কবিগোষ্ঠী বিংশ শতাব্দীর আগামী কবিদের স্বদেশচিন্তার সূত্র ধরিয়ে দিয়েছিলেন।

কবিতারচনার প্রথম যুগে প্রশংসা ও প্রেরণার যুগ্ম প্রয়োজনে নবীনচন্দ্র স্বদেশপ্রেম অবলম্বন করেছিলেন কবিতার মূলভাব হিসেবে—যদিও একেই স্থায়ীভাব বলা যাবে না। কবির 'আমার জীবনের' কোন অংশে এই প্রশংসাউৎসুক কবিচিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। কবির যশোহর থাকাকালীন তাঁর "সায়ংচিন্তার" কোন অংশ আবৃত্ত হতে শুনেছিলেন—এবং জনসমাদরের নিরিখে আত্মবিচার করতে গিয়েই সমকালীন কবিদের ওপর অজান্তেই অবিচার করেছিলেন,—"আমি এডুকেশন গেজেটে লিখিবার পূর্বে স্মরণ হয়, স্বদেশপ্রেমের নাম গন্ধ বাংলার কাব্যে কি কবিতায় ছিল না।"

স্বলিখিত আত্মচরিতের এই পূর্ণ ভ্রান্ত উক্তিটি সম্ভবতঃ প্রশংসাবিগলিত কবির বিচলিত মনোভাবেরই ফল। এ প্রসঙ্গে কবিচিত্তে স্বদেশপ্রেম সঞ্চারের প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করেছিলেন,—

"এ স্বদেশপ্রেম অধ্যয়ন সময়ে আমার হৃদয়ে অঙ্কুরিত হয়, এবং যশোহরে শিশির বাবুর সংস্পর্শে আসিয়া উহা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে থাকে।"

এই উক্তিও নবীনচন্দ্রের স্বদেশাত্মক মনোভাবের সূচনাপর্বের ব্যাখ্যায় সাহায্য করে না। এ অংশটিতেও আত্মবিশ্লেষণে কবি যথেষ্ট অসাবধানতার পরিচয় দিয়েছেন। বাল্যকালে চট্টগ্রামের প্রকৃতিপ্রেমে মুগ্ধ কিশোরটির মনে যে স্বদেশাত্মক অনুভূতি প্রকাশের পথ খুঁজেছে কবি নিজেই তার স্বরূপব্যাখ্যা করতে ইতস্ততঃ করেছেন কেন বোঝা যায়না। নবীনচন্দ্র স্বদেশপ্রীতি সম্বল করেই কাব্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন, - এ তাঁর সহজাত অনুভূতি,—কিন্তু এই সহজ সত্যটি বিশ্লেষণে কবি নিজে অক্ষম। যশোহরে অবস্থান কালেই কবি স্বদেশপ্রেমাত্মক অনুভূতি খণ্ড কবিতাকারে প্রকাশ করেন—এবং এখানেই "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যের বিষয়টি ক্ষুদ্র কবিতাকারে রচনা করেন। সুতরাং যশোহরবাসই নবীনচন্দ্রের মনে স্বাদেশিক ভাব সঞ্চারের ক্ষেত্র বলে মেনে নিতে হয়। উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে প্রাপ্য সম্মানের সঙ্গে অতিরিক্ত যে মর্যাদাটুকু সহকর্মী ও বন্ধুদের কাছ থেকে নবীনচন্দ্র পেয়েছিলেন সে মর্যাদা স্বদেশপ্রেমী কবির। নবীনচন্দ্রও জানতেন স্বাদেশিকতার মানদণ্ডে তিনি স্বীকৃতি পেয়েছেন।

নবীনচন্দ্রের, "অবকাশ রঞ্জিনীর" প্রথম ভাগের কবিতালোচনায় দেখা যাবে— আঠার থেকে তেইশ বছরেই স্বদেশচিন্তা কবিকে কিভাবে অধিকার করেছিল। ছাত্র জীবন ও কর্মজীবনে প্রবেশের মুহূর্তে তিনি দেশচিন্তার পবিত্র ধ্যানে মগ্ন ছিলেন। শুধু কবিদেরই নয়, যে কোন সাধারণ-অসাধারণ মানুষের জীবনেই যৌবনের ঊষালগ্নটি বড় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। নবীনচন্দ্রের কাব্যজীবনে ও কর্মজীবনের ঊষালগ্নে দেশপ্রীতির মত লক্ষ্যণীয় এবং স্মরণীয় একটি চারিত্রিক গুণের প্রভাব সবার আগে চোখে পড়ছে। এই দেশপ্রীতিই নবীনচন্দ্রকে কাব্যজীবনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে,—কর্মজীবনে বিঘ্ন এনেছে। একদা নবীনচন্দ্রের পরিচয় ছিল 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রণেতারূপে ; —"ত্রয়ীর" মত একটি গুরুত্বপূর্ণ নব্যপুরাণ লিখেও পুরোন পরিচয় হারিয়ে যায়নি এটা বড়ো কম কথা নয়। অথচ কাব্য হিসেবে বহু অসম্পূর্ণতা এতে আছে তা জেনেও জনগণ কাব্যটিকে মর্যাদা দিয়েছে। 'পলাশীর যুদ্ধ' নাটক না হয়েও অভিনীত হয়েছে,—অনুবাদকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পূর্ববর্তীদের কাব্যেও দেশপ্রেমের আবেদন যে ভাবে জনমনকে আকর্ষণ করেছে তার পরিচয় পেয়েছি কিন্তু মহাকাব্যের কবিরা সাধারণ কাব্যের অন্তরালে হারিয়ে যাননি এটাই বিস্ময়ের কথা। মধুসূদনের যথার্থ স্বরূপ "মেঘনাদবধ কাব্যে" গোপন ছিল না, "বৃত্রসংহার" হেমচন্দ্রের জীবনদর্শন ব্যাখ্যা করেছে কিন্তু "ত্রয়ী" কাব্য নবীনচরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করতে পারেনি। সমকালীন বিচারে স্বদেশপ্রেমের কবিরূপেই নবীনচন্দ্র শ্রদ্ধা লাভে সমর্থ হন,—ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত রচনার পর্বটিকে কবির আধ্যাত্মিকতা বিশ্লেষণের প্রসঙ্গেই ব্যবহার করা হয় এবং আজও হচ্ছে। সৃষ্টি হিসাবে কোনটি সার্থক সে বিচার পৃথক,—কিন্তু স্বদেশপ্রে

যে উনবিংশ শতাব্দীর কবিকুলের ছাড়পত্র রূপে বিবেচিত হোতো এ প্রসঙ্গে সে কথাই মনে আসে। নবীনচন্দ্রের কাব্যজীবনের প্রতিষ্ঠালগ্নের সৃষ্টিগুলিতেই স্বদেশাত্মক মনোভঙ্গিমার প্রতিফলন রয়েছে। দেশচেতনার পূর্ণ পরিচয় আবিষ্কার করতে গেলে নবীনচন্দ্রের কাব্যোন্মেষ পর্বটিকেই যে বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে তা বলেছি। আবাল্য কবি জন্মস্থানের সৌন্দর্য ও রূপের মুগ্ধ পূজারী। সুন্দরী চট্টল কবিমনে যে গভীর প্রেম উদ্বোধিত করেছিল তার প্রমাণ শুধু কাব্য কবিতাতেই নয়,—আত্মজীবনীতে কবি তা বিস্তারিতভাবেই ব্যাখ্যা করেছেন। এই প্রকৃতি প্রেমই নবীনচন্দ্রের জন্মস্থানপ্রীতি তথা জন্মভূমিপ্রীতীতে পর্যবসিত। 'রঙ্গমতী কাব্য' রচনা করে সুন্দরী চট্টলকে লোকনয়নের সামনে তুলে ধরার আন্তরিক চেষ্টা করেছেন কবি। নবীনচন্দ্রের গীতিপ্রাণতার মূলেও রয়েছে প্রকৃতি প্রেমমুগ্ধ হৃদয়ের ভাবাবেগ। এই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতা রচনা করাই নবীনচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য, আন্তরিকতায় সে কবিতা ধন্য হয়,—অনুভববেদ্য সত্যপ্রকাশে সে কবিতার তুলনা নেই। কিন্তু নবীনচন্দ্রের স্বাভাবিক জন্মভূমিপ্রীতির পরিচয় যৌবনের প্রারম্ভে রচিত অবকাশ রঞ্জিনীর ১ম ভাগের কবিতায় আশ্চর্যজনক ভাবে অনুপস্থিত। অথচ চেষ্টাকৃত বিষয়বস্তু আহরণ করে কবি হওয়ার আপ্রাণ চেষ্টায় করি তখন অক্লান্ত সাধনায় রত। নবীনচন্দ্রের প্রবণতা প্রথম যুগের সৃষ্টির মধ্যে প্রতিফলিত হয়নি দেখে আক্ষেপ হয় বটে, কিন্তু আয়োজনের ঘটা দেখলে অন্যদিক থেকে নবীনচন্দ্রকে অভিনন্দন জানাতে হয়। চট্টগ্রামের স্কুলের ছাত্রটির সমস্ত অন্তর জুড়ে সেদিন সমগ্র দেশের চিন্তা বাসা বেঁধেছিল; রাজনৈতিক—সামাজিক ও নৈতিক সমস্ত ভাবনা কবিকে দিশাহারা করেছিল। সমকালীন চেতনা কবির স্বাভাবিকতাকে আচ্ছন্ন করেছিল বলেই নবীনচন্দ্রের প্রথম যুগের সৃষ্টিতে চিন্তাক্লিষ্ট নবীন কবিকে আবিষ্কার করা যায় অতি সহজে। ছদ্মগাম্ভীর্য নিয়ে নিপুণ ভাবে দেশপ্রেমিকের ভূমিকায় কবি অভিনয় করেছেন। মধুসূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তাঁর প্রবাসী মনের করুণ আলাপ, অথচ নবীনচন্দ্র সুন্দরী চট্টলের জন্য একটি পঙ্‌ক্তিও নিবেদন করলেন না, এই আলোকে উভয় কবির মানস পরিমণ্ডলটি বিচার করাটা খুব অযৌক্তিক হবে না। তার কারণ মধুসূদনের দেশপ্রেম অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত চিরপ্রবাহ বয়ে বেড়ায়, নবীনচন্দ্র সাড়ম্বরে চট্টলপ্রীতি প্রকাশ করেন কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্তু হিসেবে গুপ্তজার মত সাময়িকতাকেই আঁকড়ে ধরে থাকেন।

এ আলোচনা থেকে নবীনচন্দ্রের স্বদেশভাবনার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির পরোক্ষ যোগাযোগের কথা স্পষ্ট হবে। স্বদেশপ্রেম বা জন্মভূমিপ্রীতি নবীনচন্দ্রে সহজাত কিন্তু কাব্যের বিষয়বস্তু রূপে আমরা কবির সাড়ম্বর দেশচিন্তার প্রমাণ পাই।

"অবকাশ রঞ্জিনীর" ১ম ভাগে নবীনচন্দ্র প্রবীন কবির মতো স্বদেশপ্রেম অবলম্বনে স্বাদেশিক কবিতা রচনা করেছেন। একথা যত অস্বীকারই করুন না কেন,—দেশ-ভাবনাজাত কবিতা রচনা করাটা সে যুগে প্রায় ফ্যাসানে দাঁড়িয়ে গেছে,—নবীনচন্দ্র তীক্ষ্ণধীর মত এর ফলাফল জেনে ফেলেছিলেন। 'অবকাশ রঞ্জিনীর' বহু কবিতায় কবি যে প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তার আবেদন নিছক সাময়িক কবিতা বলেই। সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ক্ষেত্রেও দেশপ্রেমের প্রসঙ্গটি তিনি আরোপ না করে পারেননি,—এই আরোপিত দেশপ্রেমের স্বরূপটি সে যুগে বসে বিচার করা সম্ভব ছিল না। অনেক সময় বহু অসঙ্গতি ও অর্থহীনতাও ধরা পড়েছে,—কিন্তু তাতে দেশপ্রীতি বোঝাতে অসুবিধে হয়নি। বহু কবির রচনাংশ বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা করেই দেশচিন্তার প্রসঙ্গে আসতে হয়েছে। "অবকাশ রঞ্জিনী"র [১ম ভাগ] বহু কবিতায় এই চেষ্টাকৃত স্বাদেশিকতা সহজেই ধরা পড়ে। তার মানে এই নয়, সর্বত্রই তা আরোপিত বা চেষ্টাকৃত। শুধু আরোপের প্রসঙ্গ যেখানে অতি প্রত্যক্ষ তাকে নির্ভেজাল আন্তরিকতা বলে ব্যাখ্যা করার অর্থ হয়না। নবীনচন্দ্রের একটি বা দুটি কবিতা আলোচনা করলেই এ সত্য স্পষ্ট হবে।

"চট্টগ্রামের সৌভাগ্য" কবিতাটির বিষয়বস্তু নিতান্তই ব্যক্তিগত। চট্টগ্রামবাসী কবিবন্ধু ও আত্মীয়ের ডিগ্রী প্রাপ্তিতে আনন্দিত কবি এ কবিতাটি রচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার যথার্থ অর্থটি অনুধাবন করেই কবি উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। আলোকে আসার চেষ্টায় যাঁরা সফলকাম কবির অভিনন্দন সেখানে সঙ্গত ও স্বাভাবিক অভিব্যক্তি বলেই মনে করা যায়। কনভোকেশন দর্শনান্তর কবিচিত্তে এই ভাবটি জাগরিত হয়েছিল। কিন্তু কবিতাটির প্রারম্ভ মুহূর্তে চট্টগ্রামের যে পরাধীনা, অশ্রুভারানত চিত্রটি কবি অঙ্কন করেছেন—তাতে শুধু চট্টগ্রামের নয় সমগ্র ভারতের শৃঙ্খলিতা, ক্রন্দনসিক্তা ভারতজননীর মূর্তিটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। কবিতাটির জন্মমুহূর্তে কবির যে মনোভাব লক্ষ্য করেছি তার মূলে আশা ও ভবিষ্যতের আনন্দই মুখ্য, কিন্তু সমকালীন দেশানুরাগের স্পর্শ দিয়ে কবিতাটির বক্তব্য অনেক ব্যাপক ও প্রসারিত করা হয়েছে। চট্টগ্রামের দুঃখের চিত্রটি স্থানিক সঙ্কীর্ণতা অতিক্রম করে সর্বজনীন ভারতের দুর্দশার প্রতীক হয়েছে। নিঃসন্দেহে এ এক নিপুণ প্রযুক্তি (technic) কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তি সত্যকে অকপটভাবে প্রকাশ করার সারল্য হারিয়ে কবির দেশপ্রেম আরোপের চেষ্টাটি লক্ষ্যণীয়! কবিতাটির প্রথম দুটি স্তবকে পরাধীন দেশের গ্লানি ও ক্রন্দনের একটি নিখুঁত বর্ণনা কবি অনায়াসে যো' করেছেন। বস্তুতঃ সেকালে ব্যক্তি অনুভূতির উপর ভরসা না করে কবিরা একা দৃষ্টি আকর্ষণের সহজ সূত্র রচনা করেছিলেন। নিবিড় আন্তরিকতা না থাকু

অগভীর চিন্তাতেও দেশচিন্তা কি ভাবে কবিস্বভাবকে অধিকার করেছিল তার প্রমাণ এটি।

"চট্টগ্রামের সৌভাগ্য" কবিতার আরম্ভ মুহূর্তে কবিকেও আমরা চিন্তান্বিত—বিষাদক্লিষ্ট রূপে দেখি,—

[১]

উঠ উঠ জন্মভূমি উঠ একবার।
বসি অবনত মুখে, মজিয়া মনের দুখে,
বিরস বদনে মাতা কেঁদো নাক আর।
কি দুঃখে কাঁদিছ এত বল না আমায়,—
তব মুখ দেখি, বুক বিদরিয়া যায়।

[২]

বিগলিত অশ্রুধারা কর সম্বরণ,
মাথা তোল জন্মভূমি, বল মা! আমায় তুমি,
এমন মলিন বেশ কিসের কারণ?
মা! তোমার অশ্রুবারি ঝরি অনিবার,
বহিতেছে "কর্ণফুলী" স্রোত দুর্নিবার।

নিঃসন্দেহে এ ক্রন্দন পরাধীনতার ক্রন্দন। নবীনচন্দ্র যে যুগে কাব্যজগতে প্রবেশ করেছিলেন সে যুগের বাঙ্গালী বাংলা মায়ের এই রিক্তরূপ কল্পনা করেছে। এই ক্রন্দন দেশভক্ত সন্তানদের চিত্তে যে অব্যক্ত ব্যথা সৃজন করেছে—দেশপ্রেম সেই ব্যথারই আরতি। নবীনচন্দ্র চট্টগ্রাম শব্দটি ব্যবহার করেছেন বলেই এ অংশটিকে আমরা সমগ্র বাংলাদেশের রূপক হিসাবে ব্যবহার করতে পারি না। খুব স্পষ্টভাবে চট্টগ্রামের দুটি কৃতি ছাত্রের সাফল্য যে কবিতায় সংবাদ হিসেবে পরিবেশিত হয়েছে তা যত মর্মস্পর্শী হোক না কেন স্থানিকতার উর্ধ্বে তার বিচার চলতে পারে না। অথচ শুধু চট্টগ্রামের চিত্র হিসেবে এমন একটি আবেদনপূর্ণ দেশাত্মবোধক কবিতাংশকে কেমন করে একঘরে করে রাখি। নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেমের বিচিত্র রূপটিই এ অংশে ধরা পড়েছিল। শুধুই জন্মভূমির রিক্ততার চিত্র নয়, কবি সযত্নে সমগ্র দেশের আত্মাটিকেই আবিষ্কার করে চলেছেন।

ছাত্রজীবনেই হিন্দুমেলার মত একটি জাতীয় উৎসবের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের পরিচয় ঘটেছিল। কলকাতায় "ন্যাশন্যাল মুভমেণ্ট" প্রথম শুরু করেন নবগোপাল মিত্র। সেই সভাতেই ঠাকুরবাড়ীর স্বদেশপ্রাণ সন্তানেরা প্রকাশ্যে যোগদান করতেন। স্বদেশী গানের প্রথম শুরুও হিন্দুমেলাতেই। উদ্বোধন সংগীত হিসেবে গাইবার জন্যই

গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী-গান রচনা করেছেন। দেশ বলতে বাংলা নয়, দেশবাসী বলতে যে কেবল হিন্দুকেই বোঝায়না, হিন্দু-মেলাতেই তা প্রমাণিত হয়েছিল। নবীনচন্দ্রই শুধু নয়, সে যুগের স্বদেশী কবিরা এ উৎসবকে মনেপ্রাণে বরণ করেছিলেন।

নবীনচন্দ্রের জন্মভূমিপ্রীতি ও সেযুগীয় দেশচিন্তার যোগফলই 'অবকাশ রঞ্জিনীর' [১ম ভাগ] কবিতাগুচ্ছ। সে যুগের কবিরা আত্মমগ্ন ভাববিলাসে ডুব দিতে গিয়েও যুগধর্মের প্লাবনে ভেসেই চলেছেন। যে যুগের কোন কথাই তাঁদের একান্ত কথা নয়,—সকলের বক্তব্যই তাঁদের কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত। হেমচন্দ্রের 'কবিতাবলী'তে ক্ষুব্ধ কবিকণ্ঠের গুঞ্জন যেমন কবিকে হতাশার অন্ধকার গহ্বরে নিয়ে গেছে, নবীনচন্দ্রের স্বদেশমূলক কবিতাগুচ্ছেও অকারণ হতাশাবোধের কিছু পরিচয় ইতস্ততঃ খুঁজে পাবো। কিন্তু তা যে কবিচিত্তের আন্তরিক ক্ষুব্ধতা থেকেই এসেছে—একথা প্রমাণ করা যাবে না। নবীনচন্দ্রের বিষাদ কিংবা হতাশার মূলে কোন জীবনদর্শন বা আত্মদর্শন নেই। অথচ কারুণ্যের, অশ্রুজলের বিস্তারিত বর্ণনা সর্বত্রই দেখা যায়। নবীনচন্দ্র এসব কবিতায় উপলব্ধি ও অভিজ্ঞতাকে মেশাতে পারেন নি—চিন্তা ও শব্দের সাহায্যে মানসিক ব্যায়াম করে চলেছেন। "অবকাশ রঞ্জিনীর" খণ্ড কবিতাবলীতে আমরা এমন কোন প্রসঙ্গ পাইনা যা ইতিপূর্বে চোখে পড়েনি,—এমন কোন অনুভূতির সঙ্গে পরিচিত হইনা যা নিঃসন্দেহে শুধু নবীনচন্দ্রের বলেই ধরে নিতে পারি। স্বদেশপ্রেমের অনুভূতিটুকুও অগভীরভূমিতে কেমন করে অস্বচ্ছ হয়ে ওঠে,—নবীনচন্দ্রের "অবকাশ রঞ্জিনীর" (১ম ভাগের) খণ্ড কবিতাগুলি তার প্রমাণ। কবির কাব্যজীবনের প্রবেশপর্বে এদের জন্ম,—তাই খানিকটা অসম্পূর্ণতা এতে থাকবেই। কিন্তু দেশাত্ম-বোধের এই অনতিগভীর অনুভূতিই পরিণত বয়সের কাব্যে কত সার্থকরূপে ধরা পড়েছে, তাই "পলাশীর যুদ্ধের" রচয়িতা নবীনচন্দ্রকে অকৃপণ প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছিলেন সেযুগের সমালোচকবৃন্দ। সাহিত্যসাধক চরিতমালাকারের নিম্নলিখিত মন্তব্যের যৌক্তিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে এখানে,—

"দেশের প্রতি সুগভীর ভালবাসায় তাঁহার হৃদয় ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ, পরাধীনতার বেদনা তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছেন।...এই দেশপ্রীতির প্রেরণায় তাঁহার অন্তঃস্থল হইতে যে কবিত্বস্রোত তরুণ বয়সেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উৎসারিত হইয়া উঠিয়াছিল পরিণত যৌবনে তাহাই দুকূল প্লাবিত হইয়া তাঁহাকে পলাশীর যুদ্ধ রচনায় প্রণোদিত করে।"

"অবকাশ রঞ্জিনীর' (১ম ভাগ) কবিতাতে দেশপ্রীতির প্রসঙ্গই মুখ্য, কিন্তু জ বনারম্ভের মুহূর্তেও উন্মাদনা নয়, অবসন্নতাই ঘিরে আছে কবিকে। হেমচন্দ্রের

মতো সে অবসাদ আর্তনাদে রূপান্তরিত নয়, নবীনচন্দ্রের সচেতন বৈরাগ্য লিরিক উচ্ছ্বাসে ফেনায়িত হয়ে উঠেছে। "সায়ংচিন্তা" নামক কবিতাটির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য। যে পৃথিবীকে কবি প্রত্যক্ষ করলেন সে শুধু পরাধীনতার শীর্ণ ছবি। অজ্ঞতার আশীর্বাদকেও কখনও কখনও পরম কাম্য বলে মনে হয় কবির, পরাধীনতার গ্লানি অনুভব করার মত মনই যার তৈরী হয়নি, তার মনে স্বস্তিটুকু অন্ততঃ আছে।

"গাইছে রাখাল শিশু মধুর গায়ন,—
নাহি কোন চিন্তা, নাহি ভবিষ্যৎ ভয়।

* * *

নাহি জানে অধীনতা কেমন নিগড়,
স্বাধীনতা কি রতন, ভাবে না কখন।

এই অজ্ঞতাকেই কবি কাম্য বলে মনে করছেন,—

কেন বা ফুটিল মম জ্ঞানের নয়ন,
কেনই বিবেক-শক্তি হলো বিকশিত,
উথলিতে অভাগার, শোকসিন্ধু অনিবার,
নিজ হীন অবস্থায় করিতে দুঃখিত,
কেনই ভাঙ্গিল মম শৈশব স্বপন।

এখানে আক্ষেপের অনতিগভীর স্বরটি সুস্পষ্ট—সচেতন বৈরাগ্যও লক্ষণীয়। এই ধরণের সুলভ জীবন জিজ্ঞাসা কখনও জীবন দার্শনিকতার ভিত্তি হতে পারে না। অবশ্য দেশাত্মবোধকে জীবনদর্শনের গভীর আধারে স্থাপন করা চলে না তবে কখনও কখনও "দেশাত্মবোধ" কবির মনোজগতে স্থায়ীভাব রূপে দেখা যায়। দেশ ও আত্মার সম্মিলিত স্বভাব একটি মনের সমস্ত চিন্তাকে গ্রাস করতে পারে বলেই ত দেশপ্রেম নয়,—দেশাত্মবোধ শব্দটি এ প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। "সায়ংচিন্তার" মধ্যে কবি খুব স্পষ্টভাবেই দেশচিন্তার উৎস অনুসন্ধান করেছেন। নবীনচন্দ্র ইতিহাস, রাজনীতি, সমাজনীতির আলোচনা থেকেই দেশাত্মবোধ লাভ করেছিলেন। পঠন পাঠন আমাদের জ্ঞাননেত্রই উদ্বোধন করেনা আমাদের দেশপ্রেমিক সত্তাটিকেও জাগিয়ে তোলে। তাই সে যুগের আবহাওয়ায় বাস করে, শিক্ষালাভ করে, বাঙ্গালীর আত্মদর্শন জাগরিত হয়েছিল অনায়াসে। ডিরোজিওকে শিক্ষকরূপে লাভ করেছিলেন বলেই রাজনারায়ণ-ভূদেব গোষ্ঠীর দেশপ্রেমচিন্তা অন্যান্য চিন্তার থেকেও বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিলো। নবীনচন্দ্রের পুরোভাগে উনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাশীল দেশপ্রেমিকদের মিছিল। নবীনচন্দ্র 'সায়ংচিন্তায়' আত্মজাগরণ পর্বটি সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন,—

ভারতের ইতিহাস, শোকের সাগর,
কেন পড়িলাম, আমি কেন পাইলাম
আপনার পরিচয়, আর্য বংশ কীর্তিচয়
কেন দেখিলাম, আহা! কেন জন্মিলাম
স্বাধীন বংশেতে মোরা অধীন পামর? [সায়ংচিন্তা]

বাঙ্গালীর জাতীয়তাবোধের মূলে ইতিহাস চেতনার প্রসঙ্গটি নবীনচন্দ্র অকপটে ব্যক্ত করেছেন। রঙ্গলাল-মধুসূদন-হেমচন্দ্র যে ইতিহাস প্রসঙ্গ বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছিলেন,—নবীনচন্দ্র সেই কাব্যকাহিনী পাঠ করেই চেয়েছিলেন দেশবোধ-স্বদেশপ্রেম। যশোহরের কবিবন্ধুরা নবীনকাব্যের এই অর্থপূর্ণ অংশটি বারবার আবৃত্তি করতেন, কারণ এমন অকপট সত্য দুর্লভ। ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ঔজ্জ্বল্যেই জাতীয় চরিত্রের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হতে পারে, আমাদের চিনতে হলে আমাদের ঐতিহ্যের কষ্টিপাথরের সাহায্য নিতে হবে। নবীনচন্দ্র ঠিক তাই করেছিলেন,—প্রাচীন ভারতের গরিমার আলোকে আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়েই ব্যথাহত হয়েছেন,—

তাঁদের সন্তান কি গো আমরা সকল।
আমরা দুর্বল ক্ষীণ পাপিষ্ঠ হৃদয়। [ঐ]

এখানে উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমী কবিদের সঙ্গে তিনিও কণ্ঠ মিলিয়েছেন। এই বেদনায় জাতীয়তার গান সাহিত্যের সত্য হয়ে দেখা দিয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশীসঙ্গীতের মর্মকথাটিও এই,—

জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান!
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্বকীর্তি করহ স্মরণ,
রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন?

প্রকাশ্য সভায় এ সংগীতটি সমগ্র জাতির সামনে এক প্রচণ্ড আবেগকেই তুলে ধরেছে। মাকে ভুলে ভারতসন্তানেরা আর কতদিন বা সুপ্ত থাকবেন? নবীনচন্দ্রের খণ্ড কবিতায় সেযুগের ধ্রুব জিজ্ঞাসাটিই স্থানলাভ করেছিলো। পূর্বেই বলেছি, "সায়ংচিন্তা" রচনার পশ্চাৎপটে কবিচিত্তের অবসন্নতাই মুখ্য হয়ে উঠেছে। আত্ম-বিশ্লেষণের নিপুণ মহিমায় উজ্জ্বল এমন কবিতাতেও কবির নৈরাশ্য ঘিরে আছে। কিন্তু এ মনোভাবটিকে স্বদেশপ্রেমী কবির বিশ্বাস-শ্লথ মনের অনতিগভীর চিন্তাবলেই ধরে নিতে হবে। রাজনৈতিক চেতনা কবির আকুতিকে কিভাবে বিলাপের পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে সে দৃষ্টান্ত হেমচন্দ্রের কাব্যে মিলেছে। নবীনচন্দ্রের আকুতি আবেদনের রূপ নিয়েছে বলেই তাঁর স্বদেশচিন্তার ওপর হেমচন্দ্রের চেয়ে ঈশ্বরগুপ্তের প্রভাবই বেশী।

ঈশ্বরগুপ্ত একই সঙ্গে দেশপ্রেমও ইংরাজবন্দনা করে অনায়াসে দু' নৌকোয় পা দিয়ে দাঁড়িয়েছেন,—অবিচলিত নিষ্ঠা না বলে একে বিচলিত আদর্শ বলাই সঙ্গত। ঈশ্বরগুপ্ত দেশাত্মবোধের দ্বিধাখণ্ডিত মনোভাব পোষণ করেছেন,—দেশপ্রেমের অবিচল আদর্শ তাঁর সামনে ছিলো না; এ ভুল মারাত্মক নয়, অসঙ্গতও নয়। কিন্তু নবীনচন্দ্র আদর্শও নিষ্ঠার আভিধানিক অর্থ জেনেও এ ভুল করেছেন। ঐতিহ্যপ্রীতি, ইতিহাসচেতনা ও বিশুদ্ধ স্বাদেশিকতা কি বস্তু জেনেও তিনি ইংরাজের কাছে করজোড়ে সমাধানের উপায় জানতে চেয়েছেন, এখানেই তাঁর ভ্রান্তি। পরাধীনতার জ্বালা তাঁকে উত্তেজিত করেনি,—নিষ্ফলের দলে থেকেই যাবার চিন্তা যেন কবির মনে স্থান পেয়েছে। "সায়ংচিন্তা" কবিতার শেষাংশে ইংলণ্ডেশ্বরীর কাছে কবি আশ্রয় ভিক্ষা করছেন,—

"রে বিধাতঃ।
কি দোষে ভারতভূমি দোষী ও-চরণে?
কেন অভাগিনী সহে এতেক যন্ত্রণা,
ভারত নিঃশ্বাসে ভার দিয়ে যাও সিন্ধুপার,
রাণী যিনি, কহ তাঁরে এসব যাতনা,
কাঁদিবেন দয়াবতী ভারত-রোদনে।

আত্মবিশ্বাস ও আশাবাদের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার মত মনোবল ছিলনা বলেই নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমে খণ্ডিত সংশয় ও দ্বিধার চিত্র প্রকট। এ ব্যাপারে তিনি সেকালীন গতানুগতিক মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। পরাধীনতার ক্রন্দনেও অবিমিশ্র উত্তাপ সঞ্চারের, আন্তরিকতার অভাব সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়। কবির মনোদর্পণে কালোত্তীর্ণ ভবিষ্যতের ছবি ফুটে ওঠাটাই যেখানে স্বাভাবিক ছিলো দ্বিধা, সংশয়, ভীরুতার অক্টোপাশে সেই কথাই বন্দী হয়ে রইলো বলে আক্ষেপ করতেই হয়। অথচ সহজাত 'দেশবুদ্ধি নিয়েই নবীনচন্দ্র সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। স্বদেশের জন্য অশ্রুবিসর্জনের প্রসঙ্গটি কবি ব্যক্ত করেছেন আত্মকথায়, কবিতায় নয়। জ্বালা ও গ্লানি, বীর্যহীনতা ও হীনমন্যতার হাত থেকে বাঁচানোর অকৃত্রিম প্রয়াস সমগ্র বঙ্কিমজীবনের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছিলো, নবীনচন্দ্রের প্রথম যুগের দেশাত্মবোধেই কিন্তু জড়তা ও ভীরুতার স্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। জীবনের যে পর্বটিতে এই কবিতা লিখিত হয়েছিল রাজনৈতিক, কূটনীতিক কিংবা ভবিষ্যতচিন্তা কোনটিই প্রাণচাঞ্চল্যকে দমন করতে পারে না। আঠার থেকে তেইশ বছর বয়সে উচ্ছ্বাস ও আদর্শ প্রায় দুর্নিবার হয়ে উঠতে চায়—তাই হৃদয়োচ্ছ্বাসে অকৃত্রিমতা, উত্তেজনায় অকৃপণতাই ধরা পড়ে। অথচ নবীনচন্দ্র পরাধীনতার জ্বালা মর্মে মর্মে

উপলব্ধি করেও স্বাধীনতা পাওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারেননি। কর্মজীবনে উদ্যত রাজরোষের প্রসঙ্গ তখনও চিন্তার কারণ হয়ে ওঠেনি,—কবি যেন অকারণেই নত হয়েছেন। সেই ভরসায় কবি বসে আছেন,—

"কাঁদিবেন দয়াবতী ভারত রোদনে"

আঠার থেকে তেইশ বছরেই কবি শান্ত-অনুদ্ধত-হৃদয়োচ্ছ্বাস নিয়ে দেশপ্রেমের কবিতা রচনা করেছিলেন ; দেশপ্রেমের গভীর আকুতি রুদ্ধরোষে বজ্রনির্ঘোষে শোনা যাবে কি করে ?

আরও একটি কবিতায় নবীনচন্দ্রের স্বীকারোক্তি তাঁর অগভীর উচ্ছ্বাস ব্যক্ত করেছে। 'পিতৃহীন যুবক' 'পতিপ্রেমেদুঃখিনী কামিনী' কিংবা 'বিধবা কামিনীর' মত কবিতায় কবির সহানুভূতি বাহ্যিক বলে মনে হয়। কোথাও কবি জীবন সংগ্রামে সৈনিকের ভূমিকা নিতে চাননি। বিধবা নারীর জীবনসমস্যা বিদ্যাসাগরের মনকে ব্যথিত করেছিল বলেই স্থায়ী সমাধানের জন্য সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। অথচ নবীনচন্দ্র দেশাচার রাক্ষসীকে মৃদু ভর্ৎসনা করেই শান্ত হয়েছেন। অকপটে নিজের অক্ষমতা নিবেদনেও তিনি অনন্য,—

ইচ্ছা করে একেবারে জ্ঞান-অসি ধরি,
দাসত্ব শৃঙ্খল একা কবি বিমোচন,
কিন্তু আমি অসহায়, তাহে শত অরি,
একেশ্বর কে কোথায় জিনিয়াছে রণ ?

[বিধবা কামিনী]

অক্ষমতার এমন অভিব্যক্তি খুব কম দেখা যায়। অথচ দেশসচেতনতা না থাকলে এমন একটি কবিতা লিখিত হতো না। সাময়িকতাকে আশ্রয় করার পূর্ণ সুযোগটুকু নবীনচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন শুধু সাময়িকতার অন্তরালে যে বিদ্রোহী আত্মার বিক্ষুব্ধ গুঞ্জরণ শোনা যায় অন্যান্য কবির রচনায়, নবীন কাব্যে তা অনুপস্থিত। ভাব, ভাষা ও প্রকাশভঙ্গীর দুর্বলতায়ও কবিতাগুলি ভারাক্রান্ত।

'অবকাশ রঞ্জিনীর' হৃদয়োচ্ছ্বাসপূর্ণ প্রেমকবিতা ছাড়া প্রায় সব কবিতারই অন্যতম বিষয়বস্তু স্বদেশ। স্বদেশ বলতে আমরা বিস্তৃতভাবে ভারতবর্ষকে সংকুচিত-ভাবে বঙ্গদেশকেই বুঝে থাকি। উনবিংশ শতাব্দীর কবিতায় স্বদেশ শব্দটি কখনও ভারত কখনও বাংলাদেশকেই বুঝিয়েছে। নবীনচন্দ্রের কবিতায় জন্মভূমি ও জন্মস্থান অনেক জায়গাতেই সমার্থক। কিন্তু স্বদেশ বলতে সমগ্র ভারতকেই বোঝানোর স্বাভাবিক চেষ্টা সর্বত্র রয়েছে। কবি যখন দেশের দুর্দশা স্মরণ করেন সমগ্র ভারতের

পদানত রূপটি কবিচিত্তে বেদনা সৃষ্টি করে। স্বজাতি সম্পর্কে বাঙ্গালীপ্রসঙ্গ বা হিন্দু-ঐতিহ্য স্মরণ করেও নবীনচন্দ্র আর্যসংস্কৃতিকেই প্রাধান্য দিয়েছিলেন। এ ব্যাপারেও কোন অভিনবত্ব দেখা যায়না। বাংলাসাহিত্যে বীরযুগ উদ্বোধনের মুহূর্তেই আমরা বাঙ্গালীয়ানা পরিত্যাগ করেছি, হিন্দুয়ানীকে গ্রহণ করার আগ্রহে। বস্তুতঃ স্বদেশ-প্রেমের অনুভূতি যেমন নিতান্ত ব্যক্তিগত হতে পারেনা তেমনি ঐতিহ্য গ্রহণের ব্যাপারেও উজ্জ্বল আদর্শকে আঁকড়ে ধরার সহজাত বুদ্ধি মানুষের রয়েছে। না হলে বঙ্গদেশের স্থানিক ঐতিহ্যকে আমল না দিয়ে বল্লালী যুগ থেকেই আর্যসংস্কৃতির প্রতি আমরা লুব্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছি কেন? ঐতিহ্যের উজ্জ্বলতা মানুষের দিনযাপনের অনেক গ্লানিকে ঢেকে ফেলে। দেশপ্রেমচিন্তার পরিসর উনবিংশ শতাব্দীতে ব্যাপকতম আকার গ্রহণ করেছিল—তা সর্বত্রই স্পষ্ট। জাতীয় আন্দোলনের পটভূমিকায় এই উদার দেশচিন্তাই সব মানুষকে এক ছত্রছায়াতলে দাঁড় করিয়েছে। গদ্যের বিস্তৃত কথায় বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টভাবেই হিন্দুপ্রীতির সমর্থন করে বাঙ্গালীয়ানাকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। তাঁর আদর্শে কিছু গোঁড়ামী থাকলেও বক্তব্যে কোন অস্পষ্টতা ছিল না। নবীনচন্দ্রের দেশাত্মবোধের পূর্ণ রূপ পাওয়ার জন্য বিচ্ছিন্ন অংশগুলো বিভিন্ন কবিতা থেকে সংগ্রহ করতে হয়। তা থেকেই কবির স্বদেশচিন্তার নিজস্ব রূপটি প্রতিভাত হয়ে থাকে। নবীনকাব্যে ভারতপ্রেম এসেছে পূর্বসাধকের চিন্তাপ্রভাবে, সমকালীন দেশাত্মবোধক সংগীতের প্রভাব পড়াও স্বাভাবিক। হিন্দুপ্রীতি অন্যান্য কবির মত নবীনচন্দ্রেও ওতপ্রোত—জন্মজাত। বাঙ্গালীয়ানা উচ্চশিক্ষার প্রকট প্রভাবে ক্রমশঃ প্রকাশিত। নবীনচন্দ্রের কবিতায় নানাভাবে ভারতপ্রীতির পরিচয় পেলেও স্বজাতিপ্রীতি বা বাঙ্গালীয়ানার উচ্ছ্বাস তুলনায় অনেক বেশী। জাতীয়তাবাদী কবির স্বরূপ চিনে নেবার জন্য এই অনুদারতা হয়ত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়—কিন্তু প্রত্যেক যুগের মানুষরাই চিন্তার প্রসঙ্গে কিছু কিছু সীমাবদ্ধতার পরিচয় দিয়ে এসেছেন। আজকের যুগে বিশ্বপ্রীতির প্রসঙ্গ সুলভ। সেই নিরিখে অনুদারতার অভিযোগে খুব সহজেই কাব্যবিচার সেরে ফেলি আমরা। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় ঈশ্বরগুপ্ত-রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের চিন্তাধারার ক্রমবিবর্তনের সূক্ষ্ম আলোচনায় এ অনুদারতাকে অপ্রত্যাশিত সংকীর্ণতা বলা যাবে না। এরই ওপর আমাদের জাতীয় চেতনা বা দেশাত্মবোধ দাঁড়িয়ে আছে। একটি জাতির আকুতি যে সব বিভিন্ন কবির কাব্যে ধরা পড়েছিল—নবীনচন্দ্র তাঁদের অন্যতম। 'অবকাশ রঞ্জিনীর' যে সব কবিতায় স্বদেশচিন্তাই কবির একমাত্র চিন্তা হয়ে উঠেছে তার মধ্যে,—

"মুমূর্ষু শয্যায় জনৈক বাঙ্গালী যুবক" কবিতাটি অন্যতম। এ কবিতা যশোহরে

অবস্থান কালে রচিত হয়। ক্রমবর্ধমান দেশানুভূতির আবেগেই কবিতাটির জন্ম হলো। কবি মুমূর্ষু একটি বাঙ্গালীর যুবকের বেদনার ইতিহাসকে দীর্ঘ কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। মৃত্যু যখন এসেছে,—যুবকটি নিশ্চিন্তভাবে মৃত্যুকেই কামনা করেছে, শুধু বেঁচে থাকার লাঞ্ছনার ইতিহাসটিই সে শুনিয়ে যেতে চায়। মুমূর্ষু যুবকটি মৃত্যুর মধ্যেই সান্ত্বনা খুঁজে পেতে চায়,—বাঁচার অর্থই পরাধীনতার গ্লানিকে বরণ করা। স্বদেশ-প্রেমের গভীর উপলব্ধি থেকেই কবিতাটির জন্ম—কিন্তু এ যেন অক্ষমের ভাবাবেগ। যে সংগ্রামমুখী মন স্বদেশচিন্তার প্রত্যক্ষ প্রেরণা থেকেই লাভ কবা সম্ভব, নবীনচন্দ্র ও তাঁর পূর্বসূরীরা তা থেকে আশ্চর্যভাবে বঞ্চিত। তাই দেখি, পরাধীনতার জ্বালায় মর্মদাহ, বিলাপোক্তি এবং মৃত্যুকামনা করার দিকেই কবিকুলের ঝোঁক। নবীনচন্দ্র এ কবিতায় স্পষ্টভাবেই মৃত্যুর অমোঘ ক্ষমতার প্রশংসা করেছেন,—জীবন-জ্বালাই তাঁকে মৃত্যুমুখী করে তুলেছে। স্বদেশচিন্তা ব্যক্তিমন থেকে সঞ্চারিত হয়ে দাবানলের মতো যখন সমস্ত জনমনে সঞ্চারিত হয়—তার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত থেকেই আসে মুক্তি ও স্বাধীনতা। নবীনচন্দ্রের যুগেও যুগ-যন্ত্রণার হাত থেকে লোকে মুক্তি না খুঁজে মৃত্যুই খুঁজত। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায়।— 'আমার জীবনে' নবীনচন্দ্র একটি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন কোন একটি ব্যক্তির আত্মহনন প্রসঙ্গে। বিষয়টি এই দিক থেকে লক্ষ্যণীয় যে, আত্মহননের মূলে স্বদেশপ্রেমের তাড়না রয়েছে। যশোহরে কবি এ সংবাদটি শুনেছিলেন,—"সত্য মিথ্যা জানি না, শুনিয়াছি, তাঁহার একটি কনিষ্ঠ ভ্রাতা [হীরালাল] উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং এক টুকরা কাগজে লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিলেন—"আমার দ্বারা যখন মাতৃভূমির কিছুই হইবে না, তখন এ জীবন রাখিয়া কি ফল ?"

সত্য মিথ্যা প্রসঙ্গ আলোচনা না করেও এ সিদ্ধান্তে আসা খুব অসহজ নয় যে, হয়ত কবি এই ঘটনাটির দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ব্যর্থতার জ্বালাই মুমূর্ষু যুবকটিকে মৃত্যু সম্পর্কে আগ্রহী করেছে। তবু যেহেতু নবীনচন্দ্র সে প্রভাবের কথা নিজে মুখে বলেননি সুতরাং এ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় না।

এই কবিতাটিতে কবির দেশপ্রেমোচ্ছ্বাসের অকপট প্রকাশ আছে। সেযুগে অকপট দেশপ্রীতি প্রকাশের বাধা হয়েছিল উদ্যত রাজদণ্ড। নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ রঞ্জিনীর' [১ম ভাগ] দ্বিতীয় সংস্করণে পূর্ণ কবিতাটি মুদ্রিত হয়েছিলো কিন্তু প্রকাশিত ও প্রচারিত এই কবিতাটির কিছু অংশ [১৪ স্তবক থেকে ১৮ স্তবক পর্যন্ত] শেষ পর্যন্ত বর্জিত হয় রাজনৈতিক কারণে। এই গ্রহণ ও বর্জনের ব্যাপারটুকু ভারী কৌতূহলজনক। যে কবিতা প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে প্রকাশিত ও প্রচারিত হচ্ছে —রাজনৈতিক কারণে তার তৃতীয় সংস্করণে কিছু অংশ বাদ দেওয়ার যৌক্তিকতা

নিশ্চয়ই আছে কিন্তু সেই সঙ্গে প্রকাশিত ও প্রচারিত এবং গৃহীত অংশগুলোকে স্মৃতিপট থেকে মুছে ফেলার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা হয়নি। কারণ তা হওয়া সম্ভব ছিল না। এই ধরণের বর্জন ব্যাপারে একটা স্থায়ী প্রভাব কিন্তু থেকে যায়। নিষিদ্ধ বস্তুর মতো এই কবিতাগুলোর দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হয় তীব্রভাবে। হেমচন্দ্র এবং নবীনচন্দ্রের বহু কবিতায় এই বর্জন ব্যাপারটি খুব আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। স্বদেশচিন্তার অনাবৃত অনুভূতি যে কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে,—তার স্থায়ী আবেদন গ্রহণ ও বর্জনের মাধ্যমে আরও অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

এই কবিতাটি নবীনচন্দ্রের গভীর দেশপ্রেমানুভূতির পরিচয় বহন করছে। দেশপ্রেমের জ্বালাময় অনুভূতির কথা এ কবিতায় স্বচ্ছ হয়ে ধরা পড়েছে। এজন্য কখনও কখনও অজ্ঞতার শান্তি কবি পরম কাম্য বলে মনে করেছেন। যুগযন্ত্রণার অগ্নিদাহে জ্বলে পুড়ে খাক হয় শিক্ষিত মন,—কবিও দুঃখে ও বেদনায় মুহ্যমান হয়ে বলছেন,—

সুশিক্ষিত বাঙ্গালীর যতেক যন্ত্রণা,
অভাগার যে অনলে দহিছে হৃদয়,
কেমনে জানিবে তুমি কত বিড়ম্বনা
সহিয়াছি প্রতিদিন প্রাণে নাহি সয়
অধীনতা অপমান প্রাণে নাহি সয়
স্বজাতির হীনাবস্থা, কি বলিব হায়।

এখানে অতিশয়োক্তি নেই, ব্যঞ্জনা নেই, শিক্ষিত বাঙ্গালীর হৃদয়যন্ত্রণার হাহাকার স্পষ্টভাষায় ফুটিয়ে তোলার অকৃত্রিম প্রয়াস শুধু চোখে পড়ে। মুমূর্ষু শয্যায় শায়িত যুবকটির অন্তর্দাহের কারণ হিসেবে দেশপ্রেমের প্রসঙ্গটি আনা হয়েছে কিন্তু এ ছিল পরাধীনতার যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত অগণিত দেশবাসীর অন্তিম আর্তনাদ। চেতনাই মানুষকে তিলে তিলে দগ্ধ করে,—অচেতন মানুষের কাছে মুক্তি কিংবা দাসত্বের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকতে পারে না। আমাদের জাতীয় ইতিহাসের কোথাও আর্তনাদ নেই। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর কিছু আগের রচনাগুলিতে দেশপ্রেম মানসিক যন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠেছিলো। আমাদের এই অন্তরভেদী দুঃখই আগামী দিনের সশস্ত্র বিপ্লবের ভিত্তি স্থাপন করেছিল। দৈহিক পীড়নেও যে বোধ সম্মিলিত ঐক্য সৃজন করেনি মানসিক যন্ত্রণার যুগে দ্রুতগতিতে তা প্রাণেপ্রাণে সঞ্চারিত হয়েছে। সব দেশেই বিপ্লবের জন্ম এভাবেই হয়ে থাকে। কবিদের রচনায় সেই সূত্রগুলো এতই স্পষ্ট ও প্রত্যক্ষ যে অনায়াসে তা মন্ত্রের মতো মানুষকে বশীভূত-উত্তেজিত করেছে।

নবীনচন্দ্র এই স্তবকের শেষাংশে দুটি পংক্তিতে অনুভূতির তীব্রতা প্রকাশ করেছেন,—

জাতীয় বিদ্বেষ সর্প পাপী নীচাশয়
দংশিছে জ্বলিছে বুক দংশন জালায়।

কবির অন্তর বেদনার এই দাহ যেন পাঠকের অন্তরকেও ছুঁয়ে গেছে। কিন্তু জাতীয় বিদ্বেষকে সর্পের সঙ্গে তুলনা করে কবি যে ঠিক কোন মনোভাবটির প্রতি ইঙ্গিত করতে চেয়েছিলেন বলা শক্ত। এ বিদ্বেষ যদি জাতির অন্তরজাত হয় তবে হেমচন্দ্রের জাতিবৈরিতার সঙ্গে তার কিছু মিল খুঁজে পাওয়া যায়। হেমচন্দ্রের জাতি-বৈরিতার ফলশ্রুতি রূপেই এসেছে অপরিসীম ক্লান্তি। অসহায়ের মত কবি ক্ষুব্ধ অন্তরে অসীম বেদনা লালন করে এসেছেন। এই বিদ্বেষবহ্নি জাতির অন্তরে জাগিয়ে রাখার প্রয়োজন ততদিনই থাকবে যতদিন শত্রুর হাত থেকে মুক্তিকে ছিনিয়ে আনতে না পারি। হেমচন্দ্র স্বপ্ন দেখেছিলেন এবং স্বপ্নভঙ্গের ছায়াছবিকে মিলিয়ে যেতে দেখেছিলেন—এর জ্বালা কবির মনে হতাশা সঞ্চার করবেই। নবীনচন্দ্রের মনে এই জ্বালা জীবনের প্রতি তাঁকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলেছে। মুমূর্ষু শয্যায় বাঙ্গালী যুবকটি তাই মৃত্যু কামনা করছে। জীবনবিতৃষ্ণ এই যুবকটির পলায়নীমনোবৃত্তি প্রশংসনীয় নয়। যে দেশপ্রেম আশা ও বিশ্বাসের অপেক্ষায় প্রতিকূলতায় অবিচল হয়ে থাকে—এ কবিতায় তা অনুপস্থিত। কবি তাই মরণের প্রতি আগ্রহশীল,—

জান নাকি বাঙ্গালীর মরণ মঙ্গল,
খুলিবে আমার আজি স্বাধীনতা-দ্বার!

মুমূর্ষু যুবকটি জীবনে যা পায়নি মৃত্যুতেও তা পাবে না, অথচ কেমন করে এ বিশ্বাসটি আঁকড়ে ধরেছে ভাবতেও হাস্যকর মনে হয়। কবিতাটির মধ্যে এ ধরণের দুর্বল কল্পনা রয়েছে। অপরিণত বা উচ্ছ্বসিত দেশানুরাগের এ এক হাস্যকর দৃষ্টান্ত।

তবু কবিতাটিতে এমন গভীর স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ আছে যে, মাঝে মাঝে বিচ্ছিন্ন অংশরূপে তাঁর গভীরতার স্বাদ পেতে ভালো লাগে। দীর্ঘ কবিতা রচনার এই অসুবিধা, কোন কোন অংশে অনবধানতার—দুর্বলতার চিত্রগুলো বড় বেশী প্রকট হয়ে ওঠে। এ কবিতায় কবি প্রাচীন ভারতের গরিমার আলোকে অভয়বাণী শোনানোর মহাকাব্যিক ভঙ্গিটি অনায়াসে প্রকাশ করেছেন, দুর্বলতর অংশগুলো পাশাপাশি বসানো হয়েছে বলেই তাকে মূল্যহীন মনে করা যায়না। শাসকগোষ্ঠীর প্রতি নিদারুণ ঘৃণা হয়ত নেই, কিন্তু ইংরেজ জাতির অতীতকে আমাদের গৌরবময়

ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করে কবি তাঁর বক্তব্যে প্রত্যাশিত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পেরেছেন। ভারতের ভবিষ্যতের আশাবাদের চিত্রটি কবি তুলে ধরেছেন,

গেছে বীর্য, কিন্তু পিতঃ! জানিও নিশ্চয়,
ভারতবাসীর মন অমর অচল,
কালে, বলে, দ্বেষানলে মরিবার নয়।
যেই মানসিক শক্তি, যবন কবল,
শত বৎসরের পাপ দাসত্ব শৃঙ্খল,
সহিয়াছে অনায়াসে, সেই বৃত্তিচয়
এখনো রয়েছে পিতঃ। তেমনি সবল,
ধরিবে সতেজ মূর্তি পাইলে সময়।

এই আশার আনন্দে যে কবি উৎসাহিত বোধ করেছেন আবার তিনিই অধীনতা শৃঙ্খল ভাঙতে পারেননি বলেই মৃত্যু কামনা করছেন।

অধীনতা হায়! এই দুঃখের কারণ,
সাধে বলি বাঙ্গালীর মরণ মঙ্গল।

এ কবিতাটির যে অংশ বর্জিত ও পুনর্যোজিত হয়েছিল—কবি গভীর দুঃখে বাঙ্গালী জাতির মসীলিপ্ত বর্তমানকে সেখানে প্রত্যক্ষ করেছেন। এত স্পষ্ট ও ও সোচ্চার সত্যকথনের স্বাধীনতা সেযুগে ছিল না—সম্ভাব্য কারণেই অংশটি বর্জিত হয়েছে,—

বাঙ্গালী, দাসত্বজীবী, দুর্বল বাঙ্গালী,
প্রকাশ্য সংবাদপত্রে সমকক্ষ প্রায়
ঢালিবেক শ্বেত অঙ্গে কলঙ্কের কালি,
দূষিবে রাজার কার্য নিন্দিবে জেতায়,
এই দুঃখে শ্বেত বুক বিদরিয়া যায়।
শূন্য এবে রাজকোষ, রাজ্যে হাহাকার,
করদান একমাত্র আমাদের দায়,
ব্যয়কালে আমাদের, নাহি অধিকার।

দাসত্বজীবী দুর্বল বাঙ্গালীর প্রতিনিধিত্ব করছেন যিনি ঘটনাচক্রে তিনিও দাসত্ব-জীবী—এ দাসত্ব সরাসরি রাজকার্যে যোগদান করে কবি স্বেচ্ছায় বরণ করে নেন। সম্মান ও উচ্চপদ পাবার আনুষঙ্গিক ইচ্ছাকে সমূলে উচ্ছেদ করার মত মনোবল কবির নেই, অথচ দাসত্বের লাঞ্ছনা তাকে পীড়িত করে। পরাধীনতাকে দুঃখের সঙ্গে সঙ্গ মেনে নেওয়ার দিকেই কবিকুলের •স্বাভাবিক আসক্তি। আদর্শের সঙ্গে

জীবনের আসমুদ্র ব্যবধান রয়েই গেছে। গভীর দেশপ্রেমে এতবড় ফাঁক থাকে না—থাকতে পারে না। কবির খেদ,

রাজপদে আমাদের নাহি অধিকার,
রাজ চিন্তা আমাদের উন্মাদ স্বপন,
* * * *
কেবল কেরাণীগিরি বাঙ্গালী জীবন,
বর্ণ বিনে বিদ্যাবুদ্ধি সকলি বিফল,

অথচ মেকি রাজপদ অলঙ্কৃত করেই কবিকে জীবনধারণ করতে হয়। শাসকের অভিসন্ধি হৃদয়ঙ্গম করেও নবীনচন্দ্র এমন একটি পরাধীন বৃত্তি বেছে নিয়েছেন বলে একই সঙ্গে কবিজীবন ও কবিকর্মকে সঠিক ভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না। নবীনচন্দ্র কর্মজীবনে যে সৎসাহস ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছিলেন,—"আমার জীবনে" তার বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। উর্ধ্বতন রাজকর্মচারীদের সঙ্গে মতবিরোধ অনেক সময়ই তাঁর উন্নতির পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে,—কিন্তু শেষ পর্যন্ত কবি সরকারী কাজটিতে টিকে ছিলেন ; আপোষ তাকে করতেই হয়েছিল, কিন্তু পরাধীনতার লাঞ্ছনা শিরোধার্য করে নিলেও বিক্ষুব্ধ অন্তরে তিনি শান্তি পাননি। এজন্য অবশ্য পারিবারিক প্রয়োজনের বেদীতেই কবি আদর্শ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এ কবিতাটিতে যে জীবনযন্ত্রণা ও পরাধীনতার লাঞ্ছনার ইতিহাস রয়েছে কবিজীবনে এ অভিজ্ঞতা আরও পরবর্তীকালের ; মুমূর্ষু যুবকের অন্তিম বিক্ষোভটি সেদিক থেকে কবির দূরদর্শিতার বাণী বহন করছে। ভবিষ্যতের নৈরাশ্যের চিত্রটিই তিনি নিপুণ ভাবে ব্যাখ্যা করছেন যেন। শুধু তাই নয়—ইংরেজীশাসন কি ভাবে আমাদের শিক্ষা মন্দিরের স্বাধীনতাকে গ্রাস করছে—বিচক্ষণ কবি তারও উল্লেখ করেছেন,—

বাঙ্গালীর একমাত্র আছিল সান্ত্বনা,
শিক্ষামন্দিরে দ্বার ছিল অনর্গল,
তাতেও অর্গল দিতে হতেছে মন্ত্রণা।

এই সুপরিকল্পিত অত্যাচারের চিত্র যিনি অকুণ্ঠভাবে প্রকাশ করেছেন—তাঁর নির্ভীকতা অনস্বীকার্য। শত্রুতার ব্যাপারে নবীনচন্দ্র যখন ডেপুটিগিরি ত্যাগ করে চট্টগ্রামে ওকালতি করার প্রস্তাব তুললেন নবীনচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় কৃষ্ণদাস পাল বলেছিলেন,—"তোমার হৃদয়ে কি অগ্নি আছে আমি জানি না, তুমি কিছুতেই নিরুৎসাহ হইও না।" নবীনচন্দ্রের ডেপুটি জীবনের স্বলিখিত বৃত্তান্তে এধরণের দৃঢ়চিত্ততার উল্লেখ অজস্র। দূরদর্শিতা—নির্ভীকতা ও দেশপ্রেমের আন্তরিকতা

থাকা সত্ত্বেও নবীনচন্দ্র কর্মজীবনের পরাধীনতার গ্লানি বহন করে গেছেন চিরকাল। চট্টগ্রাম কবির মাতৃভূমি—কিন্তু এখানেই প্রতিকূলতার সঙ্গে তাঁকে অহরহ সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু কবিতায় জন্মস্থানপ্রীতির অকৃপণ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। "শশাঙ্ক দূত" কবিতায় কবির জন্মস্থানপ্রীতির নিদর্শন অত্যন্ত আন্তরিক,—

প্রসারি কৌমুদীকর ধরিয়া গলায়,
জন্মভূমি জননীকে জিজ্ঞাসিও হায়!
ক্রোড়ভ্রষ্ট, দূরস্থিত, চিরদুঃখী তরে
কাঁদেন কি জন্মভূমি স্মরিয়া অন্তরে?
অভাগা যেদিকে থাকে, দেখিবে তাঁহায়
জাগ্রত কল্পনা—নেত্রে, স্বপনে।

নবীনচন্দ্রের চট্টগ্রামপ্রীতির নিদর্শন তাঁর অন্য কবিতাতেও স্পষ্টোচ্চারিত। 'অবকাশ রঞ্জিনী' রচনাকালে স্বদেশচিন্তাই যে কবির অন্য চিন্তাকে ছাপিয়ে উঠেছিলো তার প্রমাণ অজস্র রচনায় আছে। ভবুয়ায় রচিত "বুড়ামঙ্গল" কবিতায় এ মনোভাবের প্রতিফলন আছে। একটি বিশেষ উৎসবের বর্ণনা দেবার জন্যই কবিতাটির পরিকল্পনা। অথচ যে মানসিক আবেগে কবির সমস্ত অন্তর আলোড়িত অপ্রাসঙ্গিক হলেও তা মুখ্য হয়ে উঠেছে। দেশপ্রেমিকের ভূমিকা নিয়ে কবি স্বয়ং আত্মপ্রকাশ করেছেন কবিতায়। সুরাসেবনে অচেতন দেশীয় মহারাজাদের এই শ্রেণীর আমোদপ্রমোদকে কবি সমর্থন করেননি। ভারতের এই অধঃপতনের বেদনা যেন কবির অন্তরে গিয়ে পৌঁছেছে।

একে পরাধীন, তাহে অপমান,
কত সবে বল আমাদের প্রাণ!
একে পরাধীনা, তাহে অপমান,
কত সবে আহা, ভারতের প্রাণ!

*   *   *   *

এদের সন্তান তুমি মহারাজ,
ইহাদের প্রজা ভারত-সমাজ,
আজি সে ভারতে যবনের রাজ,
মোসাহেব রূপ তুমি মহারাজ। [বুড়ামঙ্গল]

নবীনচন্দ্রের নির্ভীকতার—স্বাধীনচেতনার চিহ্ন কবিতাটিতে পূর্ণরূপ লাভ করেছে] দেশপ্রেমই কবিকে শক্তি দিয়েছে। দেশীয় রাজাদের ভর্ৎসনা করেছেন কবি তীব্রভাষায়। পরাধীনতার অপমান যদি মানুষের চেতনা সৃষ্টিতে সহায়তা না করে

থাকে তবে সেদেশের ভবিষ্যৎ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। কবির এই বক্তব্যটি অসমসাহসিক মনোভাবেরই পরিচায়ক।

এ কবিতাটিতে নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ও ইংরাজপ্রীতি একই সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। কবিতাটিকে আমরা বিশুদ্ধ দেশাদর্শের কবিতা বলতে পারি না বটে কিন্তু ইংরাজ বন্দনার পটভূমিকায় নিছক চাটুকারিতা নেই বলেই কবিতাটিকে কবির স্বাভাবিক সৃষ্টি বলে অভিনন্দন জানাতে পারি। আরোপিত দেশপ্রেমের আড়ষ্টতা কবিতাকে ভারাক্রান্ত করেনি। অথচ কবি দেশপ্রেমিকের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেও স্বার্থ ভোলেননি। নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেমের স্বচ্ছরূপ এ কবিতার যে অংশে প্রকাশ পেয়েছে তার আবেদন পূর্ণমাত্রায় বর্তমান বলেই কবিকে ভুল বুঝিনা।—কবি অন্তরের আবেগে বলেন,—

চির পরাধীনা ভারত দুঃখিনী
চালিতেছে আহা! দিবস যামিনী,
শ্রবণে তোমার দুঃখের কাহিনী,
কেমনে শুনিছ বল নৃপমণি ?
ভারতের আহা! এই হাহাকার
বারেক পশে না শ্রবণে তোমার ? [বুড়ামঙ্গল]

ভারতের এই দীনাবস্থার চিত্রটি জনগণের চিত্তে গেঁথে দেবার উদ্দেশ্যেই কবি অংশটুকু রচনা করেছেন। কিন্তু এই দীনতার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার যথার্থ পথটি কবির জানা ছিল না। প্রস্তুতি পর্বের গোড়ার যুগে যা একান্ত অবিশ্বাস্য বা অকল্পনীয় বলে মনে হয় কালক্রমে তার বিরাট রূপ দেখে আমরাও স্তম্ভিত না হয়ে পারি না। অসন্তোষের বয়স যত ধীরে ধীরে বাড়ে বিপ্লবের ও বিদ্রোহের বয়স সেভাবে বাড়ে না। বিদ্রোহ যৌবন শক্তি নিয়েই জন্মায়,—ফেটে পড়ে রুদ্ধরোষে। নবীনচন্দ্র অসন্তোষের যুগে জন্মেছিলেন বটে কিন্তু প্রতিমুহূর্তে তাঁকে রাজশক্তির সঙ্গে মিত্রতা বজায় রেখে চলতে হয়েছে। নবীনচন্দ্র দেশপ্রেমিক হতে পারেন কিন্তু রাজদ্রোহী হবার ক্ষমতা তাঁর থাকবে না। জীবন-যন্ত্রণার এই আবেগ থেকেই মৃত্যুকামনার মত সুলভ একটি আদর্শকে কবি বরণ করেছিলেন। এ কবিতায় সরাসরি শাসক প্রেমিক রূপে নবীনচন্দ্রকে দেখা যাবে। ভারতের দুঃখ-দুর্দশার গ্লানি তাঁকে পীড়িত করে, তবুও কবিকে শক্তি বন্দনা করতে হয়,—

কৃতঘ্ন আমরা হবো না কখন,
কৃতজ্ঞতা এই ভারত জীবন,
মাগিব সতত ঈশ্বর-সদন,
অখণ্ড হউক ইংলণ্ড-শাসন। [ঐ]

ইংরেজ অধিকারের দীর্ঘস্থায়িত্ব কামনা করার সঙ্গে সঙ্গে যবন বিদ্বেষ স্মৃতিও কবি বর্ণনা করেছেন,—

লুটাব পড়িয়া বিরাটের পায়,
কীচকাপমান সহা নাহি যায়। [ঐ]

এই আপোষ মনোবৃত্তির সঙ্গে বিশুদ্ধ দেশচেতনার বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। নবীনচন্দ্রের রাজভক্তি ও দেশভক্তির স্বরূপ বিচারে এই মনোভাবটি কোথাও প্রচ্ছন্ন-ভাবে নেই বলে দুটিকে সম্পূর্ণ পৃথকভাবে বিচার করা সম্ভব।

কবির কাছে ভবিষ্যতের কোন আদর্শ নেই,—স্বাধীনতার স্বাদ কল্পনাতেও পাবার আগ্রহ নেই,—তবু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতালব্ধ পরাধীনতার জ্বালা তাঁকে পীড়া দেয়। নবীনচন্দ্রের স্বদেশচেতনা বস্তুতঃই তাঁর অন্তর্লোকের গভীরতম বাণী নয়.—কবি যে সাময়িক প্রসঙ্গকেই কাব্যরচনার প্রয়োজনে ব্যবহার করেছিলেন খুব সহজেই তা বোঝা যায়। পূর্বেই বলেছি, দেশচিন্তা কোন কোন কবির কাছে ফ্যাসনের বস্তু হয়ে উঠেছিলো ; বিশেষতঃ "অবকাশ রঞ্জিনী" রচনাকালে নবীনচন্দ্রের কাব্যজীবনের উন্মেষ পর্ব চলছিল। তিনি নিছক প্রচলিত ও আলোচিত বিষয়বস্তুর সুবিধেটুকু গ্রহণ করেছিলেন।

'অবকাশ রঞ্জিনীর' ১ম ভাগের একটি আপত্তিকর স্বদেশাত্মক কবিতা হল রাজবন্দনা উপলক্ষ্যে রচিত "মহারাণীর দ্বিতীয় পুত্র ডিউক অফ এডিনবরার প্রতি" কবিতাটি। আপত্তিকর এই কারণে যে, কবি যে উপলক্ষ্যে কবিতাটি রচনা করেছেন এবং যে ভাবে বিষয়টি 'আমার জীবনে' আলোচনা করেছেন তাতে কবির মনোভাব ও আদর্শ দুটোই কলঙ্কিত হয়েছে। প্রিন্স অব ওয়েলসের ভারত আগমন ইংরাজ-অধীন ভারতবাসীর জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এই ঘটনাবলম্বনে কবিতা রচনার হিড়িককে নবীনচন্দ্র সমালোচনা করেছেন এবং সঙ্গোপনে পুরস্কার পাবার আশায় একটি কবিতাও লিখে ফেললেন। প্রকাশ্য সমালোচনা করার মুহূর্তেও তিনি যেমন অকপট, নিজের গোপন বাসনা প্রকাশেও তাঁর জুড়ি নেই। নবীনচন্দ্র লিখছেন, "এই সময়ে ইংলণ্ডের যুবরাজ [বর্তমান সম্রাট] ভারতদর্শনে শুভাগমন করেন। সেই উপলক্ষে হেমবাবু হইতে ছোট বড় সকল কবিগণ কবিতা লিখিয়া বঙ্গদেশ প্লাবিত করিয়া ফেলিলেন। কান পাতিবার জো নাই। কিন্তু এরূপ 'হুজুগে' কবিতা কখনও লিখি নাই। এবারও লিখিলাম না।" [আমার জীবন পৃঃ ৩৪৮]

অথচ পরমুহূর্তেই একই উপলক্ষ্যে তাঁর কবিতা রচনার ধারাবাহিক বর্ণনা দিয়েছেন তিনি। নবীনচন্দ্রের রাজবন্দনাটি অন্যান্য কবিদের দ্বারা প্রভাবিত,—বিশেষভাবে হেমচন্দ্রের কথনভঙ্গীর সাহায্য তিনি স্পষ্টভাবে গ্রহণ করেছেন। বিজিত

জাতির মনোভাব থেকেই কবিতার জন্ম হয়েছে। পরিশেষে অনুনয়-মিনতির ক্রন্দনে কবিতাটি শেষ করা হয়েছে। স্তুতিমূলক কবিতা রচনার সমালোচনা করে অবশেষে এমন অসার্থক ও স্তুতিসর্বস্ব কবিতা রচনা নবীনচন্দ্রের পক্ষেই সম্ভব। অথচ হেমচন্দ্র 'ভারতভিক্ষা' রচনা করে স্বদেশপ্রেমের অমলিন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পরাধীনতার গ্লানি প্রশস্তির অন্তরালে আত্মগোপন করেনি—হেমচন্দ্রের স্বদেশপ্রাণতাই কবিতাটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছিল। হেমচন্দ্রের "ভারত ভিক্ষার" আবেদন শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে সার্থকভাবে পরিবেশিত হয়েছিল এমন প্রমাণ রয়েছে। তুলনায় নবীনচন্দ্রের কবিতাটিতেও তাঁব স্বদেশাত্মক অনুভূতিকে বিকৃতভাবে দেখি। হেমচন্দ্রের 'ভারত ভিক্ষা' সম্পর্কে কোন মহিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখেছিলেন,

"আমাদের মতে ভারত ভিক্ষা তাঁহার সর্বোৎকৃষ্ট গীতিকবিতা।...আমাদের ভাষায় ইহা অপেক্ষা মর্মভেদী ও দারুণ শোকগীতি রচিত হইয়াছে কি না জানি না।"[৩৯]

নবীনচন্দ্র হেমচন্দ্রের কবিতার সাফল্য সংবাদে অভিভূত হয়েছিলেন বলে মনে হয়।

নবীনচন্দ্র ইংরাজ-অধিকারকে নতুন ভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন,—

নিরাশ্রয়া অনাথিনী, যবনের করে,
সহি কত শতবর্ষ অশেষ যন্ত্রণা,
অবশেষে তোমাদেরে ডাকি সমাদরে
লইনু আশ্রয় যেন অনাথা ললনা।
সে অবধি রহিয়াছি অধিনীর মত,
এই রূপে শতবর্ষ হইয়াছে গত।

নবীনচন্দ্র এই অধীনতার জ্বালা অনুভব করেন নি বরং আশ্রয়লাভের শান্তি যেন কবিকে তৃপ্তি দিয়েছে। পরাধীনতার জ্বালা দেশপ্রেমী কবিকে যখন বিপর্যস্ত করে দেয়,—সেই মুহূর্তে নির্বিকার আত্মসমর্পণের সুখ যিনি বর্ণনা করেন—তাঁর দেশপ্রেমের নিষ্ঠা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

এ কবিতায় অমনোযোগী কবিস্বভাবটিও ধরা পড়েছে। ইংরাজ প্রতিভূকে অভিবাদন জানানোই যে কবিতার উদ্দেশ্য সে কবিতায় জাতীয় জাগরণের সংবাদ পরিবেশনের যৌক্তিকতা কোথায়? এ কবিতাতেই সমকালীন প্রাণবন্যার সংবাদ পরিবেশন করেছেন তিনি,

"জাতীয় বিদ্বেষ স্রোত্ত হতেছে বিস্তার।"

এই বিদ্বেষ-বহ্নি আমাদের গোপন রত্ন—কবি কি তার মহিমা সম্পর্কেও অচেতন?

---

৩৯. লাবণ্যপ্রভা সরকার [জগদীশচন্দ্র বসুর ভগিনী] কর্তৃক লিখিত। হেমচন্দ্র। ২য় খণ্ড। মন্মথনাথ ঘোষ থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ২০।

এ কবিতাটিরও কিছু অংশ রাজনৈতিক কারণে বর্জিত হয়েছিল। স্পষ্টকথনের চেষ্টার জন্যই সম্ভবতঃ এই বর্জন। কিছু অভিযোগের স্বর শোনা যায় এখানে। স্বদেশবাসীর পক্ষ সমর্থনের চেষ্টা, সুবিচার প্রাপ্তির আবেদন কবিতাটির বাস্তব মূল্য বৃদ্ধি করেছে। ভাবের দৈন্য, প্রকাশভঙ্গির দুর্বলতার মধ্যেও কবির এই প্রশংসাটুকু প্রাপ্য। "ডিউক অফ্ এডিনবরার প্রতি" আনুগত্য প্রদর্শনের ছলে—সখেদে কবির মনোবেদনা জ্ঞাপন,—

ভারতের সুখ দুঃখ করিতে বিদিত,
রাজ্ঞী-প্রতিনিধি-কাছে, উপায় এমন
নাহি কিছু, অনুমাত্র রাজ্যহিতাহিত,
না পারে ছুঁইতে প্রতিনিধির শ্রবণ।
আমার এ রাজ্যধন, আমার সকল,
অথচ আমার মাত্র দাসত্ব শৃঙ্খল।

শেষাংশে নির্ভুলভাবে আত্মবিশ্লেষণ করেছেন কবি। এই বোধই অধিকার চেতনা এনে দেয়—অবশেষে সংগ্রাম সামর্থ্য দিয়ে তা উদ্ধার করতে হয়। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে রচিত "ভারত উচ্ছ্বাস" কবিতায় কবি যেন উদ্ধৃত কবিতার উপসংহার রচনা করেছেন। "ভারত উচ্ছ্বাসের" বক্তব্যও ভাবি নরপতিকেই নিবেদন করা হয়েছে। নামকরণেও হেমচন্দ্রগন্ধ পুরোমাত্রায় বিদ্যমান,—বক্তব্যেও অভিনবত্ব কিছু নেই। অতীত ভারতকাহিনী বর্তমানের বিষাদ-আধারে স্থাপন করে দেশপ্রেমিকতার আভাষ দিয়েছেন কবি। এই গতানুগতিকতার শুরু—রঙ্গলালে, পরবর্তী যুগের দেশপ্রেমিক কবিরা এই ধরণের জোরালো ঐতিহাসিক কিংবা পৌরাণিক অংশগুলোকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরে আছেন। নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে রাজপদে আত্মনিবেদনের বিনীত ভঙ্গিমা যেসব কবিতায় প্রকট হয়ে উঠেছে—ভারত উচ্ছ্বাসেও তার ব্যতিক্রম নেই। হেমচন্দ্র প্রভাবিত হয়েও এসব কবিতায় নবীনচন্দ্র ব্যক্তিত্ব বজায় রেখেছেন। কাজেই সাময়িকতার প্রভাব যে স্বকীয় প্রভাবকে কোনক্ষেত্রেই অতিক্রম করতে পারে না,—নবীনচন্দ্রের এই ধরণের স্বদেশাত্মক কবিতাগুলোই তার প্রমাণ।

"ভারত উচ্ছ্বাসে" ভাবী রাজ্যেশ্বরের আগমনে কবি এতই আত্মহারা হয়েছেন যে বিস্ময় ও পুলকে তিনি বলেন,—

"জয় ভারতের! ভাবি-রাজ্যেশ্বর।"
এ কোন কুহক বুঝিতে না পারি;
হায়! শতাধিক বৎসর অন্তর,
এ সুখ স্বপ্ন হইল কাহারি?

আবার ভারত প্রেমার্দ্র নয়নে
দেখিবে আপন নৃপতিবদন ?
অবধি যাহার চন্দ্র সূর্য সনে,
শতবর্ষ শূন্য সেই সিংহাসন।

উচ্ছ্বাসের হেতুটি এই যে, ভারত আবার আপন রাজাকে পেয়েছে। 'আপন নৃপতি-বদন' বলে বিজিত ও জেতৃসম্বন্ধটি কবি পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। এই মুগ্ধতার মনোবৃত্তিকে সে যুগের আত্মআবিষ্কারের পরম লগ্নে বড় বেশী বেমানান বলে মনে হয়। উচ্ছ্বাসের আবেগেও দেশপ্রাণ কবির এই অসংলগ্ন উক্তিকে মেনে নেওয়া যায় না। মনে প্রাণে ভাবী রাজাকে কবি বরণ করেছেন,—

রাজ্ঞীপুত্র তুমি, যে হও সে হও,
ভাবি রাজ্যেশ্বর,—বৃটিশতপন,
লও ভারতের সিংহাসন লও,
বহুদিন পরে যুড়াই নয়ন।

এই রাজানুগত্য নবীনচন্দ্রের দেশাদর্শকে গতানুগতিকতার গণ্ডী অতিক্রম করতে দেয় নি। উপলব্ধির অনতিগভীর স্তরে দেশচিন্তার এও এক চিত্র, কিন্তু দেশপ্রাণতা বলে এ অনুভূতিকে কোনদিনই ব্যাখ্যা করা যাবে না। নবীনচন্দ্র ভারতের স্বাধীনতার স্বপ্ন হারিয়েছেন বলেই দেশপ্রীতি গভীরতা হারিয়েছে। এ কবিতায় এমন অনেক অসংলগ্ন উক্তি আছে যা উনিশ শতকীয় দেশচিন্তার সম্পূর্ণ বিপরীত। রামমোহনের পর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর কোন মানুষই যে স্বপ্ন দেখেছিলেন নবীনচন্দ্র সেখানে হতাশার প্রশ্ন তুললেন,

হায়! রাজপুত্র, কি দেখিতে হায়!
পতিতা ভারতে তব আগমন ?
ভারতের কীর্তি এবে স্বপ্ন প্রায়,
আসমুদ্র গিরি তোমার সৃজন।

*　　　　*　　　　*

তোমার সাহিত্য তোমার সংগীত,
তোমারই শিল্প, তোমার আচার,
তব সভ্যতায় ভারত প্লাবিত,
ভারতের আহা! কি রয়েছে আর।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই আত্মানুসন্ধানের চেষ্টা চলেছে এদেশে,—ইংরেজী সভ্যতা ও শিক্ষার আলোকে আত্মবিচারের এ চেষ্টাকে কবি অনুল্লেখ্য রেখে

আত্মদৈন্য প্রচারের চেষ্টা করেছেন। ভারতের অতীত ইতিহাস চিরদিনই সমৃদ্ধ ও উজ্জ্বল—কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের মুহূর্তে মৃত ঐতিহাসিক ঘটনাকে আমরা উপলব্ধি করেছি আমাদের অন্তরের আগ্রহে। ইংরেজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে তুলনা করে প্রাচীন ঐতিহ্যকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা করার অনলস প্রচেষ্টাই এ যুগের সাহিত্যের মূল্যবান সংযোজন। নবীনচন্দ্র 'রৈবতক-কুরুক্ষেত্র-প্রভাস' রচনা করেছিলেন এই প্রেরণা থেকেই।

কবির মনে ভবিষ্যতের কোন উজ্জ্বল আশা নেই, পরিবর্তে কালিমালিপ্ত আগামী দিনের কথকতা তিনি শোনাতে চান—এ মনোভাবও দেশপ্রেম নির্দেশিত শুদ্ধ চিন্তা নয়। অধুনার মধ্যে আগামীকে প্রত্যক্ষ করাই ত কবিজনোচিত দূরদর্শিতা—কর্মভারাক্রান্ত কবি সেই বিশেষ শক্তিটি হারিয়ে ফেলেছিলেন এই রাজ-প্রশস্তি রচনালগ্নে। কিংবা আত্মদৈন্যের অকপট উচ্চারণের মধ্যে শান্তি খুঁজেছিলেন কবি। আত্মনিন্দা কোনদিনই আত্মপ্রশংসার মত অমার্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হয়নি। কিন্তু প্রচ্ছন্ন আশা না থাকলে জাগরণের উন্মাদনা সৃষ্টি হবে না, বিষন্নতার বিষাদই পরিব্যাপ্ত হবে। বিশেষতঃ হিন্দুমেলা, কংগ্রেস ইত্যাদির সূচনা পর্বে বিবাদ গ্রস্ত হওয়ার মত বিমূঢ়তা আর কি হতে পারে? এ ব্যাপারে—নবীনচন্দ্র ইতিহাসের নির্দেশ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। ভাবপ্রবাহের স্বাভাবিক গতি কিন্তু আশার আলোক শিখা ক্রমশই উজ্জ্বল করছিল। নবীনচন্দ্রের অহেতুক নৈরাশ্য "ভারত উচ্ছ্বাসের" কোন কোন অংশে অত্যন্ত বিসদৃশ,—

পশ্চিম হইতে গরজি গম্ভীরে—
　　বিপ্লব ঝটিকা করিবে প্রবেশ,
নিরস্ত্র ভারত, অরক্ত শরীরে
　　ভীম উৎপীড়নে হইবে নিঃশেষ!
হায়! যুবরাজ, এই পরিণাম
　　শতবর্ষ তব দাসত্ব করিয়া?
ভারতের বল, বীর্য্য, কীর্তি, নাম,
　　চিরদিন তরে গেল কি নিবিয়া?

তথ্যগত ত্রুটিও এখানে দেখা যায়। শতবর্ষের দাসত্ব নয়—শত শত বর্ষের পরাধীনতার ইতিহাস ত আমরা ইতিহাসের বুক থেকে মুছে ফেলতে পারি না। আসল সত্যটি কবি গোপন করেছেন,—শতবর্ষের দাসত্ব যেমন করে আমাদের অন্তরকে নাড়া দিয়েছে, সাড়া জাগিয়েছে, ভারতচিন্তা করতে শিখিয়েছে, এমনটি কোন যুগেই দেখা যায়নি—এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। উনবিংশ শতাব্দীর অবিস্মরণীয় জাতীয়

ঘটনারও উল্লেখ করেছেন কবি, সিপাহী বিদ্রোহের প্রসঙ্গটি সঠিকভাবে বর্ণনা করেছেন,—

সিপাহী বিদ্রোহে ভারত কলঙ্ক
প্রক্ষালিল যারা শোণিত ধরায়,
সেই শিখ জাতি বীরের আতঙ্ক!
যুবরাজ!—আজি সে জাতি কোথায়?

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যে বিদ্রোহ বহ্নি সমগ্র ভারতে ইতস্ততঃভাবে জ্বলে উঠেছিল তার স্মৃতি সমগ্র জাতির অন্তরে উদ্দীপনা সৃজন করেছিল। এ বর্ণনা প্রসঙ্গ পেয়েছি একটি গ্রন্থে—

"বলিতে কি ১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ পর্যন্ত, এই কাল বঙ্গ সমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে বিধবা বিবাহের আন্দোলন, ইণ্ডিয়ান মিউটিনী, নীলের হাঙ্গামা, হরিশের আবির্ভাব, সোমপ্রকাশের অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যালয়ের প্রতিষ্ঠা, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব,—.—"

[রাজ নারায়ণ বসুর আত্মচরিত, ২২৪ পৃঃ]

এই ঘটনাবলী পূর্ণরূপে বিস্মৃত না হলে দেশপ্রেমিক বা স্বদেশীকবি বৃথা অশ্রুসিক্ত হবেন কেন? অথচ এই অল্প সময়ের মধ্যে নবীনচন্দ্র বাংলাদেশের উদ্দীপনাময় সমস্ত ঘটনাগুলি বিস্মৃত হয়েছিলেন এ কথাও চিন্তা করা যায় না। দেশভক্তি নয়, রাজভক্তিই ভারতউচ্ছ্বাসের জন্মদান করেছে। নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করার মুহূর্তে এই দুর্বলতার প্রসঙ্গগুলো আলোচনা করে নিতে হবে।

নবীনচন্দ্রের কবিতা সঙ্কলন গ্রন্থের প্রথম ভাগে কবির যৌবন চাপল্য, সাময়িক চিন্তার প্রভাবই প্রকট ভাবে ধরা পড়েছে। কবিচিত্তের নির্মল দেশানুরাগের প্রতিফলন যদি না পড়ে থাকে তবে কবিকে দোষ দেওয়া যায় না। কিন্তু আক্ষেপ হয় এজন্যই যে, কবি তাঁর এই অক্ষম রচনাগুলির উপর অযথা গুরুত্ব আরোপ করে আত্মপ্রশংসা করে গেছেন।

'অবকাশ রঞ্জিনীর' [২য় ভাগ] রচনা শুরু করার আগেই কবি "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যটি রচনা করেন। পলাশীর যুদ্ধের কবি হিসাবেই নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেমের উল্লেখ করা হয়। ১৮৭৫ সালে পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশিত হয়েছিলো - যদিও খণ্ড কবিতাকারে একই বিষয়বস্তু নিয়ে বহু পূর্বেই তিনি এ কাব্যের খসড়া লিখে ফেলে-ছিলেন। "ভারত উচ্ছ্বাস" ১৮৭৫ সালের রচনা বলেই, "পলাশীর যুদ্ধের" রচনা-কালীন মনোভাব এতে ধরা পড়ার কথা। 'ভারতোচ্ছ্বাস' কবিতাটিতে নবীনচন্দ্রের যে বিচিত্র মনোভাব ধরা পড়েছে তা একই সঙ্গে দেশভক্তি ও রাজভক্তির দ্বৈত প্রকাশ।

একই সঙ্গে এ দুটি অনুভূতি কেমন করে হাত ধরাধরি করে চলে—নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধে"ও তার পরিচয় মিলবে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হলেও ১৮৭৩ খৃঃ চট্টগ্রামে কাব্যটি লিখিত হয়েছিল—তারও বেশ কিছুদিন আগে 'পলাশীর যুদ্ধ' অবলম্বনে তিনি যে দীর্ঘ কবিতাটি রচনা করেছিলেন সে বিষয়ের বিশদ বর্ণনা কবির স্বলিখিত "আমার জীবনে" পাওয়া যায়। যশোহরে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের স্বদেশপ্রেম নবীনচন্দ্রের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে—কবি মুক্ত কণ্ঠে সেকথা প্রচার করেছেন। কিন্তু 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনার বীজ আরও আগে উপ্ত হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে কবি বলছেন—

"কলেজে অধ্যয়ন সময়ে রামপুর বোয়ালিয়া যাইবার পথে পলাশীর যুদ্ধের ও যুদ্ধক্ষেত্রের যে গল্প শুনিয়াছিলাম, তাহা আমার সর্বদা মনে পড়িত, এবং যুদ্ধক্ষেত্র সর্বদা আমার নয়নের সমক্ষে ভাসিত। আমি বলিলাম—আমি পলাশীর যুদ্ধ লিখিব।"

সহজাত আবেগই পলাশীর যুদ্ধ রচনার প্রেরণা দিয়েছে—কিন্তু দেশপ্রেমের প্রেরণা এসেছে বিভিন্ন স্বদেশপ্রেমিক মনস্বীর কাছ থেকে। যশোহরের ইঞ্জিনিয়ার বাবু কবিকে দীর্ঘ কাব্যাকারে 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনার অনুরোধ জানান, বঙ্কিমচন্দ্র মাসিক 'বঙ্গদর্শনে' কাব্যটি ছাপতে অস্বীকার করেছিলেন। পূর্ণ গৌরবে প্রকাশের বাসনায় 'পলাশীর যুদ্ধের' ভবিষ্যৎ সাফল্যের ইঙ্গিত সকলেই দিয়েছিলেন—এ উৎসাহবাণী নবীনচন্দ্রকেও উচ্ছ্বসিত করেছে। সে যুগের সম্মিলিত আকাঙ্ক্ষা এ কাব্যরচনার উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের অকুণ্ঠ সমর্থনের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে কাব্যটি আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে,—নবীনচন্দ্র এ সব কাহিনীও সাড়ম্বরে বর্ণনা করেছেন। কবির প্রথমযুগের রচনা বলেই নানা ত্রুটি চোখে পড়বে। কিন্তু এ কাব্যের কাব্যিক বিচার অনেক ক্ষেত্রেই অর্থহীন, স্বদেশাত্মক অনুভূতির বিচারে এ কাব্য বাঙ্গালীর প্রাণে সাড়া জাগিয়েছিল,—এই আলোকেই কাব্যটির বিচার হয়ে আসছে। কবির অক্ষমতার প্রশ্নটি চাপা পড়েছে কারণ স্বদেশ-প্রেমই আলোচনার সবটুকু স্থান দখল করে নিয়েছে। এ কাব্যের স্বদেশপ্রেম ব্যাখ্যা করে কবির স্বদেশচেতনার স্বরূপ নির্ণয় করাই আমাদের উদ্দেশ্য হবে।

নবীনচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিক স্মৃতিতর্পণ [প্রথম ভাগে] ডক্টর সুকুমার সেন "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্য প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"বাঙ্গালা সাহিত্যে" 'পলাশীর যুদ্ধ' একটু নূতন সুর আনিল। সাহিত্যে দেশপ্রেম প্রবর্তন করিয়াছিলেন রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'পদ্মিনী' কাব্যে (১৮৫৮) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ভারত সংগীত' কবিতায় (১৮৬৯) দেশপ্রেমের উদ্দীপনা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু এই দুই কাব্যে ও কবিতায় ভারতের বর্তমান স্বাধীনতা

হীনতার ক্ষোভ মুসলমান শাসনের পটভূমিকায় জনান্তিকে অভিব্যক্ত হইয়াছে। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরাজের কাছে বাঙ্গালীর স্বাধীনতা বিনিময় তখনকার শিক্ষিত যুবকদের মনে যে ধিক্কার জাগাইতে সুরু করিয়াছিল, কাব্যে তাহার স্পষ্ট প্রকাশ হইল নবীনচন্দ্রের লেখনী মুখে।" ['নবীনচন্দ্রের পলাশীর যুদ্ধ' প্রাচ্যবাণী প্রবন্ধাবলী ৪র্থ খণ্ড]

"পলাশীর যুদ্ধে" নবীনচন্দ্র নিছক দেশপ্রেম নয়—পরীক্ষামূলকভাবে একটি জাতীয় ঐতিহাসিক ঘটনার সত্যবিচার করতে বসেছিলেন, এর মর্মমূলে ছিল দেশপ্রেমের প্রস্রবণ। দেশপ্রেমিক কবি বলেই ইংরাজ বাঙ্গালীর জয়পরাজয়ের ঘটনা অবলম্বনে কাব্য রচনার কথা তাঁরই প্রথম মনে পড়েছিলো। ইতিহাসের প্রমাণটি যত সরল ছিল—পলাশীর যুদ্ধের সত্যকার ঘটনাটি তত ছিল না। পলাশীর প্রান্তরে মুসলমান নবাবের পতনের ফলাফল ইংরাজ অধিকার হলেও এই পতনের অন্তরালে যে দীর্ঘ কাহিনীর সন্ধান মিলছে—ঐতিহাসিকেরা তা অভ্রান্তভাবে খুঁজে বার করতে পেরেছেন হয়ত,—কিন্তু তাকে মেনে নিতে অনেক সময়ই আমাদের মন চায়নি। সব কথার শেষেও কিছু কথা বাকী ছিলো, বঙ্গ ইতিহাসের সেই রহস্য-জনক অধ্যায়টি নিয়ে কবি-নাট্যকারেরা তাই নাড়াচাড়া করেছেন। নবীনচন্দ্র এ ব্যাপারে পুরোধা, এমন কি এ ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ ই স্বকীয় কল্পনাশক্তির উপর নির্ভর করেছিলেন। দেশাত্মবোধ সৃজনের মহদুদ্দেশ্যে তাঁর পূর্বসূরীরা পৌরাণিক ঐতিহাসিক অথবা কল্পিত ইতিহাসের সাহায্য নিয়েছিলেন,—নবীনচন্দ্র অনতিদূর ইতিহাসের রোমাঞ্চকর অধ্যায় অবলম্বন করে দুঃসাহসিকতার প্রমাণ রেখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গদর্শনে 'পলাশীর যুদ্ধ' সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বিষয় নির্বাচন সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,—"কাব্যের বিষয় নির্বাচন সম্বন্ধে নবীনবাবুকে সৌভাগ্যশালী বলিতে পারি না।"

কিন্তু কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার যেখানে গৌণ শুধু বিষয়বস্তুর চমৎকারিত্ব দিয়ে যে সুবিধাটুকু পাওয়া যায় নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনা করে সে অনায়াস প্রতিষ্ঠা লাভ করে আসছেন। যত অনৈতিহাসিকতাই থাকুক না কেন নতুন করে স্বাধীনতা হারানোর কাহিনী যিনি বলবার চেষ্টামাত্র করবেন—তা সোরগোল তুলবেই। উনবিংশ শতাব্দীর গণচেতনার দৃষ্টিতে সে কাব্যে মহত্তর কিছু পাওয়া যাবেই। কালের হাওয়ায় ইতিহাসের অনেক জমাট সত্য উবে যায়। স্বাধীনতাস্পৃহা নিয়ে বাঙ্গালী কবিরা নিশ্চয়ই ইতিহাসের কাঠামোতে দেশপ্রেমের খড়মাটি লাগাবার অধিকার পাবেন। তাছাড়া নবীনচন্দ্র গা বাঁচিয়েছেন, ইতিহাসের পরিবর্তে একে কাব্য বলে প্রমাণ করে। ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এ ঘটনাটি,—

"When the sun dipped into the Ganges behind the blood red

field of Plassey, on that fateful evening of June. did it symbolise the curtain dropping on the last scene of a tragic drama? Was that day followed by "a night of eternal gloom for India", as the poet of Plassey imagined Mohanlal foreboding from the ranks of the losers?[৪০]

'পলাশীর যুদ্ধের' ঐতিহাসিকত্ব কিংবা কাব্যত্ব বিচার সেযুগেও হয় নি, এ যুগেও হয় না। দেশপ্রেমের বিচারে কাব্যটির কিছু দান স্বীকার করেই সমালোচনা সাঙ্গ হয়। কিন্তু দেশপ্রেমের কোন রূপ এ কাব্যে ধরা পড়েছিল সেকথা বিশদভাবে আলোচনা করাই আমাদের উদ্দেশ্য। 'পলাশীর যুদ্ধের' কবি বলেই এককালের বাংলাদেশ নবীনচন্দ্রকে আবিষ্কার করেছিল, এর পরে বহু অর্থপূর্ণ ও তত্ত্বপূর্ণ কাব্য লিখেও এত অভ্যর্থনা তিনি পাননি। অনৈতিহাসিক কিংবা অর্ধ ঐতিহাসিক কাব্য হিসেবে বিচার করা একরকম প্রায় অর্থহীন হয়ে পড়েছিল, শুধু দেশপ্রেমের উন্মাদনার প্রসঙ্গটিই এ কাব্যের একমাত্র বক্তব্য বলে লোকে ধরে নিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রও বিশদ সমালোচনা না করে নির্দেশ দিয়েছিলেন কাব্যটিকে আগাগোড়া পড়ে দেখার। বাঙ্গালীয়ানার গন্ধ পেলে বঙ্কিমচন্দ্র যেমন উল্লসিত হয়ে ওঠেন এমন আর কেউ নয়, তিনি লিখলেন,

"পলাশীর যুদ্ধের আমরা রাখিয়া ঢাকিয়া পরিচয় দিয়াছি। যদি তাঁহারা ইহার যথার্থ পরিচয় লইতে ইচ্ছা করেন, আদ্যোপান্ত স্বয়ং পাঠ করিবেন। যে বাঙ্গালি হইয়া বাঙ্গালির আন্তরিক রোদন না পড়িল, তাহার বাঙ্গালি জন্ম বৃথা।"

[বঙ্গদর্শন, কার্তিক ১২৮২]

'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যটি এই ধরণের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দনের মধ্যেই গৃহীত হয়েছিল। কাব্যপাঠ শেষে নবীনচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের প্রকৃত রূপ আবিষ্কার করলে দেখা যাবে, অপরিসীম গ্লানি ও পরাধীনতার বেদনা যেন সমগ্র কাব্যটিকে ঘিরে রয়েছে। অস্ফুট উচ্চারণে কবি যেন বারংবার জাতীয় দৈন্য, লজ্জা ও অপমানের মুহূর্তগুলো স্মরণ করেছেন। বক্তব্যের সত্য যাচাই করতে গেলে অনেক সময়েই ঠকতে হবে। সেখানে দেখব, ইংরেজ প্রশস্তির বিন্দুমাত্র স্বল্পতা নেই,—স্পষ্ট প্রশংসায় মুখর হয়ে কবি ক্লাইভবন্দনা করে চলেছেন কিন্তু সব ছাপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস যেন গুমরে কেঁদে ওঠে। বাঙ্গালীর অসহায়তা, দৈন্যকে এমন ভাবে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা অন্য কোন কাব্যে দেখা যায়নি। কাব্যটির আগাগোড়াই বিষণ্ণ চিত্তে

৪০. Jadunath Sarkar, History of Bengal (Vol. II) Dacca, 1948, P—497.

কবি আমাদের শক্তিহীনতা ও দুর্বলতার ঘটনাগুলি বর্ণনা করে গেছেন। আত্মদৈন্য প্রকাশের ভাষাহীন বেদনা "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যটির সমস্ত দোষত্রুটি ঢেকে ফেলেছে বলেই আমাদের ধারণা। বীরত্ব প্রকাশের মুহূর্তেও দীর্ঘ বর্ণনায় কবি কালিমালিপ্ত পরাধীন ভারতের চিত্র অঙ্কন করে চলেছেন একমনে। স্বাধীনতাচিন্তা দেখা দিয়েছিল মোহনলালের মনে। 'পলাশীর যুদ্ধের' এই বীরহিন্দু নায়কটির মনে না ছিল স্বার্থচিন্তা না ছিল সিংহাসনমোহ। শুধু দেশপ্রীতির শক্তিতেই "পলাশীর যুদ্ধে" আত্মদান করে শহীদসৌভাগ্য অর্জন করেছিল মোহনলাল। আমরা সেযুগের ঐতিহাসিক কাব্যটি পাঠ করি মোহনলালকে প্রত্যক্ষ করাব জন্যই। ঘটনা বা বর্ণনা দিয়ে আমাদের মন ভরে না—আমরা আদর্শ চাই, আত্মদান চাই, সেই আলোকে পথ চিনে নেওয়াই আমাদের কামনা।

"পলাশীর যুদ্ধ" রচনাকালে নবীনচন্দ্রকে দ্বিধায় পড়তে হয়েছে নানা কারণে। মুসলমান শাসক সিরাজদ্দৌলার পতনে হিন্দু বাঙ্গালীর দুঃখ পাওয়ার কোন হেতু আছে কি না—এ নিয়ে নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধের' সমালোচকবৃন্দ মুখর হয়ে উঠেছিলেন সেকালে। টেক্সট বুক কমিটির বিচিত্র অভিমত কাব্যটির যথার্থ রসোদ্ঘাটনের বাধা স্বরূপ হয়ে দেখা দিয়েছিল। নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধের' প্রথম সর্গে মন্ত্রণা সভার অবতারণা করেছেন খুব সাবধানতার সঙ্গে। সিরাজদ্দৌলার পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে হিন্দু সভাসদদের ষড়যন্ত্র প্রসঙ্গটি ঐতিহাসিক দিক থেকে খুব অসত্য নয় কিন্তু ক্ষমতালোভী মুসলমান মন্ত্রীর সিংহাসন লোভের যথার্থ চিত্রটি সন্নিবেশিত হয়নি বলেই ব্যাপারটি আগাগোড়া অস্বচ্ছ থেকে গেছে। এ কাব্যে বিপরীতমুখী দুটো ভাবাদর্শ প্রায় পাশাপাশি দেখা যাচ্ছে—ইংরাজ শাসনের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য প্রদর্শন অন্য দিকে মোহনলালের আত্মদান। কবি সচেতনভাবে শাসকগোষ্ঠীর মনোরঞ্জনের কথা চিন্তা করেছেন। "কাটোয়া বৃটিশ শিবির" সর্গটিতে ক্লাইভের চিন্তা ভাবনার রূপদানে কবি খুব সাবধানতার সঙ্গে শ্যাম ও কুল রাখার চেষ্টা করেছেন,—ক্লাইভ প্রশংসার কোন ত্রুটি হয়নি। বাংলাদেশের হিন্দুশক্তির কাছে মুসলমান শাসকের অত্যাচার অসহনীয় হয়ে উঠেছিলো, এ যেমন ঐতিহাসিক সত্য—তেমনি এই হিন্দুশক্তি যে সম্মিলিত ভাবে বাংলাকে মুসলমান শাসকের হাত থেকে মুক্ত করতে অসমর্থ, এ ত স্বীকৃত সত্য। সেযুগে ইংরেজের রীতিনীতি, আচার ব্যবহার, কৌশল ও কূটনৈতিকতার সঙ্গে আমাদের বিন্দুমাত্র পরিচয় ছিলনা, সুতরাং হিন্দু-শক্তির বক্তব্যটি আগাগোড়াই ক্ষীণ ও অর্থহীন। নবীনচন্দ্র জানতেন উনবিংশ শতাব্দীর গণজাগরণের মুহূর্তে হিন্দুবোধ জাগ্রত হচ্ছে,—সম্মিলিত হবার চেষ্টা করছে, এবং ইংরাজের ভয়ঙ্কর রাজ্যলোভের স্বরূপ তারা চিনেছে। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে

হিন্দুর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটিই পল্লবিতরূপে প্রাধান্য পেয়েছে,—বোধকরি এজন্যই কাব্যটির স্বাদেশিকতার মূল্য স্বীকার করা হয়।

"পলাশীর যুদ্ধ" যে স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রাম,—সেযুগের হিন্দু বা মুসলমান কোন সম্প্রদায়ই এর তাৎপর্য বোঝেনি বলেই মনে হয়। অবশ্য দু' একজন হিন্দু সেনাপতি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এ যুদ্ধের ভবিষ্যৎ চিন্তা করেছিলেন,—তার ঐতিহাসিক বিবরণ "পলাশীর যুদ্ধ"। দেশের স্বার্থকে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে বড়ো করে ভেবেছিল তারা। সিরাজের পতন যারা মনেপ্রাণে কামনা করত দেশের সাধারণ মানুষকে বাঁচানোর সদিচ্ছা তাদের ছিল।

সিংহাসন যে কোনো চক্রান্তেই হিন্দুগোষ্ঠীর হাতে এসে পড়বে না, এ সত্য ছিল জলের মত পরিষ্কার। অথচ আত্মদানের মহৎ পুণ্য অর্জন করেছে হিন্দু, সেযুগের লোকসাহিত্যে এর নির্ভুল ইতিহাস ধরা পড়েছিল;—কিন্তু সিরাজ পেয়েছে পল্লী-কবির সমবেদনা। লোকসংগীতের অজ্ঞাত কবির কণ্ঠে উচ্চারিত এই সহজ হৃদয়াবেদনের রসে জারিত কবিতাটি নিরপেক্ষ ঘটনার সাক্ষীর মতো,

> কি হলোরে জান,
> পলাশী ময়দানে নবাব হারাল পরাণ।
> তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে, গুলি পড়ে রয়ে,
> একেলা মীরমদন বল কত নেবে সয়ে।
> নবাব কাঁদে সিপুই কাঁদে আর কাঁদে হাতী,
> কলকাতাতে বসে কাঁদে মোহনলালের বেটী,
> .. ..
> হি হলোরে জান,
> পলাশী ময়দানে উড়ে কোম্পানী নিশান।
> ফুলবাগে মল নবাব খোসবাগে মাটি,
> চাঁদোয়া টাঙ্গায়ে কাঁদে মোহনলালের বেটী।

পল্লী কবির দরদভরা দৃষ্টিতে মোহনলাল সিরাজের অতি প্রিয় জন। সিরাজপত্নীর আসনে দেশপ্রেমিক মোহনলালের কন্যাকে কল্পনা করে নিয়ে পল্লীকবি ইতিহাস বজায় রাখেন। হিন্দু বা মুসলমান যিনিই এর রচয়িতা হোন না কেন বক্তব্যটি আগাগোড়া সিরাজের প্রতি সমবেদনাপূর্ণ। বাংলার নবাব রাজ্য হারিয়েছেন, কিন্তু পল্লী কবির দরদ হারান নি, স্বদেশপ্রেমিক মোহনলালের কন্যার শ্রদ্ধা-প্রেমও সিরাজের প্রাপ্য।

'পলাশীর যুদ্ধে'র ঘটনাটি মর্মান্তিক পরাজয়ের, শোচনীয় মৃত্যুর ভয়াবহ রূপটি তুলে ধরেছে। ইংরাজের চক্রান্তে হিন্দু ও মুসলমান স্তম্ভিত। সেদিনের পরাজয়ের বিবরণ

শুনে রোমাঞ্চিত হয়েছি আমরা, বিস্মিত হয়েছি যুদ্ধটির অন্তর্নিহিত তাৎপর্য দেখে। যুদ্ধ নামাঙ্কিত হলেও 'পলাশীর যুদ্ধ' কিছু গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ নয়। ইংরেজের শৌর্য কিংবা বাঙ্গালীর বীর্যহীনতা কোনটাই এ যুদ্ধে প্রতিফলিত হয়নি। কিন্তু আড়াগোড়া নিখুঁত চক্রান্তের ইতিহাস এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে। দেশের চেয়ে ব্যক্তি স্বার্থ, নবাবের চেয়ে নবাবীয়ানাই চক্রান্তকারীদের লক্ষ্য ছিল, এরই রন্ধ্রপথে সর্বনাশের আবির্ভাব।

নবীনচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি দিয়ে সেদিনের ষড়যন্ত্রের ভয়াবহ রূপ অঙ্কন করেছিলেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে বাঙ্গালার—বাঙ্গালীর ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণ করছিলেন যাঁরা, তাঁরা অধিকাংশই হিন্দু বাঙ্গালী। পূর্বেই বলেছি, সিরাজকে তারা সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন জনস্বার্থের দিকে তাকিয়ে। নবীনচন্দ্র দেখিয়েছেন, বাঙ্গালী ঐ মন্ত্রণায় যে দুরদর্শিতা-বাগ্মিতা ও স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিল তারই ঘনীভূত আবেগ মোহনলালের আত্মদানে প্রমাণিত হয়েছে। প্রহসন বুঝেও যাঁরা দেশের জন্য আত্মদান করেছিলেন তাঁদের কাহিনী আমাদের জাতীয় ইতিহাসের গৌরবের কাহিনী। এঁদের নিয়ে শিক্ষিত বাঙ্গালী গর্ব করবে—এ ত স্বাভাবিক। নবীনচন্দ্র অত্যন্ত প্রয়োজনীয় সময়ে এই তাৎপর্যময় ঐতিহাসিক মুহূর্তটি কাব্যাকারে প্রকাশ করেছিলেন বলেই স্বদেশবাসী তাঁকে যোগ্য সমাদর প্রদর্শন করেছে। কাব্যবিচার নয়, উদ্দেশ্যের বিচারে নবীনচন্দ্র অভিনন্দিত হয়েছিলেন।

পাঁচটি সর্গে সে যুগের সমস্যাকীর্ণ রাজনীতিকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন কবি আপন বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে, বর্ণনায় সে যুগের দুর্যোগের পূর্বাভাস দেওয়ার-চেষ্টা করেছিলেন সাধ্যমত। কাব্যটিতে ইঙ্গিতময় ভাষা, অর্থপূর্ণ শব্দ ব্যবহার, ব্যঞ্জনাধর্মী বর্ণনার সাহায্য নিয়েছিলেন কবি,—সে যুগের উত্তেজনার মুহূর্তে এর আবেদন তাই শিক্ষিত বাঙ্গালীর মর্মমূলে সাড়া জাগিয়েছিল।

ঘোর তমসাময়ী রাত্রিতে সমগ্র প্রকৃতি বাঙ্গালার এই দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তটি প্রত্যক্ষ করছেন সভয়ে,—সিরাজ ভীতি বঙ্গনারীকে কম্পিত করেছে,—

> ধরিয়া বঙ্গের গলা কালনিশীথিনী,
> নীরবে নবাব—ভয়ে করিছে রোদন ;
> নীরবে কাঁদিছে আহা ! বঙ্গ বিষাদিনী,
> নীহার-নয়ন জলে তিতিছে বসন [প্রথম সর্গ]

সিরাজবিরোধী সভার নেতৃত্ব পদে স্বয়ং মন্ত্রী সুচতুর গাম্ভীর্যে সিরাজপ্রীতি দেখিয়ে ধূর্ততার প্রাথমিক পরিচয় দিলেন।

> নাহি কাজ অতএব পাপ-মন্ত্রণায় ;
> কি কাজ পাপেতে আত্মা করি কলুষিত !

মজিয়া মোহের ছলে, মাতি দুরাশায়,
কি জানি ঘটাব পাছে হিতে বিপরীত।
... ...
নিরাশ ভাবিয়া মনে যবন পামর,
প্রত্যেকের মুখপানে দেখিছে কেবল।॥ [ঐ]

জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ, কৃষ্ণচন্দ্র রায়, রানী ভবানী, মন্ত্রী মীরজাফরের সঙ্গে গোপনে মন্ত্রণাক্ষেত্রে মিলিত হয়েছেন। বাংলা দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার সদিচ্ছায় এঁরা মিলিত—যবন-হিন্দু ভেদাভেদও লুপ্ত হয়েছে। ক্লাইভকে আমন্ত্রণ করার স্বপক্ষে সকলেই যখন একমত -রাজবল্লভ উত্তেজিত হয়ে প্রস্তাব জানান,—

"সহৃদয় ইংরেজের লইয়া আশ্রয়
রাজ্য ভ্রষ্ট করি এই দুরন্ত যুবায়,
[কতদিনে বিধি বঙ্গে হইবে সদয়।]
সৈন্যাধ্যক্ষ সাধু মিরজাফরের করে—
সমর্পি এ রাজ্যভার। তা' হলে নিশ্চয়
নিদ্রা যাবে বঙ্গবাসী নির্ভয় অন্তরে;
হইবে সমস্ত রাজ্য শান্তি সুধাময়। [ঐ]

অদূরদর্শিতা এখানে দাসমনোবৃত্তি সুলভ। শৌর্য-বীর্য-বল হারিয়ে বেঁচে থাকার দুর্মদ ইচ্ছা মানুষকে কত নীচ করে ফেলে এসব উক্তিগুলো তারই প্রমাণ। কিন্তু সেই মন্ত্রণা গৃহে সিরাজনিধন যজ্ঞে হবি নিক্ষেপ করে জাতীয় ইতিহাসে নতুনভাবে তাঁরা অজ্ঞতার স্বাক্ষর এঁকে গেলেন! পরাধীনতা আমাদের চিন্তাধারাকে কত কলুষিত করেছিল--স্বদেশপ্রেমের পবিত্র স্পর্শ থেকে বঞ্চিত থেকেছি বলেই এত সহজে ভবিষ্যতের মুক্তির চিত্রটি আমরা এঁকে ফেলেছি। রাজা কৃষ্ণচন্দ্র ভাগ্যবাদী মানুষের মতো অক্ষমতাকে নতুন করে প্রচার করেছেন,—

সপ্তদশ অশ্বারোহী তুরকের ডরে,
কি কুলগ্নে কাপুরুষ বৃদ্ধ নরপতি
তেয়াগিল সিংহাসন সত্রাস অন্তরে।
সেই দিন হ'তে যেই দাসত্ব-শৃঙ্খল
প'ড়েছে বঙ্গের গলে, আর্য্যসুত-বল
আর কি পারিবে তাহা করিতে খণ্ডন? [ঐ]

ভারতের ইতিহাসের দীর্ঘদিনের সত্যটি কোনদিনও যে পরিবর্তিত হতে পারে এ বিশ্বাস সেযুগে ছিল না। পরাধীনতায় অভ্যস্ত সে যুগের বাঙালীর চিন্তাধারার

স্বাভাবিকতা থেকেই উদ্ভূত মনোভাবের জন্ম। আদর্শগত উচ্চতা সে যুগে ছিলনা, তবু দেখি মন্ত্রণা সভায় একটি অসমসাহসিকা নারীর দুর্জয় আত্মঘোষণা। নবীনচন্দ্র এ কাব্যে জাতীয় গ্লানি অপনোদনের চেষ্টা করেননি বলে তাঁকে প্রশংসাই করব। ইতিহাসের পাতায় যে গ্লানির চিত্র দেখি, বৃথা আত্মাভিমান কিংবা আত্মপ্রশংসা দিয়ে তা ত ঢাকা যাবে না, এ ব্যাপারে নবীনচন্দ্র খানিকটা দুঃসাহস দেখিয়েছেন স্বজাতীয়ের দুর্বলতা ও নীচতার চিত্রগুলো যথাযথভাবে বর্ণনা করে। রানী ভবানীর স্বদেশপ্রেম সোচ্চারে কথিত হলেও ফলপ্রসূ হয়নি,—কিন্তু মনে রাখতে হবে এটি আলোচনা সভা। রানী ভবানীর তেজোদৃপ্ত ভাষণ 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় অংশ। এর বহু অংশ মুখে মুখে আবৃত্ত হোতো। সুযোগ্যা ও দূরদর্শিনী এই নারীর সত্যবিচারের মূলে আছে তাঁর অকৃত্রিম দেশানুরাগ। পূর্বোক্ত মন্ত্রণাকারীদের প্রস্তাবকে ঘৃণ্য বলে অভিহিত করতেও তিনি ভীত হননি,—

লক্ষ্মণ সেনের সেই কাপুরুষতায়
সহি এত ক্লেশ! তবে জানিলে কেমনে
তোমাদের ঘৃণাস্পদ এই মন্ত্রণায়
ফলিবে কি ফল পরে? ভেবে দেখ মনে,
সেনাপতি সিংহাসনে বসিবেন যবে,
তিনি যদি একাধিক হন অত্যাচারী,—
ইংরাজ সহায় তাঁর,—কি করিবে তবে?
এ পাণ্ডিত্য আমি নারী বুঝিতে না পারি।
বঙ্গভাগ্যে এ বীরত্ব ফলিবে তখন
দাসত্বের বিনিময়ে দাসত্ব স্থাপন।

বোঝাই যায় দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতার একমাত্র অধিকারিনী ছিলেন রানী ভবানী। তাঁর তেজোদৃপ্ত, বীরগর্ভ উক্তিতে রাজনৈতিক জ্ঞানের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে দুরদর্শিতা। স্বাধীনতার যথার্থ অর্থটি তিনি অনুধাবন করেছিলেন, নতুন পন্থাটি তাই তাঁকে খুশী করেনি। "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যের সার্থক দেশাত্মবোধের চিত্র রানী ভবানীর উক্তির মধ্যেই নিহিত আছে। কল্পিত হলেও একে ইতিহাস চেতনাজাত মহৎ আত্মদর্শনের নামান্তর বলা চলে। সে যুগের কুটিল মন্ত্রণার বিষাক্ত বায়ুতে এক ঝলক উপলব্ধির আলোক এটি। রানী ভবানী হয়ত একথা এমন করে বলেননি, কিন্তু কবির অন্তরের ভাষা ছিল রানী ভবানীর উক্তিগুলোর মতই প্রত্যক্ষ ও ভাবগভীর। কল্পনার সঙ্গে সত্যের সমন্বয় না হলে এ অংশটির

আবেদন এত করুণ ও মর্মস্পর্শী হতো না। ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার আসনে বসেছেন রানী ভবানী,

যে ভীম অনল,
জলিবে সমস্ত বঙ্গে, পতঙ্গের মতো,
পোড়াবে নবাবে ; মিরজাফরের বল
কি সাধ্য নিবাবে তারে ? হবে পরিণত
দাবানলে ; না পারিবে এই ভীমানল,
সমস্ত জাহ্নবী জল করিতে শীতল। [ঐ]

মিরজাফরের সঙ্গে গোপন মন্ত্রণাকালে সে-যুগের আত্মস্বার্থমগ্ন বাঙ্গালী এ কথার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেনি। নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধের' ইতিহাস রচনা করার জন্ম পরিচিত কাহিনীর সাহায্য নিয়েছিলেন। কি ভাবে ধূর্ত ইংরেজ ধীরে ধীরে সমগ্র ভারতে সাম্রাজ্য জাল বিছিয়েছিল,—১১৮ বছর পরে সুশিক্ষিত কবি অনায়াসে বঙ্গ ইতিহাসের সঙ্কটময় মুহূর্তটি নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করতে পেরেছিলেন। দুঃসাহস ছিল এটুকু যে দেশাত্মবোধের আবেগটুকু পুরোমাত্রায় তাঁর চিন্তার স্নায়ুগুলোকে উত্তেজিত করে চলেছিল। যুবকোচিত উন্মাদনা বাদ দিলে কাব্যটিতে আর কিই বা থাকে ? রানী ভবানীর দীর্ঘ সংলাপে কবির স্বকীয় অনুভাবনার স্বাক্ষর,—

জানি আমি যবনেরা ইংরাজের মত
ভিন্নজাতি ; তবু ভেদ আকাশ পাতাল।
যবন ভারতবর্ষে আছে অবিরত
সার্দ্ধ পঞ্চশত বর্ষ। এই দীর্ঘকাল
একত্র বসতি হেতু, হয়ে বিদূরিত
জেতা জিত বিষভাব, আর্যসুত সনে
হইয়াছে পরিণয় প্রণয় স্থাপিত ;
নাহি বৃথা দ্বন্দ্ব জাতি ধর্মের কারণে। [ঐ]

হিন্দু ও মুসলমানের পারস্পরিক আত্মীয়তার মূল কারণটি তিনি নির্ভুলভাবে বর্ণনা করেছেন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বানবাণী হিসেবে এই উক্তিটিকে গণ্য করা যায়। রানী ভবানীর বক্তব্য যুক্তিপূর্ণ, সম্ভবতঃ নবীনচন্দ্রের যুগৈষণার ফলাফল এটি। যবনবিদ্বেষ বাংলা সাহিত্যে জাতীয়তাবাদের প্রথম ক্রটি। নবীনচন্দ্র সাম্প্রদায়িক ঐক্যসৃষ্টির কথা স্মরণ রেখেই এই গভীর ও স্বতঃস্ফূর্ত সত্যটিকে তুলে ধরেছেন। সে যুগের গণচেতনায় এই প্রশ্নটি কিন্তু বারবারই ঘুরে ফিরে দেখা দিয়েছিল, নজরুল ইসলামের মত স্বাধীনতাকামী কবিরা বোধকরি

নবীনচন্দ্রের ঐতিহাসিক কাব্যটির উদার আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। সিরাজদ্দৌলাকে সে যুগের বাঙ্গালী আপনজন হিসেবেই কল্পনা করে নিয়েছে। কবি ও নাট্যকারেরা বিরূপ সমালোচনার পাত্র হয়েও সিরাজদ্দৌলার মহত্ত্ব আবিষ্কারে ব্রতী হয়েছিলেন। জাতিগত, ধর্মগত সঙ্কীর্ণতাকে অতিক্রম করে দেশপ্রেমই সেদিন জয়ী হয়েছিল। 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নাট্যাকারে পরিবেশিত হয়েছিল,—'আমার জীবনে' কবি বলেছেন এ প্রসঙ্গে,—

"পলাশীর যুদ্ধ প্রকাশিত হওয়ামাত্র নবস্থাপিত "ন্যাশনাল থিয়েটারে" অভিনীত হয়। সে অভিনয়ে শুনিয়াছি, খ্যাতনামা অভিনেতা ও নাটক রচয়িতা গিরীশচন্দ্র ঘোষ ক্লাইভের অভিনয় করিয়া প্রথম খ্যাতি লাভ করেন। এরূপ চারিদিকে 'পলাশীর যুদ্ধ' লইয়া তোলপাড়।" [আমার জীবন পৃঃ ৩৫৯]

ন্যাশনাল থিয়েটার "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যের নাট্য সম্ভাবনা আবিষ্কার করেছেন ন্যাশনালইজম্-এর গন্ধ এ কাব্যে মিলেছিল বলেই। গিরিশচন্দ্রের 'সিরাজদ্দৌলা' নাটকের উপাদান ও প্রেরণা যে এ কাব্যের থেকে পাওয়া—তা সহজেই বলা চলে। বলাবাহুল্য "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যটিই সম্ভবতঃ বাংলা দেশে সিরাজভাবনা সঞ্চারিত করেছিল, কারণ ইতিপূর্বে এ ধরণের কোন গ্রন্থরচনার উল্লেখ কোথাও নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র এ কাব্যের বিষয় নির্বাচনের প্রশংসা করতে পারেননি—তিনি 'পলাশীর যুদ্ধের' সুদূরপ্রসারী প্রভাবের ইতিবৃত্তটি জানার সুযোগ পাননি। বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলনে অবাস্তব ও সংযোগশূন্য ইতিহাসের ঘটনা বা কাহিনী আমাদের চিত্তে যতটুকু আবেদন সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিল—"পলাশীর যুদ্ধে" বর্ণিত সত্য ইতিহাসের প্রভাব যে তার চেয়ে শতগুণ বেশী হয়েছিল তা প্রমাণের অভাব নেই। বঙ্গ ইতিহাসের এ ঘটনাটির সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ রয়েছে, নবীনচন্দ্রই সেটি আবিষ্কার করে, আলোচনা করে, জাতীয়তাবাদী কবির দায়িত্ব পালন করেছিলেন। 'পলাশীর যুদ্ধ' সেদিক থেকে নবীনচন্দ্রের সার্থকতম রচনা বলে মনে করতে হবে। একযুগে 'পলাশীর যুদ্ধের' কবি বলেই তাঁর পরিচয় ছিল, একালে মহাকবি হিসেবেই তাঁর পরিচিতি কিন্তু সার্থকতার প্রসঙ্গে 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যটি উল্লিখিত হয় সর্বাগ্রে। এ তাঁর মহত্তম প্রেরণার অমূল্য সৃষ্টি।

নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যের দেশাত্মবোধক অংশগুলো বিস্তৃত ভাবে আলোচনার জন্য পুনরায় রাণী ভবানী প্রসঙ্গে আমাদের ফিরে আসতে হবে। পূর্বে বলেছি, নবীনচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে গণজাগরণের যুগে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যবোধ জাগ্রত করার পরোক্ষ চেষ্টা করেছিলেন। ইংরেজ অধিকারের লগ্নে রাণী ভবানী আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন, প্রত্যেকটিই

নবীনচন্দ্রের দেশভাবনার সুচিন্তিত ফল বলে মনে হয়। রানী ভবানী সেদিন সমগ্র বঙ্গবাসীকে ডাক দিয়ে বলেছিলেন,—

আমার কি মত ? তবে শুন মহারাজ!
অসহ্য দাসত্ব যদি, নিষ্কোষিয়া অসি,
সাজিয়া সমর—সাজে নৃপতি-সমাজ
প্রবেশ সম্মুখ রণে ; যেন পূর্ণ শশী,
বঙ্গ-স্বাধীনতা-ধ্বজা বঙ্গের আকাশে
শত বৎসরের ঘোর অমাবস্যা পরে—
হাসুক উজলি বঙ্গ। এই অভিলাষে
কোন বঙ্গবাসি—রক্ত ধমনী ভিতরে
নাহি হয় উষ্ণতর ? আমি যে রমনী
বহিছে বিদ্যুৎ বেগে আমার ধমনী। [ঐ]

এই উদাত্ত আহ্বান সেদিন বঙ্গবাসীর কর্ণে প্রবেশ করেনি বলে আক্ষেপ করার কিছু নেই। পলাশীর প্রান্তরে শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার মত মনোবলই দুর্লভ ছিল। রানী ভবানী চেয়েছিলেন সংঘবদ্ধ শক্তিতে আত্মরক্ষা করুক দেশবাসী—কিন্তু মন্ত্রণাগৃহে এর সমর্থন মেলেনি। নবীনচন্দ্র রানী ভবানীর নেত্রে সমগ্র বাঙ্গালীর শতধাজীর্ণ শক্তিহীন রূপটি প্রত্যক্ষ করেছেন অভিনব উপায়ে। মন্ত্রণাসর্বস্ব বাঙ্গালী জীবনে স্বাধীনতার স্বাদ পাবার ইচ্ছাটুকুও জাগেনি সেদিন। কিন্তু স্বার্থরক্ষার জন্য গোপনমন্ত্রণার বুদ্ধি তাদের চিরদিনই প্রবল। পলাশীর যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর এদেশীয় জমিদার ও নবাব সম্প্রদায়ের টনক নড়েছিল, ইংরেজের আসল উদ্দেশ্য আর গোপন ছিলনা তাদের কাছে। আত্মরক্ষার উপায় সেদিনও তারা চিন্তা করেছিলেন এমনি গোপন মন্ত্রণা কক্ষেই, তার বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছেন তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট হলওয়েল একটি চিঠিতে,—

"Tuncaws on the lands were however granted for the payment of the stipulated sums at particular times, by which the Royroyan, Mutta Suddier, Dewans and every Harpey employed in the Zemindary and revenues became our implacable enemies; and, consequently, a party was soon raised at the Durbar headed by the Nabob's son, Miron and Rajah Rajebullub, who were daily planning schemes to shake off their dependence on the English, and continually urging the Nabob, that till this was effected, his Government was a name only. The Nabob, something irritated

by the protection given Rajah Doolubram, and weak and irresolute in himself, fell too soon into these sentiments."[৪১]

উল্লিখিত সংবাদটি যুদ্ধপরবর্তী মনোভাবের চিত্র। ধরে নেওয়া অসঙ্গত নয় যে এমনি মন্ত্রণা করেই একদিন বিদেশী অতিথি বরণ করেছিল এরাই, কিন্তু সে চিত্রটি ইংরেজদের নথিপত্রে না থাকাই স্বাভাবিক। নবীনচন্দ্র ইতিহাসের সাহায্যেই ইতিহাসের সত্যকে ফুটিয়েছেন বলতে হবে।

"পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যে ভাবাবেগের চেয়ে যুক্তির প্রাধান্য বেশী, নিছক স্বদেশপ্রেমের বর্ণনা দিয়ে অবাস্তব রূপকথা সৃষ্টির চেষ্টা করেননি বলে নবীনচন্দ্রকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। জাতীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা নির্মমসত্যটি অকপটভাবে তুলে ধরার প্রয়াস অতি অসাবধানী পাঠকেরও দৃষ্টি এড়ায় না। অক্ষয়চন্দ্র মৈত্রেয় দেশানুরাগের প্রেরণায় সিরাজকাহিনী রচনা করার মুহূর্তে নবীনচন্দ্রকে তাই দোষারোপ করেছেন। দেশানুরাগ যদি মিথ্যা ভাবাদর্শ সৃজনেই ব্যয়িত হয়, সত্য উৎঘাটনের জন্য প্রয়োজন নির্মম দেশপ্রীতি। বঙ্কিমচন্দ্র নবীনচন্দ্রকে ব্যাখ্যা করেছেন সঠিকভাবে,—

"যদি উচ্চৈঃস্বরে রোদন, যদি আন্তরিক মর্মভেদী কাতরোক্তি, যদি ভয়শূন্য তেজোময় সত্যপ্রিয়তা, যদি দুর্বাসা প্রার্থিত ক্রোধ, দেশবাৎসল্যের লক্ষণ হয়,—তবে সেই দেশবাৎসল্য নবীনবাবুর, এবং তাহার অনেক লক্ষণ এই কাব্যমধ্যে বিকীর্ণ হইয়াছে।"

"পলাশীর যুদ্ধের" দ্বিতীয় সর্গে ক্লাইভ চরিত্রে শক্তি, দম্ভ ও সাহসিকতার সমন্বয় ঘটানো হয়েছে, ইংরাজচরিত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখেই। বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রথম স্তরে ইংরেজ প্রীতি ও মুগ্ধতা আমাদের পেয়ে বসেছিল, যত ঘনিষ্ট সান্নিধ্যে এসেছি ততই ইংরেজের জাতীয় চরিত্রের মহৎ গুণগুলি আমাদের আকৃষ্ট করেছে। ইংরেজ বিদ্বেষ জাগার মুহূর্তেও জাতীয় চরিত্রের শ্রেষ্ঠত্ব বা মহত্ব আবিষ্কার করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। নবীনচন্দ্র "পলাশীর যুদ্ধে" নিরপেক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলেন শুধু প্রাণবাঁচানোর তাগিদে নয়, সত্যের দাবী তিনি অস্বীকার করেন নি। কাজেই ক্লাইভের স্বদেশপ্রেম, আত্মবিশ্বাস ও মনোবলের প্রসঙ্গটি তিনি নিপুণ ভাবে চিত্রিত করেছেন। ক্লাইভের স্বদেশপ্রেমের পরিচয় এই সর্গটিতে পাওয়া যায়। নির্ভীক ক্লাইভের উক্তি,

নাহি ভাবি, নাহি ডরি, কালের কবল ;—
লভিয়াছি যবে এই মানব-জীবন,

৪১. Quoted from "Original Papers Relative to the Disturbances in Bengal (From 1759-1764)" by J. Newbery, London, 1765, P-8.

মৃত্যু ত আমার পক্ষে নিয়তি কেবল !
কিন্তু যদি আমাদের হয় পরাজয়,
বাঙ্গালার স্বর্ণ-প্রসূ বাণিজ্যের আশা,
ডুবিবে অতল জলে ; ঘুচিবে নিশ্চয়
ইংলণ্ডের আন্তরিক রাজ্যের পিপাসা। [২য় সর্গ]

আত্মবিসর্জনের বিনিময়েও স্বদেশের মঙ্গল সাধনের ঐকান্তিক ইচ্ছাই ক্লাইভের চরিত্রে লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য, দেশের জন্য আত্মদানের নির্মম সংকল্প সেদিনের বাঙ্গালী গ্রহণ করেনি, কিন্তু ক্লাইভের চরিত্রে সেটাই মূল কথা। স্বদেশপ্রেমের এই চিত্রটি অতিরঞ্জন বা অতিকথন নয়। অন্ধকূপহত্যাকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা সেদিন হয়নি, ক্লাইভ শপথ গ্রহণ করেছে দেশবাসীর সম্মান ও স্বার্থের পক্ষ থেকে,

অন্ধকূপ হত্যা প্রতিবিধানের ভার ;
রক্ষিতে ভারতবর্ষে বৃটিশ-গৌরব,
দণ্ডিয়া নবাবে। হেন উদ্দেশ্য যাহার,
তার কাছে কি অসাধ্য, কিবা অসম্ভব ?
অবশ্য পশিব রণে, জিনিব সমর ;

এই দুর্লভ মনোবলের চিত্র 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনাকার স্বদেশবাসীদের চরিত্রে আরোপ করতে পারেননি—কারণ তা হত অবিশ্বাস্য। রণোন্মাদনার সঙ্গীত ক্লাইভের কণ্ঠেই ধ্বনিত হয়েছে,—

সম্পদ সাহস ; সঙ্গী তরবার,
সমুদ্র বাহন ; নক্ষত্র কাণ্ডারী ;
ভরসা কেবল শক্তি আপনার ;
শয্যা রণক্ষেত্র ; ঈশা ত্রাণকারী। [ঐ]

স্বদেশপ্রেমী কবি নবীনচন্দ্র স্বাধীনতা-কামী বাঙ্গালীর পক্ষ নিয়ে বিশ্বাসঘাতক বাঙ্গালীদের ধিক্কার দিয়েছেন। পলাশীর রণক্ষেত্রে দর্শনে কবির অন্তর ক্রন্দন করে ওঠে,—

এই কি পলাশী ক্ষেত্র ? এই সে প্রাঙ্গণ ?
যেইখানে, কি বলিব ? বলিব কেমনে !
... ...
যেইখানে চিররুচি স্বাধীনতা ধন
হারাইল অবহেলে পাপাত্মা যবনে ?

দুর্বল বাঙ্গালী আজি, মানস নয়নে,
দেখিবে সে রণক্ষেত্র। [তৃতীয় সর্গ]

এ ইতিহাস রচনামুহূর্তে আত্মবিস্মৃত কবি বিশ্বাসঘাতককে নির্মম কণ্ঠে ধিক্কার দিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রও আত্মশোধনের উপায় হিসেবে আত্মনিন্দার আশ্রয় নিয়েছিলেন ;—আত্মজাগরণের মুহূর্তে সত্যপথ চিনে নেবার গুরু দায়িত্ব যে আমাদেরই—কবি শুধু পথপ্রদর্শক। নবীনচন্দ্র ষড়যন্ত্রকারীদের ক্ষমা করেননি,—

রে পাপিষ্ঠ রাজা রায়দুর্লভ দুর্বল!
বাঙ্গালি কুলের গ্লানি, বিশ্বাসঘাতক!
ডুবিলি ডুবালি পাপি! কি করিলি বল?
তোর পাপে বাঙ্গালীর ঘটিবে নরক।
... ...
প্রতিদিন বঙ্গবাসী পাবে প্রতিদান।
প্রতিদিন বাঙ্গালীর শত মনস্তাপ,
প্রতি মনস্তাপ তোরে দিবে শত শাপ। [ঐ]

প্রকৃত দেশপ্রেম কবিকে সত্য কথনের শক্তি দিয়েছে,—আন্তরিক দুঃখে কবির সমগ্র অন্তর আন্দোলিত। 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যেব তৃতীয় সর্গে ও চতুর্থ সর্গে গভীর মনোদুঃখের অভিব্যক্তি ধরা পড়েছে। সময়োচিত প্রকৃতি বর্ণনায় আসন্ন দুর্যোগের ব্যঞ্জনা ফুটিয়েছেন বর্ণনাপটু কবি নবীনচন্দ্র। স্বাধীনতালুপ্তির কালিমা যেন কবির অন্তর স্পর্শ করেছে। দেশপ্রেমের বিশুদ্ধ আবেগ বর্ণনার ছত্রে ছত্রে ধরা পড়েছে,—

নিদাঘ নিশির শেষে নীরব অবনী ;
নিবিড় তিমিরে ঢাকা ভূতল গগন ;
তারাগণ ম্লানমুখে চাহিয়া ধরণী
জ্বলিতেছে শিবিরের আলোর মতন।
ভবিষ্যৎ ভাবি যেন বঙ্গবিষাদিনী
কাঁদিতেছে ঝিল্লীরবে, পলাশী প্রাঙ্গণ
ভেদিয়া উঠিছে ধ্বনি চিত্ত বিদারিনী— [ঐ]

স্বদেশপ্রেমিক কবির চিত্তে জন্মভূমির ম্লানমুখী এই রূপ ধরা পড়েছিল, অসহায় ভঙ্গিতে এই দুরবস্থা প্রত্যক্ষ করেছি আমরা।—স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্ম লগ্নে এই চিত্র আমাদের মনোবল সৃষ্টিতে সহায়তা করেছে, আমাদের সুপ্ত শক্তিকে জাগিয়েছে। একদিকে দীনা মাতৃভূমির হৃতসর্বস্ব রূপ—অন্যদিকে ক্লাইভের স্বদেশ

প্রেমের অভিব্যক্তি দেখে পরাধীন ভারতবাসী স্বাধীনতা লাভের শপথ উচ্চারণ করেছে।

আমাদের স্বাধীনত্ব বীরত্ব জীবন,
রণক্ষেত্রে এই দেহ হলে ধরাশায়ী,
তথাপি ত্যজিব প্রাণ বীরের মতন।

এই কথা ক্লাইভের মুখে উচ্চারিত হলেও এ শপথ স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিটি সৈনিকের। ইঙ্গিতময়-অর্থময় প্রেরণা হিসেবে এসব অংশের অপরিসীম মূল্য স্বীকার করতে হয়।

"পলাশীর যুদ্ধকে" বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর আন্তরিক রোদনের কাব্য বলেছেন, চতুর্থ সর্গ পাঠ করেই এই সার্থক অভিমতটির যৌক্তিকতা বোঝা যায়। 'যুদ্ধ' নামাঙ্কিত এই সর্গটিতে নবীনচন্দ্র বঙ্গ ইতিহাসের নতুন অধ্যায় যোজনার সকরুণ ইতিহাসটি বর্ণনা করেছেন। দুর্বলতা অথবা ষড়যন্ত্র, পলাশীর যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ যাই হোক না কেন,—এই মুহূর্তটি অশুভ। ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রশ্নটি একেবারে সরাসরি তুলে ধরেছেন কবি,—হিন্দু জাতীয়তার আদর্শ দিয়েই বিচার করেছেন ঘটনাটি,—

"দেখিছ না সর্বনাশ সম্মুখে তোমার ?
যায় বঙ্গ-সিংহাসন,
যায় স্বাধীনতা-ধন,
যেতেছে ভাসিয়া সব, কি দেখিছ আর ?
"ভেবেছ কি শুধু রণে করি পরাজয়,
রণমত্ত শত্রুগণ
ফিরে যাবে ত্যজি রণ,
আবার যবন বঙ্গে হইবে উদয় ? [চতুর্থ সর্গ]

যবন কিংবা ইংরাজের সত্যিকারের কোন পার্থক্য নেই—এ সত্য সেযুগীয় ঐতিহ্যজাত উপলব্ধি। নব্য রেনেসাঁ আমাদের এ সত্য চিনিয়েছে। মুক্তির আহ্বান এসেছে হিন্দু শক্তির সম্মিলিত চেতনা থেকে। নবীনচন্দ্র ইংরাজ অধিকারের প্রশ্নটিকে গুরুত্ব দেননি, যদিও রাণী ভবানীর ব্যাখ্যায় মুসলমান সিরাজদ্দৌলার সঙ্গেও আমাদের আত্মীয় সম্বন্ধটি ঘোষিত হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর ব্যাখ্যায় স্বাধীনতা হরণকারী যে কোন জাতিই আমাদের শত্রু বলে পরিগণিত,—বিশুদ্ধ দেশচেতনা উদার বিশ্ব-মানবতার অন্তর্নিহিত আবেদন এমনি করেই যুগে যুগে কালে কালে ব্যর্থ করে দিয়েছে। আত্মজাগরণ আত্মস্বার্থের সীমিত উপাসনার উপরই অধিষ্ঠিত হয়ে থাকে। তাই নবীনচন্দ্র ইংরেজ অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ পটভূমিকায় দার্শনিকসুলভ উক্তি করেছেন,—

'মূর্খ তুমি!—মাটি কাটি লভি কোহিনুর,
ফেলিয়া সে রত্ন হায়!
কে ঘরে ফিরিয়া যায়,
বিনিময়ে অঙ্গে মাটি মাখিয়া প্রচুর?' [ঐ]

প্রথম পংক্তিটির অসামঞ্জস্যপূর্ণ শব্দপ্রয়োগের ফলে কখনও আমাদের মনে এ ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠতে পারে যে, সেদিন বাঙ্গালী হিন্দু পূর্ণ আত্মসচেতনতা লাভ করেছিল—কিংবা হিন্দু জাতীয়তা পুনঃ প্রতিষ্ঠার পুণ্যব্রতে আত্মনিয়োগের বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেছিল। শুধু কাব্যেই নবীনচন্দ্র সেই উপলব্ধির ক্ষীণ আভাস দানের চেষ্টা করেছিলেন, অষ্টাদশ শতকের বিচ্ছিন্ন বাংলায় এত বড় আত্মজাগরণ পর্ব কল্পনারও অতীত ছিল। রাজপদে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে সংকীর্ণ স্বার্থকে দেশ-স্বার্থের চেয়ে অনেক বড়ো বলে মনে করাটাই ছিল সে যুগীয় প্রবণতা। দেশজননীর পবিত্র রূপ দেশপ্রেমিকের সংগঠন প্রবৃত্তিকে সে যুগে জাগিয়ে তোলেনি। নবীনচন্দ্র সেযুগের মানসিক দৈন্যের চেহারা দেখে শিহরিত হয়েছিলেন,—আন্তরিক রোদনের মতই তার কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত হয়েছে বহু বেদনা,—

যেই হিন্দুজাতি এবে চরণে দলিত,
সেই হিন্দুজাতি সনে,
নিশ্চয় জানিও মনে,
একই শৃঙ্খলে সবে হবে শৃঙ্খলিত।
অধীনতা অপমান সহি অনিবার,
কেমনে রাখিবে প্রাণ,
নাহি পাবে পরিত্রাণ,
জ্বলিবে জ্বলিবে বুক হইবে অঙ্গার। [ঐ]

কবির এ বক্তব্যটি সমগ্র বাঙ্গালীর জীবনে পরীক্ষিত সত্য। এই আত্মদহনের প্রয়োজন ছিল জানি—কিন্তু সে আয়োজন করার পূর্ণ গৌরবও আমাদের। পলাশীর প্রান্তরে আমাদের দোষগুলোই পুনরাবৃত্ত হয়েছে—এজন্য আমাদের বিস্মিত হওয়ার অবকাশ নেই। এমন ঘটনা, এমন পরাজয় বঙ্গদেশে ইতিপূর্বেও হয়েছে,—কিন্তু তবু পলাশীর যুদ্ধচিত্রটি বারংবার কবি স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন কেন? এ প্রসঙ্গে এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে যে, ইতিপূর্বে বাঙ্গালীর মনে যুদ্ধ বা পরাজয় সংক্রান্ত ব্যাপারটি এমন ব্যাপকতর আলোচনার বিষয়বস্তু বলে গৃহীত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গদেশে এ চিন্তা প্রথম করেছে এ যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালী। আমাদের পরাজয়ের লজ্জাকে, জয়ের গৌরবকে লোকচক্ষুর সামনে দাঁড় করিয়ে নিন্দা ও প্রশংসা করার তাগিদ অনুভব

করেছেন এ যুগের কবি ও সাহিত্যিকবৃন্দ। পলাশীর যুদ্ধের ঘটনাটিকে বিশ্লেষণ-এর নিপুণ দায়িত্ব নিয়ে কবি নবীনচন্দ্র অকপটে আত্মবিচার করছেন,—হাজার বছরের বাংলা সাহিত্যে এমন ঘটনা এমন দৃষ্টান্ত আর নেই।

আত্মবিশ্লেষণের মুহূর্তেও নবীনচন্দ্র নির্ভীক হৃদয়ে সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন।

কোথায় ভারতবর্ষ!—কোথায় বৃটন!
অলংঘ্য পর্বতশ্রেণী, অনন্ত সাগর,
* * *
সেই সে ইংলণ্ড আজি হইল উদয়,
ভারত অদৃষ্টাকাশে স্বপনের মত।
এই রবি শীঘ্র অস্ত হইবার নয়,
কখনো হইবে কি না, জানে ভবিষ্যৎ। [ঐ]

এই অংশ রচনার কয়েক বৎসরের মধ্যেই সমগ্র ভাবতব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন জন্মলাভ করে। নবীনচন্দ্র বিগত অতীতকে নিখুঁতভাবে বিচার করেছেন বটে, অদূর ভবিষ্যতের স্পষ্ট ইঙ্গিতগুলো তিনি চিনে নিতে পাবেননি। যে মনোভাব থেকে এ কাব্যের জন্ম, শিক্ষিত স্বদেশবাসী যে আশার বাণী শোনার অপেক্ষায়, কবি সেই প্রত্যক্ষ আশাবাদের চিত্রটিই ফোটাতে পারেননি। 'পলাশীর যুদ্ধ' প্রকাশনা ও রঙ্গমঞ্চে এ কাব্যের জনপ্রিয়তা, সে যুগীয় দেশৈষণারে প্রত্যক্ষ ফল। অথচ কবি পলাশীর যুদ্ধকালীন আশা নিরাশার চিত্রাঙ্কনে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দস্যু হলেও হিন্দু মারাঠা শক্তির জাগরণে সেকালের বঙ্গদেশ ক্ষীণ আশার আলো দেখেছিল, রানী ভবানীর উক্তিতে সে সত্য ধরা পড়েছে,—

যেই রূপে যবনেরা ক্রমে হতবল,
হইতেছে দিন দিন, অদৃশ্যে বসিয়া
যেরূপে বিধাতা ক্রমে ঘুরাতেছে কল
ভারত অদৃষ্ট যন্ত্রে, দেখিয়া শুনিয়া
কার চিত্ত হয় নাই আশায় পূর্ণিত? [১ম সর্গ]

এই আশাটি অত্যন্ত ক্ষীণ আশা,—তবু হিন্দু জাতীয়তার আলোকে নবীনচন্দ্রও এ আশাটি লালন করেছেন,—

যবনের অবনতি করি দরশন,
নিরখিয়া মহারাষ্ট্র গৌরব বর্দ্ধিত,
কোন হিন্দুচিত্ত নাহি—নিরাশা সদন—
হয়েছিল স্বাধীনতা—আশায় পূরিত? [৪র্থ সর্গ]

মারাঠা শক্তির জাগরণে হিন্দু সম্প্রদায়ের আশা নিরাশার যে কল্পিত চিত্রটি তিনি তুলে ধরেছেন, তদানীন্তন রাজনৈতিক ইতিহাসের কিংবা সামাজিক ইতিহাসের সঙ্গে তার প্রচণ্ড অমিল। হিন্দুশক্তি হলেও দস্যু-অত্যাচারী বর্গীদের সঙ্গে বঙ্গবাসীদের যোগাযোগের বিস্তারিত বিবরণ ইতিহাসে ইতিপূর্বে বিবৃত হয়েছে। নবীনচন্দ্র স্বাধীনতা চেতনা দিয়ে দস্যু বর্গীদের অত্যাচারের ব্যাখ্যা করেছেন—এখানেও স্বদেশপ্রেমী নবীনচন্দ্রের পরিচয় মিলবে। বর্গী হাঙ্গামাকারীদের হিন্দুশক্তির প্রতিভূ হিসেবে কল্পনা করার মৌলিক শক্তিটি দেশপ্রেমজাত। ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা কাব্যে আশা করা যায়—বিশেষ করে যুগ সচেতন কাব্যে। মারাঠা দস্যুদের পরাভবে রোদনপ্রিয় বাঙ্গালী দেশপ্রেমী কবি তাই অশ্রুসিক্ত—দেশপ্রেমিকতাব এ এক অনন্য দৃষ্টান্ত সন্দেহ নেই।

পরাধীনতার গ্লানি কবি মর্মে মর্মে অনুভব কবেছিলেন বলেই আগামীদিনের দুঃখের চিত্রটি বাস্তব হয়ে উঠেছে,—

যবন গৌরব রবি ফিরিবার নয়,
ভারতের এই দিন ফিরিবে না আর
ফিরিবে না মৃতদেহে বিগত জীবন।
বাঁচিবে না রণাহত অভাগা সকল। [ঐ]

কবিজনোচিত উচ্ছ্বাস দুঃখের আবেগকে গাঢ়তর করেছে। বর্ণনাসিদ্ধ কবি নবীনচন্দ্র স্বাধীনতা বিসর্জনের এ শোকাবহ ঘটনাটিকে বিলাপসর্বস্ব কাব্য করে তোলেননি, দুঃখের অন্তরালে যুক্তির সত্য বারংবার ধ্বনিত হয়েছে এখানে। দোষস্খালন কিংবা দোষারোপের বাড়াবাড়ি যা কিছু ছিল, নিরপেক্ষ বর্ণনাগুণে তা হৃদয়গ্রাহী হতে পেরেছে। পরাধীনতার অন্তহীন জ্বালা নিয়ে উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বসে কবি ইচ্ছে করলেই দীর্ঘ বিলাপমালা রচনা করতে পারতেন কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর তমসাচ্ছন্ন বাংলা দেশে দেশ চেতনার সত্যরূপটি আরও আচ্ছন্ন হয়ে যেতো। নবীনচন্দ্র এ ব্যাপারে অসীম সংযমের পরিচয় দিয়েছেন। সে যুগে স্বাধীনতার মূল্য কিংবা পরাধীনতার জ্বালা উভয় অনুভূতিই ছিল অসাড়। তাই নবীনচন্দ্র বিশ্লেষণী মনোবৃত্তি থেকেই বলেছেন,—

আর ভারতের ? সেই চির-অধীনীর ?
ভারতেরো নহে আজি অসুখের দিন।
পশিয়া পিঞ্জরান্তরে, বন-বিহগীর
কিবা সুখ, কি অসুখ ?—সমান অধীন। [ঐ]

এই সহজ সত্য দেশপ্রেমের কাব্যে পরিবেশন করে কবি সংযত মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন।

ক্ষমতা হস্তান্তরের এ নাটকে বাঙ্গালীকে যদি দর্শক হিসেবে মেনে নেওয়া যায়—তবে তাদের যথার্থ মনোভাব কি হতে পারে—নবীনচন্দ্র মানসচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। যবন অত্যাচার এদেশীয় হিন্দুসম্প্রদায়ের চিত্তে যে গ্লানি সৃষ্টি করেছিল—ইতিহাস তা ভোলেনি,—কবি তা ভুলবেন কেমন করে? আগন্তুকের শক্তি বন্দনায় জাতীয় চরিত্রের দুর্বল রূপটি যেমন ধরা পড়ে, নির্মম অত্যাচারীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার বাসনাটিও সেখানে গোপন থাকে না। যদিও জানি পররাজ্য যারা গ্রাস করতে আসে তারা সাধু নয়,—শক্তিমান। অষ্টাদশ শতাব্দীর অত্যাচার ক্লিষ্ট বাঙ্গালীর যথার্থ মনোভাব নবীনচন্দ্র ফুটিয়ে তুলেছেন এভাবেই,—

"কিন্তু বৃথা,—নাহি কাজ সুদীর্ঘ কথায়
জানি আমি যবনের পাপ অগণিত ;
জানি আমি ঘোরতর পাপের ছায়ায়
প্রতি ছত্রে ইতিহাস আছে কলঙ্কিত।
আছে,—কিন্তু হায়। এই কলঙ্ক সাগরে
ছিল নাকি স্থানে স্থানে রতন নিচয়
চিরোজ্জ্বল, ইতিহাসে রক্ষিত আদরে ?
ছিল না কি সম্রাট মাত্র সম নৃশংসয় ?
পাপী আরঙজীব, আলাউদ্দীন পামর,
ছিল যদি, ছিল না কি বাবর, আকবর ? [ঐ]

কাব্য নয়—এ যেন ঐতিহাসিকের নিষ্ঠায় রচিত ইতিহাসের একটি অংশ মাত্র। ইতিহাসের কলঙ্কিত পৃষ্ঠাগুলোর সত্যাসত্যতা যাচাই করার দায়িত্ব কবির নয়, সমাজপ্রেমীর। নবীনচন্দ্রকে পৌরাণিক যুগ থেকে অনায়াসে আধুনিক ইতিহাসের মধ্যে প্রবিষ্ট হতে দেখি—

"বিনাযুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী—
এই মহাবাক্য যার ইতিহাস গত,
সেই জাতি এ ভারত করি পরাধীনী
—পাণিপথে, আত্মদ্রোহী হল আত্মহত।
সপ্তদশ অশ্বারোহী যবনের ডরে,
সোনার বাংলা রাজ্য দিল বিসর্জন।" [ঐ]

এ আক্ষেপবাণী শুধু নবীনচন্দ্রের নয় ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমী কবিদের এ মনোক্ষোভ নানাভাবে প্রকাশিত হতে দেখেছি। প্রশ্ন উঠতে পারে 'পলাশীর যুদ্ধের' পটভূমিকায় বহুশ্রুত এ অংশগুলো যোজনার কি সার্থকতা আছে? পুনরাবৃত্তির

কোন ঐতিহাসিক প্রয়োজন থাকে কি না জানি না, বাংলাদেশের। স্বাদেশিক আন্দোলনের পূর্বাহ্নে বাংলা কবিতায় অতীত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি বারংবার প্রত্যক্ষ করেছি। সব কবিরাই শেষ পর্যন্ত বর্তমানের হতাশা থেকে অতীত ইতিহাসের গৌরবোজ্জ্বল মুহূর্তের ছায়ায় আত্মগোপন করতে চেয়েছেন,—এ যেন ক্রোড়ের শীতল শান্তি। আমাদের বর্তমান নেই,—কিন্তু অতীত ছিলো, এ কথা যতক্ষণ না বোঝাতে পেরেছেন, অতৃপ্ত কবি শান্ত হতে পারেন নি। বাংলা সাহিত্যে স্বাদেশিকতার জোয়ার এসেছে এই অতীত স্মৃতিচারণার মধ্য দিয়েই। পুনরাবৃত্ত অতীত আদর্শ সত্যই একদিন আমাদের কালিমালিপ্ত বর্তমানের দৈন্য ঘোচাবার চেষ্টা করেছিল। "পলাশীর যুদ্ধে" যে বাঙ্গাল'র পতন ঘটেছে—সে ইতিহাসও কবি যথাসাধ্য বর্ণনা করলেন,—কিন্তু ইতিহাসেরও যে ইতিহাস আছে—এ সংবাদ পরিবেশনের লোভটুকু তিনি ত্যাগ করবেন কি করে? লক্ষ্যণীয় প্রবণতা হচ্ছে এই যে, নবীনচন্দ্র যখন মোঘল ইতিহাসে গৌরবচিহ্ন আবিষ্কারে অক্ষম হলেন তখন পৌরাণিক ইতিহাস অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করেননি আর মহাভারতের অতি শ্লাঘনীয় আত্মম্ভরিতাকে নবীনচন্দ্র মহাবাক্য নামে অভিহিত করলেন অনায়াসে। দুর্যোধনের সঙ্কীর্ণতা-নীচতা তার বীরত্বের-শৌর্যের প্রতীকে পরিণত হলো,—দম্ভ রূপ নিল বন্দনীয় বীর্যশক্তি রূপে। নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন করে তৃণখণ্ডকে আশ্রয় করে বাঁচার চেষ্টা করে,—স্বদেশপ্রেমী কবিরাও তেমনি করে পৌরাণিক খড়কুটো আঁকড়ে ধরতে চেয়েছেন, শুধু ভাবেননি যে পৌরাণিক সিদ্ধসত্যটি প্রয়োজনের তাগিদে রূপান্তরিত বা বিকৃত হল কি না। উনবিংশ শতাব্দীর শেষতম উল্লেখযোগ্য স্বদেশী কবি হিসাবে নবীনচন্দ্রের এ প্রয়াস লক্ষ্যণীয়।

'পলাশীর যুদ্ধের' শেষাংশ রোদনপ্রিয় বাঙ্গালীর কাছে অতি মর্মান্তিক বলে মনে হবে—যদিও এই হৃদয়বিদারক অংশটি পরোক্ষভাবে আমাদের উত্তেজনা সঞ্চারে সাহায্যই করেছিল। সিরাজদ্দৌলার হত্যাদৃশ্য যোজনা করে নবীনচন্দ্র বাঙ্গালীর কোমল তন্ত্রীতে ঘা দিয়েছেন,—সমবেদনায় কবিকণ্ঠ পূর্ণ,—

> ডুবিবে, ডুবিছে, আহা! আপনি আপন।
> শৃঙ্গচ্যুত শিলাখণ্ড ত্যজিয়া শিখর
> পড়ে যবে ধরাতলে, কি কাজ তখন
> আঘাত করিয়া তার পৃষ্ঠের উপর? [পঞ্চম সর্গ]

কবিত্ব,শক্তি নয়—সমবেদনাই ট্র্যাজিক রসের উৎস এখানে। "পলাশীর যুদ্ধে" নবীনচন্দ্র মৃত্যুর মর্মান্তিকতা, নৃশংসতার নগ্ন রূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন,—রোদনপ্রিয় বাঙ্গালীর সদ্যজাগ্রত চিত্তভূমিতে উত্তাপ সঞ্চারের প্রয়োজনে এ অস্ত্রটি অব্যর্থ হবে

নবীনচন্দ্র তা জানতেন। "পলাশীর যুদ্ধের" কাব্যগুণ বিচার করার প্রয়োজনই বা কি; ঐতিহাসিক মানদণ্ডের নিখুঁত নিরিখে যাচাই করার তাগিদই বা কোথায়? স্বদেশচেতনায় উত্তেজিত বাঙ্গালী এর মর্মান্তিক চিত্র দেখে অভিভূত। নাট্যকার এ দেখে নাটক রচনার কথা চিন্তা করছেন,—স্বদেশপ্রাণ বাঙ্গালী এ দেখে আত্মরক্ষার শপথ উচ্চারণ করছে,—নীতিবাগীশ এ দেখে বিশ্বাসঘাতকতার নতুন দৃষ্টান্ত অনুসন্ধান করেছে, সব মিলিয়ে 'পলাশীর যুদ্ধের' কবি নবীনচন্দ্র দেশবাসীর অকুণ্ঠ প্রশংসা যদি পেয়েই থাকেন, নিছক উচ্চাঙ্গের সৃষ্টি নয় বলে এ কাব্যের সব অসম্পূর্ণতা যদি সাফল্যের নীচেই চাপা পড়ে থাকে তবে তা স্বাভাবিকই হয়েছে। কাব্য বিচারের উন্নত মানদণ্ড চিরকালীন সাহিত্যের বা ক্লাসিক রচনার চরণ বিশ্লেষণ করুক,—কালের চিত্ততলে স্বদেশী সাহিত্যের বিচার যে ভাবে হওয়া উচিত, সে যুগের উচ্ছ্বসিত বন্দনা 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যকে সেদিক থেকেই বিচার করেছে। নবীনচন্দ্রের সার্থকতার নয়, তাঁর সিদ্ধির সাফল্যের বিচার হয়েছে "পলাশীর যুদ্ধ" কাব্যে।

অবকাশরঞ্জিনী [১ম ভাগ]-এ নবীনচন্দ্রের স্বদেশ প্রেমোচ্ছ্বাসের শুরু, "পলাশীর যুদ্ধ" রচনাকালে উচ্ছ্বাস ও স্বদেশচিন্তার সমন্বয় ধরা পড়েছে,—যাকে ক্রম পরিণত স্বদেশচিন্তার একটি বিশিষ্ট ধাপ বলে মনে করা যায়। নবীনচন্দ্র কাব্য-জীবনের শুরুতেই স্বাদেশিকতার উত্তাপ সঞ্চার করেছিলেন, পরিণত বয়সে এ চিন্তা আধ্যাত্মিকতার দ্রবরসে সিক্ত হয়েছিলো। স্বদেশ ভাবনার ঘনীভূত রূপটি কবির কাব্য জীবনের আদি পর্বেই নিঃশেষিত হয়েছিলো বলে কিছু রচনাগত দুর্বলতা, আঙ্গিকগত শৈথিল্য কিংবা ভাবগত দৈন্য চোখে পড়বে। কিন্তু পূর্বেই বলেছি, কবিতা হিসেবে এবং স্বদেশাত্মক কবিতা হিসেবে বিচারের মানদণ্ড এক নয়। সৃষ্টি হিসেবে নিখুঁত না হলেও উত্তেজনা সঞ্চারের ক্ষমতা দেশাত্মক কবিতায় থেকেই যায়,—অনেক প্রকাশ্য ত্রুটিও স্বদেশপ্রেমের মতো মহৎ এবং মূল্যবান ভাবনার অন্তরালে চাপা পড়ে। দেশপ্রেমের অন্তর্নিহিত আবেগ কোনোক্রমে ধরা পড়লেই উৎসুক দেশবাসীর মন নেচে ওঠে। দেশের কোন কোন সঙ্কটময় পরিস্থিতিতে এ সত্য বারবারই ধরা পড়েছে। এককালে নজরুল কিংবা রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক সঙ্গীত শুধু মানুষকে তৃপ্তি দেয়নি,—উত্তেজনা দিয়েছে—দাহ সৃজন করেছে। কে না জানে সার্থক কবিতার নিখুঁত অঙ্গসজ্জা কিংবা প্রসাধনের অভাব সেসব কবিতায়ও রয়েছে? নবীনচন্দ্রের দেশাত্মবোধ তাঁর প্রথম জীবনের সৃষ্টির প্রেরণা; সেই প্রেরণা যেমন শুচিশুদ্ধ—তার আবেদনের সীমাও শুধু সেই উন্মুখ পবিত্র দেশপ্রেমিক মানুষদের কাছে। "পলাশীর যুদ্ধ" তাই কাব্য নয়, মন্ত্র; শপথেচ্ছু দেশপ্রেমিকের কাছে

বীজমন্ত্রের মতো। এর অভিনয় নাটকের সূক্ষ্ম কলাকৌশল তুলে ধরেনি, কিন্তু প্রতিটি মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগিয়ে তুলেছে। প্রথম যুগের রচনা বলে এঁদের প্রতি সমালোচকের অনীহা থাকবে সেটা অসঙ্গত নয়,—কিন্তু যে উদ্দেশ্যে এ কবিতার জন্ম—তার পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে দেশপ্রেমী রসিকেরা এর রস গ্রহণ করেছিলেন। সাহিত্যে দেশপ্রেমের ধ্বজা যাঁরা বহন করেন তাঁদের অনেক সময়ই উদ্দেশ্যমুখ্য বক্তব্য পরিবেশন করতে হয়—নবীনচন্দ্রই শুধু নয় সেদিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র কাব্যসাহিত্যেই এই প্রবণতা প্রকটরূপে প্রকাশিত।

নবীনচন্দ্রের "পলাশীর যুদ্ধ" নানা অভিমতের বিরোধিতা মাথায় নিয়ে শেষ পর্যন্ত দেশপ্রেমিকতার কষ্টিপাথরে উত্তীর্ণ হয়েছে। এ সত্যটি অন্য একটি ঘটনা দিয়েও ব্যাখ্যা করা যায়। জনৈক রসিক চিকিৎসক [ফ্রেঞ্চ মলেন] এ কাব্যটি অনুবাদ করেছিলেন এ কাব্যের অন্তর্নিহিত স্বদেশপ্রেমাত্মক বক্তব্যটি তাঁর ভালো লেগেছিল বলেই। এ প্রসঙ্গে এ সংবাদটুকু যোগ করা দরকার যে, কবির সঙ্গে পরিচিত হবার আগেই নিছক সাহিত্যপ্রীতি ও মুগ্ধতা নিয়েই অনুবাদক এগিয়েছিলেন। নবীনচন্দ্রের কাব্য একজন বিদেশীর সানুরাগ সমর্থন লাভ করেছিল, এ নিশ্চয়ই সংবাদ। এ অনুবাদ শেষ পর্যন্ত আত্মপ্রকাশ করেনি তবুও নবীনচন্দ্র এ বিষয়ে "আমার জীবনে" দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এ সৌভাগ্য নবীনচন্দ্র "পলাশীর যুদ্ধ" রচনা করেই পেয়েছিলেন।

"পলাশীর যুদ্ধ" রচনার অল্পদিন পরেই নবীনচন্দ্রের 'অবকাশ রঞ্জিনী' [দ্বিতীয় ভাগ] প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় ভাগের অধিকাংশ কবিতাই সাময়িক পত্রে প্রকাশিত। কবি হিসেবে—বিশেষতঃ স্বদেশপ্রেমী কবি হিসেবে নবীনচন্দ্র তখন সুপ্রতিষ্ঠিত। স্বদেশাত্মক অনুভূতি কবিতাগুলির বক্তব্যকে গভীরতর করেছে। তবে প্রথমাবধি যে চিন্তাধারা,—যে দুঃখ কবিচিত্তে দেখেছি 'অবকাশ রঞ্জিনীর' [২য় ভাগ] দেশাত্মক কবিতাতেও তারই প্রতিবিম্বন। বহু কবিতা প্রথম মুদ্রণে প্রকাশিত হলেও পরবর্তী মুদ্রণে নির্বাচিত অংশ বর্জন করা হয়েছে। 'আবাহন' শীর্ষক অধ্যাত্মচিন্তাজাত কবিতাটিতে একই ভঙ্গিতে কবি আধ্যাত্মিকতা ও স্বদেশভাবনা একীকরণ করেছেন। তবে সহজেই লক্ষ্য করা যায় যে, ধর্মচেতনা নয়—স্বদেশ ভাবনার মাধ্যম হিসেবেই বিষয়বস্তু গ্রহণ করা হয়েছে। কারণ শক্তি ও শিবকে কবি সাধকের মতো আহ্বান করেননি, আত্মিক দ্বন্দ্বে পীড়িত হয়ে দেবতার কৃপাভিক্ষা করার প্রয়োজনও তার ছিল না,—কিন্তু দেশাদর্শ ছিল সামনে। কবি শক্তিকে আহ্বান জানিয়েছেন, এ আহ্বানের আধ্যাত্মিক প্রয়োজনই সেদিন তুচ্ছ হয়েছিল, শক্তিদেবীকে আহ্বানের অন্তরতর উদ্দেশ্যই হয়েছে প্রকট। কবি দীর্ঘাকারে কবিতাটি পরিবেশন করেছেন। ব্যক্তিস্বার্থ ও

স্বকীয় কামনাকে বিস্মৃত হয়ে দেশভাবনা কি ভাবে কবিকে পীড়িত করেছে তার চিত্র,—

বীর বালা মম, দানবদলনী।
দেখ, শৈলেশ্বর! দেখ নাহি তুমি
বহুদিন, আহা। সিন্ধু অতিক্রমি
যেদিন যবন এ ভারতভূমি
প্রবেশিল, হায়, হইল সেদিন
যেই মূর্ছা তব, ভাঙ্গিল না আর।
সপ্ত শতবর্ষ সেই মূর্ছাধীন—
রহিয়াছ। নেত্র মেল একবার। [আবাহন]

সেযুগে আত্মিক মুক্তিলাভের বাসনা কখনো বড়ো হয়ে ওঠেনি,—দেশাদর্শই সব ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছিল। অধ্যাত্মচিন্তা-ধর্ম দর্শনের মূল চিন্তা ও আদর্শ যদি দেশের স্বার্থকে অস্বীকার করে তবে সেযুগের দেশবাসীর কাছে তার কানাকড়ি দাম ছিল না। সাহিত্য সাধকদের অধ্যাত্মপ্রসঙ্গেও দেশমাতৃকা এসে দাঁড়িয়েছেন—সেই মূর্তিটির ধ্যান করতে শিখিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রও। তবে বঙ্কিমচন্দ্রেরও আগে শক্তিদায়িনী-দানবদলনী-শত্রুবিজয়িনী শক্তিকে নবীনচন্দ্র আবাহন জানিয়েছিলেন, এ মৌলিক ভাবনাটিকে সম্মান জানাতেই হয়। নবীনচন্দ্র আধ্যাত্মিকতার আবেগ মুক্ত হয়েও দেশাত্মবোধের প্রেরণায় এ কবিতাটি রচনা করেছিলেন—এবং প্রকট স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন। শক্তিদেবীর কাছে মন্ত্রোচ্চারণের জন্য শাস্ত্র বা পুঁথির সাহায্য কবি নেননি। দেশের বর্তমান দুঃখ ও নৈরাশ্যবোধে পীড়িত কবি আত্মোন্নতির জন্য দেবারাধনায় প্রবৃত্ত হননি,—তিনি অধঃপতিত ভারতের চিত্রটিই দেবীর সামনে তুলে ধরেছেন,—

হইতেছে নিশি ক্রমে গাঢ়তর;
গেল যবনেরা; কিন্তু পারাপার
চির অবিশ্বাসী-নির্দয় অন্তর,
সোনার ভারত ডুবাল আবার।
ওই সংখ্যাতীত বাষ্পীয় বাহনে,
লুঠি ভারতের রতন-ভাণ্ডার
নিতেছে বহিয়া, শোষে প্রাণপণে
শত স্রোতে হায় শোণিত তাহার। [ঐ]

আধ্যাত্মিকতা সর্বস্ব ভারতে নবীনচন্দ্র দেববন্দনার প্রাচীন রীতিটি সম্পূর্ণভাবে

বর্জন করেছিলেন। দেবীকে আহ্বানের প্রয়োজন আছে, কিন্তু লাঞ্ছিত পদানত ভারতবাসীর প্রণাম মন্ত্রটি পরিবর্তিত হয়েছে শুধু,

দেখ হৈমবতি, দেখ একবার
পিঞ্জরের পাখী ভারতদুঃখিনী।

ভারতের এই সর্বজনীন আর্তি কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। 'ভারত দুঃখিনী'কে উদ্ধারের জন্য কবি দেবশক্তিকে আহ্বান জানিয়েছেন, গতানুগতিকতার বেড়াজাল ছিন্ন হয়েছিল দেববন্দনার ক্ষেত্রেও, দেশপ্রেমী নবীনচন্দ্রের এ কবিতাটি তারই পরিচয় বহন করছে। কিন্তু সম্পাদকের সূক্ষ্মদৃষ্টি এড়ানো সম্ভব ছিল না বলেই 'আবাহন' নামক দেববন্দনামূলক এ কবিতাটীও রাজনৈতিক কারণে খণ্ডিতভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। কবি যদি চতুর হয়ে ওঠেন, সম্পাদককে আরও সাবধানী হতে হয়; এই আপোষের মনোভাব সেযুগের স্বদেশপ্রেমিক কবি মাত্রকেই অনিচ্ছার সঙ্গে মেনে নিতে হয়েছিল। 'আবাহন' এবং 'আগমনী' এ দুটি কবিতাতেই কিছু অংশ দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত হয়েছিলো রাজনৈতিক কারণে। কালানুক্রমিক বিচারে 'আগমনী' কবিতাটি আগের রচনা।

"আগমনী" কবিতাটি রাজবন্দনা; প্রাকৃতিক সৌন্দর্যমণ্ডিত চট্টগ্রামে রাজাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন কবি। বিদেশী সম্রাটকে আহ্বান জানানো হয়েছে যে কবিতায় স্বদেশপ্রেম সেখানে উপেক্ষিত হবে এটাই ত স্বাভাবিক। স্বদেশচিন্তার মূলে যে পরাধীনতার যন্ত্রণাবোধ থাকে, স্বাধীনতা অপহরণকারীকে তারই আলোকে সাধারণতঃ বিচার করা হয়। তবু দেখি, নবীনচন্দ্র আনুগত্য প্রদর্শন করেছেন ছদ্ম কৌশলে। রাজাকে আহ্বান জানিয়ে স্বকীয় বেদনার অনুভূতিটিকেও কবি ব্যাখ্যা না করে পারেননি। নিছক রাজানুগত্য নয়, বিদেশীর কাছে আত্মবিক্রয়ের করুণ উপলব্ধি কবি প্রকাশ করেছেন,

স্বয়ং বিধাতা তুমি,
বঙ্গ তব লীলা ভূমি,
বাঙ্গালী অদৃষ্ট, প্রভু, করেতে তোমার।
যার ভাগ্যে যা লিখিবে
কার সাধ্য খণ্ডাইবে ?
... ...
প্রকাণ্ড ত্রিশূল করে,
ত্রিভুবন কাঁপে ডরে,
এক শূল 'মিলিটরি' দ্বিতীয় 'সিবিল',
তৃতীয়তঃ 'হোমচার্জ', ওহে দয়াশীল॥ [আগমনী]

প্রত্যক্ষ রাজবন্দনার অন্তরালে পরোক্ষ আত্মদৈন্যের অনুভূতিটি কবি গোপন রাখতে পারেননি। বোঝা দুরূহ নয় কেন এসব অংশ বর্জনের প্রয়োজন অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। রাজবন্দনা পরোক্ষভাবে রাজসমালোচনারই নামান্তর হয়েছে,

তুমি কালান্তক যম,
অনিবার্য পরাক্রম,
বর্তমান কারাগার, 'নরক' তোমার।
যমদূত ভয়ংকর,
কাঁপে অঙ্গ থরথর,
সপুলিশ ম্যাজিস্ট্রেট। কি কহিব আর?
হায়! প্রভু মহামারি 'সমারি' বিচার।

হেমচন্দ্রের তীব্র ব্যঙ্গ এখানে নেই—নবীনচন্দ্রের কণ্ঠে অভিযোগের স্বরটিই স্পষ্ট হয়েছে বেশী। 'আগমনী' কবিতাটি নবীনচন্দ্রের নির্ভীক দেশপ্রেমের সাক্ষর বহন করেছে। রাজনৈতিক চেতনা কবির অন্তরে যে দাবদাহ সৃজন করেছে—অত্যন্ত মৃদু আন্দোলনে, সুপরিকল্পিত সজ্জায় তাকে তিনি সন্তর্পণে রূপদান করেছিলেন। বিদ্রোহী মনোভাবটি গোপন করে বিনীত অভিযোগের স্বরটি ফুটিয়ে তোলার আপ্রাণ সাধনা করেছিলেন—কিন্তু সত্যকে মিথ্যের মেঘ ঢেকে রাখতে পারে কতক্ষণ? রাজবন্দনা যে প্রতিবাদের গুঞ্জন ছাড়া অন্য কিছু নয় সম্পাদকের দৃষ্টি সে কথা আবিষ্কার করেছে। 'অবকাশ রঞ্জিনীর' [২য় ভাগ] ঐ কবিতা দুটি নবীনচন্দ্রের সদাজাগ্রত স্বদেশচিন্তার সাক্ষর বহন করছে। স্বদেশভাবনা কবির সব চিন্তাকে কিভাবে গ্রাস করে ফেলে, শক্তি বন্দনা ও রাজবন্দনা কি ভাবে দেশবন্দনাই নামান্তরে পরিণত হয়, এ কবিতা দুটি সে সত্য তুলে ধরেছে।

নবীনচন্দ্রের আর্যপ্রীতি, ইতিহাস প্রীতি হেমচন্দ্রের মতই সোচ্চার, এই আর্যপ্রেম—সে যুগের নতুন পাওয়া সম্পদ। উত্তাপ সঞ্চারের সামর্থ্য না থাকলেও উত্তপ্ত হওয়ার উপাদান এতে মিলবে। আর্যপ্রীতি উনবিংশ শতাব্দীর দেশসাধনার একটি প্রচলিত মাধ্যম। 'আর্যদর্শন' পত্রিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে নবীনচন্দ্র অভিনন্দন জানিয়েছেন সার্থক নামটি বেছে নেওয়ার জন্য। আর্যসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের মুহূর্তে এই পত্রিকা-প্রকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, নবীনচন্দ্রও তাই গভীর দেশপ্রেমে মগ্ন হয়ে কবিতাটি রচনা করেছিলেন। সার্থক দেশপ্রেমমূলক কবিতা হিসেবে এটি উল্লেখযোগ্য রচনা। 'আর্য' নামটিকে ঘিরেই কবির উন্মাদ দেশপ্রেম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে,—

"আর্য!"—আজি এ ভারতে,
নিষ্ঠুর! এ নাম কেন ধ্বনিলে আবার?

মরুভূমে পিপাসায়,
যেজন জলিছে, হায়।
"সুশীতল জল" কানে কেন কহ তাঁর ?
কেন মৃগ—তৃষ্ণিকার কর আবিষ্কার ? [আর্যদর্শন]

দেশানুভূতিকে কবি দহনের সঙ্গে তুলনা করেছেন,—আত্মআবিষ্কারের পালা যখন সাঙ্গ হল—চতুর্দিকের তমসাচ্ছন্ন পরিবেশ আমাদের মনে যে ক্ষোভ ও জ্বালার সঞ্চার করেছিল—কবি নিজেও তাতে দগ্ধপ্রাণ। আর্যইতিহাস সচেতনতাই আমাদের নিশ্চিন্ততার শান্তি গ্রাস করেছে, তাই বর্তমানের জীবন দুর্বিষহ বোঝার মত মনে হয়। প্রতিটি দেশপ্রাণ বাঙ্গালীর মর্মজ্বালা এ কবিতায় যেন ঝংকৃত।

ইতিহাসে ?—অবিশ্বাস।
ইতিহাস নহে,—অনুমানের সাগর।
তব ইতিহাসে কয়,
এই সেই আর্যালয়,
আমরা সে বীর্যবান আর্যের কুমার,
চন্দ্র সূর্য বংশে, এই জোনাকি সঞ্চার ? [ঐ]

হেমচন্দ্রের মতো পরাধীনা ভারতবাসীর অসহায় মূর্তিটি নবীনচন্দ্রকেও ম্লান করেছে। উজ্জ্বল ঐতিহ্য হারিয়ে আমরা রিক্ত,—নিম্নোক্ত অংশে কবির খেদ ;—

এই নহে আর্যাবর্ত,
আমরাও নহি সেই আর্যের কুমার,
তাহাদের বীর্যবল,
ছিল যেন দাবানল,
পৃষ্ঠে তূণ, করে ধনু, কক্ষে তরবার,
আমাদের অশ্রুজল, ভিক্ষা-পাত্র সার। [ঐ]

নবীনচন্দ্রের কণ্ঠে যে দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হতে দেখি,—তার মধ্যে নতুনত্ব নেই—সে যুগের বাঙ্গালীর মনোক্ষোভের সাধারণ রীতি ছিল এই। শুধু কবিতায় নয়, উপন্যাসে-নাটকে-ব্যঙ্গকাব্যে প্রাচীন ভারতের গৌরবময় অতীতের জন্য দুঃখমোচন সেযুগে অনিবার্য হয়ে উঠেছিলো। এই চিত্র বর্ণনায় কোনো স্বদেশপ্রেমিক ক্লান্তি বোধ করেন নি কেন, খুব সহজেই তা অনুমেয়। তিমিরাচ্ছন্ন বর্তমানকে অতীতের উজ্জ্বলতার প্রেক্ষাপটে যাচাই করে নেবার সাধারণ প্রবণতা সেযুগে জন্ম নিয়েছিল। নবীনচন্দ্র

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের বলিষ্ঠ আশাবাদের চিত্র অঙ্কন করেননি কোথাও,—কিন্তু বর্তমানের দৈন্যকে শতমুখে নিন্দা করেছেন,—

"নাহি আর্য, কেন 'আর্য-দর্শন' এখন ?
কি আছে আর্যের আর,
বিনে ওই—হাহাকার,
নাহি অঙ্গ, নাহি মন, নাহি সে জীবন,
কি আর দেখিবে "আর্য দর্শন" এখন ? [ঐ]

নবীনচন্দ্র ধিক্কার দেবার নির্ভীকতা দেখিয়েছেন সর্বত্র,—রোদন ও দুঃখপ্রিয়তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন তিনি। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে আর্তের ক্রন্দন শতধারে উৎসারিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র আরও পরে সমালোচনায় কঠিন মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। নবীনচন্দ্রের কোনো কোনো কবিতায় এই দৃঢ়তা দুর্লভ নয়। হাহাকার ও ক্রন্দন মানুষকে স্বাধীনতা দিতে পারে না, শক্তি অর্জনের জন্য অন্যপথ অনুসন্ধান করতে হবে। ভবিষ্যতের জন্য কবি সেই পথটুকু নির্দেশ করেছেন,—

আর কোন মহারথী
বাজাইয়া পাঞ্চজন্য, ধরি তরবার,
করি' সিংহনাদ ধ্বনি,
আনে রক্ত তরঙ্গিনী,
আর্যরক্তে আর্যাবর্ত ভাসায় আবার,
তবে যদি আর্য বংশ জাগে পুনর্বার। [ঐ]

এই নির্দেশটি যেমন সত্য তেমনি উদাত্তগম্ভীর। নবীনচন্দ্র আগামী দিনের সৈনিক বাঙ্গালীর কথা চিন্তা করেছিলেন ; রক্তের শপথে আন্দোলিত প্রাণ বিদ্রোহীর নেতৃত্বের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন,—অদূর ভবিষ্যতেই যে তা আসবে শুধু এ সত্যটুকু অভ্রান্তভাবে চিনে নিতে পারেননি। এ অংশটি পরবর্তী অধ্যায়ের স্বাধীনতা আন্দোলনের ভবিষ্যৎ বাণীরূপে গৃহীত হতে পারে। আর্যশক্তি বাঙ্গালীর তথা সমগ্র ভারতবাসীর অন্তরে দীপ্যমান হয়ে উঠেছিল পরবর্তী অধ্যায়ে,—নবীন কবি তার সংকেত জ্ঞাপন করেছেন।

মাইকেল মধুসূদনের অকাল মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত স্বদেশী কবির মূল্যায়ন যথোচিত হয়েছে,—

মধুর কোকিল কণ্ঠে অমৃত লহরী
কে আর এখন,

দেশদেশান্তরে থাকি, কে 'শ্যামা জন্মদে' ডাকি,

নূতন নূতন তানে মোহিবে শ্রবণ ? [৺মাইকেলমধুসূদন দত্ত]

স্বদেশপ্রাণ মধুসূদনকে স্বদেশপ্রিয় নবীনচন্দ্র এভাবেই শ্রদ্ধার্ঘ অর্পণ করেছেন। নবীনচন্দ্র 'অবকাশ রঞ্জিনীর' [১ম ভাগে] বাঙ্গালী যুবকের মুমূর্ষু দশার চিত্র অঙ্কন করেছিলেন,—পরাধীন হয়ে বেঁচে থাকার দুঃসহ যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার উপায় হিসেবে মৃত্যুকেই অবলম্বন করছিল সে। এ ধরণের কল্পনা অন্যত্রও আছে। সুরাপ্রিয় বাঙ্গালীকে নেশাচ্ছন্ন হতে দেখেছিলেন কবি,—এই মোহাবেশকে তিনি ধিক্কার দিয়েছেন। কবিতাটির নামকরণটিও লক্ষ্যণীয়, "বাঙ্গালীর বিষপান" নবীনচন্দ্রের স্বদেশচিন্তায় উৎকৃষ্ট যোজনা। বাঙ্গালীর শক্তিহীনতা লজ্জার কারণ, কবি তা স্পষ্ট ভাবে বলেছেন,—

বিশেষ বাঙ্গালী চিরপরাধীন,
দাসত্ব জনম, দাসত্ব জীবন,
হইবে জীবন দাসত্বে বিলীন,
দাসত্ব যাহার অদৃষ্ট লিখন।
দাসত্ব জ্বালায় মরিবারে চাও ?
মরিবার তরে খুঁজিছ গরল ?
ঢাল এই বিষ—অধঃপাতে যাও।
এ জ্বলন্ত বারি তরল অনল।

[বাঙ্গালীর বিষপান]

স্বদেশপ্রেমের আদর্শেই কবিতাটির পরিকল্পনা। বাঙ্গালী জীবনের দুর্বলতাগুলি কবি জানেন তাই অধঃপতনের শোচনীয় সীমানায় বাঙ্গালীর অগ্রসর হওয়ার চেষ্টাকে তিনি নির্মমভাবে সমালোচনা করেছিলেন। সুরার বিভ্রান্তি কখনও কখনও আমাদের কাম্য। দাসত্ব পীড়িত আত্মা যখন ক্ষোভে দুঃখে ম্রিয়মান হয়ে পড়ে, কবি সচেতন ভাবে সুরা গ্রহণ করার স্বপক্ষে বলেছেন,—

ব্রাণ্ডি ;—ব্রাণ্ডি বিনে, কিছু নাহি আর
অধীনতা দুঃখ করিতে বিনাশ,
চিত্তে স্বাধীনতা করিতে সঞ্চার,
মহৌষধি এই ব্রাণ্ডির গেলাস। [ঐ]

এই যন্ত্রণাদগ্ধ চিত্তের কাছে সুরা পরম রমণীয় হতে পারে—কিন্তু এত ক্রমশঃ শক্তিহীন হওয়ার সাধনা—এ পথে শান্তি কি স্বাধীনতা আসতে পারে না। কখনও কখনও স্বদেশপ্রেমী কবিকে উপদেষ্টার আসনেও বসতে হয়েছে—যেমন কল্যাণাদর্শ

বঙ্কিমচন্দ্রকে সমালোচক হওয়ার প্রেরণা দিয়েছিল। নবীনচন্দ্র সুরাপানের চরম ফলাফলটি ঘোষণা করেন অবশেষে,—

জ্ঞান, বুদ্ধি, লজ্জা, ভরসা, বিশ্বাস,
নীতি, ধর্ম, সত্য জাতীয় গৌরব,
এই বিষতেজে হইবে বিনাশ।
একা সুরা বঙ্গে বিনাশিবে সব। [ঐ]

অধীনতার দুঃখ, পরপীড়নের গ্লানি এ কবিতাটিতে যেমন দৃপ্তভাবে প্রকাশ করেছেন কবি, এমন কোথাও পাওয়া যায় নি। সুরাসেবনের নিশ্চিত ফলাফল যে বিষময় শুধু এ কথা জানানোর জন্য কবিতাটি রচিত হয়নি। কবির ক্ষোভ-গ্লানির আপাতঃ সান্ত্বনা এই বিষমিশ্রিত সুরা। কবিও মুক্তি পেতে চান জীবন যন্ত্রণার হাত থেকে,—

সঙ্গে তুমি—তুমি কে? যম? কি ভয়।
জানি আমি ব্র্যাণ্ডি তব উপাদান,
যেই বিষাধার বাঙ্গালী-হৃদয়,
এই বিষ তাহে অমৃত সমান। [ঐ]

সুরাপান সমালোচনার মধ্যে কবির আত্মদহনের সংবাদ কবিতাটির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। উপদেশকের আসনে বসে কবি সুরাপানের নিন্দা করেননি,—সর্বনাশী সুরার হাতে কোন দুঃখে মানুষ আত্মসমর্পণ করে তিলে তিলে মৃত্যুকে বরণ করে তারই মর্মান্তিক চিত্ররচনা করেছেন। এসব কবিতায় বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ও স্বদেশ ভাবনার বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়।

'অবকাশ রঞ্জিনী' [২য় ভাগ] নবীনচন্দ্রের পরিণত মনের সৃষ্টি;—স্বদেশচিন্তার অধিকার কবি পেয়েছেন, তাঁর স্বদেশপ্রেম জনমনের তৃপ্তিসাধন করেছে। স্বকীয় উপলব্ধিকে তিনি বাঙ্গালীর মনে সঞ্চার করেছেন। স্বদেশপ্রেমিকের স্বচ্ছ দৃষ্টি 'অবকাশ রঞ্জিনী' [১ম ভাগে] নেই—কিন্তু দ্বিতীয় ভাগের কবিতাতে এই স্বচ্ছতাই সবার আগে চোখে পড়ে। 'চিহ্নিত সুহৃদ' কবিতাটিতে স্বদেশপ্রেমের আবেগ উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা যায়। সামান্য বিষয়বস্তু অবলম্বনে সুদীর্ঘ কবিতা রচনার সহজ ক্ষমতা নবীনচন্দ্রের ছিল। বিষয়বস্তুর অকিঞ্চিৎকরতা তিনি স্বদেশচিন্তার নির্মল প্রসঙ্গে দূরীভূত করেছেন। কবিবন্ধু উচ্চশিক্ষালাভের জন্য বিদেশে গমন করছেন,—প্রসঙ্গটি না স্বদেশচিন্তার না উৎকৃষ্ট কবিতার। কিন্তু নবীনচন্দ্র এ প্রসঙ্গ অবলম্বনে ১৪২ পংক্তির দীর্ঘ কবিতাটি রচনা করেছেন স্বচ্ছন্দে। স্বদেশাত্মক অংশটুকু কবিতার মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে,—নিছক অর্থহীনতার হাত থেকে

কবিতাটির মান বাঁচিয়েছে। এই শিক্ষালাভের সমালোচনাটি স্বদেশপ্রেমী কবির অন্তরের কথা।

অকূল, দুর্লঙ্ঘ্য সিন্ধু অতিক্রমি',
বীরত্বের খনি ব্রিটনে পশিয়া ;
জগত জীবন ইউরোপে ভ্রমি,
আসিয়াছ সখে! কি ফল লভিয়া?
শিখেছ সাহিত্য, শিখেছ দর্শন,
শিখেছ গণিতে নক্ষত্র মণ্ডল,
কিন্তু তাহে, সখে! হ'বে কি বারণ
"মাতার রোদন,—মাতৃ চিতানল?" [চিহ্নিত সুহৃদ]

এ প্রশ্নটি অবান্তর হয়নি কারণ স্বদেশপ্রেমিকের অন্তরাবেগ থেকে ঐ প্রশ্নের জন্ম হয়েছে। আমাদের শিক্ষাদীক্ষার মূল্য কবি স্বীকার করতে অপারগ, যদি সে শিক্ষার মূলে স্বদেশচিন্তার অভাব থাকে। শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যটি মহৎ হতে পারে, কিন্তু পরাধীন দেশের অধিবাসীর পক্ষে সেই শিক্ষাটুকুরই প্রয়োজন যা তাকে মুক্তির পাথেয় সংগ্রহে সাহায্য করবে। কিন্তু অভিজ্ঞতায় যা দেখেছেন কবি,—

ইংরাজের শ্মশ্রু ইংরাজেব কেশ,
ইংরাজী আহার—প্রিয় ব্রাণ্ডিজল,
আনিয়াছ, সখে! ইংরাজের বেশ,
কিন্তু ইংরাজের কই বীর্য-বল? [ঐ]

স্বদেশপ্রেমের অভিমান কবিকে সত্য জানার সাহস এনে দিয়েছে,—

কই ইংরাজের তীক্ষ্ণ তরবার?
কই ইংরাজের দুর্জয় কামান?
কই ইংরাজের সাহস অপার?
সিংহচর্মে তুমি মেষ অল্পপ্রাণ। [ঐ]

হেমচন্দ্র কিংবা পরবর্তীকালে দ্বিজেন্দ্রলাল ব্যঙ্গের আশ্রয়ে জাতীয় দুর্বলতার মুখোশ খুলেছিলেন ; নবীনচন্দ্র অকুতোভয়ে প্রত্যক্ষ সমালোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন,—স্বাদেশিকতার শক্তিই সত্য যাচাই এর সাহস এনে দিয়েছে তাঁকে।

এমন দৃঢ়তার বর্ম স্বদেশপ্রাণ কবিকে নির্ভীক করে তোলে সুতরাং 'চিহ্নিত সুহৃদ' শুধু কবিবন্ধুর উদ্দেশ্যেই রচিত হয়েছে এমন কথা বলা যায়না,—সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যেই কবির বক্তব্য। শক্তিমান-স্বদেশপ্রাণ, স্বজাতিগঠনে স্বদেশপ্রেমী কবিরা যেভাবে প্রেরণা জোগান, নবীনচন্দ্রের এ কবিতায় তা মিলবে। ইংরেজী শিক্ষাসভ্যতা

গ্রহণের প্রয়োজন সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হলেও নবীনচন্দ্র নিছক শিক্ষাগ্রহণের পক্ষপাতী নন। জাতীয় চরিত্র গঠনে শিক্ষিত মানসিক শক্তিসম্পন্ন মানুষের প্রয়োজন সবচেয়ে-বেশী, নবীনচন্দ্র এ কবিতায় মুক্তকণ্ঠে সে সংবাদ জানিয়েছেন। তাই 'চিহ্নিত সুহৃদকে' কবি ভর্ৎসনা করেন,—

হয়েছ "চিহ্নিত"। কিন্তু সেই চিহ্ন
তব পক্ষে, হায়! কলঙ্ক কেবল,
এই চিহ্নে সখে! হইবে না ছিন্ন
দীনা ভারতের অদৃষ্ট শৃঙ্খল। [ঐ]

পরাধীন অথচ স্বাধীনতাকামী বাঙ্গালীর সত্যিকারের শিক্ষা হবে রণনীতিজ্ঞান। সুউচ্চ দেশভাবনাজাত এ কবিতাটিতে নবীনচন্দ্র আগামী দিনের স্বধীনতালাভেরা পথনির্দেশ করেছেন,—

হবে কি সে দিন, কে করে গণনা,
যেই দিন দীনা ভারত তনয়
শিখি রণনীতি, করি', বীরপণা,
রক্তাক্ত শরীরে ফিরিবে আনায়?
সেইদিন যেই জয়—জয় ধ্বনি
তুলিবে ভারত আনন্দে বিহ্বল,
শুনিয়া সে ধ্বনি, হইবে অমনি
হিমাদ্রি চঞ্চল, সমুদ্র অচল। [ঐ]

রক্তাক্ত বিপ্লবের বহ্নি অল্পকাল পরেই জলে উঠেছিল সমগ্র ভারতে, নবীনচন্দ্রের দূরদর্শন সার্থক হয়েছিল। ইতিহাসের সত্যতা নির্ণয়ে নবীনচন্দ্র অকপট। পরাধীনতার দৃষ্টান্ত যেভাবে আমাদের সমবেদনা লাভ করবে বিজিতের জয় ততটুকু নয়। আমরাও দোসরখুঁজি সমবেদনা জ্ঞাপনের। কবি বলছেন,—

কি সুখ ছলনা! নাহি কাজ তাহে
বল বল, সখে! দেখেছ কি তুমি,
পতিতা বিগত বিপ্লব প্রবাহে
জগত গৌরব ফ্রান্স বীরভূমি?
ফরাসি-গৌরব সমাধি 'সিডনে'
দাঁড়াইয়া শোকে বিষাদে বিহ্বল,
ফরাসি অদৃষ্টে, বাঙ্গালী নয়নে
ঝরেছিল কি হে একবিন্দু জল? [ঐ]

ইতিহাসের দৃষ্টান্ত মানুষকে যে শক্তি এনে দেয় নবীনচন্দ্র ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সেই শক্তি সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন। গৌরবের-সম্মানের আসন থেকে পরাধীনতার অতল গহ্বরে তলিয়ে যাওয়ার দুঃখ যেদিন ফরাসীদের অন্তরে বেজেছিল নবীনচন্দ্র তারই সঙ্গে পরাধীন ভারতের সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। কখনও কখনও কবিকে অর্থহীন উল্লাসে মত্ত হতে দেখি,—

ভারত জীবন যাহাদের করে,
জানেন কি তাঁরা ভারত অমর ?
পোড়াও আগুনে, ডুবাও সাগরে,
মুমূর্ষু জীবন হবে না অন্তর।
কিন্তু মুছাইয়া নয়নের জল,
কর ক্ষীণ দেহে জীবন সঞ্চার
আবার ভারত ছাড়ি হিমাচল,
তুলিবে মস্তক মরি। দুরাশার।

এ আশাটুকুই আমাদের স্বদেশভাবনার অন্তস্থলে ফল্গুর মত নীরবে প্রবহমানা। ইতিহাসেরও ইতিহাসে যেকথা একদিন সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর মানুষরা পরম আগ্রহে তাকেই আঁকড়ে ধরেছে। আর্যত্ব, বীরত্ব কিংবা শক্তির দৃষ্টান্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হয়ে আমাদের প্রাগৈতিহাসিক যুগে ফিরে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না। আমাদেরই ইতিহাসে যা বিবর্ণ, আমাদের পুরাণে তা প্রোজ্জ্বল। সুতরাং নিরুপায়ের মত আমরা পুরাণ অবলম্বন করেছি, সৎ ও উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের মূল্য আমাদের জীবনে সেদিন অপরিহার্য প্রয়োজন রূপে দেখা দিয়েছিল। 'শবসাধন' কবিতায় বর্তমান ভারতের সঙ্গে পৌরাণিক ভারতের তুলনা দিয়েছেন কবি, বর্তমান ভারতের শ্মশান চিত্রটি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন,—

নিবাবে অনল ?—নিবেনি এখন,
কে নিবাবে বল,—নিবিবে কেমনে ?
সপ্তশত বর্ষ জ্বলিছে এমন,
কত শত বর্ষ জ্বলিবে কে জানে ?
যেই দিকে দেখি,—এই মহানল।
কোথায় ভারত ?—অনন্ত শ্মশান।
শ্মশান—শ্মশান—শ্মশান কেবল।
রাবণের চিতা, লঙ্কার প্রমাণ। [শবসাধন]

এই ভারতের উজ্জীবন সাধন করতে হবে আধুনিক ভারতবাসীদের। কোন মন্ত্রে মৃতদেহে প্রাণ সঞ্চার করবে তারা—কবি সেই নির্দেশটুকুও দিয়েছেন,—

আর্য-বীর্য-ভস্ম মাখি কলেবরে,
স্মৃতি মহামালা জপ অনিবার,
ত্রাহি মে ভৈরবি!—ডাক উচ্চৈঃস্বরে,
সাধ মহামন্ত্র—ভারত উদ্ধার। [ঐ]

বামাচারী সাধকের প্রয়োজন অনুভব করেছেন কবি। কিন্তু মোক্ষলাভের প্রশ্নটি তাঁকে ব্যাকুল করেনি—তিনি জানেন, পরাধীন ভারতের মোক্ষ তাঁর হৃত স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনা। স্বাধীনতা আকাঙ্ক্ষা যে দেশের মানুষকে অস্থির করেছে—তাদের ধর্মার্থ-কাম-মোক্ষ বলে আলাদা কিছু থাকতে পারে না,—কবির অভিমত এটি। 'আমার সঙ্গীত' কবিতায় এই চিন্তাটিই প্রাধান্য পেয়েছে; পরাধীন ভারতের সঙ্গীতই কবির সঙ্গীত। ব্যক্তিচিন্তার স্থান জাতীয় চিন্তার মাঝখানে কি ভাবে হারিয়ে যায়—জাতীয়সঙ্গীতই দেশপ্রেমিকের কাছে আত্মসঙ্গীত হয়ে ওঠে কি ভাবে 'আমার সঙ্গীতে' সে সত্য ধরা পড়েছে,—

গর্জে ছিল এই সঙ্গীত আমার,
পাঞ্চজন্যে মহাকুরুক্ষেত্র-রণে,
শিঞ্জিনী-শিঞ্জনে, অস্ত্রের ঝঞ্জনে,
রথের ঘর্ঘরে, ঘোর সিংহনাদে।
সেই সঙ্গীতের হইয়াছে, হায়!
শেষ তান লয় 'চিলেন ওয়ালায়?'

[আমার সঙ্গীত]

জালিয়ান ওয়ালাবাগের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গটি উল্লেখ করে কবি তাঁর গানের যথার্থ অর্থটি প্রকাশ করেছেন। সে যুগের ভারতবাসীর সামনে জালিয়ানওয়ালা বাগের ঘটনাটি স্মরণ করিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিলেন কবি,—যে ঘটনার আলোকে জড়ত্বজীবী ভারতবাসী স্বরূপ বিচার করতে শিখেছে। ভবিষ্যতের উত্তেজনা সৃষ্টিতে এ ঘটনাটির অসামান্য অবদান রয়েছে। মৃত ভারতের আত্মাকে পুনর্জীবিত করতে হলে যে সঙ্গীত সাধনার প্রয়োজন তাতে বীররসের আধিক্য থাকবে, সে সঙ্গীত অবশ্যই বীরসঙ্গীত হবে। কিন্তু নির্জীব দেশবাসীকে জাগাবার দায়িত্ব নিয়ে কবির মনে হতাশাই জেগে উঠেছে,—

ভস্মরাশিময় আজি এ ভারত,
কে শুনিবে বীর-সঙ্গীত আমার,

কি আছে ভারতে, গাইবে যে কবি,
ঢালিয়া অমৃত ভস্মের ভিতর ? [ঐ]

কোনো প্রস্তুতির আভাস না পেয়েই কবির মনে বিষাদ ভাবটি মুখ্য হয়ে উঠেছে কারণ দেশচেতনার স্ফুলিঙ্গটি নানা অন্তরে জ্বালিয়ে দেবার একান্ত ইচ্ছাই যেখানে মুখ্য—অসাফল্যের আঘাত সেখানে অসহনীয় হয়ে দেখা দেয়। স্বাধীন চেতনা সৃজনের উপযুক্ত সঙ্গীত রচনা করাই যে নবীনচন্দ্রের একান্ত অভিলাষ তাও কবি ব্যক্ত করেছেন,—

শুনিয়া সঙ্গীত নাচিবে নির্জীব
মহীরুহচয় ভুজ আস্ফালিয়া
জাগিবে পাষাণ ; গর্জিবে জীমূত ;
বনে দাবানল উঠিবে জলিয়া। [ঐ]

আসন্ন বিপ্লবের প্রতিধ্বনি যে কবির অন্তরে স্পন্দন সৃষ্টি করেছে তার স্পষ্ট ইঙ্গিত এখানে ধরা পড়েছে। স্বাধীনতার গান যদি নির্জীবকে প্রাণময় করে তুলতে না পারে তবে সব আয়োজনই যে ব্যর্থ হতে বাধ্য। আগামী দিনের ভাবী বিপ্লবকে যারা ত্বরান্বিত করতে পেরেছিলেন স্বদেশপ্রেমী কবি নবীনচন্দ্র তাঁদের অন্যতম।

'বক্তৃতা ও বিদায়' কবিতায় দেশপ্রাণ কবি উচ্ছ্বসিত হয়ে আত্মপ্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেন—দেশ ভাবনায় একাগ্রচিত্ত কবির বিচারে এ সত্য সদা প্রকাশ্য। আত্মমগ্ন—ভগ্ন মন কবি বালুকাবেলায় দেখা পেলেন দেশজননীর। সুকঠিন আত্ম-দানের শক্তি পরীক্ষায় কবি অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে চান—কারণ শক্তি ও সাহসই তাঁকে নির্ভীক করেছে—

জন্মভূমি, কেন মাতা দেখা দিলে ফিরে ?
হৃদয়ের রক্তে অঙ্গ আসিনু মাখিয়া,
বালার্ক রক্তিম করে তাহা অভিষিয়া
আসিলে কি দেখাইতে ? পরীক্ষিতে আর
এখনো বহিছে কি না শোনিতের ধার—
হৃদয় হইতে বেগে ?

দেশোদ্ধারের স্বপ্নটি সার্থক করতে হলে শক্তি পরীক্ষার অবতীর্ণ হতে হবে, শক্তিমানই স্বাধীনতার সাধ পূর্ণমাত্রায় লাভ করতে পারে—এ বিশ্বাসটি নবীন কবির চিত্তে দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল। নিছক বাক্যবল যে আমাদের ঈপ্সিত স্বাধীনতা এনে দেবে না, বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ লগ্নেরও কিছু আগে সে যুগের মানুষ এ সত্য মনেপ্রাণে

বুঝেছিল। নবীনচন্দ্রের স্বদেশাত্মক কবিতার একটি বিশেষ অংশে এ চিন্তা প্রাধান্ত লাভ করেছিল। 'চিহ্নিত সুহৃদ' নামক কবিতাটিতেও স্পষ্টভাবে বাহুবলের শিক্ষালাভের আশু প্রয়োজনীয়তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন কবি। এ কবিতাতে কবি স্বকীয় মানসিকতার পরিচয় দিচ্ছেন,—কবির অন্তরে যে বিক্ষুব্ধ স্বদেশচিন্তা গর্জন করে উঠেছিল—সে পরিচয় প্রসঙ্গে তিনি ঘোষণা করেছেন,—

বহিছে, বহিবে,
যতদিন শেষবিন্দু হৃদয়ে রহিবে।
রক্ষিতে পরের প্রাণ আপনার প্রাণ
এখনো অর্পিতে পারি তৃণের সমান। [বন্ধুতা ও বিদায়]

অবশ্য কার্যক্ষেত্রে এ সত্য প্রমাণের প্রয়োজন হয় নি তবে কাব্য ক্ষেত্রে এমন ওজস্বিনী বক্তব্যের মূল্য অনস্বীকার্য। বিশ্বাসঘাতক, ভীরু, দেশবাসীদের স্বরূপ উদ্‌ঘাটনের চেষ্টাও রয়েছে,—

যারা গৌরাঙ্গের কৃপা-কটাক্ষের তরে,
বিশ্বাস, বন্ধুতা, সব বিনিময় করে,
বলিও তাদেরে মাতা, বলিও নিশ্চয়,—
উচ্চতর রক্তস্রোত ধমনীতে ধরি,
নীচত্বের মস্তকেতে পদাঘাত করি। [ঐ]

এ বক্তব্য আস্ফালনের মত শোনায় বটে—কিন্তু দৃঢ়তার—নির্ভীকতার বাণীও এতেই ধ্বনিত হচ্ছে। স্বার্থশূন্য দেশানুরাগের অভিমান কবিচিত্তে প্রবল বলেই নীচতাকে নগ্নভাবে আক্রমণের শক্তি তিনি অর্জন করেছিলেন। নবীনচন্দ্র জলন্ত দেশপ্রীতির শক্তি অনুভব করেছিলেদ মর্মে মর্মে, তাই অভীক বীরের মত অকুণ্ঠ বক্তব্য প্রকাশেও তিনি দ্বিধাহীন। দুঃখাভিসিক্ত মর্মদাহের চিত্রটিও তিনি অনায়াসে তুলে ধরেন,—

দাসত্বচক্রের হায় দৃঢ় নিষ্পেষণে,
উচ্চ আশা আমাদের হৃদয় হইতে
করিয়াছে তিরোধান,
ঘোর হিম স্বার্থ জ্ঞান
সৃজিয়াছে সেই স্থলে, স্বজাতি, স্বদেশ,—
আমাদের উপকথা, প্রলাপ বিশেষ। [ঐ]

স্বাধীনতা হারানোর শোক বোধকরি তত মর্মান্তিক নয় যতটা তীব্র চারিত্রিক শৌর্যবীর্য-পরাক্রম বিনষ্ট হওয়ার দুঃখ। কারণ স্বাধীনতা একটি মানসিক আনন্দজনিত

অনুভূতিমাত্র,—তার জন্য যে অভাববোধ,—তার জন্ম মানুষের অন্তঃকরণে, তার অভিব্যক্তিটুকুও মানসিক। সুতরাং স্বাধীনতাবিহীন একটি জাতিকে যতদিন নির্লিপ্ত উদাসীনতার সঙ্গে আপোষ করতে দেখি—তার জন্য দুঃখবোধ না করে পারিনে,—কিন্তু আত্মশক্তিতে ভর দিয়ে যে জাতি দাঁড়িয়েছে তার দিকে সতৃষ্ণ নয়নে তাকিয়ে থাকি। স্বাধীনতা হারানোর দুঃখ নিয়ে শোকগাথা রচনার যুগ পেরিয়ে নবীনচন্দ্রের কবিতায় আমরা ভবিষ্যতের কর্মপন্থা নির্ধারণের চেষ্টা দেখেছিলাম,—এ সত্যটিই কবিতাটিতে ইতস্তত ছড়িয়ে আছে। ভবিষ্যতের সশস্ত্র উত্থানের আভাষ এমনি করেই অস্পষ্টালোকে এ সব কবিতায় ধরা পড়েছিলো, বঙ্কিমচন্দ্রের রোম্যান্সধর্মী, অর্ধ ইতিহাসানুগ উপন্যাসে বার বার এই প্রত্যাশাটিই ঘুরেফিরে দেখা যাচ্ছে। কিন্তু সত্যকারের ভবিষ্যতে কিভাবে এ সংগ্রাম সত্যায়িত হলো এ তথ্য না জেনেও নবীনচন্দ্র বুঝেছিলেন আত্মদানের শপথ নেবার সময় আসন্নপ্রায়।

"অবকাশ রঞ্জিনীর" খণ্ড কবিতায় ইতস্তত যা আকীর্ণ, স্বদেশাত্মক একটি কাব্যের মধ্যে তা আরও সুস্পষ্ট বক্তব্যে পরিণত হয়েছিল,—সে কাব্যটির নাম "রঙ্গমতী কাব্য"। 'রঙ্গমতী কাব্য' রচনার বহুপূর্বেই স্বদেশপ্রেমিকরূপে নবীনচন্দ্র জনসাধারণ্যে সুপরিচিত-সম্বর্ধিত। কাব্যরচনার প্রথম পর্বে জনসমাদর ও আশাতীত সমর্থন কবিমাত্রকেই বিচলিত করে,—নবীনচন্দ্রও বিচলিত হয়েছিলেন; 'পলাশীর যুদ্ধ' কবিকে যে প্রতিষ্ঠা এনে দিয়েছিলো, নবীনচন্দ্রের জবানিতেই তা বোঝা যায়—

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আমি চট্টগ্রাম কমিশনরের পার্শন্যাল এসিস্টেণ্ট হইবার অব্যবহিত পরেই, স্মরণ হয়, আমার "পলাশীর যুদ্ধ" প্রকাশিত হয়। তাহাতে দেশব্যাপী যেরূপ আন্দোলন উঠে, এবং যেরূপ আগ্রহের সহিত প্রকাশ হইবামাত্র উহা 'ন্যাশন্যাল' রঙ্গ-ভূমিতে অভিনীত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা কেবল আমার আশাতীত নহে, স্বপ্নাতীত। তাহাতে উৎসাহিত হইয়া কিছুদিন পরে "রঙ্গমতী" লিখিতে আরম্ভ করি।

[আমার জীবন—রঙ্গমতী কাব্য]

স্পষ্টতই বোঝা যায় স্বদেশ ভাবনার অভাবনীয় সিদ্ধিই নবীনচন্দ্রকে 'রঙ্গমতী' লেখার প্রেরণা এনে দিয়েছিল। দেশপ্রেমিকতা অন্য কাব্যে বা কবিতায় পরিবেশিত হয়েছে যে কারণে রঙ্গমতীর মধ্যে তা সযত্নারোপিত অর্থাৎ পরিকল্পনা করে, ছক বেঁধে কবি স্বদেশপ্রেমের আদর্শটি এ কাব্যে তুলে ধরবেন—এমন চিন্তা তিনি মুহূর্তের জন্যও ভোলেননি। 'পলাশীর যুদ্ধ' রচনাকালে দ্বিধা-সংশয় ও আদর্শের মধ্যে দোলায়িত কবিচিত্তের সূক্ষ্ম স্তরগুলি আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কিন্তু 'রঙ্গমতী' নবীনচন্দ্রের নিশ্চিন্ত মানসিকতার যোগফলমাত্র। দেশপ্রেমের ভবিষ্যৎ রূপ কবি যেভাবে চিন্তা করেছিলেন—'রঙ্গমতী' নামক কাব্যটিতে তা সূত্রসিদ্ধরূপে প্রমাণ

করার চেষ্টা করেছেন। রঙ্গমতীর কোমল অংকেই কবির শৈশব ও কৈশোর অতিবাহিত, সৌন্দর্য্যের অমরাপুরী—শৈলশিখরিনী এ ভূমিতেই কবি কল্পিত ঘটনাটি ঘটেছে। নায়ক বীরেন্দ্র অদৃষ্টতাড়িত হয়েও শেষপর্যন্ত রঙ্গমতীর কোমল অংকেই শেষ বিশ্রাম লাভ করেছে। রঙ্গমতীর নদীতীর, কানন, গিরি, বন, দেবমন্দিরই ঘটনাস্থলরূপে পরিকল্পিত। বস্তুতঃ রঙ্গমতীর প্রতি মুগ্ধভক্তের দৃষ্টি নিয়েই কবি দৃকপাত করেছিলেন—ঘটনা ও কাহিনী এসেছে স্বদেশচিন্তার আবিষ্টতা থেকে। সুতরাং এ কাব্যে স্বদেশপ্রেম ও জন্মভূমিপ্রেম একাকার হয়ে গেছে। ঘটনাটির উদ্ভাবনায় স্বদেশপ্রেমের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান, অন্যদিকে নীলিম সমুদ্র ও আকাশের কোলে প্রকৃতিকন্যা রঙ্গমতীর অবারিত সৌন্দর্যস্বপ্ন কবিকে আবিষ্ট করে রেখেছে। দেশভাবনা ও কবিভাবনার ছন্দায়িত রূপই রঙ্গমতী কাব্যের জন্ম-দিয়েছে। কোন কোন সমালোচক অবশ্য একটি দিক সম্পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য করে কবির স্বদেশভাবনার অপরূপ নিদর্শন হিসেবে এ কাব্যের বিচার করেছেন। শ্রীশশাঙ্কমোহন সেন লিখেছেন,—

"রঙ্গমতীতে এই অধঃপতিত জাতির নিপীড়িত কবিহৃদয় স্বাধীনতা লোকপাবনী মূর্তির দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া কাঁদিতেছে, স্বদেশের, স্বজাতির বর্তমান দুরবস্থা পরিদর্শন করিয়া আকুলতায় অশ্রু বিসর্জন করিয়াছে।"[৪২]

স্বদেশচিন্তার কাব্যশরীর গঠন করতে গিয়ে কবি একটি মৌলিক কাহিনী নিবেদন করেছেন কাব্যে। স্বপ্নবৃত্তান্ত হিসেবেই মূল কাহিনীর পরিচয় দেওয়া হয়েছে—শেষের পংক্তিটি না থাকলে সে কথা বোঝাই দুষ্কর হত পাঠকের পক্ষে। আর যেহেতু স্বপ্ন জৈবজীবনের অপ্রকাশ্য চিন্তারই ফলাফলমাত্র সুতরাং কাহিনী রচনায় যে অসঙ্গতি ও অসম্ভাব্যতা রয়েছে তার সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যায় না। নায়ক বীরেন্দ্রের ব্যক্তিগত চিন্তাধারার ধারাবাহিক আলোচনা থেকেই কবির স্বদেশচিন্তার স্বরূপটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে বলেই এ চরিত্রটির সমালোচনাই কাব্যের একমাত্র আলোচ্য বস্তু। স্বদেশপ্রেমিক বীরেন্দ্র চরিত্রের মধ্যেই স্রষ্টা নবীনচন্দ্রের কল্পিত আদর্শ নায়কের সংজ্ঞা প্রতিফলিত। নবীনচন্দ্র নিজেও জন্ম-ভূমির মুগ্ধপ্রেমিক, বীরেন্দ্র চরিত্র রচনার মধ্যে তাঁর ব্যক্তি জীবনের এই মুগ্ধতা সঞ্চারিত হয়েছে। নানা নাটকীয় ঘটনার সংঘাতে রঙ্গমতীর আদর্শ পুরুষ বীরেন্দ্র সমগ্র হিন্দু জাতি, আর্যসংস্কৃতির প্রতিই অনুরক্ত হয়ে পড়ে,—স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার মহৎচিন্তাই তার ধ্যানের বস্তুরূপে দেখা দেয়। 'রঙ্গমতী কাব্যের' সর্গ বিভাগে কবি যে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন তা অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময়। নদীতীরে, কাননে,

৪২. শশাঙ্কমোহন সেন, বঙ্গবাসী, 'রঙ্গমতী' সম্বন্ধে আলোচনা।

চন্দ্রশেখরে, রঙ্গমতীবনে, রঙ্গমতী দেবমন্দিরে, গিরিশিখরে এ কাব্যের ৬টি সর্গের ঘটনাস্থল। রঙ্গমতীর প্রকৃতি বর্ণনার পূর্ণ সুযোগ কবি পেয়েছেন—কাহিনী আবর্তিত হয়েছে এই প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর মধ্যেই।

রঙ্গমতীর গৌরব রবিরূপেই কবি বীরেন্দ্র চরিত্রটি কল্পনা করেছেন। ভাগ্যতাড়িত বীরেন্দ্র বাল্যে মাতা পরিত্যক্ত, কৈশোরে জন্মভূমি পরিত্যক্ত। দ্বিতীয় সর্গে আত্ম-পরিচয় প্রসঙ্গে বীরেন্দ্র আক্ষেপ করেছে,—

ছিল না জননী মম, ছিল জন্মভূমি,
ছাড়িলাম তাও এই দ্বাবিংশ বয়সে
হায় হতভাগ্য আমি।
… … আছে কি মানব হেন
এই ভূমণ্ডলে, দেবি, হায় রে যাহার,
তেয়াগিতে জন্মভূমি, না কাঁদে পরাণ? [দ্বিতীয় সর্গ]

এই জন্মভূমিপ্রীতিই বীরেন্দ্র চরিত্রে মুখ্য হয়ে দেখা দিয়েছে। রঙ্গমতীপ্রেমিক বীরেন্দ্র মাতার সন্ধানে বারাণসী ধামে এসেছে, মণিকর্ণিকার ঘাটে নিরুদ্দেশ মাতার স্মৃতিতর্পণ শেষে যে অনুভূতি তার সমস্ত অন্তরকে ঢেকে ফেলেছে—সেটি কিন্তু আরও ভাবদ্যোতক। সমগ্র আর্যভূমির পদানত রূপ বীরেন্দ্রের সামনে ফুটে ওঠে। নিতান্ত ব্যক্তিগত শোক দুঃখ তখন অন্তর্হিত,—ব্যর্থকাম বীরেন্দ্র দেশজননীর চিন্তায় মগ্ন,—

হায় মাতঃ আর্যভূমি! বিদরে হৃদয়,
হারায়েছ তুমি আর্য—স্বাধীনতা ধন,
আর্যের বিক্রম, আর্য-গৌরব-জীবন,
হস্তিনা অযোধ্যা তব হয়েছে স্বপন।
… … …
আর্য-ধর্ম-জ্যোতি প্রায় আচ্ছন্ন তিমিরে।
কেবল রয়েছে মাতঃ হৃদয়ে তোমার
হায়! এই অনির্বাণ আর্য—চিতানল। [দ্বিতীয়সর্গ]

দেশপ্রেম বীরেন্দ্রহৃদয়ের কত গভীরে স্থান লাভ করেছে উদ্ধৃত উক্তিই তার যথেষ্ট প্রমাণ। মাতৃপরিত্যক্ত, জন্মভূমির স্নেহবঞ্চিত বীরেন্দ্র চরিত্রে বৃহত্তর দেশভাবনা এসেছে জীবনবৈরাগ্য থেকে। ব্যক্তিগত চিন্তার হাত থেকে মুক্তি পেয়েই বৃহৎ আত্মত্যাগের পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে পেরেছে সে। বীরত্বপূর্ণ উক্তিই তার প্রমাণ—

……এই মাত্র জানিতাম,
ভারত বীরত্ব বিনা হবে না উদ্ধার।

কিন্তু সে অনন্ত সিন্ধু, বারিবিন্দু আমি,
কোথায় পাইব সেই সিন্ধু পরাক্রম ?
তথাপি মিশিতে সেই সাগর—সলিলে,
মরিতে বীরের মত, করিলাম পণ। [দ্বিতীয় সর্গ]

সুতরাং আত্মত্যাগের পণ নিয়েই দেশজননীর শৃঙ্খলমোচনের আহ্বানে সাড়া দিল বীরেন্দ্র। আপাততঃ মোঘল সৈন্যদলেই স্থান করে নিল সে। দেশপ্রেমিক নবীনচন্দ্র যে কাব্যের নায়কচরিত্রে আত্মত্যাগে নির্ভীক একটি অকুতোভয় দেশপ্রেমিকেই বরণ করে নেবেন—এতে বিন্দুমাত্র সংশয় নেই। "পলাশীর যুদ্ধের" মত ইতিহাস ভিত্তিক কাব্যে দেশপ্রেমের অবতারণা করে নবীনচন্দ্র যে অভাবনীয় সিদ্ধি লাভ করেছিলেন—সেই উৎসাহের আবেগ থেকেই 'রঙ্গমতীর' জন্ম। সুতরাং কবির দেশানুরাগ উচ্ছ্বসিত অন্তর থেকেই 'রঙ্গমতী কাব্যের' দেশপ্রেমী নায়ক বীরেন্দ্রের জন্ম। "পলাশীর যুদ্ধে" ঘটনা ও চরিত্র রচনার স্বাধীনতা ছিল না—'রঙ্গমতী কাব্যে' কবি সে সুযোগটিরও সদ্ব্যবহার করেছেন। বীরেন্দ্র দেশচিন্তায় এতই মগ্ন যে দেশোদ্ধারের আপাতঃ কোন উপায় না দেখে দিল্লীশ্বরের সৈন্যদলেই যোগ দিয়েছিল সে,—কিন্তু ঘটনাচক্র আবর্তিত হল। দিল্লীশ্বরের সৈন্যরূপে দাক্ষিণাত্য বিজয়ে অংশগ্রহণ কালেই শিবাজীর হাতে ধৃত হল বীরেন্দ্র। ঘটনার এই আকস্মিকতায় অবাক হবার চেয়ে নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেম চিন্তার অভিনবত্বে মুগ্ধ হতে হয়। নবীনচন্দ্র ইতিহাসের বিস্ময়, দেশপ্রেমের মূর্তপ্রতীক শিবাজী চরিত্রটি রচনার এক অভাবনীয় সুযোগ লাভ করলেন। নিঃসন্দেহে দেশপ্রেমী কবির কল্পনায় শিবাজী চরিত্র এক নতুন মহিমায় উদভাসিত হয়ে উঠবে। হয়েছেও তাই। বীরেন্দ্র শিবাজীর কাছে দেশপ্রেমের দীক্ষা নিয়েছে—পরিবর্তে নবীনচন্দ্র শিবাজীর মুখে একটি দীর্ঘ দেশাত্মবোধের বক্তৃতা আরোপ করেছেন। 'রঙ্গমতী কাব্যের' শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমমূলক অংশ হিসেবেই শিবাজীর বক্তৃতাটি গণ্য হবে। ভারতের পরাধীনতা আর্য জাতির কলঙ্ক। শিবাজীর অগ্নিগর্ভ বাণীতে ক্ষোভ-দুঃখ-বিদ্বেষ একই সঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে,—

আর্যের সন্তান মোরা হায়। আমাদের
অদৃষ্টে দাসত্বলিপি লিখিলা বিধাতা।
... ...
বীরেন্দ্র। বীরেন্দ্র। করে এই করবাল
থাকিতে কেমনে, হায়। থাকিতে কেমনে
বিন্দুমাত্র আর্যরক্ত শিবজী শরীরে,—
সহিব এ অপমান ? চল যাই সবে

ওই নীলাচল শিলা বাঁধিয়া গলায়,
ঝাঁপ দিয়া সিন্ধুজলে, হায়রে ! ডুবাই
এই আর্য নাম, এই তীব্র পরিতাপ
অন্যথা কৃপাণ-করে চল যাই রণে,
স্বজাতির, স্বদেশের, স্বধর্মের তরে,
নিবাই কৃপাণ তৃষা, যবন শোনিতে । [ঐ]

বীরশ্রেষ্ঠ শিবাজীর স্বাধীনচেতনা আমাদের ইতিহাসের গর্বের বস্তু। স্বাধীন চেতনার জাগরণ মুহূর্তে নবীনচন্দ্র ঐতিহাসিক এই পূজনীয় চরিত্রটিকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছিলেন বলেই আমাদের শ্রদ্ধা পাবেন। ঐতিহাসিক কাব্য নয় বলেই শিবাজী চরিত্রটির আরোপ এখানে খানিকটা অসঙ্গতিময় হয়েছে সন্দেহ নেই কিন্তু তাতে শিবাজী চরিত্রের মর্যাদাহানি হয় না। নবীনচন্দ্র স্বাধীনচেতা শিবাজীর বজ্রনির্ঘোষ ও সদর্প আত্মঘোষণার প্রসঙ্গ অবতারণা করে ঐতিহাসিক সত্যকেই প্রোজ্জ্বল করেছেন। বীরেন্দ্রকে দেশপ্রেমে দীক্ষিত করার পরিকল্পনাটিকে একটু ইতিহাসঘেঁষা করে নবীনচন্দ্র শুধু একটি মহৎ আদর্শকেই রূপায়িত করেননি,—সেই আদর্শের সার্থক প্রতিফলন দেখানোর চেষ্টা করেছেন। শিবাজীর মহৎ আদর্শ একদিন সমগ্র দাক্ষিণাত্যবাসীকেই সংগ্রামশক্তি দান করেছিল,—নবীনচন্দ্র এই আদর্শ সমগ্র ভারতে সঞ্চারিত করেছেন এ কাব্যের মাধ্যমে। শিবাজীর বিদ্রোহ শুধু একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল,—নবীন কবির কল্পনায় সুদূর পূর্বদেশের অজ্ঞাত অঞ্চলগুলিতেও এই আদর্শ কিভাবে বিস্তারিত হয়েছিল তারই বর্ণনা আছে। বীরেন্দ্র দেশপ্রেমাদর্শকেই জীবনে বরণ করেছে,—শিবাজীর উদ্দীপ্ত বাণী তাকে প্রেরণা দিয়েছে। শিবাজীর উল্লেখযোগ্য উক্তি,—

'বীরেন্দ্র ! জান কি তুমি সোনার ভারত-
বর্ষ আছিল কাহার ? সেই রাজ্য হায় !
কোন ধর্মনীতি বলে পেয়েছে যবন ?
ঘোরি, গিজ্‌নি, ছিল কি হে ধর্মের যাজক ?
দস্যুত্ব, দস্যুত্ব-বলে ভারতে যবন
করিয়াছে আধিপত্য। দস্যুত্বে সে রাজ্য
আজি করিছে শাসন দোর্দণ্ড প্রতাপে।
কি পাপ, দস্যুত্বে তবে করিতে হরণ ?
বীরেন্দ্র, দাসত্ব হতে দস্যুত্ব উত্তম !
যেই মহামন্ত্রে আমি হয়েছি দীক্ষিত,

'ভারতের স্বাধীনতা-মহারাষ্ট্র জয় !
সাধিব এ মন্ত্র আমি। [ঐ]

এই বীরত্বব্যঞ্জক অংশগুলি 'রঙ্গমতী কাব্যের' সম্পদ। ঘটনাংশ, ভাষা ও ছন্দ বিশেষত্বহীন, চরিত্র রচনায় ব্যর্থ এ কাব্যে দেশাত্মবোধক এই পংক্তিগুলি নবীনচন্দ্রের দেশপ্রেমিকতার আন্তরিক দান। পূর্ববর্তী কাব্যে যে দেশচেতনাকে বিভিন্ন ভাব ও ভাষায় কবি রূপদান করেছিলেন এ কাব্যে তারই ঘনীভূত রূপ বর্তমান। কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট না হলেও শিবাজীচরিত্র রচনায় তিনি যুগোচিত সামর্থ্যের পরিচয় দিয়েছেন। শিবাজীর সাগ্নিক দেশ উপাসনার নিদর্শন হিসেবেই কবি এ অংশটি রচনা করেছিলেন —এর পরিকল্পনা ও রূপদানের মূলে যে আশাতীত অভিনবত্ব রয়েছে তাতে সন্দেহ নেই।

'রঙ্গমতী কাব্যের' যথার্থ দেশাত্মবোধক অংশটির সঙ্গে মূল ঘটনা ও চরিত্রের যোগ কম,—এটাই সম্ভবতঃ এ কাব্যের রচনার দুর্বল দিক। নায়ক বীরেন্দ্রের দেশপ্রেমের বিকাশপর্বটি শিবাজী প্রভাবিত বলেই উজ্জ্বলতর,—অন্যত্র বীরেন্দ্র শিষ্যোচিত শৌর্য-শক্তি ও সাহসের পরিচয় দেবার চেষ্টা করেও কবির রচনাদোষেই নিষ্প্রভ-অবাস্তব। ঘটনা পরিবেশনের মূলে বাস্তবতা, স্বাভাবিকত্ব ও সৌন্দর্য সৃজনের যে সুষ্ঠু প্রয়াসটি থাকা দরকার কোথাও আন্তরিকতার সঙ্গে তা পালিত হয়নি। সুতরাং শিবাজীর সাক্ষাৎ শিষ্য বীরেন্দ্র সর্বত্র দেশপ্রেমিকোচিত শক্তিতে ভাস্বর হয়নি—কষ্ট কল্পনার চাপে বীরেন্দ্রের আদর্শই ম্লান হয়ে গেছে।

বীরেন্দ্র দেশপ্রেমের দীক্ষালাভান্তে রঙ্গমতীতে ফিরে এসেছে,—নাটকীয় ঘটনাস্রোতে দেশপ্রেমের স্ফুরণ ঘটেছে সঙ্গে সঙ্গেই। দস্যু বেঞ্জামিনকে বীরেন্দ্রের প্রত্যক্ষ শত্রু হিসেবে আবিষ্কার করেছেন কবি। উভয়ের আস্ফালনে বীরত্বের, দম্ভের যথোচিত প্রকাশ দেখি যার সঙ্গে দেশপ্রেমের যোগ নিতান্তই কম। দেশচেতনা নিছক বীরত্ব প্রকাশ মাত্র নয়। কিন্তু দ্বৈত সংগ্রামে বেঞ্জামিনকে পরাভূত করেছে স্বদেশপ্রেমী বীরেন্দ্র। শিবাজীর আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বীরেন্দ্র স্বচক্ষে দেখে এসেছে - সেই উজ্জ্বল দেশচিন্তা তার অন্তরেও দীপ্যমান,—

ভাবিতেছে মনে,
কতদিনে শিবাজীর সমর-প্রবাহ
উত্তরিবে সিংহনাদে বিন্ধ্যাচল হতে
সমতল বঙ্গভূমে, ওই প্রপাতের
মত, কতদিনে মহারাষ্ট্রীয় কেতন
উড়িবে গরবে বঙ্গে—স্বাধীন সোহাগে,

আবার হাসিবে বঙ্গ, বিধর্মি শোণিতে—
নিবাইবে মনস্তাপ। [চতুর্থ সর্গ, রঙ্গমতী]

বীরেন্দ্র আত্মচিন্তার মাঝখানেও দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখে, শিবাজীর আদর্শই তার আলোক সমুদ্র। তাই আর্যঅরি বিতাড়নই আপাততঃ বীরেন্দ্রের একমাত্র চিন্তা। ঘটনাচক্রে যবনপক্ষে যোগ দিয়ে মগদস্যুর অত্যাচারের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার চিন্তাটিই প্রবল হয়ে উঠেছে। পিতৃব্য মর্কট রায়ের আবেদন মগদস্যু বিতাড়ন করে চট্টগ্রামের শান্তি বজায় রাখা। কিন্তু বীরেন্দ্রের স্বপ্ন ও আদর্শটি সে উচ্চারণ করেছে,—

যবন সাপক্ষে কিন্তু ধরিতে কৃপাণ
নাহি সাধ, রণগুরু শিবাজীর কাছে,
ভারত উদ্ধার ব্রতে আর্য-অরিগণে
কেবল নাশিতে পিতঃ করিয়াছি পণ। [চতুর্থ সর্গ]

স্বাধীন ভারতের কল্পনাই একদিন সুপ্ত সিংহ শিবাজীকে প্রেরণা দিয়েছে যবন-নাশের। ভারতের চিরন্তন শত্রু এই যবন। বীরেন্দ্র গুরুর শিক্ষাকে কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখল প্রচণ্ড বাধা। শত্রু শুধু যবন নয়, বিদেশী দস্যুর লুণ্ঠনে সোনার চট্টল অসহায়। ভারত উদ্ধার ব্রত অনেক মহৎ হতে পারে কিন্তু জন্মভূমি চট্টলকে সমূহ বিপদ থেকে মুক্তি দেওয়ার ব্রত আরও পবিত্র। দেশোদ্ধার ব্রত নিয়েও সংঘাতের মুখোমুখি হয়েছে বীরেন্দ্র। যে শত্রুকে বিনাশ করার জন্য শিবাজীর নির্দেশ মস্তকে ধারণ করেছে—জন্মভূমির প্রয়োজনে তাকে বন্ধু বলেই গ্রহণ করতে হবে। যবন বিনাশের নয়—যবন স্বার্থেই জন্মভূমির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার দিন এসেছে।

নবীনচন্দ্র বীরেন্দ্রের সামনে যে আদর্শ তুলে ধরেছেন তা ভারত উদ্ধার ব্রতের চেয়েও বড়ো। পিতৃব্যের আদেশের মধ্যেও কিছু সত্যতা আছে।

ভারত উদ্ধার! ক্ষিপ্ত তুমি, ভারত উদ্ধার
নহে বালকের ক্রীড়া! আজিও যবন
বিন্ধ্য হতে হিমাচল শাসিছে বিক্রমে,
সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র বহে পদচিহ্ন ধরি।
এ শক্তি টলিবে কি হে তর্জনী হেলনে?
... ... জন্মভূমি ঘোর নির্যাতন
সহিবে কেমনে? বল, সহিবে কেমনে
অসহায় অঙ্গনার সতীত্ব হরণ? [ষষ্ঠ সর্গ]

বীরেন্দ্র আদর্শচ্যুত হয়েছে বটে কিন্তু ধর্মচ্যুত হয়নি। দেশপ্রেমের মহান আদর্শেই জন্মভূমির সম্ভ্রম রক্ষার দায়িত্ব মাথায় তুলে নিয়েছে সে। নবীনচন্দ্র শিবাজীর যবন

বিনাশের সংগ্রামকে দেশপ্রেমের উত্তম আদর্শ বলেই প্রচার করেছেন। কিন্তু বৃহত্তর ভারতের বৃহৎ ও বিচিত্র সমস্যা থেকে মুক্ত হবার আপাতঃ প্রয়াসটিও কম প্রশংসনীয় নয়। বীরেন্দ্র মাতৃভূমির আপাতঃ সমস্যাটি সমাধানের উদ্দেশ্যেই আরাকানী ও মগ-দস্যুদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছিল। মোঘল পক্ষ অবলম্বন না করলে হয়ত প্রত্যন্ত দেশের এই বিদেশী শক্তির অধীনতাকেই বরণ করে নিতে হবে। নবীনচন্দ্র দীর্ঘ বর্ণনায় বীরেন্দ্রের সমর কৌশল ও স্বাধীনচেতনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। আদর্শচ্যুত বীরেন্দ্র মোঘলশক্তিকে বিজয়ীর সম্মান অর্পণ করেছে বটে কিন্তু মোঘলপ্রসাদ ভোজী হতে পারেনি। বঙ্গেশ্বরের প্রদত্ত সম্মান অবহেলাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে বীরেন্দ্র,—

"যবনের দান"

বলিলা সগর্বে যুবা—বাঁধিয়া গলায়
বরং উপলখণ্ড, কালিন্দীর নীরে
দিব ঝাঁপ। শুনিয়াছ নিজকর্ণে তুমি,
করিয়াছি কি প্রতিজ্ঞা শিবাজীর কাছে
নাহি বহুদিন আর, জলেছে আবার
দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর সমর অনল।
পুড়িছে পতঙ্গ মত বিধর্মী যবন।
ভারত-দাসত্ব-পাশ ভস্মশেষ প্রায়
সে তীব্র অনল তাপে,—বিধি অনুকূল।
নাহি বহুদিন আর, সেই বহ্নি শিখা
বঙ্গের পশ্চিম প্রান্তে দেখা দিবে যবে,
ভস্মিয়া মোঘল রাজ্য, জ্বালি ভীমানল
পূরব অচলশিরে, দিব আবাহন
সেই বীর বৈশ্বানরে। [ষষ্ঠ সর্গ]

শিবাজী প্রদর্শিত স্বাধীনতার আদর্শেই বীরেন্দ্র দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছে,—যবন শক্তির অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণে—আসমুদ্র হিমাচল এক অখণ্ড স্বাধীন হিন্দুরাজত্ব স্থাপনই বীরেন্দ্রের উদ্দেশ্য। শিবাজীর যবন বিরোধিতার মূলে এ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নটি ঊনবিংশ শতাব্দীর কবি নবীনচন্দ্র 'রঙ্গমতীতে' ব্যাখ্যা করেছেন এবং প্রমাণ করেছিলেন যে পূর্বদেশের কোন এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের জমিদার পুত্র বীরেন্দ্র এই আদর্শের স্বপ্ন দেখেছিলেন। এ কল্পনায় বিশালত্ব আছে, কিন্তু নিছক কাব্যের বিষয় বলেই নবীনচন্দ্র এ কাহিনী উত্থাপন করেছেন। ঐতিহাসিক চরিত্র কোন কাল্পনিক চরিত্রকে কি ভাবে প্রভাবিত করেন তারও দৃষ্টান্ত

'এ কাব্যটি। স্বদেশপ্রেমী নবীনচন্দ্র এই কল্পনানির্ভর কাব্যটিতেও আন্তরিক খেদে বলেছেন,—

ভারত সন্তান
এত দীর্ঘ শিক্ষা পরে শিখিল না আজি,
জাতিত্বের মহামন্ত্র, সর্বশক্তি মূল
একতা। [ষষ্ঠ সর্গ]

উনবিংশ শতাব্দীতে নবজাগরণের বাণী যখন ভারতের আত্মায় সঞ্চারিত হয়েছে তখনও অনৈক্যের প্রত্যক্ষ বাধা সমস্ত স্বপ্নের অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেশপ্রেমের সুমহান আদর্শের চিত্র উদ্‌ঘাটন করেই নবীনচন্দ্র যেন আগামী দিনের স্বপ্নসত্যকেই আবৃত্তি করেন।

"নাহি অন্য শত্রু দ্বারে, জাতীয় উত্থান
এ নববিপ্লব স্রোত, রাখিতে ঠেলিয়া।
আসে যদি ঐরাবত, নিবে ভাসাইয়া
জননী জাহ্নবী মত ;" [ষষ্ঠ সর্গ]

জাগরণের কাহিনী কবি নবজাগরণের যুগেই শোনাবার চেষ্টা করেছেন,—অতীত ইতিহাসের সুমহান প্রচেষ্টাকে বর্তমানের পটভূমিকায় স্থাপন করে নবীনচন্দ্র যুগোপযোগী বাণীকেই প্রচার করেছেন। সেদিক থেকে নিছক কল্পনানির্ভর হলেও এ কাব্যের মধ্যে যুগসত্যের প্রতিফলন রয়েছে। স্বদেশপ্রেমের বাণীই একদা এ দেশের একমাত্র উপলব্ধির বস্তু হয়ে উঠেছিল,—দেশপ্রেমিকতাই কবির কাব্যসৃষ্টির একমাত্র উপাদান রূপে গণ্য হোতো—'রঙ্গমতী কাব্যের' কবি নবীনচন্দ্র এ কাব্যটিতে যেন সেই সত্যটিই নতুন করে দেখালেন।

কাব্য হিসেবে এর মূল্য বিচার নিরর্থক,—অসংখ্য ক্রটির বাধা সরিয়ে এ কাব্যের নিহিত ব্যঞ্জনা হয়ত কাব্যামোদীর কানে পৌঁছবে না কিন্তু দেশপ্রেমের প্রত্যক্ষ আবেদন যে-কোন অসাবধানী পাঠককেও সচকিত করবে। এ ছাড়াও 'রঙ্গমতী' নবীনচন্দ্রের প্রথম মৌলিক কাব্য বলে এ কাব্যের মূল বাণী তাঁর আত্মোপলব্ধির বাণী। স্বদেশপ্রেমী কবি হিসেবেই নবীনচন্দ্রের প্রসিদ্ধি,—এই স্বদেশ উপলব্ধি তাঁর মৌল চিন্তাকেও গ্রাস করেছিল—এ কাব্য তারও প্রমাণ।

স্বদেশচিন্তার নাম গন্ধ বাংলা খণ্ড কবিতায় ছিল না বলেই 'অবকাশ রঞ্জিনীর' জন্ম, 'পলাশীর যুদ্ধে' ভারত ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত রচনায় নবীনচন্দ্রের অভাবনীয় সাফল্য এবং ঠিক তার পরেই 'রঙ্গমতী কাব্যে' মৌলিক কল্পনার সাহায্যে স্বদেশচেতনার উজ্জ্বল আদর্শ তুলে ধরার সাহিত্যিক প্রয়াস। স্বদেশাত্মক কাব্যধারার

সমাপ্তিও "রঙ্গমতী কাব্যে"। এই কাব্যেই ঐক্যবোধের অভাবে সমগ্র ভারতে অখণ্ড হিন্দু স্বাধীনতার স্বপ্ন রচনা কি ভাবে ব্যর্থ হয়ে গেছে তারই কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। এর পরের পর্বেই নবীনচন্দ্রের বিখ্যাত 'ত্রয়ীকাব্যের' উন্মেষ লগ্ন। আধ্যাত্মিকতা ও প্রাচীন কাব্যসত্যকে যুক্তির আলোকে প্রতিষ্ঠার উনবিংশ শতকীয় প্রচেষ্টা শুরু হল। জীবনবোধের যে স্তরে স্বাধীনচেতনা আছে—তার সার্বিক আবেদন সর্বজনস্বীকৃত—বিশেষতঃ জাতীয় চেতনার মত গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি যখন জোয়ারের আবেগে আমাদের মনে ঢেউ তুলেছে ঠিক সেই সময়ে। নবীনচন্দ্রের স্বদেশাত্মক কাব্যগুলির বক্তব্য তাই অস্পষ্ট নয়, অস্বচ্ছ নয়—কিন্তু বহুশ্রুতও নয় আবার। স্বদেশচিন্তার আলোতেই এ কাব্য পাঠ করা যেতে পারে। কিন্তু পরের পর্বেই অধ্যাত্মসাধনা মগ্ন নবীনচন্দ্র আরও মহত্তর বক্তব্য প্রচারে ব্যস্ত হলেন। স্বাধীন চেতনার প্রয়োজনেই দেশাত্মবোধক কাব্য রচনার আয়োজন—কিন্তু বিষয়বস্তুর পুনরুক্তি সাহিত্যে যে ক্লান্তিবোধ আনে—নবীনচন্দ্র বোধহয় সে ব্যাপারে সজাগ ছিলেন। নবীনচন্দ্রের শেষপর্বের রচনায় তাই ভিন্ন স্বর, ভিন্ন প্রসঙ্গ। রঙ্গলাল থেকে হেমচন্দ্র, হেমচন্দ্র থেকে নবীনচন্দ্রের কাব্যে দেশাত্মবোধের আরোপ যেন প্রায়শই গতানুগতিক, বৈচিত্র্যহীনও বটে। আর্যমহিমার স্মৃতির সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বাঙ্গালীর অন্তরের যোগ স্থাপনের অক্লান্ত চেষ্টা করেছেন উল্লিখিত কবিরা। কিন্তু যত উচ্চাঙ্গের ভাবাদর্শই হোক না কেন, প্রাণধারার সজীবতার সঙ্গে এই ভাবগঙ্গার অতিপবিত্র বারি যদি মেশাতে না পারি তবে সে চেষ্টা আন্তরিক হলেও ব্যর্থ চেষ্টারই নামান্তর। আর্যমহিমা, হিন্দুসংস্কার প্রসঙ্গ বারবার আলোচনা করে একটি বলিষ্ঠ ঐক্যবোধ ও জাতীয়তাচেতনা সঞ্চারে এঁরা সত্যিই সমর্থ হয়েছিলেন—কিন্তু স্বাধীনতা পাবার সত্যিকারের পথটি নির্ভুল ভাবে চিনিয়ে দেবার কৌশলটি কোথাও স্পষ্ট হয়নি। হয়ত তখনও সে পথ রাজপথ হয়ে ওঠেনি—মিছিলের কণ্ঠস্বর কবির ক্রন্দনকে ছাপিয়ে ওঠেনি,—আমাদের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার সংঘশক্তি তখন সৃষ্টি হয়নি। কিন্তু আর্যচেতনার সঙ্গে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্তের রাখীবন্ধন করে এ যুগের কবিরা যে কথা বলতে চেয়েছিলেন—অনেক অক্ষমতা সত্ত্বেও তার বাণী দুর্বোধ্য হয়ে যায়নি। 'পলাশীর যুদ্ধের' রানী ভবানী, মোহনলাল ব্যর্থ হয়নি,—'রঙ্গমতীর' শিবাজী-বীরেন্দ্র অসার্থক নয়। এঁরা সবাই আমাদের সুপ্তচেতনার দ্বারে করাঘাত করেছে—তার প্রত্যক্ষ ফলাফলও আমাদের অজানা নয়। কংগ্রেসের জন্মলাভ ও ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ভারত ব্যাপী দেশচেতনার যে বজ্রহুঙ্কার শোনা যায়—তা কি অভাবিত অচিন্তিত কিছু? নবীনচন্দ্রের কাব্যধারার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পর পরবর্তীযুগের স্বাধীনতা সংগ্রামের চেতনার উৎস যে কোথায় তা আর বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না।

পঞ্চম অধ্যায়

নাটক

উনবিংশ শতাব্দীর মূল্যবান আবিষ্কারের মধ্যে নাটকের কথা সর্বাগ্রে মনে পড়ে। সংস্কৃত-উত্তরাধিকার হারিয়ে দিকচিহ্নহীন রসসমুদ্রে পালা-নাট-গীতিনাট্য নিয়ে কালযাপনের একঘেঁয়েমী থেকে নাট্যশালা যেদিন আমাদের মুক্তি দিল—তা শুধু নাট্যরসিকের মনেই ঝড় তোলেনি এরই মধ্যে ভবিষ্যতের সোনালী দিনগুলোর স্বপ্ন দেখেছিল শিক্ষিত বিদগ্ধ-সমাজপ্রাণ বাঙ্গালী। নাটক যে সমাজের দর্পণ, আগুন জ্বালানোর ইন্ধন, কুসংস্কারের জঞ্জাল অপসারণের হাতিয়ার—এ কথা বুঝতে দেরী হয়নি। তাই জন্মলগ্নে আত্মোপলব্ধির নতুন বাণীকে রূপ দেবার একটা অভাবনীয় মাধ্যম হিসেবে নাটককে সে যুগের প্রতিভাবান মানুষেরা সাদরে বরণ করে নিয়েছিলেন। নাটকের দুরবস্থা দেখে মধুসূদন যে খেদোক্তি করেছিলেন স্বদেশপ্রেমী কবিরাও দেশের জন্য, জাতির জন্য, পরাধীনতার জন্য এমন আন্তর ক্রন্দন শোনাতে পারেননি। "অলীক কুনাট্যে রঙ্গে" আকণ্ঠমগ্ন বঙ্গভারতীর পরম-অপমানকর দুরবস্থাটিকে মধুসূদন বরদাস্ত করতে পারেননি সেদিন। মধুসূদন অতীতের সমৃদ্ধ ভারতবর্ষকে আহ্বান জানিয়েছিলেন, যে ভারতবর্ষের বুকে ব্যাস-বাল্মীকি-কালিদাস-ভবভূতির পদার্পণ ঘটেছিলো। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার জন্য বিন্দুমাত্র ব্যাকুলতা ছিল না সেদিন কিন্তু মানসিক অবনতি ও দুরবস্থার ভয়াবহ পরাধীনত অসহ্য হয়েছিল মধুসূদনের কাছে। তাই 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনায় মধুসূদন আমাদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির বিপন্নতা দেখে যে কবিতাটি লিখলেন—তাঁর মূলে গভীর সাহিত্যবোধের সঙ্গে জড়িয়ে আছে জাতীয়চেতনা। বাংলা নাটকের ভবিষ্যতের প্রতি অকৃত্রিম আশাবাদও ধ্বনিত হয়েছে মধুসূদনেরই কণ্ঠে,—

শুনগো ভারত ভূমি কত নিদ্রা যাবে তুমি,
আর নিদ্রা উচিত না হয়।
উঠ, ত্যজ ঘুম ঘোর হইল, হইল ভোর,
দিনকর প্রাচীতে উদয়।

বাংলা নাটকের আবির্ভাবের সঙ্গে যিনি সূর্যোদয়ের তুলনা দিয়েছেন-সেই মধুসূদনকে শুধু নাট্যকার হিসেবেই নয়, নাট্যসাহিত্যের ভবিষ্যৎ দ্রষ্টার আসনেই বসাতে হয় নাটক লিখে নাট্যসাহিত্যের মানোন্নয়ন করার মত প্রতিভাই শুধু নয়, নাট্যসাহিত্যে আবির্ভাবে বাংলা সাহিত্য যে কী মহারত্ন লাভ করেছে সে উপলব্ধিও পারি

নাটক সৃষ্টির মধ্যে মধুসূদন রসবিতরণের প্রশ্নটিকে অবান্তর বলে মনে করেননি অথচ নাটকের অভাবিত শক্তি ও সামর্থ্য কিভাবে জাতীয়চেতনার পুষ্টিসাধন করতে পারে সে বিষয়েও চিন্তা করেছিলেন। সার্থক নাটক লেখার প্রতিভা থেকে যদি "কৃষ্ণকুমারীর" জন্ম হয় তবে জাতীয়চেতনার রসরূপ দানের সাধু ইচ্ছা থেকেই তাঁর প্রহসনের জন্ম হয়েছে বলতে হয়। নাটকের সঙ্গে মানুষের যথার্থ সম্বন্ধ কি, মধুসূদন বিচিত্রধর্মী নাটক ও প্রহসন রচনা করে মোটামুটি তার আভাস দিতে পেরেছিলেন। নাট্যসাহিত্যের প্রাথমিক স্তরে তাঁর এই দানকে অসামান্য বলে অভিহিত করা হয় সেকারণেই। তবু নাট্যসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাক্ মধুসূদন নাট্যকারগোষ্ঠী সম্পর্কে কিছু আলোচনা দরকার।

বাংলা নাটক রচনার প্রথম বৎসরে শুধু কৈফিয়ৎ দেবার পর্বটি সারা হয়ে গেলে [১৮৫২ সালে মুদ্রিত নাটকদ্বয়ের ভূমিকা] আমরা নাট্যকার হিসেবে রামনারায়ণ তর্করত্নের সাক্ষাৎ পাই। স্বদেশাত্মক কোন অনুভূতির অনুসন্ধান করে নাট্যকারকে অভিনন্দিত করার সুযোগ আমরা সদ্য উদ্ভাবিত নাটক রচয়িতাদের রচনা থেকে আশা করতে পারি না—কিন্তু তবু দেখছি সমাজচেতনার ক্ষীণধারা প্রথম যুগের নাট্যরচয়িতাদের মনেও ছিল। ১৮৫৪ সালে রামনারায়ণের "কুলীন কুলসর্বস্ব" নাটকের ভূমিকায় রামনারায়ণ বলেছেন,—"ইহা কেবল রহস্যজনক ব্যাপারেই পরিপূর্ণ বটে, কিন্তু আদ্যোপান্ত সমস্ত পাঠ করিয়া তাৎপর্য গ্রহণ করিলে কৃত্রিম কৌলিন্য প্রথায় বঙ্গদেশের যে দুরবস্থা ঘটিয়াছে তাহা সম্যক অবগত হওয়া যাইতে পারে।[১]

দেশ ও জাতির সমস্যাচিত্র বর্ণনার মূলে দেশানুরাগের স্পর্শই স্রষ্টাকে বিচলিত করেছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না। আদিযুগে ভাব ও প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে যেটুকু গ্রাম্যতা—যেটুকু আড়ষ্টতা থাকে ঈশ্বরগুপ্তের কবিতাতে তা দেখেছি। নাট্যরচনার প্রারম্ভ যুগের নাট্যকার রামনারায়ণের চিন্তা ও প্রকাশভঙ্গিতে সেজাতীয় দৈন্য সর্বদাই চোখে পড়ে। তবু দেখছি, নাটকরচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে ও রূপদানে নাট্যকার দেশভাবনাপীড়িত। সে ভাবনায় মৌলিকত্ব যেমন স্বীকৃত—চেষ্টাকৃত সাজসজ্জা তেমনি অস্পষ্ট। নাট্যকার তৎকালীন বাংলাদেশের জীবনচিত্র রচনার পূর্ণসামর্থ্য অর্জন করেননি বটে কিন্তু সাধ্যমত দেশের কুপ্রথাগুলো লোকচক্ষে তুলে ধরার আন্তরিক বুদ্ধি নিয়েই নাট্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হয়েছিলেন। বাংলা কাব্যে স্বদেশপ্রেমের প্রতিফলন আবিষ্কারের মুহূর্তেও দেখেছি, প্রত্যক্ষ আভাস থেকে পরোক্ষ দেশভাবনা ব্যাঙ্গাত্মক কবিতায়,—সামাজিক কবিতায় স্পষ্টতর হয়ে উঠেছে। জাতীয়ভাব কিংবা স্বদেশচিন্তা ছাড়া অন্য কোন উৎস থেকে এ চিন্তা আসে না।

---

[১] রামনারায়ণ তর্করত্ন, কুলীন কুলসর্বস্ব নাটক, ভূমিকা, ১৮৫৪।

ঈশ্বরগুপ্তের ব্যঙ্গাত্মক কবিতায় ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রীতি ও জীবনদর্শন ওতপ্রোত হয়েছিল—ব্যঙ্গ ও পরিহাস মিশিয়ে তিনি সংবাদকে মুখরোচক করার সাংবাদিকী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছিলেন। সেখানে জাতিত্ববোধ তাঁকে নির্মম ও অনুদার করে তুলেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও আমরা ঠিক এই জাতীয় দেশপ্রেম লক্ষ্য করি, প্রসঙ্গক্রমে সেকথা আলোচিত হবে। রামনারায়ণ তর্করত্নের নাট্যরচনার সূত্র ধরে নাট্যকারের ভাবদৃষ্টির যে পরিচয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ধরণের। ব্যঙ্গ ও পরিহাস রসিকের তরলতা নাটকের প্রয়োজনে অবতারণা করলেও আগাগোড়া নাট্যকার মর্মস্পর্শী ট্র্যাজিক অনুভূতিটিকেই নাটকের মধ্যে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৫৪ সালের সমগ্র বাংলাসাহিত্যের দিকে দৃকপাত করলেও এ সত্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে। সেযুগের নির্মম সামাজিক প্রথার মূলোচ্ছেদের বাসনা নিয়ে রামনারায়ণ আবির্ভূত হননি; রামমোহন-বিদ্যাসাগরের দৃঢ়তা ও শক্তি তাঁর চরিত্রে আশা করাই যায় না, কিন্তু নাটকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে তাঁর নিঃসংশয় দৃঢ়তা অনস্বীকার্য। সাধারণ্যে পৌঁছে দেবার মত কাহিনী নিয়েই তিনি নাট্যনক্সা রচনা করেছেন, তাতে নাট্যিক কলাকৌশল কিংবা উচ্চাঙ্গের নাটকীয় সংহতি ছিল না—কিন্তু নাট্যকারের সহানুভূতিসিক্ত চরিত্রগুলি অনেক ক্রটি-বিচ্যুতির মাঝখানেও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল। সাহিত্যবিচারে রসিকের দৃষ্টি খোঁজে রসসিক্ত মুহূর্তগুলি, সমালোচকের শাস্ত্রানুগ বিচারের প্রয়োজন সেখানে সামান্যই। তাই দেখি, রামনারায়ণ সার্থক নাটক না লিখেও নাট্যকারের অভিনন্দন পেয়েছেন। সাহিত্যের ইতিহাসে তার স্থান নির্ধারণ নিয়ে কিছু যদি সংশয় থেকে থাকেও বা যুগবিচারে রামনারায়ণ সেদিন সফল ন্যাট্যকার বলেই বন্দিত হয়েছিলেন।

নাট্য সাহিত্যের আদিপর্বে সমাজচেতনার এই আদর্শ সঞ্চার করে রামনারায়ণ আরও একটি মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। দেশীয় জনগণের রসপিপাসা মেটাবার দায়িত্ব নিয়ে তিনি সুলভ আনন্দবিতরণের সঙ্গে চিন্তাবিতরণেরও চেষ্টা করেছিলেন। সমবেত সুধীজনের সামনে যথার্থ আনন্দ পরিবেশনের এই পরিকল্পনাটির জন্যও সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ তিনি পাবেন। অবশ্য দেশপ্রেমী জমিদারগোষ্ঠীর প্রতিযোগিতা ব্যবস্থাটিও এ ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য—তাঁদের মহৎ আবেদনে সাড়া দেবার যোগ্যতা সেযুগে রামনারায়ণের মধ্যেই প্রত্যক্ষ করেছি। নাট্যরচনার ক্ষমতার বিচারে রামনারায়ণকে সার্থক নাট্যকার বলা যাবে না, তাই নাটক বিচারের জটিলতায় না গিয়ে শুধুমাত্র নাটকের বিষয় নির্বাচনের ও রসবিতরণের যে ইচ্ছাটি রামনারায়ণের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি,—তাতেই তাঁকে সমাজসচেতন-দরদী নাট্যস্রষ্টা বলতে পারি

অনায়াসে। অবশ্য তাঁর মৌলিক নাটকের প্রসঙ্গেই এ মত গ্রহণযোগ্য, অনুবাদ নাটকের ক্ষেত্রে তা প্রয়োগ করা যায় না।

রামনারায়ণের প্রথম নাটক "কুলীন কুলসর্বস্বের" সাফল্যই তাঁকে পরবর্তী সুযোগ এনে দিয়েছে। রামনারায়ণের প্রথম দুটি নাটকই পুরস্কারপ্রাপ্ত রচনা, ঠাকুরবাড়ীর প্রযোজনায় নাটক রচনা প্রতিযোগিতায় সর্ববাদীসম্মতভাবে রামনারায়ণকেই যোগ্য নাট্যকার বলে সম্মানিত করা হয়েছে। সেই সভায় পরবর্তী যুগের স্বদেশপ্রেমী নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বক্তব্য ছিল এই,—"পণ্ডিত রামনারায়ণ ইংরাজী জানিতেন না, তিনি খাঁটি দেশীয় আদর্শেই নাটক রচনা করিতেন। তাঁহাকেই প্রকৃতরূপে আমাদের বাংলার সর্বপ্রথম জাতীয় নাট্যকার (national dramatist) বলা যাইতে পারে।[২]

পরবর্তীকালের সফল নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই অভিমতটি কিঞ্চিৎ ভাবাবেগপীড়িত হলেও নিতান্তই অতিশয়োক্তি মাত্র নয়। রামনারায়ণ জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবার কর্তৃক নির্বাচিত নাট্যকার হিসেবেই "বহুবিবাহ প্রভৃতি কুপ্রথা বিষয়ক নবনাটক" রচনা করলেন।

নাট্যশালার সঙ্গে নাটকরচনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলেই—অভিনীত নাটকের গুণাগুণ বিচারকালে নাট্যকারের ও নাটকের জনপ্রিয়তাও বিচারের অন্যতম মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। রামনারায়ণের যুগে নাটকের অভাব নাট্যামোদীদের নিরাশ করত। শকুন্তলার অনুবাদ কিংবা শেকসপীয়র রচিত নাটকের বাংলা অনুবাদে তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব ছিল না—কারণ অনুবাদ কখনই সার্থকতার মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ হতে পারত না। ঠিক সেই মুহূর্তে রামনারায়ণকেই "নাটুকে" বলে অভিনন্দন জানিয়ে একাধিক জমিদার চালিত-নাট্যশালার কর্তাব্যক্তিরা আঁকড়ে ধরেছিলেন। এ সম্মানটুকু মৌলিকসৃষ্টির জন্যই মনে হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে রামজয় বসাকের বাড়ীতে এই নাটকের অভিনয় জনসমাগমে সার্থক হয়েছিল। ১৮৫৮ সালের ২৫শে মার্চ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর', তিনদিন আগে গদাধর শেঠের বাড়ীতে অনুষ্ঠিত 'কুলীনকুলসর্বস্ব' অভিনয়ের সংবাদ পরিবেশন করছেন,—

"বড বাজারস্থিত এই রঙ্গভূমি প্রায় ছয় সাত শত লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীযুত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়, শ্রীযুক্তবাবু নগেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরীমোহন মিত্র প্রভৃতি অনেকানেক মহোদয়গণ আগমন করিয়া সভামণ্ডপ শোভিত করিয়াছিলেন। অভিনয় প্রক্রিয়া যে কতদূর সুন্দর হইয়াছিল তাহা লেখনী

২. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, 'জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি' ১৩২৬।

সম্যকরূপে প্রকাশ করিতে সমর্থ নহে। এই অভিনয়দর্শন করিয়া প্রত্যেক দর্শকেই ভূরি ভূরি ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছিলেন—”[৩]

এই সংবাদটি এ কারণেই উল্লেখযোগ্য যে, নাটকের অভাব ছিল বলেই নিতান্ত সাধারণ শ্রেণীর একটি সামাজিক নাটকই রসিক ব্যক্তিরা উপভোগ করতেন সানন্দে অথচ নাট্যশালার সমৃদ্ধির যুগে অসংখ্য ভাল নাটকের মাঝখানে রামনারায়ণের অন্যান্য নাটক অভিনয় হলেও 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকটির অভিনয় সংবাদ পাওয় যায় না। প্রথম রচনার সমস্ত দুর্বলতা 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকে ধরা পড়েছে কিন্তু 'নবনাটকের' অভিনয়যোগ্যতা বেশী ছিল বলে জোড়াসাঁকোমঞ্চে এর অভিনয় জমেছিল। "জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতিতে" এ ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ পাওয় যাচ্ছে। কিন্তু অভিনয়যোগ্যতা নাটকেব গুণে না অভিনয়ের গুণে—এ প্রশ্নটি সকলের মনেই গুঞ্জিত হয়েছিল সেদিন। এ নাটকেও সমাজের বহুবিবাহ প্রথার সমালোচনা করে নাট্যকার নতুনভাবে তাঁর সমাজচিন্তনের পরিচয় দিয়েছেন আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বহু ট্রাজেডি প্রতিনিয়ত ঘটে থাকে,—সূক্ষ্ম বা স্থূল দৃষ্টিতে তা দেখেও সকলেই নীরবতা পালন করেছেন, রামনারায়ণের দৃষ্টিতেই সহানুভূতির স্পর্শ লেগেছিল শুধু। এই কারণেই আদিপর্বের সমাজবাদী ও জীবন-জিজ্ঞাসু রামনারায়ণকে প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে।

বাংলা নাটকের অপরিমিত সম্ভাবনা জন্মলগ্নেই ধরা পড়েছিল, তাছাড়া নাটকের সঙ্গে সাধারণ মানুষের সংযোগও ঘনিষ্ঠতর। কাব্য ও প্রবন্ধে যাদের রুচি নেই—অভিনয়ে তাদের আগ্রহ থাকাটা নানা কারণেই সম্ভব। আর নগর কলকাতার আজব আবিষ্কার রঙ্গমঞ্চ ও নাটক সেদিনের বাঙ্গালীর কাছে এক পরম বিস্ময়। মহাকবি হয়েও মধুসূদন সেদিন কলম ধরেছিলেন নাট্যরুচির সংস্কার সাধনব্রতে, কারণ সম্ভাবনার মহীরুহকে বজ্রাহত হতে দেখলে প্রতিভাবানের অন্তর বেদনার্ত হবেই। সুতরাং ১৮৫২ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে বাংলা নাট্য সাহিত্যে অভাবনীয় সিদ্ধি ও জনসমর্থন বিস্ময়করভাবে দেখা গেল। একটু তলিয়ে দেখলে বোঝা যায় নবজাগরণের জন্মলগ্নে পিপাসু বাঙ্গালী সেদিন নাট্যরসেই তৃপ্ত হয়েছিল সবচেয়ে বেশী। কারণ সমাজকে চিনতে গেলে, জানতে হলে পুঁথি পড়ে বোঝার সময়টুকু হাতে ছিল না, কিন্তু সারা কলকাতা জুড়ে অসংখ্য রঙ্গমঞ্চের দ্বারে দ্বারে ভীড় জমানোয় আনন্দ ছিল, নেশা ছিল, উন্মাদনা ছিল। মাত্র ৮ বছরের মধ্যে মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটকগুলির রচনা সমাপ্ত হয়, দীনবন্ধু মিত্রের সার্থক ও সর্বপ্র

---

৩. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। ৩য় সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত। ১৩৫

নাটক 'নীলদর্পণ' প্রকাশিত হয়। সামাজিক কুপ্রথা নিবারণ উদ্দেশ্যে রচিত উমেশচন্দ্র মিত্রের চতুরঙ্ক নাটক 'বিধবা বিবাহ'ও রচিত হয়েছিল।

এ সমস্ত নাট্যরচনার বিষয়বস্তু নির্বাচনে যে ধরণের সমাজচিন্তার ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করি নানা কারণে সেটিই বিস্ময়কর। বাঙ্গালীর সামনে বাংলাদেশের সমাজ জীবনের পূর্ণরূপটি তুলে ধরার সাধু উদ্দেশ্য সমগ্র নাট্যকার গোষ্ঠীর মধ্যে কিভাবে সঞ্চারিত হল বলা কঠিন। তবু দেখছি, পরাধীন ভারতের পীড়িত নাগরিকরা আত্মসচেতন হয়েছেন। রামনারায়ণের 'কুলীন কুলসর্বস্বের' প্রভাবে উমেশচন্দ্র 'বিধবা বিবাহ' লিখেছেন এ তথ্য সম্মত, কিন্তু কোন প্রেরণায় অত্যাচারিত, নিপীড়িত বাঙ্গালীচাষীর মর্মবেদনার বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তুলেছিলেন দীনবন্ধু মিত্র, কোন আদর্শে বিপথগামী—বিকৃতরুচি ইয়ংবেঙ্গলের স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করলেন মধুসূদন, বৃদ্ধ ধনবানের বিবাহতৃষ্ণার অন্তরালে যে বীভৎস সামাজিক ব্যাধি বাসা বেঁধেছে সে চিত্র ফুটিয়ে তোলার প্রেরণা এল কোথা থেকে? এ প্রশ্নের উত্তর আজ আর অজানা নয়, সে যুগের কবি ও নাট্যকার, সমাজসংস্কারক ও শিক্ষাব্রতী, প্রতিটি মানুষের মনে অলক্ষ্যে দেশচিন্তার প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে। ব্যক্তিচিন্তার অন্তরালে বাসা বেঁধেছে সমগ্রের চিন্তা। নিঃসন্দেহে এই জাগরণকেই যথার্থ নবজাগরণ বলা চলে! দেশচেতনা ছাড়া একে অন্য কোন নামে অভিহিত করা যায় না।

স্বদেশপ্রেমী সাহিত্যস্রষ্টার মনে সৃষ্টির বাসনা যখন দুর্নিবার হয়ে ওঠে, একটা সুপরিকল্পিত পথ ধরেই তাঁরা এগিয়ে চলেন। সে যুগের উন্মাদনায় এ সত্যটি বার বার ধরা পড়েছিল। প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখছি স্রষ্টার চিন্তার কিছু অংশ সর্বজনীন চিন্তারূপেই আত্মপ্রকাশ লাভ করেছে। কুলীন কন্যার বিবাহসমস্যা যেদিন লিখিত বক্তব্য হয়ে উঠল, হাতের কাছেই বিধবা বিবাহ-এর মত একটা আলোড়নকারী সমস্যার অস্তিত্ব অলিখিত হয়ে থাকবে এ হতে পারে না। বিশেষ করে বিধবা বিবাহ বহু আলোচিত-বহু বিতর্কিত একটি সামাজিক সমস্যা। সুতরাং নাটক যতই অসার্থক হোক না কেন সে বিচার পরে, নাট্যকারের দেশহিতৈষিতার প্রমাণ রূপেই তা গ্রাহ্য হয়েছে। নাট্যকার উমেশচন্দ্র যে সচেতনভাবে দেশচিন্তার আবেগেই নাটকটি রচনা করেছিলেন, এমন প্রমাণও মিলবে। তৃতীয় সংস্করণ 'বিধবা বিবাহের' বিজ্ঞাপনে উমেশচন্দ্র যে উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত করেছেন—তাও লক্ষ্যণীয়। নাটক যে সমাজ সংস্কারের কাজেও প্রযুক্ত হতে পারে তা তিনি সরবে ঘোষণা করেন,—

Our national idea of the purposes of a drama is that it should not only amuse.⋯Even with purposes so limited and means thus restricted, the drama would not be an ineffective instrument of

social reformation ; but then its success would entirely depend upon its falling in with current public opinion.[8]

বিধবা বিবাহের প্রয়োজনীয়তার সমর্থনে বক্তব্য তুলে ধরার আন্তরিক চেষ্টা নাটকটিতে লক্ষিত হয়। ভ্রান্ত পথানুগামী নায়িকার মর্মবেদনা প্রকাশে কিঞ্চিৎ গ্রাম্যতা ও অশালীনতা প্রকাশ পেলেও নায়িকা দর্শকের সহানুভূতি হারায়নি। সমাজ সংস্কারক মহাত্মাদের মতো নাট্যকারগোষ্ঠীও সেযুগে যে অসীম মনোবল ও দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন তা অনস্বীকার্য। সমাজদরদী সুধীজন যে কঠিন দৃঢ়তার সঙ্গে সংস্কারের কাজে নেমেছিলেন—অতিসাধারণ মানুষের কাছে সহজ বোধ্যরূপে সে সংবাদ পরিবেশনের সুষ্ঠু চেষ্টাই করেছিলেন নাট্যকার উমেশচন্দ্র মিত্র।

মধুসূদনের নাট্যরচনা প্রয়াসের মূলে সাহিত্যানুরাগ ও দেশানুরাগ যে ওতপ্রোত হয়েছিল—'শর্মিষ্ঠা' নাটকের উৎসর্গপত্রেই তা মিলবে। পাইকপাড়ার বিদ্যানুরাগী—নাট্যানুরাগী রাজভ্রাতৃদ্বয়কে উদ্দেশ্য করে মঙ্গলাচরণে মধুসূদন জানিয়েছেন,—

"মহাশয়দিগের বিদ্যানুরাগে এ দেশের যে কি পর্যন্ত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাহুল্য। আমি এই প্রার্থনা করি যে, আপনাদিগের দেশহিতৈষিতাদি গুণরাগে এ ভারত ভূমি যেন বিদ্যাবিষয়ক স্বীয় প্রাচীন শ্রী পুনর্দ্ধারণ করেন। ইতি—

শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্তস্য।"[৫]

রাজভ্রাতৃদ্বয়ের সাহিত্যপ্রীতিকে নিতান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে মনে করা যায় না—মধুসূদনের শ্রদ্ধার্ঘ্য রচনার ভাষাই তার প্রমাণ। সাহিত্যপ্রীতির অন্তরালে স্বদেশ-প্রীতি ও স্বভাষাপ্রীতির এমনতর নির্মল নির্দশন সে যুগের বাংলা দেশে বিরল ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রস্তুত পরিবেশে সেযুগের সাহিত্যানুরাগী ও সাহিত্য-স্রষ্টারা মিলিত হয়েছিলেন।

বাণীর বরপুত্র মধুসূদনের রচনাশক্তি ছিল কিন্তু রচনা প্রকাশের সামর্থ্য ছিল না। দেশানুরাগের অমলিন স্বার্থেই রাজভ্রাতৃদ্বয় প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। পরাধীনতার ঐক্যে সেদিনের ধনবান ও প্রতিভাবানের ঐক্যমূলক সৌভ্রাতৃবোধ রচিত হয়েছিল। মধুসূদনের পরিকল্পনা ছিল ন্যাশনাল থিয়েটর প্রতিষ্ঠার এবং সেই জাতীয় নাট্যশালায় কি ধরণের নাটক অভিনীত হওয়া প্রয়োজন তারও আভাস তাঁর চিঠিপত্রে মিলবে। মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখছেন—

..."as yet we have not established a National Theatre, I mean,

৪. উমেশচন্দ্র মিত্র, বিধবা বিবাহ। তৃতীয় সংস্করণ। ১২৮৫।

৫. মধুসূদন দত্ত, শর্মিষ্ঠা নাটক' মঙ্গলাচরণ। বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত। মাইকেল গ্রন্থাবলী। ২য় ভাগ। থেকে উদ্ধৃত।

we have not as yet got a body of sound, classical Dramas to regulate the national taste, and therefore we ought not to have Farces".[৬]

"বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রেঁা" রচনায় যুগান্তকারী ঐশ্বর্য না থাকলেও তৎকালীন বাংলা দেশের বিকৃতরূপ যথাযথভাবে ফুটিয়ে তোলার সাধনায় তিনি সিদ্ধি লাভ করেছিলেন। প্রহসনের স্বল্প বক্তব্যেও হিন্দুয়ানী বনাম ইংরাজীয়ানার দ্বৈত তুলনা মধুসূদন খুব স্পষ্টভাবে অবতারণা করেছেন। এই দুয়ের উর্ধ্বে যে শাশ্বত মানবতা-বোধের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি তারই জয়গান করেছেন। শেষাংশে যে নীতি কবিতাটির অবতারণা করেছেন তাতেই অন্তর ও বাহিরের প্রসঙ্গ নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন,—

বাইরে ছিল সাধুর আকার
মনটা কিন্তু ধর্ম ধোয়া।
পুণ্য খাতায় জমা শূন্য,
ভণ্ডামীতে চারটি পোয়া।

ভক্ত প্রসাদের হিন্দুয়ানীর ওপর আস্থা রাখার বোকামী থেকে আমাদের মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন—প্রহসনকার মধুসূদন। হিন্দুয়ানী আর খৃষ্টিয়ানীর পার্থক্য বিচার করতে গিয়েই ভক্ত বলেছে,—"দেব ব্রাহ্মণের প্রতি অবহেলা, গঙ্গাস্নানের প্রতি ঘৃণা, এই সকল খৃষ্টিয়ানী মত।" আচারসর্বস্ব ও কুসংস্কারপূর্ণ হিন্দুয়ানীর অন্তঃসার-শূন্যতার বড়াইকে এমন চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখানোর জন্য প্রহসন রচনা করেছিলেন মধুসূদন। ভক্তপ্রসাদের হিন্দুয়ানী রক্ষার আকুল আগ্রহ শুধু হাস্যরস নয় আমাদের অন্ধতা ঘোচাবার মত কিছু প্রাণরসও সঞ্চার করেছে বলতে হবে। সহর কলকাতার একটি সুন্দর চিত্র বর্ণনা করেছেন মধুসূদন ভক্তপ্রসাদের জবানিতে,—

"...আমি শুনেছি যে, কলকাতায় নাকি সব একাকার হয়ে যাচ্ছে ? কায়স্থ, ব্রাহ্মণ, কৈবর্ত্ত, সোনার বেনে, কপালী, তাঁতী, জোলা, তেলী, কলু সকলেই নাকি একত্রে উঠে বসে, আর খাওয়া দাওয়া করে ?" সমাজের বা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র রূপেই কলকাতা সেদিন সব মানুষকে আহ্বান জানিয়েছিল। মধুসূদনও সেদিন কলকাতাকে সর্বজাতিসমন্বয়ের কেন্দ্ররূপেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সাধুপ্রসাদ যখন মহাক্ষোভে বলছে,—"কি সর্বনাশ হিন্দুয়ানীর মর্যাদা দেখছি আর কোন প্রকারেই রৈলো না। আর রৈবেই বা কেমন করে ? কলির প্রতাপ দিন দিন বাড়ছে বৈত নয়।"—তখন চরিত্রহীনতা ও লাম্পট্যের মুখোসটি প্রকাশিত হয়।

---

৬. নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ৫৯৮।

তীক্ষ্ণ সমাজবোধের দর্পণে জীর্ণ হিন্দুয়ানীর কিছু আভাস মধুসূদন অত্যন্ত কৌশলে প্রচার করেছিলেন। কাব্যকার মধুসূদনের কাব্যে যেমন সমাজচেতন কবিকে আবিষ্কার করা দুরূহ—প্রহসনের আলোকে মধুসূদন চরিত্রের এই উজ্জ্বল দিকটি উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। শুধু নাট্য সাহিত্যের সংস্কার করার ইচ্ছা থেকেই নয়—মধুসূদন সমাজ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারার নিপুণ অভিব্যক্তিটুকুই প্রহসনে তুলে ধরেছিলেন। সমাজচিন্তা ও দেশচিন্তার মধ্যে লক্ষ্যণীয় পার্থক্য সেখানে থাকতে পারে না।—যেখানে সমাজই দেশ,—সমাজ চিন্তাই সমগ্রের চিন্তা। "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ" শতধাজীর্ণ—সেযুগের সামাজিক কাঠামোর প্রতিফলন। "একেই কি বলে সভ্যতা"তে পাই প্রতিক্রিয়াশীল সমাজজীবনের ছবি। একদিকে পরিবর্তনকে অস্বীকার করার হাস্যকর দুর্বলতা, অন্যদিকে পরিবর্তনের স্রোতে ভেসে যাওয়ার অবিবেকিতা—দুয়ে মিলে সমাজের পূর্ণরূপটি মধুসূদন প্রহসনে তুলে ধরেছিলেন। "একেই কি বলে সভ্যতা"য় কবি মধুসূদনের জিজ্ঞাসা সমাজবিদের কাছে না নিজেরই কাছে বলা মুস্কিল। কবিকে ও কাব্যকে একাকার করে বিচার করে দেখলে যে আপাতঃবিরোধী চিত্র ফুটে ওঠে সেখানে প্রহসনকার মধুসূদনের সঙ্গে ব্যক্তি মধুসূদনের আচরণগত অসঙ্গতিই প্রকট। ইয়ংবেঙ্গলকে সমালোচনা করার সৎসাহস যে মধুসূদনের মত একজন খাঁটি ইয়ংবেঙ্গলের কাছ থেকেই পাব—এ আশাতীত আশা। নিজের উদ্দামতায় যিনি প্রায় অস্থির হয়েছিলেন—ইয়ংবেঙ্গলের অস্থির উন্মাদনাকে তিনিই আবার প্রহসনের বস্তু করে তুলেছেন। সমসাময়িক পত্রপত্রিকায় এ প্রহসনটির সার্থক সমালোচনা হয়েছিল। 'বিবিধার্থ সংগ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র লিখেছিলেন,—"ইয়ংবেঙ্গল অভিধেয় নব বাবুদিগের দোষোভাষণই বর্তমান প্রহসনের একমাত্র উদ্দেশ্য ; এবং তাহা যে অবিকল হইয়াছে, ইহার প্রমাণার্থে আমরা এইমাত্র বলিতে পারি যে, ইহাতে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে প্রায়ঃ তৎসমুদায়ই আমাদিগের জানিত কোন না কোন নববাবু দ্বারা আচরিত হইয়াছে।"[৭]

সংবাদপত্রের এই তথ্যসমর্থন ছাড়াও উচ্ছ্বসিত সাহিত্যগুণের প্রশংসাও এ প্রহসনটি লাভ করেছিল। নামকরণের প্রত্যক্ষ সৌন্দর্যই প্রহসনটি পাঠের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। "নীলদর্পণকে" সমাজচিত্র বলে যে অভিনন্দন জানাই—মধুসূদনের প্রহসন দুটি তার চেয়ে কোনো অংশেই কম নয়। দীনবন্ধুর সহানুভূতির প্রলেপে একদা যে কাহিনী আমাদের জীবনে সংগ্রাম সামর্থ্য সৃজন করেছিল—মধুসূদনের প্রহসন দুটিতে সেই উপাদানই আরও প্রত্যক্ষ ও সুবিন্যস্ত। মধুসূদন সামাজিক বিষয়বস্তু গ্রহণ করেও

৭. মাইকেল গ্রন্থাবলী। ১ম ভাগ। একেই বলে সভ্যতা। পরিচয় থেকে উদ্ধৃত।

রসসৃষ্টির চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এর ফল হয়েছিল সম্পূর্ণ উল্টো। ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায় কি ভাবে এই প্রহসনটির অভিনয় বন্ধ করে দেওয়া যায় তারই চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথায় একটি চমকপ্রদ বিবরণ মিলছে,—

A few of the 'Young Bengal' class getting a scent of the farce "একেই কি বলে সভ্যতা ?" and feeling that the caricature made in it touched them too closely, raised a hue and cry, and choosing for their leader a gentleman of position and afffluence who, they know, had influence with the Rajahs, deputed him to dissuade them from producing the farce on the Board of their Theatre. This gentleman (also a Young Bengal) fought tooth and nail for the success of his mission. The Rajahs would not yeild at first, but under great pressure were obliged to give up the farce".[৮]

এই প্রহসন দুটির অকৃত্রিম প্রয়াস সেযুগের বাঙ্গালী গ্রহণ করেনি। সমাজের উন্নতিবিধান-এর প্রকট আদর্শ না থাকলেও সে সামর্থ্য এ দুটি প্রহসনের ছিল কিন্তু জাতীয় চেতনার মত মূল্যবান উপলব্ধির অভাবেই সে যুগের মানুষরা এ প্রহসনের অন্তর্নিহিত আবেদনে সাড়া দেয়নি। উপরন্তু এমন সার্থক প্রহসন লিখেও মধুসূদন লাঞ্ছিত হলেন। যে নির্মল দেশচেতনার সার্থক প্রতিফলন এ প্রহসনের মর্যাদা বাড়িয়েছে সে যুগের নব্যশিক্ষিত সম্প্রদায় তার মর্যাদা দিতে পারেননি এটা আক্ষেপেরই কথা। অবশেষে মধুসূদনের মত প্রহসনকারকেও বিরক্ত হয়ে রচনা বন্ধ করতে হয়েছিল। 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ'—লিখেও তিনি জনপ্রিয় হননি,—সমালোচিত হয়েছিলেন কারণ এতে প্রাচীন হিন্দু সমাজকে আঘাত হেনেছেন। সুতরাং উৎকৃষ্ট সমাজচিন্তা থাকলেই সে সাহিত্য নাট্যকার ও স্রষ্টাকে বিপুল সাফল্য এনে দেবে এমন কোন কথা নেই। "নীলদর্পণের" মত সমাজ দর্পণেই মধুসূদন সে যুগের সার্থক চিত্র ফুটিয়ে তুলেছিলেন কিন্তু পৃষ্ঠপোষক রাজাদের মনোরঞ্জন করার ধৈর্য্য ছিল না বলেই বিরক্ত হয়ে তিনি প্রহসন লেখা বন্ধ করেন। এতে ক্ষতি হয়েছে এই যে, মধুসূদনের সমাজচিন্তার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হয়েছে। অবশ্য সমাজ ও স্বদেশ সম্পর্কে গভীর অনুরাগ ও প্রীতির নিদর্শন তার কাব্যে অজস্র রয়েছে। পূর্বেই বলেছি, নাটকের উজ্জ্বল সম্ভাবনা ও জনসংযোগ ক্ষমতা কাব্যে আশা করা যায় না, তাই নাটকের সাফল্য আসে দ্রুতলয়ে। মধুসূদনের পরিচ্ছন্ন স্বদেশচিন্তা যেভাবে দুটি

৮. মাইকেল গ্রন্থাবলী। ১ম ভাগ, একেই কি বলে সভ্যতা, পরিচয় থেকে উদ্ধৃত।

প্রহসনে স্থান পেয়েছে—কাব্যে তা পায়নি। সমাজচিন্তার মূল্যবান দলিল রচনার স্বাভাবিক ক্ষমতা মধুসূদনের প্রতিভায় নিহিত ছিল অথচ গুণীজনের সমর্থন না পেয়েই তাঁকে থামতে হলো, এ সত্যিই আক্ষেপের কথা। বাংলা নাট্যসাহিত্যের সার্থকতম প্রহসনস্রষ্টা বিরক্তি ও খেদে পত্র লিখেছিলেন,—

"Mind, you broke my wings once about the farce ; if you play a similar trick this time, I shall for-swear Bengali and write books in Hebrew or Chinese.[৯]

প্রহসনটির উপস্থাপনা ও বক্তব্যরীতিতে প্রহসনকারের দৃষ্টিভঙ্গীর অভিনবত্ব ছাড়াও ইয়ংবেঙ্গল সম্প্রদায়ের উন্নাসিকতা ও সমাজচেতনার যে দ্বিধাগ্রস্ত রূপ দেখতে পাই—মধুসূদনের দূরদর্শিতা ও দেশচিন্তা অনুধাবনের পক্ষে তা একটা মূল্যবান অংশ। "একেই কি বলে সভ্যতা" নামকরণের মধ্যেও গভীর আত্মবিচারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন তিনি। দ্বিতীয় অংক, প্রথম গর্ভাঙ্কে সভার সমবেত সভ্যদের বক্তৃতাংশটি নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। 'জ্ঞানতরঙ্গিনী,' সভায় অজ্ঞান কিম্বা জ্ঞানহীনের স্থান হতে পারে না, সুতরাং জ্ঞানঅর্জনের জন্যই এ সভায় আসা। জ্ঞানদানের ভার নিয়েছেন তাঁরাই, যাঁরা স্পীচ দিতে পারেন। সে যুগীয় আবহাওয়ায় বক্তৃতার মাধ্যমে শিক্ষাদানের প্রচলিত রেওয়াজকে নিখুঁতভাবে রূপায়িত করেছেন মধুসূদন। দেশপ্রেমিক রূপে যাঁরা সম্মানিত তাঁরা বক্তৃতাপটু। নববাবু তাই যে বক্তৃতা করেন—সেখানে দেশের প্রসঙ্গ আসবে সবার আগে। প্রহসনের ক্ষুদ্রায়তনে দেশচর্চার প্রচলিত রীতিটি মধুসূদনের নিপুণ রচনায় ফুটে উঠেছে। নববাবুর বক্তব্যটিও লক্ষ্য করার মত,—

"জেন্টেলম্যেন, তোমাদের মেয়েদের এজুকেট কর, তাদের স্বাধীনতা দাও—জাতভেদ তফাৎ কর—আর বিধবাদের বিবাহ দেও—তা হলে এবং কেবল তা হলেই, আমাদের প্রিয় ভারতভূমি ইংলণ্ড প্রভৃতি সভ্য দেশের সঙ্গে টক্কর দিতে পারবে নচেৎ নয়।"[১০]

১৮৬০ সালে লিখিত প্রহসনে মধুসূদন দেশচর্চ্চার ধারা যে ভাবে চিত্রায়িত করেছেন—তা কেবল শক্তিমানের পক্ষেই সম্ভব। ইয়ংবেঙ্গলের সদস্যসুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দিতে উৎসাহী এই নব্যশিক্ষিতরা পাশ্চাত্ত্যপ্রেমের হাওয়ায় আন্দোলিত। মদ্যপানে জ্ঞানশূন্য হলেও সভার প্রারম্ভে এদের সাড়ম্বর ঘোষণাবাণী যে কোন আনুষ্ঠানিক ও অর্থহীন দেশপ্রেমিকতাকে ছাড়িয়ে যেতে পারে। সভার প্রারম্ভে স্পীচ দেবার অত্যুৎসাহে নব বলেছে,—

৯. মাইকেল গ্রন্থাবলী। ১ম ভাগ, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ, পরিচয় থেকে উদ্ধৃত।

১০. মাইকেল গ্রন্থাবলী। ১ম ভাগ। একেই কি বলে সভ্যতা।

"জ্ঞানের বাতির দ্বারা আমাদের অজ্ঞান অন্ধকার দূর হয়েছে ; এখন আমার প্রার্থনা এই যে, তোমরা সকলে মাথা মন এক করে, এদেশের সোসীয়াল রিফরমেশন যাতে হয় তার চেষ্টা কর।"

মধুসূদন যে সময়ে এ প্রহসন রচনা করেছিলেন—সামাজিক বিধি ব্যবস্থার সাধ্যমত সংস্কার করার আন্তরিক ইচ্ছা যে কোন সমাজবাদী ও দেশসচেতন মানুষের মনে দেখা দিয়েছিল। যদিও সমাজসংস্কারই দেশপ্রেমিকতা নয় কিন্তু সংস্কারকের মনোবৃত্তির সঙ্গে দেশপ্রেমিকের শুভইচ্ছার পার্থক্য কম—তাই যুগভেদে-কালভেদে দেশপ্রেম ভিন্ন রূপে আত্মপ্রকাশ করে। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে দেশপ্রেমের সাগ্নিক আন্দোলনে পরাধীনতা মুক্ত হবার বাসনা যদি যথার্থ দেশপ্রেমের লক্ষণ হয়—তবে সে অনুভবে পৌঁছতে 'গলে আমাদের অতীত মনোবৃত্তির এই বিচিত্র স্তরগুলো পেরোতেই হবে। মধুসূদনপর্বে মুক্তিআন্দোলন সম্ভব ছিল না কল্পনাতেও,—কিন্তু সমাজপ্রেম-ভাষাপ্রীতিই সমাজসংস্কারব্রতীকে প্রেরণা দিয়েছে। নববাবু "সোসীয়াল রিফরমেশন" বলতে যা বোঝাতে চেয়েছে তার অর্থ সমাজের প্রগতি। কিন্তু মদ্যাসক্তি বক্তৃতাশক্তি দান করলেও যথার্থ কর্মশক্তি দিতে পারেনি। সে যুগের Patriotরা বক্তৃতা দিতেন, এ দৃষ্টান্ত ছাড়া জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার' সদস্যরা আর কিই বা শোনাতে পেরেছে ? অথচ অসার জ্ঞানগর্ব প্রকাশে এদের বিন্দুমাত্র সংকোচ নেই। মধুসূদন শুধু এই ভয়াবহ সত্যটি সম্পর্কেই দেশবাসীকে সচেতন করেছেন। যে শিক্ষায় শিক্ষাগর্ব ও মদ্যপ্রেম ছাড়া আর কিছুই লক্ষ্যণীয় নয়—তারই ওপর ভিত্তি করে আমাদের ভাবী সমাজ দাঁড়িয়ে আছে। "একেই কি বলে সভ্যতায়" তাই পেয়েছি আমরা। এ প্রহসন মধুসূদনের দেশসচেতনতাই প্রকাশ্য রূপ, জীবনজিজ্ঞাসার রূপায়ণ।

জ্ঞানতরঙ্গিনী সভার সভ্যদের চরিতকথা হয়ত শ্রবণীয় নয় কিন্তু তাদের অন্ধকারের গভীরে তলিয়ে যাওয়ার উচ্চাশা উচ্চাঙ্গের প্রহসনের বিষয়। নববাবুর বক্তৃতার শেষাংশ,—

"কিন্তু জেণ্টেলম্যেন, এখন এ দেশ আমাদের পক্ষে যেন এক মস্ত জেলখানা ; এই গৃহ কেবল আমাদের লিবরটি হল অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতার দালান ; এখানে যার যে খুশী, সে তাই কর। জেণ্টেলম্যেন, ইন্ দি নেম্ অব ফ্রীডম্, লেট্ অস এঞ্জয় আওরসেলভস।"

'স্বাধীনতা' 'ফ্রীডম' শব্দগুলি অর্থগৌরব হারিয়ে কিভাবে একটি বিশেষ সম্প্রদায়কে বিনষ্টির শেষ স্তরে নামিয়ে দিয়েছিল এ প্রহসন না পড়লে তা আমাদের অজানা থেকে যেতো। আর প্রহসনকার যে এ ব্যাপারে আন্তরিকতার সঙ্গেই আভ্যন্তরীণ অভিজ্ঞতাকেই রূপ দিয়েছিলেন সে বিষয়ে সংশয় থাকতে পারে না।

শুধু প্রহসন বলেই প্রত্যক্ষ অর্থটি মুখ্যার্থ না হয়ে এখানে বিশেষ অর্থটিই সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। সে যুগের যন্ত্রণাময় অভিজ্ঞতাকে নিছক হাস্যরসের মাধ্যমে পরিবেশনের দূরদর্শিতা মধুসূদনের ছিল, কিন্তু তবু যা তিক্ত তা মধুর হয়ে ওঠেনি। এই ভয়াবহ সত্যকে স্বচক্ষে দেখার সাহস করেনি কেউ। স্বাধীনতার আনন্দে স্বেচ্ছাচারের ঘোলাজলই আকণ্ঠ পান করেছিল ইয়ংবেঙ্গল গোষ্ঠী—কিন্তু নীলকণ্ঠ মধুসূদনের প্রহসনেই তা একটা কালজয়ী রূপ পেয়েছিল। এই বাস্তবনিষ্ঠা মধুসূদনের প্রহসনের এক দুর্লভ সম্পদ, তার অন্যান্য নাটকে তা আশা করাই যায় না। দেশপ্রেমের কাব্যিক কল্পনা বা ভাবময় রূপের পরিচয় হয়ত অন্যত্র মিলবে কিন্তু যুগসমালোচনার ছলে আত্মসমালোচনার দুঃসাহসী পরিকল্পনার মধ্যে যে অকপট আদর্শ পাই তা অন্যত্র পাওয়া যাবে কী করে?

"কৃষ্ণকুমারী নাটকে"ও মধুসূদনের স্বাজাত্যবোধের প্রকাশ দেখি। মধুসূদন রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে এ নাটক লিখেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমমূলক রচনার একটা বিশিষ্ট অংশ রাজপুত জাতির ইতিহাস অবলম্বনে রচিত হয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে স্বাদেশিকতার প্রচলনে টড লিখিত 'রাজস্থান' গ্রন্থটির অসামান্য অবদান রয়েছে। রঙ্গলালও সাহিত্যে দেশপ্রেম সৃজন করেছেন টডের 'রাজস্থান' অবলম্বন করে। শৌর্য-বীর্য-দেশপ্রেমের উজ্জ্বলতায় রাজস্থানের ইতিহাসই দেশবোধ স্ফুরণে খানিকটা সহায়তা করেছে আমাদের। মধুসূদনের "কৃষ্ণকুমারী" ইতিহাস অবলম্বনে লেখা প্রথম নাটক বলেই নয়,—মধুসূদনের রাজস্থান ইতিহাস অনুসরণের মধ্যেও একটা অলক্ষ্য যোগাযোগ দেখা যাচ্ছে। মূলতঃ ট্রাজিডি লেখার উদ্দেশ্যেই এ নাটকের জন্ম,—কিন্তু তা যে কোন ঘটনার অনুসৃতি বা মৌলিক রচনা হতে পারত। কিন্তু মধুসূদন রাজস্থানের ইতিহাস থেকেই এর উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন বলে আমাদের পক্ষে মনে করা স্বাভাবিক যে, অন্যান্য সেকালীন সাহিত্যিকদের মতো টডের 'রাজস্থান' তাঁরও ভালো লেগেছিল। দেশপ্রেমের সচেতন প্রেরণা না পেলেও সাহিত্যিক উন্মাদনাই 'কৃষ্ণকুমারী নাটক' রচনার প্রেরণা এনে দিয়েছে। এ সম্পর্কে তার স্বলিখিত পত্রের স্বীকারোক্তিটি লক্ষ্যণীয়,—

"For two rights, I sat up for hours pouring over the tremendous pages of Tod and about I.A.M. last Saturday, the Muses smiled."[১১]

টডের গ্রন্থে এমন আকর্ষণীয় আয়োজন ছিল বলেই এ দেশীয় সাহিত্যিকরা গ্রন্থটির

---

১১. নগেন্দ্রনাথ সোম, মধুস্মৃতি থেকে উদ্ধৃত। কেশবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিত। পৃঃ ৬২৮।

সাহায্য নিয়েছিলেন। মধুসূদনের সঙ্গে সমসাময়িক সাহিত্যিকদের এখানে যেন ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। স্বদেশপ্রেম, বীরত্ব ও রোম্যান্স অনুসন্ধানীদের মত তিনিও এ গ্রন্থটির মূল্য স্বীকার করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কোন সমালোচক বলেছেন,—

"টডের গ্রন্থই বাংলা কাব্যকার, উপন্যাসিক, নাট্যকারদের সামনে ঐতিহাসিক উপাদানের ভাণ্ডার উন্মোচিত করলে। রেনেসাঁসের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বীরত্ব, উন্মাদনার প্রতি যে স্বাভাবিক আকর্ষণ এসেছিল টডের রাজস্থান তার যোগান দিলে। দেশপ্রেম, সতীত্ব গৌরব, বীরত্ব এবং রোমান্স 'রাজস্থানে' প্রচুর পরিমাণে পরিবেশিত হয়েছিল। ঐতিহাসিক ঔপন্যাসিক ও কাব্যকারবৃন্দ যথেচ্ছ টডের দ্বারস্থ হতে লাগলেন।"[১২]

মধুসূদনের রচিত সাহিত্যে বিষয়ের নির্বাচনে সর্বদাই মৌলিকত্ব পাওয়া যায় কিন্তু ঐতিহাসিক ট্রাজিডি রচনার জন্য তিনি সে যুগীয় সাহিত্যিক অনুসৃত গ্রন্থটিই বেছে নিয়েছিলেন।

কৃষ্ণকুমারীর আত্মদানের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এই ট্র্যাজিক নাটকটিতে যে সমস্যাচিত্র অঙ্কন করা হয়েছে তার সঙ্গে ব্যক্তিগত স্বার্থ ও বৃহত্তর স্বার্থের সংঘাত অনিবার্যভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। উদয়পুরের রাজকন্যাকে বিবাহের আশায় জয়পুরের রাজা জগৎসিংহ ও মরুদেশের অধিপতি মানসিংহের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব ঘনিয়ে এল উদয়পুরের ভবিষ্যৎ মানসম্মান ও স্বাধীনতারক্ষার জন্য কৃষ্ণার আত্মাহুতি তাতে অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ ঘটনায় দেশের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নই বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। শক্তিহীন রাজা দেশের সম্মানরক্ষায় অসমর্থ বলেই পরাধীনতার চেয়ে কন্যার মৃত্যুদণ্ডকেই কাম্য বলে বিধান দিয়েছেন। এই মর্মান্তিক চিত্রটিই এ নাটকের ট্র্যাজিক অংশ। রাজস্থানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি সর্বদাই সন্ত্রস্ত, যে কোন মুহূর্তে যবনশক্তি সবকিছু গ্রাস করতে পারে। প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্কেই দেশের এই দুরবস্থার চিত্র ফোটানো হয়েছে। জয়পুরের রাজা জগৎসিংহকে ঘরোয়া বিবাদ থেকে সতর্ক থাকার জন্যই মন্ত্রী পরামর্শ দিচ্ছেন,—

মন্ত্রী—ধর্মাবতার, এ কি ঘরাও বিবাদের সময়? দেখুন, দেশবৈরিদল চতুর্দ্দিকে দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে।

রাজা—আঃ, দেশবৈরিদল। তুমি যে দেশবৈরিদলের কথা ভেবে ভেবে একেবারে বাতুল হলে।··· ।প্রথম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক।

১২. বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, কলিকাতা, ১৯৬৩।

জগৎসিংহের কাছে দেশরক্ষার প্রসঙ্গটি গুরুত্ব পায়নি বটে কিন্তু উদয়পুরের রাজা ভীমসিংহকে দেশরক্ষার চিন্তায় অত্যন্ত বিব্রত হতে দেখছি।

যবন অধিকৃত ভারতভূমির পরাধীনচিত্র দেখে রাজা সখেদে বলেন,—

…এ ভারত ভূমির কি আর সে শ্রী আছে। এ দেশের পূর্ব্বকালীন বৃত্তান্তসকল স্মরণ হল্যে, আমরা যে মনুষ্য, কোনোমতেই ত এ বিশ্বাস হয় না…হায়! হায়! যেমন কোন লবণাম্বুতরঙ্গ কোন সুমিষ্ট বারি নদীতে প্রবেশ করো তার সুস্বাদ নষ্ট করে, এ দুষ্ট যবনদলও সেইরূপ এ দেশের সর্ব্বনাশ করেছে। [২য় অঙ্ক ১ম গর্ভাঙ্ক]

স্বাধীনচিত্ত ভীমসিংহ উদয়পুরের স্বাধীনতা রক্ষার চেষ্টায় সর্বস্বান্ত হলেও দেশের স্বাধীনতা রক্ষার প্রজ্জ্বলিত আশা পোষণ করেন। হীন চক্রান্তজাল সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রণ করেছে অথচ এর সত্যাসত্যতা রাজা ভীমসিংহ নির্ধারণ করতে পারেননি কিন্তু দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করেই তিনি অকূল সাগরে পড়েছেন। সামর্থ্যহীন রাজা আক্ষেপ করছেন,—

"আমার যদি এমন অবস্থা না হতো, তা হলে কি আর এঁরা এত দর্প কত্যে পারতেন? দেখ, আমার ধনাগার অর্থশূন্য, সৈন্য বীরশূন্য, সুতরাং আমি অভিমন্যুর মতন এ সপ্তরথীর মধ্যে যেন নিরস্ত্র হয়ে রয়েছি; তা আমার সর্ব্বনাশ করা কিছু বিচিত্র কথা নয়।" [পঞ্চম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

নিশ্চিত পরাজয় জেনেও রাজভ্রাতার স্বদেশরক্ষার জন্য শেষ চেষ্টা—"মহারাজের কিম্বা স্বদেশের হিতসাধনে, যদি আমার প্রাণ পর্য্যন্ত দিতে হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত আছি।" [ঐ]

স্বদেশচিন্তা ও বীররসের এমন দৃষ্টান্ত "কৃষ্ণকুমারী নাটকে" আরও মিলবে। কৃষ্ণকুমারীর আত্মদানের মূলেই স্বদেশচিন্তার প্রাধান্য। কৃষ্ণকুমারী যে চিতোর কন্যা। মৃত্যুমুহূর্তে অকুতোভয় আদর্শটি কৃষ্ণার মুখেই সার্থক সংলাপে রূপায়িত হয়েছে,—

কাকা, আমি রাজপুত্রী। রাজকুলপতি ভীমসিংহের মেয়ে। আপনি বীর-কেশরী। আপনার ভাইঝি। আমি কি মৃত্যুকে ভয় করি?

[পঞ্চম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাংক]

এই নির্ভীকতার আদর্শ রেনেসাঁ যুগেরই আবিষ্কার। কৃষ্ণার আত্মদানের সঙ্গে দেশের স্বার্থ ও স্বাধীনতারক্ষার মহৎ উদ্দেশ্য মিলিয়ে মধুসূদন এ নাটকের বক্তব্যকে সবিশেষ করে তুলেছেন। কৃষ্ণার আত্মদানের মধ্যে এই সুগভীর দেশার্তি আছে বলেই এ নাটকের ট্র্যাজিক রসের মহিমাও বেড়ে গেছে।

দেশপ্রেমই এ নাটকের মুখ্য অবলম্বন নয়। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও ষড়যন্ত্রের জালে যুদ্ধ সম্ভাবনা এসেছে অতর্কিতে—কিন্তু দেশের স্বাধীনতার রক্ষার প্রশ্নটিই শেষপর্যন্ত মুখ্য

হয়েছে। সুতরাং উদয়পুরাধিপতি ভীমসিংহ, রাজভ্রাতা বলেন্দ্রসিংহ ও রাজকুমারী কৃষ্ণার স্বদেশচিন্তার পরিচয় পাঠকের আন্তরিক সহানুভূতি ও স্বদেশচেতনা জাগিয়ে তোলে। বাংলা নাটকের ক্ষেত্রেও অভিনব নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন মধুসূদন ;—বিষয় নির্বাচনে, নাটকীয় সংলাপ রচনায় উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বাংলা নাটকে স্বদেশচেতনার আরোপ মধুসূদনের স্বাভাবিক বৈচিত্র্য সম্পাদনী বুদ্ধিরই অন্যতম প্রকাশ। কোন দ্বিধা না রেখেই বলা চলে, দেশচেতনার প্রথম উপলব্ধি নাট্যাকারে গ্রথিত করেন তিনিই। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দেই গোপনে "নীলদর্পণ" নাটক অনুবাদ করেছিলেন তিনি। তারই আগে কিংবা পরে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দেই "কৃষ্ণকুমারী" রচিত হয়। ১৮৬১ সালে এ দুটি নাটকই তিনি রচনা করেছিলেন। দেশচেতনা এ সময়ে তাঁর চিত্তে ক্ষণকালের জন্য হলেও স্থানলাভ করেছিল, কোথাও তা স্পষ্ট হয়নি বটে কিন্তু এ উপলব্ধি তাঁর সেকালীন প্রবনতার মধ্যে ধরা পড়েছিল। "নীলদর্পণ" অনুবাদের দুঃসাহসিকতার মূলেও দেশপ্রীতির প্রভাব ছিল এ কথা অনস্বীকার্য। প্রসঙ্গত বলা যায় ১৮৬১ সালেই 'মেঘনাদ বধ কাব্যের' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়। 'মেঘনাদবধ কাব্যেই' মধুসূদনের দেশচেতনার পূর্ণরূপ ধরা পড়েছিল। নাটক ও কাব্যে দেশোপলব্ধির প্রসঙ্গটি বার বার ঘুরে ফিরে এসেছিল এই সময়টিতে। এ সময়ের যাবতীয় রচনার মধ্যেই এই বিশিষ্ট অনুভূতির প্রকাশ দেখি। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই তিনি ইংলণ্ড গমনের উদ্যোগ শুরু করেন—সুতরাং এই চেতনাটি অন্য কোনভাবে পরিবর্ধিতরূপে প্রকাশ পায়নি।

রামনারায়ণ ও উমেশচন্দ্র মিত্রের সমাজপ্রেম থেকে যে নাট্যসাহিত্যের জন্ম—বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকায় সমাজসেবার সেই আদর্শ অবলম্বন করেই দীনবন্ধু রচনা করলেন "নীলদর্পণ"। সমাজ ও স্বদেশচিন্তার গভীরতা যে নাটকে প্রতিফলিত,—সহানুভূতির তীব্রতাই যে নাটকের উৎকৃষ্ট নাট্যরস সৃজনের সহায়ক,—সেই নাটকের স্বদেশপ্রেমী নাট্যকার দীনবন্ধুকে নিছক সামাজিক নাটক রচয়িতা বলে মনে করা যায় না। দীনবন্ধু সম্পর্কে সমালোচকবৃন্দ যে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন অধিকাংশ স্থলেই তা স্বদেশপ্রেমী দীনবন্ধুর কথা স্মরণ করেই। শুধু সামাজিক সমস্যা নয়, দীনবন্ধুর বিক্ষুব্ধচিত্তের বিদ্রোহবহ্নি বিদেশী শাসকের অন্যায় অত্যাচার দেখে ধূমায়িত হয়ে উঠেছিল। আন্তরিক বেদনাবোধের তীব্রতা থেকেই "নীলদর্পণের" পরিকল্পনা। একদিকে স্বজনপ্রেম ও দেশবাসীর প্রতি মমত্ববোধ অন্যদিকে অত্যাচারিত, লাঞ্ছিতদের মুখপাত্ররূপে বিদেশী অত্যাচারীদের মুখোস খুলে দেওয়ার রাজনৈতিক প্রচেষ্টা নাটকের মাধ্যমে সফল করে তোলার দূরদর্শিতা নিয়েই

দীনবন্ধুর আবির্ভাব। কিন্তু নাট্যকার দীনবন্ধুকে মাঝে মাঝে বড় শান্ত অবিচলিত মনে হয়। শুধু অন্তরভরা বেদনা নিয়ে কাতরোক্তিটুকু সম্বল করেই যেন বিনীত নাট্যকার রঙ্গমঞ্চে এসে ভূমিকাপাঠ করছেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তি থেকে শুরু করে তদানীন্তন গর্ভনর জেনারেলদের প্রসঙ্গে দীর্ঘ প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করেও দীনবন্ধু আত্মগোপন করেছিলেন কোন উদ্দেশ্যে? অথচ ইংরাজী সভ্যতার প্রতি বিমল অনুরাগের সাড়ম্বর প্রচার কার্য চালিয়েও ভবিষ্যতের সম্ভাবনার সত্যটি তিনি অনাবৃতভাবে প্রকাশ করেছেন। যে উদ্দেশ্যে "নীলদর্পণ" রচনা,—তার ভাবী ফলাফল ভূমিকাতেই ব্যক্ত করেছেন অকুতোভয়ে। অত্যাচারী নীলকর শাসক সংবাদপত্রের সম্পাদকের মুখ বন্ধ করেছে উৎকোচের সাহায্যে,—কিন্তু দীনবন্ধু সত্য উচ্চারণে দ্বিধা করেননি। "কিন্তু চক্রবৎ পরিবর্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ, প্রজাবৃন্দের সুখ সূর্যোদয়ের সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে।"

যে অভিজ্ঞতার বেদনা নিয়ে দীনবন্ধু নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন তার আশুফলাফলও তাঁর স্বচক্ষে দেখা। বাংলাদেশের নির্যাতিত চাষীদের বিক্ষুব্ধ প্রতিবাদের মধ্যেই দীনবন্ধু ভবিষ্যতের ছবি দেখেছিলেন। শাসক ও শোষিতের সংগ্রামে নির্বাক নাট্যকার দীনবন্ধু শুধু যথাযথ চিত্রটি তুলে ধরেছিলেন নিখুঁতভাবে। এ নাটকের বক্তব্য তাই বিক্ষুব্ধ নাট্যকারের আত্মকথা। এ অত্যাচার ও পীড়নের নির্মমতাই ঐতিহাসিক নিয়মে আত্মরক্ষার শক্তি জোগায়,—সেই জাগরণের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা দীনবন্ধু। এ নাটক তাই গণজাগরণের আশ্বাস নিয়ে এসেছিল, ভবিষ্যতের সুগভীর ব্যঞ্জনাবাণী এ নাটকের ভাষাতীত আবেদন। দীনবন্ধুর "সধবার একাদশী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা" আলোচনা কালে তাঁর পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্র মন্তব্য করেছিলেন,—

"দীনবন্ধুর এই সহানুভূতি ও পরদুঃখকাতরতা কেবল ব্যক্তি বিশেষের জন্য দৃষ্ট হইত, তাহা নহে। ইহা দেশের ও দশের জন্য সর্বদাই জাগ্রত ছিল। দেশের দুঃখ দেখিয়া তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল সেই ক্রন্দনের ফল—"নীলদর্পণ"। দশকে লইয়া সমাজ, সেই সমাজের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল—সেই ক্রন্দনের ফল "সধবার একাদশী"।[১৩]

এই মন্তব্যটি দীনবন্ধু সম্বন্ধে একটি প্রতিষ্ঠিত মতামত। দেশপ্রেমিক দীনবন্ধুর সচেতনতা দেশপ্রেমসর্বস্ব এ নাটক রচনার মূলেই বর্তমান। সুতরাং সামাজিক ও সাময়িক নাটক হিসেবে "নীলদর্পণ" আলোচিত হতে পারে কিন্তু নাট্যকারের

১৩. ললিতচন্দ্র মিত্র, সধবার একাদশী সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, সধবার একাদশী, ১৯১৯।

স্বদেশপ্রাণতা কোথাও অস্বচ্ছ নয়। সামাজিক কোন গতানুগতিক সমস্যা এটি নয়— নিছক সমাজ সংস্কারকের মনোবৃত্তিও নাট্যকারকে চালিত করেনি,—বিদেশী শাসনের যে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন "নীলদর্পণ" নাটকে তারই প্রতিফলন দেখি। নীলকর সাহেবদের মনোবৃত্তির মূলে দীনবন্ধু দেখেছিলেন প্রচণ্ড স্পর্ধা ও দুঃসাহস। শাসনের ভার এরা নিজেই তুলে নিয়েছে—এদেশীয় নিরীহ প্রজার ধন-মান নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকার এরা অবলীলাক্রমে পেয়ে এসেছে। এদেশের কর্তৃত্বলাভের জন্য কোন বাধাকেই এই হীন ও অর্থলোভী নীলকর সম্প্রদায় তুচ্ছ করেছিল,—আইন আদালত এদেরই স্বপক্ষে। নবীনমাধবের নায়কত্বে স্বরপুরের উত্তেজিত চাষীসম্প্রদায়ের নবজাগরণকে দমন করার পাশবিক উল্লাসে এরা মগ্ন। দীনবন্ধু এ জাগরণের মূলে একটি কারণ দেখিয়েছিলেন। বেগুনবেড়ের কুটিতে ধৃত সাধুচরণও রাইচরণকে কুটির দেওয়ান গোপীনাথ পরিচয় করিয়ে দেয়,—

"ধর্মাবতার, এই সাধুচরণ একজন মাতব্বর রাইয়ত, কিন্তু নবীন বসের পরামর্শে নীলের ধ্বংসে প্রবৃত্ত হইয়াছে।···ধর্মাবতার! পল্লীগ্রামে স্কুলস্থাপন হওয়াতে চাষালোকের দৌরাত্ম্য বাড়িয়াছে।" [১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]

পল্লীগ্রামে স্কুল স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে চাষালোকের দৌরাত্ম্য বাড়ার সংবাদটি নানা কারণেই অর্থপূর্ণ। স্বাধিকারের প্রশ্নকেই যদি আত্মজাগরণের প্রথম লক্ষণ বলে স্বীকার করি—সাধুচরণের মনেও সেই প্রশ্নই জেগেছিল। সাধুচরণই গোলোক বসুকে পরামর্শ দিয়েছিল—"কর্তা মহাশয়, আপনিও দেশের মায়া ত্যাগ করুন। গতবারে আপনার ধান গিয়েছে, এই বারে মান যাবে।" [১ম অংক, ১ম গর্ভাংক]

সাধুচরণ আর অজ্ঞ চাষী নয়—আত্মঅধিকারের দাবী সম্পর্কে সচেতন একটি মানুষ। "নীলদর্পণে" তোরাপ ও রাইচরণ অজ্ঞ ও অসহায়ের মত নিষ্ফল আক্রোশে মাথা কুটে মরেছে—কিন্তু সাধুচরণের সচেতনতা লক্ষ্যণীয়। চরম বিপদের মুহূর্তেও প্রজাপালক নবীনমাধবের সর্বনাশের কথা শুনে আর্তনাদ করেছে,—

"আমার বোধ হয়, নীলকর নিশাচরের অত্যাচারাগ্নি বড়বাবু আপনার পবিত্র শোণিতধারা নির্বাপিত করিলেন।" [৫ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]

পল্লীগ্রামের অজ্ঞ চাষীও ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন তুলতে পারে, এজন্য শিক্ষাকেই দায়ী করেছে নীলকর উড সাহেব,—'গবরণমেণ্টে এ বিষয়ে দরখাস্ত করিতে আমাদিগের সভায় লিখিতে হইবেক, স্কুল রহিত করিতে লড়াই করিব।' [১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]

এই ধৃষ্টতার মূলে শাসকোচিত বর্বরতা ছাড়া অন্য কিছু থাকতে পারে না। এই কারণেই নীলকর অত্যাচার সমর্থন পায়নি—এদের নগ্নতা দেখে শিহরিত হয়েছিল শিক্ষিত ও মার্জিতরুচি ইংরেজ। দীনবন্ধুর রচনা কৃতিত্বও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

"নীলদর্পণের" ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ ও ইংলণ্ডেও তা নিয়ে আলোচনা—প্রত্যক্ষ ভাবে নীলআন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছিল। অবশ্য এই অত্যাচারের ধূমায়িত প্রতিবাদ একদিন সশব্দে ফেটে পড়তই। কিন্তু তার আগেই নাট্যকার দীনবন্ধুর সাহিত্যিক প্রচেষ্টাই জয়ী হলো। নীলআন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলন বলা যায় না কারণ সীমাবদ্ধ অত্যাচারের সীমিত সমস্যার মধ্যেই তা পর্যবসিত ছিল। তবু শাসক-শাসিত বোধের আলোকে এই সমস্যা ও তার প্রতিকার চেষ্টার মধ্যে এক সুগভীর দ্যোতনা আছে। নিছক স্থানিক আন্দোলন হলেও নীল আন্দোলন বাংলাদেশে বিদেশী শাসকের বিরুদ্ধে প্রথম মুখর প্রতিবাদ। জাতীয় আন্দোলন বা স্বাধীনতা আন্দোলনের বক্তব্য আরও ব্যাপক ও বিস্তৃত বলেই নীল আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত উদ্দেশ্যটিকে বিরাট বক্তব্যের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু সর্বভারতীয় আন্দোলনের মূলে এই ধরণের স্থানিক আন্দোলনের কিছু ভূমিকা আছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বাহ্নে বাংলা দেশের আঞ্চলিক ও সীমিত আন্দোলনের মাধ্যমেই জনগণের সম্মিলিত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। "নীলদর্পণ" নাটক রচনার মূলে দেশানুরাগের আদর্শ বর্তমান। এ প্রসঙ্গে সমালোচক শ্রীসুকুমার সেনের মন্তব্য, "দীনবন্ধুর নাটকে সর্বপ্রথম দেশের শাসক-শাসিতের নিগূঢ় সম্বন্ধ, দেশের অর্থনৈতিক শোষণের কুৎসিত রূপ, সভ্যনামিক মানুষের বর্বর অন্তর, উদ্ঘাটিত হইল।—"নীলদর্পণে" সমগ্র দেশের মর্মবেদনার প্রকাশ হওয়ায় দেশে যে সাড়া পড়িল তাহা ইতিপূর্বে কখন ঘটে নাই।"[১৪]

নীলদর্পণের অভিনয় রঙ্গমঞ্চ ইতিহাসের আলোড়নকারী পৃষ্ঠারূপে পরিগণিত হবে। ১৮৭২ শনের ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল থিয়েটরের দ্বারোদ্ঘাটনের সূচনা হয়েছিল দীনবন্ধুর 'লীলাবতী' নাটকের অভিনয় দিয়ে, কিন্তু "নীলদর্পণই" ন্যাশনাল থিয়েটরের প্রথম অভিনয়। এই অভিনয়ের সূত্র ধরেই সমস্ত পত্রপত্রিকায় "নীলদর্পণ" নাটকের অভিনয় সম্পর্কিত আলোচনার ঝড় বয়ে গেল। "বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে" শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় এ সম্পর্কে যে বিস্তৃত বিবরণ পরিবেশন করেছেন, "নীলদর্পণের" অভিনয়-এর সমস্ত সংবাদও সেখানে উল্লিখিত হয়েছে।

থিয়েটরের "ন্যাশনাল" নামকরণ নিয়ে যখন তুমুল বাদ-প্রতিবাদের সূচনা হলো, 'নীলদর্পণের' অভিনয় প্রসঙ্গে 'ন্যাশনাল পেপার'-সম্পাদক নবগোপাল মিত্র অভিনন্দন জানালেন,—

---

১৪. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় খণ্ড, বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬২। পৃঃ ৭০।

"The event is of national importance."[১৫]

॥ ন্যাশন্যাল পেপার। ১১ই ডিসেম্বর ১৮৭২ ॥

'অমৃত বাজার পত্রিকায়' 'নীলদর্পণের' অভিনয় প্রসঙ্গের ব্যাখ্যাটিও সময়োচিত হয়েছে—"শ্বেতাঙ্গগণের পক্ষপাতত্ব ও অত্যাচার অনেকেই মধ্যে মধ্যে দেখিতেছেন কিন্তু তথাপি সেই সকল কার্য রঙ্গভূমিতে অভিনীত দেখিলে এক অপরূপ মনোভাব মনোমধ্যে প্রকটিত হইতে থাকে।" ॥ অমৃত বাজার, ১৪ই ডিসেম্বর ১৮৭২ ।

উল্লেখযোগ্য সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে "Englishman" পত্রিকার ২০শে ডিসেম্বর ১৮৭২, সংখ্যায়। 'নীলদর্পণ' নাটকের প্রকাশ্য অভিনয় যে সত্যিই বিপজ্জনক এ ব্যাপারে ভবিষ্যতবাণী করে ইংলিসম্যান মন্তব্য করেছিল,—

A native paper tells us that the play of "Nil Darpan" is shortly to be acted at the National Theatre in Jorasanko. Considering that the Revd. Mr. Long was sentenced to one month's imprisonment for translating the play, which was pronounced by the High Court a libel on Europeans, it seems strange that Government should allow its representation in Calcutta, unless it has gone through the hands of some competent censor and the libellous parts been excised.[১৬]

এ সব আলোচনা থেকেই স্পষ্টতই বোঝা যায় এ অভিনয় জনমনে আলোড়ন সৃষ্টিতে সমর্থ হয়েছিল। "জাতীয় নাট্যশালায়" জাতীয় চেতনা জাগানোর একটা অর্থবহ ইঙ্গিত রূপেই যেন 'নীলদর্পণের' অভিনয় হলো। নবগোপাল মিত্রের 'ন্যাশনাল পেপার' 'নীলদর্পণ' অভিনয়ের প্রসঙ্গে যে মন্তব্য করেছে—তার তাৎপর্যটিও লক্ষ্যণীয়। এ অভিনয়কে নাট্যজগতের একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা বলেই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন তিনি। 'নীলদর্পণের' অভিনয় থেকেই রঙ্গমঞ্চ ও আমাদের জাতীয় জীবন একসূত্রে গাঁথা হলো। পরবর্তী যুগে নাট্যশালা স্বাধীনতা আন্দোলনে ও জাতীয় চেতনাসঞ্চারে যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল,—১৮৭২ সালের শুভসূচনায় তা আভাষিত হয়েছিল। বাংলা দেশে নাট্যাভিনয়ের সঙ্গে জনজীবনের সংযোগ সাধনেও দীনবন্ধু মিত্র উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করলেন। সশ্রদ্ধ চিত্তে একথা স্মরণ করেছিলেন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়,—"দীনবন্ধুর নিকট বঙ্গীয়

১৫. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। তৃতীয় সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত।

১৬. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। তৃতীয় সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত।

নাট্যশালার ঋণ অপরিশোধ্য। দীনবন্ধুর নাটক না থাকিলে ন্যাশনাল থিয়েটরের এত প্রতিষ্ঠা হইত কি না সন্দেহ।"[১৭]

"নীলদর্পণের" প্রকাশ থেকেই যে আলোড়ন বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল পরবর্তী কালে তা থেকেই নীল আন্দোলনের শুরু। বাংলাদেশের এই আন্দোলনটির অবিমিশ্র ফলাফল আশাপ্রদ। পাদরী লং-এর মত বিদেশীকেও দীনবন্ধু দলে টানতে পেরেছিলেন—তাঁর অকুতোভয় সমালোচনাশক্তি ও দুর্জয় সাহস জাগানোর মূলেও 'নীলদর্পণের' মত একটি স্বচ্ছদর্পণের প্রয়োজন ছিল। ভয়াবহ অত্যাচারের হাত থেকে অসহায় মানুষের আপাতঃ উদ্ধারের শুভ উদ্দেশ্যেই এটি লেখা। সমগ্র ইংরাজ জাতির প্রতি দীনবন্ধুর জাতীয়চেতনাজাত কোন বিদ্বেষ ছিল না। সে যুগেও পরার্থপর ইংরেজের উজ্জ্বল উদাহরণ অনেক শিক্ষিত মানুষকেই আচ্ছন্ন করেছিল—দীনবন্ধু তার ব্যতিক্রম নন। তিনি একশ্রেণীর লোভী ব্যবসায়ীদের নির্মমতা প্রত্যক্ষ করেই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন নতুবা ইংরাজ প্রশস্তি ও ইংরাজমুগ্ধতা দীনবন্ধুর মনে অন্য কোন বৃহত্তর বাসনা জাগানোর পক্ষে মোটেই অনুকূল ছিল না। এই ইংরাজপ্রীতি ও স্বদেশপ্রীতির দ্বৈত অস্তিত্ব একই মনে বাসা বেঁধেছিল—সেও নিতান্তই বাস্তব অভিজ্ঞতার ফলে। দীনবন্ধু সমগ্র ইংরাজ জাতির সদ্‌গুণের প্রশংসা থেকে মুহূর্তের জন্য বিরত ছিলেন না,—ভূমিকায় তারই পরিচয় মেলে,—

—হে নীলকরগণ! তোমাদিগের নৃশংস ব্যবহারে প্রাতঃস্মরণীয় সিডনি, হাউয়ার্ড, হল প্রভৃতি মহানুভব দ্বারা অলংকৃত ইংরাজকুলের কলঙ্ক রটিয়াছে। তোমাদিগের ধনলিপ্সা কি এতই বলবতী যে তোমরা অকিঞ্চিৎকর ধনানুরোধে ইংরাজ জাতির বহুকালার্জিত বিমল যশস্তামরসে কীট স্বরূপে ছিদ্র করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ।"

ইংরাজ জাতির চরিত্রগুণাচ্ছন্ন দীনবন্ধু স্বরপুর গ্রামের শিক্ষিত পরিবারের কর্ত্রী সাবিত্রীর মুখেও অনুরূপ সংলাপ আরোপ করেছেন,—

"নীলকর সাহেবেরা সব কর্ত্তে পারে, তবে যে বলে সাহেবেরা বড় সুবিচার করে, আমার বিন্দু যে সাহেবদের কত ভাল বলে, তা এরা কি সাহেব না, না এরা সাহেবদের চণ্ডাল।" ॥ প্রথম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক ॥

তবু স্বদেশবাসীর অসহায় রূপটি প্রত্যক্ষ করে দীনবন্ধু চঞ্চল হয়েছিলেন। সহানুভূতি ও আন্তরিকতায় যে চরিত্রগুলো উজ্জ্বল—দীনবন্ধুর একটু অসাবধানতায়

১৭. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। তৃতীয় সংস্করণ।

তা প্রাণহীন হতে পারত। ভদ্রেতর চরিত্রের ব্যর্থতা থেকেও নিপীড়িত প্রজাকুলের আর্তনাদ যেন দীনবন্ধুর মর্মতল আলোড়িত করেছিল। সুতরাং 'নীলদর্পণ' যে সাধারণ মানুষের দিনযাপনের-প্রাণধারণের প্রত্যক্ষ গ্লানিরও দর্পণ তাতে সন্দেহ নেই। ইংরাজপ্রীতির প্রসঙ্গটি ভূমিকাকারে ব্যক্ত হয়েছে বটে,—সাধারণ পল্লীবাসীর অসহায়ত্ব প্রচারে অনেক বেশী দক্ষতা ও সহমর্মিতার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি। সুতরাং প্রকাশ্য ইংরাজপ্রীতির ভূমিকাটুকুর আড়াল না থাকলে দীনবন্ধু এ নাটক বাংলাতেই প্রকাশ করতে,—প্রচার করতে পারতেন কি না সন্দেহ। এ সব অন্তর্নিহিত মনোভাবের ব্যাখ্যাকালে স্বদেশপ্রেমী দীনবন্ধুর আত্মাটিকেই যেন আবিষ্কার করি। নাটকে দীনবন্ধুর স্বাদেশিকতা অন্তঃসলিলা হলেও প্রকাশ্যভাবে তা দীনবন্ধুর একটি কবিতাতে পাওয়া যাচ্ছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ডিউক অফ্ এডিনবরার কলিকাতা আগমন উপলক্ষ্যে দীনবন্ধু 'লয়ালটি লোটাস' কবিতাটি রচনা করেন। তবে একটি স্তবকে অন্তর্নিহিত বেদনাটি শ্রদ্ধাকারে ঘোষণা করেছিলেন দীনবন্ধু,

রাজপুত্র সিংহাসনে, বড় শুভদিন,
কে বলে ভারতে আর স্বাধীনতা হীন ?
আপন নয়নে তুমি, দেখিলে ভারত ভূমি,
আনন্দ সাগরে সব দেখিলে বিলীন ;
বলিবে বিলাতে গিয়ে শুভ-সমাচার,
ভাসিয়াছে ভারতের ভক্তি পারাবার।

স্বাধীনতা শব্দটির অর্থ জেনেই কবি প্রশ্ন করেছিলেন—'কে বলে ভারতে আর স্বাধীনতাহীন ?'—যারা ভারতবর্ষ পরাধীন বলে আক্ষেপ ও হতাশা পোষণ করেন—কবি প্রত্যক্ষভাবে তাদেরই উত্তর দিয়াছেন এই অংশটিতে। রাজরোষের হাত থেকে আত্মরক্ষার এ বিচিত্র কৌশলটি সে যুগের সাহিত্যে বারবারই দেখা গেছে। তাই 'নীলদর্পণের' আগাগোড়া জাতীয় চেতনায় উদ্দীপিত হয়েও দীনবন্ধু ভূমিকায় ইংরাজ প্রশস্তি না করে পারেননি।

"সধবার একাদশীতে"-ও সমাজচেতনার প্রতিফলন রয়েছে,—মধুসূদনের "একেই কি বলে সভ্যতার" সমাজচিন্তা প্রায় দেশচিন্তার গভীরতা বহন করছে। "সধবার একাদশীতে" নিমচাঁদের অধঃপতনে যে সহানুভূতি সঞ্চারে সিদ্ধ হয়েছেন দীনবন্ধু—তার মূলে রয়েছে শিক্ষিত বিপথগামী যুবকচরিত্র অনুসন্ধান। ইয়ংবেঙ্গলের আভ্যন্তরীণ রূপটি মধুসূদন তুলে ধরেছিলেন, দীনবন্ধু একটি প্রতিভাবান ইয়ংবেঙ্গল সভ্যের অপমৃত্যুর ইতিহাস রচনা করেছেন। এই ইতিহাস অধঃপতনের আলোকে

আত্মবিশ্লেষণের সুযোগদান করেছে। সমাজ-সংস্কারের ব্রত ও স্বদেশপ্রেমিকতায় পার্থক্য থাকতে পারে—কিন্তু সমাজের হিতকামনায় যে লেখক একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কনের সামর্থ্য অর্জন করেছেন তিনি নিশ্চয়ই স্বদেশপ্রেমিক। নিছক সমাজচিন্তার সঙ্গে সাহিত্যিককের সমাজ চিন্তার পার্থক্য এখানেই। তিনি ব্যক্তিগত চিন্তাকে সর্বজনীন চিন্তায় পরিণত করেন। এ প্রসঙ্গে নাট্যকার দীনবন্ধু সম্পর্কে তাঁর পুত্রের উক্তিটিকে অত্যুক্তি বলা চলে না,—"দশকে লইয়া সমাজ, সেই সমাজের জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়াছিল—সেই ক্রন্দনের ফল—"সধবার একাদশী"—মধুসূদন ও দীনবন্ধুর সমাজ-চিন্তার মধ্যে যে প্রত্যক্ষ স্বদেশভাবনার পরিচয় ছিল অন্যান্য নাট্যকারদের রচনায় তা ধরা পড়েনি। অথচ সে যুগের কবিসম্প্রদায় নানাভাবে স্বদেশচিন্তাবিষয়ক কাব্য, কবিতা লিখেছিলেন। বস্তুতঃ জাতীয়চেতনার সুপ্ত ধারা কাব্যের আত্মায় প্রতি-বিম্বিত হয়েই স্বদেশচিন্তার স্ফুরণ ঘটায়। রঙ্গলাল থেকে নবীনচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা কাব্যে একটি সুরই ঝঙ্কৃত হয়েছিল, সাধারণ ভাবে তার নাম দেওয়া যায় স্বদেশপ্রেমের সুর। বাংলা নাটকে স্বদেশচিন্তার যথার্থ প্রতিফলন দেখেছি সাধারণ রঙ্গালয় স্থাপনেরও পরে। ১৮৭২ সালের পাবলিক থিয়েটরের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই জন-চেতনার সঙ্গে নাটকের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা দেখা দেয়। ইতিপূর্বে নিতান্ত ব্যক্তিগত রঙ্গমঞ্চে নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীর মনোমত নাটক রচনা ও অভিনয়ের আয়োজনই বেশী দেখা যায়। অবশ্য দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' ও 'সধবার একাদশী' নাট্যকারের মহৎ প্রেরণাসঞ্জাত সৃষ্টি। ১৮৭২ সালে সর্বজনীন রঙ্গালয়ে 'নীলদর্পণই' প্রথম অভিনয় যোগ্য সৃষ্টি বলে অভিনন্দিত হয়েছিল। সুতরাং নাটকে স্বদেশপ্রেমের মত সেকালীন মনোভাবপুষ্ট একটি আন্তরিক ভাবনাকে যথাযথভাবে রূপদানের প্রয়োজনীয়তার সঙ্গে রঙ্গমঞ্চেরও যোগাযোগ রয়েছে। জনগণের অর্থানুকূল্যে যে রঙ্গমঞ্চ পরিচালিত হয়,—জনমনের সংবাদ সেখানে রাখতেই হয়। হিন্দুমেলার জাতীয়তার উদ্বোধন চেষ্টার প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা দিয়েছিলো জাতীয় রঙ্গমঞ্চে—স্বদেশ ভাবানুপ্রাণিত নাটকের অভিনয়ে। সুতরাং এ ধরণের নাটকাভাবও বিদগ্ধ ব্যক্তিদের ভাবিয়ে তুলেছিল। এধরণের নাটকের প্রয়োজন যাঁরা প্রথম উপলব্ধি করেন তাঁরা নাট্যালয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এই সময়ে রঙ্গমঞ্চে দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ' ছাড়াও 'সধবার একাদশী', লীলাবতী', 'জামাইবারিক', বিয়েপাগলা বুড়ো', 'নবীন তপস্বিনীর' অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু নিছক প্রহসনের অভিনয় দেখে তৃপ্ত হয়নি রসিকসমাজ। জাতীয় নাট্যসমাজ সম্পর্কে দীর্ঘ সমালোচনায় অমৃত বাজার পত্রিকার মন্তব্যও লক্ষ্যণীয়। নাট্যশালা স্থাপন ও নাট্যাভিনয়ের আদর্শ সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় সমালোচনায় স্বদেশীয়ানার মনোভাবটি চোখে পড়ে।

"যখন 'জাতীয়' বিশেষণটি ধারণ করা হইয়াছে, তখন যাহাতে সেই গুরু বিশেষণের মর্যাদা থাকে, সর্বতোভাবে তাহার চেষ্টা পাওয়া উচিত। তাহা করিতে গেলে প্রথমতঃ এমন বিষয় নির্বাচন করা এবং সেই বিষয়কে এমন ভাবে লিপিবদ্ধ করা চাই, যাহাতে আমোদ ও কৌতুক ব্যতীত সন্নীতি শিক্ষা হয়। যাহাতে স্বদেশের বিশেষ বিশেষ পূর্ব ঘটনা ও বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত স্থানীয় জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়া স্বদেশস্থ লোকের মনপ্রাণ স্বদেশানুরাগে প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তেজিত হয়।"[১৮]

নাটক যে শক্তিশালী জনমানস সংগঠনের মাধ্যম, প্রথম যুগের নাট্যরসিকরাই তা বুঝেছিলেন। এমন প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও সমালোচনার নির্ভীক ভঙ্গিটি সত্যই প্রশংসনীয়। পরবর্তী কালে রঙ্গমঞ্চের অভিনয় জাতীয় আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য প্রেরণা দান করেছিলো। নাট্যকারগোষ্ঠী সেদিন বিষয় নির্বাচনে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। দেশাত্মবোধের অনুভূতি বিস্তারের এ অভিনব সুযোগ দান করেছিলেন নাট্যকার, নাট্যাভিনেতা ও রঙ্গমঞ্চের কর্ণধারগণ। 'মধ্যস্থ' পত্রিকার মন্তব্য,—

"যদিও এই নাট্যশালা সাপ্তাহিক ও কখনো কখনো অর্দ্ধসাপ্তাহিক রূপে কলিকাতার মধ্যে একটি বিশেষ আমোদ ও কৌতুকের স্থান হইয়াছে, কিন্তু তদ্ব্যতীত অন্য উচ্চতর উদ্দেশ্য যে অধ্যক্ষগণের আছে, তাহা এ পর্যন্ত আমরা দেখিতে পাইলাম না। যে আমোদ দিতেছেন, তাহাকেও সম্পূর্ণ রূপে বিশুদ্ধ আমোদ বলা ভার। কয়েক রজনীতে এমন সকল নাটকাংশের অভিনয় হইয়াছে, যাহা ত্যাগ করাই উচিত ছিল। "জাতীয় নাট্যসমাজ" এই নামটি অতি উচ্চ। এই নাম ধারণ করাতে তাঁহাদের নিকট কেবল আমোদ ব্যতীত আরো যে উচ্চ আশা আছে, এবং তাহারাও যে সে আশা পূরণের আশা দিয়েছিলেন এখন কি তাহা ভুলিয়া গেলেন?[১৯]

এই নির্ভীক সমালোচনাই নাট্যকার ও রঙ্গালয়ের কর্ণধারদের সচেতন করেছিলো। নিছক প্রহসনের সঙ্গে ক্ষুদ্র রূপক নাট্য ['mask'] যোগ করে অভিনয়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি করার কৌশলটি আবিষ্কার করলেন নাট্যালয়ের পরিচালকবর্গ। দীনবন্ধুর "জামাই বারিক" প্রহসন অভিনয়ের সঙ্গে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারত মাতা" নামক ক্ষুদ্র রূপকনাটিকাটিও অভিনীত হয়েছিল এভাবে। প্রহসনের অনাবিল হাস্যরসের সঙ্গে দেশভাবনার যোগ স্থাপন করে নাট্যাভিনয়ের গুরুত্ব বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। যিনি এই অতিরিক্ত নাটকের রচনাকার, নাট্যালয়ের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ

১৮. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস। তৃতীয় সংস্করণ থেকে উদ্ধৃত।

১৯. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাসে তৃতীয় সংস্করণ থেকে মুদ্রিত।

কাজে এবং অভিনেতারূপেও তাঁর একটি পৃথক পরিচয় রয়েছে। সংবাদপত্রের সমালোচনা সম্বল করে যাঁদের পথ চলতে হয়—তাদের হয়ত এ ধরণের কৌশল অবলম্বন করাই স্বাভাবিক, কিন্তু এখানে দেশভাবনার উল্লেখযোগ্য প্রকাশ দেখে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। স্বদেশচিন্তার গভীরতাই এই ছোট নাটিকার মধ্যে প্রতিফলিত। স্বদেশপ্রেমের অনুভূতি সৃজনে এই ছোট নাটিকাটির অবদান বড় কম নয়। আসল নাটকের সমালোচনার সঙ্গে এই ক্ষুদ্র নাটিকার আলোচনা প্রসঙ্গে অমৃতবাজার বলেন,—

"গত শনিবার ন্যাশন্যাল থিয়েটরে "জামাই বারিক" প্রহসন অভিনয়ের পর "ভারত-মাতার" একটি দৃশ্য প্রদর্শিত হইয়াছিল। দৃশ্যের কৃতকার্যতা সম্বন্ধে আমরা এই বলিতে পারি যে, উহা দেখিয়া শ্রোতৃবর্গ প্রকৃত প্রস্তাবে মোহিত হইয়াছিলেন। কোন অভিনয়ে পঞ্চশতাধিক লোকের ১৫ মিনিটকাল পর্যন্ত এরূপ আগ্রহ ও স্তম্ভিতভাব আমরা কখন প্রত্যক্ষ করি নাই। শ্রোতৃবর্গের দীর্ঘনিশ্বাস ও রোদন-ধ্বনিতে কেবল মধ্যে মধ্যে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল। সেদিন ন্যাশনাল থিয়েটারে যাঁহারা উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেখান হইতে এমন একটি ভাব অর্জন, ও এমন একটি শিক্ষা লাভ করিয়া আসিয়াছেন, যাহা কস্মিন কালে বিনষ্ট হইবে না।"[২০]

'ভারতমাতার' অভিনয় প্রসঙ্গে অমৃত বাজার পত্রিকার মন্তব্যে বিচক্ষণতা ও দূরদর্শিতাই ধরা পড়েছে। দর্শকের মনোমত পরিবেশ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল নাটিকাটি, এবং এই অভিনয়ের আলোচনা থেকে সে যুগের দর্শকসমাজের চরিত্রও স্পষ্ট হয়ে উঠে। কিন্তু নাটিকাটিতে উচ্চাঙ্গের নাটকীয় কৌশলের হাস্যকর প্রয়োগ রয়েছে,—দুর্বল কল্পনা ও গভীর ভাবাবেগই স্রষ্টার মূলধন। অথচ এই তুচ্ছতম সৃষ্টিও দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিল,—এ থেকেই সে যুগের দর্শকদের চাহিদার খতিয়ান করা চলে। হিন্দুমেলার জাতীয়ভাবটি জনমনে দৃঢ় আসন লাভ করেছিল, —তারা দেশের জন্য চিন্তা করতে শিখেছিল।—দেশের দুরবস্থার চিত্র দেখে সচেতন হবার একান্ত প্রয়াসের সাধনায় মগ্ন ছিলেন সে যুগের শিক্ষিত সমাজ। দর্শক হিসেবে 'ভারতমাতার' অন্তর্নিহিত সত্যটি তারা অনুধাবন করতে পেরেছিলেন,—নাট্যকার ও রঙ্গালয়পরিচালক উভয়ের কাছেই এটি একটি সংবাদ। কারণ এর ঠিক অব্যবহিত পরেই দেখব ক্ষুদ্র নাটিকাকারে নয়, পূর্ণাঙ্গ নাটকাকারেই স্বদেশপ্রেম সম্বল করে দেশপ্রেমী নাট্যকারের আবির্ভাব লগ্ন সমাগত। সুতরাং "ভারতমাতা" সৃষ্টি হিসেবে ব্যর্থ হলেও স্রষ্টা হিসেবে নাট্যকার কিরণচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়ের নাম এ প্রসঙ্গে

২০. ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্গীয় নাট্যশালার ইতিহাস তৃতীয় সংস্করণ থেকে মুদ্রিত।

স্মরণীয় হয়ে থাকবে। বাংলা নাটকে স্বদেশপ্রেম প্রবর্তনের প্রথম প্রয়াস তাঁরই। ক্ষুদ্র নাটিকাটিতে তিনি স্বদেশের একটি নিখুঁত রূপ ফোটানোর চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তাতে কিছু অসুবিধা আছে বলেই রূপকাকারে বক্তব্যটি স্পষ্ট করেছেন তিনি।

নাটিকাটির উৎসর্গপত্রে নাট্যকার মহারানী স্বর্ণময়ী দেবীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,—"এক্ষণে আমি দুঃখিনী ভারতমাতাকে সন্তানগণের সহিত আন্তরিক আহ্লাদ ও যত্নের সহিত আপনার কোমল করে অর্পণ করিলাম।"[২১]

এ আবেদনটি অতি করুণ। ভারতমাতার প্রসঙ্গে দুঃখিনী বিশেষণটির প্রয়োগে নাট্যকার ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর আন্তরিক অনুভূতির সংবাদটি জ্ঞাপন করেছেন। পরাধীনা জননীকে দুঃখিনী বলেই কল্পনা করেছিলেন সে যুগের কবিসম্প্রদায়। নাট্যকার শুধু কাব্যিক কল্পনাটিকেই মূর্তিমতী দুঃখিনীরূপে জনগণের সামনে উপস্থিত করেছিলেন। নাট্যকারের পরিকল্পনার মূলেই দেশচেতনার সুগভীর স্পর্শ অনুভব করা যায়। জাতীয় নাট্যশালায় বিদগ্ধ ও উৎসুক দর্শকের চিন্তা ও দেশানুভব জাগানোর সচেতন প্রয়াস এ নাটিকা রচনার মূলে রয়েছে। নাটক আরম্ভ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সূত্রধারের প্রবেশ ও বর্ণনীয় বিষয়ের আভাসদানের চেষ্টাটিও লক্ষ্যণীয়। সূত্রধার উদ্দেশ্যের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছে,—

"ভারত-ভূমির ও ভারত সন্তানগণের বর্তমান দুরবস্থা প্রদর্শনই ভারতমাতার উদ্দেশ্য। যদ্যপি সমাগত সুধীমণ্ডলীর একজনও এই অভিনয় দর্শনে ভারতমাতার দুঃখ দূর করতে একদিন যত্ন পান, তাহা হলেই আমার ও গ্রন্থকর্তার শ্রমসফল।"

এ উদ্দেশ্যটিই দেশপ্রেমাত্মক। ভারতমাতার যে ভয়াবহ রূপ তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, দর্শকের দেশপ্রেম জাগানোর পক্ষে সেটুকুই যথেষ্ট। কিন্তু সেই বিশুদ্ধ স্বদেশানুভূতির প্রেরণায় এগিয়ে এসে দেশমাতৃকার দুঃখমোচনের ব্রতপালন করতে হবে—এই আহ্বান বাণী ধ্বনিত হয়েছে সূত্রধারের বক্তব্যে। সমগ্র নাটিকাটিতে নাট্যকার মহাখেদে ভারতবাসীর দুঃখ দৈন্যের চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। ভারতমাতা স্বয়ং একটি চরিত্র রূপে কল্পিত। ভারত লক্ষ্মীকেও একটি পৃথক চরিত্র রূপে কল্পনা করা হয়েছে। ভারতের অবর্ণনীয় লাঞ্ছনার বর্ণনা না দিয়ে নাট্যকার সংগীতের আশ্রয় গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া আলোক-সম্পাতের ইঙ্গিতটুকুও রয়েছে। মঞ্চ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতার সাহায্যেই এ ধরণের প্রত্যক্ষ নির্দেশ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। নাট্যকার যেন পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের দর্শকচিত্তের গোপন সংবাদ নিয়েই দৃশ্য সাজিয়েছেন। সংগীতের মাধ্যমে বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করারও সুবিধা হয়েছে।

২১. কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতমাতা ১৮৭৩

হিমালয় পর্বতের ওপরেই ঘটনাস্থল পরিকল্পিত। ভারতমাতার চিন্তামগ্না রূপটি প্রথম দৃশ্যেই দেখা যাবে। নিদ্রিত ভারতসন্তানদের সামনে মূর্তিমতী বেদনারূপিনী এই ভারতমাতা। ভারতলক্ষ্মীর প্রবেশের সঙ্গেই সঙ্গীত আরম্ভ হয়। স্বদেশী-সঙ্গীতের বক্তব্য আমরা ইতিপূর্বেই বহু দেশপ্রেমমূলক কবিতায় পেয়েছি। তবু দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের একটি বিশেষ আবেদন রয়েছে। হিন্দুমেলায় দেশাত্মবোধক কবিতা পঠিত হোতো,—দেশাত্মবোধক সঙ্গীত প্রচারের ব্যবস্থাও ছিল। নাট্যকার কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দুমেলার দ্বারাই প্রভাবিত। জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক রচনার প্রথম শুরু 'ভারতমাতা' রূপক নাটিকায়,—দেশাত্মবোধক সঙ্গীতের আরোপও সর্বপ্রথম এ নাটিকায় দেখি। ন্যাশনাল থিয়েটরে দেশাত্মবোধক নাটকের সর্বপ্রথম অভিনয় এটি এবং সেকারণেই দর্শকের অভিনন্দন লাভে ধন্য হয়েছিলেন নাট্যকার। ১৮৭৫ সালে মনোমোহন বসু "হরিশচন্দ্র" নাটকে স্বদেশী সঙ্গীত আরোপ করেছিলেন। হিন্দুমেলার অন্যতম উদ্যোক্তা হিসাবে এ সব সঙ্গীত তাঁকে লিখতে হয়েছিল।—পরবর্তীকালে পৌরাণিক নাটকে কালানৌচিত্য দোষ ঘটিয়েও তিনি স্বরচিত স্বদেশী-সঙ্গীত আরোপ না করে পারেননি। স্বদেশীয়ানার জোয়ার এভাবেই সে যুগের সমস্ত ভাবুক ও কবি সম্প্রদায়ের হৃদয় অধিকার করেছিল। নাট্যকার কিরণচন্দ্রের কৃতিত্ব এই যে, তিনি উপযুক্ত ক্ষেত্রেই দেশাত্মবোধক সঙ্গীত আরোপ করেছিলেন।

সঙ্গীতের বক্তব্যটি নাট্যকারেরই গভীর দেশানুভূতির ফলমাত্র। হিমালয়ে ভারতমাতার শোকমগ্না রূপটি ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যেই সঙ্গীতটি গীত হয়।

মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি
রাত্র দিবা ঝরিছে লোচন বারি

দেখগো ভারতমাতা তোমারি সন্তান
ঘুমায়ে রয়েছে সবে হয়ে হতজ্ঞান ॥
সবে বলবীর্যহীন, অন্ন বিনা তনুক্ষীণ ;
হেরিয়ে এদের দশা বিদরিয়ে যায় প্রাণ।

* * *

এ দুঃখ যন্ত্রণা হতে কররে মোরে উদ্ধার।
হইয়ে তোদের জননী, পরাধীনা অভাগিনী,
এ জ্বালা সহে না প্রাণে হর দুঃখ হর হর।
স্বাধীনতা মহাধন বলনারে কি কারণ
লভিবারে বাছাধন হও না কেন তৎপর ॥

স্বয়ং ভারতলক্ষ্মীর উক্তি বলে সঙ্গীতটির আবেদন গভীর তাৎপর্য বহন করছে। ভারতমাতা ও ভারতলক্ষ্মীকে চরিত্র হিসেবে কল্পনা করে নাট্যকার দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। সম্পূর্ণ কাল্পনিক হলেও বিষয়টির সঙ্গে সেকালীন চেতনার যোগাযোগ অত্যন্ত গভীর। দেশমাতাকে বন্দনা করেই বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৭০ সালে "কমলাকান্তের দপ্তরে" "আমার দুর্গোৎসব" প্রবন্ধটি রচনা করেন। দুর্গোৎসবে তিনি দুর্গাপ্রতিমার পরিবর্তে দেশজননীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন।

"এই কি মা? হ্যাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিনী—অনন্তরত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভেনিহিতা।"

কিন্তু নাট্যকার দেশজননী ভারতমাতাকে দর্শকের সামনে এনেছেন। প্রাণময়ী, সচলা কিন্তু বেদনার প্রতিমূর্তি ভারতমাতা স্বয়ং লোকচক্ষুর সামনে উপস্থিত হয়েছেন। ভারতমাতার আর্তনাদে সমগ্র দর্শক অশ্রুসজল,—

হায়, হায়, হায় কি ছিলেম, কি হলেম, একদা আমার পুত্রগণের যশঃসৌরভে এই ভারতভূমি চিরপরিপূর্ণ ছিল, বাহুবলে সসাগরা, সদ্বীপ ধরিত্রীর একাধিপত্য কোরেছিল, দ্বাদশবর্ষীয় বালকগণও অকুতোভয়ে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে কালান্তক কালসদৃশ বৈরিদলকে মুহূর্তমধ্যে শমন-দমনে প্রেরণ কোরতো, রমণীগণও স্বীয় অলৌকিক শৌর্যবীর্যাদির দ্বারা বন্দী স্বামীগণকে উদ্ধার কোরতো⋯"

ভারতের এই অতীত সমৃদ্ধির ইতিহাস অসংখ্য দেশাত্মবোধক কবিতার বিষয় হয়েছে। কিন্তু স্বয়ং ভারতমাতা মঞ্চে অবতীর্ণ হয়ে দেশবাসীর সামনে দুরবস্থার করুণ বিবরণ দিয়েছেন এখানেই। পরাধীন ভারতবাসীর ভবিষ্যৎচিত্র নাট্যকার অঙ্কন করেননি। শুধু তাই নয়, ভারতমাতা এখানে বিদেশী শাসকের করুণাভিক্ষা করছেন করজোড়ে,—এমন দুর্বল কল্পনাও রয়েছে। নাট্যকারের সীমিত কল্পনা-শক্তিতে আবেদন—নিবেদনপ্রিয় বাঙ্গালী মনের দুর্বলতাই প্রকট। ভারতমাতাও যে মনোবল হারিয়ে করজোড়ে ইংরাজের কৃপাপ্রার্থিনী হতে পেরেছেন সে শুধু নাট্য-কারের দ্বিধা ও সংশয়ের প্রভাবেই। ভারতবাসী যখন ভারতমাতার কাছে ভবিষ্যতের কর্মপন্থা সম্পর্কে পরামর্শ ভিক্ষা করেছে—ভারতমাতা বলেছেন,—"বাবা, তোরা আর কি কোরবি, তোদের আর কে আছে? তোরা এখন একবার দয়াশীলা মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে তোদের দুঃখ জানা, তিনি পরম দয়াবতী, অবশ্য তোদের প্রতি মুক্ তুলে চাইবেন।"

দেশজননী ভারতমাতার এই লাঞ্ছিতা রূপটি নাট্যকার অনায়াসে তুলে ধরেছেন। স্বাধীন চেতনার অভাব এখানে প্রকট হলেও স্বদেশপ্রেমের আন্তরিকতার অভাব নেই। এখানে নাট্যকার কষ্টকল্পনার আশ্রয় না নিয়ে যুগানুগ সত্যটিই তুলে

ধরেছেন। ইংরেজপ্রশস্তি ও ভারতসাম্রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার প্রশস্তি উনবিংশ শতাব্দীর যে কোন স্বদেশপ্রেমমূলক কাব্য-কবিতায় মিলবে। প্রথমতঃ ইংরেজ বিরোধিতা করার কিছু প্রত্যক্ষ অসুবিধা ছিল। দ্বিতীয়তঃ বিদেশী শাসনের দ্বারা পীড়িত হলেও কোনও কোনও মহানুভব ইংরেজের চরিত্র-মাহাত্ম্য সে যুগের বাঙ্গালী অকপটে স্বীকার করেছে। 'নীলদর্পণের' নাট্যকার সমগ্র ইংরাজ জাতির চরিত্র গৌরব বর্ণনা করে মুষ্টিমেয় নীলকরের অমানুষিক আচরণের প্রতিবাদ করেছিলেন।

ভারতমাতা যখন সন্তানদের মহারানী ভিক্টোরিয়ার কাছে আবেদনের পরামর্শ দিলেন, একজন অত্যাচারী সাহেব প্রবেশ করেছে এবং ভারতবাসীদের এই প্রচেষ্টাকে রাজবিদ্রোহ বলে অভিহিত করেছে।—"রে নরাধম রাজবিদ্রোহিগণ, মহারানীকে ডাকতে তোদের মনে অনুমাত্রও ভয় সঞ্চার হোলো না ? ওঃ এমন জানলে কে তোদের লেখাপড়া শেখাত ?"

প্রথম সাহেব যখন অসহায় ভারতবাসীদের পদাঘাত করতে উদ্যত, ভারতমাতা প্রিয় সন্তানদের স্মরণ করেছেন,—"কোথায় হরিশ, কোথায় গিরীশ, কোথা রামমোহন, কোথায় রামগোপাল।"

কিন্তু দ্বিতীয় সাহেবের আবির্ভাব ও ভারতমাতাকে সান্ত্বনাদানের চেষ্টাটি হাস্যকর। যে নাটকে ভারতের দুরবস্থাই রূপকাকারে পরিবেশিত হয়েছে—সদয় ইংরেজের প্রসঙ্গ সেখানে অবান্তর বলে মনে হয়। নাট্যকারের দেশপ্রেম নিছক গতানুগতিকতারই পুনরাবৃত্তি। মৌলিক কল্পনা কিংবা স্বাধীনতালাভের সুগভীর আদর্শস্থাপন নাট্যকারের পক্ষে অসম্ভব ছিল। সহৃদয় সাহেবটির বক্তৃতাও হাস্যকর,—

"মা কিছু দুঃখ করো না, তোমাদের দুঃখরজনী শীঘ্রই অবসান হবে। তুমি কি ফসেট্ টরেন্স প্রভৃতি মহাত্মাগণের নাম শোনোনি, যাঁহারা অভাগা ভারতসন্তানের দুঃখ দূর কোরতে প্রাণপণ যত্ন করে থাকেন। আর এই যে সজ্জন-পালক, প্রজারঞ্জক, মহামতী লর্ড নর্থব্রুক গভর্নর জেনারেল হোয়েছেন, ইনিই তোমাদের দুঃখ দূর কোরবেন॥"

সহৃদয় ইংরেজ সাহেব যে আশ্বাস দান করেছেন—স্বাধীনতাকামী ভারতবাসীর কাছে তা হাস্যকর। বস্তুতঃ নাট্যকার স্বাধীনতার যথার্থ অর্থ কল্পনাতেও চিন্তা করেন নি। শুধু সমসাময়িক দেশাত্মবোধ যেভাবে রাজকার্যের সমালোচনা রূপে প্রকাশ পেত, সেটুকুই নাটকের বিষয় রূপে তুলে ধরেছেন। ভারতমাতার দীনারূপই যে ভারতবাসীদের সুপ্ত শক্তি ও বীর্য জাগাতে জাগাতে পারে নাট্যকার সে সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। ভারতমাতার অসহায় রূপটি এই ক্ষুদ্র নাটিকার সম্পদ রূপে পরিগণিত হলেও নাট্যকারের সীমিত শক্তির ব্যর্থতাই প্রকট হয়ে উঠেছে। ভারতমাতার মুখে

ভিকটোরিয়াপ্রশস্তি ও সহৃদয় ইংরেজের মুখের আশ্বাসবাণী নাট্যকারের দ্বিধাগ্রস্ত স্বদেশচিন্তারই নামান্তর। গভীর স্বদেশচিন্তা ও স্বাধীনতার দুর্মদ আকাঙ্ক্ষা সেযুগের সাধারণের চিন্তার বিষয় হয়ে ওঠেনি সুতরাং দুর্বল রচনায় তা আশা করাই যায় না। "ভারত মাতা" নাটিকাটি সেযুগের দ্বিধাগ্রস্ত-অস্পষ্ট ও অগভীর স্বদেশচিন্তাকেই রূপ দিয়েছে। কিন্তু শেষাংশে নাট্যকার স্বকীয় চিন্তার পরিচয় দিয়েছিলেন ধৈর্য, সাহস ও ঐক্যতা চরিত্রত্রয় রচনা করে। আগামী দিনের স্বাধীনতাকামী মানুষদের কাছে এ বক্তব্যটি তিনি তুলে ধরেন এই তিনটি চরিত্রের মাধ্যমে। সাহসের একটি অকুতোভয় উক্তি,—

> ভেবনা ভেবনা,
> অবিলম্বে দুঃখ নিশি হবে অবসান,
> ভারতের সুখরবি উদিবে গগনে।
> কায়মনে প্রাণপণে কররে যতন।
> মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন॥

ভারতের সুখরবির উদয়ের জন্য জীবন পণ করতে হবে, আত্মত্যাগের মূল্যেই স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে, এ উপলব্ধি নাট্যকারেরই। ঐক্যতা ভারতের বহু খণ্ডিত আত্মার অসংখ্য ত্রুটির সমালোচনাকালে বলেছে,—

"ভ্রাতৃগণ, অনৈক্যতা, আত্মাভিমান ও স্বজাতিহিংসাই তোমাদের সর্বনাশের মূল। যতদিন তোমাদের অন্তর হতে এ সকল ভাব দূরীভূত না হবে, ততদিন তোমাদের মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই।"

ক্ষুদ্র নাটিকার ক্ষুদ্রায়তনে নাট্যকার যে বিষয়টি অবলম্বন করেছিলেন সেযুগের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ চিন্তা বলে অভিহিত করা যায় এ ভাবনাকে। দেশাত্মবোধের প্রেরণা সঞ্চারের উদ্দেশ্য নিয়ে বর্তমান ভারতের লাঞ্ছিত মূর্তিকে রূপদান করেছিলেন নাট্যকার। সংক্ষেপিত ভূমিকায় উদ্দেশ্যটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেছিলেন তিনি—পরিশেষে ভারতবাসীর আশু কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন করে দেবার চেষ্টাও করেছেন। প্রত্যক্ষ স্বদেশচিন্তার নাট্যরূপ বলেই 'ভারতমাতা' উল্লেখযোগ্য স্থান পাবে। সে যুগের দর্শক প্রথম অভিনয়ে রুদ্ধশ্বাসে এ অভিনয়টি প্রত্যক্ষ করেছিলেন সে শুধু এর অভিনব বিষয় গৌরবের জন্যই। ভারতমাতা, ভারতলক্ষ্মী ও অসহায় ভারতবাসীগণ আমাদের মনোলোকে এতদিন বিরাজমান ছিলো,—নাট্যকার চরিত্ররূপে এঁদের মঞ্চে তুলেছেন। ধৈর্য, সাহস ও ঐক্যতাও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। নাট্যকার কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় নাট্যশালার প্রয়োজনেই কলম ধরেছিলেন,—বিষয় নির্বাচনের দায়িত্বও সম্ভবত তাঁর হাতে ছিল না ;—নাট্যকার হিসেবে স্থায়ী কৃতিত্বও তিনি অর্জন

করেননি তবু তাঁর কল্পনায় কিছু স্বকীয়ত্ব ছিল। একাঙ্ক নাটিকার ক্ষুদ্রায়তনে দেশপ্রেমের আদর্শটিকে রূপকের অন্তরালে প্রকাশের বাসনা ছিল তাঁর।

এই নাটিকার অভাবনীয় সাফল্যই পরবর্তী নাটিকারচনার প্রেরণা দিয়েছিলো নাট্যকারকে। ১৮৭৪ সালে কিরণচন্দ্র "ভারতে যবন" নামে অনুরূপ একটি রচনা প্রকাশ করেন। 'ভারতমাতার' অভিনয় সাফল্য দেখে পূর্ববর্তী 'মাস্ক' রচনার রীতিতেই "ভারতে যবন" লিখিত হয়েছিলো। প্রথম রচনার বক্তব্যই জনসমাদৃত হয়েছিল বলে নাট্যকার স্বদেশাত্মক বিষয় নিয়েই দ্বিতীয় রচনায় হাত দিয়েছিলেন। ভূমিকায় নাট্যকার জানিয়েছেন,—"আমি এক্ষণে "ভারতে যবন" স্বদেশোনুরাগী মহোদয়গণকে অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত রহিলাম।"[২২]

স্বদেশচিন্তার প্রত্যক্ষ রূপটি এ রচনায় মিলবে। নাট্যকার এ নাটকে পরাধীনতার বেদনাটি আরও স্পষ্টভাবে বোঝাতে পেরেছেন। টাইটেল পেজে উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে,—

স্বাধীনতা সম কি আছে আর
পামর যবনে করি ভয়?

স্বাধীনতার জন্য আকুলতা প্রকাশের চেষ্টা যখনই বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে নাট্যকার ক্ষুব্ধ হয়েছেন। এবং স্বাধীনতালাভের জন্য একটি ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার অভাববোধ নাট্যকারের মনে দেখা দিয়েছে। খণ্ডিত, আত্মকলহলিপ্ত ভারতবাসীর চারিত্রিক দুর্বলতা বোঝার পালা চলছে তখনও। নাটকে তারই ব্যাখ্যা শোনা যাবে। দাসত্বপ্রিয় ভারতবাসী স্বাধীনতার চেয়ে দাসত্বকেই শ্রেয় বলে মনে করে,—এই দাসত্বজীবীদের প্রসঙ্গ ঘৃণার সঙ্গে উল্লেখ করেছেন নাট্যকার।

ভারতসন্তান দুর্বল-কাপুরুষ স্বদেশবাসীকে উদ্দেশ্য করে আক্ষেপ করেছে,—

"সেই নরাধম, কাপুরুষগণ কি পুরুষ, যারা অম্লানবদনে স্বদেশের মায়া ও স্বাধীনতায় বিসর্জন দিয়া বিদেশীর দাসত্ব স্বীকার কচ্চে; জননী আমায় নিষেধ কোরবেন না। দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যু ভাল।"

ভারত রমণীও মহাদুঃখে উত্তর দিয়েছেন,—"যদি সমস্ত হিন্দু রমণীগণ তোমার ন্যায় স্বদেশানুরাগী বীরপুত্রের জননী হতেন, তাহলে কি এই বীরপ্রসূ ভারতভূমি দাসত্ব শৃংখলে বদ্ধ হোতো।"

এই ধরণের আদর্শ ভারতসন্তান ও আদর্শ ভারতরমণী সৃজন করে নাট্যকার পরাধীনতার ক্ষোভটি ব্যক্ত করেছেন। যদিও নাটকীয় সংলাপ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে তবু উদ্ধৃত উক্তির মধ্যে নাট্যকারের স্বাধীনতার আশা আকাঙ্ক্ষা উচ্ছ্বসিত হয়ে

২২. কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতে যবন, ১২৮১।

উঠেছে। বামদেব চরিত্রের মাধ্যমে নাট্যকারের নিজস্ব মন্তব্যই প্রকাশিত হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য একটা দুর্বার আকাঙ্ক্ষাই যেন নাট্যকারকে বেদনার্ত করে তুলেছে। বামদেব দুঃখ করেছেন,—

'যদি তোমার ন্যায় সকল আর্য সন্তানগণের অন্তঃকরণ স্বাধীনতা-স্পৃহায় প্রজ্জ্বলিত হোতো, তাহলে, এই পুণ্যভূমি ভারতভূমি কি কখন পরাধীন থাকে, ভারত মাতা কি এত দুর্দশা ভোগ করেন, কখনই না।"

বামদেবের আক্ষেপ ও নাট্যকারের ব্যক্তিগত ক্ষোভ এখানে প্রকাশিত হয়েছে। 'স্বাধীনতা স্পৃহায়' অন্তঃকরণের প্রজ্বলনই আত্মত্যাগের প্রেরণা এনে দেবে। দাসত্বের চেয়ে মৃত্যু যদি বেশী সম্মানের বলে প্রমাণিত হয়ে থাকে—দেশবাসী নিশ্চয়ই শ্রেয়তম পন্থাটিই বেছে নেবে। রূঢ় অথচ বাস্তব সত্যটিই নাট্যকার প্রচার করেছিলেন। স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাটিকে এভাবেই কবিতায়-নাটকে মহাকাব্যে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলেছে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই। দ্বিতীয় নাটিকাতেও এই নিঃসংশয় সত্যটিকেই নাট্যকার সোচ্চারে ব্যক্ত করেছেন। ১৮৭৩ – ৭৪এ নাট্যশালা যখন বক্তব্য প্রচারের শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানরূপে পরিগণিত হলো সেই সময়ে যুগোপযোগী আদর্শ প্রতিষ্ঠায় সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন ইনি।

"ভারতে যবনে"ও "ভারত মাতার" মত সংগীতের সাহায্য গ্রহণ করা হয়েছে। এই সংগীতারোপের উদ্দেশ্য স্বদেশপ্রেমকেই মূর্ত করে তোলা। ইতিপূর্বে নাট্যকার ও কবিগোষ্ঠী স্বদেশাত্মক অনুভূতিকে অকপটভাবে প্রকাশ করতে পারেননি। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দেই হেমচন্দ্রের বিখ্যাত স্বদেশাত্মক কবিতা "ভারত সংগীত" প্রকাশিত হওয়ায় কবি লাঞ্ছিত হন। ১৮৭২ খৃঃ 'নীলদর্পণের' অভিনয় প্রসঙ্গে ইংলিশম্যান গভর্নমেণ্টকে অভিনয় বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন কিন্তু কিরণচন্দ্র দেশবাসীর অন্তরে স্বাধীনতাস্পৃহা প্রজলনের চেষ্টা করেও রাজরোষে পড়েননি কেন সেটাই আশ্চর্য। 'ভারতমাতা'য় ইংরেজ শাসনের ভয়াবহতা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন নাট্যকার,— 'ভারতে যবনে' তাঁর আবেদন আরও অর্থবহ। "দাসত্ব অপেক্ষা মৃত্যু ভাল"—এই প্রকাশ্য উক্তি এ নাটকেই পরিবেশিত হয়েছিল। সংগীতের মধ্যেও নাট্যকার স্বাধীনতার মাহাত্ম্য জ্ঞাপনের চেষ্টা করেছিলেন,

স্বাধীনতা সম কি আছে আর,
বীরের জীবন, বীর অলঙ্কার,
বীরপ্রসূ হায়। ভারত জননী,
অশ্রুজলে তাঁর ভাসিছে ধরণী;
হারায়ে উজ্জ্বল স্বাধীনতা-মণি।

সর্বত্রই নাট্যকার স্বাধীনচেতনাসঞ্চারে দুঃসাহসিক চেষ্টা করেছিলেন। সম্ভবতঃ ক্ষুদ্রাকৃতি নাটিকা হিসেবে মূলনাটকের শেষে অভিনীত হোত বলেই পৃথক নাট্যসৃষ্টি বলে এ ধরণের রচনার মূল্য স্বীকার করা হয়নি। তাছাড়া খ্যাতনামা নাট্যকার হিসেবে কিরণচন্দ্রের পরিচয় ছিল না বলে এ ধরণের অভিনয়ের সংবাদ নাট্যরসিক ও নিয়মিত দর্শক ভিন্ন অন্যের দৃষ্টিপথে পড়েনি। কিন্তু বাংলা নাটকে স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করার প্রথম গৌরবটুকু তাঁকে অর্পণ করতেই হয়। সুধীজনের দৃষ্টিআকর্ষণ বা সমালোচকের মনোযোগ সৃজনে ব্যর্থকাম হলেও কিরণচন্দ্রের রচনা দুটি বহুবার অভিনীত হয়েছিল। 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' 'ভারত মাতার' প্রথম অভিনয় প্রসঙ্গে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাও প্রকাশিত হয়েছিল। তবু নাট্যকার সমগ্র সাহিত্যরসিকসমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হননি। কিন্তু স্বদেশপ্রেমী নাট্যকারগোষ্ঠীর উপরে তাঁর রচনার প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। সে যুগের নাট্যরচয়িতারা অভিনয়ের সংবাদ রাখতেন,—অভিনীত নাটকের চাহিদা দেখে নাটক লেখার খসড়া তৈরী করতেন। কিরণচন্দ্র নিজেই জনগণের মনোমত বিষয় অবলম্বনে নাটিকা রচনা করেছিলেন। পরীক্ষামূলক রচনা হিসেবেই এ নাটিকাদুটির মূল্যবিচার করা উচিত। কিরণচন্দ্রের ক্ষুদ্র নাটিকার বক্তব্য যখন বৃহৎ নাটকের বক্তব্যের কাছাকাছি স্থান করে নিল,—অনুকারক নাট্যকারদের সংখ্যাও তত বেড়েছে। কিরণচন্দ্র মঞ্চের প্রয়োজনে কিংবা মঞ্চের আকর্ষণ বাড়ানোর জন্য কলম ধরেছিলেন—অনুকারক নাট্যকারগোষ্ঠী শুধু লক্ষ্য করেছিলেন কিরণচন্দ্রের অভাবিত সাফল্য। যশ ও সম্মানের আহ্বানেই এঁরা বিচলিত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই তবু এঁদের একটা আদর্শ ছিল। কিরণচন্দ্রের অনুসরণ করে এঁরাও দেশভাবনার প্রসঙ্গ অবলম্বন করলেন। সেযুগের উন্মাদনাকে বাঁচিয়ে রাখার পবিত্র ব্রত ও যশোলাভের চেষ্টা একত্রীভূত হয়েছিল বলেই এই স্বল্প-খ্যাত কিম্বা প্রায়-বিস্মৃত নাট্যকারদের কথা স্মরণ করতে হবে শ্রদ্ধার সঙ্গে। সাহিত্য ইতিহাসে উল্লিখিত এই নাট্যকারদের রচনার বিষয় স্বদেশ, রচনার উদ্দেশ্য স্বদেশপ্রেম-প্রসঙ্গ বর্ণনা। এঁদের সকলের রচনায় গতানুগতিকতা ছাড়া লক্ষ্যণীয় কিছু নেই। তবু রচনার বিষয় ও নাট্যকারের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। কিরণচন্দ্রের পরে যে কজন নাট্যকার দেশভাবনা নিয়ে সাহিত্যজীবন আরম্ভ ও শেষ করেছিলেন, দেশভাবনার সুষ্ঠু রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেই যাঁরা ব্যর্থ ও অবজ্ঞাত হয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে হারাণচন্দ্র ঘোষ, নটেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কুঞ্জবিহারী বসুর নাম করা যায়। এঁদের কারোর রচনাই উল্লেখযোগ্য সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না। কুঞ্জবিহারী বসুর নামে দুটি রচনা মিললেও বাকী দুজন একটি করে নাটক লিখেছেন। হারাণচন্দ্রের কিছু মৌলিকত্ব পাওয়া যায় "ভারতী দুঃখিনী" নাটকের মধ্যে। কিরণচন্দ্র ও হারাণচন্দ্র

উভয়ের নাট্যচেষ্টা বিশ্লেষণ করলে মোটামুটি উল্লিখিত নাট্যকারদের প্রবণতা, আদর্শ, উদ্দেশ্য ও সাফল্যের একটা স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। নটেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'এই কি সেই ভারত?' ও কুঞ্জবিহারী বসুর 'ভারত অধীন?'—পরাধীনতার উপলব্ধিমুখর অভিব্যক্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়। কুঞ্জবিহারী বসুর 'ধর্মক্ষেত্র', 'ভারতে যবনের' অনুকরণে লেখা। পরাধীনতার জ্বালা উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে প্রায় ক্ষোভ ও অতীত স্মৃতিমন্থনের দীর্ঘশ্বাসে পরিণত হয়েছিলো, কাব্যকবিতায় বিচিত্রভাবে তা ব্যঞ্জিত হয়েছে, দেশচিন্তার নামে উদ্গত শোকোচ্ছ্বাস প্রকাশের এ সুযোগটুকু নাট্যকার-গোষ্ঠীও গ্রহণ করেছিলেন। কোনো অর্থবহ পরিণামের দিকে এগিয়ে যাবার প্রস্তুতির অভাবেই এই বহুদৃষ্ট পন্থাটি নাটক-কাব্য-কবিতায় একমাত্র ভঙ্গী হয়ে উঠেছিলো। সেযুগের স্বদেশপ্রেমের অর্থই হলো আর্যামির চেষ্টাকৃত স্মৃতিসায়র তোলপাড় করে একবিন্দু অশ্রুজল তাতে মিশিয়ে দেওয়ার অন্তহীন চেষ্টা। কখনও কখনও রূপকে-ব্যঞ্জনায় তা শ্রোতব্য হলেও—অধিকাংশস্থানেই তা যেন পুনরাবৃত্তি ছাড়া অন্য কিছু নয়।

হারাণচন্দ্র ঘোষের "ভারতী দুঃখিনীর" বিষয়বস্তুও দেশপ্রীতিউদ্বুদ্ধ স্রষ্টার পরাধীনতার দুঃখে অশ্রুমোচন। কিন্তু যে বৈশিষ্ট্য নাটকের পরিকল্পনায় মূলে দেখা যায় তা হল নাট্যকারের নির্মম সমালোচনার চেষ্টা। নাট্যকার সচেতনভাবে আঞ্চলিকতার ভেদবুদ্ধির নিন্দা করেছেন, জাতীয় দৈন্য ও শক্তিহীনতার প্রতি কটাক্ষপাত করেছেন। নাট্যকার নিছক দুঃখ নিবেদন না করে দুঃখের কারণগুলি অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন। ঘটনার ব্যাখ্যার সঙ্গে কিছু নিজস্ব টীকা সংযোগ করে নাট্যকার দূরদর্শিতার ও সূক্ষ্মদর্শিতারও পরিচয় রেখেছেন। নাট্যকার দেশপ্রেমী ও স্বদেশহিতকামীদের উদ্দেশ্যেই নাটকটি নিবেদন করেছেন,—

"স্বদেশহিতসাধনৈকব্রত সুহৃদসমাজকে এই গ্রন্থ উপহার দিলাম।"[২৩]

কিরণচন্দ্রের মত হারাণচন্দ্র ঘোষও রূপকান্তরালে বক্তব্য গোপনের তথা আত্মগোপনের প্রচলিত পন্থানুসরণ করেছিলেন। রূপকের আবরণে সত্য গোপনের প্রয়াসটি কিন্তু সত্যিই সার্থক হয়েছে এ নাটকে। 'ভারতীদুঃখিনী' নামকরণের মধ্যে কিন্তু কোন রূপকই নেই। ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই ভারতী নামে অভিহিত করেছেন নাট্যকার, তাঁকে প্রকাশ্যে দুঃখিনী বলেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন। নাট্যকার হারাণচন্দ্র ভারতীর দুঃখিনীরূপ ফোটানোর চেষ্টা করেছিলেন। আগাগোড়া এই বেদনার বিবরণ দিয়েছেন তিনি। ভারতের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আশ্রয়ের খোঁজে ও

২৩. হারাণচন্দ্র ঘোষ, ভারতী দুঃখিনী, ১৮৭৫।

ভবিষ্যতের আশা নিয়ে আসমুদ্র হিমাচল ভ্রমণ করছেন। বিভিন্ন অঞ্চলের পৃথক সংস্কৃতির মধ্যে লালিত মূলভারতীয় আদর্শ অনুসন্ধানের জন্য ভারতী তাঁর এক একটি কন্যার কাছে উপস্থিত হয়েছেন। বঙ্গসুন্দরী, অযোধ্যা, মদ্রবালা, মালবিকা, রাজবালা, জয়াবতী, যোধাবতী, উদয়নার কাছে গেছেন—কিন্তু হতাশায় দুঃখে তিনি শুধু ক্রন্দন করেছেন। কারণ কোথাও কোনো আশার চিহ্ন নেই। মনকে সান্ত্বনা দেবার মত কিছুই তিনি পাননি। নাট্যকার বঙ্গসুন্দরীর চরিত্র রচনায় স্বীয় অভিজ্ঞতার সাহায্য পেয়েছিলেন ও অন্যান্য চরিত্র রচনায় কল্পনার সাহায্য নিয়েও মোটামুটি তা সার্থক ভাবে অঙ্কন করেছেন বলতে হবে। ইতিহাসের নীরস বিবরণকে নাট্যকার সাধ্যমতো সচল চরিত্রের বক্তব্যরূপে দাঁড় করিয়েছেন। কিছু কিছু অসঙ্গতি ও কল্পনাতিরেক থাকলেও নাটকের বক্তব্য সুসম হয়েছে। নাট্যকারের সমালোচকসুলভ মনোভঙ্গিমার কথা প্রথমেই বলেছি। বঙ্গসুন্দরীর সঙ্গে ভারতীর আলাপে সূক্ষ্ম হিউমরের আরোপ করে নাটকীয় সংলাপের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছেন নাট্যকার।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের উন্মেষ পর্বেই এসব সৃষ্টির অবতারণা করে নাট্যকারবৃন্দ সাধ্যমতো দেশহিতৈষণার পরিচয় দিয়েছিলেন। এছাড়া করাঁর মতো কাজ হয়তো ছিল কিন্তু জনমনে স্বদেশচিন্তার বীজটি বপন করার মতো তা গুরুতর নয়। হিন্দুমেলা এই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করেছে। সদ্যপ্রতিষ্ঠিত জাতীয় রঙ্গমঞ্চের উৎসাহী নাট্যকার ও প্রযোজকবর্গ এবং জাতীয়ভাবে উদ্দীপিত সংবাদপত্রগুলিও দেশাত্মবোধের বাণী শহরে-নগরে-গ্রামে ও গঞ্জে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করেছে। "ভারতী দুঃখিনীর" স্রষ্টা হারাণচন্দ্র সেই মহৎ আদর্শের দ্বারাই অনুভাবিত হয়েছিলেন। ভারতী সত্যই দুঃখিনী,—পূর্ব হতে পশ্চিমে, উত্তর হতে দক্ষিণে, সেই দুঃখিনী ভারতমাতা পরিক্রমণে বেরিয়েছেন,—আশার আলো যেখানে দেখেছেন, ছুটে গিয়েছেন সবার আগে;—এই পরিকল্পনায় যে অভিনবত্ব রয়েছে তা অনস্বীকার্য।

ভারতীয় সঙ্গে বঙ্গসুন্দরীর কথোপকথন নাট্যকারের কল্পনাশক্তির নিদর্শন,—

"ভারতী—আমি যে শুনিছি তোর অনেকগুলি সুসন্তান হয়েছে। আমার মেয়েদের মধ্যে আজকাল তুই যে সুখী, নূতন নূতন সাহিত্যের মুখ দেখতে পাস ছেলেদের সৌভাগ্যের সীমা নাই।

বঙ্গসুন্দরী—বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগুলি প্রায় অধিকাংশ আমার সন্তানদিগের নামের পার্শ্বে বিরাজ করতেছে, কিন্তু হায়! আমি যে দিন দিন অন্তঃসার শূন্য হচ্ছি, তাত আর কেউ টের পাচ্ছে না।" [১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

বঙ্গসুন্দরীর উক্তির সত্যতা ও স্পষ্টতায় আমরা অভিভূত না হয়ে পারি না। নূতন শিক্ষাপদ্ধতির সমালোচনার এমন পরিচ্ছন্ন ও অর্থবহ ইঙ্গিত সেযুগে মেলেনি। নাট্যকার রূপকাকারে ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই বঙ্গসুন্দরীর আক্ষেপের ও দীর্ঘশ্বাসের মধ্যে কোন অসঙ্গতি নেই। শিক্ষা ও জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চার লক্ষ্যণীয় প্রসারের কথা উল্লেখ করেও নাট্যকার আমাদের অন্তরের বেদনার বাণীটি শোনাতে পেরেছেন। অন্তঃসারশূন্যতার ব্যাধিতেই সমগ্র বাঙ্গালীজাতি আক্রান্ত হয়েছে। শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্গে স্বাধীন চেতনা জন্ম নিচ্ছে না বলেই বঙ্কিমচন্দ্র একদা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিলেন, কমলাকান্তের বকলমে ভ্রান্ত দেশবাসীর সামনে শিবপথের সন্ধান জানাবার সাধনাই স্বদেশপ্রেমী বঙ্কিমের স্বপ্ন ছিল। নাট্যকার হারাণচন্দ্রও বাঙ্গালীর চরিত্রদোষ ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন,

বঙ্গসুন্দরী—এক বিলাসপ্রিয়তা, দ্বিতীয় ভীরুতা, এই দুইয়েই ত তাদের সর্বনাশ কর্তে বসেছে, বড় বড় গাড়ি, বড় বড় ঘোড়া, দোতালা তেতালা বাড়ি, গদি, আলবোলা, এত তারা ছাড়তে পারবে না এবং পরিশ্রমসাধ্য কোন কর্মও প্রাণ থাকতে করবে না পাছে শরীরে আঘাত লাগে। [১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

বিলাসব্যসনে আত্মতুষ্ট বাঙ্গালী জাতির এই জাতিগত দোষ ত্রুটির প্রসঙ্গ নাট্যকার অকপটে ব্যক্ত করেছেন। আয়াসপ্রিয় বাঙ্গালীর আত্মদানের উৎসাহ সঞ্চারের জন্যই নির্মম সমালোচনার প্রয়োজন ছিল। ব্যঙ্গকাব্য ও ব্যঙ্গসর্বস্ব প্রবন্ধেও এ মহৎ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এক শ্রেণীর লেখক সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হয়েছিলো যুগ-প্রয়োজনেই। হারাণচন্দ্র ঘোষ নাটকের ক্ষুদ্রায়তনে সেই প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। নাট্যকার চাকুরীজীবী সম্প্রদায়ের দুঃখ কবিতাকারে ব্যক্ত করেছেন,—

কে সৃজিল অপরূপ অধীনতা পাশ
যাহাতে পতিত হয়ে, মরি লাথি জুতা খেয়ে
তথাপি তাহাতে গিয়ে, পশিতে প্রয়াস
কে আনিল বাঙ্গলায় এই মায়াপাশ। [১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

নাট্যকারের বিক্ষুব্ধ মনোভাবের পরিচয় এখানে মূর্ত হয়ে উঠেছে। এক যুগে আমরা নির্বিচারে বিদেশীসভ্যতার ভালমন্দ গ্রহণ করেছি,—সেই জড়তার হাত থেকে মুক্তির লগ্নটি যে এসে গেছে—নাট্যকারের উদ্দেশ্যপূর্ণ সমালোচনাই তার প্রমাণ। চাকুরীজীবীরাও সচেতন হয়েছে, বাঁচার মত বাঁচতে হবে বলেই নিশ্চিন্ততা বা জড়ত্বকে কেউ সম্মানের বলে মনে করছে না। বঙ্গসুন্দরীর আক্ষেপ ও চাকুরী-জীবীর খেদ কোনটিই রূপক নয়; নব জাগরণের প্রথম লক্ষণ ও আত্মবিশ্লেষণের চেষ্টা মাত্র। স্বাধীন জীবনের প্রতি আগ্রহ না থাকলে দাসত্ব বা অধীনতার

সমালোচনা করা চলে না। স্বাধীনতার মূল্য সম্পর্কে অবহিত নাট্যকার চাকুরী-জীবনের মোহকে মায়াপাশ বলেও অভিহিত করেছেন, অভিযোগ করেছেন এই দাসত্ব বৃত্তি যারা প্রবর্তন করেছিল তাদের।

এই অংশেই ভারতীর সঙ্গে মালবিকার কথোপকথনে মালবিকার ক্ষোভ ধ্বনিত হয়েছে, "আমি কি আর আমি আছি? না আমার সে বলবিক্রম আছে! যেদিন বিক্রমাদিত্য মর্ত্ত্যলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেইদিন হতেই মালবের মান সম্ভ্রম গিয়াছে;" [১ম অংশ, ২য় গর্ভাঙ্ক]

পূর্বস্মৃতি মন্থনের সঙ্গে বর্তমান অবস্থার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করলে এ ক্ষোভ জাগা ত অস্বাভাবিক নয়!

ভারতী সচেতন করে দেয় মালবিকাকে,—"পুনঃ পুনঃ যবন বিপ্লবে সকলি বিস্মৃত হয়েছে, পূর্বের কথা তো আর কারুর মনে নাই, এখন সকলি নূতন। [ঐ]

দীর্ঘদিনের স্মৃতির বোঝা বয়ে লাভ নাই—অতীতকে বর্তমানে টেনে এনে যে ধরণের দুঃখ পাওয়া সম্ভব, তা দুঃখেরই বিলাস, নাট্যকার এ অংশে তার প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন। তবে অতীতের ঐশ্বর্যকে ফিরিয়ে আনার কোনো প্রেরণা যদি পাওয়া যায়, এ আশাতেই স্মৃতির প্রসঙ্গ বারবারই ফিরে এসেছে।

দ্বিতীয় অংকের প্রথম গর্ভাঙ্কে ভারতীর আত্মবিলাপটি লক্ষ্যণীয়। অতীতের উজ্জ্বল সৌভাগ্যে যিনি পৃথিবীর বরেণ্যা হয়েছিলেন, বর্তমানের গ্লানিতে তিনি যদি ভেঙ্গে পড়েন তবে তাতে অস্বাভাবিকত্ব থাকে না। ভারতীর কল্পিত রূপের সঙ্গে আত্মস্মৃতিমন্থনের উচ্ছ্বাসটি তাই হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। ভারতী দীর্ঘ-বিলাপের বাণী উচ্চারণ করেছে মহাদুঃখে,—

আমি বীরপত্নী, বীর প্রসবিনী, কবির জননী, সাহিত্যের ভাণ্ডার, রত্নের আকর, শেষে আমি পরাধীনী, আমি পথের কাঙ্গালিনী; হায়! আমার দশা কি হলো?… আমি আর্য্যগণের জনয়িত্রী, আমার ভাষা দেবভাষা বলিয়া লোকে সম্মান করতো, আমার সন্তানগণের প্রণীত চিকিৎসা শাস্ত্র, ভারতীয় বীরগণের রণ-কৌশল, শিল্পবিদ্যার মহীয়সী শক্তি, সাহিত্যের রচনা ও চাতুরী জগদ্বিখ্যাত ছিল, এখন সেই আমি আছি, আমার কিছু নাই, সকল বিষয়েই পরের মুখাপেক্ষী হয়ে চলতে হচ্ছে; এ হতে বিড়ম্বনা আর কি আছে?

[২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

ভারতীর দুঃখ প্রকাশের ভাষাটি যদি একান্তভাবে নাট্যকারের না হোতো তাহলে পরমুহূর্তেই নেপথ্য সংগীতের সাহায্যে ভারতবাসীদের সচেতন করার আশু প্রয়োজন তিনি অনুভব করতেন না। ভারতমাতার ক্ষোভের বিশদ ব্যাখ্যার অন্তরালে

দেশপ্রেমিক নাট্যকারের আবেদনটিই প্রকাশ পেয়েছে। তাই ভারতবাসীর সামনে তিনি করুণ আকুতি নিবেদন করেন নেপথ্য সংগীতের মাধ্যমে,—

ভারত নিবাসী জন, কেন বিষণ্ণ বদন,
প্রকাশ জ্ঞানলোচন, অলসেরে পরিহরি ॥

অজ্ঞানতাই মানুষের আত্মজ্ঞান নষ্ট করে, স্বাধীনচেতনা সেই পূর্ণ আত্মজ্ঞান লাভের প্রথম স্তর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে ভারতবাসীর আত্মচেতনা জাগানোর অক্লান্ত চেষ্টাই সাহিত্যে বিভিন্ন ভাবে প্রতিফলিত হয়েছে। লেখকচিত্তের আন্তরিকতাই যেখানে স্বদেশচিন্তাকারে ব্যক্ত হয়েছে—আমরা শুধু সেটুকুই লক্ষ্য করব। স্বদেশপ্রেমিকের মনোবিশ্লেষণে আমরা নানাভাবে হৃদয়ের এই আক্ষেপ ও আবেদন বারবার শুনেছি, কাব্যে-নাটকে স্রষ্টার সেই স্বদেশগত প্রাণটিই ধরা পড়েছে।

ভারতমাতার আক্ষেপোক্তি শ্রবণে মদ্রবালাও সমগ্র দেশবাসীর সামনে ধিক্কার বাণী উচ্চারণ করেছে;—আত্মশক্তি উদ্বোধনের প্রয়োজনে ধিক্কার বাণী কখনও কখনও কার্যকরী হয়ে থাকে। ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের হাতিয়ার বীররসের উদ্দীপনা জাগায় নির্ভুল নিয়মে। মদ্রবালার জ্বলন্ত বাণী যেন অঙ্গারের মতো সমগ্র দেশবাসীর দেহে মনে ছড়িয়ে পড়ে,—

মদ্রবালা—তোমরা না জননী জন্মভূমিকে স্বর্গাপেক্ষা গরীয়সী বলিয়া ব্যাখ্যা কর? ···জননীর ঈদৃশ দুরবস্থা কি প্রকারে চক্ষে দেখতেছ হা ধিক তোমরা না আর্য্যসন্তান বলে পরিচয় দেও? এই কি আর্য্যোচিত ব্যবহার? তোমাদের পূর্বপুরুষগণ যে সকল মহতী কীর্তি স্থাপনা করে গেছেন, তোমরা স্বহস্তে সেই সকল কীর্তিস্তম্ভ ভগ্ন করতে বসেচো, হায়! হায়! কিছুতেই কি আর চৈতন্য হয় না?

[২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

এই বীরত্বব্যঞ্জক বাণী সে যুগীয় কাব্যের উৎকৃষ্ট বীররসাত্মক অংশগুলিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

মদ্রবালার সন্তানদের চরিত্রবৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্গসন্তানদের সঙ্গে তুলনা করেছেন নাট্যকার। বাঙ্গালীচরিত্রে দাসমনোবৃত্তির ভয়াবহ রূপটিকে ফুটিয়ে তোলার এ চেষ্টাটিও লক্ষ্যণীয়। মদ্রসন্তানদের চরিত্রে দাস্যভাবের আধিক্য নেই বলে মদ্রবালা অভিমত পোষণ করেছেন,—

মদ্রবালা—আমার সন্তানেরা ত নিতান্ত দাস্যবৃত্তিতে অনুরক্ত নয়, তাদের মধ্যে এখনো যে অনেক স্বাধীন, তবে অধিকাংশ পরাধীন বটে, তথাপি কেবল চাকরী চাকরী করে তারা লালায়িত নয়, কৃষি বাণিজ্যের উপর তাদের নির্ভর আছে; [ঐ]

স্বাধীনতাকামী জাতির অন্তরে দাসমনোবৃত্তির প্রাবল্য থাকতেপারে না। দাসত্বের

প্রতি অনুরাগ নিয়ে স্বাধীনতার তেজ ও বীর্য প্রকাশ পেতে পারে না। আত্মশক্তির কর্ষণ যতো বেশী হবে স্বাধীন মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ততো বেশী স্বাভাবিক হবে। সুতরাং চাকুরীজীবী বাঙ্গালীদের স্বাধীনতার প্রতি সত্যিকারের শ্রদ্ধাবোধ জাগানোর চেষ্টা এখানে লক্ষ্যণীয়। নাট্যকার রূপকের সাহায্য নিয়েই বাঙ্গালীর চরিত্রবিশ্লেষণের এ সুযোগটুকু যথাযথভাবে ব্যবহার করেছেন।

এই অংশেই মদ্রবালার প্রশ্নের উত্তরে ভারতী সমগ্র ভারতের অনৈক্য ও দুর্বলতার প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন,—

আমি অভাগিনী তা না হলে কি পরাধিনী হতেম? আমার পুত্রগণের মধ্যে যদি পূর্ববৎ ভ্রাতৃভাব থাকতো তা হলে কি তাদের এত দুর্দশা হয়, না দুরন্ত যবন মামুদ সোমেশ্বর ভগ্ন করতে পারে?···যে একতাবলে আমি উন্নতির চরমসীমায় অধিরোহণ করিয়াছিলেম আবার সেই একতার অভাবই আমাকে অবনতির চরম সীমায় আনিয়াছে···। [ঐ]

সহজবোধ্য নাটকীয় সংলাপে বহু-আলোচিত বহু-শ্রুত এই সত্য অনেক বেশী আবেদনশীল হয়েছে বলেই আমাদের বিশ্বাস। অনৈক্য ও আভ্যন্তরীণ বিরোধই যে ভারতের দুর্ভাগ্যের প্রধানতম কারণ,—সেই প্রতিষ্ঠিত সত্যটি স্বীকার করেই একতাবদ্ধ হবার চেষ্টা করে যেতে হবে। স্বাধীনতার মত মূল্যবান একটি মহারত্ন লাভের প্রাথমিক উপায় বিরোধের মধ্যে ঐক্যবোধ সঞ্চার, অনুল্লেখ্য নাট্যকারের চিন্তায়ও এ সত্যটি এমন সার্থক ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিলো,—এটাই আশ্চর্য। স্বাধীনচেতনা সঞ্চারের প্রথম লগ্নে কবি-সাহিত্যিকদের চিন্তায় এই আবেদনের বাণী ধ্বনিত হয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনেরও একটি মাত্র বাণী—একতার বাণী। বাংলানাটকের স্বদেশচিন্তা প্রতিভাসের লগ্নেও একতার বাণীই প্রাধান্য লাভ করেছে—এটা আশারই কথা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমাবধি দূরদর্শী স্রষ্টারা জাতীয় অবনতির সূত্রগুলো নিখুঁত ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। আর প্রগতির পদক্ষেপ নির্ভুল হবে যদি দুর্বলতার ইতিহাস মোটামুটি জানা থাকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েই ত স্বাধীনতাসম্পদ অন্তর্হিত হয়েছে—লক্ষ্য স্থির থাকলে হৃতসম্পদ পুনরুদ্ধার অসম্ভব নয়। এই সহজ সত্যটিই প্রত্যেক দেশবাসীর অন্তরের জপমন্ত্র হওয়া দরকার। সমগ্র ভারতের ঐতিহাসিক ও বর্তমান দুটি রূপ পাশাপাশি স্থাপন করে নাট্যকার একটি তুলনামূলক চিত্র অঙ্কন করেছেন। সজীব নারী চরিত্ররূপে এক একটি অঞ্চলের অধিনায়িকা আত্মকাহিনী শুনিয়েছেন। নাট্যকার বঙ্গসুন্দরী, মদ্রবালার পর রাজবারার প্রসঙ্গ অবতারণা করেছেন। এক একটি অঙ্কে এক একটি নতুন বক্তব্য নাটকটিকে অভিনবত্ব দান করেছে। বিশাল ভারতবর্ষের এক একটি প্রদেশের বিভিন্ন ইতিহাসের

সত্য স্থাপন করায় সুসংবদ্ধ একটি নতুন ভারতবর্ষের প্রচ্ছন্ন স্বপ্ন সমগ্র নাটকে ধরা পড়েছে।

রাজবারা গৌরবোজ্জ্বল স্বাধীন ইতিহাসের পীঠস্থান রাজস্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। রাজস্থানের ইতিহাস স্বাধীনতার আন্দোলনসৃজনেই যে প্রেরণা দিয়েছে তা নয়,—স্বাধীনতা আন্দোলনের পূর্বকালীন সাহিত্যেও রাজস্থানের ইতিহাস মুখ্য স্থান জুড়ে আছে। বাংলাসাহিত্যে রাজস্থানের ইতিহাসপ্রসঙ্গ নানাকারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে আসছে। সমগ্র ভারত ইতিহাস থেকে বাঙ্গালী কবি ও সাহিত্যিক, নাট্যকার ও প্রবন্ধকার রাজস্থানের ইতিহাসকেই বেছে নিয়েছিলেন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য। রাজস্থান সমগ্র ভারতের প্রেরণাস্থল। কাজেই এ অংশটি প্রসঙ্গে নাট্যকারের বক্তব্যটি গুরুত্বপূর্ণ হবে এ আশা করা স্বাভাবিক। রঙ্গলাল, মধুসূদন এই রাজস্থান ইতিহাস প্রসঙ্গই সার্থকভাবে কাব্যে-নাটকে আরোপ করেছিলেন। হারাণচন্দ্র ঘোষের বক্তব্য কিন্তু গতানুগতিক নয়। এখানে রাজস্থানের অধিষ্ঠাত্রীদেবীর কণ্ঠে আশার বদলে নৈরাশ্যের বাণীই মুখ্য হয়ে উঠেছে। রাজবারা মহাক্ষোভে আত্মকাহিনী শুনিয়েছে,—"লোকে বলে আমি স্বাধীন, কিন্তু আমি যে অধীনেরও অধীন তাত জানে না…এই রাজপুতদেশ কত শতবার যবন বিপ্লবে ছারখার হয়েছে, কতবার নগরী ভূমিসাৎ হয়েছে, রমণীমণ্ডলী অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আপনাপন কুলমান রক্ষা করেচে তথাপি কেহ দাসত্ব স্বীকার করে নাই।" [২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

এখানে বিগতদিনের ক্ষোভে জননী রাজবারার দুঃখ আরও গভীর হয়ে উঠেছে। স্বাধীনতার আনন্দ রাজস্থান দীর্ঘ দিন ধরেই লাভ করেছে—সুতরাং বর্তমানের এই হীনাবস্থা রাজবারার কাছে অসহনীয় হয়েছে।

রাজস্থানে শুধু বীরপুরুষরাই আত্মদানের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেনি, যোগ্য বীরনারীরাও অংশগ্রহণ করেছে জীবনদানে। তাই রাজবারা আবার এই দুর্দিনে তাদের আত্মদানের কথা স্মরণ করে অশ্রুবারি মোচন করছেন,—

হায় কি ভারতে আর সেদিন আসিবে!
যেদিন মহিলাগণ, ধরি নানা প্রহরণ
রণসাজে সমর করিত,
যেদিনেতে বীরনারী, সুতপতি পরিহরি
অনায়াসে অনলে পশিত;
স্বদেশের তরে প্রাণে মায়া না করিত। [ঐ]

স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে স্বাধীনতাযজ্ঞে আত্মদানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে রাজবারার উক্তিটি একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত। ভারতইতিহাসের এই ঐতিহ্যের পুনরাবির্ভাব

নাট্যকারেরও কাম্য। ক্ষুদ্র নাটিকার রূপক আবরণ উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে নাট্যকারের দেশচিন্তার ব্যাপকতা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নাটকের শেষাংশে অযোধ্যার সঙ্গে ভারতীর কথোপকথনের মাধ্যমে ভারতীয় সনাতনধর্মের রক্ষণও যে জাতীয়তাবাদী দেশবাসীর অন্যতম প্রধান কর্তব্য সে সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়া হয়েছে। ধর্ম ও ঐতিহ্য এই দুটি আদর্শ আঁকড়ে ধরেই ভবিষ্যতের বনিয়াদ গড়ে তুলতে হবে, নাট্যকারের এ মন্তব্যও যথার্থ সত্য।

অযোধ্যার কাছে ভারতী আক্ষেপ করে বলেন,—"কেহ "বেদ কিছু নয়" বলে বেদের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত, কেহ বা তাহার রক্ষার জন্য ব্যস্ত, কেহ বা জাতিভেদ উঠাইবার চেষ্টা করিতেছে, কেহ "রামায়ণ কবিকল্পনা সম্ভূত কোন সত্যঘটনা অবলম্বন করিয়া হয় নাই" বলিয়া কত মিথ্যা বাচালতাপ্রকাশ করচে।" [৩য় অঙ্ক]

ভারতীর এই উক্তি খুব সংক্ষেপে বাংলাদেশের ধর্মান্দোলনের সমালোচনা। প্রাচীন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যরক্ষার সচেতন চেষ্টাও সে যুগের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য। নাট্যকার প্রগতি ও ঐতিহ্যরক্ষার মধ্যে শুধু ভাবাবেগ প্রত্যক্ষ করেছিলেন, কোনটিই অভ্রান্ত সত্যনির্দেশে সহায়তা করেনি বলেই তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু ভারতীর সমালোচনায় ও স্পষ্টভাষিতায় তার অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গটি বড়ো মনোরম হয়েছে বলে মনে হয়। মিত ও ব্যঞ্জিত ভাষণের সৌন্দর্যও এখানে চোখে পড়ে। সচেতন দেশবোধ যথার্থ সত্যচেতনায় সাহায্য করে থাকে। দেশপ্রেমিকই দেশনিন্দুক হতে পারেন,—আন্তরিকতার শাসনে অপদার্থকে স্বরূপ চিনিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নেন। সে যুগীয় ব্যঙ্গসাহিত্যের স্রষ্টা সম্পর্কে এ সত্যটি আমরা নতুন করে আলোচনা করব। "ভারতী দুঃখিনী" নাটকের সমালোচনার অংশগুলি তাই নাট্যকারের নিস্পৃহ ও নিখুঁত সমাজদর্শনেরই ফলাফল। হিন্দুশাস্ত্রও এ নাটকের একটি চরিত্র রূপেই কল্পিত। হিন্দুশাস্ত্রই হিন্দুসভ্যতার ধারক ও আলোচক। সুতরাং 'দুঃখিনী ভারতী যখন পরিবর্তনের প্রাবল্যে সনাতন হিন্দুশাস্ত্র, সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষীয়মান রূপ দেখে আক্ষেপ করেন, হিন্দুশাস্ত্র প্রত্যুত্তর দিয়েছে,—

"আমাদিগের আসন, এক্ষণে তোমাদের তনয়গণ, আমাদিগের চিরশত্রু স্বেচ্ছাচার, অজ্ঞতা, অভাব প্রভৃতিকে প্রদান করিল।" [ঐ]

এরই নাম পরিবর্তনের যুগ,—প্রাচীনত্বকে বিদায় দিয়ে নবীনকে অভ্যর্থনায় মুহূর্তে নাট্যকার এই প্রগতিকে স্বেচ্ছাচারিতা, অজ্ঞতা বলেই ব্যাখ্যা করেছিলেন। এবং এমন ব্যাখ্যা মহাজনকথিত বাক্যেও বারংবারই শোনা গেছে। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গের হুল ফুটিয়ে আধুনিকতার রূপ ব্যাখ্যা করেছিলেন নির্মমভাবে। রূপক নাটকে হিন্দুশাস্ত্রই চরিত্ররূপে দর্শকের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এই নাটকের পরিসর অল্প

হলেও প্রতিভানুগ বিশাল ভাবপ্রকাশে কোন অসুবিধা হয়নি। তৎকালীন ভারতের অন্তরটি নাট্যকার প্রত্যক্ষ করেছিলেন,—দর্শককেও সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত করেননি। ভারতী যে কেন দুঃখিনী, তাঁর দুঃখের হেতুই বা কি,—নাটকটি পাঠ করে সে সম্বন্ধে একটা স্পষ্ট ধারণা লাভ করা সম্ভব হয়েছে বলেই নাট্যকারের উদ্দেশ্য ও আদর্শ, দেশপ্রেমিকতা ও স্পষ্টবাদিতা সম্পর্কে আমরা নিঃসংশয় হতে পেরেছি। নিঃসন্দেহে এ ক্ষমতা নাট্যকারের নিজস্ব,—প্রচলিত বিশ্বাস ও মতবাদ কিংবা দেশপ্রেমাদর্শ তাঁর প্রতিভার স্পর্শে রূপময় হয়ে উঠেছিলো।

নাটকের শেষদিকে রোদনরতা দুঃখিনী ভারতী পুনরায় ভবিষ্যতের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন,—

'মনে মনে আশা ছিল যদি কখন সন্তানগণের জ্ঞান হয় তবে হিন্দুশাস্ত্রের অভিমতে চলিবে আর আমারও আবার সৌভাগ্যের উদয় হবে। আবার হাত তুলে মানুষকে দিতে পারব।' [ঐ]

দর্শকচিত্তও উজ্জীবিত হয় সে মন্ত্রে। প্রাচীন আদর্শকে গ্রহণ করেই নবীন জীবন ও পরিবর্তনকে আহ্বান জানাতে হবে। অজ্ঞানতাই তার একমাত্র বাধা। জ্ঞানের শলাকা দিয়ে শুধু চিত্তলোকের সংস্কার করলেই চলবে না, মশাল জ্বালিয়ে নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে বীরত্বের বাণী উচ্চারণ করে—এমন স্পষ্ট আহ্বান নাটকেই পরিবেশন করা সম্ভব। নাট্যকার পরিচিত নন, নাটকটিও জয়মাল্য ভূষিত বিশেষ সৃষ্টি বলে অভিনন্দিত হয়নি তবু এ নাটকের দেশপ্রেমাত্মক বক্তব্য আমাদের বিস্মিত করেছে। পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনের লগ্নে যে দেশপ্রেমমূলক নাট্যসম্ভারের জন্ম হয়েছিলো, যা আমাদের আত্মত্যাগের প্রেরণা সঞ্চার করেছিলো, তারও বহু আগে এই অনুল্লেখ্য রচনাটির মধ্যে আমরা যে সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছি,—তা সামান্য নয়। যে যুগের অভিনয়ের আসরে সাড়া জাগানো নাটকের শ্রেণীতে ফেলা না গেলেও এর অভিনয় সংবাদ পাওয়া গেছে। যথেষ্ট আলোচনা হয়নি বলেই এর নাট্যমূল্য বা অভিনয়সাফল্য সম্পর্কে আমাদের নীরবতা পালন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। "ভারতী দুঃখিনীর" রূপক ভেদ করে যদি এর মর্মার্থ গ্রহণ করা যায়, দেখা যাবে, আমরা বিফল হইনি। দেশভাবনা সম্বল করে সমগ্র ভারতের অতীত ও বর্তমান পটভূমিকায় নাট্যকার কিভাবে এই ক্ষুদ্র নাটিকাটির পরিকল্পনা করেছিলেন ভাবলে বিস্মিত শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে যাই আমরা।

মধুসূদন ও দীনবন্ধুর নাট্যসাহিত্যে যা শুধু ইঙ্গিত ছিলো,—পরবর্তী যুগের নাটকে যা রূপকান্বিত স্বদেশাত্মক ভাবনামাত্র—অল্পকালের মধ্যেই তা প্রকাশ্য স্বদেশপ্রেমের বক্তব্য প্রচারে ব্রতী হয়েছে। কিরণচন্দ্র এবং হারাণচন্দ্র পূর্ণাঙ্গ নাটক রচনা

করেননি, এমন কি নাটকের স্বাভাবিক রচনাভঙ্গীর সাহায্য নেওয়াও তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তির্যক ভঙ্গীতে স্বদেশপ্রেম প্রচারের ক্ষীণ চেষ্টা করেছিলেন তাঁরা। ঝুঁকি নেওয়ার সামর্থ্য নিয়েই পরবর্তী যুগের নাট্যকারেরা স্বদেশাত্মক বক্তব্যকে সরাসরি বলার স্পর্ধা পেলেন। কাব্যেও যেমন দেখেছি, দ্বিধা ও সংশয় থেকে পরোক্ষভাবের সাহায্য গ্রহণ করে দেশপ্রেমিক কবিরা ব্যঙ্গ কবিতায় স্বদেশপ্রেম প্রচার করেছেন, নাটকের প্রথম যুগেও ঠিক তাই। কিন্তু জাতীয় নাট্যশালা স্থাপনের অল্পকালের মধ্যেই দুঃসাহসিক ক্ষমতা নিয়ে নাট্যকারগোষ্ঠী সদর্পে স্বাধীনতা মহিমা ঘোষণার জন্য প্রস্তুত হলেন। এ যুগেরই প্রবীণ নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিচয় স্বদেশপ্রেমিক স্রষ্টারূপে। বাংলা নাটকে স্বদেশপ্রেম প্রচারই ছিল তাঁর সাধনা ও জীবনবাণী। জাতির মনে স্বাধীনতাস্পৃহা সৃজনের দীক্ষা নিয়ে নাট্য-সাহিত্যে তাঁর শুভ পদার্পণ হলেও তাঁর আবির্ভাবেরও আগেই এসেছিলেন দু'একজন নাট্যকার, যাঁরা একই আদর্শের প্রেরণা পেয়েছিলেন, তৎকালীন রাজনৈতিক পরিবেশ থেকে। এঁদের মধ্যে হরলাল রায়ের নামই সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। শ্রীসুকুমার সেন মহাশয় মন্তব্য করেছেন,—

"জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব সমসাময়িক নাটকের মধ্যে দেখা গেল সর্বপ্রথম হরলাল রায়ের "হেমলতা" নাটকে।"[২৪]

সুতরাং জাতীয় আন্দোলনের প্রভাব যে নাটকের মহিমা বৃদ্ধি করেছিল সেই নাটকের স্রষ্টার কিছু বৈশিষ্ট্য আমাদের আলোচনা করা দরকার। হরলাল রায় "হেমলতা" নাটকে সময়োচিত বক্তব্য পরিবেশন করেছিলেন। স্বাধীনতার জন্য জীবনবিসর্জনও যে কাম্য এ সত্য 'হেমলতা' নাটকের গৌরব বৃদ্ধি করেছে। এ নাটকের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদক ১২৮০ খৃষ্টাব্দের মাঘের 'বঙ্গদর্শনে' লিখেছিলেন,—

"হেমলতা" নাটক এখনকার প্রচলিত অনেক নাটক অপেক্ষা অনেকাংশে উত্তম।"

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রশংসার মূলে তৎকালীন বাংলানাটকের দুরবস্থার উল্লেখ রয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেযুগের প্রচলিত বাংলানাটক সম্পর্কে নৈরাশ্যবোধ করতেন। সমালোচনায় প্রচলিত বাংলা নাটক সম্পর্কে অনাস্থার মনোভাবটি গোপন করতে পারেননি তিনি। কিন্তু "হেমলতা" নাটকের বক্তব্য তাঁকে খুশী করেছিল সম্ভবতঃ স্বদেশপ্রেমী সাহিত্যিকের দৃষ্টিতেই তিনি সেযুগের বাংলা নাটকের বিচার করেছিলেন এবং প্রচলিত বাংলা নাটকে দেশাত্মবোধের অভাবই তাঁকে পীড়িত করেছিলো।

২৪. সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় খণ্ড। বর্ধমান সাহিত্য সভা।

"হেমলতা" নাটকের এই সমালোচনার মূলে নাট্যকারের স্বদেশ চেতনারই প্রশংসা করা হয়ে থাকে—কারণ উচ্চাঙ্গের নাটক রচনা করার মত যোগ্যতা নাট্যকারের ছিল না। শুধু বিষয়গত বা ভাবগত শুদ্ধতার প্রসঙ্গ নিয়েই নাট্যকার প্রশংসিত হয়েছিলেন।

"হেমলতা" নাটকের বিষয়বস্তু কল্পিত ইতিহাস এবং এ ব্যাপারেও তাঁকে রাজস্থানের ঐতিহ্যের দ্বারস্থ হতে হয়েছে। ঐতিহাসিক চরিত্রের প্রচ্ছায়ে কল্পনার অবাধ স্বাধীনতা গ্রহণ করতে পারেন নাট্যকার। সুতরাং দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত চরিত্রগুলির সঙ্গে ইতিহাসখ্যাত দেশপ্রেমিকদের নাম যুক্ত করে দেওয়ার প্রচলিত সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন নাট্যকার। এখানেও প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রেম কাহিনীর পটভূমিকা সৃজনে সহায়তা করেছে। চিতোরের বর্তমান অধিপতি বিক্রমসিংহই কাহিনীর অন্যতম প্রধান নায়ক। চিতোরের সিংহাসনে বীরত্ব না থাকলেও অধিপতি হয়ে উপবেশন করা চলে তাই বিক্রমসিংহ অকর্মণ্য সম্রাটরূপেই রাজত্ব করেন। কমলা ও হেমলতা প্রতাপসিংহের বিতাড়িতা পত্নী ও কন্যারূপে পরিচিত। অকর্মণ্যতার প্রতিফল পেলেন বিক্রমসিংহ কারণ শক্তিমান উদয়পুরাধিপতি তেজসিংহ তাঁকে বন্দী করে রাজ্য অধিকার করেছেন। বন্দীজীবনের লাঞ্ছনা যখন অসহনীয় হয়ে ওঠে বিক্রমসিংহ তখন আক্ষেপ করেন,—

"অধীনতামিশ্রিত রাজভোগও তীব্রতম কালকূট, অধীনতামিশ্রিত সুখ বিড়ম্বনামাত্র, অধীনতামিশ্রিত জীবন শুষ্ক তৃষমাত্র।"[২৫] [তৃতীয় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]

হতাশের ক্রন্দন হলেও পরাধীনতার জ্বালাটি ত মিথ্যা নয়। নাট্যকার স্বাধীনতার আনন্দ বোঝাতে গিয়েই অধীনতার দুঃখবর্ণনার সুযোগ গ্রহণ করেছেন মাত্র। না হলে বিক্রমসিংহের দুঃখ আবেদন সৃজনে সক্ষম হয়নি,—বিক্রমসিংহের অযোগ্যতার যোগ্য প্রতিফল ত এই!

কিন্তু চিতোরের রাজা অযোগ্য হলেও প্রতাপসিংহের চিতোরে সাহসী সৈনিক ও স্বদেশপ্রেমিক বীরের অভাব ছিল না। এ নাটকের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের প্রসঙ্গে আমাদের প্রয়োজন নেই,—শুধু দেশাত্মবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত বীর সৈনিক সত্যসখার আত্মদানের সংকল্পটি যখন সোচ্চার হয়ে ওঠে তখন দর্শক দেশপ্রেমের শিক্ষাটুকু গ্রহণ করতে পারেন। কমলাকে সত্যসখা চিতোরের দুর্দিনে তার ভবিষ্যতের সংকল্প জানিয়েছে,—বীরত্ব ও শৌর্যের প্রতীকরূপেই এ নাটকে তার আবির্ভাব। প্রতাপসিংহের স্বপ্ন ও আদর্শ চিতোরের কোনো একটি যুবকের মনেও

২৫. হরলাল রায়, হেমলতা নাটক। ২য় সংস্করণ। ১২৮১।

অন্ততঃ উত্তেজনা সৃজনে সক্ষম হয়েছে—এটুকুই আশার কথা। সত্যসখাই চিতোরের যথার্থ পুরুষ,—স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে দুর্বার শক্তি দান করেছে। সত্যসখার বীরত্বপূর্ণ উক্তি স্বদেশপ্রেমিকের প্রাণেও উদ্দীপনা সঞ্চারে সমর্থ হবে।

সত্যসখা—"মহারাজ বিক্রমসিংহের হিতের জন্য আমি যবনদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করব। দুরাচার ম্লেচ্ছগণ সগর্বে ভারতের বক্ষের উপর পদার্পণ করেছে।—আমি কি পঙ্গু আতুরের ন্যায় তাহাদের দৌরাত্ম্যের কথা শুনব আর হয়ত কণামাত্র ক্রোধ মনে জলে উঠেই নির্বাণ হবে?…এই স্বর্গতুল্য ভারতভূমিকে যবনেরা অধীনতাশৃঙ্খলে বদ্ধ করবে, তা মনে করাই মৃত্যুর অধিক। ভারতভূমি পরাধীন হবার পূর্বে প্রত্যেক ভারতসন্তান প্রাণত্যাগ করুক। যে ইহার জন্য প্রস্তুত নয় ত্রিভুবনে যেন তার স্থান না হয়। আমি আপনাকে মা বলে ডাকবার অনুপযুক্ত যদি ভারতভূমির জন্য প্রাণ দিতে না পারি।" [চতুর্থ অঙ্ক, দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক]

নাটকীয় প্রয়োজনেই হয়ত নাট্যকার সত্যসখার মুখে এ সংলাপ আরোপ করেছেন। 'হেমলতা' নাটকের এই বীরত্বপূর্ণ অংশগুলিই অভিনয়ের আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছিল সম্ভবতঃ। 'হেমলতা' নাটকের প্রথম অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে ১৮৭৩ সনের ১৩ই ডিসেম্বর। "অমৃতবাজারে"-এর সমালোচনা প্রকাশিত হয়,—

"বাংলা সাহিত্যে যদি বীররসপ্রধান পুস্তকের অসদ্ভাব থাকে তবে সে পাঠকের কি শ্রোতার অভাবে নহে—গত শনিবার ন্যাশনাল থিয়েটরে "হেমলতা" নাটকের অভিনয়ে আমরা ইহার আর একটি প্রমাণ পাইয়াছি। নাটকখানি যেরূপ পাঠোপযোগী হইয়াছে, উহা সেইরূপ অভিনয়োপযোগী হইয়াছে।—আমরা কলিকাতার রঙ্গভূমিতে যে সকল নাটকের অভিনয় দেখিয়াছি 'হেমলতার' ন্যায় কোন নাটকই এত কৃতকার্য হয় নাই।" [১৮ই ডিসেম্বর, ১৮৭৩]

"হেমলতা" নাটকের প্রতি সুধীসমাজের সপ্রশংস দৃষ্টি যে পড়েছিল—এ সমালোচনায় তার আভাস পাওয়া যাবে। অভিনয়ধন্য নাটক হিসেবেই শুধু নয়,—এ নাটকের পাঠযোগ্যতাকেও স্বীকার করা হয়েছে। বিষয়বস্তু পরিকল্পনায় রোমান্টিকতার প্রভাব নাট্যকার এড়াতে পারেননি। বস্তুতঃ স্বদেশপ্রেম এক ধরনের রোমান্টিক বৃত্তিরই অনুশীলন—বাস্তবতার সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া যাবে না। দেশাদর্শের কল্পনায় বাস্তবের ছোঁয়াচ তখনও আমাদের জীবনেই লাগেনি, সাহিত্যিকের কল্পনায় কোনমতে তা স্থান করে নিয়েছে মাত্র। সেই মুহূর্তেই নাট্যকার দেশপ্রেমভিত্তিক একটি পূর্ণাঙ্গ নাটকের পরিকল্পনা করেছিলেন, এই পরিকল্পনাই ভবিষ্যতের নাট্যকারগোষ্ঠী কর্তৃক গৃহীত হয়েছিলো, এখানেই হরলাল রায়ের কৃতিত্ব। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পূর্বসূরী হিসেবে এই কৃতিত্বটুকু লক্ষ্যণীয়।

'হেমলতা' প্রসঙ্গে শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন,—"হেমলতা [১৮৭৩] রোমান্টিক নাটক এবং কতকটা ইংরাজী আদর্শে পরিকল্পিত।"২৬

দেশচেতনার মূলেই যখন পাশ্চাত্ত্য প্রভাব রয়েছে—তখন দেশপ্রেমমূলক সৃষ্টিতে তার পূর্ণ প্রতিফলন থাকাটাই স্বাভাবিক। রঙ্গলালের স্বদেশপ্রেমাত্মক কবিতায় টমাস মুরের প্রভাব যেমন স্পষ্ট, হরলাল রায়ের পূর্ণাঙ্গ দেশপ্রেমাত্মক নাটকে বিদেশী ভাবাদর্শের প্রতিফলন তেমনই স্পষ্ট। তবে এদেশীয় ভাবধারায় দেশচেতনা যখন সর্বজনীন অনুভূতিতে পরিণত হয়েছে,—সে মুহূর্তে সত্যসখার ভাবাবেগপূর্ণ নাটকীয় উক্তিকে নিতান্তই বিদেশীবস্তু বলে মনে হয় না। যবনবিদ্বেষ, অতীতমহিমা স্মরণ, হিন্দুসভ্যতার মহিমাকীর্তনে সমগ্র বাংলা কাব্য যখন স্ফীত হয়ে উঠেছে,—সে মুহূর্তেই এ নাটকের পরিকল্পনা। সেদিক থেকে সমসাময়িক বাংলাকাব্যের প্রভাবও এতে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে।

সত্যসখার বীরত্বপূর্ণ উক্তিতে দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ লক্ষ্যণীয়—কিন্তু সেকালীন প্রয়োজনের সঙ্গে স্বদেশপ্রেমিক নাট্যকারের অনুভব মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। ভারতসন্তানের কাছে স্বাধীনতার মূল্য জীবনের চেয়েও অনেক বেশী। আর স্বাধীনতাবিহীন জীবনের প্রতি নাট্যকারের ঘৃণাই এ সংলাপের মাধ্যমে উচ্চারিত হয়েছে। শুধু মাত্র সত্যসখার উক্তি নয়, নাট্যকারের গভীর বিশ্বাস ও আদর্শেরই কথা এ। নাটকীয় প্রয়োজন ও নাট্যকারের অনুভাবনা এ সংলাপে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। পরাধীনতার জ্বালা সত্যসখার জীবনে যে তিক্ততা সৃজন করেছে উনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনচেতা প্রতিটি মানুষের মনে সেই তিক্ততা ছেয়ে ফেলেছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়ারূপে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখার পালা শুরু হল চেতন-অবচেতন মনে। উনবিংশ শতাব্দীর সদ্যজাগ্রত স্বাধীনতা চিন্তায় চিতোরের গৌরবের, স্বাধীনতার মুহূর্তগুলি সেকারণেই নাট্যকার, কবি ও স্রষ্টাকে আকর্ষণ করেছিল। চিতোরের ইতিহাসেই আত্মদানের সংকল্প, বাণী ও স্বাধীনতার জন্য আকুলতা দেখা দিয়েছিল, তাই সত্যসখার মুখে এ শপথবাক্য বেমানান হয়নি। ভারতভূমির স্বাধীনতা রক্ষার দায়িত্ব এমনি ভাবে প্রতিটি মানুষের চিন্তাকে অধিকার করবে নাট্যকার সম্ভবত এই আশায় সত্যসখা চরিত্রটি কল্পনা করেছিলেন। সুতরাং 'হেমলতা' নাটকে সত্যসখাই নাট্যকারের স্বদেশচিন্তা ও আদর্শের বাণী বহন করছে। যে মুহূর্তে সত্যসখা আমাদের সামনে এসেছে নাটকের উচ্ছ্বসিত আবেগের বাণী আমাদের চিত্তকে অভিভূত করে ফেলে। সত্যসখা চিতোর উদ্ধারের সংকল্প করে বলেছে,—

২৬. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় খণ্ড। বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬২, পৃঃ ২৫৪।

"স্বাধীনতার কাছে জীবন কি ?···যদি তোমাদের স্বদেশের প্রতি অনুরাগ থাকে, যদি স্বাধীনতাকে তৃণজ্ঞান না কর, যদি হিন্দুধর্মে তিলার্দ্ধ শ্রদ্ধা থাকে সকলে চল ম্লেচ্ছদিগকে দূরীভূত করি ।···স্বাধীনতা তোমাদের বল, স্বদেশানুরাগ তোমাদের বল, হিন্দুধর্ম আমাদের বল, দেবাদিদেব মহাদেব আমাদের বল ।" [৪র্থ অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]

এ উক্তি যে কোন দেশপ্রেমিকের বীজমন্ত্র হতে পারে ।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেশপ্রেম নাটকে বিভিন্ন ধারায় উৎসারিত হয়েছিল এবং তাঁর প্রতিটি মৌলিক ইতিহাসাশ্রিত পূর্ণাঙ্গ নাটকেই স্বদেশভাবনা মুখ্যরূপে দেখা দিয়েছিল । 'হেমলতা' নাটকটিও পূর্ণাঙ্গ ও ইতিহাসাশ্রিত নাটক । তবে ঐতিহাসিক একটি স্থানের মাহাত্ম্য ছাড়া ঐতিহাসিক কোন চরিত্র, ঘটনা ও চেতনার পরিচয় নাটকে নেই । সুতরাং মৌলিক রচনা বলেই নাটকটির পরিচয় দেওয়া যায় । "ভারতমাতা', 'ভারতে যবন' ইত্যাদি ক্ষুদ্র নাটিকায় স্বদেশপ্রসঙ্গই জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে । নাট্যকার হরলাল রায় সর্বপ্রথম স্বদেশাত্মক পূর্ণাঙ্গ নাটকের পরিকল্পনা করে জনগণের ক্রমবর্ধমান স্বদেশানুবাগের আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম পরিচয় স্বদেশপ্রেমী নাট্যকাররূপে । কিন্তু স্বদেশভাবনার প্রবহমান ধারাটির সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল বলেই আমাদের ধারণা । নাটক অভিনয়ের উৎসাহ নিয়েই প্রথম জীবনে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন । এই সময়েই বঙ্গ-রঙ্গমঞ্চ ও সেকালের নাট্যোৎসাহী জনসমাজের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছিল । তিনিই স্বদেশপ্রেমকে নাটকে একটা বিশেষ বক্তব্য করে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন কিন্তু এর প্রেরণা দিয়েছিল সেযুগে নাট্যকার-বর্গ ও উৎসাহী নাট্যরসিকদের সময়োচিত অভিনন্দন । হরলালের "হেমলতা" নাটকেই আমরা মোটামুটি স্বদেশভাবনার একটা সংহতরূপ প্রত্যক্ষ করেছি,—বিশুদ্ধ দেশচিন্তাই ছিল নাট্যকারের প্রধান অবলম্বন । কিন্তু সফল নাট্যকার হিসেবে হরলাল রায়ের কোনো বিশিষ্ট পরিচয় নেই বলেই তাঁব উদ্দেশ্যের মহত্ত্ব আজকের অনুসন্ধিৎসু পাঠকদের পরিশ্রম করে আবিষ্কার করতে হয় । তিনি হারিয়ে গেছেন অজ্ঞাত নাট্যকারদের মাঝখানে । এর প্রথম কারণ এই হতে পারে, তিনি যে বিষয়ে নাটক লিখে বিশিষ্টতা অর্জনে সমর্থ হয়েছিলেন সে বিষয়ে অধিকচর্চার বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করা । অর্থাৎ মনোযোগ আকর্ষণ করেও তিনি একাধিক নাটক রচনা না করে থেমে গেলেন । অথচ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একই বক্তব্য বারংবার প্রকাশ করার অনলস প্রচেষ্টায় জয়ী হলেন । স্বদেশভাবনার বিষয় নিয়ে তিনি পরপর চারটি নাটক লিখেছিলেন অথচ 'হেমলতার' মত অভিনয়-সফল নাটক আরও লিখে এ বক্তব্য প্রচার করার অনলস সাধনা নাট্যকার হরলালের ছিল না । তিনি অবশ্য অন্যধরণের নাটক লিখেছিলেন ।

আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করতে হয় যে হরলাল তাঁর সীমিত প্রতিভা ও সামান্য প্রতিষ্ঠা অবলম্বন করেই পৃথিবীখ্যাত নাট্যকারদের শ্রেষ্ঠ নাটকের অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন। সেক্সপীয়ারের "ম্যাকবেথ" অবলম্বনে "রুদ্রপাল" কালিদাসের "অভিজ্ঞান শকুন্তলমের" অনুবাদ করেছেন 'কনকপদ্ম' নামে। নিজের প্রতিভার অনন্যতা ও বক্তব্যের মৌলিকত্ব অনুসন্ধানের বিন্দুমাত্র চেষ্টা না করে খ্যাতিলাভের স্থলভ চেষ্টায় মেতে না থাকলে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অগ্রজ স্বদেশপ্রেমী নাট্যকার হিসেবে হরলাল রায় ইতিহাসে স্থান পেতেও পারতেন। কিন্তু প্রতিভার দুর্বলতা, আত্মআবিষ্কারের অক্ষমতাই তাঁর অসাফল্যের কারণ হিসেবে উল্লিখিত হবে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে হরলাল রায়ের রচনাগত সাদৃশ্যও দুর্লক্ষ্য নয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথও দেশী ও বিদেশী প্রখ্যাতনামা নাট্যকারদের অনুসরণে অনুবাদ নাটক রচনা করেছিলেন। এ যুগের স্বদেশপ্রেমী নাট্যকার রূপে যিনি সর্বজনপরিচিত সেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিচয় ঠাকুর পরিবারের সন্তান রূপে। তাঁর আদর্শ ও খ্যাতির আলোচনা কালে ঠাকুর পরিবারের প্রসঙ্গ এসে পড়ে সবার আগে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ঠাকুর পরিবারের অবদানের উল্লেখ না থাকলে সে ইতিহাস অপূর্ণ রচনা বলে চিহ্নিত হবে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্বাধীনচেতনার নানা প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' ও মহর্ষির 'আত্মচরিত' পাঠেই জানা যায়। মহর্ষির দেবোপম চরিত্রের প্রভাব তাঁর সন্তানদের চরিত্রে উত্তরাধিকার সূত্রেই বর্তেছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ পিতার স্বদেশপ্রেমাদর্শ ও ঠাকুর পরিবারের স্বাদেশিকতার আবহাওয়ার মধ্যেই জন্মেছিলেন। তাঁর ধ্যানধারণা, শিক্ষাদীক্ষা, স্বপ্ন ও কল্পনার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ীর সংস্কার ও স্বাধীনচিন্তা ওতপ্রোত হয়ে আছে। সুতরাং জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধের আদর্শ ব্যাখ্যা করতে পারলেই তাঁর চিন্তাজগতের স্বরূপ বিশ্লেষণে আমাদের অসুবিধে হবে না।

নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যসম্ভারে স্বদেশচিন্তার যথার্থ রূপ আবিষ্কারই আমাদের উদ্দেশ্য হলেও স্বদেশপ্রেমিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বিভিন্ন পরিচয় অন্যত্রও রয়েছে। তিনি নাট্যকার রূপে পরিচিত হওয়ার বহুপূর্বেই স্বাধীন মননের ও চিন্তনের পরিচয় দিয়েছিলেন নানা কাজে। ঠাকুরবাড়ীতে অভিনয়-ব্যবস্থার প্রধান উদ্যোক্তাদের মধ্যে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ; —তাঁরাই এর পরিকল্পনা করেছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাট্যরচনার সঙ্গে তাঁর নাট্যাভিনয়ের প্রতি একান্ত আগ্রহের যোগ রয়েছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশচর্চার বিভিন্ন পন্থার কথাও রবীন্দ্রনাথ জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন। নিতান্ত বাল্যকালের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ যে সব আশ্চর্য ঘটনা তাঁদের বাড়ীতে ঘটতে দেখেছিলেন,

সবকিছুর সঙ্গে জ্যোতিদাদার ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশচর্চাও নানারূপে বিকশিত হয়ে উঠেছিল।

সম্ভব ও অসম্ভব নানা কল্পনার মাধ্যমে সেদিনের অত্যুৎসাহী স্বদেশপ্রেমীরা দেশ ও জাতির উদ্ধারের অথবা কল্যাণের বিষয় চিন্তা করতেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অমিত উদ্যম ও উৎসাহ নানা অবাস্তব কল্পনায় কি ভাবে উদ্দাম হয়ে উঠত,—জীবনস্মৃতির পাতায় তার বিবরণ রয়েছে। "স্বাদেশিকের সভা" স্থাপন করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখতেন, - গঠনমূলক অনুষ্ঠানসূচীও তৈরী করেছিলেন নিখুঁত ভাবে। একই সময়ে "হিন্দুমেলা"-র উত্তেজনা চলছিল। ১৮৬৭ খ্রীঃ 'চৈত্রমেলার' প্রথম উৎসবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু ১৮৬৮ খ্রীঃ হিন্দুমেলায় 'উদ্বোধন' কবিতাটি নিজেই রচনা করলেন, মেতে উঠলেন সেই 'জাতীয় মেলাটি' নিয়ে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তখন ১৯।২০ বৎসরের যুবক। নবগোপাল মিত্র ও রাজনারায়ণ বসুর মত স্বদেশপ্রেমীদের সংস্পর্শে এসে তাঁর যুবচিত্তের চাঞ্চল্য আরও উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। দেশচিন্তার ধ্যানে এঁরা তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে' বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন,—

"নবগোপাল বাবু দেখা হইলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে উত্তেজনাপূর্ণ জাতীয় ভাবের কবিতা লিখিতে অনুরোধ করিতেন। জ্যোতিবাবু এ সময়ে কবিতা লিখিতেন না বা ইহার পূর্বেও কখনও লেখেন নাই।"[২৭]

এর পরের ঘটনায় দেখি, হিন্দুমেলার পঠিত কবিতাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথই রচনা করেছেন। দেশকে ভালবাসার যে প্রেরণা এসেছিল সে যুগের আবহাওয়া থেকে,—জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মনে তার ঢেউ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। এই ভালবাসা নিষ্ক্রিয় দেশাভিমান নয়,—সংগঠনমূলক চিন্তাভাবনায় এই দেশপ্রেমের অকলঙ্ক রূপটি উদ্ভাসিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিজের জীবনে সৎ আদর্শের ছবিগুলি নানাভাবে চিত্রিত করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। "স্বাদেশিকতা" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জ্যোতিদাদার আন্তরিক প্রচেষ্টায় যে দেশপ্রেম স্ফুরিত হয়েছিল সে প্রসঙ্গে বলেছেন,—

"ভারতবর্ষের একটা সর্বজনীন পরিচ্ছদ কী হইতে পারে, এই সভায় জ্যোতিদাদা তাহার নানা প্রকারের নমুনা উপস্থিত করিতে আরম্ভ করিলেন···এইরূপ সর্বজনীন পোশাকের নমুনা সর্বজনে গ্রহণ করিবার পূর্বেই একলা নিজে ব্যবহার করিতে পারা যে-সে লোকের সাধ্য নহে। জ্যোতিদাদা অম্লান বদনে এই কাপড় পরিয়া মধ্যাহ্নের প্রখর আলোকে গাড়িতে গিয়া উঠিতেন—আত্মীয় এবং বান্ধব, দ্বারী এবং সারথি

২৭. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি, ১৩২৬, পৃঃ ১২৮।

সকলেই অবাক হইয়া তাকাইত, তিনি ভ্রূক্ষেপমাত্র করিতেন না। দেশের জন্য অকাতরে প্রাণ দিতে পারে এমন বীরপুরুষ অনেক থাকিতে পারে কিন্তু দেশের মঙ্গলের জন্য সর্বজনীন পোষাক পরিয়া গাড়ি করিয়া কলিকাতার রাস্তা দিয়া যাইতে পারে এমন লোক নিশ্চয়ই বিরল।"

স্বদেশপ্রাণ জ্যোতিদাদার প্রতি প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধাই রবীন্দ্রনাথ এখানে ব্যক্ত করেছেন। স্বদেশপ্রেমিক কবি ও সাহিত্যিকদের স্বদেশভাবনার রূপ তাঁদের কাব্যে ও সাহিত্যেই স্থান পেয়েছে কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক মানুষের জীবনবৃত্তান্ত এমনভাবে পাইনি আমরা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি গ্রন্থটিতেও তাঁর স্বদেশভাবনার সঙ্গে স্বদেশপ্রেমিক জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মিলিত রূপ খুঁজে পাওয়া যায়। স্বদেশচিন্তাই তাঁর সবচেয়ে পবিত্রতম চিন্তা ছিল এবং কখনও কখনও মনে হবে তাঁর সব চিন্তাই স্বদেশচিন্তার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পরাধীন ও লাঞ্ছিত ভারতের মুক্তি সাধনের ব্রতপালনে অগ্রণী চিন্তানায়কদের পুরোভাগে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্থান নির্দেশিত হতে পারে।

স্বদেশীয়ানা বস্তুটি শুধুমাত্র কাব্য-কবিতার বিষয় হয়ে থাকুক কিংবা নিছক পাঠ্য বিষয়েই নিহিত থাকুক—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর কয়েকজন সহকর্মী বন্ধু প্রথম এর প্রতিবাদ করেন। হিন্দুমেলার পরিকল্পনা, সম্মিলিত স্বদেশী ব্যবসায়ের পত্তন, আত্মনির্ভরশীল হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের অক্লান্ত চেষ্টা করেছিলেন এঁরা। রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই তিনজনই কল্পলোক থেকে বাস্তবে স্বদেশীয়ানার ভিত্তিস্থাপনের চেষ্টায় এগিয়ে এসেছিলেন। দেশলাই কাঠির ব্যবসা থেকে স্বদেশী জাহাজকোম্পানি খোলার নানারকম অবাস্তব কল্পনাও এঁদের উৎসাহেই শুরু হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যম যে কোনদিনই দমিত হয়নি, তার প্রমাণ পরবর্তীকালে বহু অর্থের ঝুঁকি নিয়েও তিনি জাহাজের স্বদেশী ব্যবসায় আরম্ভ করে ব্যর্থ ও ঋণগ্রস্ত হন। এসব দৃষ্টান্ত থেকে আমরা একজন স্বদেশপ্রাণ ও স্বদেশসর্বস্ব দেশপ্রেমিকের পরিচয় পাই যিনি দেশের জন্য যে কোন সৎ উদ্যমের পুরোভাগে থাকতেন।

ঠাকুরবাড়ীতে কলাচর্চার প্রশস্ত অবসর ছিল, এই পরিবেশেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুধু বাণীর সেবক না হয়ে কর্মযোগী হবার নেশায়ও মেতে উঠলেন; সহজাত কাব্য-প্রতিভা ছিল বলেই সাহিত্যের সেবা না করে তাঁর উপায়ও ছিল না। কর্ম ও সাহিত্যসেবার দ্বৈত ব্রত সাধনের অক্লান্ত চেষ্টার ইতিহাসই তার জীবনকাহিনী।

হিন্দুমেলার জন্য লিখিত স্বদেশপ্রেমের কবিতা রচনার আগে লেখক হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিচয় নেই। হিন্দুমেলার জন্য স্বদেশী গান রচনার একটা আগ্রহ ঠাকুরবাড়ীর অন্যান্যদের মধ্যেও দেখা গেছে। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ,

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রত্যেকেই হিন্দুমেলার জন্ম স্বদেশী সংগীত রচনা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ "জীবনস্মৃতিতে" এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—

"সাহিত্য এবং ললিতকলায় তাঁহাদের উৎসাহের সীমা ছিল না। বাংলার আধুনিক যুগকে যেন তাঁহারা সকল দিক দিয়াই উদ্বোধিত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। বেশে-ভূষায়, কাব্যে-গানে, চিত্রে-নাট্যে, ধর্মে-স্বাদেশিকতায়, সকল বিষয়েই তাঁহাদের মনে একটি সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ জাতীয়তার আদর্শ জাগিয়া উঠিতেছিল।...বাংলায় দেশানুরাগের গান ও কবিতার প্রথম সূত্রপাত তাঁহারাই করিয়া গিয়াছেন।"

[জীবনস্মৃতি, বাড়ির আবহাওয়া]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার জন্য অনুরুদ্ধ হয়েই স্বদেশপ্রেমের কবিতা লিখেছিলেন বটে কিন্তু স্বদেশভাবনার নির্মল স্রোত নিরন্তর তাঁর মনে প্রবাহিত হোতো। ১৮৬৮ সনের দ্বিতীয় বাৎসরিক মেলার জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'উদ্বোধন' কবিতাটি,—

জাগ জাগ জাগ সবে ভারত সন্তান!
মাকে ভুলি কতকাল রহিবে শয়ান?
ভারতের পূর্বকীর্তি করহ স্মরণ;
রবে আর কতকাল মুদিয়ে নয়ন?

স্বদেশপ্রেমোদ্বেল অন্তরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ অংশ রচনা করেছিলেন, বিষয়বস্তু ও প্রকাশভঙ্গিতেই তা পরিস্ফুট। 'হিন্দুমেলার' আদর্শ থেকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যে স্বদেশহিত সাধনের প্রেরণা লাভ করেছিলেন তা নয়, স্বদেশপ্রেমী বলেই হিন্দুমেলার তাৎপর্য তিনি অত্যন্ত গভীরভাবে অনুধাবন করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে 'জীবনস্মৃতিতে' তাঁর বক্তব্য,—

"হিন্দুমেলার পর হইতে, কেবলই আমার মনে হইত—কি উপায়ে দেশের প্রতি লোকের অনুরাগ ও স্বদেশপ্রীতি উদ্বোধিত হইতে পারে। শেষে স্থির করিলাম, নাটকে ঐতিহাসিক বীরত্ব গাথা ও ভারতের গৌরব কাহিনী কীর্তন করিলে, হয়ত কতকটা উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলেও হইতে পারে। এই ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া, কটকে থাকিতে থাকিতেই, আমি পুরুবিক্রম নাটকখানি রচনা করিয়া ফেলিলাম।"

[জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি পৃঃ ১৪১]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক নাটক রচনার কারণ হিসাবে উদ্ধৃত মন্তব্যটিকে মূল্যবান বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে। স্বদেশভাবনাকে নিতান্ত ব্যক্তিগত চিন্তা বলে মনে করতেন না তিনি। এই পবিত্র ভাবনাই প্রতিটি মানুষের মনে সঞ্চারিত করবার কথাই তিনি চিন্তা করেছিলেন। নাটকের অভিনয় দেখে জনসাধারণ যদি

দেশকে ভালবাসার শিক্ষালাভ করে নাট্যকারের সার্থকতা হবে সেটুকুই। সুতরাং দেশপ্রেমে ভরপুর হয়ে তিনি যে নাটক রচনার আয়োজন করলেন, তার ভিতরের উদ্দেশ্যটি কোথাও গোপন হয়ে রইলনা। দেশবাসীর সামনে প্রাচীন ঐতিহ্যের, বীরত্বের, শৌর্যের চিত্র তিনি তুলে ধরেছিলেন এবং উৎকণ্ঠিতচিত্ত নিয়ে অপেক্ষা করেছেন, সে বক্তব্য যোগ্যস্থানে অনুরণিত হোল কি না। "পুরুবিক্রম" রচিত হয়েছিল কটকে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যৌবনের উত্তেজনাময় মুহূর্তে কর্মশক্তি ও স্বদেশ-ধ্যানতন্ময়তা নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। তাই বাংলাদেশ থেকে, কোলাহল থেকে, প্রকৃতির শান্ত আবেষ্টনীতে এসেই প্রতিভাবান নাট্যকারের সৃজনী প্রতিভা শতধারে উৎসারিত হয়েছিল।

'পুরুবিক্রমই' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম মৌলিক নাটক। ইতিপূর্বে 'কিঞ্চিৎ জলযোগ' [১৮৭২] রচিত হয়েছিল,—রঙ্গমঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হওয়ার সুযোগও লাভ করেছিলো নাটকটি। সুতরাং নাট্যকার হিসেবে তাঁর পরিচয় হয়ত নতুন নয় কিন্তু মৌলিক নাট্যকার হিসেবে প্রথম পূর্ণাঙ্গ নাট্যপ্রতিভার পরিচয় দেবার সুযোগ পেলেন "পুরুবিক্রম" নাটকেই। সেদিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভার স্ফূর্তি স্বদেশাত্মক নাটকেই ধরা পড়েছে।

'পুরুবিক্রম' প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমালোচকবৃন্দ এর প্রশংসায় মুখর হয়েছিলেন। সমালোচক শ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র নিপুণ সমালোচনায় এ সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে নাটকটি বীররসের খতিয়ান। অবশ্য বঙ্কিমচন্দ্র অনেক আশা নিয়ে নাটকটি বিচার করতে গিয়েই কিছুটা হতাশ হয়েছিলেন।

১২৮১ সালের ভাদ্র মাসের 'বঙ্গদর্শনে' 'পুরুবিক্রমের' সমালোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন,—

"এই উপন্যাসে বৈচিত্র আছে। কিন্তু লেখার তাদৃশ বৈচিত্র নাই। সকলেই কাটা কাটা কথা কহে। লেখক যে কৃতবিদ্য ও নাটকের রীতিনীতি বিলক্ষণ জানেন তাহা গ্রন্থ পড়িলেই বোধ হয়। গ্রন্থখানি বীররস প্রধান এবং গ্রন্থে বীরোচিত বাক্যবিন্যাস বিস্তর আছে বটে, কিন্তু সকল স্থানেই যেন বীররসের খতিয়ান বলিয়া বোধ হয়। আন্তরিক ভাব বলিয়া বোধ হয় না। কে যেন বলিল, কে যেন শুনিল, কে যেন সেই কথাগুলি ছাপিয়াছে আর আমরা পড়িলাম। নহিলে অঙ্গ কণ্টকিত হইল না কেন? গ্রন্থের মর্মভেদকতার অভাবে আমাদের দুঃখ হইয়াছে।"

বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমাত্মক নাটকে শুধু বীররসের হুংকার ও বক্তৃতার আধিক্য আশা করেননি। স্বদেশপ্রেমের গভীরতা ও আন্তরিকতার প্রকাশ ব্যাহত হলে সবই কথার কথা হয়ে যায়,—যে মহৎ উদ্দেশ্যে এ নাটকের জন্ম,—জনগণের মনে দেশাত্মবোধ

জাগিয়ে তোলা,—তাও ব্যাহত হয়। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের গভীরতা আবিষ্কার করতে পারেননি বলেই অকপটে সমালোচনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনার উদ্দেশ্যটি কিন্তু নাটকের বহিরাঙ্গিক সমালোচনা মাত্র নয়,—তিনি নাটকের ফলশ্রুতির বিষয় চিন্তা করেই আক্ষেপ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে স্বদেশাত্মক সংলাপ আমাদের অন্তরের সুপ্ততন্ত্রীতে আঘাত হানবে, আমরা উত্তেজিত হবো। যথার্থ স্বদেশপ্রেমিকের মতই বঙ্কিমচন্দ্র 'পুরুবিক্রমের' সমালোচনা করেছিলেন। "পুরুবিক্রমে" যথেষ্ট বীররস থাকতে পারে কিন্তু আন্তরিক উদ্দেশ্যটি হচ্ছে স্বদেশপ্রেম উদ্বোধিত করা। অনেক সময়ই নাটকের পাত্র পাত্রীর সংলাপে ভাবাবেগের আধিক্য স্বাভাবিকতা ও আন্তরিকতার প্রতিবন্ধকতা করেছে। অবশ্য সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র একটু কঠোর সমালোচনাই করেছিলেন, তা না হলে সে যুগের অন্যান্য নাটকের সঙ্গে তুলনা করলেই 'পুরুবিক্রমের' প্রশংসনীয় দিকগুলো চোখে পড়বেই।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম মৌলিক নাটক হিসেবে 'পুরুবিক্রমের' ঘটনা, চরিত্র ও বক্তব্য উপস্থাপনের মধ্যে কিছু দোষত্রুটি থাকা সম্ভব। কিন্তু উদ্দেশ্যের প্রসঙ্গটি সবকিছু ছাপিয়ে বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল এ নাটকে। দেশপ্রেমের আদর্শ প্রত্যেকটি ঘটনা ও চরিত্রের ওপরে প্রভাব ফেলেছে। নাট্যকারও এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন। 'পুরুবিক্রম নাটকের' সঙ্গে ইতিহাসের যোগ নিশ্চয়ই আছে কিন্তু ঐতিহাসিকতা বজায় রাখার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি নাট্যকার। সম্পূর্ণ মৌলিক কাহিনীর সঙ্গে ঐতিহাসিক দু'একটি নামের যোগাযোগ ঘটিয়েছেন নাট্যকার। কিন্তু যেহেতু নামগুলির ঐতিহাসিক পরিচয় আছে, নাট্যকার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন মূল ঐতিহাসিক ঘটনা যেন অবিকৃত থাকে। পুরু ও সেকেন্দর শা ঐতিহাসিক চরিত্র। সেকেন্দর শা সেযুগে পাঞ্জাব আক্রমণ করেছিলেন,—পাঞ্জাবের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জনপদের নৃপতিরা যে সংঘবদ্ধ হয়ে আক্রমণকারীকে বাধা দিতে পারেননি এ ঘটনাটিও ঐতিহাসিক। কিন্তু তারই মধ্যে স্বাধীনরাজা পুরুর স্বদেশপ্রেমের টুকরো কাহিনী ইতিহাসে সত্যকাহিনীর মর্যাদা পেয়ে আসছে। নাট্যকার এই সামান্য ঐতিহাসিক ঘটনাটিকে নাটকে বিস্তৃতভাবে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। নাটকীয় প্রয়োজনে অনেক চরিত্র তাঁকে কল্পনা করে নিতে হয়েছে,—ঘটনাকে নাটকীয় রূপ দেবার জন্য কল্পিত জটিলতা সৃষ্টি করতে হয়েছে। পুরুর স্বাধীনতার আদর্শটি কিন্তু সমস্ত ঘটনা ও জটিলতার আবর্তেও অম্লান রূপে বর্তমান ছিল,—সম্ভবতঃ একারণেই নাটকের নাম "পুরুবিক্রম"। স্বদেশভাবনার ঘনীভূত রূপ নাটকের মধ্যে তুলে ধরার প্রয়াস নিয়েই তাঁর যাত্রা শুরু,—নাট্যকারও সে বিষয়ে অকপটচিত্ত। সমসাময়িক দেশপ্রেমোচ্ছ্বাসের দ্বারা আক্রান্ত না হলে হয়ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ ধরনের আদর্শ

প্রচারে ব্রতী হতেন না। তাই ঐতিহাসিকতা নয়, এই শ্রেণীর নাটকের বিচার হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শে। দেশপ্রেমমূলক ভাবনা ইতিহাসের সামান্য অবলম্বন গ্রহণ করে কি ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল, -তা'রই দৃষ্টান্ত হিসেবে এ নাটকের উল্লেখ করতে হয়। শ্রীসুকুমারসেন বলেছেন এ প্রসঙ্গে,—

"জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর উদ্যোগে হিন্দুমেলার মধ্য দিয়া যে দেশপ্রিয়তার উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল, সাহিত্যে তাহার মুখ্য অভিব্যক্তি হইল "পুরুবিক্রমে।" এই পঞ্চাঙ্ক নাটকখানির রচনার মধ্যে বাংলাদেশের সমসাময়িক ইতিহাসের একটুখানি হৃদয়োচ্ছ্বাস স্তব্ধ হইয়া আছে।"[২৮]

'পুরুবিক্রম নাটকে' উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশাত্মক চিন্তাভাবনারই প্রতিফলন পড়েছিল। যদিও নাটকের ঘটনা সম্পর্কে ঐতিহাসিক সচেতনতা থাকা দরকার—তবু বলব পুরু-সেকেন্দরের ইতিহাসের চেয়ে সেকালীন বাংলাদেশের অগণিত স্বদেশানুরাগী মানুষের মনে দেশপ্রেমের যে বহ্নি জ্বলে উঠেছিল নাট্যকার অতীত ইতিহাসের স্বল্প পরিচিত চরিত্রের মধ্যে তারই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছেন। 'পুরুবিক্রম' নাটকের চরিত্রগুলোকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করে ফেলতে পারি,—একটি সম্প্রদায়—যারা দেশপ্রেমাদর্শ বহন করে চলেছে, অন্য সম্প্রদায় দেশের স্বাধীনতার চেয়ে ব্যক্তিগত স্বার্থকে বড়ো করে দেখছে। এই দুইদলের সম্পর্কে নাট্যকারের ভিন্ন ধারণা এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং একান্তভাবেই স্বদেশভাবনামুখ্য নাটক হিসেবে 'পুরুবিক্রমের' বিচার হতে পারে। স্বদেশপ্রেমাদর্শই এ নাটকের চরিত্রগুলোর দীপ্তি—তার অভাবে অন্য চরিত্রগুলো নিষ্প্রভ ও ম্লান। নাট্যকারের আদর্শ আমাদের অন্তরেও এমন প্রভাব সৃষ্টি করেছে যার ফলে স্বদেশপ্রেমী চরিত্রগুলিই আমাদের সহানুভূতি লাভ করেছে,—স্বদেশভাবনার অভাব যে চরিত্রে প্রত্যক্ষ করেছি, তাকে আমরাও ক্ষমা করতে পারিনি।

স্বদেশপ্রেমের নির্মল আদর্শ এ নাটকের স্ত্রী ও পুরুষ চরিত্রে সমভাবে আরোপিত হয়েছে। পুরুষের মতই নারীর স্বদেশচেতনার গভীরতা নাট্যকার এ নাটকে তুলে ধরেছেন। শুধু তাই নয়, এ নাটকের নায়িকা ঐলবিলা দেশপ্রেমিকা, ব্যক্তিগত প্রেম-ভালবাসাকে সে স্বদেশপ্রেমের মত মূল্যবান মনে করে না—স্বদেশপ্রেমাদর্শই তার সমগ্র জীবন নিয়ন্ত্রণ করেছে। অন্যদিকে অম্বালিকা চরিত্রে স্বদেশানুভূতির অভাব ছিল বলে আমাদের সহানুভূতি লাভেও চরিত্রটি বঞ্চিত হয়েছে বলা যায়। তার

২৮. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় খণ্ড। বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬২, পৃ ২৫৮।

ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম-ভালবাসার প্রসঙ্গ অন্যান্য উজ্জ্বল আদর্শের সামনে ম্লান হয়ে গেছে। এ নাটকে সক্রিয় নাটকীয় চরিত্র হিসেবে অম্বালিকা উজ্জ্বল ও সুঅঙ্কিত হয়েছে, কিন্তু দেশবোধের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয় বলে নাট্যকারও এ চরিত্রটির ওপর সুবিচার করেননি। মর্মান্তিক ব্যর্থতায় এই নারী শুধু হাহাকার করেছে। এ নাটকে সাধারণ নারীচরিত্রের মধ্যেও স্বদেশানুরাগ দেখা গেছে। উদাসিনীর পরিকল্পনায় নাটকীয়তা থাকলেও নাট্যকারের উদ্দেশ্যেই তার আবির্ভাব। উদাসিনী নাট্যকারের কল্পিত স্বদেশপ্রাণ নারী—সব হারিয়েও যে শান্তি পেয়েছে দেশপ্রেমের মধ্যে, সব ব্যর্থতাকে যে দেশানুরাগের আবেগে ভুলে থাকতে চেয়েছে। এ সব চরিত্র নাটকের স্বাভাবিকতা বা সৌন্দর্যবৃদ্ধিতে সহায়তা করেনি, নাট্যকারের আদর্শকে তুলে ধরেছে মাত্র। পরবর্তী কালে স্বদেশপ্রেমমূলক নাটকে এ ধরণের নারীচরিত্রের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয়েছে। 'মেবারপতনের' চারণী সত্যবতীর পদধ্বনি যেন উদাসিনীর চরিত্রে শোনা যায়। এদিক থেকে নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কল্পনাশক্তির মৌলিকত্বকে অভিনন্দন জানাতে হয়। স্বদেশচেতনা সঞ্চারে স্ত্রীচরিত্রগুলো যে মুখ্য ভূমিকা নিতে পারে এ নাটকে ঐলবিলা ও উদাসিনী তা প্রমাণ করেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোকে নাট্যকারের চিন্তাধারার এই উদারতাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। এ নাটকে ঐলবিলার স্বপ্ন, আদর্শ ও জীবনবাদের সঙ্গে দেশপ্রেমের যোগ এত গভীর যে নারীসুলভ ভাবাবেগ এ চরিত্রে মাঝে মাঝে দেখা দিয়েছে বটে কিন্তু দেশচিন্তাকে ঢেকে ফেলতে পারেনি। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই দুঃসাহসিকা, স্বদেশসর্বস্ব নারীচরিত্রের মধ্যেই স্বদেশাত্মক চিন্তাধারাকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। মেবার পতনেও দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশপ্রেমের বাণী প্রচারের জন্য দুটি নারী চরিত্রকেই নির্বাচন করেছিলেন। সত্যবতীর দেশাত্মবোধ ও মানসীর দেশপ্রেমের মধ্যে আত্মত্যাগের মহিমাকে নাট্যকার তুলে ধরেছিলেন। এঁরা উভয়েই ব্যক্তিগত স্বার্থচিন্তাকে বিসর্জন দিয়ে স্বদেশের জন্যই প্রাণ উৎসর্গ করেছে। কিন্তু নাট্যকারের বক্তব্য ও নাটকের বিষয়বস্তুকে মেলাতে পারেননি বলেই তাঁর দুটি চরিত্রই অস্বাভাবিক ও আদর্শপ্রচারের যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল চারণী সত্যবতীর নারীত্ব ও স্বাভাবিক চেতনাকে অগ্রাহ্য করেছিলেন,—মানসীর মধ্যে প্রাণস্পন্দনের পরিচয় পাই না, সে যেন ছায়ারূপিনী একটি নারীমূর্তি মাত্র। আবাল্য প্রণয়কে অস্বীকার করে বিশ্বপ্রেমের দোহাই দেওয়াটাই তার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমমূলক নাটকটির পরিকল্পনাগত ত্রুটি এখানেই। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্রনাথ "পুরুবিক্রম" নাটকের নায়িকা ঐলবিলাকে যথাসম্ভব স্বাভাবিক ভাবে অংকন করেছিলেন। দেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে দেশাত্মবোধই একমাত্র চিন্তা হতে পারে—কিন্তু নিতান্ত ব্যক্তিগত ও

আন্তরিক অনুভূতি তাতে নষ্ট হয় না। ঐলবিলা প্রেম-ভালবাসাকে গোপনে লালন করেছে,—প্রণয়ী পুরুর জন্য অধীরপ্রতীক্ষা তাকে চঞ্চল করেছে, কিন্তু দেশের স্বার্থরক্ষার আদর্শ থেকেও সে সরে থাকতে পারেনি। এই দ্বন্দ্বই চরিত্রটির স্বাভাবিক সৌন্দর্য রক্ষা করেছে। ঐলবিলার দেশপ্রেমই তাঁর ব্যক্তিগত প্রেমকে আরও দৃঢ় করেছে। নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রথম মৌলিক নাটক হলেও—চরিত্র সৃষ্টিতে নিখুঁত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি। দেশপ্রেমের আবেগে তাঁর এ নাটকটির রক্তব্য ভারাক্রান্ত হতে পারত,—কিন্তু ঘটনা ও চরিত্র সৃষ্টিতে বৈচিত্র্য ছিল বলেই নাটকীয় গুণ বিনষ্ট হয়নি। ঐলবিলার মত স্বদেশপ্রেমিকা, দুঃসাহসিকা নারী চরিত্রের পাশাপাশি অম্বালিকার বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রেমান্ধতা নাটকীয় বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছে। অম্বালিকাও সুঅঙ্কিত একটি স্বাভাবিক নারী চরিত্র। প্রেমের সঙ্গে দেশপ্রেমের দ্বন্দ্ব তার জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করেনি,—বিজাতীয় শত্রুকে প্রেম-নিবেদন করেই সে ধন্যা হয়েছে। এই দুটি নারী চরিত্রের মধ্যে অলক্ষ্য যোগাযোগ রয়েছে—সমগ্র নাটকটি এই দুটি সক্রিয় নারীই পরিচালনা করেছে বলা যায়।

পুরু ও তক্ষশীল চরিত্রেও নাট্যকার স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল চিত্র রচনা করেছেন। পুরুর স্বদেশপ্রেমই তার চরিত্রের লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য, বিদেশী যবনকে বিতাড়ন না করা পর্যন্ত সে যুদ্ধোন্মত্ত। তক্ষশীলও স্বদেশপ্রেমিক তবে পুরুর দৃঢ়তা তার চরিত্রে নেই। প্রেমের বিফলতা তক্ষশীলকে দুর্বল করে। দেশপ্রেম ও ব্যক্তিপ্রেমই এই দুটি পুরুষ চরিত্রকে চালিত করেছে। পুরুর স্বদেশপ্রেম তার জীবনের সবরকম উপলব্ধির ওপরে ধ্রুবতারার মতই জ্বলছে,—নাট্যকারের কল্পিত আদর্শ নায়ক চরিত্র এটি। তক্ষশীলও চেতনাহীন নন—কিন্তু ভগ্নী অম্বালিকার পরামর্শের প্রভাবে তাকে মাঝে মাঝে দুর্বলের মতই বিচলিত হতে দেখি। তাছাড়া ঐলবিলার প্রেমবঞ্চিত হবার দুঃখ তক্ষশীলকে সর্বদাই চঞ্চল করেছে। তবু এ নাটকের মুখ্য দুটি পুরুষ ভূমিকায় নাট্যকার স্বদেশাত্মক চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছেন সুন্দর ভাবে।

"পুরুবিক্রম নাটকে" নাট্যকার স্বদেশী সঙ্গীতের অবতারণা করেছিলেন। শুধু সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশপ্রেমের বক্তব্য প্রচারের উদ্দেশ্যেই তিনি গায়িকা চরিত্র সৃষ্টি করেছিলেন। অবশ্য 'ভারতমাতা' ও 'ভারতে যবন' ইত্যাদি ক্ষুদ্র নাটিকাতেও স্বদেশাত্মক সঙ্গীত আরোপিত হয়েছিল এবং স্বদেশী সঙ্গীতের দ্বারা দেশপ্রেমের বক্তব্য যে খুব কার্যকরী হয়,—অভিনয়ের মাধ্যমেই তা বোঝা গিয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রচলিত রীতিই গ্রহণ করেছিলেন। তবে শুধু স্বদেশাত্মক সঙ্গীত পরিবেশনের জন্যই নাটকীয় চরিত্র সৃষ্টির প্রয়াস জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকে দেখা যায়। নাটকীয় বিশ্রাম (Dramatic relief) সৃজনের জন্যই সংগীত নয়,—নাটকের বিশেষ বক্তব্যই সঙ্গীতে

পরিবেশিত হবে এই ছিল তার উদ্দেশ্য। "মেবারপতন" নাটকের চারণী সম্প্রদায়ের পরিকল্পনাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'পুরুবিক্রমের' গায়িকা চরিত্রের কাছ থেকে পাওয়া কিছু অসম্ভব নয়—কারণ বাংলা নাট্যসাহিত্যের আদিপর্বের দেশাত্মবোধক নাটকে সংগীতের সাহায্য গ্রহণ করাটা প্রায় নিয়মে দাঁড়িয়ে গেছে। দ্বিজেন্দ্রলাল আরও অনেক পরের যুগের নাট্যকার হলেও তাঁর স্বদেশীনাটকের মোটামুটি ছাঁচটি নিতান্তই পুরাতন ও পূর্বসূরী প্রভাবিত। এ ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রথম পথপ্রদর্শক ও স্বদেশীনাটকের উদ্ভাবনায় তাঁর কৃতিত্ব স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

'পুরুবিক্রমের' কাহিনীর শুরুতেই দেখি দেশের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের প্রসঙ্গ। প্রথমদিকেই নাট্যকার নাটকের মূল সমস্যাটি উত্থাপন করেছেন। পাত্র পাত্রীরাও দেশচিন্তায় মগ্ন। কুলু প্রদেশের স্বাধীন-অবিবাহিতা রানী ঐলবিলা তাঁর সখীর সঙ্গে কথোপকথন করছেন,—

ঐলবিলা—সেদিন গিয়ে আমি পাঞ্জাব প্রদেশস্থ সমস্ত রাজকুমারগণকে যবনদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে দিয়ে এসেছি।···যতদিন না যবনেরা আমাদের প্রিয় জন্মভূমি হতে একেবারে দূরীভূত হচ্ছে, ততদিন আমার আর আরাম নেই, বিশ্রাম নেই।

সুহাসিনী—রাজকুমারি! আমাদের দেশীয় রাজাদের মধ্যে কি কিছুমাত্র ঐক্য আছে যে, আপনি তাঁদের একত্র সম্মিলিত করার জন্য চেষ্টা কচ্ছেন?[২৯]

[১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

উদ্ধৃত কথোপকথন থেকে রানী ঐলবিলার ব্যক্তিত্ব, দূরদর্শিতা ও দেশপ্রেম উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। নারী হলেও চারিত্রিক শক্তির আধার ঐলবিলা। অন্যান্য পার্শ্ববর্তী রাজ্যের রাজারাও যেকথা চিন্তা করেনি রানী তা আগেই চিন্তা করেছেন। যে যুগে পাঞ্জাবপ্রদেশে সেকেন্দরশাহের আক্রমণ শুরু হয়েছিল—সে যুগের বাস্তব চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা প্রসঙ্গেই নাট্যকার ঐতিহাসিকের মতো যুক্তির অবতারণা করেছিলেন সুহাসিনীর উক্তির মাধ্যমে। এই জাতিগত অনৈক্যই আমাদের অধঃপতনের যুক্তি-সঙ্গত কারণ। নাটকারম্ভেই আড়ম্বরহীন সত্যপ্রকাশের এই চেষ্টা প্রশংসনীয়। কল্পিত চরিত্র ও চিত্র রচনা না করে নাট্যকারের উপায় নেই। কিন্তু কল্পনাটি একান্তই অবাস্তব হলে পাঠকেরা খুশী হন না। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিহাসসম্মত যুক্তির সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন প্রথমাবধি।

রাণী ঐলবিলার স্বদেশাত্মক ভাবনার মধ্যেও অসঙ্গতি দেখি না। শক্তিময়ী এই

২৯. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী। ৫ম খণ্ড। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা।

নারীর জীবন ও আদর্শের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগ লক্ষ্য করা যায়। কথাপ্রসঙ্গে সখীকে ঐলবিলা আপন অভিলাষের কথা ব্যক্ত করেছিল,—

"যে রাজকুমার যবনদিগের সহিত যুদ্ধে সর্বাপেক্ষা বীরত্ব প্রকাশ করবেন, আমি তাঁরই পাণিগ্রহণ করব।"

স্বদেশচিন্তা কি ভাবে একটি নারীর ধ্যান ও ধারণায় প্রতিফলিত হল তারই সার্থক কল্পনা এখানে দেখা যায়। স্বদেশপ্রেমের নিরিখে ব্যক্তিকে যাচাই করার চেষ্টাটিও অভিনব। ঐলবিলা অবিবাহিতা রানী—কিন্তু রাজ্য পরিচালনার দায়িত্বে বিন্দুমাত্র অবহেলা করেননি কেন,—একটি সংলাপের মাধ্যমে তা পরিস্ফুট হয়েছে। সুহাসিনীর কথার উত্তরে ঐলবিলা বলেছেন,—"আমার উপরে প্রজাগণের সুখস্বচ্ছন্দতা, স্বাধীনতা, সমস্ত নির্ভর কচ্চে। দেশে এমন বিপদ উপস্থিত, আমি কি এখন এখানে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে পারি? আমি যদি আমার সৈন্যগণের মধ্যে না থাকি, তাহলে কে তাদের উৎসাহ দেবে? আমি যদি এখন নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকি, আর দেশটি যদি স্বাধীনতা বিচ্যুত হয়, তা হলে সকলে বলবে, একজন স্ত্রীলোকের হাতে রাজ্যভার থাকাতে দেশটি এইরূপ দুর্দশাগ্রস্ত হল।" [১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

এমন দূরদর্শিতা ও সুবিবেচনা আমাদের দেশের শক্তিমান রাজাদের চরিত্রেই ছিল না, উপরন্তু বিলাসে-আরামে নিশ্চিন্ত থেকে সর্বনাশ ডেকে আনাই যেখানে জাতীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য সেখানে ঐলবিলা চরিত্রটির পরিকল্পনাতেও নাট্যকারের আশ্চর্য শক্তির পরিচয় পাচ্ছি। ঐলবিলার স্বদেশচিন্তার মধ্যে নিছক আবেগ ছিল না,—নারীত্বের সম্মান বজায় রাখার চেষ্টাটি এ ব্যাপারে লক্ষ্যণীয়। ঐলবিলা চরিত্রের কোন ঐতিহাসিক ভূমিকা নেই, এ চরিত্রটির আদর্শ তবে নাট্যকার কোথায় পেলেন? প্রাক্-জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বাংলা নাটকে এমন সামঞ্জস্যপূর্ণ নারীচরিত্রের সাক্ষাৎ মেলেনি।

ঐলবিলার আদর্শ ঐলবিলার রাজ্যের অন্যান্য নারী চরিত্রেও সঞ্চারিত হয়েছে। গায়িকা চরিত্রটির মুখে এ সংবাদ আমরা পেয়েছি; ঐলবিলাকে সে বলেছে,—"আমি শুনেছি, স্বদেশের প্রতি আপনার অত্যন্ত অনুরাগ।" সত্যেন্দ্রনাথের রচিত স্বদেশী সংগীতটি 'পুরুবিক্রম' নাটকের সৌন্দর্য বাড়িয়েছে। সার্থক স্বদেশী নাটকে এমন সংগীতের আবেদন অত্যন্ত গভীর। গায়িকার মুখে সমগ্র ভারতবাসীকে একতাবদ্ধ করার আহ্বান,—

মিলে সবে ভারত-সন্তান, একতান মনপ্রাণ,
গাও ভারতের যশোগান।
ভারতভূমির তুল্য আছে কোন স্থান,
কোন অদ্রি হিমাদ্রি সমান?

ঐলবিলাও গায়িকাটিকে প্রেরণা দিয়েছে—"তোমার এ গান শুনলে, কোন হৃদয়ে না দেশানুরাগ প্রজ্জ্বলিত হয় ? কে না দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারে ? ধন্য সেই কবি, যিনি এই গানটি রচনা করেছেন।"

গায়িকাটি ঐলবিলার রাজ্যে সার্থক স্বদেশপ্রাণ নারী। রাজ্যের যিনি কর্ত্রী তাঁর আদর্শ সমগ্র মানুষের প্রাণে স্বদেশভাবনা জাগিয়েছে। গায়িকার আত্মপরিচয় দানের ভঙ্গিতেই তা পরিস্ফুট হয়েছে। প্রেমে ব্যর্থতাই গায়িকার জীবনে এই পরিবর্তন ঘটিয়েছে। নাট্যকারের এই ইঙ্গিতটুকুর কিছু মূল্য আছে। স্বদেশপ্রেমকে সব বিফলতার শান্তিরূপে কল্পনা করেছেন তিনি। কিন্তু এ ধারণাটি যতটা আদর্শগত ততখানি বাস্তব নয়। গায়িকা দেশপ্রেমের বাণী প্রচারের দায়িত্ব নিয়েছে,—"আমি দেশকে প্রাণের চেয়ে ভালবাসি। আমি দেশের জন্য অনায়াসে প্রাণ দিতে পারি। …আমার যে পাঁচ ভাই আপনার সৈন্যদলের মধ্যে নিবিষ্ট আছেন, তাঁদের প্রত্যেককেই এই গানটি আমি শিখিয়ে দিয়েছি ও তাদের আমি বলে দিয়েছি যে, এই গানটি গেয়ে যেন তাঁরা সকল সৈন্যগণের মধ্যে দেশানুরাগ প্রজ্জ্বলিত করে দেন।"

স্বদেশপ্রেম জাগানোর জন্য উত্তেজনাপূর্ণ স্বদেশীসংগীতের প্রয়োজন সম্পর্কে নাট্যকার আমাদের সচেতন করেছেন। "পুরুবিক্রমে" স্বদেশী সংগীতারোপ একটি বিশেষ উদ্দেশ্য ও আদর্শ প্রচারে যতখানি কার্যকরী হয়েছে পরবর্তী নাট্যকারদের সামনে তা একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে। উদাসিনীর মুখে আমরা আরও একটি স্বদেশী সংগীতের উল্লেখ শুনতে পাই। উদাসিনী ও গায়িকাকে শুধুমাত্র সংগীত প্রচারের যন্ত্র হিসেবে কল্পনা করেননি নাট্যকার। এই দুটি নারীর জীবনের সঙ্গে দেশপ্রেমের যোগসাধন করেছেন তিনি। গায়িকা সংগীতের মাধ্যমে জীবনের নবলব্ধ স্বদেশ অনুভূতিকে ব্যক্ত করেছে। উদাসিনী শেষপর্যন্ত বন্দিনী ঐলবিলাকে উদ্ধারে সাহায্য করেছে। উদাসিনী বলেছে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে,—

"আমি 'হোক ভারতের জয়'—এই গানটি দেশেবিদেশে গেয়ে গেয়ে বেড়াই, এই আমার জীবনের একমাত্র ব্রত। যাতে সমস্ত ভারতভূমি ঐক্যবন্ধনে বদ্ধ হয়, এই আমার মনের একান্ত বাসনা।" [৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

'পুরুবিক্রম নাটকে' শুধু স্বদেশীসংগীতই নয়—উত্তেজনাপূর্ণ স্বদেশীকবিতাও ব্যবহার করেছেন নাট্যকার। পুরু স্বদেশীকবিতা আবৃত্তি করছেন সৈন্যদের প্রাণে শক্তি সঞ্চারের উদ্দেশ্যে,—

ওঠ! জাগ! বীরগণ! দুর্দান্ত যবনগণ,
গৃহে দেখ করেছে প্রবেশ।

হও সবে একপ্রাণ, মাতৃভূমি কর ত্রাণ,
শত্রুদলে করহ নিঃশেষ।

দেশের আশু দুর্দিনে নির্জীব প্রাণকে জাগানোর জন্য এই অংশটুকু যথেষ্ট সাহায্য করেছে। পুরু নিজেই স্বদেশপ্রেমের প্রতীক। বিদেশী যবনের হাত থেকে মাতৃভূমিকে উদ্ধারের চেয়ে বড়ো কিছু আদর্শ তাঁর জীবনে নেই। তাই ভাবাবেগে চঞ্চল পুরুর মুখে স্বদেশী কবিতার আবৃত্তি একটি উত্তেজনার রস সিঞ্চন করেছে এ নাটকে। বীররস উদ্বোধনের চেষ্টা নানাভাবে দেখেছি বাংলা কবিতায়,—নাটকেও দেখি একই চেষ্টা ; পুরু আবৃত্তি করেন,—

এত স্পর্ধা যবনের, স্বাধীনতা ভারতের
অনায়াসে করিবে হরণ ?
তারা কি করেছে মনে, সমস্ত ভারত ভূমে,
পুরুষ নাহিক একজন ?

আত্মত্যাগের আহ্বান জানিয়েছে স্বদেশপ্রাণ পুরু নিজেই,—

"স্বদেশ উদ্ধার তরে, মরণে যে ভয় করে,
ধিক সেই কাপুরুষে, শত ধিক্ তারে
পচুক সে চিরকাল দাসত্ব-আঁধারে।"

স্বদেশচেতনা নাট্যকারের সমস্ত সত্তাকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে, নাটকীয় ঘটনা ও চরিত্রের মধ্যে স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত আবেগটিই বারবার দেখা দিয়েছে।

তক্ষশীল ও পুরুর প্রেম ঐলবিলাকে কেন্দ্র করেই ঘনীভূত হয়ে উঠেছিল,—কিন্তু পুরুর স্বদেশচেতনার গভীরতাই প্রেমের বিফলতা ঢাকার পক্ষে যথেষ্ট। পুরুর প্রেমই দেশপ্রেমকে আরও তীব্র করেছে। পুরু অসংকোচে আত্মদানের সংকল্প জানিয়েছেন ঐলবিলাকে—"সে নরাধম আপনার প্রেম হ'তে আমাকে বঞ্চিত করলেও করতে পারে, কিন্তু সে সহস্র চেষ্টা করলেও, স্বাধীনতার জন্য, মাতৃভূমির জন্য, সংগ্রামে প্রাণ দিতে আমাকে কিছুতেই নিবারণ করতে পারবে না।"

[১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

তক্ষশীলের মধ্যে এই আত্মদানের প্রেরণা ছিল না। প্রেমের মধ্যেই সার্থকতা খুঁজেছে তক্ষশীল—যদিও দেশচেতনার অনুভূতি তেমন তীব্র না হলেও কিছুটা পরিমাণে তার চরিত্রেও দেখেছি। ভগ্নী অম্বালিকার পরামর্শের প্রতিবাদ জানিয়েছিল তক্ষশীল। কিন্তু পুরুর দেশপ্রেমে যে গভীরতা দেখেছি তক্ষশীলের চরিত্রে তার ক্ষীণ আভাসও পাই না। তক্ষশীলভগ্নী কু-পরামর্শের জবাব দিয়েছে,—

"তোমার কি এই ইচ্ছা, যে আমি নীচ ভয়ের বশবর্তী হয়ে সেকেন্দর শার

পদতলে অবনত হব? আমি কি স্বহস্তে ভারতবাসীদিগের জন্য অধীনতা শৃঙ্খল নির্মাণ করব?" [১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

কিন্তু তক্ষশীল প্রেমের ব্যর্থতার মধ্যে দেশপ্রেম বিসর্জন দিলেন, পুরুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার সব উদ্দেশ্য নষ্ট করে দিল। এ অংশে অম্বালিকা ও তক্ষশীল ব্যক্তিগত স্বার্থ সাধনের জন্য এমনই তৎপর হয়ে উঠেছে যে নাটকের জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র। ঐলবিলার প্রেম স্বদেশপ্রাণ পুরুকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে, তক্ষশীলের মত অপদার্থ সে কথা বোঝেনি। পুরু আহত অবস্থায় শিবিরে অবস্থান কালে ঐলবিলা পুরুর মৃত্যু হয়েছে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু দয়িতের মৃত্যু ঐলবিলার দেশপ্রেমকে বিনষ্ট করেনি। পুরুও ব্যক্তিগত প্রেমের চেয়ে, দেশের স্বাধীনতাকেই বড়ো বলে প্রমাণ করেছে—প্রণয়িনী ঐলবিলার আদর্শও পুরুর আদর্শেরই অনুগামী। জীবনের এই সংকটমুহূর্তেও ঐলবিলা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘোষণা করেছে,—

"যদিও আমার প্রেমের প্রস্রবণ জন্মের মত শুষ্ক হয়ে গেল, তবু দেশ উদ্ধারের এখনও আশা আছে। আর একবার আমি চেষ্টা করে দেখব।···আর একজনও কি বীরপুরুষ নেই যে মাতৃভূমির হয়ে অস্ত্রধারণ করে? বীরপ্রসূ ভারতভূমি কি এর মধ্যেই বীরশূন্য হলেন?" [৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

দয়িতের মৃত্যু আশঙ্কা করেও প্রণয়িনী ঐলবিলা দেশপ্রেমের দায়িত্ব বহন করতে সম্মত হয়েছে। অদম্য প্রাণশক্তিই এখানে জয়যুক্ত হয়েছে, দুঃখ ও বেদনার মধ্যেও জীবনীশক্তি লাভ করে নতুন উদ্যমে জেগে উঠেছে এক অসমসাহসিকা নারী। তক্ষশীলকে ক্ষমা করার মত মানসিক দৃঢ়তা এখনও ঐলবিলার আছে। স্বাধীনতার ব্যাখ্যাটি অতি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়েছে ঐলবিলা—'স্বর্ণ শৃঙ্খল কি শৃঙ্খল নয়?··· সেকেন্দর শার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে যদি আমাদের রাজত্ব রাখতে হয়, তা সে তো রাজত্ব নয়, সে দাসত্বের আর এক নাম মাত্র।' [৩য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

'পুরুবিক্রম নাটকের' ঐলবিলা চরিত্রটির মধ্যেই দেশপ্রেমের অদম্যশক্তি প্রত্যক্ষ করি আমরা। শেষপর্যন্ত পুরু তক্ষশীলকে বধ করে সেকেন্দর শার সখ্য লাভ করেছিলেন। ঐলাবিলার স্বদেশপ্রেমের স্বপ্ন সফল করে ঐলবিলাকে লাভ করেছিলেন পুরু। মিলনাত্মক একটি রোম্যান্টিক প্রণয় কাহিনীরূপেই 'পুরুবিক্রম নাটকের' বিচার হতে পারে। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের প্রচারে অবতীর্ণ-নাট্যকার নিছক প্রণয়াত্মক একটি নাটক রচনা করার কল্পনাও করতে পারেননি। তাই ঐলবিলা পুরুর প্রেমের সেতুরূপে স্বদেশপ্রেমের অবতারণা করে সমগ্র নাটকের মূল বক্তব্যের মধ্যে তা সঞ্চারিত করেছিলেন। সর্বপ্রথম মৌলিক নাটকের মধ্যেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। নিছক আদর্শবাদী চরিত্রগুলির মধ্যেও বাস্তবতার অবতারণা করে

নাট্যকার উদ্দেশ্য ও আদর্শের সমন্বয় ঘটিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে সুকুমার সেনের বক্তব্যটি যথার্থ বলেই মনে হয়,—

"সমগ্রভাবে দেখিলে পুরুবিক্রমে যে অকৃত্রিম দেশানুরাগ রস উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।"[৩০]

পরিশেষে অম্বালিকার ট্র্যাজেডীকেও দেশদ্রোহিতারই পরিণাম বলে মনে হয় আমাদের। দেশপ্রেম যেন এ নাটকের প্রতিটি চরিত্রের ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণ করেছে। পাঠকচিত্ত যেন রুদ্ধশ্বাসে দেশপ্রেমিক পুরু ও দেশপ্রেমিকা ঐলবিলার মিলন সংঘটনের স্বপ্ন দেখছে। অত্যন্ত ক্রিয়াশীল ও ঘটনাকীর্ণ এই অংশটুকুতেই নাট্যকারের রোম্যান্টিক কল্পনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। এ নাটকের যুদ্ধবিগ্রহ চিত্রগুলি অবাস্তব। দ্রুত গতিশীলতা আরোপ নাট্যকারের আঙ্গিকগঠনের দুর্বলতারই নামান্তরমাত্র। স্বদেশপ্রেমের সত্যিকারের পরিচয় দেবার সুযোগ যখন হাতে এল—পুরু তখন আত্মরক্ষা করতেও সক্ষম হলেন না—অতর্কিত আক্রমণে ধৃত হলেন তিনি। তবু পুরুর দেশপ্রেমের অমলিন আদর্শটিকে নাট্যকার শেষপর্যন্ত সেকেন্দর শাহের প্রশংসায় অভিনন্দিত করলেন। ঐতিহাসিকতার মর্যাদারক্ষার সঙ্গে দেশপ্রেমিকতার জয়গানে নাটকটি শুভশেষ হলো। নাট্যকার পুরুর বীরত্ব ও স্বাদেশিকতার উজ্জ্বল নাটকে পরিবেশন করে দেশাত্মবোধক নাটকরচনার উদ্দেশ্যটিই তুলে ধরেছেন মাত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তার আদর্শ দেশবাসীর প্রাণে সঞ্চারিত করার উদ্দেশ্যে পুরুর দেশপ্রেমের চিত্র নাটকে সুঅঙ্কিত হয়েছে—এটিই সান্ত্বনা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মৌলিক নাটক সৃষ্টির ক্ষমতা এতে যেমন প্রমাণিত হলো, দেশপ্রেমিক নাট্যকারের আন্তরিকতাও এ নাটকে তেমনি প্রতিফলিত হয়েছে। স্বদেশচিন্তার অমূল্য দলিল হিসাবে 'পুরু বিক্রম' প্রশংসা পেয়েছিল, এর অভিনয়ের সাফল্যও নাট্যকারের প্রাপ্য। সেকেন্দর শা পুরুর প্রশংসায় বলেন,—

"তোমার প্রতি যে দণ্ডাজ্ঞা দিচ্চি শ্রবণ কর,— তুমি যে স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করেছ—শেষকাল পর্যন্ত বরাবর সমানরূপে তোমার তেজস্বিতা ও বীরত্ব প্রকাশ করে এসেছে—এত ভয় প্রদর্শনেও যে তুমি আমার নিকট নত হওনি, এতে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হয়েছি।" [পঞ্চম অঙ্ক]

এই প্রশংসাবাণী ঐতিহাসিক ঘটনা সমর্থিত। সম্ভবতঃ ইতিহাসের এই ক্ষীণ সূত্রটি অবলম্বন করেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের কল্পনা উদ্দাম হয়ে উঠেছিল।

'পুরুবিক্রম নাটকে' দেশপ্রেম প্রচারই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল,—সমগ্র নাটকের চরিত্র

৩০. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস। ২য় খণ্ড। বর্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬২, পৃঃ ২৬০।

পরিকল্পনায়, ঘটনা বিশ্লেষণে নাট্যকারের এই উদ্দেশ্যটি কোথাও আচ্ছন্ন হয়নি। দ্বিতীয় নাটকের পরিকল্পনাতেও স্বদেশপ্রেমের ব্যঞ্জনা কোথাও প্রচ্ছন্ন নেই। "চিতোর আক্রমণ নাটক" নামকরণ করে নাট্যকার প্রথমেই বিষয়বস্তুর গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন করেছেন। 'সরোজিনী নাটক' বললে নিছক নামকরণ মাত্র হয়,—বিষয়টির গুরুত্ব বোঝানো যায় না। সম্ভবতঃ এ কারণেই দুটি নামকরণ চলে আসছে পাশাপাশি। 'চিতোর' নামটির সঙ্গে আমাদের বাসনাসংস্কার এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে মুহূর্তের মধ্যেই চিতোরের উজ্জ্বল ঐতিহাসিক চরিত্রগুলিকে আমরা স্মরণ করি। প্রতাপসিংহ থেকে পদ্মিনী সব কটি নামই মনের কোণে উঁকি দিয়ে যায়। সেই সঙ্গে শৌর্য-বীর্য, পরাক্রম, দেশানুভূতি, আত্মত্যাগ ইত্যাদি মহৎ বৃত্তির যে অনুশীলন একদা চিতোরে—মেবারে সংঘটিত হয়েছিল সে প্রসঙ্গটিও এসে পড়ে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ইতিহাসপ্রীতি ও দেশপ্রীতি সংগত কারণেই এমন ইতিহাস অনুসন্ধান করেছে যা আমাদের অতিপরিচিত। রাজস্থানের ইতিহাস আমাদের সমগ্র সাহিত্যকেই প্রভাবিত করছিল। জাতীয়তার উন্মেষলগ্নে স্বদেশপ্রেমী নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে প্রভাব এড়াতে পারেননি। তাঁর চারটি মৌলিক স্বদেশভাবনাজাত ও ইতিহাসসম্পৃক্ত নাটকের মধ্যে দুটি নাটকের কাহিনীই রাজস্থানের কাহিনী থেকে নেওয়া হয়েছে। কোনো নাটকেই ইতিহাস প্রাধান্য পায়নি—কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্রের সূত্র ধরেই নাট্যকার কল্পনার জগতে প্রবেশ করেছেন,—আদর্শ ও স্বীয় উপলব্ধির কথাই বলতে চেয়েছেন। সেদিন থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঐতিহাসিক নাটক স্রষ্টা নন,—ইতিহাসাশ্রয়ী-কাল্পনিক নাটকের রূপকার। এ ব্যাপারে অবশ্য মৌলিকত্বও দাবী করতে পারেননা তিনি,—যেহেতু মধুসূদনের মতো আবির্ভাব লগ্নের সফল নাট্যকারও ইতিহাসের সূক্ষ্মদেহ অবলম্বনে যথেচ্ছ কাল্পনিক কাহিনী রচনা করেছেন। তবে স্বদেশপ্রেমের ব্যঞ্জনাটুকু কল্পনার সঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে তাকে সেযুগীয় বক্তব্যে রূপায়িত করার ঐকান্তিক চেষ্টা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মত অন্য কোন নাট্যকারের ছিল না। স্বদেশভাবনা এমনভাবে তুলে ধরার আবেগটুকু নিয়েই স্বদেশপ্রেমী জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আবির্ভাব।

তাঁর প্রথম মৌলিক নাটকেও দেখেছি ঘটনা সংস্থাপনায় বিদেশী আক্রমণকারীর মুখ্য ভূমিকা রয়েছে। দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন, এমন একটি অবরুদ্ধ ও উত্তেজনাকর মুহূর্তেই নাটক শুরু। নাটকের প্রতিটি পাত্রপাত্রীর নিজস্ব বক্তব্য কিছু আছে বটে কিন্তু অপেক্ষমান বিদেশী শত্রুর আক্রমণাত্মক প্রচেষ্টাকে ভুলে একান্ত ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের কথা মনে করার মত যথেষ্ট অবসর কারো হাতে নেই। প্রত্যেকটি চরিত্র এই আকস্মিক বিপদের পটভূমিকায় নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করেছে,—সেখানেই নাটকের

ব্যঞ্জনা। দেশচেতনা এখানে সর্বজনীন অনুভবের বস্তু হয়ে উঠেছে,—অপেক্ষমান বিদেশী শত্রুর উপস্থিতি বিস্মৃত হয়ে নিছক ভাবাবেগ নিয়ে সময় নষ্ট করার মত প্রস্তুতি নেই। 'সরোজিনী' বা 'চিতোর আক্রমণ নাটকের' নামকরণেই নাট্যকার বিদেশী শত্রুর উপস্থিতি সম্পর্কে দর্শককে সচেতন করেছেন। নাটকের বিষয়বস্তু জটিল হতে পারে—কিন্তু নামকরণের মধ্যেই তার প্রত্যক্ষ ইঙ্গিত আমাদের সচেতন করে তোলে। অবরুদ্ধ চিতোরপুরীর পূর্বমুহূর্তের নাটকীয় ঘটনাবলী পরিবেশন করাই নাট্যকারের উদ্দেশ্য। স্বাধীনতা অপহরণের উদ্দেশ্যে আলাউদ্দীন চিতোরের দ্বারপ্রান্তে অপেক্ষমান, আভ্যন্তরীণ কলহ-বিবাদ, প্রেম-প্রত্যাখ্যান নিয়ে মগ্ন চিতোরবাসীর জীবনকথা ঐ নাটকের বিষয়বস্তু। রূপ-গুণবতী রাজকন্যার প্রেমলাভের জন্য সাময়িক মত্ততা বাদলাধিপতি বিজয়সিংহ ও গারাধিপতি রণসিংহের বিরোধের মূল কারণ। বিদেশী শত্রুর উপস্থিতি ভুলে ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব প্রবল হয়েছে যদিও—চিতোররাণা লক্ষ্মণ-সিংহের যোগ্য সেনাপতি বিজয়সিংহের দেশপ্রেম তবুও অমলিন। মাতৃভূমির জন্য প্রাণ বিসর্জনের সংকল্পটি তাঁর মুখেই শুনেছি,—

পৃথিবীতে এমন কি বস্তু আছে, যা মাতৃভূমির জন্য অদেয় থাকতে পারে? আমার জীবন বলিদান দিলেও যদি তিনি সন্তুষ্ট হন, তাহাতেও আমি প্রস্তুত আছি।[৩১]

[১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

নানা জটিলতায় ঘটনাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তই চরিত্র-গুলিকে চিহ্নিত করেছে। উদ্ধৃত সংলাপ নাট্যকারের উদ্দেশ্য ও স্বদেশভাবনারই নাট্যিক রূপ; এ প্রশ্ন ত শুধু বিজয়সিংহের মত একজন সর্দারের নয়, এ সংকল্প পরাধীন ভারতবাসীর সামনে সরবে উচ্চারিত একটি ইঙ্গিতপূর্ণ শপথবাক্য। দেশের জন্য জীবন বলিদানের এমন উদাত্ত আহ্বান ইতিপূর্বের নাটকে শোনা যায়নি। এমন সহজ ভাষায় আবেদনের আন্তরিকতা কোথাও ইতিপূর্বে ধরা পড়েনি। দেশ-প্রেমের অনুভূতি যখন শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত না হয়ে সর্বজনীন হয় তা প্রকাশের ভাষাও তত আন্তরিক হয়ে ওঠে। নাট্যকারের গভীরতর দেশোপলব্ধির ভাষাটি তাই অনাড়ম্বর অথচ গভীর অর্থবহ। নাট্যকার দেশপ্রেমের যে আগুন বাঙ্গালীর প্রাণে জ্বালিয়ে দিতে চান শুধু নিখুঁত চরিত্র সৃজনে বা নিপুণ সংলাপ রচনায় তা সম্ভব নয়। নাট্যকারের স্বীয় উপলব্ধির অনলঙ্কৃত ভাষাটি যখন নাটকীয় সংলাপে পরিণত হয় তখনই তা সম্ভব। বিজয়সিংহ এ কাহিনীর নায়ক। বিজয়-সিংহ শুধু নায়কোচিত গুণাবলীতেই শোভিত নন,—নাট্যকার তাকে দেশপ্রেমিকরূপে কল্পনা করে দর্শকের সহানুভূতি আকর্ষণ করেছেন।

৩১. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী। ৫ম খণ্ড। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা।

অন্যদিকে রাণা লক্ষ্মণসিংহের জীবনে এক অভাবনীয় ও শোকাবহ দ্বন্দ্বের অবতারণা করেছেন নাট্যকার। চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নির্মম সংকল্প লক্ষ্মণ-সিংহের কর্ণগোচর হল। প্রাণোপম দুহিতা রাজকুমারী সরোজিনীকে বলি দেবার আদেশ পেলেন রাণা। ষড়যন্ত্রকারী আলাউদ্দীনের অনুচরই যে ভৈরবাচার্য ছদ্মনামে পুরোহিতের পদে অধিষ্ঠিত, এ সংবাদ সকলের অগোচরেই থেকে যায়। দেশমাতৃকার আদেশ অগ্রাহ্য করার মত যুক্তি ও দৃঢ়তা রাণার নেই। সরোজিনী এ নাটকের ভাগ্যপীড়িতা নায়িকা। কিন্তু রাণা লক্ষ্মণসিংহ যখন পিতৃস্নেহ ও দেশপ্রেমের দ্বন্দ্বে উন্মাদপ্রায়—রাজকুমারী সরোজিনীর দৃঢ়তা তখন লক্ষ্যণীয়। রাজপুত রমণী প্রাণের মায়া জানে না। আত্মত্যাগের প্রেরণা পায় তারা অন্তর থেকে। সতী সাধ্বীদের পবিত্র ধূলিই চিতোরের মাটিকে উর্বর করেছে। লক্ষ্মণসিংহের দুঃসহ দ্বন্দ্ব চিরন্তন পিতৃহৃদয়ের হাহাকার মাত্র। মহাক্ষোভে লক্ষ্মণ সিংহ বলেছে,—

"জগতে তার মত হতভাগ্য আর কে আছে, যার ক্রন্দনেও স্বাধীনতা নাই।"

[১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

সুতরাং লক্ষ্মণসিংহের চরিত্রে পিতৃস্নেহের অমলিন রূপটি নাট্যকার বর্ণনা করেছেন। দেশপ্রেম ও পিতৃস্নেহ যখন একই সঙ্গে তীব্র হয়ে ওঠে, রাণার অন্তর্দ্বন্দ্ব তখন ট্রাজেডীর মহিমা লাভ করে। কিন্তু সরোজিনীই পিতার ব্রতসাধনে তৎপরতা দেখায়,—মৃত্যুবরণ করার জন্য প্রস্তুত হয়েই বলে,—

আমি যেন মনের চক্ষে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি যে, যেই আমার চিতা প্রজ্বলিত হয়ে উঠবে অমনি আলাউদ্দীনের বিজয়লক্ষ্মী ম্লান হবে—তার জয়পতাকা দিল্লীর প্রাসাদশিখর হতে ভূমিতলে স্খলিত হবে—তার সিংহাসন কম্পমান হবে। আমি মলেম তাতে কি, আমার মৃত্যু যদি আপনার অক্ষয় কীর্তির সোপান হয়,—দেশ-উদ্ধারের উপায় হয়, তাহলেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হবে। [৫ম অংক, ১ম গর্ভাংক]

আত্মবিসর্জনের পূর্বমুহূর্তে সরোজিনীর এ উক্তিটি লক্ষ্যণীয়। মৃত্যুবরণ করার গৌরব থেকে সরোজিনী বঞ্চিত হতে চায় না—কারণ এ মৃত্যু পরোক্ষভাবে দেশ উদ্ধারের উপায় হবে। সরোজিনী জীবনদানের পরিবর্তে দেশহিতব্রত সাধনেরই সংকল্প করেছিল। নিঃসন্দেহে স্বদেশপ্রেমী নাট্যকারের তুলিকায় সরোজিনী চরিত্রের এমন পরিকল্পনা সম্ভব হয়েছিল। পিতার স্বার্থে জীবনদানের মহৎ দৃষ্টান্ত ত আছেই—কিন্তু দেশচেতনাটিও সরোজিনীর আত্মদানের অন্যতম প্রেরণা হলে এ চরিত্রটির মূল্য বেড়ে যাবে। নাট্যকারের দেশভাবনারই প্রতিফলন সরোজিনী চরিত্রে প্রকাশ লাভ করেছে। যে কোন কাহিনীতেই দেশপ্রেমের রসটি সঞ্চারিত করাই যেন নাট্যকারের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়েছিল। সরোজিনী চরিত্রে কিন্তু

আগাগোড়া এ উপলব্ধি ছিল না, ঐলবিলার ব্যক্তিত্ব ও স্বদেশপ্রেম সরোজিনী চরিত্রে দেখা যায় না। কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাবর্তের আবিলতায় স্পন্দিত না হলেও স্বদেশপ্রেমের স্থির-শান্ত উপলব্ধি সম্ভব, সরোজিনীর আত্মদানের মুহূর্তে এ সত্যটিই উদ্‌ভাসিত হয়েছিল। দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের মহিমা এ নাটকে এমন একটি গভীর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে যা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্য নাটকে পাওয়া যায় না। দেশপ্রেমের এমন সংহত প্রকাশও অন্য নাটকে দুর্লভ। এই কারণেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকগুলি প্রথমে নাটক, পরে তা নাট্যকারের দেশপ্রেমাদর্শের বাহন হিসেবে গণ্য হয়েছে। 'সরোজিনী নাটকের' অভিনয় যে একদা বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আড়োলন সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছিল—তা সম্ভবত একারণেই। "আমার অভিনেত্রী জীবন" গ্রন্থে অভিনেত্রী লেখিকা বিনোদিনী 'সরোজিনী নাটক' অভিনয়ের মনোজ্ঞ বর্ণনা দিয়েছিলেন।

"সরোজিনী" নাটকের শেষাংশে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণই মুখ্য। আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণে রাণা লক্ষ্মণসিংহ নিহত হলেন, রাজ্যের অন্যান্য শক্তিমান যোদ্ধারাও দেশরক্ষায় সক্ষম হয়নি। সরোজিনী রাজপুত নারীদের সঙ্গে নিয়ে প্রাণবিসর্জন দিলেন জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে। এই পরাজয়ের ঘটনাটি নাট্যকার যথাসম্ভব নাটকীয়ভাবেই বর্ণনা করেছেন। শূন্য পুরীতে একটি নারীও জীবিত ছিল না। রাণার বিশ্বস্ত পুরাতন অনুচর বৃদ্ধ রামদাস প্রবেশ করেছেন সেই ভয়াবহ পুরীতে। নাট্যকার নাটকীয় ঘটনারূপে নয়, রামদাসের আক্ষেপবাণী হিসেবে একটি দীর্ঘ স্বদেশপ্রেমের কবিতা রচনা করেছেন। শ্রীসুকুমার সেন এই কবিতাটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের বন্ধু কবি অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরীর রচনা বলে অনুমান করেছেন। এ কবিতাটি নাট্যকারের আক্ষেপবাণী হিসাবেও গণ্য হতে পারে। রামদাস শূন্য চিতোরপুরী প্রদক্ষিণ করতে এসে ব্যথিত চিত্তে আবৃত্তি করেছিলেন,—

আচ্ছন্ন ভারতভাগ্য আজি ঘোর অন্ধ তমসায়
জয়লক্ষ্মী বাম ম্লান আর্য্যনাম
পুণ্য বীরভূমি এবে বন্দিশালা হায়।
স্বাধীনতা রত্নহারা, অসহায়া অভাগা জননি!
ধনমান যত পর-হস্ত-গত
পরশিরে শোভে তব মুকুটের মণি!
জ্বলন্ত দহনে হায় জ্বলিতেছে আজি মন-প্রাণ,
তবে কেন আর, বহি দেহভার
চিতানলে চিন্তানল করি অবসান!

রামদাসের এ আক্ষেপটি নাট্যকারেরই দীর্ঘশ্বাসধ্বনি। শূন্য চিতোরপুরীতে রামদাসের হাহাকার আমাদের ভাগ্যবিপর্যয়ের করুণতম বিলাপ বলে গণ্য হতে পারে। কাজেই নাটকের মূল ঘটনা ও কাহিনীর সঙ্গে সূক্ষ্ম বা স্থূল কোন যোগাযোগ না থাকলেও এ অংশটি অবান্তর বলা যায় না। শুধু চিতোরের ভাগ্যবিপর্যয়ের কাহিনী অবলম্বনেই এ নাটক লেখা হয়েছে, চিতোর আক্রমণের ভয়াবহ পরিণাম অঙ্কন করে নাট্যকার গভীর বিষাদের চিত্রটিই তুলে ধরেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর পরাধীন কবি ও নাট্যকারেরা এই অবসাদ ও বিলাপধ্বনির অবতারণা করেছিলেন নানা কারণে। হেমচন্দ্রের কবিতায় এই বিষাদ পর্বটি কবির জটিল আত্মদ্বন্দ্বের পরিচয় বহন করেছে। নাট্যকার হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথও অতীত ইতিহাসের করুণতম অধ্যায় রচনাকালে বিষাদগ্রস্ত না হয়ে পারেননি।

এ নাটকের বিখ্যাত সংগীত রাজপুত রমণীদের আত্মবিসর্জনের লগ্নে একটি করুণরস সৃষ্টি করেছে। প্রজ্বলিত চিতাগ্নির সামনে দাঁড়িয়ে রাজপুত বালার আত্মসমর্পণলগ্নে যে বিষাদকরুণ সুরটি প্রতিধ্বনিত হয়েছে,—কিশোর কবি রবীন্দ্রনাথ কবিতাকারে তা রূপায়িত করার চেষ্টা করেছিলেন। যদিও দেশপ্রেমের চেয়ে আত্মসম্ভ্রম রক্ষার তাগিদই ছিল মুখ্য, তবু রাজপুতনারীদের আত্মদানের মহিমালোকে সমগ্র নাটকটি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণকে যে কোন দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই বিচার করি না কেন,—স্বাধীনতাকামী চিতোরবাসীদের কাছে তা সর্বদাই একটি অর্থ বহন করেছে। বিদেশীর হাতে দেশকে তুলে দেবার অনিচ্ছাকেই বৃহৎ ও মহৎ পটভূমিকায় স্বাধীনতাপ্রীতি বলে অভিহিত করা হয়। সেই অর্থে যে কোন আত্মদানই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষভাবে দেশের জন্য স্বাধীনতার জন্য জীবনদানেরই নামান্তর। রাজপুত রমণীরা প্রাণের মায়াকে তুচ্ছ করেছিল,— দেশপ্রেমের আহ্বানেই অকুতোভয়ে জলন্ত অগ্নিকে ঘিরে তারা উচ্চারণ করেছিল,—

জল জল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।

ঐ দৃশ্যের ট্রাজিক মহিমাই নাটকটির সার্থকতার হেতু হয়েছিল। দেশপ্রেমের এমন মর্মস্পর্শী অভিব্যক্তি কাব্যে-নাটকে-ইতিহাসে দুর্লভ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এই অনুভূতিগভীর অংশটিকে হৃদয়গ্রাহ্য নাট্যরূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশচেতনার মহিমা ও বীর রাজপুতানীদের আত্মোৎসর্জন সে যুগের বাঙ্গালীচিত্তের গভীর তলদেশটি স্পর্শ করতে সক্ষম হয়েছিল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মঞ্চসফল নাটকরূপে "সরোজিনী" পল্লী ও সহরবাসী সকলকেই তৃপ্তি দিয়েছিল।

'অশ্রুমতী' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের তৃতীয় মৌলিক স্বদেশপ্রেমমূলক নাটক। স্বদেশ-

ভাবনা থেকেই 'পুরু বিক্রমের' পরিকল্পনা, 'চিতোর আক্রমণ নাটকে',—চিতোরের স্বাধীনতাবিলুপ্তির সকরুণ ইতিহাসের সঙ্গে স্বদেশচেতনার মিশ্রণ স্বাভাবিকভাবেই দেখা যাচ্ছে, 'অশ্রুমতীতেও' রাজপুত ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় চরিত্র প্রতাপসিংহকেই দেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে নাট্যকার গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বের ঘটনা ও কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাসের যোগসূত্র ছিল, বাকীটুকু বিশুদ্ধ স্বদেশভাবনার স্বকীয় আলোকেই নাট্যকার কল্পনা করে নিয়েছিলেন। অশ্রুমতীর গল্পাংশ মৌলিকরচনা হলেও এ গল্পের মূল চরিত্রটির মাধ্যমে দেশপ্রেম লক্ষ্য করছি, তা সম্পূর্ণই ঐতিহাসিক সত্য। সমগ্র ভারতে চিতোরের স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তটি আমাদের সব পরাজয়, সব গ্লানির মধ্যেও একমাত্র সান্ত্বনা। প্রতাপসিংহ আমাদের বিস্ময়, পরাধীন ভারতের একমাত্র আশা ও গৌরব। স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত আমাদের অজানা নয় কিন্তু ত্যাগের, দুঃখের মধ্যেও স্বদেশপ্রেমকে এমনভাবে অবলম্বন করেও যিনি অপরাজেয় মনোবলের পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি আমাদের আরাধ্য ও পূজনীয়। স্বদেশপ্রেমিকের সামনে তিনি আশা ও উদ্যমের বিগ্রহ। স্বদেশানুরাগের অমলিন আদর্শটি জনগণের সামনে তুলে ধরার ব্রত নিয়েই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তাঁর প্রথমদুটি মৌলিক স্বদেশাত্মক নাটকেও এ বক্তব্য ছিল, এ চরিত্র ছিল কিন্তু তার ঐতিহাসিক ভিত্তিটুকু নাট্যকারকেই তৈরী করে নিতে হয়েছে। কিন্তু 'অশ্রুমতী' নাটকেই একটি পরিচিত ও জনপ্রিয় ঐতিহাসিক চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই আমরা। নাটকের কাহিনীর মধ্যে যত রচনা-কৌশলই থাক না কেন, এই বরেণ্য ঐতিহাসিক চরিত্রটির আবির্ভাবে নাট্যকারের সমস্ত আদর্শ ও বক্তব্য একই সঙ্গে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। প্রতাপসিংহের পদধ্বনি সেদিন প্রতিটি দেশপ্রেমিকের অন্তরে বেজে উঠেছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শুধু চিরকালীন স্বদেশপ্রেমের ভাষাটুকু দিয়েই চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। সেদিক থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশাত্মক নাট্যসম্ভারের মধ্যে এ নাটকটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। বহু চরিত্রের ভীড় ও বহু ঘটনার সংঘাতে এ নাটকের আবেদন বহুমুখী হয়েছিল, সমালোচকেরা রসনিষ্কাষণের মুহূর্তে এ নাটকের নিন্দা প্রশংসা করেছেন নানা প্রসঙ্গ নিয়ে,—কিন্তু দেশপ্রেমের প্রতীকরূপে যে শ্রদ্ধেয় ঐতিহাসিক চরিত্রটিকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নিখুঁত মানবিক রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিলেন—সে বিষয়ে তেমনতর আলোচনা হয়নি। অশ্রুমতীকে সেলিম অনুরাগিনী করে তিনি ভারতীয় নারীত্বের আদর্শ রক্ষা করেননি বলে যেদিন সমালোচকসম্প্রদায় ও চিতোরবাসীদেরও সমালোচনা ও আক্রমণ সহ্য করেছিলেন—কিন্তু প্রতাপসিংহের ঐতিহাসিক মর্যাদা নিখুঁতভাবে রূপায়িত করেছিলেন বলে কোনো বিশেষ প্রশংসা পাননি তিনি।

বস্তুতঃ দেশাত্মবোধের খাতিরে যিনি নাটকরচনা করেন—তার ঐকান্তিকতা দেশপ্রাণ-তারই নামান্তর। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ বঙ্গবাসীকে 'অশ্রুমতী' নাটকের মূল বক্তব্যটি উপহার দিতে চেয়েছিলেন,—কিন্তু নানা ঘটনার আলোচনায় আসল কথাটি ধামাচাপা পড়ে ছিল।

'অশ্রুমতী' নাটকে অশ্রুমতী ও সেলিম উপাখ্যান নাট্যকারের মৌলিক উদ্ভাবন,—নাট্যকারের স্বাধীনচিন্তার স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশই যেখানে মুখ্য। ঐতিহাসিকতা ও কিছু কল্পনায় ঐতিহাসিক নাটক যেভাবে জমে ওঠে এ নাটকে তার ব্যতিক্রম হয়নি। নাটকটিতে ঐতিহাসিক রোম্যান্স সৃষ্টির চেষ্টা সর্বত্রই ধরা পড়েছে—সেখানেই এ নাটকের নাটকত্ব। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের সার্থক নাটকরূপে বিচারকালে দেখা যাবে স্বদেশপ্রেমের গভীর আকুতি যে চরিত্রটিকে কেন্দ্র করে উৎসারিত হয়েছে—তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র প্রতাপসিংহ। প্রতাপসিংহের আমরণ সংগ্রামের আদর্শ থেকে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী আত্মগঠনের ও দেশচিন্তনের আগুন জ্বালিয়ে নিক,—সম্ভবতঃ এই ছিল নাট্যকারের স্বপ্ন। তাই দেশপ্রেমের নাটকে একটি সার্থক দেশপ্রেমিক চরিত্র রচনায় যতটুকু আন্তরিকতা থাকা দরকার—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রতাপসিংহ চরিত্র রচনায় ততটুকু ব্যয় করতে কার্পণ্য করেননি। প্রতাপের দেশপ্রেমের স্বপ্ন সমগ্র নাটককে—নাটকীয় মুহূর্তগুলোকে যেন আচ্ছন্ন করে আছে। প্রতাপসিংহ সব চরিত্রের ভীড় ঠেলে আমাদের সামনে এসেছেন, কারণ সব বক্তব্যের চেয়ে জোরালো বক্তব্যটি তাঁরই। সব কণ্ঠস্বর তাঁর গর্জনের কাছে সামান্য বলে বোধ হয়েছে। দেশের কবিরা তাঁকে সামনে রেখে কাব্য রচনা করেন, বৈতালিক তাঁকে উদ্দেশ্য করেই সংগীত রচনা করেন, প্রজাসাধারণ তাঁকে শ্রদ্ধা জানায়,—শপথ নেয় স্বদেশমন্ত্রের। এই গৌরবের আসনে বসেও প্রতাপসিংহের মনে এতটুকু শান্তি নেই, স্বস্তি নেই, স্বাধীন চিতোর ছাড়া অন্য কোন চিন্তা নেই। নাটকের শুরুতেই মোঘল পদলেহনকারী মানসিংহের সঙ্গে কথোপকথনে প্রতাপসিংহের আদর্শের পরিচয় পাই,—"প্রতাপ—দেখুন মহারাজ মানসিংহ! আমি বরঞ্চ পর্বতে পর্বতে, বনে বনে অনাহারে ভ্রমণ করে বেড়াব, সকল প্রকার বিপদকে অসংকোচে আলিঙ্গন করব, অদৃষ্টের সকল অত্যাচারই অনায়াসে অক্লেশে সহ্য করব, তথাপি তুর্কের দাসত্ব কখনই স্বীকার করব না।"[৩২] [১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

বাংলা নাটকে এমন স্বচ্ছন্দ বীররসের দৃষ্টান্ত সেযুগে সুলভ ছিল না। আত্মশক্তিতে অটল, আদর্শে অবিচল, যোগ্য দেশপ্রেমিকের মতই উক্তি করেছে

৩২. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী। ৫ম খণ্ড। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা।

প্রতাপসিংহ। দেশই যার আরাধ্য, সেই আরাধিতা দেশমাতৃকার অপমান ঘোচাবার দায়িত্ব নিয়েছে যোগ্য সন্তান। প্রতাপসিংহ তাই মহা খেদে উচ্চারণ করেন,—

হা! সে চিতোর এখন বিধবা—স্বাধীনতার জন্মভূমি—বীরের জননী—সেই চিতোর এখন বিধবা। [১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ শক্তিমান নাট্যকার বলেই—ব্যঞ্জনাগর্ভ শব্দময় রচনার নিপুণতা তাঁর ছিল। চিতোরের দুর্দশা বর্ণনার মধ্যে যে রিক্ততার ব্যঞ্জনাটি তিনি আরোপ করেছেন—অকুলীন শব্দ প্রয়োগেও তার ভাবকে ধ্বনি গ্রাস করেনি। অথচ মাতৃভূমির বৈধব্যদশা ঘোচানোর পবিত্র ব্রতটিই যে স্বদেশপ্রেমিকের প্রথমতম কর্তব্য—প্রতাপসিংহের আক্ষেপের মধ্যে সে ব্যঞ্জনা পূর্ণমাত্রায় বর্তমান।

এ নাটকে আকবর চরিত্রটিকেও আনা হয়েছে প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রাণতাকেই আরও তীব্রভাবে বোঝানোর জন্য। আকবরের দূরদৃষ্টির মধ্যে পররাজ্য গ্রাস ও কায়েম করার যে অভিসন্ধিটি দেখতে পাই নাট্যকার তা সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। আকবর সম্রাট হিসেবে চিতোররাণা প্রতাপসিংহকে বিচার করেছেন,—

রাজপুতদিগের সঙ্গে কুটুম্বিতা করে আমাদের সিংহাসন অটল করব মনে করেছিলেন আমার সে রাজনৈতিক অভিসন্ধি অনেক পরিমাণে সিদ্ধও হয়েছে—কিন্তু প্রতাপসিংহ দেখছি সেইসব পুরাতন হিন্দু কুসংস্কার আবার উদ্দীপন করে দিচ্ছেন, আবার সেই চিরন্তন জাতিবৈরিতা উত্তেজিত করে দিচ্ছেন। তাঁকে দমন না করলে আমার এই রাজনৈতিক অভিসন্ধি একেবারে বিফল হবে। [১ম অঙ্ক, তৃতীয় গর্ভাঙ্ক]

নাট্যকার ঐতিহাসিক এ জাতীয় প্রসিদ্ধ চরিত্রগুলোর বিচারেও যথেষ্ট পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। আকবরের রাজ্যবিস্তারের কূটকৌশলকে এ নাটকে সংক্ষেপে সমালোচনা করেছেন নাট্যকার। এ নাটকেই স্বদেশপ্রেমের পাশাপাশি আছে স্বদেশদ্রোহিতা, আত্মত্যাগের পাশাপাশি স্বার্থসিদ্ধি। প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রাণতা ও শক্তসিংহের দেশদ্রোহিতা—এ নাটকের বক্তব্যকে ঘনীভূত করে তুলেছে। একই সহোদর হলেও শক্তসিংহ প্রতাপসিংহের মত দেশপ্রেমিক নন। দেশপ্রেম প্রতাপ-সিংহকে দুর্বার করেছে, শক্তসিংহ স্বদেশদ্রোহীর মত আচরণ করেছে,—এই বৈপরীত্য নাটকীয় দ্বন্দ্বকে ঘনীভূত করেছে। শক্তসিংহ সম্পর্কে চিতোরবাসীরা তাই খেদে উচ্চারণ করেছে,—

"কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সাহসিকতা, এই বীরত্ব, অবশেষে কিনা স্বদেশের বিরুদ্ধে নিয়োজিত হল।" [১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]

স্বদেশের জন্য আত্মত্যাগের আদর্শও যে সব মানুষের জীবনে কার্যকরী হয় না—শক্তসিংহ চরিত্রটি যেন সেই প্রসঙ্গটিই স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যক্তিগত ঈর্ষাদ্বেষই

মহৎ আদর্শের অন্তরায়—এই আপ্তবাক্যটি নাটকে পরিবেশিত হয়েছে—শক্তসিংহের চরিত্রটির মধ্যে। তবু দেখি প্রতাপসিংহ অপরিসীম আশায় আন্দোলিত হয়েছেন—স্বদেশচিন্তাই সব চিন্তার উর্ধ্বে স্থান পেয়েছে। শক্তসিংহের শত্রুতা ভুলেই প্রতাপসিংহ বলেন,—"ভায়ে ভায়ে যতই শত্রুতা হোক না কেন—দেশবৈরির বিরুদ্ধে কি সকল ভ্রাতার তলোয়ার একত্র হবে না।" [১ম অঙ্ক, ৫ম গর্ভাঙ্ক]

দেশবৈরিতার অপমান থেকে দেশকে মুক্ত করার আমরণ পণ প্রতাপসিংহের, তাই শক্তসিংহের ভ্রাতৃদ্রোহকেও উদার স্বদেশপ্রেমিকের দৃষ্টিতেই বিচার করেছেন তিনি। ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও সংগ্রামের বহু উর্ধ্বে স্বদেশ,—এই গভীর উপলব্ধি দেশপ্রেমিক প্রতাপসিংহের অন্তরে বিরাজমান। স্বদেশের শ্রীহীন রূপ তাঁর অন্তরে গভীর বেদনা সৃষ্টি করে। অতীত গৌরব প্রতাপসিংহের প্রেরণা—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অতীত মহিমা স্মরণে চেষ্টামগ্ন। পরাধীন ভারতের সামনে প্রতাপসিংহের মহিমা বর্ণনার উদ্দেশ্য আর কি হতে পারে? প্রতাপসিংহ মহাদুঃখে মহিষীকে বলছেন,—

আর এখন আমাদের কি আছে? চিতোরের যখন স্বাধীনতা গেছে তখন সকলই গেছে—যে চিতোর পূজনীয় বাপ্পারাওর স্থাপিত—যে চিতোর আমার পূর্ব পুরুষের বাসস্থান—যে চিতোর স্বাধীনতার লীলাস্থল—সে চিতোর যখন গেছে, তখন আর আমাদের কি আছে? মহিষি, তোমরা স্ত্রীলোক, তোমরা বস্ত্র, অলঙ্কার, ধন-ধান্যকেই লক্ষ্মী বলে জ্ঞান কর—কিন্তু তোমরা জাননা স্বাধীনতাই সৌভাগ্যের প্রাণ—

[১ম অঙ্ক, পঞ্চম গর্ভাঙ্ক]

প্রতাপসিংহের স্বাধীনতাপ্রীতির বীরোচিত প্রকাশ উদ্ধৃত সংলাপে করুণ রসের সঞ্চার করেছে যেন। স্বাধীনতাবিহীন জাতির আর কিছুই অবলম্বন থাকে না—এ যেন সংলাপাকারে নাট্যকারেরই ঘোষণা। স্বাধীনতাই সৌভাগ্য সমৃদ্ধি; স্বাধীনতা ছাড়া সবই যে অন্তঃসার-শূন্য, সে যুগে এই বক্তব্যটি প্রচারের আয়োজনেই কাব্য-নাটক-মহাকাব্য-ব্যঙ্গকাব্যের জন্ম। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণায় এই বক্তব্যটি যেন সব বক্তব্য ছাপিয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে।

প্রতাপসিংহের ঐতিহাসিক স্বাধীনচেতনা নবজাগরণের পূর্ণলগ্নে এমন বাস্তব ও হৃদয়গ্রাহী করে প্রচার করে নাট্যকার যে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন সে শুধু দেশপ্রেমের দ্বারা সম্ভব ছিল না। প্রতিভার সঙ্গে শক্তি ও অনুভবের সংমিশ্রণেই এটা সম্ভব হতে পেরেছে।

প্রতাপসিংহ-কন্যা অশ্রুমতীকে কেন্দ্র করেই এ নাটকের পরিকল্পনা, কাহিনীগত অভিনবত্বে অনুপম রসলোক সৃজনের চেষ্টা অন্যান্য নাটকের মত এ নাটকেও আছে। কিন্তু দেশপ্রেমের প্রেরণা নাট্যকারকে কতদূর উদ্বুদ্ধ করেছিল প্রতাপসিংহ চরিত্রের

বিশ্লেষণেই তা ধরা পড়বে। তাঁর সমগ্র ঐতিহাসিক নাট্যসম্ভারে দেশপ্রেমের যে উজ্জ্বল রূপ প্রত্যক্ষ করি, প্রতাপসিংহের চরিত্রে তা ঘনীভূত হয়েছে পুরোমাত্রায়। ঐতিহাসিক পটভূমিকাটি সামনে ছিল বলেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্দাম কল্পনা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল যেন। মানসিংহকে অপমান করেই প্রতাপসিংহ যে সমস্যার সৃষ্টি করেছিলেন তার ফল ভোগ করেছেন তিনি। এ নাটকের শেষাংশে মৃত্যুবরণের মুহূর্ত পর্যন্ত প্রতাপসিংহের অমলিন দেশাত্মবোধ সমগ্র দর্শকের চিত্ত অভিভূত করে রাখে। পরাজয়ের গ্লানি, স্বপ্নভঙ্গের বেদনা, আদর্শের বিফলতা প্রতাপসিংহকে মুহ্যমান করেছে, —কন্যাস্নেহ কিংবা ব্যক্তিগত সমস্ত দুঃখকে তুচ্ছজ্ঞান করেও তিনি শুধু দেশোদ্ধারের স্বপ্নটি বাঁচিয়ে রেখেছিলেন, মৃত্যুমুহূর্তে তাঁরই অন্তিম হাহাকার নিবিড় করুণরসের ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে। প্রতাপসিংহের দেশপ্রেমের গভীরতাকে মানবজীবনের যে কোন গভীরতর উপলব্ধি বলেই মেনে নিতে হবে। দেশপ্রেমের অনুভূতিও যে হৃদয়ের গোপনতম সম্পদ হতে পারে—প্রতাপের হাহাকার তা প্রমাণ করেছে। প্রতাপসিংহ বলেছেন,—"জন্মভূমি চিতোর—তোমাকে জন্মের মত বিদায় দি—তোমার এ অযোগ্য সন্তানের নিকট আর কোনো আশা কোরো না—আর একটু পরেই তোমার ঐ উন্নত জয়স্তম্ভ আমার চক্ষের অন্তরাল হবে।" [৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

সংগ্রামে অনেক কিছু জয় করেও জন্মভূমি চিতোর তাঁর অনায়ত্ত থেকে গেছে, এ আক্ষেপটিও করুণরসের ব্যঞ্জনাসমৃদ্ধ অংশ,—

"মহিষি! এখনও চিতোর উদ্ধার হয়নি—যতদিন না চিতোর উদ্ধার করতে পারব, ততদিন মহিষি, আমার আরাম নাই—বিরাম নাই—শান্তি নাই—নিদ্রা নাই।…যে চিতোর আমাদের পিতৃভূমি, যে চিতোরের সঙ্গে আমার পূর্বপুরুষদিগের কীর্তিগৌরব জড়িত, যার শৈলদেশ তাঁদের শোণিতধারায় ধৌত সেই চিতোরের নিকট আমি এখন কিনা একজন অপরিচিত বিদেশী মাত্র। [৪র্থ অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

এ অনুভূতির গভীরতা স্বাধীনতাকামী পরাধীন দেশের মানুষদেরই উপলব্ধ অনুভূতি। নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বদেশ অনুভূতির মধ্যে যে বেদনাটুকু স্বকীয় অভিজ্ঞতালব্ধ—শুধু সেটুকু দিয়েই প্রতাপসিংহের সংলাপের সত্যতাকে প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছিলো। নাট্যকারের দেশানুরাগের ছবিটুকু আবিষ্কার করতে হবে এসব অংশ থেকেই। হিন্দুমেলার অনুরাগী সমর্থক হিসেবে যে প্রেরণা তিনি জাতির প্রাণে সঞ্চার করতে চান তা ঠিক এই ভাবেই রূপময় করে তোলা সম্ভব। একটি আদর্শ চরিত্রের নিখুঁত রূপ নাট্যকারের সমস্ত বক্তব্যকেই ব্যক্ত করতে পারে একমুহূর্তে,—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তাই সৃষ্টির মধ্যেই তাঁর স্বপ্নকে অনুসন্ধান করেছেন। দেশজননীর প্রতি অনুরাগের মাত্রা ঠিক কতদূর যেতে পারে—প্রতাপসিংহের সারাজীবনের দুঃখ-

বরণের ইতিহাসই তার সাক্ষ্য দিতে পারে। প্রতাপসিংহ চরিত্র অবলম্বন করেই তাঁর স্বকীয় উচ্ছ্বাসের ও উপলব্ধির আশাতীত সাফল্য দেখা যাচ্ছে। মৃত্যুমুহূর্তেও প্রতাপ বিশ্বস্ত অনুচরদের শেষবারের মত আক্ষেপবাণী শোনান,—"যে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা করবার জন্য আমরা এতদিন আমাদের অজস্র রক্ত দিলেম, সেই স্বাধীনতালক্ষ্মীকে তখন সেই রাক্ষসীর নিকট বলি দেওয়া হবে আর রাজপুত প্রধানগণ, তোমরাও সেই বিষময় দৃষ্টান্তের অনুগামী হবে। [৫ম অঙ্ক, প্রথম গর্ভাঙ্ক]

দেশের জন্য সর্বস্ব পণ করতে হবে এমনকি জীবনও। কিন্তু জীবন দিয়েও আদর্শ রক্ষার গুরুদায়িত্ব অর্পণ করে প্রতাপসিংহ দেশপ্রেমের গভীরতা বোঝাতে চাইলেন। এই আদর্শ বংশপরম্পরা বেঁচে থাকবে, স্বাধীন মনটি কখনও হারিয়ে যাবে না, এই প্রতিশ্রুতি বড়ো কঠিন। প্রতাপসিংহের মত দেশপ্রেমিকের সমগ্র জীবন তার প্রতিজ্ঞা পালনেরই ইতিহাস। এই শপথ উচ্চারণের লগ্নেই নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের আবির্ভাব। তিনি প্রতাপসিংহের আদর্শটি প্রাণে প্রাণে সঞ্চারিত করার আশায় 'অশ্রুমতী' নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র না হলেও প্রতাপসিংহকেই উজ্জ্বলরূপে অঙ্কন করেছিলেন, রোম্যান্টিক ঐতিহাসিক নাটক লিখতে গিয়েও দেশপ্রেমোচ্ছ্বাস সব কিছুকেই ছাপিয়ে উঠেছে।

"অশ্রুমতী" কেন্দ্রীয় চরিত্র হলেও অপরিণত চরিত্র। প্রাধান্য পেলেও চরিত্রটি অন্যান্য চরিত্রের ছায়ায় ম্লানমুখী হয়ে আছে। পিতার দেশপ্রেমের দম্ভটি যেন কন্যার জীবনে অভিশাপের মতই নেমে এসেছিল। কিন্তু নিতান্ত গৌণ চরিত্রগুলোও এ নাটকে উজ্জ্বল হতে পেরেছে। কবি পৃথিরাজও তাঁর দেশপ্রেমের অনুভূতির আলোকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কবি পৃথিরাজ দাসত্ব স্বীকারে লজ্জা পেয়েছে। সঙ্গীত রচনা করে, প্রতাপের বীরত্ব ও দেশানুরাগের ব্যাখ্যা করে দুর্বল পৃথিরাজও একটা আদর্শ খুঁজে পেয়েছে। পৃথিরাজের কবিতায় উচ্ছ্বসিত স্বদেশপ্রেম আমাদের মুগ্ধ করেছে। পৃথিরাজের প্রতাপউপাসনা তাঁর গভীর দেশানুরাগেরই ফলমাত্র। প্রতাপের সম্মানরক্ষার জন্যই পৃথিরাজ অশ্রুমতীকে বিবাহ করতে চায়।— নাটকের জটিল পরিস্থিতিতে প্রতাপঅনুরাগী পৃথিরাজ ঘোষণা করেছে,—

বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপসিংহ আমার হৃদয়ের আরাধ্য দেবতা,—তাঁকে প্রাণ থাকতে আমি কখনই কলঙ্কিত হতে দেব না। তাঁর বীরত্ব নিয়েই আমার কবিতা জীবিত রয়েছে···। [৩য় অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]

প্রতাপসিংহের সম্মান রক্ষার দায়িত্ব বহন করতে গিয়েই আত্মদান করতে হল পৃথিরাজকে। কিন্তু প্রতাপসিংহ পৃথিরাজের মূল্য বুঝেছিলেন। দেশপ্রেমের বাণী চয়ন করে যে মহান আদর্শ প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন পৃথিরাজ,—প্রতাপসিংহ সে

মর্যাদা দিয়েছিলেন ; মহিষীকে অনুরোধ করেছিলেন যেন তাঁর নির্বাসিতা কন্যাকে দেশপ্রেমমূলক অংশ পাঠ করতে দেওয়া হয়। বলেছিলেন,—"মহিষি! তুমি ওকে ভাল করে শিখিও, যেসব কবিদের গাথাতে রাজপুত বীরত্বের গুণকীর্তন ও মুসলমানদের নিন্দাবাদ আছে, সেই সব গাথা ওর কণ্ঠস্থ করিয়ে দিও।

[২য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

এই নির্দেশটি পৃথিরাজকে উদ্দেশ্য করেই বলা হয়েছে। পৃথিরাজের শক্তি ছিল না, বীরত্ব ছিল না কিন্তু আদর্শের মহত্ব ও সততা ছিল। বন্দী বিকানীর রাজপুত্র পৃথিরাজ দাসত্বযন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে বলেছিলেন,—

"দাসত্বে এখনও আমরা ভাল করে অভ্যস্ত হইনি। এখনও আমাদের হীন অবস্থা উপলব্ধি করে কষ্ট পাচ্ছি। [১ম অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক]

'অশ্রুমতী' নাটকের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে সমালোচক সম্প্রদায় নাটকীয় কলা-কৌশল ও বিষয়বস্তুর নাট্যিক বিন্যাসেরও চরিত্রচিত্রণের প্রশংসা করেছেন। সেলিম অশ্রুমতীর প্রণয়োপাখ্যান ইতিহাসসম্মত না হলেও উচ্চাঙ্গের নাটকীয় উপাদান এখানে সৃজন করেছেন নাট্যকার। কিন্তু ঐতিহাসিক-রোম্যান্টিক নাটকে উচ্চাঙ্গের দেশপ্রেম যে নিখুঁতভাবে চিত্রিত হতে পারে এবং ঐতিহাসিক উপাদান বজায় রেখেই যে এমন সার্থক দেশপ্রেমীর চরিত্র অঙ্কন সম্ভব,—প্রতাপসিংহ চরিত্রটি বিশ্লেষণ করেই এ তথ্য জানা যায়। নাটকের ঘটনা শুরু হয়েছে দেশপ্রেমের প্রসঙ্গ থেকেই,—যা ঘটেছে তা শুধু দেশপ্রেমিকের দেশানুরাগের ফলাফল রূপে। তবু এ নাটকের প্রতিটি চরিত্র প্রতাপসিংহের মহৎ চরিত্রের কাছে নতি স্বীকার করেছে,—তার আদর্শকে শ্রদ্ধা করেছে। পঞ্চম অঙ্কে নানা জটিলতার অবসান ঘটেছে,—পৃথিরাজের আত্মদান, অশ্রুমতীর যোগিনী বেশ দেখিয়েও নাট্যকার শেষ বক্তব্যটিতে দেশাদর্শকেই স্থান দিয়েছেন। প্রতাপসিংহের অন্তিম আক্ষেপের উত্তরে তাঁর বিশ্বস্ত অনুচরদের মুখে একটি শান্ত দৃঢ় সংলাপ স্থাপন করেছেন।—এই শপথবাক্য শ্রবণ করেই নিশ্চিন্ত প্রতাপসিংহ মৃত্যুবরণ করেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা রক্ষার আশ্বাস দিতে পেরেছিলেন তাঁর অনুচরবৃন্দ—"না—মহারাজ আপনি নিরুদ্বিগ্ন হোন্ আমরা সকলে বাপ্পারাও সিংহাসনের নামে শপথ করে বলছি যে, যতদিন না মেবারের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার হয়, ততদিন এখানে প্রাসাদ নির্মাণ করতে দেব না।"

[৫ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

এই শপথবাক্যের মধ্যে নাট্যকার দেশপ্রেমিকদের অন্তরের দৃঢ়তার চিত্র অঙ্কন করেছেন। পরাধীনতার মধ্যে সামান্যতম বিলাসকেও স্থান দেওয়া যে অপরাধ এই বোধটি সঞ্চার করার কোন ইচ্ছা নাট্যকারের অন্তরে সুপ্ত ছিল কিনা কে জানে।

দেশপ্রেমমূলক নাট্যসম্ভারের তৃতীয় নাটক হিসেবে "অশ্রুমতী"র রচনাকৌশল ও বিষয়বস্তুর উদ্ভাবনে নাট্যকারের পরিণত চিন্তাধারার পরিচয় থাকবে এটাই স্বাভাবিক। আগের দুটি নাটকে দেশাদর্শ ও নাট্যাদর্শকে একাকার করে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা চোখে পড়ে। বিশেষতঃ প্রথম নাটক 'পুরুবিক্রমে' চরিত্রগুলোকে নাটকীয় চরিত্র হিসেবে কল্পনা না করে তিনি দেশপ্রেমী ও স্বদেশপ্রেমী এ'দুটি স্তরে সাজিয়েছেন। দেশপ্রেমের মাপকাঠিতেই যেন চরিত্রগুলোর ওজন ঠিক করা হচ্ছে। "অশ্রুমতী" নাটকের রচনাদর্শ ঠিক এতখানি দেশকেন্দ্রিক নয়। দেশপ্রেম আছে, পিতৃস্নেহের সঙ্গে দেশাত্মবোধের দ্বন্দ্ব আছে কিন্তু কোনটাই নাটকের মূল ঘটনা নয়। অশ্রুমতী এ নাটকের নায়িকা;—ঘটনাচক্রে প্রতাপসিংহদুহিতার সঙ্গে আকবরপুত্র সেলিমের যে রহস্যমধুর প্রণয় পর্বটি সূচিত হলো,—নাট্যকার এই মূল উপাখ্যানটিকেই নাটকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এই অংশটিই নাটকের জটিলতম অংশ। এরই সমাধানে নাটক শেষ হয়েছে। মূল চরিত্রের মধ্যে যেমন দেশচেতনার স্পর্শ নেই, মূল ঘটনাটিও মানবজীবনের চিরন্তন রহস্যকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। রাজকুমারী অশ্রুমতী সেলিমের অনুরাগিনী,—এই কল্পনাতে নাটকীয়তা আছে;—মৌলিকত্ব ও চমৎকারিত্ব আছে কিন্তু দেশপ্রেমের নামগন্ধ নেই। অথচ মূল ঘটনা ও চরিত্রের অন্তর্গত না হয়েও সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতাপসিংহ চরিত্রটিকে জনগণের সামনে আদর্শ চরিত্র হিসেবে দেখানোর ত্রুটি করেননি নাট্যকার। প্রতাপসিংহের ঐতিহাসিক মহত্বটুকু নিখুঁতভাবে চিত্রিত করে নাট্যকার তাঁর দেশচেতনার অনুরাগটি যেমন প্রকাশ করেছেন তেমনি মূল ঘটনা ও চরিত্র অঙ্কনেও সাবধানতা অবলম্বন করেছেন। বোধহয় এদিক থেকে আলোচনা করলেই নাট্যকার হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিণত প্রতিভার অবদান হিসেবে 'অশ্রুমতী' নাটকের উল্লেখ করা যায় সঙ্গত ভাবেই।

'অশ্রুমতী' নাটকে যেমন নাট্যরসঘন মুহূর্ত সৃজনে নাট্যকার সার্থকতা দেখাতে পেরেছেন,—মূল রসসৃজনে বাধা সৃষ্টি না করে নাট্যকারের বাঞ্ছিত দেশপ্রেমের ব্যঞ্জনাটুকুও তিনি এ নাটকে সার্থকভাবে প্রয়োগ করতে সক্ষম হয়েছেন। তাঁর সমগ্র দেশপ্রেমাত্মক নাট্যসৃষ্টির মধ্যে 'অশ্রুমতী' নাটকেই দেশপ্রেমের বক্তব্য বিস্তারিতভাবে চিত্রিত হয়েছে। দেশ সম্পর্কে নাট্যকারের ধারণা ও আদর্শ ঐতিহাসিক প্রতাপসিংহের দেশচেতনার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে। দেশাত্মবোধের সংলাপ প্রতাপসিংহের মুখে যখন উচ্চারিত হতে শুনি তখন ইতিহাস ও বর্তমান যেন একাকার হয়ে যায়। জাতির আত্মায় আত্মায় যখন দেশপ্রেমের বান ডেকেছে নাট্যকার সেই মুহূর্তেই প্রতাপসিংহের মূর্তিটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেশপ্রেমমূলক নাট্যধারার সর্বশেষ সংযোজন 'স্বপ্নময়ী নাটক।'

ইতিপূর্বেও দেশপ্রেমাদর্শ প্রচারের জন্য নাট্যকার ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছেন, 'স্বপ্নময়ী নাটকটিও' ইতিহাসভিত্তিক রচনা। কিন্তু সে ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। দেশাত্ম-বোধের ধারণাটি ঐতিহাসিক চরিত্রের কাঠামোতে স্থাপন করার কিছু সুবিধে আছে, দেশাত্মচেতনার মত একটি দুর্লভ অনুভূতিকে বিশ্বাসযোগ্য ভাবে পরিবেশনের জন্য কল্পিত চরিত্র থেকে পরিচিত ঐতিহাসিক চরিত্রের সাহায্য নেওয়াটা সবদিক থেকেই নিরাপদ। পাত্র-পাত্রীরা ইতিহাসের পরিচয়পত্র নিয়ে মঞ্চারোহন করলে নাট্যকারের দায়িত্ব খানিকটা কমে বৈকি। বিশেষ করে কোন আদর্শ প্রচারের ক্ষেত্রে পরিচিত ঐতিহাসিক আদর্শের অনুসরণ করলে অনেক অবাঞ্ছিত কৈফিয়তের হাত থেকেও নাট্যকার মুক্তি পেতে পারেন। তাই দেখা যাচ্ছে—দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করতে বসেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিহাসের পৃষ্ঠানুসন্ধানে মগ্ন। প্রবাদতুল্য ঐতিহাসিক চরিত্র সামনে রেখে দেশপ্রেমের মহিমা ব্যাখ্যা করতে নাট্যকারের যে বিশেষ সুবিধে হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। চারটি নাটকেই দেখা যায় নাট্যকার ইতিহাসের সূত্রটুকু সংযোগ-সেতু রূপে ব্যবহার করেছেন। মৌলিকত্ব যে নেই তা বলা যায় না, নাটক রচনায় যে ধরণের কল্পনার সাহায্য নেওয়া অত্যাবশ্যক নাট্যকার তাও গ্রহণ করেছেন। সুতরাং এই শ্রেণীর সর্বশেষ নাটকটিতেও জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের লক্ষণ বর্তমান। তবে পার্থক্যটুকুও চোখে পড়ে। ইতিপূর্বে বাংলাদেশের ইতিহাসকে কেন্দ্র করে তিনি দেশপ্রেম প্রচারের চেষ্টা করেননি। বাংলার নবজাগরণের মহালগ্নে ভারতীয় ইতিহাসের উজ্জ্বল চরিত্রগুলোকে তিনি রূপদান করেছেন—শুধু বাংলার ইতিহাসই স্থান পায়নি। এজন্য নাট্যকারের পরিকল্পনাকে দোষারোপ করা অন্যায়; বাংলার ইতিহাসকেই বরং দায়ী করা চলে। স্বদেশপ্রেমের চেতনাটি বাংলার ইতিহাসে এমন সুলভ ছিল না যে নাট্যকার তা থেকে নাটকের উপাদান সংগ্রহ করতে পারেন। তাছাড়া বাংলার আঞ্চলিক বিদ্রোহকে দমন করার জন্য মাঝে মাঝে কোন কোন শক্তিমান পুরুষের আবির্ভাব হলেও অবিচ্ছিন্ন দেশারাধনা হয়ত সে চরিত্রের একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। ফলে বাংলাদেশের ইতিহাস থেকে দেশপ্রেমিক চরিত্র অনুসন্ধানের চেষ্টা করলেও তাতে নাটকীয় উপাদানের যথেষ্ট অভাব ছিল এটা সত্য। তবু দেখা যাচ্ছে, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এ কার্যে প্রথম ব্রতী। বঙ্গইতিহাসের একটি বিদ্রোহী নেতাকে দেশপ্রেমিকতার রং-এ রঙ্গীন করে একটি মৌলিক নাটক সৃজনের এ প্রচেষ্টাটি সেদিক থেকেই অভিনন্দনযোগ্য। শোভা সিংহ চরিত্রের সবটুকু হয়ত ঐতিহাসিক সত্য নয় কিন্তু এ চরিত্রকে মিথ্যা বলারও হেতু নেই। স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষা থাকাটা বিচিত্রও নয়, অসম্ভাবিতও নয়। মোঘল অধ্যুষিত বঙ্গদেশে চিতুয়া বর্দা অঞ্চলের শক্তিমান নেতা শোভা সিংহ দেশ থেকে মোঘল বিতাড়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন,

এটুকু যদি মিথ্যা না হয় তবে 'স্বপ্নময়ী নাটকের' নায়ক হিসাবে যে শোভা সিংহ চরিত্রটি নাট্যকার আমাদের সামনে এনেছেব – তাকে শুধু অতিরঞ্জিত বা কষ্টকল্পিত চরিত্র বলে মনে করার কোন সঙ্গত কারণ নেই। ঐতিহাসিক বিবরণ যতটুকু মিলছে তাতে শোভা সিংহের স্বাধীনতাপ্রীতি ও দুঃসাহসিক দেশোদ্ধারের প্রসঙ্গ সর্বত্র রয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের নানাস্থানে মেদিনীপুর থেকে রাজমহল পর্যন্ত শোভা সিংহের অপ্রতিহত বিজয়অভিযানের সংবাদ সে যুগীয় নথিপত্রে বারবার উল্লিখিত হয়েছে। 'District Gazetteers'—এ হুগলী, মেদিনীপুর ও বর্দ্ধমানের জেলাভিত্তিক ইতিহাসে শোভা সিংহ অন্যতম সংবাদ। হুগলীর ইতিহাসে বলা হয়েছে,—

"Subha Singh, a Zamindar of parganas Chitwa and Barda in the Ghatal Sub-division of the Midnapore district becoming dissatisfied with the Government, joined hands with Rahim Khan, an Afgan Chief of Orissa. Their levies marched through the Arambagh sub-division to Burdwan, slew the Raja, Krishna Ram, in battle, and seized his family and property. The rebels next took Hooghly and spread over West Bengal, capturing Murshidabad Cossimbazar, Rajmahal and Malda".[৩৩]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ইতিহাসের এই সত্য বিবরণের মর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করেছিলেন নাটকটিতে। কারণ দেশাত্মবোধের আদর্শ ইতিহাসের এ চরিত্রটিতে যেমন ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল যে কোন স্বদেশপ্রেমী নাট্যকারের কাছে তার উপাদান লোভনীয়। ইতিহাসে বর্দ্ধমান রাজকন্যার নামটিও উল্লিখিত হয়েছে। রাজকন্যা সত্যবতীর সাহসিকতার প্রসঙ্গও অনুল্লিখিত ছিল না; সব মিলিয়ে নাটকের উপাদান ও ইতিহাসের ঘটনার মোটামুটি ঐক্য সংস্থাপিত হয়েছে বলা চলে। নাট্যকার কাহিনী উদ্‌ভাবনে যেটুকু কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন তা তাঁর অন্যান্য নাটকেও দেখা যাচ্ছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভা বিশ্লেষণ করলে খুব সহজেই তার এ প্রবণতা চোখে পড়ে। শুধু ইতিহাস নিয়ে তিনি তৃপ্ত নন, ইতিহাসবিহীন কল্পনাও তাঁর পক্ষে অস্বস্তিদায়ক—তাই ইতিহাসের সেতু ধরে রোম্যান্টিক কল্পনার জগতে খুব সহজেই তাঁর উত্তরণ। তিনি ইতিহাসের সংযোগটুকু হারাতে চান না অথচ কল্পনার বিমানে আকাশ ভ্রমণের ইচ্ছাটুকু পুরোমাত্রায় আছে। পূর্বেই বলেছি এর হেতু;

৩৩. L. S. S. O' Malley, Bengal District Gazetters, Hooghly, 1912, P. 33.

আদর্শ প্রচারের প্রয়োজনটুকু নাট্যকার অস্বীকার করতে পারেন না তাই নিছক কাল্পনিক বস্তু থেকে আদর্শবাদ নিষ্কাশনে তাঁর দ্বিধা। তাই তাঁর প্রত্যেকটি নাটকে একই সঙ্গে [মৌলিক ও ঐতিহাসিক] নাট্যকারের স্বাধীনতা পুরোমাত্রায় ব্যবহার করেও মোটামুটি ইতিহাসের সঙ্গে তাল ফেলে চলার চেষ্টাই তাঁর বৈশিষ্ট্য। 'স্বপ্নময়ী নাটকেও' এসব লক্ষণ বর্ত্তমান থাকবে এটাই সঙ্গত।

এ নাটকেও অন্যান্য নাটকের মত স্বদেশপ্রাণ একটি আদর্শ নায়কের পরিকল্পনা করেছেন নাট্যকার। স্বদেশই যাঁর জীবনের আরাধ্য বস্তু, ব্যক্তিগত স্বার্থবোধকে তুচ্ছ মনে করার মত নির্ভীকতা ও দৃঢ়তা যে চরিত্রকে লোকচক্ষে মহৎ করে তোলে। শোভাসিংহ চরিত্রে একই সঙ্গে নাট্যকার এই দৃঢ়তা ও স্বাদেশিকতা দেখিয়েছেন। এ চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি সম্পর্কে আলোচনা করলেও দেখা যাবে নাট্যকারের এই চরিত্র কল্পনা মোটামুটি বাস্তব সত্যকেই অনুসরণ করছিল। ইতিহাসেও এ চরিত্রটি ঐতিহাসিকেরা এভাবে দেখিয়েছেন। সামান্য জমিদার হয়েও উচ্চাশা ছিল তাঁর চরিত্রের মূলে—যার সাহায্যে অতর্কিত আক্রমণে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের রাজশক্তিকে পরাজিত করে এমন কি আফগান সর্দার রহিম খাঁর সাহায্য নিয়েও সম্মিলিতভাবে মোঘলশক্তিকে এদেশ থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্ন দেখছিলেন শোভা সিংহ। তাঁর অত্যাচার ও লুণ্ঠনঅভিযানের কবল থেকে বিদেশী উপনিবেশগুলোও রেহাই পায়নি। এ প্রসঙ্গে একটি তথ্যপূর্ণ প্রবন্ধগ্রন্থের উল্লেখ করা প্রয়োজন। শ্রীচারুচন্দ্র রায় 'শোভাসিংহের বিদ্রোহ' গ্রন্থে সে বিষয়ে আলোকপাত করেছেন। তিনি একটি কৌতূহলজনক সত্য ঘটনা জানিয়েছেন,—

"শোভা সিংহের বিদ্রোহের ছুতায় Old Fort William রচনা আরম্ভ হইয়াছিল একথা সত্য।"[৩৪]—কাজেই শোভা সিংহের অসমসাহসিকতা ও বীরত্ব যে সম্পূর্ণ সত্য এ বিষয়টি অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। অথচ নাটকীয় উপাদানও এই চরিত্রটিতে যথেষ্ট রয়েছে। এ ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটকের সঙ্গে এ নাটকের পার্থক্য স্বীকার করতেই হয়। ইতিপূর্বে তিনি কাল্পনিকতাসর্বস্ব ও ইতিহাসগন্ধী যে স্বদেশপ্রেমের নাটক রচনা করেছিলেন তার সঙ্গে 'স্বপ্নময়ী নাটকের' মূল ঘটনা ও চরিত্রের যোগ অল্প। মোটামুটি ইতিহাসের নির্দেশ অমান্য না করে নাটক রচনার এমন প্রয়াস এই নাটকেই প্রথম দেখি। বর্দ্ধমান রাজাকে পরাজিত করে সৈন্য সংগ্রহের যে অবিরত চেষ্টা তিনি করেছিলেন তাতে তাঁর আগামী দিনের উদ্দেশ্যটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিদেশী মোঘলরা যে শত্রু,— এ ধারণা যাঁর ছিল তিনি

৩৪ চারুচন্দ্র রায়, শোভাসিংহের বিদ্রোহ, ১৯২২।

নিশ্চয়ই স্বদেশ সচেতন ছিলেন। তবে নাট্যকার শোভা সিংহকে স্বদেশপ্রাণরূপেই চিত্রিত করার স্বাধীনতাটুকু গ্রহণ করেছিলেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার বলেছেন,—

"Sova Singh, a Zamindar of Chota-Barda in the Ghatal-Chandrakona sub-division of Midnapur, took to plundering his neighbours, about to the middle of 1695. Raja Krishna Ram, a Panjabi Khatri, who held the contract for the revenue collection of the Burdwan district, opposed the brigand with a small force, but was defeated and slain (C. Jan. 1695). His wife and daughters were captured by Shova Singh, who took the town of Burdwan itself with all ahe Raja's property. With the vast wealth thus gained the rebel leader greatly increased his army, took the title of Raja, and began to plunder and occupy the neighbouring country".[৩৫]

মোটামুটি এ ইতিহাস নাট্যকার অনুসরণ করেছিলেন। পররাজ্য গ্রাসের দ্বারা আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা করতে গেলেও নিজের দেশের স্বার্থচিন্তাই সবার আগে আসে। শোভা সিংহ ক্ষুদ্র জমিদার হয়েও বৃহৎবঙ্গ উদ্ধারের স্বপ্ন দেখেছিলেন, নাট্যকার এই স্বপ্নের পেছনে স্বদেশপ্রেমের শক্তি কল্পনা করেছেন।

"স্বপ্নময়ী" নাটকের প্রথমেই শোভা সিংহের স্বদেশপ্রেম প্রচার করেছেন নাট্যকার।

"—আমি দেশের জন্য—মাতৃভূমির জন্য—ধর্মের জন্য—আর সকল ক্লেশ—সকল যন্ত্রণাকেই আলিঙ্গন কচ্চি; কিন্তু—কিন্তু—দেবতার ভান করে লোকের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করা—ছদ্মবেশ ক'রে লোকদের প্রতারণা করা—ওঃ কি জঘন্য—কি জঘন্য—"[৩৬]

[১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক।

শোভাসিংহের দেশোদ্ধারের পরিকল্পনা, স্বদেশপ্রাণতা ও মানবিকতার দ্বন্দ্বে নাটকের প্রথম থেকেই এ চরিত্রটি লক্ষ্যণীয় হয়ে উঠেছে। সপ্তদশ শতাব্দীর মোঘল অধ্যুষিত বাংলার কোন জমিদার দেশব্যাপী বিদ্রোহ জাগাবার চেষ্টা করেছিলেন-নাট্যকার যদি এ নাটকে সে সংবাদটুকুও প্রচার করার দায়িত্ব নিয়ে থাকেন তবে তাঁকে অভিনন্দন জানাতেই হয়। দেশবোধে অনুপ্রাণিত অতীত ইতিহাসলুব্ধ সে

৩৫. Jadunath Sarkar, History of Bengal (Vol. II) Dacca, 1948, P. 393.

৩৬. জ্যোতিরিন্দ্রনাথ গ্রন্থাবলী। ৫ম খণ্ড। বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা।

যুগের বাঙালী বোধহয় এ ধরণের চরিত্র সামনে রেখেই দেশোদ্ধারের সঙ্কল্প গ্রহণ করতে চাইছিল। এই অনুপ্রেরণা ইতিহাসই সঞ্চার করতে পারে—আবার সে ইতিহাসে যদি একান্ত আমাদেরই সংবাদ থাকে তবে তার প্রতি আকর্ষণ দুর্বার হওয়াই ত স্বাভাবিক। স্বদেশপ্রেমী নাট্যকার হিসেবে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সে যুগের এই বক্তব্যটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলেই বাংলার ইতিহাসে নাটকীয় চরিত্র অনুসন্ধান করেছিলেন।

"স্বপ্নময়ী নাটকের" প্রথমেই সুরজমল ও শুভ সিংহের পরিকল্পনা অসম্ভব হতে পারে কিন্তু দেশোদ্ধারের উৎসাহ নিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকাটা আরও বেশী অস্বাভাবিক হতো বোধ হয়। সামান্য একজন জমিদার যখন বাহুবলে দেশোদ্ধারে অক্ষম তখন তাকে কৌশল অবলম্বন করেই কার্যোদ্ধার করতে হবে। অবশ্য নাটকের দিক দেখে এমন পরিকল্পনার মূলে নাটকীয়তা সৃজনের চেষ্টাটিই চোখে পড়ে। এমন সময়েই আফগান সর্দার রহিম খাঁন বিদ্রোহী শুভসিংহের সঙ্গে যোগদান করেছে। এ ঘটনাটিতেও ইতিহাসের সমর্থন আছে। ঐতিহাসিক যে সংবাদ দিচ্ছেন তা এই,—

Rahim Khan, the leader of the Orissa Afgans, joined him and greatly increased his military strength.[৩৭]

কিন্তু ইতিহাস যে সংবাদ দেয়নি রহিম খাঁ সম্পর্কে নাট্যকার তা কল্পনা করে নিয়েছেন। সুযোগসন্ধানী রহিম খাঁর উদ্দেশ্যটি নাটকের প্রথমেই নাট্যকার ব্যক্ত করছেন। হিন্দু ও মুসলমানের সম্মিলিত অভিযানের ফলাফল যাই হোক না কেন,—রহিম খান যে স্বার্থসিদ্ধির জন্য শোভাসিংহের আশ্রয় নিয়েছিলেন এ সত্যটি প্রথমেই ব্যক্ত করেছেন নাট্যকার। শোভাসিংহের আদর্শের সুযোগেই রহিম খান বন্ধুত্বের ভান করেছিল,—নাট্যকার এভাবেই সে যুগের রাজনীতির জটিল ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করেছেন এবং এ ব্যাখ্যাটি খুব স্বাভাবিক বলেই মনে হয়েছে। রহিম খানের বক্তব্য,—

"বেশ এদের বুঝিয়ে দিয়েছি—হিন্দুদের বোঝাতে কতক্ষণ? এই বিদ্রোহে যদি মোঘল রাজত্ব যায়, তখন এই তৃণভোজী হিন্দুদের জয় করতে কতক্ষণ?

[১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

তবু নাটকের নায়ক শুভসিংহ ও রহিম খান সম্মিলিতভাবে বর্দ্ধমানরাজ কৃষ্ণরামের বিপক্ষতা করেছে। শাস্ত্রালোচনামগ্ন কৃষ্ণরাম বিপদ সংবাদ পেয়েও নীরব; হাস্যকর

৩৭. Jadunath Sarkar, History of Bengal (Vol. II) Dacca, 1948, P. 393.

ব্যাপার বলে তিনি উপেক্ষা করেন ঘটনাটিকে,—"সম্রাটের বিরুদ্ধে; ক্ষুদ্র একজন তালুকদার দুর্দান্ত প্রতাপ সম্রাট আরঙ্গজীবের বিরুদ্ধে; কি হাস্যকার ব্যাপার। তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে আমি শাস্ত্রালোচনা করতে পারি।" [১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

নাট্যকার কৃষ্ণরামের সংলাপে নাট্যরস সৃজন করছিলেন ;—কিন্তু বক্তব্যের গভীরতা অনুসন্ধান করলে আমরা যে সত্যটি লাভ করব তার মূল্য বড় কম নয়। সেযুগে দাসমনোবৃত্তিতে অভ্যস্ত জমিদারদের চরিত্রটিও যেন এখানে মূর্ত হতে দেখছি। শুভসিংহ যে সামান্য তালুকদার হয়েও এ চেষ্টা করতে পারে তা কৃষ্ণরাম কল্পনাও করতে পারেননি। দেশাত্মবোধের অভাবে এ চরিত্রটি আমাদের সহানুভূতি হারিয়েছে অথচ নাট্যকার বাংলাদেশের তৎকালীন ইতিহাসের স্বরূপ চিনিয়ে দিতে পেরেছেন।

এ নাটকে শুভসিংহের অমলিন দেশচেতনার প্রকাশ সর্বত্র। শুধু দেশপ্রেমিক হিসেবে নয়, উদার মানবতার আদর্শটিও তাঁর চরিত্রে বর্তমান। নায়কোচিত গুণে বিভূষিত এ চরিত্রটিকে শ্রদ্ধেয় করে তুলেছেন নাট্যকার। স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের কল্পনা ও সচেতন মানবিকতা শুভসিংহের সংলাপে মূর্ত হয়ে উঠেছে ;—

"মাতঃ জন্মভূমি, আমি যা যথার্থ ছিলেম, তা তোমার কাছে আমি বলিদান দিয়েছি, আমি এখন আর সে শুভসিংহ নই, আমি আর একজন। মা, তোমার শতকোটি সন্তানের মধ্যে আমি কে? আমি আপনার অবমাননা করে তোমাকে অবমাননার হাত হতে যদি মুক্ত করতে পারি, আমি আপনাকে হীন ক'রে তোমাকে যদি হীনতা হ'তে উদ্ধার করতে পারি, তবে আমি কেন তা না করব?"

[১ম অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]

নাট্যকার এই উক্তির অন্তরালে যে আদর্শই প্রচার করেছেন তাতে সন্দেহ কোথায়? দেশজননীকে অবমাননার হাত থেকে মুক্ত করার জন্যই শুভসিংহ ছদ্মবেশ ধারণ করেছেন. উদ্দেশ্যসাধন ছাড়া অন্য কোন দুরভিসন্ধি তার ছিল না। দেশের জন্য আত্মঅবমাননাও বরণ করা সম্ভব,—এটি নিছক সেযুগীয় আদর্শবাদেরই কথা। উপরন্তু দেশপ্রেমিকের বহু সংশয়ের সমাধান হয়েছে এ ভাবটির মাধ্যমে। বিপ্লবাত্মক আদর্শবাদের শুরু যেখানে নাট্যকার প্রায় ততদূর পর্যন্ত আমাদের চিন্তাধারাকে চালিত করেছেন। দেশের জন্যই আত্মাবমাননা করেছে শুভসিংহ। দেশের স্বার্থ নিজের মান-অপমানের চেয়েও যে মূল্যবান—এই স্পষ্ট ইঙ্গিত ভবিষ্যতের বিপ্লবীদের বহুতর্কের অবসান ঘটাতে পারে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এখানে গভীরতর দেশোপলব্ধির বিশুদ্ধ মার্গে আরোহণ করেছেন। অধ্যাত্মসাধনায় সাধক যেমন নিজের মান-অপমান, লাভালাভকে সমর্পণ করেন ভগবানের চরণে, দেশপ্রেমিকও সব তুচ্ছতাকে সমর্পণ করেছে দেশের স্বার্থে। এই পথটিই ভবিষ্যতের দেশপ্রেমিকেরা বেছে নিয়েছিলেন।

কিন্তু দেশপ্রেমের গভীরতা না থাকলে এই আচরণকে ভয়াবহ ও নীতিবিরোধী বলে মনে করতে বাধা থাকে না। মৌলিক দেশপ্রেমাত্মক নাটক রচনার শেষপর্যায়ে এসে নাট্যকার এই ধরণের জটিল দেশচিন্তার স্তরগুলি বিশ্লেষণ করেছেন নিপুণভাবে।

শুভসিংহ দেশের জন্য ছদ্মবেশ ধারণ করেছে,—কিন্তু এই ছদ্মবেশ যখন সরল-নিষ্পাপ স্বপ্নময়ীর মনে ভ্রান্তির সৃষ্টি করেছে তখনই মর্মে মর্মে বেদনাবোধ করেছে সে। একদিকে মানসিক অনুভূতি অন্যদিকে স্বদেশের স্বার্থ। যা নিন্দনীয় ও অন্যায় শুভসিংহ সমগ্র অন্তর থেকে তার প্রতিবাদ করেছেন। স্বপ্নময়ী দেবতারূপে পূজার্চনা করার আয়োজন করেছে,—শুভসিংহ মরমে মরে গেছেন। দেশের সঙ্গে আত্মার এই তীব্রবিরোধ চরিত্রটির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে, দেশপ্রেমিক রূপেও শুভসিংহ সার্থক হয়েছে, মানুষ হিসেবে তার সার্থকতা আরও বেশী করে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। শুভসিংহ চরিত্রে নিখুঁত একটি বিচারশীল-যুক্তিপ্রাণ স্বদেশবাসীকে অনুসন্ধান করেছেন নাট্যকার। ক্ষুদ্র তালুকদার হয়ে যে সমগ্র দেশের স্বাধীনতা বিদেশীর হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে চায়,—সে বাতুল চরিত্রের সারিতে স্থান পেত অনায়াসে, নিছক আদর্শবাদের আন্তরিকতায় শুভসিংহ শ্রদ্ধার আসনে উপবেশন করেছে। শুভসিংহের দেশপ্রেম ও ব্যক্তিমনের দ্বন্দ্বে নাটকটি আলোড়িত হয়েছে। দেশপ্রেমিকের জীবনেও যে উচ্চাঙ্গের নাটকীয় দ্বন্দ্ব থাকতে পারে,—এ নাটকটি না পেলে সে তথ্য আমাদের অজানা থেকে যেতো। তাই সে যুগের পটভূমিকায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের এই নাটকটিকে মননশীল সৃষ্টি বলেই অভিনন্দিত করা হয়।

শুভসিংহের অন্তর্দ্বন্দ্বের ঘনীভূত রূপ প্রত্যক্ষ করি যখন সরলা নায়িকা স্বপ্নময়ীকে প্রেমিকারূপে আবিষ্কার করেছে সে। কিন্তু কোন ভাবেই আত্মপ্রকাশ যখন অসম্ভব তখন মহৎ আদর্শের দ্বারা স্বপ্নময়ীকে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেছে সে। স্বপ্নময়ীকে লাভ করার স্বাভাবিক কামনাকে পবিত্র দেশপ্রেমে রূপান্তরিত করেছে শুভসিংহ। যদিও ব্যাপারটি যথেষ্ট অবাস্তব, নাট্যকার বাস্তবরূপেই তা দেখানোর চেষ্টা করে গেছেন। শুভসিংহ মানসিক চাঞ্চল্য অবদমন করেছে দেশপ্রেমের আবরণে। তার উক্তিটিও তদনুসারী,—

"আমি সেই বিশ্বস্তা সরলা বালাকে বুঝিয়ে বলব যে, দেশই আমাদের আরাধ্যা জননী, তিনি পার্থিব পিতা হতে উচ্চ, মাতা হতে শ্রেষ্ঠ, স্বর্গ হতেও গরীয়সী।"

[২য় অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

এই আদর্শবাদের কোথাও ছলনা নেই, অতিশয়োক্তি নেই, শুভসিংহ তাঁর জীবনের সব স্বপ্নকেই দেশস্বপ্নে রূপান্তরিত করতে চেয়েছেন। আপাততঃ তাঁর

উদ্দেশ্য সাধনের পথে কোন বিঘ্ন আসতে দেওয়া মানেই তাঁর সব আদর্শের মূলে আঘাত করা। বর্ধমানের কোষাগারের প্রতিই তার লোভ, যেন তেন উপায়ে সেই অর্থবিত্ত সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যটি সফল করে তুলতে হবে। রহিম খানের সঙ্গে যুক্তভাবে শুভসিংহ শুধু সেই উপায়টিই চিন্তা করেন। তবু রাজকুমারী স্বপ্নময়ীর পবিত্ররূপে মুগ্ধ না হয়ে পারেননি শুভসিংহ। শুভসিংহ চরিত্রটি এখানেই শুধু নাট্যকারের আদর্শবাদের বাহক না হয়ে জীবন্ত মানুষের বিগ্রহরূপে দেখা দিয়েছে। দেশপ্রেমের সঙ্গে ব্যক্তিপ্রেমের আবির্ভাব শুভসিংহের জীবনে জটিলতা সৃষ্টি করেছে যেখানে, সে অংশটুকুই এ নাটকের সর্বাপেক্ষা হৃদ্য অংশ। শুভসিংহের মানসিক চাঞ্চল্যকে সুরজমল ব্যাখ্যা করেছে মূঢ়ের মতন; স্বপ্নময়ীকে দেশপ্রেমে দীক্ষা দিতে গিয়ে শুভসিংহ তাঁকে তাঁর মানসীর আসনেই প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এ গূঢ় সত্যটি না বুঝেই সুরজমল বলেছে,—

দেশ, মাতৃভূমি, এই সকল অশরীরী মহান ভাব কি কোন স্ত্রীলোক কখন মনে ধারণা করতে পারে? [২য় অঙ্ক, ৪র্থ গর্ভাঙ্ক]

তবু দেখছি, শুভসিংহ তাঁর স্বাদেশিকতার আদর্শে দীক্ষা দেবার জন্য স্বপ্নময়ীকে দেশমাতৃকা সম্বন্ধে ধারণা জাগাতে চেষ্টা করেছেন। দেশজননীর মহিমা বোঝানোর চেষ্টাটি নাট্যকারের দিক থেকে স্বাভাবিক হলেও নাটকের দিক থেকে নয়। চিতোয়াবর্দার তালুকদার শোভাসিংহ শুভসিংহরূপে নাটকে আবির্ভূত হয়ে নাটকীয় চরিত্র কিংবা নাট্যকারের কল্পিত আদর্শ চরিত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করুন ক্ষতি নেই কিন্তু তিনিই আবার পয়ারে বিশুদ্ধ দেশপ্রেমের কবিতা রচনা করছেন, উদাত্তস্বরে তা আবৃত্তি করে সমগ্র দর্শকের হাততালি কুড়োচ্ছেন,—এ ধরণের কল্পনাগত চমৎকারিত্ব সর্বত্রই আছে বটে কিন্তু নাটকের বাস্তবতা এতে ক্ষুণ্ণ হয়েছে। যিনিই দেশপ্রেমিক, তিনিই কূটকৌশলী, তিনিই কবি, একাধারে এ ধরণের বিপরীত স্বভাবধর্ম একটি চরিত্রে আরোপ করার জন্যই প্রশ্নটি দেখা দিয়েছে। তবে বক্তব্যের সমর্থনে একটি কথা বলা যায়;—বাস্তবতা থেকে আদর্শগত সত্য প্রচারের দিকেই স্বদেশপ্রেমী নাট্যকারের লক্ষ্য ছিল বলেই এ ত্রুটিও সমর্থিত অংশ বলে পরিগণিত হবে। দেশপ্রেমপ্রচার যেখানে মুখ্য, আদর্শ দেশপ্রেমিক সেখানে স্বদেশপ্রীতি জাগানোর জন্য বিশুদ্ধ স্বদেশী-কবিতা আবৃত্তি করতেই পারেন। শুভসিংহের মুখে দীর্ঘ কবিতাটি যোজনা করে নাট্যকার বোধ করি এ ধরণের মনোভাবটিই প্রকাশ করেছেন। স্বপ্নময়ীকে স্বপ্ননায়িকারূপে কল্পনা করেই শুভসিংহ আত্মদহনে দগ্ধ হয়, আবার দেশের স্বার্থে ছলনার পথটিও সে পরিত্যাগ করতে পারে না। সুতরাং এই আদর্শে স্বপ্নময়ীকেও দীক্ষা দেবার সুযোগটুকু হারাতে চায় না শুভসিংহ। এখানে

নায়ক নয় স্বয়ং নাট্যরচয়িতাই আপন যুক্তি ও কবিত্ব এ চরিত্রটিতে আরোপ করেছেন। দীর্ঘ কবিতায় শুভসিংহ স্বদেশমহিমা কীর্তন করেছে,—

কে তোমারে বক্ষে করে করেছে পোষণ ?
কে তোরে অচল স্নেহে বক্ষে ধরে আছে ?
* * * *
কে তোরে পোহালে নিশি, প্রভাত হইলে
পাখীদের মিষ্টতম গান শুনাইয়া
শুভ্রতম শান্ততম ঊষার আলোকে
ধীরে ধীরে ঘুম তোর দেন ভাঙ্গাইয়া ?

নাট্যকারের কবিত্বই স্বদেশী কবিতাটিকে এমন ভাবরস সমৃদ্ধ করেছে। শুভসিংহ নায়িকা স্বপ্নময়ীর সামনে আপন ভাবাবেগটি কাব্যাকারে প্রকাশ করে যথার্থ রোম্যাণ্টিক পরিবেশ সৃজনে সক্ষম হয়েছে। দেবতার ছদ্মবেশে মুগ্ধা নায়িকার সামনে এই কবিত্বপূর্ণ সংলাপ আবৃত্তির যথেষ্ট যুক্তি আছে। শুভসিংহ দেশের বর্তমান অবস্থাটিও বর্ণনা করতে ভোলেনি,—

সেই মাতা স্নেহময়ী জননী তোদের
দেখ দেখ আজি তাঁর একি দুর্দশা,
* * * *
বিদেশী মোঘল যত দলে দলে আসি
দেখ চেয়ে দেখ তারে করে অপমান
দেখ তোর মায়েরে করিছে পদাঘাত।

স্বপ্নময়ীকে দেশের স্বার্থে আত্মনিয়োগের নির্দেশ দেয় শুভসিংহ। দেবতার ছদ্মবেশে এই ভাবাবেগপূর্ণ উচ্ছ্বসিত সংলাপ বেশ কার্যকরীও হয়েছে। স্বপ্নময়ীকে পথ চিনিয়ে দেন শুভসিংহ,—

সঁপিবি দেশের কার্যে কুমারী জীবন
অমর জীবন পাবি তার বিনিময়ে
* * * *
ভাই বল বন্ধু বল, পুত্র পিতাবল
মাতৃভূমি চেয়ে কেহ নহে আপনার।

উনবিংশ শতাব্দীর পটভূমিকায় নাট্যকারের এ বক্তব্যের যে একটি সর্বজনীন আবেদন ছিল সে কথা অকপটে মানতেই হয়। দেশের সঙ্গে মানুষের নিবিড় যোগাযোগটি যে কত গভীর, নাট্যকার তাও বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। সে যুগের

উত্তেজনায় এ কবিতাংশটি কতখানি প্রেরণা দান করেছিল বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। পদদলিত দেশের চিত্রটি নিখুঁত করে পরিবেশন করাই যেখানে নাট্যকারের একমাত্র উদ্দেশ্য,—দেশমহিমাপ্রচার সেখানে তীব্ররূপ নেবে এটাই স্বাভাবিক। তাই শুভসিংহ পিতা-পুত্র-ভাই-বন্ধুর চেয়ে প্রিয় বলে বর্ণনা করেন মাতৃভূমিকে। এই উচ্ছ্বসিত উপলব্ধি শুধু স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী একটি পরাধীন জাতির পক্ষেই সম্ভব,—আর এই আবেগান্বিত উচ্ছ্বাস সে যুগের নাটকেরই রসোত্তীর্ণ সংলাপ বলে পরিগণিত হতে পারে।

শুভসিংহ স্বপ্নময়ীকে দেশমহিমা সম্বন্ধে সচেতন করেছে এবং ভবিষ্যতে দেশের স্বার্থেই পিতাকে পরিত্যাগের যুক্তি দেখিয়েছে। অবশ্য স্বপ্নময়ীর তন্ময়তা ও মুগ্ধতার অবসরেই নাট্যকার শুভসিংহকে এ সুযোগ দান করেছেন। দেবতার ছদ্মবেশে এই পরামর্শ দিয়েছিল শুভসিংহ,—

সে শত্রু তোমার পিতা, যবনে যেমন
আপনার প্রভুবলে করিছে বরণ।
মায়ের কোমল হস্তে শৃঙ্খল আঁটিতে
যে জন মোঘল সাথে করিয়াছে যোগ
মায়েরে যে বিদেশীরা করে অপমান,
তাদের যে হাসিমুখে করে সমাদর,
সেজন তোমার পিতা শত্রু সে তোমার।

এই অকপট সত্যভাষণের সুযোগ ছদ্মবেশী শুভসিংহ পেয়েছিল, নাট্যকার স্বাভাবিক চরিত্রের মুখে এই সংলাপ দেননি। দেশপ্রেমিক পুত্র দেশদ্রোহী পিতাকে পরিত্যাগ করেছে এ ঘটনারও অজস্র নজির আছে। প্রিয়জন দেশদ্রোহী হলে তাকেও ত্যাগ করার অমোঘ নির্দেশ আসবে একদিন, নাট্যকার যেন তা বুঝেছিলেন। স্বপ্নময়ীকে শুভসিংহ ভাবীযুগের আদর্শে দীক্ষাদান করতে চেয়েছে মাত্র। নাট্যকার অন্য নাটকেও দেশপ্রেম সম্পর্কে কতকগুলো আদর্শ প্রচারের চেষ্টা করেছেন। প্রথম নাটকেই স্ত্রী পুরুষের সম্মিলিত সংগ্রামের প্রয়োজনীয়তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। এ নাটকেও স্ত্রী ভূমিকাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। বর্ধমানরাজার পুত্রটিকে নির্বাচন না করে কন্যাটিকেই দেশাদর্শে দীক্ষা দেবার নাটকীয় পরিস্থিতি সৃজন করেছেন নাট্যকার। নাট্যকার স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে দেশসাধনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। এই আদর্শটিকেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলার চেষ্টাটিই নাটকে দেখা যাচ্ছে।

সঙ্গীতের সাহায্যে দেশপ্রেম উদ্বোধনের জন্য জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অর্থপূর্ণ স্বদেশীগানও

যোজনা করেছিলেন। এ সঙ্গীতধ্বনি সে যুগের নরনারীর প্রাণে ধ্বনিত হোক, এই ছিল স্বদেশপ্রাণ নাট্যকারের গোপন বাসনা। সঙ্গীতটির মর্মকথা জনচিত্তে শক্তিসঞ্চার করে যেন,—

তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোমারি দুঃখে কাঁদাব ;
তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে ত্যজিব।
সকল দুঃখ সহিব সুখে তোমারি মুখ চাহিয়ে।

এই ভাবেই স্বপ্নময়ীর অন্তরে দেশপ্রেমাকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুললেন শুভসিংহ। যদিও সপ্তদশ শতাব্দীর তালুকদার শুভসিংহের জীবনকথাই এ নাটকে পরিবেশন করা হয়েছে তবু তাতে সপ্তদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক চেতনার প্রতিফলন কতটুকুই বা পড়েছে।—কিন্তু উনবিংশ শতকীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারারই পূর্ণ প্রতিফলন আমরা এ নাটকে পাই। সঙ্গীতের মধ্যে যে সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে, আত্মজাগরণের যে আশার বাণী শোনানো হচ্ছে, বস্তুতপক্ষে সে বাণী নাট্যকারের সমসাময়িক দেশচেতনার। নাট্যকার সেযুগের দেশচেতনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন এভাবে,—

বন্ধন শৃঙ্খলে করিতে সম্মান
ভারত জাগিয়া উঠেছে আজি ?
* * *
হারে হতভাগ্য ভারত ভূমি
কণ্ঠে এই ঘোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলঙ্কার
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে ?

ভারতের নবজাগরণলগ্নে নাট্যকার স্বকীয় উপলব্ধিকেই নাটকে প্রকাশ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতেই ভারতের নবজাগরণপর্ব শুরু—এর আগেও বন্ধনকে শৃঙ্খলরূপে ও কলঙ্করূপে অনুভব করার কোন সচেতনতাই আমাদের ছিল না। কিন্তু নাট্যকার নবজাগ্রত ভারতবাসীর আকুলতাটিই যেন প্রত্যক্ষ করেছিলেন। দেশের জন্য নির্ভীক-ভাবে আত্মদানের মরণপণ করতেও শুভসিংহ ভয় পান না। সৈন্যদের উৎসাহদান করেন শুভসিংহ,—

আসুক সহস্র বাধা,
মাতৃ মুখ উজ্জ্বলিবি
কি ভয় মরণে।

নিছক দেশপ্রেম প্রচার ছাড়া এসব অংশের নাটকীয় তাৎপর্যই বা কোথায় ? বর্দ্ধমান রাজান্তঃপুরের জটিল অংশগুলির কল্পনা করে যথাসাধ্য বাস্তবরস পরিবেশনের

চেষ্টা করেছেন নাট্যকার,—কিন্তু শুভসিংহের অনলস দেশসাধনার প্রসঙ্গটিই সব বক্তব্য ছাপিয়ে উঠেছে। শোভাসিংহের ছলনা চাতুরী, বর্দ্ধমান কোষাগার লুণ্ঠনের বিচিত্র পরিকল্পনার মাঝখানেও স্বদেশানুভূতির তীব্রতাটুকু একটি বিশেষ রসসঞ্চার করে। শোভাসিংহের সব অপরাধই যেন ক্ষমার্হ হয়ে ওঠে। বর্দ্ধমান রাজপরিবারের ভাগ্যপরিবর্তনের মূলে এই চক্রান্তকারী ব্যক্তিটির সমস্ত পাপ দেশপ্রেমের অগ্নিতে শুদ্ধ হয়ে যায়। এদিক থেকে নাট্যকারের পরিকল্পনাকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। দেশপ্রেমের ধারণাটি এমন মহিমময় রূপে ব্যাখ্যা করেছেন বলেই দেশপ্রেমিকের অপরাধও দর্শকের কাছে প্রশংসনীয় গুণ বলে মনে হয়। শুভসিংহের আদর্শে চালিত দর্শক শুধু মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেশপ্রেমিকের উজ্জ্বলমূর্তির ধ্যান করে। শেষ মুহূর্তে শুভসিংহ যখন আত্মানুশোচনায় মৃত্যু বরণ করেছে, সেও যেন তার মহত্ত্বকেই নতুন করে চিনিয়ে দিয়। ছলনা করেই শুভসিংহ স্বপ্নময়ীর সর্বনাশ করেছে, এই অনুশোচনাই তার মৃত্যুর কারণ,—কিন্তু মৃত্যুমুহূর্তেও নাট্যকার শুভসিংহের দেশপ্রাণতার প্রসঙ্গটিই তুলে ধরেছেন।

"আমা হতে জননীর কোন কাজ হল না, আমার জীবনের সংকল্প বিফল হল—আমার সহচরেরাও আমার শত্রু হয়ে দাঁড়াল···এ অপদার্থ জীবনে আর কি ফল ?

[পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

নাটকীয় ঘটনার জটিলতা ভেদ করেও স্বদেশপ্রেমিক শুভসিংহের জীবন কথাই এ নাটকের মুখ্য কথা হয়ে উঠেছে। নাট্যকার শুভসিংহের মহত্ত্ব ও দেশপ্রেমকে এক করে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন বলেই নাটকের শেষাংশে অবাস্তব ঘটনা সমাবেশ করেছেন। ঘটনা যত অচিন্তিত বা অসম্ভব হোক না কেন শুভসিংহের মাহাত্ম্য অক্ষুণ্ণ থাকলেই নাট্যকার নিশ্চিন্ত হন। দেশপ্রেমিকের ব্যক্তিজীবন ও রাষ্ট্রজীবনের মহত্ত্ব প্রচারের বাসনাটিই কার্যকরী হয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইতিহাসের ঘটনাটি স্মরণ করলে নাট্যকারের উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হবে।

ইতিহাসে শোভাসিংহের বিদ্রোহ সংবাদ আছে,—রাজ্যবিস্তারের সংকল্প কাহিনী আছে, রহিম খানের সঙ্গে চক্রান্তের সংবাদ আছে, বর্দ্ধমানরাজাকে বিতাড়নের প্রসঙ্গ আছে এবং স্বাভাবিকভাবে তাঁর মৃত্যু প্রসঙ্গটিও বর্ণিত হয়েছে। ইতিহাসের কিংবদন্তীতে শোভাসিংহের আদর্শের প্রসঙ্গটি গৌণ, তাঁর দেশপ্রেমিকতা [যদি তা থেকে থাকেও] সেখানে উহ্য থাকারই কথা কিন্তু ঘটনা ও তথ্যগত সত্য অবিকৃত ভাবেই ইতিহাসে মিলছে। এ বিষয়ে 'District Gazetteer'-এ যে সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে।

Amongst the captives taken in Burdwan was the Raj Kumari

Satyabati, the daughter of the Raja whom Subha Singh kept in confinement until an opportunity should offer of sacrificing her to his lust.[৩৮]

শোভাসিংহ সাহসিকা বর্দ্ধমান রাজকুমারীর হাতেই মৃত্যুবরণ করেছিলেন—এই চমকপ্রদ ইতিহাস বজায় রাখলে শোভাসিংহের চরিত্র মাহাত্ম্য ক্ষুণ্ণ হলেও বাস্তবতা ও নাটকীয়তা একই সঙ্গে বজায় থাকত। সম্ভবতঃ নাট্যকার দেশপ্রেমিক শুভসিংহের চরিত্রটি কলঙ্কমুক্ত রাখার উদ্দেশ্যেই বহু অবাস্তব ঘটনার সমাবেশ করেও শেষ পর্যন্ত তার চারিত্রিক মাহাত্ম্য প্রচারে সক্ষম হয়েছিলেন। শুভসিংহের আত্মদানের মহৎ দৃষ্টান্তস্থাপন ও আদর্শপ্রচারের চেষ্টা এ নাটকের শেষাংশে এমন তীব্র হয়ে উঠেছে যা অন্য নাটকে দেখা যায় না। দেশপ্রেমিক নায়কের আত্মদানের অনিবার্য কারণগুলি না দেখিয়েও নাট্যকার শুভসিংহের মৃত্যুদৃশ্যটি যোজনা করেছেন। বর্দ্ধমান রাজার শোচনীয় মৃত্যুতে স্বপ্নময়ীর বিচলিত হওয়ার ঘটনাটি সহ্য করতে পারেনি বলেই শুভসিংহ প্রায়শ্চিত্ত করেছে মৃত্যুবরণ করে। বিবেকদংশনের জ্বালা,—ছলনার গ্লানিতে শুভসিংহ ভেঙ্গে পড়েছিল—সুতরাং মানবিক দিক থেকে আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগাটা স্বাভাবিক। নাট্যকার হয়ত এভাবেই সমাধানের পথ খুঁজেছিলেন। কিন্তু কিছু প্রশ্ন থেকেই যায়। দেশোদ্ধারের স্বপ্ন যাঁকে দুর্বার করে তুলেছিল—নির্ভীকভাবে আদর্শরক্ষা করেও যিনি একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের পরিচালক ছিলেন, তাঁর পক্ষে রাজকুমারীর ব্যথায় আত্মহননের ইচ্ছা জাগাটা কতদূর বাস্তব, সেটাই বিচার্য। নাট্যকার শুভসিংহকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন,—সেই দিক থেকে বিচার করলেও তার এই আচরণকে সমর্থনযোগ্য বলে মনে হয় না। স্বপ্নময়ীর প্রতি আকর্ষণ তীব্র হলে আত্মহত্যার ইচ্ছা জাগার ব্যাপারটি আরও জটিল হয়ে পড়ে। অথচ এমন নির্ভীক স্বদেশপ্রাণ বীর শুধু কৃতকর্মের অনুশোচনায় জীবন ত্যাগ করলেন,—দেশোদ্ধারের তীব্রসংকল্প শুধু একটা অর্থহীন পরিকল্পনাহীন পাগলামীতে পরিণত হল—একথা ভাবাই যায় না। স্বদেশপ্রেমিক চরিত্রে মানবিক গুণের প্রাচুর্য ঘটিয়ে মানবিকতার মুখরক্ষা করতে গিয়েই এ বিপদ ঘটেছে। এবং শুভসিংহের অদূরদর্শিতা ও ভাবালুতার রন্ধ্রপথেই যে এই মৃত্যুচিন্তা প্রাধান্য পেয়েছে। এতে অসুবিধা হচ্ছে এই যে, দেশপ্রেমকেই শেষ পর্যন্ত ভাবালুতা বলে মনে হয়। দেশোদ্ধারের কঠিন সংকল্প নিছক কল্পনাবিলাসে পর্যবসিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের সীতারাম উপন্যাসেও ইতিহাসের ছায়ায় মানবচরিত্রের রহস্যোদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে উপন্যাসিক ঠিক এ ধরণের একটি

৩৮. J. C. K. Peterson, Bengal District Gazetteer, Burdwan, 1910.

ভাবাবেগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিলেন। সীতারামের ব্যর্থতার মূলে ছিল তাঁর অদম্য হৃদয়াবেগ ও প্রেমে ব্যর্থতাবোধ। শুভসিংহের আত্মহত্যার মূলে সে ধরণের ইঙ্গিতটুকু স্পষ্ট হলে দর্শকরা যুক্তি খুঁজে পেতেন।

'স্বপ্নময়ী নাটকের' সর্বাপেক্ষা অবাস্তব চরিত্রটিই স্বপ্নময়ীর। নাটকের শুরু থেকেই এই চরিত্রটির আচরণ এতই অস্বাভাবিক যে গুরুত্বপূর্ণ কোনো মুহূর্তে এই চরিত্রটির আবির্ভাবের হেতু খুঁজে পাওয়া যায় না। অথচ নায়ক শুভসিংহ এই অপরিণতমনা—ছায়াচ্ছন্না নারীকে স্বদেশপ্রেমে দীক্ষা দিয়েছিলেন। ছদ্মবেশী যুবককে স্বপ্নময়ী দেবতা বলেই বিশ্বাস করে এসেছে,—শুভসিংহ সেই সুযোগেই স্বপ্নময়ীকে দেশচেতনায় দীক্ষিত করলেন। কিন্তু নাটকের কোনো ঘটনা ও জটিলতায় স্বপ্নময়ী অংশগ্রহণ করেনি,—এ চরিত্র সম্পর্কে নাট্যকারের সঠিক বক্তব্য যে কী ছিল নাটকে তা খুঁজে পাওয়া যায়নি।

স্বপ্নময়ী চরিত্রের ঐতিহাসিক ভিত্তি নাট্যকার গ্রহণ করেননি। কিন্তু ইতিহাসে বর্দ্ধমান রাজকন্যার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও নির্ভীকতার সংবাদটি পরিবেশিত হয়েছে। ইতিহাসে যে ঘটনা মিলছে,—

"At Burdwan in making an attempt upon the honour of Raja Krishna Ram's daughter, Shova Singh was stabbed to death by that heroic girl. who next plunged the dagger into her own heart". [History of Bengal Vol—II P—394]

এই ঘটনাকেই নাটকীয়রূপে পরিবেশনের যথেষ্ট সুযোগ ছিল ; নাট্যকারের আদর্শ ইতিহাসের সত্যকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেনি বলেই এ চরিত্রটির ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বও এ নাটকে অবলুপ্ত। শুভসিংহ চরিত্রের পরিবর্তনটি আমূল নয় বলে শুভসিংহের দেশভাবনা একটি উজ্জ্বল আদর্শ সঞ্চার করেছে এ নাটকে, কিন্তু স্বপ্নময়ী প্রায় ছায়াময়ী হয়ে উঠেছে। স্বদেশপ্রেমের আদর্শ তার চরিত্রের গভীরে প্রতিফলিত হয়নি বলেই ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে চরিত্রটি।

এ নাটকেই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ দেশোদ্ধারের পরিকল্পনায় সমবেত চেষ্টার প্রয়োজনীয়তাটি উল্লেখ করেছেন। চিতুয়াবর্দার তালুকদারের পক্ষে একক চেষ্টায় কিছু করাই সম্ভব ছিল না, এই কারণেই পাঠান সর্দার রহিম খানের সাহায্য নিতে হয়েছে তাকে। রহিম খানও মোঘলবিদ্বেষী, উদ্দেশ্যের অভিন্নতাই এই দুই পৃথক শক্তিকে একত্রিত করেছিল। কিন্তু রহিম খানের ধূর্ততা নাট্যকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। এমন অবস্থায় স্বীয় স্বার্থসিদ্ধির চিন্তাটিও যে গোপন থাকে না, – নাট্যকার সে বিষয়ে সচেতন করেছেন। তবে শুভসিংহের দেশোদ্ধারের সহায়তায় রহিম খান ও জোহনা

যুক্তভাবে সাহায্য করেছে। অন্যদিকে বিশ্বস্ত অনুচর সুরজমল নানা পরামর্শ দিয়ে শুভসিংহের দেশোদ্ধার পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদানের চেষ্টা করেছে। অন্যান্য নাটকে যে সমস্যা শুধু একটি দেশের বা গোষ্ঠীর,—'স্বপ্নময়ী নাটকে' সেটি একাধিক শক্তিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এতে হিন্দু তালুকদার ও পাঠান সর্দার সম্মিলিতভাবে উদ্দেশ্যসাধনের ব্রত নিয়েছে। এদিক থেকে নাট্যকার যে ভবিষ্যৎ দেশোদ্ধার প্রচেষ্টায় আভাস দিয়েছিলেন—তাতে সন্দেহ কোথায়? দেশপ্রেম সেযুগে শুধু ভাবাদর্শমাত্র ছিল না—তার বাস্তবভিত্তিও স্থাপনের চেষ্টা চলছে দেশব্যাপী, এমন মুহূর্তে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই আদর্শ প্রচারেরই চেষ্টা করে গেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ স্বদেশচেতনাকে নাটকের প্রাণমূলে সঞ্চারিত করে বাংলা নাট্য-সাহিত্যে একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তন করলেন—নাট্যসাহিত্যের এই পর্বের উল্লেখযোগ্য নাট্যকারও তিনি। সমসাময়িক যুগচেতনার প্রভাবে এমন ভাবে প্রভাবিত হতে পেরেছিলেন বলেই তিনি সে যুগীয় বক্তব্যকে ইতিহাসের আধারে স্থাপন করে নাট্যরস সৃষ্টির অনলস সাধনা করেছিলেন। অথচ মৌলিক নাটক রচনার সত্যিকারের ক্ষমতা যে তাঁর ছিল,—ঐতিহাসাশ্রিত অথচ কাল্পনিক কাহিনীসর্বস্ব নাটকগুলিই তার প্রমাণ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কাহিনীর জটিলতা ও নাটকের অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃজন মুহূর্তে তাঁর উদ্দেশ্য বিস্মৃত হননি,—দেশপ্রেমের বক্তব্য সেখানেও স্থান পেয়েছে। তার মৌলিক নাটক ছাড়া অন্যত্র এ চেষ্টা দেখি না। অগণিত নাটক অনুবাদ করার আশ্চর্য ধৈর্য তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করা যায়,—যা মৌলিক সৃষ্টির পর্যায়ে পড়বে না কোনদিনই। কিন্তু যে চারটি নাটকে নাট্যকারের প্রতিভার সাক্ষাৎ পাই জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেখানে আদর্শ প্রচারে উন্মুখ। এই স্বাদেশিকতামন্ত্র তাঁর জীবনসাধনার বাণী। এই পবিত্র উপলব্ধি প্রচারে কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়। দেশসাধনার স্বপ্ন তাঁকে আচ্ছন্ন করেনি, আলোকিত করেছিল তাই দেশপ্রেমের বাণী আমাদের কানে পৌঁছে দেবার আগ্রহ তাঁকে সৃজনধর্মী নাটক রচনার প্রেরণা দিয়েছিল।

তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় এই চারটি নাটকে ধরা পড়েছিল। কিন্তু নাটকগুলির কাহিনী নির্বাচন, চরিত্র কল্পনা ও নাটকীয়তা সৃজনের আলোচনা থেকে এ সত্য স্পষ্ট হয় যে নাট্যকার সমসাময়িক দেশোপলব্ধির বাণী প্রচারের চেষ্টা করলেও সে যুগের সামাজিক ঘটনা ও পরিবেশ থেকে কাহিনী ও চরিত্র নির্বাচন করেন নি। রোম্যান্টিক কল্পনার আত্যন্তিকতা ও অতীত ইতিহাসের আবছা আলোয় স্বপ্ন রচনার চেষ্টাটি তাঁর সবকটি নাটকেই ধরা পড়েছে। প্রহসন রচনার ক্ষেত্রে তিনি সমকালীন সমাজচিত্র অবলম্বন করেছেন—অথচ স্বদেশপ্রেমসর্বস্ব নাটকগুলির পরিবেশ নির্বাচনে

ইতিহাসের নিশ্চিন্ত আশ্রয় কামনা করেছেন বার বার। সম্ভবতঃ আদর্শের গাম্ভীর্য ও শুদ্ধতা বজায় রাখারও একটা অভ্যস্ত পথ বলেই ধরে নিয়েছিলেন তিনি। ইতিপূর্বে যে দু'একটি নাটকে দেশপ্রেমকথা স্থান পেয়েছে সেখানেও সমসাময়িক পরিবেশ থেকে পলায়ন করার একটা সহজ প্রবণতা নাট্যকারগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায়। দেশপ্রেমের অনুভূতিকে একটা বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তির ওপর স্থাপন করতে পারলেই এঁরা যেন বেশী আশ্বস্ত হন। অথচ নিতান্ত বাস্তবে একটি নিখুঁত আদর্শবাদী চরিত্র কল্পনা করার নানা অসুবিধা রয়েছে। দেশপ্রেমের সুগভীর ব্যঞ্জনা অতি বাস্তবের সত্যতায় যাচাই করতে গেলে অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়বে সহজেই। তাই এঁরা সাময়িক উত্তেজনায় কম্পিত হৃদয়াবেগ অতীতের আধারে স্থাপন করতে চেয়েছেন। তার প্রথম মৌলিক নাটকের ঐলবিলা চরিত্রটির কথা স্মরণ করা যায় এ ব্যাপারে। ইতিহাসে এ চরিত্র কোথায়? শক্তিময়ী, ব্যক্তিত্বময়ী স্বাধীনচেতা এ নারীচরিত্রটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের স্বপ্ননায়িকা। নাট্যকারের কল্পনায় এই নায়িকার আবির্ভাব যেমন অভিনব তেমনি অপরূপ। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নারী ও পুরুষের সম্মিলিত দেশসাধনার স্বপ্ন দেখতেন, 'স্বপ্নময়ী নাটকেও' এ বক্তব্য স্থান পেয়েছে। ভবিষ্যতের স্বাধীনতা আন্দোলনের স্বপ্ন দেখেছিলেন নাট্যকার এঁদের মাধ্যমে। কিন্তু সে যুগের সমাজে এমন কাহিনী তিনি কি খুঁজে পাননি যা নিয়ে একটি দেশাত্ম-বোধক নাটক লেখা সম্ভব? এ প্রসঙ্গটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ইতিহাসপ্রীতির যুক্তি দিয়েও বোধকরি খণ্ডন করা যায় না। দেশপ্রেম সেযুগীয় চিন্তাধারায় স্থান পেয়েছে বটে কিন্তু আমাদের সমাজে তেমন কোন ঘটনা বা আন্দোলন গড়ে ওঠেনি বলেই নাট্যকারের দ্বিধা ঘোচেনি। এ ধরণের নাটকের অভিনয়েও অভাবিত সাফল্যও দেখা গেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নাটকের প্রভাব অন্যান্য নাট্যকারদের কিভাবে চালিত করেছে তার অজস্র উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। ইতিহাসাশ্রিত ঘটনা অবলম্বনে দেশপ্রেমপ্রচার সেযুগের নাট্যকারদের ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছিল বললেও ভুল বলা হয় না। শুধু একটি বিদেশীশক্তির আক্রমণ ও একটি স্বদেশী চরিত্র থাকলেই এ ধরণের নাটক রচনা করা যেত অনায়াসে। নাটকের বক্তব্য ও ইতিহাসের সিদ্ধান্ত যতই বিরোধমূলক হোক না কেন, দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস প্রকাশের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র রচনায় বাধা ছিল না। এ প্রসঙ্গে বিপিনবিহারী পালের 'বঙ্গের পুনরুদ্ধার' [১৮৭৪] নাটকটির নাম করা যেতে পারে। গিয়াসুদ্দীনের সঙ্গে রাজা গণেশের সংঘর্ষ কাহিনীভিত্তিক এ নাটকে গতানুগতিকতা ছাড়া আর কীই বা আশা করা যায়? কিংবা নবীনচন্দ্র বিদ্যারত্নের "ভারতের সুখশশী যবন কবলে" [১৮৭৫] নাটকের উল্লেখ করা যায়। এই নাটকদ্বয়ের রচনাকাল 'পুরুবিক্রম নাটকের' রচনাকালের সমসাময়িক। লক্ষ্যণীয়

এই যে, স্বদেশপ্রেমের আবেগ সেযুগের নাট্যকারদের কিভাবে চালিত করেছিল তা এই রচনা-কৌশল থেকে সহজেই অনুমেয়। এ ধরণের অজস্র নাটক যেমন লেখা হোত, তেমনি তার সমালোচনাও কম হয়নি।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমসাময়িক নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ দাস স্বদেশপ্রেমের নাটকে একটু নতুন রসসঞ্চার করলেন। নাটমঞ্চের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত নাট্যকার উপেন্দ্রনাথের নাট্যসাহিত্যে দান হয়ত তেমন কিছুই নয়,—কিন্তু সেযুগের রঙ্গমঞ্চের কর্ণধাররূপে উপেন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট পরিচয় রয়েছে। ইতিহাসাশ্রিত নাটকের স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গ বর্জন করেই তিনি মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের নাটকে যে অভাব বোধ আমাদের মনে প্রশ্ন জাগিয়েছিল তাঁর সমসাময়িক নাট্যকারের নাটকেই সমাজভিত্তিক স্বদেশপ্রেমাত্মক কাহিনীর সাক্ষাৎ মিলছে—এটাই সান্ত্বনার কথা। উপেন্দ্রনাথের এই স্বকীয়তাই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তার প্রথম নাটকের রচনাকাল 'পুরুবিক্রমের' সমসাময়িক হলেও 'পুরুবিক্রমের' অভিনয় হয়েছিল আগেই। "শরৎ সরোজিনী"-তে উপেন্দ্রনাথ দাস আত্মগোপন না করে পারেননি। দুর্গাদাস দাস ছদ্মনামে আত্মগোপনের প্রয়াসটুকু নাট্যকারের দূরদর্শিতারই পরিচায়ক। নাট্যশালার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত থেকেই নাট্যকার সে যুগের আবহাওয়াটি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। দেশপ্রেমের প্রকাশ্য বক্তব্য যে কোন মুহূর্তে যে বিপদ ডেকে আনতে পারে এ ধারণা তাঁর ছিল। সেযুগীয় সমাজে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি কিভাবে চলছিল তারই অস্পষ্ট আভাস ও কাল্পনিক বিবরণ নাটকটিতে স্থান পেয়েছে। দেশচেতনা শিক্ষিত বাঙ্গালীর শিরার ধমনীতে প্রবাহিত হোক—এই স্বপ্ন ও কল্পনা অতিরঞ্জিত হলেও সে যুগের সমাজে এর একটা মূল্য ছিল। তাছাড়া শুধু দেশোদ্ধারের স্বপ্ন দেখলেই যথেষ্ট হবে না, দেশোদ্ধারের সম্ভাব্য পন্থা আবিষ্কার করতে হবে, এই ছিল নাট্যকারের অভিপ্রেত। শিক্ষিত বাঙ্গালীর দেশ-সাধনা যে নাটকের বিষয়বস্তু হতে পারে উপেন্দ্রনাথের নাটকদুটি না পেলে এ সম্পর্কে একটা সংশয় থেকে যেতো। কারণ সাময়িক সমাজকে নাটকে স্থান দেওয়ার প্রথাটি সেযুগে প্রায় অপ্রচলিত রীতিতে পর্যবসিত হতে বসেছিল। 'কুলীন কুল-সর্বস্ব' থেকে 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী'তে সমাজচিত্রণের যে প্রবণতা ধরা পড়েছিল, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখের অতীতচারিতার আতিশয্যে তা প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল। কিন্তু অভিনয়ের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, সামাজিক নাটকের প্রতি প্রবল অনুরাগ সে যুগেও ছিল। দীনবন্ধুর সামাজিক নাটকগুলির আবেদন কিংবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রহসনের আবেদন যে কত বেশী ছিল তা বোঝা যায় এদের অভিনয়ের আধিক্য থেকে। তুলনায় ঐতিহাসিক ও রোম্যান্টিক

অর্ধকাল্পনিক নাটকের চাহিদা ছিল কম। উপেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সমসাময়িক কালের নাট্যকার হয়েও, জ্যোতিরিন্দ্রনাথের দেশপ্রেমাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েও বিষয়বস্তু অনুসন্ধান করেছেন সে যুগের সামাজিক পটভূমিকায়। এ প্রসঙ্গে শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন,—

"খুন-জখমের বাড়াবাড়ি এবং পিস্তল বন্দুক লাঠির হুড়াহুড়ি সমসাময়িক সমাজ-চিত্র নাট্যে এই প্রথম দেখা গেল। দেশপ্রেমের উদ্দীপনা তো আছেই, সেই সঙ্গে দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক চেষ্টার ইঙ্গিতও রহিয়াছে।"৩৯

"শরৎ সরোজিনী" ও "সুরেন্দ্র বিনোদিনী"—এই দুটি নাটক খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই প্রকাশিত ও অভিনীত হয়েছিল। ১৮৭৫ সালের জানুয়ারী থেকে আগস্টের মধ্যে "শরৎ সরোজিনীর" ৬টি অভিনয়ের সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই সঙ্গে 'পুরুবিক্রম নাটকের' মাত্র একবার অভিনয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। এর কারণ অবশ্যই আছে। খুব বেশীবার অভিনীত না হলেও 'পুরুবিক্রমের' সাহিত্য মূল্য স্বীকৃত হয়েছিল সে যুগে এবং 'পুরুবিক্রমের' প্রভাব উপেন্দ্রনাথ দাসের উপরেও পড়েছিল গভীর ভাবে।

নাট্যাভিনয়ের মানদণ্ডে নাটকবিচারের সাধারণরীতি প্রচলিত হলেও সার্থকতা কেবলমাত্র অভিনয়ের উপরই নির্ভরশীল নয়। উপেন্দ্রনাথের নাটকের অজস্র অভিনয় হলেও নাট্যকার হিসেবে তিনি সাহিত্যইতিহাসে স্থান পেয়েছেন কোনো মতে। আপাততঃ সে বিচারও নিরর্থক। আমরা শুধু দেশপ্রেম কথা উপেন্দ্রনাথের নাটকে যে ভাবে প্রতিফলিত হয়েছিল তার স্বরূপ নির্ধারণে প্রয়াসী। "শরৎ-সরোজিনীর" প্রথম অভিনয়ের বিবরণেই এই নাটকের জনপ্রিয়তা ঘোষিত হয়েছে। সমকালীন চেতনার প্রতিফলনের সুন্দর প্রতিক্রিয়া এটি। দেশচেতন দর্শকগোষ্ঠী এ নাটকের বিচার করেছে সম্পূর্ণ অন্যনিয়মে।

১৮৭৫ সালের ২রা জানুয়ারী প্রথম অভিনীত হয়েছিল নাটকটি। অমৃতবাজার পত্রিকায়, ১৪ই তারিখে দ্বিতীয় দিনের অভিনয়ের বিবরণে সে যুগের দর্শকের চাহিদার তীব্রতাটি বোঝা যায়।

"শরৎ-সরোজিনী' নাটকের অভিনয় দেখিবার নিমিত্ত নগরবাসীদের এইরূপ কৌতূহল ও ব্যগ্রতা জন্মিয়াছিল, যে শুনিতে পাওয়া যায় নাকি স্থানাভাব প্রযুক্ত চারি পাঁচশত লোককে ফিরিয়া যাইতে হইয়াছিল।"

সে যুগের দর্শকের এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই জনগণের দেশচেতনার একটা সাধারণ

৩৯. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড), বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬২, পৃঃ ২৬৯

রূপ আবিষ্কার করা যায়। অবশ্য "শরৎ সরোজিনীর" অন্যতম আকর্ষণ ছিল সেযুগীয় সমাজচিত্রের একটি বোধগম্য রূপ। তরুণ জমিদার শরৎকুমার উচ্চশিক্ষার সঙ্গে দেশসেবার দীক্ষালাভ করেছে। বাংলাদেশের অভিনয়োচ্ছ্বাস লক্ষ্য করে কোন চরিত্র যখন ব্যঙ্গ করে বলে,—

"আপনারা কোথায় অভিনয় দেখতে যাচ্ছেন? অভিনয় মন্দিরের ত আজকাল ছড়াছড়ি।"[৪০] [১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

তরুণ নায়কের আদর্শ সেখানে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। সে যুগের একমাত্র সাধনাই যে দেশসাধনা—একমাত্র লক্ষ্য যে দেশোদ্ধার একথা শরতের মুখেই প্রথম শুনি। আত্মসমালোচনায় অকুণ্ঠ এই আদর্শবাদী নায়ক নিছক প্রেমসর্বস্ব নাটকের অভিনয়ে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে,—

"প্রণয়ে মত্ত হবার কি এই সময়? আমাদের ঘৃণা নাই? গরু গাধার মত দিবারাত্র শাসিত হচ্ছি, তাকি মনে থাকে না? পদে পদে ইংরাজদের বিজাতীয় অহঙ্কার দেখেও কি ধমনীতে বিদ্যুতের মত ধাবিত হয় না? শরীর উত্তপ্ত হয় না? মনে ধিক্কার জন্মায় না? এখন অন্য ইচ্ছা? অন্য অভিলাষ?" এর উত্তরে যখন প্রশ্ন করা হয়,—"তবে বন্দুক ধরুন না কেন?" তখন শরৎ আমাদের প্রকৃত আত্মচিত্র উদ্‌ঘাটন করে,—"আমরা যে হতভাগা কাপুরুষের জাত, দুশ তিনশ বৎসরের মধ্যে যে হবে এমন আশাও মনে স্থান পায় না! কিন্তু যতদিন না ভারতে স্বাধীনতা সূর্য্য পুনরুদয় হয়, যতদিন না অত্যাচারের লোহিতমুণ্ড আমরা পদতলে লুণ্ঠিত দলিত করতে পারি, ততদিন যে প্রণয়, কি অন্য কোন পশুবৃত্তির অনুসরণ করবে সে কৃতঘ্ন-পামর-নরাধম-দেশের কুসন্তান।" [১ম অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

এমন উজ্জ্বল ও সরল আদর্শকে নাট্যকার সেযুগের একটি শিক্ষিত যুবকের মুখে সংলাপরূপে আরোপ করেছিলেন। দেশারাধনার পবিত্র কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়েই নাট্যকারের আবির্ভাব হয়েছে যেন। দেশপ্রেমের কাল্পনিক পটভূমিকাটির রোম্যান্টিক আবরণ সরিয়ে দিয়ে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ধূলিমলিন মাটিতে সময়োচিত ও আকাঙ্ক্ষিত এই বক্তব্যটি পরিবেশনে নাট্যকার কুণ্ঠাহীন নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন। নাটকটির জনপ্রিয়তার কারণ অনুসন্ধানের জন্য খুব দূরে যেতে হয় না,—এই অকপট আদর্শ ততোধিক পরিচিত একটি সেকালীন যুবকের জীবনাদর্শরূপে কল্পনা করে নাট্যকার স্বাভাবিক সত্যকেই তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে শ্রীসুকুমার সেনের সমালোচনাটি যথার্থ,—

৪০. উপেন্দ্রনাথ দাস, শরৎ সরোজিনী নাটক, ১২৮৩।

"যে সময়ে নাটকখানি রচিত হইয়াছিল তখনকার দিনের স্বদেশপ্রিয় শিক্ষিত যুবকদের মনোভাবের পরিচয় ইহাতে স্পষ্টভাবে আছে। এইটুকুই শরৎ সরোজিনীর প্রকৃত মূল্য।"[৪১]

এই প্রকৃতমূল্যই এ নাটকের একমাত্র মূল্য। স্বাধীনতার আদর্শ বাদ দিলে নাটকটিতে কোন নাটকীয় বক্তব্য ছিল না। ঘটনা ও চরিত্রের শিথিল রূপ নাটকটিতে পীড়াদায়ক রূপে দেখা যায়। আদর্শবাদের প্রলেপটুকু সরিয়ে নিলে নাটকটির বক্তব্য অত্যন্ত সাধারণশ্রেণীর মধ্যে গণ্য হোত। শরতের আদর্শবাদ দর্শককে মুগ্ধ করে রাখার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। নাট্যকারের সমস্ত লক্ষ্য ছিল এই চরিত্রটিকে ঘিরে।

আদর্শবাদী শরৎ চরিত্রটিতে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টির চেষ্টামাত্র করেননি নাট্যকার—নির্দ্বন্দ্ব ও দেশপ্রেমস্বপ্নে মগ্ন শরতের একমাত্র চিন্তা দেশকে ঘিরে। দেশের পরাধীনতাশৃঙ্খল মোচন ভিন্ন অন্যচিন্তা তাঁর বিচারে অপরাধ, তাই নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রেমভালবাসার চিন্তাকেও বর্জন করার প্রয়াস করেছে সে। অথচ মাঝে মাঝে সে যে দুর্বলবোধ করে না এমন নয়, ইডেন উদ্যানে ভ্রমণরত শরতের আত্মচিন্তায় নাটকীয়তা নেই কিন্তু আদর্শবাদ আছে পুরোমাত্রায়। দেশের দুরবস্থার চিত্রটি মনে মনে খতিয়ে দেখে সে,—

"ভারতের অবনয় এত গভীর ও সর্বগ্রাসী, যে এই ঘৃণিত পরাধীনতার স্থায়িত্বই এখন আমাদের ভাবী উন্নতির একমাত্র পথ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সমাজের অন্তঃস্থল পর্যন্ত ভীষণ ব্যাধিসমাচ্ছন্ন, এ অবস্থায় ইংরাজরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে যে পরামর্শ দেয়, বা ইচ্ছা প্রকাশ করে, সে শুদ্ধ মূঢ় ও অবিবেচক নয়—দেশের শত্রু।" [১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

শরৎ আদর্শবাদী কিন্তু তার যাত্রাপথে সে একক। এই নিঃসঙ্গতা আদর্শবাদকে দুর্বল করে দেয়। বহুর সঙ্গে মিলিত হলে সে আদর্শ সার্থকতা লাভ করে। খল চরিত্ররূপে যার আবির্ভাব সেই মতিলালও শরৎকে ব্যঙ্গ করেছে এই বলে,

'দু এক বেটা লেখাপড়া শিখে আবার দেশহিতৈষী হতে আরম্ভ করেছেন। আরে আমার দেশহিতৈষী রে! মরে গেলে বুঝি "দেশহিতৈষিতা" সঙ্গে যাবে?'

[১ম অঙ্ক, ৩য় গর্ভাঙ্ক]

তবু অমিত উদ্যমে দেশপ্রেমগর্ব নিয়েই শরৎ তাঁর ব্যক্তিত্ব ও আদর্শ বজায় রাখে। এদেশের বিদেশী শাসকের উদ্ধত শাসনের মূলোৎপাটনের স্বপ্ন দেখে সে।

---

৪১. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬২ পৃঃ ২৭২।

উপেন্দ্রনাথের আদর্শ এই চরিত্রটি ঘিরে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিল। শ্বেতকায়কে প্রভু বলে মেনে নেওয়ার মধ্যে যে চরিত্রগত দুর্বলতা ও কাপুরুষতার লক্ষণ রয়েছে, নাটকে বার বার সে বিষয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যায়কারী ইংরাজকে বিন্দুমাত্র ভয় না পেয়ে দৈহিক শক্তি প্রয়োগের দুঃসাহসিক মনোভাব শরতচরিত্রে লক্ষ্য করা যায়। কাপুরুষ ও শক্তিহীন বাঙ্গালীদের মুখ রক্ষা করার দায়িত্ব যেন সে নিজেই মাথায় তুলে নিয়েছে। এ কাপুরুষতা ও ভীরুতার অপবাদ থেকে মুক্ত না হলে শুধু মানসিক শক্তির বড়াই করা অর্থহীন হবে। তাই এ নাটকের নায়ক অমিতশক্তি নিয়ে ইংরাজ সার্জনকে পদাঘাত করেছে। বীরত্বপূর্ণ সংলাপ তার অকুতোভয় চিত্তের পরিচয় দিয়েছে,—

"সাদা চামড়া দেখে লোকে আর ভয় করে না, জানিসনে নরাধম পশু?"

[৩য় অঙ্ক, ১ম গর্ভাঙ্ক]

বাংলা নাটকে এই বক্তব্যটিও সম্ভবত অভিনব। ইংরেজ বিতাড়নের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ঠিক আগেই ইংরেজবিদ্বেষ প্রতিটি মানুষের মনে উদগ্র হয়ে উঠাই স্বাভাবিক, নাট্যকার সেই কল্পনাটি নাটকে দৃশ্যাকারে স্থাপন করেছেন। ইতিপূর্বে যা ছিল আভাষিত-ব্যঞ্জিত 'শরৎ-সরোজিনীতে' নাট্যকার তা অনাবৃত ভাবে প্রকাশ করেছেন। একই সময়ে হেমচন্দ্র 'ভারত সঙ্গীত' রচনা করে রাজরোষে পড়েছিলেন,—তবু এ ধরণের প্রকাশ্য মনোভাব নাট্যকার গোপন করার বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি, এটাই আশ্চর্য। "ভারত সঙ্গীতের" বক্তব্য আরও অনেক সংযত ও নিরুত্তাপ ছিল। এ নাটকে শরতের ইংরেজ বিদ্বেষ তীব্রতম। পরবর্তীযুগের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্বের খসড়া এ নাটকটিতে যেন সূত্রাকারে ন্যস্ত করা হয়েছে। সেদিক থেকে এ নাটকের প্রচার-মূল্য অপরিসীম। নাটকের ইংরেজবিদ্বেষ সে যুগের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় উত্তেজনা সঞ্চারের পক্ষে যথেষ্ট বলতে হয়।

ঘটনাগত জটিলতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা নানাভাবে দেখা যায় এ নাটকে। স্বভাবদুর্বৃত্ত চরিত্রহীন জমিদারের জঘন্য ষড়যন্ত্র ও নীচতার চিত্র এ নাটকে সাড়ম্বরে দেখানো হয়েছে। কাহিনীগত জটিলতা বৃদ্ধির জন্যই খুন, হত্যা ও জখমের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এতে একধরণের উত্তেজনা সঞ্চারিত হয় নিশ্চয়ই,—অন্যদিকে নায়কের বীরত্ব প্রকাশেরও সুযোগ আসে। নায়কের গৃহ অকস্মাৎ মতিলালের দ্বারা আক্রান্ত হলে শরৎ ও সরোজিনী উভয়ে যথেষ্ট বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। মঞ্চে বন্দুক-পিস্তলের গোলাগুলি নিক্ষেপের দ্বারা সুলভ চমৎকারিত্ব সৃজনের সুযোগ মঞ্চাভিজ্ঞ নাট্যকার যে গ্রহণ করবেন এটাই স্বাভাবিক। শরতের বীরত্ব প্রকাশ পেয়েছে অতর্কিত আক্রমণ মুহূর্তে, সে বলেছে,—"আমি মরি, কিন্তু স্বর্গ সাক্ষী বাঙ্গালী

কাপুরুষ নয়।”—সরোজিনীও পিস্তল চালনা করে সাহসিকা বঙ্গনারীরূপে নিজের অসীম কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে।

মিলনান্তক এই নাটকের সর্বাপেক্ষা কষ্টকল্পিত ও অবাস্তব অংশ শরতের রাজমহল পাহাড় অঞ্চলে গমন ও সেখানকার মুসলমান ডাকাতদলের সঙ্গে পরিচয় লাভ। এদের অবাস্তব-দেশোদ্ধার স্বপ্ন ও মুসলমান রাজত্ব স্থাপনের চেষ্টা হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব করেছে। কিন্তু নাট্যকার শরতের মুখে ভবিষ্যৎ বাণী আরোপ করেছেন,—

“আমাদের দেশের কাপুরুষেরা এখনও স্বাধীনতার জন্য ব্যগ্র হয়নি। আর স্বাধীনতার নামে আপনাদের অধীনতা স্বীকার করতে কেউ সম্মত হবে না।

[পঞ্চম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

নানা অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে এ নাটকের শেষাংশে জটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সরোজিনীর অন্তর্ধানেই এই জটিল অংশের উদ্ভব হয়েছে। শরত শেষ পর্যন্ত আদালতে অভিযুক্ত হয়েছে, গোরাসৈন্য মারার অপরাধে। শরতের বীরত্ব ও অসমসাহসিকতা এখানে আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ষষ্ঠ অঙ্ক, ষষ্ঠ গর্ভাঙ্কযুক্ত ঐ নাটকের নায়ক দেশোদ্ধারের আদর্শ নিয়েই আবির্ভূত হয়েছিলেন কিন্তু নাটকের সমাপ্তি অংশে এসে মহাখেদে আবিষ্কার করি যে, দেশোদ্ধার নয় শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেই তার বীরত্ব অবসিত হয়েছে। তাছাড়া ব্যক্তিগত জীবনের জটিলতার জাল ছিন্ন করতেই বহু মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে সে। আদালতেও শরত আপন আদর্শ বজায় রাখার জন্য পণ করেছে,—

“উৎপীড়িত স্বদেশীয়দিগকে ধবলমূর্তিদের অত্যাচার হতে রক্ষা করবার জন্য যদি আমার জীবন বিসর্জন দিতে হয়, তাও দেব।” যে নাটকে নাটকীয়তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যটাই গৌণ, আদর্শপ্রচারই মুখ্যস্থান অধিকার করেছে—সেখানে নাটকের দোষত্রুটির বিচারটাই মুখ্য বিচার নয়। আদর্শ প্রচারে ব্যগ্র ও নাটক রচনায় অন্যমনস্ক নাট্যকারের নাটক বিচারের মানদণ্ড নিশ্চয়ই ভিন্ন রকম হবে।

এ নাটকের মিলনান্তক অংশটি এমন অসঙ্গতিপূর্ণ যে নাট্যকারের বিমূঢ় মনোভাবের পরিচয় এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। নাটকে নায়ক নায়িকার মিলনান্তক পরিণতি দর্শকেরা চান,—নাট্যকারও অবহেলা করতে পারেন না সে দাবী, সুতরাং এ নাটকের শেষাংশে মিলন দৃশ্য রচিত হয়েছে যথানিয়মে। কিন্তু বিবাহ আসরে পরীরা যে সঙ্গীতটি নিবেদন করেছে তাতে মিলন মাধুর্য উপভোগের বাসনাটি প্রায় লুপ্ত হবার অবস্থা;—কারণ বক্তব্যটি নাটকেরই নয় নাট্যকারের। মিলন মুহূর্তে পরীর যে সঙ্গীতটির অবতারণা করেছে তাতে নিছক উপদেশ ছাড়া অন্য কিছুই নেই।

তোমাদের নিজ দোষে, আছ সবে পরবশ,
হীনবল, অপযশে ত্রিজগতে পূরিল।
নর নারী পরস্পরে, ভারত-উদ্ধার-তরে,
উদ্যোগী হও যত্নভরে, হও না তায় শিথিল ॥

এ উপদেশটি নাট্যকারের সর্বশেষ আবেদন। মিলনমুহূর্তেও ভারতের স্বাধীনতা লাভের শপথটি বিস্মৃত হওয়া চলবে না,—কারণ তারপরেই উদ্ধৃতিটির নীচে নাট্যকার বলেছেন,—

'বজ্রধ্বনিতে ভারতের দৈর্ঘ্যেবিস্তারে কথাটি প্রতিধ্বনিত হউক।'—শরৎ সরোজিনীর মিলনবাসরে সমগ্র দর্শক সমাজের সম্মুখে নাট্যকারের এই বিচিত্র আবেদনে অসঙ্গতি থাকতে পারে কিন্তু অসংলগ্নতা নেই। নায়কের জীবন সাধনার ধারাটি এমনভাবে সমগ্র নাটকে পরিবেশন করা হয়েছে যে দেশপ্রেমের হাওয়াতে দর্শকসমাজ পূর্বেই আন্দোলিত হয়েছেন। খুন-জখম-নিরুদ্দেশ-গুপ্ত সভার জটিলতা ভেদ করেও যে সংবাদটি মুখ্যস্থান অধিকার করেছে, তা হচ্ছে নির্ভেজাল দেশপ্রীতি। সুতরাং বিপদমুক্ত নায়কের মিলনমুহূর্তেও আত্মবিস্মৃত হওয়া চলে না। দেশোদ্ধারের স্বপ্ন সফল করার জন্যেই মিলিত প্রয়াস দরকার, বিবাহবাসরে নাট্যকার সে সংবাদটুকুই পরিবেশন করেছেন,—এতে অসংলগ্নতা নেই। নাটকের শেষ গর্ভাঙ্কের সমালোচনার একটু নমুনা সেযুগীয় সংবাদপত্র থেকে উদ্ধার করা যায়,—

"শেষ গর্ভাঙ্কের অভিনয় এত উত্তম হইয়াছিল, যে দর্শকমণ্ডলীর অধিকাংশই অশ্রুবিসর্জন করিয়াছিলেন।" [আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ই জানুয়ারী ১৮৭৫]

এই উপলব্ধি নাটকের গুণে বা অভিনয়ের গুণেও হতে পারে, তবে সেযুগের দর্শকের ভালো লাগার একটা কারণ খুব সহজেই অনুমেয়—তাঁরা যা চান নাট্যকার সেই বস্তুটি তেমন করেই পরিবেশন করার চেষ্টা করেছেন ত্রুটিহীনভাবে।

নাট্যকারের মঞ্চঅভিজ্ঞতা ও দর্শকচরিত্র সম্পর্কে মোটামুটি অভিজ্ঞতাই তাঁর নাটকের সাফল্যের অন্যতম হেতু ছিল, একথা অস্বীকার করা যায় না। নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ বঙ্গরঙ্গমঞ্চের একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক। শুধুমাত্র নাটকরচনা করেই নয়, মঞ্চসেবায় আত্মোৎসর্গের আরও নজীর পাওয়া যায় তাঁর দ্বিতীয় নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে। প্রথম নাটকের অভাবিত সাফল্যের জন্যই তাঁর দ্বিতীয় নাটকের জন্ম হল অতি শীঘ্রই। ১৮৭৫ সালেই তাঁর দ্বিতীয় নাটক 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী' প্রকাশিত ও মঞ্চস্থ হয়। এই নাটকের অভিনয়ের সূত্র ধরেই রাজশক্তি নাট্যশালার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য উদ্যত হয়েছিল। ১৮৭৬ সালের ৪ঠা মার্চ তারিখে নাট্যশালা নিয়ন্ত্রণ অডিন্যান্সের বলেই থিয়েটারের ডিরেক্টর উপেন্দ্রনাথ ধৃত হয়েছিলেন,—একমাস বিনাশ্রম

কারাদণ্ড ভোগের আদেশ পেলেও শেষ পর্যন্ত হাইকোর্টের বিচারে মুক্তি পেলেন'। কিন্তু 'Dramatic Performances Control Bill'—বঙ্গীয় নাট্যশালার অবাধ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করেছিল। The Calcutta Gazettee [Dec 27, 1876]-এ প্রকাশিত আইনের সারমর্ম—

"Act no. XIX of 1876—An Act for the better control of public Dramatic Performances. This Act may be called "The Dramatic Performances Act 1876"

Whenever the Local Government is of opinion that any play, pantomime, or other drama performed or about to be performed in a public place is—

(a) of a scandalous or defamatory nature, or (b) likely to excite feelings of disaffection to the Government established by law in British India or (c) likely to deprave and corrupt persons present at the performance, the Local Government, or outside the Presidency Towns and Rangoon, the Local Government or such magistrate as it may by order prohibit the performance."

এতে খুব স্পষ্টভাবেই ব্যক্ত হয়েছে যে, রাজশক্তিবিরোধী জনচেতনা সঞ্চারের চেষ্টামাত্রই অপরাধ। এসব ঘটনার বিশেষ মূল্য স্বীকারের প্রয়োজন আছে,—কারণ গণচেতনার উচ্ছ্বসিত আবেগ যখন তুঙ্গশীর্ষে আরোহণের চেষ্টা করে চলেছে,—ঠিক সেই মুহূর্তে এই আইন পরোক্ষভাবে শক্তি সঞ্চয়েই সাহায্য করেছিল। স্বদেশচেতনা সঞ্চারের অপরিসীম ক্ষমতা যে নাট্যশালারই হাতে—এ সত্যটি গভর্নমেণ্ট আইনের সাহায্যে প্রমাণ করেছিলেন। অভিনয়ের মত শক্তিশালী জনমত গঠনের শক্তিকে দমিত করার এ চেষ্টাটি বাংলা নাট্যালয়ের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা।

"সুরেন্দ্র-বিনোদিনী" নাটকের ওপর উপেন্দ্রনাথের প্রথম নাটকের পূর্ণ প্রভাব বর্তমান। দুটি নাটকের উপাদান সে যুগের উচ্চবিত্ত শিক্ষিত সমাজ থেকে আহরণ করা হয়েছে। নানা দুর্ঘটনা সৃষ্টি করে নাটকের জটিলতা বৃদ্ধির নজির এ নাটকেও মিলবে, কিন্তু এসব নিতান্তই ঘটনা মাত্র, নাটকীয় ঘটনা নয়। নায়ক-নায়িকার যথার্থ কোনো সমস্যা নেই,—কিন্তু নায়কের উগ্র আত্মসচেতনতা ও তীব্র দেশবোধ ঘটনাকে গুরুত্বদান করেছে। দুটি নাটকেই শিক্ষিত স্বদেশপ্রাণ ইংরেজবিদ্বেষী নির্ভীক যুবককে নায়করূপে দেখা যাচ্ছে। নায়িকাও নিতান্ত অশিক্ষিতা নয়,—সেকালীন রীতিনীতিতে অভ্যস্ত ও দেশসচেতন। নাট্যকার নারী

ও পুরুষ নির্বিশেষে দেশপ্রেমিকতা অনুসন্ধান করে চলেছেন,—দুটি নাটকেই এ দৃষ্টান্ত মিলবে।

উপেন্দ্রনাথের মঞ্চজ্ঞান তাঁর নাটকে বিশেষ ভাবে ধরা পড়েছিল। সেযুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোমত কাহিনী নির্বাচনের দুরদর্শিতা সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে একমাত্র তাঁরই ছিল। কাল্পনিক হলেও সামাজিক চরিত্রালোচনার উপযোগিতাটি তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন। সমাজ সম্পর্ক শূন্য অতীতচারণা শুধু একটি আদর্শকেই তুলে ধরতে পারে,—বাস্তবজীবনের সঙ্গে যোগস্থাপনের সাধ্য তার থাকে না। উপেন্দ্রনাথের দুটি নায়কের নায়কই দেশপ্রেমী, শিক্ষিত, আত্মমর্যাদাসম্পন্ন ইংরেজবিদ্বেষী এবং নির্ভীক-আদর্শবাদী যুবক। আবার এরা বর্তমানেরই মানুষ। দর্শকের চিন্তা ভাবনার সঙ্গে নাটকীয় পাত্রপাত্রীর যোগাযোগ এত গভীর ও প্রত্যক্ষ যে এ ধরণের নাটক অতিসহজেই প্রভাব বিস্তার করতে পারে। "সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর" নায়ক সুরেন্দ্র 'পুরু বিক্রম' নাটকের নায়ক পুরুর সঙ্গে নিজের তুলনা দিয়েছে এ নাটকে। অমিত সাহস ও নির্ভীকতা নিয়ে বিপক্ষশক্তির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে সে। এতে নিছক আদর্শবাদের প্রতিফলন ছাড়া অন্য কিছু নেই। অত্যাচারী ইংরেজদের প্রতি আন্তরিক বিদ্বেষ সুরেন্দ্রের একটি বিশিষ্ট অনুভূতি। ইতিপূর্বে হতিহাসাশ্রিত যে কোন নাটকে যবন বিদ্বেষরূপে যা ব্যাখ্যাত, উপেন্দ্রনাথের নাটকে সরাসরি ভাবে তা ইংরেজবিদ্বেষে রূপান্তরিত হয়েছিল। এখানে নাট্যকারের দেশচেতনা ও নির্ভীকতাই প্রকাশ পেয়েছে। দুটি নাটকেই শ্বেতকায় ও এদেশীয়দের সংঘর্ষচিত্র স্থান পেয়েছে। যে যুগে ইঙ্গিতে আভাষে ইংরেজবিদ্বেষ প্রচার করার উপায় ছিল না,—সে যুগেরই নাট্যকার উপেন্দ্রনাথ অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এ জাতীয় ঘটনা নাট্যদৃশ্য রূপে রচনা করেছিলেন। এ ধরণের ঘটনার নাট্যরূপ কিছুমাত্র অতিরঞ্জিত নয়,—কিন্তু পরাধীন জাতির সত্যকথনের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল রাজশক্তি। অথচ নাট্যকার জানতেন সেযুগীয় দর্শকের সমর্থন ও অভিনন্দন তিনি পাবেনই। বাংলা নাটক পরবর্তীযুগে স্বাধীনতা আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বাহন হতে পেরেছিলো,—উপেন্দ্রনাথ বোধ করি এ ব্যাপারে অগ্রজ নাট্যকার। তবে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণে'ই প্রথম রাজশক্তির বিরুদ্ধ সমালোচনার চিত্র পাওয়া যায়। তখনও নাট্যকারের ধারণায় ইংরেজবিদ্বেষবস্তুটি অকল্পিত ছিল—শুধু অত্যাচারী ইংরেজই তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য ছিল, সৎ ও সজ্জন ইংরেজপ্রশস্তির অভাব কোথাও নেই। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের নাটকে এই বক্তব্য একেবারেই পৃথকরূপে চিত্রিত হয়েছে। 'নীলদর্পণের' সঙ্গে 'শরৎ-সরোজিনীর' রচনাকালগত পার্থক্য মাত্র ১৪ বছরের। কিন্তু দীনবন্ধু ইংরেজ বিতাড়নের কথা চিন্তাও করেননি—অথচ মাত্র ১৪ বছরের মধ্যেই চিন্তাগত

ও আদর্শগত পরিবর্তন এত দ্রুতলয়ে ঘটেছে যে ইংরাজ বিতাড়ন ও স্বাধীন হওয়ার স্বপ্নটি এখন আর মোটেই কল্পনা মাত্র নয়, তা ধীরে ধীরে একটা সুচিন্তিত অবয়ব লাভ করবার আশায় দিন গুনছে। আর এ ব্যাপারে ইংরেজকে রাজশক্তি ও অত্যাচারী বলেই কল্পনা করা হয়েছে সামগ্রিকভাবে, কিছু উদার ও সজ্জন ইংরেজের প্রসঙ্গটি প্রায় বাদ পড়ে গেছে। স্বাধীনতা আন্দোলন যখন দানা বেঁধে ওঠেনি অথচ সে যুগের মানুষরা যেদিন একত্রিত হতে চাইছিল, সে মুহূর্তে উপেন্দ্রনাথের নাটক যে অত্যন্ত প্রতিক্রিয়াশীল রচনা বলেই অভিনন্দিত হবে তারও প্রমাণ রয়েছে। সে যুগের দর্শক শরৎ ও সুরেন্দ্রকে পরম আত্মীয় রূপে বরণ করে নিয়েছে। সরোজিনী-বিনোদিনীরা শরৎ ও সুরেন্দ্রের আদর্শকে শ্রেষ্ঠ মানবতার আদর্শ বলে শ্রদ্ধা জানিয়েছে,—এটি শুধুমাত্র নাট্যকারের রচনাদক্ষতার ফলাফল নয়। সেযুগের দর্শকেরা সারটুকু গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। অবান্তর অংশের প্রতি অমনোযোগিতার বা অন্যমনস্কতার পরিচয় দিয়েই তাঁরা এ দুটি নাটকের মূলবক্তব্যের দ্বারা প্রভাবিত হতে চেয়েছিল, বিচারের এ চেষ্টাটিও সেযুগীয় জীবনচেতনারই লক্ষণ।

'সুরেন্দ্র-বিনোদিনীতে' প্রথমারম্ভটি আপাতঃদৃষ্টিতে অসংলগ্ন অর্থহীন ও মূল কাহিনীবিচ্ছিন্ন ঘটনা রূপেই প্রতিভাত হবে। অন্তঃপুরিকা নারী ভারতদুঃখে নিমগ্না হয়ে যে সংগীতটির অবতারণা করেছে তাতে নাটকের বীজসন্ধি বপন করা হয়নি, ঘটনাগত পরিচয় দানের চেষ্টাও নেই, কিন্তু নাট্যকারের আদর্শবাদের প্রসঙ্গটি আছে। ভারত দুঃখে মগ্না নারীর স্বদেশপ্রীতির প্রসঙ্গ ছাড়া অন্য কোন গভীর অর্থ অনুসন্ধান করাও অবান্তর। সার্থক বা অসার্থকভাবেই নাট্যকার তা পরিবেশনের উদ্দেশ্যেই নাটকটি পরিকল্পনা করেছেন। প্রথম অঙ্কের প্রথম গর্ভাঙ্কে অন্তঃপুরিকা একটি নারীর মুখে আমরা শুনি,

হায় কি তামসী নিশি ভারত মুখ ঢাকিল।
সোনার ভারত আহা ঘোর বিষাদে ডুবিল॥
শোক সাগরেতে ভাসি,
ভারত মা দিবানিশি
স্মরি পূর্ব যশোরাশি
কান্দিতেছে অবিরল,
কে এখন নিবারিবে,
জননীর অশ্রুজল।[৪২]

৪২. উপেন্দ্রনাথ দাস (দুর্গাদাস দাস ছদ্মনামে প্রকাশিত), সুরেন্দ্রবিনোদিনী, ১২৮৭

এ বক্তব্য সে যুগের দর্শকসমাজের কাছে নাট্যকারের গভীর জীবনবোধের অনুভবের কথা। নাট্যকারের সচেতন ভাবনাটির প্রসঙ্গই নাটকের প্রারম্ভে নিবেদন করা হয়েছে। আপাতঃভাবে অসংলগ্ন হলেও এই আলোকেই নাট্যকার ও নাটকটির বিচার হোক, এ বুঝি তাঁরই নির্দেশদান।

এ নাটকের নায়ক সুরেন্দ্র বিত্তবান, শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র। দুরাচার ও লম্পট ম্যাজিষ্ট্রেটকে টাকা ধার দেওয়ায় তাঁর উদারতার কথাই মনে আসে—কিন্তু সেই দুরাচার যখন উদারতার সুযোগ নিয়ে অপমান করতে উদ্যত হয়, সুরেন্দ্র তাকে ক্ষমা করে না। সাহেব ও ম্যাজিষ্ট্রেট হলেও তার নীচ চরিত্রটি নাট্যকার খুব চমৎকাররূপে চিত্রিত করেছিলেন। দীনবন্ধু মিত্রের রোগসাহেবের জন্মান্তর হয়েছে ম্যাক্রেণ্ডেল রূপে। 'নীলদর্পণেও' দীনবন্ধু মিত্রের অভিযোগ ছিল ইংরাজ প্রবর্তিত বিচার পদ্ধতি সম্পর্কে। বিচারের প্রহসন ও বিচারের নামে অবিচারের পক্ষ সমর্থন দেখে দীনবন্ধু মিত্রও ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন,—এ নাটকেও সেই বিচার প্রহসনের চূড়ান্ত নিদর্শন রয়েছে। বিচারক ম্যাজিষ্ট্রেটের সীমাহীন অত্যাচারের প্রামাণ্য দলিল নিখুঁতভাবে এ নাটকে পরিবেশন করা হয়েছে। সুরেন্দ্র প্রাপ্য টাকা ফেরত পায়নি, পরিবর্তে সাহেবের দম্ভ ও অন্যায় আস্ফালন শুনেছে,—

"নির্বোধ, আমি বাইবেল চুম্বন করিয়া শপথ পূর্বক যাহা বলিব, তাহার বিরুদ্ধে তোমাদের দুইশত বাঙ্গালীর সাক্ষ্য গ্রাহ্য হইবে না। এতকাল ইংরাজের রাজ্যে বাস করিয়া এই সামান্য জ্ঞান উপলব্ধি কর নাই? তোমার অজ্ঞতা দেখিয়া আমি আন্তরিক দুঃখিত হইলাম।" [১ম অঙ্ক, চতুর্থ গর্ভাঙ্ক]

সমগ্র বাঙ্গালী জাতির নির্বুদ্ধিতার এমন উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর অন্য কোথাও দেখি না,—ম্যাক্রেণ্ডেল সুরেন্দ্রকে সাধারণ বাঙ্গালী বলে ভুল করেছিল। প্রতিকারে অক্ষম, দুঃখ ও অন্যায় সহনে অভ্যস্ত বাঙ্গালীর জাতীয় কলঙ্ক দূর করার জন্যই যে সুরেন্দ্র চরিত্রটির পরিকল্পনা। পদাঘাত করে সুরেন্দ্র ম্যাক্রেণ্ডেলের প্রত্যুত্তর দিয়েছে।

নাটকটিতে ঘটনাবর্ত সৃজনে কোন নতুনত্ব বা অভিনবত্ব নেই। "সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর" বিবাহ সম্পাদনের পূর্বে কিছু বাহ্যিক জটিলতা সৃষ্টির উদ্যম করেছিলেন নাট্যকার, পরিশেষে 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর' মিলনে কোন বাধাই অন্তরায় হয়নি। লাভ হয়েছে এই যে, হরিপ্রিয় বিরাজমোহিনীরও মিলনসেতুও রচিত হয়েছে। 'শরৎ-সরোজিনীর' মতই এ নাটকও মিলনান্তক সামাজিক রচনা। এ নাটকের বিরুদ্ধে আনীত অশ্লীলতার অভিযোগও শেষ পর্যন্ত অপ্রমাণিত থেকে গেছে। কিন্তু এই নাটকটির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ আনা অত্যন্ত স্বাভাবিক ছিল তা কেন আনা হয়নি সেটাই আশ্চর্য। যাই হোক, অভিযোগের সেতু ধরেই নাট্যাভিনয় নিয়ন্ত্রণ আইন

বিধিবদ্ধ করেই সরকার অত্যন্ত স্বাভাবিক পথ অনুসরণ করেছিলেন। দেশাত্মবোধ সৃজনের এমন প্রকাশ্য চেষ্টাটি বন্ধ করার এ ছাড়া আর অন্য কোন উপায় ছিল না। এ সম্বন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকার সমালোচনাটি আমাদের অসহায় আক্ষেপেরই অনুরণন। ১৮৭৬ সালের ১৪ই ডিসেম্বর অমৃতবাজার লিখেছিলেন,—"এ আইনের উদ্দেশ্য মহৎ হইতে পারে, ইহা দ্বারা গভর্নমেণ্ট আমাদের উপর আর একটি শাসন স্থাপন করিলেন। আমরা শাসনের প্রভাবে নির্জীব হইয়াছি। গভর্নমেণ্ট যদি আমাদের নিত্য নৈমিত্তিক সমুদয় কার্যের উপর পর পর এইরূপ শাসন স্থাপন করিতে থাকেন, তাহা হইলে বোধহয় আর দীর্ঘকাল আমাদের এ আইনের অধীন থাকিয়া ইংরাজ রাজার আজ্ঞা পালন করিতে হইবে না। ভারতবর্ষবাসীরা এরূপ স্থানে গমন করিবে যেখানে আর ইংরাজ শাসনের ভ্রূকুটিতে তাহাদিগকে ভীত করিতে পারিবে না।"

'শরৎ-সরোজিনী' 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনী'-তেই নাট্যকার খুন-জখম, পিস্তল-বন্দুক, হত্যাকাণ্ড-মারামারির দৃশ্যগুলো নির্বিচারে নাটকে স্থান দিয়েছেন। প্রকাশ্য মঞ্চে এই উত্তেজনাকর দৃশ্য যে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু পরবর্তী নাট্যকারেরা এ নিয়ে সমালোচনা করেছেন তীব্রভাবে। উপেন্দ্রনাথের নাটকেই অভাবিত নাটকীয়ত্ব ও উদ্দেশ্যমূলক বক্তৃতার আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। দুটি নাটকেই ইংরেজবিদ্বেষ ও শ্বেতকায় নিধনচেষ্টা এত স্পষ্ট ভাবে চিত্রিত হয়েছে যে নাট্যকারের দেশপ্রেমাদর্শ অত্যন্ত প্রকটভাবে ধরা পড়েছে। এই উদ্দেশ্যটি নাটকের ভূমিকাতেই নাট্যকার ব্যক্ত করেছিলেন। একটি পুস্তক প্রাপ্তির সংবাদ দিতে গিয়ে তিনি যে সরস সমালোচনার অবতারণা করেছিলেন, তার মূলে দেশচিন্তার ছাপ রয়েছে পুরোমাত্রায়। দেশহিতৈষিতা সে সময়ের একটি পরিচিত শব্দ এবং সমালোচকেরাও দেশহিতৈষণার স্বরূপ অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছিলেন নানাভাবে। কাব্যে, নাটকে, প্রবন্ধে, সমালোচনায় সাংবাদিকতায় দেশহিতৈষণারই বিভিন্ন রূপ ধরা পড়েছে মাত্র। উপেন্দ্রনাথের সচেতনতা এ ব্যাপারে লক্ষ্যণীয়। দেশপ্রেমাদর্শই তাঁর নাটকের কাহিনী, চরিত্র ও ঘটনার মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছিল, কিন্তু নিজেই তিনি সমালোচকের আদর্শ অনুসরণ করে দেশপ্রেমকেই ব্যঙ্গ করেছেন। পরোক্ষ ফললাভ হিসেবে বিরূপ সমালোচনাই যে অন্যতম প্রাপ্যবস্তু এ বিষয়ে তাঁর সতর্কতা ছিল।

উপেন্দ্রনাথের সমসাময়িক নাট্যকারদের মধ্যে প্রমথনাথ মিত্রের নাম উল্লেখযোগ্য। নানাভাবেই তিনি সেযুগীয় নাট্যকারদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তাঁর প্রথম নাটকের কাহিনীর সঙ্গে ইতিহাস, বিশেষতঃ রাজস্থানের ইতিহাসের যোগসূত্র আছে। 'নগনন্দিনী' নামে প্রমথনাথ যে ইতিহাসভিত্তিক কল্পনাশ্রয়ী রোম্যান্টিক নাটকটি

সর্বপ্রথমে রচনা করেন তার ভূমিকায় উপেন্দ্রনাথ দাসের প্রতি কটাক্ষপাত লক্ষ্যণীয়,—

পাঠকগণ! নগ-নলিনী নাটক মধ্যে 'জয় ভারতের জয়' নাই, 'পাপিষ্ঠ ম্লেচ্ছ', 'দুরাচার যবন' নাই, 'হায়, স্বাধীনতা' নাই, 'ফোর্ট-উইলিয়ম' নাই, পিস্তক বন্দুক, লাঠি প্রভৃতি কিছুই নাই,—ইহারও যে আবার দ্বিতীয় সংস্করণ হইল, বড় আশ্চর্যের বিষয়!"[৪৩]

এই সমালোচনার অল্পকাল পরেই তিনি রীতিমত দেশাত্মবোধক একটি নাটক রচনা করে প্রমাণ করেছিলেন—সাময়িকতার মোহ থেকে মুক্তি পাওয়া সব লেখকের পক্ষেই কত অসম্ভব।

সেযুগের আরও একজন নাট্যকার উমেশচন্দ্র গুপ্ত উপেন্দ্রনাথকে ব্যঙ্গ করে একটি নাটকের ভূমিকায় বলেছিলেন,—

'জনৈক বন্ধু আমার বীরবালা গ্রন্থ উপহার প্রাপ্ত হইয়া আমাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহাতে এই একটি কথা ছিল, নির্বোধ! রুচির দিকে চাহিয়া এখন নাটক লিখিতে হয়, এখনকার রুচি, নায়ককে ডন কুইক্সটের মত সাজাইয়া এবং নায়িকাকে হারমনিয়ম বাজাইতে বাজাইতে গান করাইয়া পাঠকের এবং গ্রন্থ অভিনয়কালে দর্শকমণ্ডলীর সম্মুখবর্তী করা, দুই একটি জজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে নায়ক দ্বারা কোন উপায়ে জুতা, লাঠি, পিস্তল মারা কিম্বা প্রাণে বধ করা, একটি বাঙ্গালী বালিকা দ্বর্তৃক বহুসংখ্যক গোরা সৈনিকের প্রতি বন্দুক বা পিস্তল ছোঁড়া, এ সকল তোমার বীরবালাতে নাই, গতিকেই ইহা মিষ্ট লাগিলেও দুর্গন্ধযুক্ত।'[৪৪]

এই ভূমিকায় লেখক রচিত "বীরবালা" নাটকের পরিচয় স্পষ্ট হয়নি, কিন্তু উপেন্দ্রনাথের নাটক দুটির বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক বিবরণ দেওয়া হয়েছে। ইতিহাসের নামমাত্র সংযোগ রেখে নাট্যরচনার যে অসার্থক ও অনুল্লেখ্য চেষ্টা করেছিলেন এঁরা, তার চেয়ে উপেন্দ্রনাথের মৌলিক চিন্তাজাত নাটক দুটির মূল্য যে স্বাভাবিক বিচারেই অনেক বেশী হবে তাতে সন্দেহ কোথায়? উপেন্দ্রনাথ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের যুগের নাট্যকার হয়েও চিন্তাভাবনায় মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন সবদিক থেকেই। তাঁর অনুবর্তী নাট্যকারেরা তাঁকে প্রথমে আক্রমণ পরে অনুসরণ করে প্রমাণ করেছিলেন যে, মৌলিকত্ব সৃজনের সত্যিকারের ক্ষমতা তাঁদের নেই। উপেন্দ্রনাথ তাঁর সাময়িক নাট্যকারদের আক্রমণের হেতু হতে পেরেছিলেন বলেই আজকের বিচারে তাঁকে অনেক বেশী মূল্য না দিয়ে উপায় নেই।

৪৩. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ২৭৬।
৪৪. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড) থেকে উদ্ধৃত। পৃঃ ২৭৮।

নিছক ইতিহাস কিংবা বিন্দুমাত্র ইতিহাসের সূত্র অবলম্বন করে অসার্থক কল্পনাজাল বিস্তার করার সুলভ পথটি প্রথমাবধি বর্জন করেই উপেন্দ্রনাথ আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

লক্ষ্যণীয় যে, ঠিক এ ধরণের সামাজিক নাটক সেযুগে খুব বেশী লেখা হয়নি। অন্যান্য সামাজিক সমস্যা অবলম্বনে কিছু কিছু সামাজিক প্রহসন ও নাটক লেখার চেষ্টা হলেও 'শরৎ-সরোজিনী' বা 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর' মত নিতান্ত দেশপ্রেমমূলক, সামাজিক নাটক আর রচিত হয়নি। কিন্তু "পুরুবিক্রম" কিংবা 'স্বপ্নময়ীর' অনুসৃতি চলেছিল নানা অক্ষম ও স্বল্পক্ষম নাট্যকারদের অনুশীলনের মাধ্যমে। 'শরৎ-সরোজিনীর' আদর্শবাদী নায়ক শরৎ ও 'সুরেন্দ্র-বিনোদিনীর' নির্ভীক ও সত্যসন্ধী নায়ক সুরেন্দ্রকে বহু আদর্শবান ঐতিহাসিক চরিত্রের ভীড়েও হারিয়ে ফেলা যায় না। দূর ইতিহাসের অচেনা চরিত্রকে কল্পনা করে নিতে কিছু সময়ের প্রয়োজন হয়, মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের আলোকপ্রাপ্ত উনবিংশ শতকীয় পুরুষ চরিত্রের নজির হিসেবে শরৎ ও সুরেন্দ্র অনেক বেশী পরিচিত। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগদানের প্রচেষ্টা কিভাবে শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবকের জীবনচর্যায় স্থান পেয়েছিল তার নজির হিসেবে কাল্পনিক হলেও উপেন্দ্রনাথের সৃষ্ট নায়ক চরিত্র দুটির উল্লেখ করতে হয় সবার আগে।

"নগ-নলিনী" নাটকে উপেন্দ্রনাথের সমালোচনা করেও দ্বিতীয় নাটকে প্রমথনাথ মিত্র দেশপ্রেমের ভাবনাকেই মুখ্য স্থান দিয়েছিলেন। তাঁর দ্বিতীয় রচনা 'জয়পালে' জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। বিষয়বস্তুর পরিকল্পনায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অনুসরণ শুধু যে তিনিই করেছিলেন তা নয়,—সে যুগের ইতিহাসভিত্তিক ও স্বদেশাত্মক নাট্যরচয়িতাগোষ্ঠী এ ব্যাপারে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের ধ্রুব পথটি নির্বিচারে অবলম্বন করে নিশ্চিন্ত হয়েছিলেন।

বহিঃশত্রুর আক্রমণে বিধ্বস্ত ভারতের ইতিহাস খুঁজলে একই বিষয়ের পুনরুল্লেখ মিলবে। বিদেশী শত্রুরা অমিত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে এদেশে, জনপদ লুণ্ঠন করেছে, বন্দী করেছে দুর্বল রাজশক্তিকে, জয়পতাকা উড়িয়েছে ভারতের আকাশে। অসংখ্য যুক্তি দিয়েও ভারত ইতিহাসের এই কলঙ্কের কাহিনী মুছে ফেলা সম্ভব নয়। বিদেশীশক্তির সঙ্গে ক্ষমতার লড়াইয়ে হেরে না গেলে নিজেদের দুর্বলতার প্রসঙ্গটি চাপা দেওয়া যেতো। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে তুর্কী, মোঘল, পাঠান রাজারা এদেশ শাসন করেছেন অমিতবিক্রমে, কিন্তু দীর্ঘদিনের পরাধীনতার ইতিহাসে যে নজীর সুলভ নয় উনবিংশ শতাব্দীর আত্মজাগরণের লগ্নে তা সম্ভব হল। এঁরা দেখালেন বিদেশীশত্রু এদের জয় করেছে ঠিকই—কিন্তু সে জয়ের পেছনে আছে তুমুল সংগ্রামের পটভূমিকা।

দেশকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল বলেই বহিরাগত শক্তির জয়লাভের পথটি কণ্টকাকীর্ণ হয়েছিল। প্রমথনাথ মিত্র 'জয়পাল' নাটকের কাহিনী বেছে নিয়েছেন একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে। অপ্রতিদ্বন্দ্বী তুর্কী সুলতান মামুদের এদেশ জয়ের ঘটনাটি তিনি নাটকে স্থান দিয়েছেন। কল্পনা করেছেন লাহোরাধিপতি জয়পালকে একজন বিশ্বস্ত স্বদেশপ্রেমিক রূপে, যিনি সুলতান মামুদের আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন। এই কল্পনায় প্রমথনাথের মৌলিকত্ব খুব বেশী নেই,—কারণ ইতিহাসাশ্রিত স্বদেশাত্মক নাটকরচনার বাঁধাধরা রীতিটি তিনি অনুসরণ করেছিলেন মাত্র। কিন্তু সুলতান মামুদকে প্রতিনায়ক হিসেবে কল্পনা করে ভারত ইতিহাসের একটি মসীলিপ্ত অধ্যায়কে খানিকটা কলঙ্কমুক্ত করার এই শুভ প্রয়াসটি তার মৌলিকত্ব সূচনা করে।

এ নাটকের মুখ্যচরিত্রগুলোর স্বদেশপ্রাণতা লক্ষ্যণীয়। সেনাপতি সংগ্রামসিংহ, রাজপুত্র অনঙ্গপাল, সহকারী সেনাপতি বিজয়কেতু—দেশের এই তরুণ যুবশক্তি একত্রে দেশরক্ষার শপথ গ্রহণ করেছে। নাট্যকারের সুপ্ত দেশচেতনাটি এখানে কাজ করেছে। জয়পাল দুর্ভাগ্য নিয়ে জন্মেছেন,—বিদেশী শত্রু এসে দ্বারে হানা দিয়েছে তাঁরই রাজত্বকালে, কিন্তু তিনি সার্থক রাজা; বিপদকে তিনি তুচ্ছ করেছেন, যোগ্যপুত্র ও যোগ্যসেনাপতি তাঁকে সাহায্য করেছে সর্বদা।

প্রাচীন রীতি ও আঙ্গিকের প্রথায় রচিত এ নাটকে আমরা দেবতা-নর-দস্যু -উদাসিনী-তপস্বিনী ও উদাসীন, সব রকম চরিত্রই খুঁজে পাবো। দেবতারাও চরিত্ররূপে কল্পিত,—ইন্দ্র ও সূর্য্য চরিত্র হিসেবে স্থান পেয়েছেন, গতানুগতিক প্রথায় ভবিষ্যৎবাণী করেছেন। নাটকের দিক থেকে এর কিছুমাত্র মূল্য নেই তবে এ নাটকের সঙ্গে কাব্যের কিছু মিল আবিষ্কার করা খুব দুরূহ ব্যাপার নয়। দেবতা চরিত্রকে ঐতিহাসিকতার মাঝখানে টেনে আনার পেছনে কাব্যের প্রভাবই খুব বেশী। মধুসূদনের "মেঘনাদ বধের" ভাষার গদ্যরূপ যেমন নাট্যকার সংলাপরূপে ব্যবহার করেছেন তেমনি দেবদেবীর মুখে কিছু শাশ্বতবাণী শোনাবার লোভটিও সংবরণ করতে পারেননি। এতে কিছু অসংগতি যে সৃষ্টি হয়েছে তাতে সন্দেহ নেই। দেশপ্রেমমূলক নাটকের স্থায়ীরস—বীর রস। জীবনযুদ্ধের ফলাফল জেনে ফেলার পরেও বীরত্ব দেখাবার মত মনোবল কোন কোন চরিত্রে থাকে। নাট্যকার অবশ্য ভাগ্যের দোহাই দিয়ে জয়পালের অসাফল্যকে সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন এ নাটকে। সার্থক সংলাপে বীররসের উন্মাদনা সৃষ্টির আদ্যন্ত প্রয়াস এ নাটকে লক্ষ্য করা যায়। গতানুগতিকতার মধ্যেও কিছু মৌলিকত্ব—আপাতঃবিরোধিতার মধ্যেও কিছু সান্ত্বনা এখানেই।

প্রথমেই দেশের দুর্দিনের আভাস দেওয়া হয়েছে। বিদেশী আক্রমণকারী ভারতজয়ে উদ্যত। রাজা জয়পাল সীমান্ত অঞ্চলের সম্রাট বলে শত্রুশক্তিকে বাধা দানের দায়িত্ব তাঁরই। রাজা চিন্তিত—কিন্তু সেনাপতিরা অকুতোভয়,—এঁদের বীরত্বপূর্ণ সংলাপ নাট্যকারের দেশাত্মবোধের পরিচায়ক। দেশের যুবশক্তির মুখে এই সাহসিকতার বাণী আরোপ করে নাট্যকার পরোক্ষভাবে কিছু ইঙ্গিত সৃজন করেছেন। সংগ্রামসিংহ, বিজয়কেতু, অনঙ্গপাল দেশাত্মবোধের ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন, "সংগ্রাম সিংহ—প্রাণ থাকতে পঞ্চনদ যবন অধিকারভুক্ত হবে না।

অনঙ্গপাল—যবনদের সহিত প্রাণপণে যুদ্ধ করব, স্বদেশরক্ষার জন্য জীবন দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হব না।

বিজয়কেতু—চির স্বাধীন পঞ্চনদ কখনই অন্যের অধীনতা স্বীকার করবে না।"

[১ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য]

রাজপরিবারে প্রতিপালিত উদাসীন সদানন্দের দেশপ্রেমও সোচ্চার ও গভীর। সদানন্দ—ভারত যায়—রক্ষা করুন। ভারতের সৌভাগ্যশশী চিরকালের নিমিত্ত অস্তমিত হয়—রক্ষা করুন।। যবনেরা এসে দেশপ্লাবিত করে, সোনার ভারত ছারখার করে, রক্ষা করুন।। [১ম অঙ্ক, তৃতীয় দৃশ্য]

সদানন্দ নাটকের অনুল্লেখ্য পার্শ্বচরিত্র হলেও দেশপ্রেমের বক্তব্য নাট্যকার এই চরিত্রের মুখে আরোপ করেছেন। নাটকের জটিলতম মুহূর্তে সদানন্দ বিপদের গ্রন্থিগুলো অকুতোভয়ে ছিন্ন করেছে। রাজা জয়পালের সঙ্গে কথোপকথনেও গভীর দেশপ্রেমের বাণী উচ্চারিত হয়েছে,—

আমি বলছি পঞ্চনদ কখন সহজে আপনার স্বাধীনতা নষ্ট করবে না। আমি কিংবা বিজয়কেতু আপাততঃ কিছু বিমনা হয়েছি বলে তুমি ভয় পাচ্চ, কিন্তু সদানন্দ, এটি নিশ্চয় জেনো, ডমরুধ্বনি শ্রবণ করলে ফণী কখন স্থির ভাবে থাকতে পারে না। ...তুমি শুনবে, পঞ্চনদবাসীরা প্রত্যেকেই গম্ভীর স্বরে বলছে "জীবন থাকতে কখন বিদেশীয়ের বশ্যতা স্বীকার করব না, মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পতন।"[৪৫]

কিরণচন্দ্রের 'ভারতমাতায়' দেশপ্রেমোচ্ছ্বাসের বাণী বহন করেছে নারী। সম্ভবতঃ তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েই উদাসিনী চরিত্রটি অঙ্কন করেছেন নাট্যকার—অবশ্য, 'পুরু বিক্রমের' ঐলবিলার দেশাত্মবোধের প্রভাব পড়াও খুব বিচিত্র নয়। নাট্যকার বিজয়কেতুর মুখে একটি সংলাপে জানিয়েছেন, "আমাদের স্ত্রীলোকেরাও স্বাধীনতার জন্য, স্বদেশরক্ষার জন্য, প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে।"—সে যুগীয় প্রভাব, মধুসূদনের

৪৫. প্রমথনাথ মিত্র, জয়পাল, ১৮৭৬।

নারীব্যক্তিত্ব আবিষ্কারের সূত্র ধরে সেকালের নাট্যকারগণও নারীর এই পৃথক চিন্তাধারাকে বিশেষ মর্যাদার সঙ্গে স্থান দিয়েছেন। তপস্বিনী ভারতের ভাবী অমঙ্গল চিন্তা করে মর্মাহত হয়েছে—এই দুর্দশায় ভারত জননীকে আহ্বান করে আক্ষেপ করেছে,—"জননি! ভারতের ভাবী দুর্দশাসকল বর্ণনা করে ভারতভূমির নিকট হতে চিরকালের জন্য বিদায় নিচ্ছেন। যবনেরাই ভারতের রাজসিংহাসনে উপবেশন করবে।—হায় বিধি। এই তোমার বিধি! মহারাজ! মহারাজ জয়পাল! আর কেন বৃথা চেষ্টা করচ, ভারতের স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারবে না। উঃ! তোমার জীবন নাট্যের শেষ দৃশ্য কি ভয়ানক। [৩য় অঙ্ক, প্রথম দৃশ্য]

দেশচিন্তা তপস্বিনীকে মুহ্যমান করেছে। এই ভাবাবেগে দর্শকের চিত্তও আলোড়িত হয়। আবার ইন্দ্র ও সূর্য দুই দেবতার সংলাপেও খানিকটা মানবীয় ভাব আরোগ করেছেন। এই চরিত্র দুটির উপযোগিতা যে কিছুমাত্র ছিল না—সেকথা পূর্বেই বলেছি। "মেঘনাদ বধ কাব্যের" শক্তিহীন দেবতাদের মতই এঁরাও দৈবনির্ভর, বিধির বিধান মেনে নেওয়ার দুর্বলতা এদের চরিত্রে লক্ষ্যণীয়,—

ভারতে যবন প্রবেশ করেচে, যবনেরা ভারতের অধীশ্বর হবে, পাপমতি ম্লেচ্ছদিগের কর্কশ পদদণ্ডে দেবগণের ভক্তভূমি ভারতের কোমল হৃদয় দলিত হবে, এতে কার মন না সন্তাপানলে দগ্ধ হচ্চে? কিন্তু বিবেচনা করে দেখ যা হচ্চে, আর যা হবে সকলই বিধাতার ইচ্ছায়। [৩য় অঙ্ক, ৩য় দৃশ্য]

দেশপ্রেম ঊনবিংশ শতাব্দীর আবহাওয়াতে পুষ্ট ও ক্রমবর্ধমান একটি অনুভূতি যা অতি আলোচনার ফলে প্রায়ই বিশেষত্বহীন হয়ে পড়ছিল। গতানুগতিকভাবে দেশাত্মবোধ প্রচারের পথ অনুসরণ করতে গিয়েও প্রমথনাথ কিছু অভিনবত্ব সৃষ্টি করছেন। ভারত ইতিহাসের একটি লগ্নকে চিত্রিত করার সময় তিনি ঘটনাটিকে প্রায় পৌরাণিকতার পর্যায়ে এনে ফেলেছেন। চিন্তার দৈন্য—ঐতিহাসিকতার অবমাননা প্রকাশ পেলেও নিছক কল্পনাশ্রয়ী রচনা বলে যদি ধরে নিই তবে নাট্যকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনা যায় না। দেশপ্রেম প্রচার করাই যাঁর লক্ষ্য,—উদ্দেশ্যের জন্য তিনি যদি মুখ্যকে গৌণ বলে মনে করে থাকেন তাঁকে খুব দোষ দেওয়া চলে না। দেশপ্রেম প্রসঙ্গটি শুধু মাত্র রাজা-রাজপুত্র-সেনাপতি-সৈনিক কিংবা আধপাগলা চরিত্রদের একচেটিয়া করে না রেখে তিনি সন্ন্যাসী-দেবতা এদেরও টেনে এনেছেন মাত্র। দেশের দুর্দিনের জন্য ক্ষোভ-দুঃখ ও আক্ষেপ প্রকাশ করে এঁরাও কর্তব্য পালন করেছেন।

"জয়পাল" নাটকের গভীরতম আর্তি আমরা জয়পালের মুখেই শুনতে পাই। রাজ্যরক্ষার আন্তরিক চেষ্টা সুমহতী হলেও বৃহৎশক্তির কাছে ক্ষুদ্রশক্তির পরাজয় ত

অনিবার্য—তাই জয়পালের প্রচেষ্টাও সফল হয়নি। দেশকে বিদেশীর হাতে সমর্পণ করার বেদনায় মহামান্য জয়পাল মর্মবিদারক উক্তি করেছিলেন,—

"জন্মভূমি! জন্মভূমি! পঞ্চনদ! ভারত! দুঃখিনী ভারত! আমার শত সহস্র জীবন দিলেও কি তোমার স্বাধীনতা একমুহূর্তের জন্য ফিরে পাওয়া যায় না,—
—আজ আর্যনাম আর্যগৌরব চিরকালের মত অস্তমিত হতে চলল, ভারতের আজ শেষ স্বাধীন নিশি!—জন্মভূমি! আমার অপরাধ মার্জনা কর আমি এই বিপদের সময় তোমায় পরিত্যাগ করে গেলুম।" [৫ম অঙ্ক, ২য় দৃশ্য]

এই বেদনাঘন বিলাপোক্তি যে করুণরস সঞ্চার করে তাও আমাদের দেশচেতনা জাগানোর পক্ষে সহায়তা করেছে। সে যুগের দেশাত্মবোধক নাটকের গতানুগতিকতা স্বীকার করেও বলা যায়, দেশপ্রেমাত্মক অংশটুকু যথেষ্ট হৃদ্য হয়েছে।

এই জাতীয় আরও একটি নাটকের রচয়িতা হচ্ছেন গঙ্গাধর ভট্টাচার্য—ইনি 'তারাবাই' রচনা করে দেশাত্মবোধের প্রসঙ্গ প্রচার করতে চেয়েছিলেন। দেশপ্রেম ছাড়া কোন লক্ষ্যণীয় বক্তব্য এ নাটকে নেই,—কোন উদ্দেশ্যও নাট্যকারের ছিল না। রাজস্থানের প্রচলিত কাহিনীর অনুসরণে নাটকটি লেখা। তবে বীরনারী তারাবাই-এর আদর্শে বঙ্গনারীও বীরাঙ্গনা হয়ে উঠুক এই কামনা করেছেন নাট্যকার। 'উপহারে' যে কবিতাটি যোজনা করেছেন সেটি লক্ষ্যণীয়,—

তারার মোহিনীমূর্তি ভাবিয়ে অন্তরে,
তারা হতে সাধ যেন সকলেতে করে।
তা হলে হিন্দুর পুনঃ গৌরব-তপন,
বঙ্গের আকাশে আসি দিবে দরশন।
সতীত্ব বীরত্ব দেশহিতৈষিতা আলো,
জ্বালিয়ে দেশের মুখ করিবে উজ্জ্বল।
হায়! কবে দেখিব রে ভরিয়ে নয়ন,
বীরপত্নী বীরমাতা বঙ্গযোসাগণ।
হয় যেন বঙ্গনারী সবে বীরাঙ্গনা,
গঙ্গাধর শর্মণের একান্ত বাসনা।"[৪৬]

অন্যান্য দেশাত্মবোধক নাটকের মত এখানে স্বদেশী সংগীত আরোপ করেছেন—কিন্তু আত্মশক্তির জাগরণ নয়, দেবতার আশ্রয় প্রার্থনা করেই নাট্যকার নিশ্চিন্ত। এ স্বদেশী সংগীতটি তাই একটু বিশিষ্ট।

৪৬. গঙ্গাধর ভট্টাচার্য, তারাবাই, ১২৮১।

দেশরক্ষা ধর্মরক্ষা কর গো কালিকে।
হিন্দুকুলে হিন্দুস্থান দেহি হিন্দু পালিকে॥

[১ম অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

এ জাতীয় প্রার্থনায় যে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না সে চেতনাটিও নাট্যকারের নেই। গতানুগতিকতার সঙ্গে প্রাচীনের ধর্মপ্রাণতা মিশেছে এখানে।

তারাবাই দেশোদ্ধারের জন্যই পুরুষোচিত শক্তি অর্জন করেছিলেন,—এ কাহিনীতে এই ব্যঞ্জনাটকু নাট্যকারেরই যোজনা। তারাবাই বলেছেন,—

"আমি নারীকুলে জন্মে পুরুষোচিত কার্য সমরবিদ্যা অধ্যয়ন কচ্চি কেন? কেবল পিতাকে সাহায্য কর্তে, স্বদেশের স্বজাতির স্বাধীনতারূপ অমূল্যধন দস্যুর গ্রাস থেকে পুনরুদ্ধার কর্তে, আর দুষ্ট অপহারকের বিনাশ কর্তে, আমি সমরানলে জীবন পর্যন্ত আহুতি দিতে প্রস্তুত আছি—" [ঐ]

এখানে তারাবাইকে জলন্ত স্বদেশপ্রেমিকা রূপেই কল্পনা করেছেন নাট্যকার। স্বাধীনতা আন্দোলনে বীরনারীরাও আমাদের সংগ্রাম শক্তি বৃদ্ধি করতে পারেন নাট্যকার সে আশা পূর্বেই ব্যক্ত করেছেন। দেশাত্মবোধের আবেগে তারাবাই অন্যত্রও বলেছেন,—

যারা স্বদেশের জন্মভূমির অধিকারিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে, যারা জীবনের সার স্বাধীনতারূপ অমূল্য ধন অপহারক দস্যুর গ্রাস থেকে রক্ষা কর্তে পারে নাই, তাদের আবার বিশ্রাম কি? সুখ ইচ্ছাই কি? স্বজাতির, স্ববংশের, স্বদেশের অপমানরূপ বৃশ্চিক দংশন সহ্য করলে কি নয়নে নিদ্রার আবির্ভাব হয়? যাদের হয় তারা মানবকুলে অত্যন্ত হেয়। [২য় অঙ্ক, ২য় গর্ভাঙ্ক]

এ জাতীয় উক্তি যে অত্যন্ত সময়োপযোগী ও মূল্যবান—সেটুকু সহজেই বোঝা যায়। দেশপ্রেমের প্রলেপেই এ নাটকের সব তুচ্ছতা ঢাকা পড়ে যায়। যদিও এ নাটক নাট্যকারকে প্রতিষ্ঠা, সাফল্য, সম্মান কিছুই এনে দেয় নি, কিন্তু তবুও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েই নাট্যকারগোষ্ঠী এগিয়ে এসেছিলেন। দেশপ্রেমের বিশুদ্ধ আবেগে অনুপ্রাণিত এ জাতীয় সৃষ্টির মূল্য সেদিক থেকেই বিচার করতে হবে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

উপন্যাস

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বয়ঃকনিষ্ঠ সৃষ্টিকেই উপন্যাস আখ্যা দিতে পারি। বাদানুবাদের আড়াল থেকেও স্পষ্ট ভাবে এ সত্য অনুভব করা যায় যে প্যারীচাঁদ মিত্র কিংবা ভূদেব মুখোপাধ্যায় উপন্যাসের লক্ষণাক্রান্ত যে গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তা পূর্ণ উপন্যাস নয়। সুতরাং ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী'ই উপন্যাস রচনার প্রথম সোপান। সাহিত্যের অন্যান্য শাখায় স্বদেশপ্রেমের যে বাণী স্বতোৎসারিত ও উচ্ছ্বসিত বক্তব্যে পরিণত হয়েছে উপন্যাস নামক সর্বকনিষ্ঠ রচনা-সম্ভারেও তার প্রতিফলন পড়েছিল স্বতঃসিদ্ধভাবেই। যুগদর্পণ হিসেবেই সাহিত্যের বিচার হয়ে থাকে এবং উপন্যাস-নাটক-কাব্য-প্রবন্ধের গভীরে প্রবেশ করলে যুগচিত্রের নিখুঁত রূপই তাতে ধরা পড়তে দেখি। স্বদেশপ্রেমকে অবলম্বন করেই যে যুগজীবন উচ্চকিত হয়ে উঠেছিল—কাব্য-নাটকে যে চিত্র বারবার আমাদের সুপ্ত দেশচেতনাকে জাগিয়েছে, উপন্যাসেও তার নিবিড় পরিচয় রয়েছে। বঙ্কিমপূর্ব যুগেও উপন্যাস রচনার আকুতি এ দেশের মাটিতে ছিল এবং তা থাকাটাই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। কোনো সৃষ্টিই আকস্মিক নয়, ঐতিহ্যের অনুভাবনা আমাদের চিত্তলোকের দ্বারে বার বার আঘাত করে বলেই প্রকাশের আকুলতা জাগে। কাজেই প্রথম উপন্যাসকার বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বসূরীরা উপন্যাসের যে খসড়া রচনা করে গেছেন—ধারাবাহিকভাবে সেখানেও স্বদেশচেতনার কোনো প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ পরিচয় আছে কি না দেখা দরকার। পূর্বেই বলেছি, এ যুগ দেশভাবনায় কল্লোলিত একটি উন্মুখর জনতার যুগ। যে পবিত্র ধ্যান সাধারণকে জাগিয়েছে—স্রষ্টার মনে তা এনেছে সৃজনের প্রেরণা। বস্তুতঃ ধ্যান ও ধারণার পূর্ণ রূপ যতক্ষণ না বাণীরূপ লাভ করছে ততক্ষণই সৃষ্টির ক্ষমতা নিয়ে সন্দেহ জাগে, যে সাহিত্যে তা উদ্‌ভাসিত—সমালোচক ও স্রষ্টা তাকে অভিনন্দন জানাতে দ্বিধাবোধ করেন না। উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে নাটকে দেশপ্রেমের যে উজ্জ্বল ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করেছি—উপন্যাসে অবিকলভাবে সেই ভাব ও আদর্শ রক্ষা করা সম্ভব নয়। উপন্যাসের বিষয়বস্তু কাব্যের মত আত্মগত নয়—কিংবা নাটকের মত দৃশ্যগন্ধী নয়। উপন্যাসের গল্পরস ও কাহিনীধর্মিতা দেশপ্রেম প্রচারের সম্পূর্ণ প্রতিকূলই বলতে হয়। তবু কালের মন্দিরায় যে দেশভাবনার সুরটি থেকে থেকে বেজেই চলেছে—উপন্যাসের নিবিড় ঘটনাজাল আর

সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের মাঝখানেও তার ছায়াপাত দেখতে পাই। আর দেশভাবনার মত একটি নিতান্ত আত্মগত চিন্তা ও মননের স্থান উপন্যাসে অবান্তর হলেও এর আবির্ভাবকে অপ্রত্যাশিত বলা যায় না। John Oakesmith যে কথা বলেছেন তাঁর 'Race and Nationality' গ্রন্থে—

"It is because literature—that clear record of national culture and tendency—best exhibits the operation of this process of general national development, that the writer has devoted a considerable space to the story of national literature in our own country".[১]

উনবিংশ শতাব্দীর যে লগ্নে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব যে যুগে তাঁর ধ্যান-ধারণা মনন ও চিন্তন রূপ নেওয়ার সময়—তাকেই আমরা রেনেসাঁর যুগ বলে থাকি। কাজেই দেশভাবনার স্বচ্ছতা তাঁর চরিত্রের সমস্ত দিককে উদ্ভাসিত করতে সাহায্য করেছিল বলেই উপন্যাসের মত নিতান্ত তন্ময় সাহিত্যেও উপন্যাসিকের ব্যক্তিচিন্তার প্রতিফলন পড়েছে অনায়াসে। শুধু বঙ্কিমচন্দ্র কেন, উপন্যাসের প্রাক্-বঙ্কিম যুগটিতে আমরা যে কজন উপন্যাসিককে আবিষ্কার করেছি—খুব আশ্চর্য ব্যাপার বলে মনে হলেও স্বদেশপ্রেমিকতা তাঁদের চরিত্রের অন্যতম প্রধান লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য ছিল, স্বদেশভাবনা তাঁদের রচনার একটি বিষয় বলেই গৃহীত হয়েছিল।

কোনো বিশেষ ধরণের সাহিত্যের জন্মলগ্ন বিচার করার খুব একটা অসুবিধা নেই —কারণ যা ছিল না তার অনস্তিত্বের হেতু বিশ্লেষণ করলে খুব সহজেই তা নির্ণীত হতে পারে। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের আবির্ভাব মুহূর্তটিকেও আমরা সহজেই বিশ্লেষণ করতে পারি। গদ্যের পথ বেয়ে অনায়াস ভঙ্গিতে প্রবন্ধ-রম্যরচনা-ব্যঙ্গ-প্রহসন-নাটিকা ও রীতিমত নাটক যখন বাংলা সাহিত্যের আসর জাঁকিয়ে বসেছে তখন একটি নিবিড় নিটোল গল্প শোনার প্রবৃত্তি যে খুব সহজেই জেগেছিল তা বোঝা যায়। অবশ্য নাটক ছিল.—গল্পাকারে উপদেশাত্মক কাহিনী ছিল, অনুবাদ গল্পও ছিল—কিন্তু সমগ্র জাতির মন খুঁজেছে সম্পূর্ণ অভিনব সাহিত্য, রোম্যান্স নিবিড় একটি জমাট কথাবস্তু,—যার গভীরে একক প্রবেশের বাধা নেই। সেই আকাঙ্ক্ষা থেকেই উপন্যাসের জন্ম। কাহিনীর রসাস্বাদন-উন্মুখ সুরসিক পাঠকরা তাই ভূদেব, হুতোম আর টেকচাঁদকে খুব সহজে আপন করে নিয়েছিল। এঁদের মধ্যে আবার একটু সূক্ষ্মভাগ দেখা যায়। চিন্তাশীল প্রাবন্ধিকের সুচিন্তিত কাহিনীধর্মী রচনাকে সে

১. John Oakesmith, Race and Nationality—An Enquiry into the Origin and Growth of Patriotism, London, 1919, Preface.

যুগের পাঠকরা সভয়ে এড়িয়ে গেছে—আর নিতান্তই আঞ্চলিক ভাষার বৈঠকী ভঙ্গিতে খানিকটা সংলগ্ন প্রায় অসংলগ্ন রচনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে গভীরভাবে। যদিও পূর্বেই বলেছি এ সব রচনার কোনটিকেই যথার্থ উপন্যাস বলা যাবে না। উপন্যাসের যে স্থূল লক্ষণ আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় পেয়েছি—ইতিপূর্বে কোনো রচনাতেই তা সুলভ ছিল না। বোধ হয় অনুবাদ রচনা বলেই 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ের' মত একটি সম্ভাবনাপূর্ণ উপন্যাসের অস্বচ্ছ রূপকে সে যুগের রসিকেরা উপন্যাসের চোখে দেখেনি। আর স্বদেশপ্রেমের যে সহজ ধারাটি সে যুগের সমস্ত লেখকচিত্তকে প্রায় অধিকার করে বসেছিল,—উপন্যাসিকরাও তার হাত থেকে রেহাই পাননি। তাই দেখি জন্মলগ্ন থেকেই বাংলা উপন্যাসে অনেক বিচিত্র বক্তব্য পরিবেশিত হয়েছিল কিন্তু সেই সঙ্গে লেখক চিত্তের দেশানুভূতির একটা তীব্র প্রকাশ অনায়াসে ধরা পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আগে শুধু মাত্র ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের রচনাতেই নয়,—নিতান্ত হাল্কা চালে লেখা অসংলগ্ন কথাবস্তুর মধ্যেও হুতোম কিংবা টেকচাঁদের স্বদেশপ্রেমের স্বতোৎসারিত প্রকাশ দেখি।

বাংলা উপন্যাসকে বয়ঃকনিষ্ঠ বলেছি—কারণ নাটকে-প্রবন্ধে-কাব্যে স্বদেশ ভাবনা যখন একটি সাধারণ ব্যাপার হয়ে গেছে তখনও উপন্যাসের আবির্ভাবই হয়নি। ১৮৫২ সালেই একাধিক পূর্ণাঙ্গ নাটকের জন্ম হয় কিন্তু ভূদেবের উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' গ্রন্থটির প্রকাশকাল তারও চার বছর পরে ১৮৫৬ সালে। 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর সমকালীন রচনা হলেও মাত্র দু'বছর পরে প্যারীচাঁদ সম্পূর্ণ ভিন্ন আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়েই "আলালের ঘরের দুলাল" [১৮৫৮] গ্রন্থটি প্রকাশ করেছিলেন। উপন্যাসে দেশপ্রেমের প্রতিফলন কোথায় কি ভাবে দেখা গেছে তার আবিষ্কার প্রসঙ্গে প্যারীচাঁদের গ্রন্থটির সাহায্য মিলবে না, কারণ দেশহিতৈষী বা সমাজদরদীর কলম থেকে যে সাহিত্য জন্ম নেয়, সেই সাহিত্যে যদি তাঁর স্বদেশভাবনার প্রতিরূপ না থাকে তবে বস্তুসন্ধানী আবিষ্কারকের খুবই অসুবিধায় পড়তে হয়। ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' আমরা শুধু ঘটনা নিবিড় অন্তর্দ্বন্দ্ব-মথিত একটি অনূদিত কথাবস্তুই লাভ করিনি, স্বদেশপ্রেমিক ভূদেবের অন্তরে দেশচিন্তার একটি স্বচ্ছ ধারা প্রবাহিত হতে দেখেছি,—সেটিই আমাদের ঈপ্সিত বস্তু। তাই লেখক প্যারীচাঁদের সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও তাঁর রচিত নক্সাটিতে সমাজের একটি বাস্তব চিত্ররসই আমরা উপভোগ করেছি, কিন্তু ভূদেবের উপন্যাস আমাদের দেশচিন্তার অনুভাবনাটি জাগাতে সাহায্য করেছে। সেযুগের সামাজিক জীবনে ভূদেবের মনীষা ও দেশহিতৈষিতা প্রায় প্রবাদতুল্য সত্য বলেই পরিগণিত হয়েছিল, সেদিক থেকে প্যারীচাঁদ মিত্রের সুনামও বড় কম নয়। সামাজিক

আন্দোলনের সঙ্গে এঁরা ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। বাংলাদেশের আন্দোলন ও প্রগতির ইতিহাসে এঁরা স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব। দেশভাবনায় আন্দোলিত হতে পেরেছিলেন বলেই নানা কর্মে ও চিন্তায় এঁরা অনলস দেশপ্রেমিকতার পরিচয় দিয়ে গেছেন। "আলালের ঘরের দুলালে"—শুধু উপন্যাসের গুণই নেই,—সেযুগের গল্প বলার ভাষাটি ঠিক কেমন হওয়া উচিত তা নিয়েও গভীর চিন্তা করেছিলেন লেখক। কথ্য গদ্যের সাহায্য না নিলে আমাদের দৈনন্দিন জীবন-যাপনের কাহিনী পরিবেশন করা সম্ভব নয়, এ ধারণা থেকেই প্যারীচাঁদ কথ্য গদ্যসংলাপের আশ্রয় নিয়েছিলেন। ভূদেব-বঙ্কিম-রমেশচন্দ্রেরও বহু পরে দৈনন্দিন জীবনের ভাষায়ই উপন্যাসের কথাবস্তু পরিবেশন করার তাগিদ লাভ করেছি আমরা। বর্তমানে উপন্যাসের ভাষা কেমন হবে এ নিয়ে আমাদের আর কোন দ্বিধা নেই, প্যারীচাঁদের যুগে তা একটা প্রশ্নময় সমস্যা ছিল বৈকি? "আলালের ঘরের দুলালের" প্রত্যক্ষ আবেদন যাই হোক না কেন এর পরোক্ষ বক্তব্যটি স্বজাতিচিন্তা ও স্বসমাজচিন্তারই ফলাফল মাত্র। বাবুরামের পুত্র মতিলালের চরিত্রটি জীবন্ত করে উপন্যাসে তুলে ধরে লেখক বোধ হয় সমাজের চোখে আঙুল দিয়ে শিক্ষা ও অজ্ঞতার ভয়াবহতা বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। এই চেষ্টার মূলে লেখকের গভীর সমাজদরদ প্রকাশ পেয়েছে বলেই ধারণা করি। দেশপ্রেমের অস্ফুট রূপ সমাজচিন্তার পথ বেয়ে কিভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, রামনারায়ণ তর্করত্নের নাটক প্রসঙ্গে সে আলোচনা আমরা করেছি কিংবা ঈশ্বরগুপ্তের সমাজচিন্তাজাত কবিতাগুচ্ছের বিস্তৃত আলোচনা থেকেও পরোক্ষ দেশপ্রেমের স্বরূপ আবিষ্কার করেছি। উপন্যাসের সম্ভাবনা যখন ঘনীভূত হতে চলেছে সেই লগ্নে উপন্যাসেও দেশপ্রেম কিভাবে অস্বচ্ছ ও অস্পষ্টাকারে ব্যক্ত হোত, 'আলালের ঘরের দুলাল' তারই দৃষ্টান্ত। প্যারীচাঁদের সাহিত্যকীর্তির মূল্যায়ন-প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লেখক-এর এই উদ্দেশ্যকেই অভিনন্দন জানিয়েছেন। বক্তব্যে প্রকাশিত না হলেও উদ্দেশ্যে যা আভাসিত হয়েছিল তাঁর যথোচিত মূল্য স্বীকার করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন,—

"তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, সাহিত্যের প্রকৃত উপাদান আমাদের ঘরেই আছে—তাহার জন্য ইংরাজী বা সংস্কৃতের কাছে ভিক্ষা চাহিতে হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেনযে, যেমন জীবনে তেমনিই সাহিত্যে, ঘরের সামগ্রী যত সুন্দর, পরের সামগ্রী তত সুন্দর বোধ হয় না। তিনিই প্রথম দেখাইলেন যে, যদি সাহিত্যের দ্বারা বাংলা দেশকে উন্নত করিতে হয়, তবে বাঙ্গলা দেশের কথা লইয়াই সাহিত্য গড়িতে হইবে। প্রকৃত পক্ষে আমাদের জাতীয় সাহিত্যের আদি "আলালের ঘরের দুলাল"।[২]

২. বাংলা সাহিত্যে ৺প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিম রচনাবলী। সমগ্র সাহিত্য ২য় খণ্ড। সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা।

এই উচ্চ প্রশংসা স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বসূরীদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধেরই ফল। গঠন পর্বের কিছু ত্রুটি ও অসম্পূর্ণতাকে স্বীকার করে সত্যিকারের গৌরবটুকু অর্পণ করার রীতিটিই বঙ্কিমচন্দ্র প্রয়োগ করেছেন এ ধরণের সমালোচনায়। কাজেই প্যারীচাঁদ আদি কথাসাহিত্যের উদ্ভাবক বলেই নন, উপন্যাসে সমাজচিন্তাকেই বড়ো করে স্থান দিতে পেরেছিলেন বলেই তাঁর কথা বিশেষভাবে স্মরণ করা দরকার। সমাজ ও সাহিত্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকার করে বাংলাদেশের ঘরোয়া কাহিনী একসূত্রে গেঁথেছিলেন বলেই প্রথমযুগের ঔপন্যাসিকদেব মধ্যে তাঁকে বিশেষ স্থান দেওয়া সঙ্গত হয়েছে। তাছাড়া সমগ্র জীবনের নানাকর্মে তিনি দেশহিতৈষিতার প্রমাণ রেখেছেন নানাভাবে। বহু সভাসমিতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে আজীবন দেশের সেবা করে গেছেন তিনি। কর্মে ও জ্ঞানে যিনি দেশপ্রেমী তাঁর অমূল্যকীর্তি হিসেবে এই একটি মাত্র রচনাকেই স্মরণ করে প্যারীচাঁদকে সাহিত্যরসিকরা মনে রেখেছেন, এ ত সত্য কথা। জনপ্রিয়তায় তিনি সেযুগে অনেকেরই শীর্ষে ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে Hindoo Patriot' যে কথা বলেছিলেন তাও লক্ষ্যণীয়,—

"In him the country loses a literary veteran, a devoted worker, a distinguished author a clever wit, an earnest patriot, and an enthusiastic spiritual enquirer."[৩]

স্বদেশপ্রেমী প্যারীচাঁদের স্বদেশপ্রেম শুধুমাত্র তাঁর নক্সা রচনাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না—তাই জীবনের নানাক্ষেত্রে তিনি তাঁর দেশসেবার চিহ্ন রেখেছেন।

ভূদেবের কিছুকাল পরে সাহিত্যিক প্যারীচাঁদের আবির্ভাব হলেও আলোচনার দিক থেকে তাঁকে অগ্রাধিকার দেবার একটু হেতু আছে। বাংলা সাহিত্যের আদি উপন্যাসকার হিসেবে টেকচাঁদ ও ভূদেব মুখোপাধ্যায়-এর নামোল্লেখ করা হয়ে থাকে। কিন্তু একই সঙ্গে একই প্রসঙ্গে দুটি নাম উচ্চারণে কিছু বাধা আছে। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের "ঐতিহাসিক উপন্যাস" তাঁর মৌলিক রচনা নয়, কাহিনী তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। কিন্তু 'আলালের ঘরের দুলালের' কাহিনী প্যারীচাঁদের নিজস্ব উদ্ভাবন। 'আলালের ঘরের দুলালে' যে চরিত্র সম্ভার সাজিয়েছিলেন তাতে উপন্যাসের বৈচিত্র্য অনেক বেশী পরিমাণে রয়েছে, বাবুরামের সংসারটিই প্রধানতঃ আলোচনায় স্থান পেয়েছে। এর একটা পৃথক গৌরব আছে। রচনারীতির উচ্চাঙ্গ গুণ হয়ত নেই—কিন্তু মৌলিকতায়,—উদ্দেশ্যের আন্তরিকতায় এ গ্রন্থের রচয়িতা প্যারীচাঁদই বোধ হয় অগ্রাধিকার পাবেন। অবশ্য ভূদেব

৩. সাহিত্য সাধক চরিতমালা। ২য় খণ্ড। প্যারীচাঁদ মিত্র থেকে উদ্ধৃত।

মুখোপাধ্যায়ের সহজ প্রবণতা ছিল দুটি সুন্দর নিটোল কাহিনীর সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। কণ্টারের 'রোমান্স অব হিস্টরি' পড়েও অনেকেই আনন্দ পেতে পারেন,—ভাষান্তরিত করে ভূদেব তা সহজতর উপায়ে বহুজনের উপভোগ্য করে তুললেন। Rev. Hobart Caunter-এর Romance of History' গ্রন্থটি তিনটি খণ্ডে লেখা মনোরম ইতিহাস কাহিনী। কণ্টার এখানে ইতিবৃত্তকে কাজে লাগিয়েছেন কিন্তু গল্পরস পরিবেশন করেছেন মুখ্যভাবে। তিনটি খণ্ডে ভারত ইতিহাসের চমকপ্রদ ও মনোহর কাহিনীগুলো তিনি সাজিয়েছেন। ভূদেব প্রথম খণ্ডের প্রথম কাহিনী ও তৃতীয় খণ্ডের সর্বশেষ কাহিনীটির বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। সুতরাং রচনাগুণে তা যতই সম্ভাবনাপূর্ণ হোক না কেন ভূদেব এখানে মৌলিকত্বার দাবী করতে পারেন না। সম্ভবতঃ ভূদেব তা জানতেন বলেই মৌলিক কাহিনী হিসেবে পৃথক কোন পরিচয়ই দেননি। তবে অনুবাদকের সহজ শক্তি দেখে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে ইচ্ছে করলে মৌলিক কাহিনী রচনা করেও ভূদেব বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখার সাড়ম্বর দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে পারতেন। যে রচনা অনুবাদ হলেও লেখকের আত্মদর্শন ও জীবনদর্শনের বাণী সুষ্ঠুভাবে তুলে ধরেছে তাতেই ভূদেবের যথার্থ স্বকীয়তার পরিচয় মেলে। উপন্যাস রচনা করার একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এ কাজে হাত দেননি। অথচ 'আলালের ঘরের দুলাল' প্যারীচাঁদ মিত্রের বিশেষ গবেষণার ফল বলতে হবে।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রাথমিক পরিচয় প্রাবন্ধিক হিসেবেই। অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও সুতীব্র চিন্তাশক্তি নিয়ে ভূদেব মুখোপাধ্যায় সে যুগের বিদগ্ধ সমাজে আপন ক্ষমতায় স্থান লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। প্রবন্ধ রচনায় ভূদেবপ্রতিভার বিস্ময়কর রূপ ধরা পড়েছে,—যথাসময়ে তা আলোচিত হয়েছে। স্বদেশচিন্তার যে প্রখর অনুভূতি,—স্বাজাত্যাভিমানের যে নিরহঙ্কার দর্প তাঁর রচনার গৌরব প্রবন্ধেই তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। কিন্তু যিনি প্রাবন্ধিক তিনিই যখন কথাকার—একই অখণ্ড প্রতিভার দুটি রূপেই প্রবন্ধ ও উপন্যাসের জন্ম। তা ছাড়া রচনাকালের দিক থেকে আরও একটি বিষয় চোখে পড়ে। একই সময়ে প্রবন্ধ ও উপন্যাস তিনি রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলোর জন্ম হয়েছে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের পরিণত বয়সে। [১৮৫৬-৫৭] খ্রীষ্টাব্দে 'ঐতিহাসিক উপন্যাসের' সমসাময়িক রচনা হিসেবে ছাত্রপাঠ্য প্রবন্ধপুস্তক ও পুরাবৃত্তসার [১৮৫৮]-এর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রবন্ধ তাঁর স্বভাবজ সৃষ্টি ; তার মাঝখানে "ঐতিহাসিক উপন্যাস" ভূদেবের রচনাবৈচিত্র্যের সাক্ষ্য দেয় মাত্র। অথচ বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের অভাব থাকা সত্ত্বেও ভূদেব মুখোপাধ্যায় দ্বিতীয় কোন উপন্যাস রচনা করেননি কেন সেটাই আশ্চর্য। প্রাবন্ধিক হিসেবেই

তাঁর অসামান্য প্রতিষ্ঠা অথচ ঔপন্যাসিকের অনুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টি তাঁর একটি মাত্র গ্রন্থেই পরিস্ফুট। চিন্তাশীলতা ঘনীভূত রূপে প্রবীণ লেখকের প্রবন্ধে প্রকাশিত হয়েছে,—কিন্তু ঐতিহাসিক উপন্যাসের রচনাকার ভূদেব পূর্ণযৌবনে ঐতিহাসিক চরিত্রগুলোর হৃদয় বেদনা, প্রেম-ভালবাসা, প্রাপ্তি ও ত্যাগের নিগূঢ় রহস্য নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, উপন্যাসের বিষয় হিসেবে যে ঘটনা তিনি বেছে নিয়েছিলেন তাতেও যথেষ্ট সূক্ষ্মদর্শিতার পরিচয় মেলে। আপাততঃ সে বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনার অবসর না থাকায় আমরা উক্ত উপন্যাস দুটির মধ্যে স্বদেশপ্রাণ ভূদেবের দেশপ্রীতি কি ভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ধরা পড়েছিল সে বিষয়ে আলোচনা করব।

ইয়ং বেঙ্গলের কর্ণধার মধুসূদনের পাঠ্যসঙ্গী ভূদেবের জীবনরীতির ভিন্নতা, আদর্শগত নিষ্ঠা থেকে সে যুগের পূর্ণচিত্রটি হৃদয়ঙ্গম করা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে। ইংরাজের সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ থাকার অর্থই যে স্বকীয়তা বিসর্জন নয়—এ সত্য ভূদেব মুখোপাধ্যায় জন্মগত সূত্রে লাভ করেছিলেন,—পারিবারিক ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা না হারিয়েও পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে এতটুকু অসুবিধা হয়নি তাঁর। এই জীবনবোধ—স্বধর্ম ও স্বসমাজনিষ্ঠা ভূদেব চরিত্রের মূলধন। নানা পরিস্থিতির মধ্যে এই দৃঢ়নিষ্ঠা ও জলন্ত স্বাদেশিকতা কেবল বৃদ্ধিই পেয়েছে বলতে হবে। যে চরিত্রের গভীর তলদেশে শুধু এই বিশ্বাস ও আত্মবোধই প্রবল তার রচনায় সেই সুরটিই যে মুখ্য হয়ে উঠবে তা ত স্বাভাবিকই। ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সম্পর্কে যে কোন আলোচনার সূত্র হিসেবে তাঁর ব্যক্তি চরিত্রের এই মহত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে। চিন্তায়-কর্মে-ধ্যানে-মননে তিনি সে যুগের একটি দেশভক্ত সন্তান। এই দেশভক্তির রূপ শুধু মাত্র তাঁর রচনায় বা সৃজনেই প্রতিফলিত নয়—তাঁর জীবনধারার পরিমণ্ডলটিতে এই অনুভাবনা ছড়িয়ে আছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে সেই অন্তর্নিহিত শক্তির স্ফুরণ ঘটেছে মাত্র। তিনি নূতন উদ্যমে স্বসমাজের ও স্বদেশের উন্নতির দিশারী হয়েছেন। তাঁর সম্বন্ধে যে কোন আলোচনায় তাঁর গভীর ও নিষ্ঠাপূর্ণ দেশচর্চার প্রসঙ্গটি আসে সবার আগে। কোন সমালোচক বলেছেন,

ভূদেব প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক, স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির উন্নতি সাধনে প্রকৃত চিন্তাশীল। এজন্য ভূদেব ধীরে ধীরে সেই মহিমান্বিত মহাজাতির অবলম্বনীয় কর্তব্য পথ নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন।.....

কেহ কেহ তাঁহার প্রদর্শিত যুক্তির অনুমোদন না করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধি, লিপিক্ষমতা, বিচারপটুতা এবং তাঁহার হৃদয়ের সাধুভাবের বোধ হয়, কেহই

অনাদর করিবেন না। জ্ঞান গভীরতায়, স্বজাতি হিতৈষণায় তিনি চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন।[৪]

'ঐতিহাসিক উপন্যাস' রচনার কোনো সত্যিকারের ভূমিকা নেই, নেই কোন পূর্ব প্রস্তুতির ইতিহাস। বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের অভাব মোচনের উদ্দেশ্য হয়ত লেখকের ছিল কিন্তু কোথাও এ নিয়ে এমন কোন প্রসঙ্গ লেখক আলোচনা করেননি। তবে ইতিহাসপ্রীতিই যে উক্ত উপন্যাসদ্বয়ের সূচনা করেছিল এতে সন্দেহমাত্র নেই। কোনো সমালোচকের মতে,

"ইতিহাসের প্রতি এই প্রীতিপক্ষপাত ছিল বলেই ভূদেব যখন গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হলেন তখন কাহিনীর জন্য ইতিহাসের দ্বারস্থ হয়েছিলেন।"[৫]

ভূদেব যে সময়ে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছেন সে যুগের শিক্ষিত বাঙ্গালী ভারত ইতিহাসের উজ্জ্বল অধ্যায়ের আলোচনায় গভীরভাবে মনোনিবেশ করেছিলেন। অতীতচর্চার সানুরাগ লক্ষণটি অবশ্য পাশ্চাত্ত্য শিক্ষারই ফলে ঘটেছিল। অতীতকে না জেনে বর্তমানে বাস করার চেষ্টা শিক্ষিত মনকে পীড়া দিয়েছিল। ইতিহাসবিহীন জীবনযাপনে কোন অসুবিধাই এককালে ছিল না। কিন্তু উনবিংশ-বিংশ শতকের শিক্ষিত বাঙ্গালীই প্রথম ইতিহাস অনুরাগের পরিচয় দিয়েছিল। জাতীয় জাগরণের মুহূর্তে ইতিহাসই ত একমাত্র দলিল—সেই প্রামাণ্য বক্তব্যটুকু কণ্ঠাগ্রে না থাকলে জনমানসের অভ্যন্তরে পৌঁছোনো যাবে না। এই সময়ের কিছু আগে রাজস্থানের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাস অবলম্বনে টডের 'রাজস্থান' প্রকাশিত ও শিক্ষিত বাঙ্গালীর হাতে এসেছিল। তিন খণ্ডে লেখা কণ্টারের 'রোমানস অফ হিস্টরিও' সাদরে গৃহীত হলো। বিদেশী রচিত এ দুটি গ্রন্থ চিন্তাশীল বাঙ্গালীসমাজ কিভাবে গ্রহণ করেছিলেন তার অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। তাই বাঙ্গালীর আত্মজাগরণের পরোক্ষ উপাদান হিসেবে এ গ্রন্থ দুটিকে বিশেষ মর্যাদা দিতে হয়। নিছক ইতিহাস বর্ণনাই গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য কিন্তু সেই ইতিহাসের অন্তর্নিহিত বক্তব্যটি যে অত্যন্ত সময়োচিত ও যুগধর্মী তা লেখক জানতেন। ইতিহাসের শিক্ষাকে জাতির জীবনে আরোপ করার সূক্ষ্ম উদ্দেশ্যটি আছে বলেই নিছক উপন্যাস হিসেবে বা ঐতিহাসিক কাহিনী হিসেবে বিচার না করে ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জীবনাদর্শের প্রতীক হিসেবে এ রচনাকে গণ্য করতে হবে। প্রথম কাহিনীটি সম্পর্কেও এ কথা বিশেষভাবে মনে হয় যে, ধর্মলিপ্সু, নীতিবাদী ও ভগবদবিশ্বাসী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের আন্তর পরিচয় গল্পটিতে যেন ফুটে উঠেছে। দ্বিতীয় কাহিনী সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য আরও প্রসারিত। প্রথম

৪. রজনীকান্ত গুপ্ত, প্রতিভা ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা, ১৮৯৬।

৫ বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, ১৯৬৩।

কাহিনীটি কণ্টারের 'The Traveller's Dream' অবলম্বনে রচিত, নামকরণেও ভূদেব স্বকীয়ত্ব বজায় রেখেছেন ;—পথিকের স্বপ্ন কি ভাবে সফল স্বপ্ন-এ রূপান্তরিত হয়েছে শুধু তার কারণ তিনি নির্দেশ করেছেন গল্পটিতে। ফলে ঐতিহাসিক বিবরণ ও উপন্যাসিকের মন্তব্য যুক্তভাবে গল্পটিতে পরিবেশিত হয়েছে। অনুল্লেখ্য রচনা হিসেবে বিবেচিত হলেও এ রচনায় লেখকের ব্যক্তিসত্তার প্রতিফলন পুরোমাত্রায় আছে। ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক অবশ্য আগেই সচেতন করে দিয়েছেন সে বিষয়ে—

"গল্পচ্ছলে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকৃত বিবরণ এবং হিতোপদেশ শিক্ষা হয় ইহাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য।"[৬] নীতিশিক্ষার বিষয় হিসেবে তিনি যে চরিত্রটি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন তার ভিত্তি যেমন ঐতিহাসিক তেমনি অবিশ্বাস্য হলেও বাস্তব। সুতরাং ধর্মপ্রাণতা—সদাশয়তার সাফল্য যে মানুষের জীবনে দেখা গেছে ভূদেব সে চরিত্রটি আমাদের সামনে এনেছেন। সম্ভবতঃ ধর্মাত্মা লেখক ধর্মাত্মা পথিকের চিত্রাঙ্কন করে আনন্দ পেয়েছিলেন। পথিকের চরিত্রে যথেষ্ট দৃঢ়তা ও সত্যনিষ্ঠা দেখা যায়,—তাছাড়া বীরোচিত গুণ ও আত্মবিশ্বাস চরিত্রটির মর্যাদা বাড়িয়েছে। দস্যুধৃত পথিক বিক্রীত হয়েছে হস্তান্তরের জন্য। দাসক্রেতা অর্থের বিনিময়ে বিক্রয় করার প্রসঙ্গে পথিককে প্রশ্ন করেছিল,—

"তুই স্বাধীন হইতে চাহিস কি না?

দাস উত্তর দিয়েছে—"স্বাধীনতা প্রাণীমাত্রের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু, কেহ কাহাকে এই ধনে বঞ্চিত করিতে পারে না, আমিও সেই নিজস্ব অর্থ দ্বারা ক্রয় করিতে সম্মত নহি —তাদৃশ অধার্মিক জনের প্রবঞ্চনাতেই দুষ্ট লোকে দস্যুবৃত্তিতে প্রবৃত্ত হয় এবং দুর্ভাগ্য জনের স্বাধীনতা অপহরণ করে।" [সফল স্বপ্ন]

"স্বাধীনতা প্রাণীমাত্রের স্বতঃসিদ্ধ বস্তু"—পরাধীন দেশের অভ্যস্ত পরিবেশেও ভূদেব এ স্বতঃসিদ্ধ সত্যটি ভোলেন নি। অবশ্য মূল গল্পটিতে কণ্টার ঠিক এই ভাষায় ও ভঙ্গীতে বিষয়টির অবতারণা করেছিলেন। কণ্টারে আছে,—

Would you not be glad to enjoy your freedom? "I am not disposed to buy what is the blessed boon of Heaven, and of this you have no more right to deprive me than I have to cut your throat, which you well deserve, for being the encourager of knaves and supporter of brigands".[৭]

---

৬. ভূদেব রচনাসম্ভার, প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, ১৩৬৪।

৭. Rev. Hobart Caunter—Romance of History (Vol-I), The Traveller's Dream, Calcutta, 1836.

ভূদেব-এর অনুবাদে এ বিষয়বস্তুটি যথাযথভাবে প্রতিফলিত হয়েছে,—মূল সুরটি ধ্বনিত হয়েছে অবিকৃতভাবে। সবক্তাগীনের "ধর্মাপরায়ণতা, জিতেন্দ্রিয়তা, নিরালস্য এবং স্বামীবাৎসল্যের" প্রতিদানই লেখক চিত্রিত করেননি,—স্বাধীনতালিপ্সু ও দৃঢ়চেতা একটি সার্থক মানুষের সাফল্যের কাহিনী শুনিয়েছেন।

দ্বিতীয় উপন্যাসটি ভূদেবপ্রতিভার একটি বিস্তৃত পরিচয় ব্যক্ত করে। প্রথম কাহিনী রচনায় ব্যক্তি ভূদেব এত বেশী প্রকট হয়ে আছেন যে বর্ণনার বিষয় বক্তার অস্তিত্বকে মুছে ফেলার সুযোগ দেয়নি। নিঃসন্দেহে এ ত্রুটি অমার্জনীয়। কিন্তু দ্বিতীয় রচনায় এ ত্রুটি চোখে পড়ে না। প্রথমতঃ এ রচনাটিতে কাহিনীগত জটিলতা বেশী, অন্তর্দ্বন্দ্বের বিশ্লেষণে লেখক অত্যন্ত নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন অথচ কোথাও আত্মপ্রকাশের চেষ্টামাত্র করেননি। পাত্রপাত্রীর হৃদয়বেদনার উত্তাল সমুদ্রে তাঁকে ডুবতে দেখেছি, ভাসতে দেখিনি ;—ভাসমান চরিত্র হিসেবে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন স্বয়ং নায়ক নায়িকা।

এ কাহিনীও কণ্টার রচিত 'The Mahratta Chief'-এর লেখক রচিত সংস্করণ হয়েছে—'অঙ্গুরীয় বিনিময়'। বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' সত্যিই স্থান দাবী করতে পারে এবং যুক্তি দিয়েও তা প্রমাণিত হতে পারে অনায়াসে। তবে পূর্বেই বলেছি—কাহিনীগত মৌলিকত্ব সৃষ্টির মূল দাবীটাই প্রথমে অগ্রাহ্য হবে।

এ কাহিনীতে রচনাশিল্পী ও কথাসাহিত্যিক ভূদেবের আত্মপ্রকাশ যেমন স্বচ্ছন্দ, দেশপ্রেমিক ভূদেবের আবির্ভাবও তেমনি অনায়াস। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ের' কাহিনী রচনায়ও ভূদেবের ব্যক্তিসত্তার স্বপ্ন ও আদর্শের সার্থক প্রতিফলন রয়েছে। কাহিনী ও ঘটনা, চরিত্র ও পরিবেশের সঙ্গে ঐক্যতান সৃষ্টি করে তা একটি সার্থকতর দৃষ্টান্ত সৃজন করেছে।

দেশপ্রেমিকতা ভূদেবের চরিত্রে আরোপিত কোন গুণ নয়, সহজাত। তাই যে কোন রচনায় দেশচিন্তা এমন স্বচ্ছন্দভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পেরেছিল। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর কাহিনী নির্বাচনে ভূদেবের একটি বিশেষ প্রবণতা লক্ষ্য করি। উনবিংশ শতাব্দীর জাগরণলগ্নে স্বদেশপ্রেমের মন্ত্রোচ্চারণে কবি ও নাট্যকার, প্রাবন্ধিক ও লেখক যখন উচ্চকণ্ঠ, দেশপ্রাণ ভূদেব তাঁর নবতর সৃষ্টিতেও সেই আকাঙ্ক্ষিত বাণীটুকুই প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। সমগ্র ভূদেবসাহিত্য আলোচনাতেও এ সত্যটি প্রমাণিত হবে। দেশপ্রেমের উদ্দীপনায় [১৮৫৮ খৃঃ] রঙ্গলাল যখন 'পদ্মিনী উপাখ্যান' রচনা করে বীরযুগের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন তার ঠিক পূর্বমুহূর্তে স্বাধীনচেতা শিবাজীকে নায়করূপে কল্পনা করে ভূদেব 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' রচনা করলেন। অবশ্য

এতে প্রমাণিত হয় না যে একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একই সময়ে একই ভাবাদর্শের বাণীরূপ দিয়েছেন। জাতীয়তাবোধের জোয়ার এমনি করে সূক্ষ্ম রসিকদের মনপ্রাণ অধিকার করে থাকে। সেযুগের মনীষীরা নানা উপায়ে দেশভাবনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন স্বতঃপ্রণোদিত হয়েই। মধুসূদনের উচ্ছ্বসিত দেশানুরাগের জন্য তিনি সমসাময়িকদের কাছে ঋণী একথা প্রমাণ করা কঠিন। প্রায় একই যুগে মধুসূদন, রঙ্গলাল, ভূদেব-এর আবির্ভাব, অথচ প্রত্যেকেই স্বকীয় মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের সৃষ্টিতে।

টডের 'রাজস্থান' থেকেই রঙ্গলাল 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' প্রেরণা পেয়েছিলেন,—ভূদেব তার সাহায্য নেননি। কিন্তু ইংরেজ লেখকের রচনা থেকেই ভূদেব যে স্বদেশ-প্রেমের উপাদান খুঁজে পেয়েছিলেন তা ত অস্বীকার করা যাবে না। 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' মারাঠাবীরের হৃদয়দানের আলেখ্যও বটে, আবার তাঁর বীরত্ব-স্বদেশপ্রেম-দৃঢ়চিত্ততার ইতিহাস বলেও গণ্য করা চলে একে। ভূদেব গল্পরসিক পাঠককে গল্প শুনিয়েছেন, ঐতিহাসিক উপাদান আরোপ করেছেন ইতিহাসপ্রিয় পাঠকের জন্য আর দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত আবেগে যাঁরা আন্দোলিত—মারাঠাবীর শিবাজীর চরিতোপাখ্যান বর্ণনা করে তাঁদের উৎসাহিত করেছেন। যুগোপযোগী আবেদনে পূর্ণ এই কাহিনীটির অপরিসীম মূল্য এদিক থেকে রয়েছে। ভূদেবের চিন্তাধারার আন্তরিকতার প্রশংসা করেছেন সমালোচকগণ। "ঐতিহাসিক উপন্যাস" রচনায় এই আন্তরিকতা ও গভীর জীবনাদর্শের প্রতিফলন খুব স্পষ্ট। স্বদেশচিন্তায় নিমগ্ন লেখক এই রোমান্সনিবিড় কাহিনীটির মধ্যেও দেশপ্রেমিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

প্রথমতঃ কাহিনীর নায়ক হিসেবে তিনি ভারত ইতিহাসের সংগ্রামী নায়ক শিবাজীকে নির্বাচন করেছেন। শিবাজীর শৌর্যবীর্য, বীরত্ব ও স্বাদেশিকতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উপন্যাসাকারে পরিবেশন করে তিনি যে স্বাধীন চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন সমসাময়িক কোন লেখকের রচনায় তা নেই। শিবাজী যুগ যুগ ধরে দেশবন্দিত গণনায়ক বলে বর্ণিত,—কিন্তু তাঁর কীর্তি কাহিনীকে বাঙ্গালীর সামনে উজ্জ্বলরূপে তুলে ধরার প্রথম চেষ্টা দেখি 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে'। শিবাজীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, নেতৃত্ব, দেশাদর্শের জন্য আমরণ সংগ্রামের চিত্র স্বল্পায়তনেও লেখক যথাসাধ্য চিত্রিত করেছেন অথচ শিবাজীর ব্যক্তি হৃদয়ের সুগভীর দ্বন্দ্বচিত্রটিও উপেক্ষিত হয়নি। কাহিনীর সৌন্দর্য ও আকর্ষণ বৃদ্ধি করেছেন অন্তর্দ্বন্দ্বের সুনিপুণ অধ্যায়টি রচনা করে।

'অঙ্গুরীয় বিনিময়'-এর সাহিত্যকীর্তির মূল্যায়ন আমাদের উদ্দেশ্য নয়, কিন্তু কাহিনীকার ভূদেবের ক্ষমতার পূর্ণ প্রকাশ হয়েছে এ রচনায়। বাদশাহপুত্রীর

অবরোধ-এর মতো একটি কৌতূহলজনক ঘটনা দিয়ে কথারম্ভ হয়েছে—নেপথ্য নায়কের কৌশলের পরিচয় দিয়ে ভূদেব আমাদের আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু এই নেপথ্য নায়ক যখন প্রথম আমাদের সামনে এলেন ভূদেবের চাতুর্যপূর্ণ বর্ণনা পড়ে আমরা মুগ্ধ হই।

"এমন সময়ে হঠাৎ সেই গৃহদ্বার উন্মুক্ত করিয়া অদৃষ্টপূর্ব ব্যক্তিবিশেষ তাঁহার সম্মুখীন হইলেন। তাঁহার অনতিদীর্ঘচ্ছন্দ, প্রশস্ত ললাট এবং বক্ষ, বিশাল গ্রীবা এবং আজানুলম্বিত ভুজ প্রভৃতি সমুদয় বীর লক্ষণাক্রান্ত শরীর এবং সুন্দর ও সহাস্য মুখমণ্ডল, একাধারেই বীরত্ব এবং কমনীয়ত্ব গুণের প্রকাশ করিতেছিল। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয়ের জ্যোতিঃ অতি তীব্র, বোধ হয় যেন তদ্দৃষ্টি সমুদায় প্রতিবন্ধক ভেদ করিয়া সকল বস্তুরই অভ্যন্তরে প্রবেশ করণে সক্ষম।...ঐ আগন্তুক ব্যক্তির অক্ষিদ্বয় দেখিলেই অতি প্রখর বুদ্ধি এবং তেজস্বী স্বভাব অনুমান হইত।"—কাহিনীর নায়ক শিবাজীর রূপবর্ণনায় ভূদেব সম্পূর্ণ নিজস্বভঙ্গীই আরোপ করেছিলেন, স্বাধীনতাযুদ্ধের নায়ক শিবাজীর রূপ বর্ণনায় লেখক যেন ধ্যানতন্ময়তা প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

বাদশাহ ঔরংজীবের কন্যা অপহরণকালেও সদর্প আত্মঘোষণায় শিবাজী পরিচয় দিয়েছেন,—"আমি দস্যুবৃত্তি নহি। আমি এই পার্বতীয় দেশের স্বাধীন রাজা·· তৈমুরলঙ্গ প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তি দিগ্বিজয় করিয়া দিগন্তবিশ্রুত নাম হইয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশে জন্ম অপেক্ষা যিনি তাঁহাদিগের ন্যায় স্বয়ং সাম্রাজ্য সংস্থাপনে প্রবৃত্ত এবং সক্ষম, তিনি কি সহস্রগুণে প্রধান নহেন; আমি এই পর্বতোপরিস্থ প্রস্রবণ সদৃশ হইয়াছি, আমার মহারাষ্ট্র সেনা বেগবান নির্ঝরতুল্য হইয়া সমুদায় উপত্যকা আক্রমণ করিয়াছে, এবং অচিরকাল মধ্যে তৎকর্তৃক তাবৎ ভারতরাজ্য প্লাবিত হইবে। আমাকে তাবৎকাল জীবদ্দশায় থাকিতে হইবে না, কিন্তু আমি সেইদিন অদূরে দেখিতেছি, যখন মৎপ্রতিষ্ঠিত সিংহাসনোপবিষ্ট রাজগণ দিল্লীর রাজকোষ হইতেও করাকর্ষণ করিবে।" এই অংশের উদ্দীপনাময়ী ভাষা শিবাজীর ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক হয়েছে ভূদেবের রচনাগুণে। এখানে মূল রচনা থেকে শুধু ভাবানুবাদ না করে ভূদেব খানিকটা স্বাধীনতা অবলম্বন করেছিলেন। মূলানুগত্য প্রদর্শন করলে এ অংশটি এমন আবেদনশীল হতে পারত না। ভূদেবের দৃষ্টি ছিল শিবাজীর চরিত্রমহিমার দিকে,—যত বাস্তব করে তা চিত্রিত করা সম্ভব তিনি তা করেছিলেন। মূল রচনায় এ অংশটি খুবই গতানুগতিক। শিবাজী আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে বলছেন,—

"You mistake, lady; I am a sovereign in these mountain solitudes and all monarchs are equal in moral rights. The name of Sevajee

will be heard of among the heads of nations ; for who so renowned as the founders of kingdoms ?"

["The Mahratta Chief"—Romance of History.]

প্রণয়মুগ্ধ শিবাজীর আত্মবিবরণের প্রতিটি ছত্রে ভারত ইতিহাসের তেজস্বী মহানায়ক শিবাজী বারংবার আত্মপ্রকাশ করেছেন। তাঁর আত্মবিবরণের কোথাও উচ্ছ্বাস নেই—অহমিকা নেই—কিন্তু আদর্শনিষ্ঠার ও দৃঢ় প্রত্যয়ের গাম্ভীর্য আছে। শিবাজীর স্বপ্ন ও আকাঙ্ক্ষা যে ভবিষ্যতের ছবি কল্পনা করেছে অকপটে প্রথম সম্ভাষণ মুহূর্তেই শিবাজী রোসিনারার কাছে তা ব্যক্ত করেছেন। কারণ এতে কোন সংশয় নেই তাঁর চিত্তে। দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সামান্য এক স্বাধীন পার্বত্যনেতা সোচ্চারে তাঁর নিষ্ঠা ও সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেছেন। শিবাজীর মুখে এর চেয়ে সার্থক আত্মপরিচয় আর কি হতে পারে ? ভূদেবও ধ্যানতন্ময় শিল্পী,—তিনি মুগ্ধচিত্তে ভারত ইতিহাসের তেজস্বী নায়ক শিবাজীকে চিত্রিত করেছেন।

শিবাজীও রোসিনারার পারস্পরিক আকর্ষণের সেতুরচনার উদ্দেশ্যে শিবাজীকে আরও উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করেছেন লেখক। রোসিনারার প্রণয়মুগ্ধ সৈন্যাধ্যক্ষকে দ্বৈতসংগ্রামে আহ্বান করে শিবাজী শক্তি ও প্রেমের পরিচয় দান করেছেন। উপন্যাসের জটিলতা সৃষ্টির দিক থেকেও এ অংশটি বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। মৃতপ্রায় সৈন্যাধ্যক্ষের বিশ্বাসঘাতকতার সূত্র ধরে ঘটনাটি সহজ ভাবে এগিয়ে গেছে। মুসলমান সৈন্যদলে যোগদান করে শিবাজীর বিপক্ষতার চেষ্টা করার মুহূর্তে লেখক মারাঠাজাতির ইতিহাস বিশ্লেষণ করেছেন নিপুণভাবে। মারাঠা সৈন্যদের আত্ম-জাগরণের কারণ নির্ণয়ে ভূদেব নিপুণ বিশ্লেষণীশক্তির পরিচয় দিয়েছেন,—

"...সকল জাতিরই অভ্যুদয়কালে তত্তৎজাতীয় জনগণের ধর্মবুদ্ধি প্রবল হয়। এমন কি, সেই জাতীয় অতি নিকৃষ্ট—তামস-প্রকৃতি জনের মনেও কিঞ্চিৎ তেজস্বিতা প্রতীয়মান হইয়া থাকে। শিবাজীর সময়ে মহারাষ্ট্র দিগেরও সেইরূপ হইয়াছিল।"—কারণ বিশ্বাসঘাতক সৈন্যাধ্যক্ষও সদর্পে স্বীয় অভিসন্ধির কথা ব্যক্ত করেছে,—

"আমি অর্থলোভে জন্মভূমির অপকারে প্রবৃত্ত নহি, কেবল সেই দুরাত্মার শোণিত দর্শন করিতে চাহি।"—ভূদেব এই উক্তির মধ্যেও স্বদেশপ্রেম লক্ষ্য করেছিলেন ; নিকৃষ্ট-তামস-প্রকৃতি মানুষও দেশকে ভালবেসে স্বদেশবাৎসল্যের পরিচয় দিতে সক্ষম। ভূদেবের রচনায় সে যুগের লেখক সম্প্রদায়ের সাধারণ প্রবণতাটি ধরা পড়েছে। দেশপ্রেমিক রচনাকার বলেই এই অনুল্লেখ্য অংশগুলো এঁরা সযত্নে ব্যাখ্যা করেছেন। কোন জাতির প্রবণতার মধ্যে সবকিছুই প্রশংসনীয় নয়,—ভূদেব তাই মহারাষ্ট্রীয়দের চারিত্রিক দোষ ত্রুটিরও উল্লেখ করেছেন অকপটে,—

"মহারাষ্ট্রীয়েরা নিজ মহারাষ্ট্রখণ্ড উত্তীর্ণ হইয়া যুদ্ধ করিতে যাইত, তখনই পরদেশ বলিয়া প্রজামাত্রের প্রতি অত্যাচার করিত। কিন্তু স্বদেশে তাদৃশ অত্যাচারের লেশমাত্র ছিল না। তাঁহারা বাস্তবিক স্বদেশবৎসল ছিল। দেখ, ঐ দুষ্ট মহারাষ্ট্র সেনানী স্বদোষে দণ্ডিত হইয়া প্রভুর অপকারে প্রবৃত্ত হইল বটে, কিন্তু বিধর্মী শত্রুর স্থানে ভৃতি স্বীকার করিল না।"

এ অংশটি থেকে ভূদেবের স্বদেশানুভূতির পরিচয় ও উপন্যাসিক হিসেবে তাঁর আংশিক ব্যর্থতার হেতুটি আবিষ্কার করি অনায়াসে। তবু দেশবাসীর কাছে তাঁর আন্তরিক বক্তব্য ও উপদেশের অপরিসীম মূল্য অস্বীকার করা যায় না।

কৌশলী শিবাজী বিদেশীর হাত থেকে মাতৃভূমি রক্ষা করার মহান দায়িত্ব গ্রহণ করে প্রতি পদক্ষেপে শুধু বিপদ ও দুর্যোগ ডেকে এনেছিলেন কিন্তু মুহূর্তের জন্যও আত্মবিশ্বাস হারাননি। ঐতিহাসিকেরা শিবাজীকে বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা করেছেন,—কিন্তু স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদী লেখকের কাছে শিবাজী শুধু আদর্শ পুরুষ,—একটি মহান ব্যক্তিত্বের আধার। শিবাজী বিশ্বাসহন্তা সেনানীকে দুর্গ জয় করে উদ্ধার করলেন—কিন্তু তাঁর পূর্বকৃত অপরাধ বিস্মৃত হয়েছেন বলেই দয়া ও মানবতার পরিচয় দিয়েছেন তাকে ক্ষমা করে। শুধু তাই নয়, শিবাজী বিদেশী যবনদের নিষ্ঠুরতার বীভৎস চিত্র দেখে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন।—এই অত্যাচারের চিত্র তাঁকে শক্তি ও সাহস দান করেছে। শিবাজী সখেদে ভারতের দুর্দশার কথা ব্যক্ত করেছেন,—লেখকের দুঃখ-ভারাক্রান্ত অন্তরের পরিচয়ও যেন স্পষ্ট হয়েছে এখানে;—

"হায়! ভারতভূমি আর কতদিন এই পাপাত্মাদিগের ভার বহন করিবে?"

উনবিংশ শতাব্দীর সমগ্র বাংলাসাহিত্যে এই কথাটিই যেন সমস্ত কবি-নাট্যকার-রচনাকারদের ক্ষোভের বিষয় হয়ে উঠেছিল। যন্ত্রণার তীব্রতা যত বেড়েছে স্বাধীনতার আন্দোলনের সম্ভাবনা তত ঘনীভূত হয়েছে—কিন্তু ভূদেব প্রমুখ লেখকের দীর্ঘশ্বাসের করুণ আর্তনাদ সমগ্র মানুষের প্রাণেমনে একটি বিশেষ মনোভাবের জন্ম দিয়েছে।

লেখক এই প্রসঙ্গে জন্মভূমির মহিমা কীর্তন করেছেন। বিশ্বাসহন্তা সেনানী অনুতপ্ত হৃদয়ে ভবানীদেবীর তিরস্কার ও ভর্ৎসনা শ্রবণ করেছে,—বলাবাহুল্য ভূদেব যেন প্রতিটি দেশদ্রোহী মানুষের চেতনাসম্পাদন করেছেন এখানে,—

"রে নরাধম! তুই আমার বরপুত্র শিবাজীর অপকারে প্রবৃত্ত হইয়াছিস—তুই নিজ জন্মভূমির প্রতিও স্নেহ বিবর্জিত হইয়া তাহা বিধর্মী শত্রুর হস্তগত করিলি—জানিস না গর্ভধারিনী মাতা, আর পয়স্বিনী গো এবং সর্বদ্রব্যপ্রসবা জন্মভূমি—এই

তিনই সমান। যে জন্মভূমির অপকার করিতে পারে, সে গোবধ ও এবং মাতৃহত্যাও করিতে পারে।"

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপন্যাসের সাহিত্যমূল্য বিচারের প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর কিন্তু এ রচনায় ভূদেবের আন্তরিক উদ্দেশ্যের স্বরূপটি ধরা ছড়েছে। সে যুগের প্রথম উপন্যাস রচনার চেষ্টা করেছিলেন তিনি—কিন্তু উপন্যাসের বক্তব্যটি শুধু মাত্র গল্প-রসিক পাঠকেরই মনোরঞ্জন করুক তা তিনি চাননি। রেঁনেসার চকিত আলোক যে সব শিক্ষিত-বুদ্ধিজীবী-সপ্রতিভ প্রাণকে আলোকিত করেছিল ভূদেবের উদ্দেশ্য ছিল তাঁর বক্তব্য তাঁদের কাছে পৌঁছে দেওয়া। শুধু নতুন রচনার আনন্দে আত্মহারা হয়েই তিনি তৃপ্ত নন,—তাঁর ভাবনার বিশুদ্ধ আবেদন যদি রসিকের-দেশপ্রেমিকের উৎসাহ জাগাতে না পারে তবে ত সৃষ্টির উদ্দেশ্যই অর্থহীন হয়ে যাবে। এ প্রচেষ্টা রচনাটিতে সর্বত্র প্রকট।

এ কাহিনীতে ভূদেব নির্বিচারে ইতিহাসের ঘটনা আবৃত্তি করেননি,—মারাঠা বীর শিবাজীর স্বপ্ন ও আদর্শ বিশ্লেষণ করেছেন নিপুণভাবে। হিন্দু হয়েও জয়সিংহ মোঘল সেনাপতিত্ব লাভ করেছেন, রাজপুতের বিশ্বস্ততা ও বিশ্বাসঘাতকতার পাশাপাশি চিত্র একই সঙ্গে ইতিহাসে বর্ণিত হয়েছে। মারাঠার ইতিহাসে সে দৃষ্টান্ত নেই, এই তার গৌরব। জয়সিংহ সেই রাজপুতের প্রতিনিধি, তিনিই যখন শিবাজীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন—ভূদেব সেই সুযোগে শিবাজীর মহত্ব ও জয়সিংহের দুর্বলতার আলোচনা করেন। মূল কাহিনী ও ঘটনা অসম্পৃক্ত হলেও লেখক দেশপ্রীতির যথার্থ স্বরূপ বিচার করতে চান বলেই এ অংশ যোজনা করেছেন। উপন্যাসের দাবী আর উপন্যাসিকের উদ্দেশ্য দুটিই সার্থক ভাবে যোজনা করার কৌশল নেই বলে আক্ষেপ হয় বটে কিন্তু বিশ্লেষণী শক্তির নিপুণ পরিচয় রেখেছেন বলে লেখককে খুব বেশী দোষারোপ করতে পারি না। উদ্দেশ্যমূলক রচনাংশ বলেই এর বিচার করা দরকার। শিবাজী বিপক্ষ সেনাপতির কাছে এসেছেন দুরাশা নিয়ে,—সাহসী ও দূরদর্শী শিবাজী বিপদের ঝুঁকি নিতে পেরেছেন কারণ তিনি ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিদেশীশক্তির হাত থেকে মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষা করতে চান।

শিবাজী যে আবেদন নিয়ে জয়সিংহের কাছে এসেছিলেন—সমগ্র ভারতবাসীদের একতাবদ্ধ হওয়ার আবেদনের সঙ্গে তার পার্থক্য খুব বেশী কিছু নেই। দেশপ্রেমী লেখক এখানে সঙ্ঘশক্তির মহিমা বোঝানোর চেষ্টা করেছেন শিবাজীর উক্তির মাধ্যমে। শিবাজী শত্রু হলেও নির্ভয়ে এসেছেন জয়সিংহের কাছে কারণ জয়সিংহ বিপক্ষদলে যোগ দিয়েছেন বটে, তিনি ধর্ম হারাননি, ঐতিহ্যও হারাননি। বাকচাতুর্য দিয়ে শিবাজী জয়সিংহের সেই লুপ্ত আত্মমহিমা জাগানোর একটি আন্তরিক চেষ্টা

করেছেন মাত্র। শিবাজী ধর্ম ও একজাতিত্বের দাবী নিয়ে আবেদন করেন,—এখানেও তার দূরদর্শিতার পরিচয় পাই।—শিবাজী বলেন,

"আমরা যেমন উভয়ে এক ধর্মাবলম্বী, এক জাতির এবং [বোধ হয় আপনি জানেন] এক গোত্রোদ্ভব, তেমনই আশা করি, উভয়েই এক পরামর্শী ও এককর্ম হইব। মহারাজ! আমাদিগের একত্র মিলন হইলে উভয়ের মঙ্গল। যাহাতে জাতীয় ধর্ম রক্ষা হয়, দেশের মুখ উজ্জ্বল হয়, এবং অন্য সর্বজাতির নিকট হিন্দু নামটি অবজ্ঞাস্পদ না হয়, এমত কর্ম কি কর্তব্য নহে? দেখুন দেখি, দিল্লীশ্বর কেমন মন্ত্রণা করিয়া আমাদিগের অনৈক্যকেই আমাদের অনর্থের মূল করিতেছেন।…আমি আর পরস্পর যুদ্ধে স্বজাতির বিনাশ অবলোকন করিতে পারি না।"

উদ্ধৃত উক্তি থেকে শিবাজী চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করতে পারি অনায়াসে; বিপজ্জনক হলেও তিনি একাকী বিপক্ষশিবিরে এসে জয়সিংহকে দেশের কথা জাতির কথা, মুক্তির পরামর্শ শোনাতে এসেছিলেন। অনৈক্য ও পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ কিভাবে আমাদের সর্বনাশ সাধন করছে—শিবাজী তার স্বরূপ উদ্‌ঘাটন করেছেন। জয়সিংহ যে একথা জানেন না তা নয় কিন্তু মোহগ্রস্ত দাস যেমন দাসত্বেই স্বস্তি পায় —স্বাধীন চিন্তায় অস্বস্তি অনুভব করে, জয়সিংহের অবস্থাও ঠিক তাই। শিবাজী তার চেতনা সম্পাদনের একটা চেষ্টা করেছেন মাত্র। দীর্ঘবক্তৃতায় শিবাজী মোঘল সম্রাটের পরিকল্পনারও নিখুঁত চেহারা উপস্থিত করেন। সমগ্র ভারতের উচ্চকাঙ্ক্ষী —স্বাধানতাকামী মানুষের সম্মিলিত চেষ্টায় বিদেশী যবন বিতাড়ন করা সম্ভব, এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত যে কোন জড় ব্যক্তির মনেও উৎসাহ জাগাবে। হিন্দু শক্তির ক্ষীয়মান অবস্থা দেখে শিবাজীর মর্মবেদনার গভীরে প্রবেশ করেছেন লেখক,—

"আমার এই প্রার্থনা, যেন এমনদিন কখনও উপস্থিত না হয় যে, কোন বাদসাহ হিন্দু জাতির মধ্যে সক্ষম ব্যক্তি নাই বলিয়া অবজ্ঞা করেন। মহারাজ! যাহারা আপনারাই এই জাতিকে নিস্তেজ করিয়া পরে ক্ষীণবীর্য বলিয়া অবজ্ঞা করেন, তাঁহাদের কি সাধারণ দুষ্টতা! মহারাজ! অধুনা ভারতরাজ্যের যে অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রবাবস্থা দৃষ্ট হইতেছে, সে বিকারাপন্ন রোগীর দৌর্বল্যাধীন নিষ্পন্দ হওয়ার ন্যায় —তাহা সুষুপ্তি-সুখানুভব নহে।

ভূদেব অতি আন্তরিকতার সঙ্গে ভারত ইতিহাসের স্বাধীন নায়ক শিবাজীর পূত চরিত্র রচনা করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের লগ্নে মারাঠা জাতির স্বাধানতা সংগ্রামের চিত্র উপস্থাপিত করার পেছনেও ভূদেবের বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তীকালে ইতিহাসের দুটি বিশিষ্ট অধ্যায় নিয়ে ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র দত্ত সমগ্র জাতির সামনে দুটি পৃথক চিত্র তুলে ধরেছেন, একটি 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যায়'

ও অপরটি 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'-এ, ভূদেবই মারাঠাবীর শিবাজীর আদর্শ সর্বপ্রথমে আমাদের শুনিয়েছেন। জয়সিংহ বহু অভিযানের অধিনায়কত্ব করেছেন—কিন্তু দাক্ষিণাত্যের জাগরণ মুহূর্তে এ অভিজ্ঞতা তিনি প্রথম অর্জন করলেন। রাজপুত ইতিহাসে প্রতাপসিংহ যেমন উজ্জ্বল নক্ষত্র, মানসিংহ-জয়সিংহ-যশোবন্তসিংহ তেমনই সে উজ্জ্বল ইতিহাসের বুকে কালিমা লেপন করেছেন। শিবাজী জয়সিংহের চেতনা সম্পাদনে সমর্থ হয়েছিলেন অবশেষে। দেশরক্ষা ও স্বাধীনতারক্ষার জন্য শিবাজী মৃত্যুপণ করেছেন, জয়সিংহ তা দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেন,—

"এমত সাহস না হইলে কি কেহ সাম্রাজ্য সংস্থাপনে সক্ষম হয়! এমন কার্যপরতন্ত্র না হইলেকি মহৎ কার্য সিদ্ধ হয়!"—ভূদেবও এখানে মুখর হয়ে ওঠেন। পাশ্চাত্ত্য ইতিহাসবেত্তারা শিবাজীচরিত্রের দোষত্রুটি নির্ণয় করেছিলেন,—কিন্তু ভূদেব তাঁকে দেখেছেন মুগ্ধ দৃষ্টিতে, এই মুগ্ধতা এসেছে নানা কারণে। বীর্যহীন-আশাহীন জাতির সামনে তিনি একটি উজ্জ্বল চিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন,—তাঁর চরিত্রের মহত্ত্ব উদ্ঘাটনই লেখকের উদ্দেশ্য হয়েছে। ভূদেব বলেছেন,—

"মহারাষ্ট্রপতি বাস্তবিক সরলপ্রকৃতি ছিলেন। তিনি সহজে কপট ব্যবহার করিতেন না। তিনি অত্যুদার প্রকৃতি না হইলে কখন মহারাষ্ট্রীয়দিগের অন্তঃকরণে প্রবল স্বদেশহিতৈষিতা উদ্রিক্ত করিতে পারিতেন না। কিন্তু তাঁহাকেও মধ্যে মধ্যে কৌটিল্য অবলম্বন করিতে হইত। এইজন্য তাহার চরিত্র লেখক গ্রন্থকার অনেকেই এই মহাত্মাকে কুটিল স্বভাব বলিয়া বর্ণন করিয়া গিয়াছেন।"—স্পষ্টতই বোঝা যায় ভূদেবের এতে যথেষ্ট আপত্তি রয়েছে। শিবাজীকে যিনি স্বাধীনতার মূর্তপ্রতীক রূপে কল্পনা করেছেন তাঁর চরিত্রের এই কৌটিল্যের মধ্যেও তিনি সুষমা আরোপ করেছেন। কোন সমালোচকও বলেছেন,—

"ভূদেব যে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছিলেন সে স্বাধীনতা শিবাজীর উক্তিতে রয়েছে। গ্রন্থমধ্যে শিবাজীর চরিত্রটির ওপরই নানাদিক দিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।...প্রধান হয়েছে শিবাজীর আদর্শ, উচ্চাকাঙ্খা, কৌশল। সবমিলে শিবাজী আদর্শবাদের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে দেখা দিয়েছেন।[৮] ভূদেবের দেশপ্রীতি শিবাজীকে অকলঙ্ক দেশনায়ক রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। কণ্টার মারাঠা জাতির অভ্যুদয়কে নিরপেক্ষ ভাবে বর্ণনা করেছেন গল্পটিতে,

"The rise of the Mahratta Power in India was one of those sudden and surprising revolutions which, amid the troubled

৮ বিজিত কুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, 'বঙ্কিমচন্দ্র', ১৯৬৩।

currents of political events, have been so frequently seen to spring from the reactions of despotism."

'অঙ্গুরীয় বিনিময়' উপাখ্যানটির শেষাংশে রোসিনারার অন্তর্দ্বন্দ্বচিত্রটি প্রাধান্য পেয়েছে,—শিবাজীর প্রণয়মুগ্ধা রাজপুত্রী জীবনমন সমর্পণ করার পূর্বে বৃদ্ধ শাজাহানের কাছে পরামর্শ গ্রহণ করেছে। মারাঠাবীর যে উদ্দেশ্য নিয়ে রোসিনারাকে হরণ করেছিলেন,—তা পূর্ণ হতে চলেছে। কিন্তু আরঙজেব তা হতে দেননি। ইতিহাসের কলঙ্কিত নায়ক ও ক্ষমতাবান আরঙজেব শিবাজীকে যোগ্য মর্যাদা দেননি বলেই পলায়নের পথই বেছে নিতে হয়েছিল তাঁকে। রোসিনারাই অঙ্গুরী বিনিময় করে বিশ্বস্ততার ও চিরবিরহের পথ বেছে নিয়ে গল্পটিতে একটি করুণগাম্ভীর্য্যের অবতারণা করেছে। এ উপন্যাস বাংলাসাহিত্যের প্রথম কথাসাহিত্য রূপে পরিগণিত হওয়ার প্রধান বাধা রচনার মৌলিকত্বের অভাব। কিন্তু প্রথম উপন্যাসের মর্যাদাবঞ্চিত এই রচনাটিতে স্বদেশপ্রেমিক ভূদেবের যে পরিচয় লাভ করেছি তা এককথায় অনন্যসাধারণ। কথাসাহিত্যের বিষয়বস্তুরূপে নিছক প্রেম বা নিছক রোম্যানসকে তিনি নির্বাচন করেননি। লেখকের আজীবনের সাহিত্য সাধনার ইতিহাস আলোচনা করলে তার উত্তর পাওয়া যায়। তাঁর মত চিন্তাশীল লেখকের পক্ষে নিছক গালগল্প রচনা করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। কণ্টারের মনোরম ঐতিহাসিক কাহিনীমূলক গ্রন্থ পাঠকালে কৌতূহলবশতঃ তিনি অনুবাদকের দায়িত্ব নিয়েছিলেন—কিন্তু সেখানেও দেখি নির্বাচনে যথেষ্ট সাবধানতার পরিচয় দিয়েছেন। কোনো কোনো সমালোচক ভূদেবের নীতিনিষ্ঠার প্রসঙ্গটি বড়ো করে দেখেছেন—কিন্তু মনে হয় নীতিনিষ্ঠার চেয়েও ভূদেবের স্বজাতি, স্বধর্ম ও স্বদেশনিষ্ঠতার পরিচয় আরও নিবিড়। প্রাবন্ধিক হিসেবে ভূদেবের স্বসমাজ নিষ্ঠার পরিচয় খুবই স্পষ্ট—কিন্তু অনুবাদকের দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের চেষ্টা করেও 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' ভূদেব তাঁর সুগভীর দেশনিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, সেটাই আশ্চর্য।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রকে বহু অভিধায় ভূষিত করা হয় শুধু তাঁর অনন্য সাহিত্য সৃষ্টিকে অভিনন্দিত করার জন্যই নয়—বঙ্কিম মনীষার বিভিন্ন দিককে পাঠক সাধারণের কাছে তুলে ধরার একটা উদ্দেশ্যও সেখানে বর্তমান, তাই তাঁকে সাহিত্যসম্রাট বলে উল্লেখ করা হয়। সার্থক কথাশিল্পী হলেও তিনি সার্থকতর সমালোচক,—সর্বোপরি দেশ ও জাতির কল্যাণকামী নায়ক বঙ্কিমচন্দ্রকে একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমিক বলে আমরা তৃপ্তি পাই। আসলে বঙ্কিমচন্দ্রের অসংখ্য গুণাবলী তাঁর রচনায় এমনভাবে প্রকাশিত হয়েছে যে তাঁকে শুধু একটি নামে চিহ্নিত করাই যায় না। বাংলা উপন্যাসে তাঁর অনন্য সাধারণ প্রতিভার স্বাক্ষর রয়েছে,

সর্বপ্রথম উপন্যাস থেকে সর্বশেষ উপন্যাসেও বঙ্কিম প্রতিভা সাফল্য অর্জন করে ধন্য হয়েছে। কিন্তু এই উপন্যাসসম্ভার পাঠ করে বঙ্কিমচন্দ্রকে শুধুমাত্র শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক কিংবা সার্থক ঔপন্যাসিক হিসেবে বিচার করলেই সব কর্তব্য শেষ হয় না। বঙ্কিম উপন্যাসের স্তরে স্তরে বঙ্কিম প্রতিভার বিচিত্র রূপ প্রকাশ পেয়েছে,—সে প্রসঙ্গটিও আলোচনার পক্ষে অপরিহার্য হয়ে ওঠে। বঙ্কিম মনীষার গভীরে প্রবেশ না করলে যেমন তাঁর সৃষ্ট চরিত্র, কাহিনী কিংবা মনোবিশ্লেষণের সঠিক অর্থ নির্ণয় করা যায় না তেমনি সে যুগের দেশানুরাগের স্পর্শ কি ভাবে বঙ্কিমচিত্তকে আলোড়িত করেছিল তাঁর পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে উপন্যাসের দ্বারস্থ হতেই হয়। প্রবন্ধে, রসরচনায়, সমালোচনায় প্রকাশ্যভাবে দেশাত্মবোধের বাণী প্রচার করেছেন তিনি—কিন্তু উপন্যাসের ঘটনাজাল ও নিবিড় অন্তর্দ্বন্দ্বের মাঝখানেও দেশপ্রেমের অনুভবটি তিনি অবিচ্ছিন্নভাবে প্রকাশ করে গেছেন—এও বঙ্কিম প্রতিভার একটি বিস্ময়কর পরিচয়। দেশচিন্তার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অনন্যতা আছে, কিন্তু এর পেছনে রয়েছে দীর্ঘদিনের ভূমিকা। বাংলা দেশের আকাশে বাতাসে দেশপ্রেমের বাণী যখন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত-উচ্চারিত-নিনাদিত—সেই পর্বেই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব। একটা নিখুঁত হিসেব নিলে দেখতে পাবো যে, বাংলা নাটকে, কাব্যে প্রবন্ধে দেশপ্রেম প্রসঙ্গ যখন একটি সাধারণ আলোচনার বস্তু, যে অনুভবটি বাংলা সাহিত্যকে প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—অথচ যে কথা বলার অপরিসীম প্রয়োজন তখনও ফুরিয়ে যায়নি সেযুগেই দেশপ্রেমকে একটা মূর্তি দেবার তাগিদে বাংলার সাহিত্যাকাশে বঙ্কিমচন্দ্রের উদয় হয়েছে। ঈশ্বরগুপ্ত—রঙ্গলাল—মধুসূদন—দীনবন্ধু—অক্ষয়কুমার—দেবেন্দ্রনাথ—ভূদেবের স্বপ্ন ও সাধনায় যে সত্য বারংবার আমাদের চেতনার দ্বারে ঘা দিয়েছে, বঙ্কিম সেই বাণীটিই একান্তভাবে গ্রহণ করেছেন। সমগ্র বঙ্কিমসাহিত্য আলোচনা করলেও দেখা যাবে সব ভাবনার শেষে দেশপ্রেমিক বঙ্কিম-চন্দ্রের একটি নিজস্ব বক্তব্য আছে। উপন্যাসে যে কথা উপরন্তু, যে প্রসঙ্গ অতিরিক্ত বলে সমালোচনার যোগ্য—সে কথাটি বলার জন্য বঙ্কিমের এত আকুলতা কেন? সাহিত্য কি, উপন্যাসের উপপাদ্য কি,—এ তথ্য শিক্ষিত ও সূক্ষ্মদর্শী বঙ্কিমের অজানা ছিল না। তবু তিনি কাহিনী ও ঘটনার অন্তরালে নিজেকে গোপন করতে অসমর্থ হয়েছেন এবং তাঁর বিশিষ্ট উপলব্ধির কথাটি না শুনিয়ে শান্তি পাননি। সাহিত্য শুধুমাত্র কলারসিক ও সূক্ষ্মরসিকের মনোরঞ্জনের বস্তু নয়, সাহিত্য সৃজনের দায়িত্ব যে কত নিষ্ঠাপূর্ণ কর্তব্য, সেকথা বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। সাহিত্য-সেবীর শুধু আত্মগত ভাব-বিলাস নিয়ে মগ্ন থাকা চলবে না, সাহিত্যের দর্পণে ফুটিয়ে তুলতে হবে চলমান জীবনযাত্রার নিখুঁত ছবি,—আর সেই ছবিটি দেখে শুধু আনন্দ

পেয়েই তৃপ্ত হওয়া চলবে না,—যা আমাদের চিন্তাশক্তিকেও জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করবে তাই হবে সাহিত্যপদবাচ্য। এমন চিন্তাশীল লেখকের কলম থেকে উপন্যাস কিংবা রস রচনা প্রকাশিত হলেও লেখকের চিন্তাশীলতার বিশিষ্ট স্পর্শ সে রচনায় থাকবেই। "উত্তররামচরিতে" বঙ্কিমের বক্তব্য,—"অনেক পাঠকেরই এইরূপ সংস্কার যে, ক্ষণিক চিত্তরঞ্জন ভিন্ন কাব্যের অন্য উদ্দেশ্য নাই। বস্তুতঃ অধিকাংশ কাব্যে [বিশেষতঃ গদ্য কাব্যে বা আধুনিক নবেলে] এই চিত্তরঞ্জন প্রবৃত্তিই লক্ষিত হয়—তাহাতে চিত্তরঞ্জন ভিন্ন গ্রন্থকারের অন্য উদ্দেশ্য থাকে না; এবং তাহাতে চিত্তরঞ্জনোপযোগিতা ভিন্ন আর কিছু থাকেও না। কিন্তু সে সকলকে উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়া গণ্য যাইতে পারে না।" [উত্তররামচরিত, বিবিধ প্রবন্ধ]

এমন স্পষ্ট সমালোচনা যে মানুষের চিন্তাকে সর্বদাই প্রভাবিত করেছে তিনি নিছক রসবিতরণের তাগিদে কলম ধরতে পারেন না। তাই ঔপন্যাসিক বঙ্কিম যে কর্তব্য পালনের জন্য লেখনী ধারণ করলেন তা তাঁর নিজের কথাতেই বলি,—

"কাব্যের গৌণ উদ্দেশ্য মানুষের চিত্তোৎকর্ষ সাধন—চিত্তশুদ্ধি জনন। তাঁহারা সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষ সৃজনের দ্বারা জগতের চিত্তশুদ্ধি বিধান করেন। এই সৌন্দর্যের চরমোৎকর্ষের সৃষ্টি কাব্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।" [ঐ]

এই মন্তব্যের আলোকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস রচনার আদর্শবিচার করার সুবিধে রয়েছে। বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র আধুনিক নবেল সম্পর্কে যে অভিযোগ এনেছেন,—সে অভিযোগ তাঁর নিজের রচনা সম্পর্কে প্রযুক্ত হতে পারে না নিশ্চয়ই। 'বিবিধ প্রবন্ধের' এ সমালোচনা লেখার বহু আগেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন। এবং একটি বিশেষ আদর্শ ও উদ্দেশ্য নিয়েই যে তিনি সাহিত্যজীবনের ভূমিকারম্ভ করেছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। নিছক চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি যে উৎকৃষ্ট সাহিত্যের লক্ষণ হতে পারে না—এ উপলব্ধি সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথমতম উপলব্ধি বলা চলে। তবু একথা দ্বিধাহীনভাবেই স্বীকার করা হয়ে থাকে যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সব বক্তব্য সব উদ্দেশ্যই শেষ পর্যন্ত একটি বক্তব্যে পরিণত হয়েছে। সেযুগের অন্যান্য সাহিত্যিকের রচনায় যে সাধারণ সত্যটি বড়ো হয়ে ধরা পড়েছিল, কাব্যে-নাটকে-প্রবন্ধে যে বক্তব্যটি আমাদের অন্তর স্পর্শ করেছিল,—সেই স্বদেশপ্রেমের বাণী বঙ্কিমচন্দ্রের সব রচনার সারভূত সত্যরূপে প্রমাণিত হয়েছে। উপন্যাস-প্রবন্ধ-সমালোচনা এই তিনটি ক্ষেত্রেই সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র স্বকীয়শক্তির বিশিষ্ট পরিচয় রেখে গেছেন, এই তিনটি বিভাগেই যে কথাটি সব বক্তব্য ছাপিয়ে উঠেছে,—তা হল স্বদেশপ্রেমী বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমের-দেশোপলব্ধির নিগূঢ় কথা। আপাততঃ উপন্যাস প্রসঙ্গেই আমাদের আলোচনা সীমিত থাকবে, ক্রমশঃ দেশপ্রেমিকতাই বঙ্কিমচন্দ্রের

সব সৃজনের মূলে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রেরণা বলে প্রমাণ করা আমাদের পক্ষে কিছুমাত্র কষ্টকর হবে না। Encyclopaedia Britannica-তে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

To his contemporaries his voice was that of a prophet; his valiant hindu heroes aroused their patriotism and pride of race··· In him nationalism and Hinduism merged as one.[৯]

সাহিত্য সম্রাট বলে যে অভিধায় বঙ্কিমচন্দ্রকে ভূষিত করেছি সেটি তাঁর পূর্ণ পরিচয় বহন করে না,—সত্যিই তিনি সাহিত্য জগতের সম্রাট কিন্তু এই অপ্রতিদ্বন্দ্বী সম্রাটের অন্তরটি সমগ্র দেশের জন্য, জাতির জন্য সর্বদাই অমেয় প্রেম ও ভালোবাসা বহন করেছে,—সেই গভীর দেশাত্মবোধের কিছু ইঙ্গিত তাঁর বিশেষণে থাকা দরকার। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মূল্যবান উক্তিটি স্মরণ করি।

বঙ্কিমবাবু যাহা কিছু করিয়াছেন···সব গিয়া একপথে দাঁড়াইয়াছে। সে পথ জন্মভূমির উপাসনা—জন্মভূমিকে মা বলা—জন্মভূমিকে ভালবাসা—জন্মভূমিকে ভক্তি করা। তিনি এই যে কার্য করিয়াছেন, ইহা ভারতবর্ষের আর কেহ করে নাই।[১০]

স্বদেশপ্রেমের আবেগ যে লেখকের প্রেরণা, উপন্যাসের মত নিতান্ত তন্ময় সাহিত্যেও (Objective Literature) তার প্রতিফলন পড়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের গভীর পরিচয় তাঁর প্রথম উপন্যাসটিতেই বর্তমান। যদিও 'মৃণালিনী' থেকেই দেশপ্রেমোচ্ছ্বাসের প্রথমারম্ভ বলে ধরে নেওয়া হয়। 'দুর্গেশনন্দিনীর' রচনাকালে গদ্যসাহিত্যের শৈশব অতিক্রান্ত হয়েছে,—নাটক রচনা একটা সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে,—অসংখ্য পত্র পত্রিকা রসিক-বাঙ্গালীর রসতৃষ্ণা মিটিয়েছে,—সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদ এই যে, বাঙ্গালী মধুসূদনের প্রতিভাকে আবিষ্কার করেছে, প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হয়েছে,—ইংরাজী শিক্ষাদীক্ষার প্রত্যক্ষ সুফল ও পরোক্ষ প্রভাব কি হতে পারে—তা নিয়ে যুক্তিপূর্ণ আলোচনাপর্ব সমাপ্ত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিধে ছিল এই যে, তাঁকে মধুসূদনের মত একটি অপ্রস্তুত পটভূমিকায় এসে দাঁড়াতে হয়নি। মধুসূদনের আবির্ভাবকে তাই যতটা আকস্মিক, যতটা অচিন্ত্যনীয় বলে মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রকে যুগের পটভূমিকায় ততটা আকস্মিক বলে মনে হয় না। মধুসূদনের সামনে ছিল অজস্র প্রলোভন কিন্তু তার ফলাফলের দৃষ্টান্ত হাতের কাছে ছিল না,—কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র

৯, Encyclopaehia Britannica, (VOI-5), England, 1962,

১০. বঙ্কিমচন্দ্র জীবন ও সাহিত্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র লিখিত গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

ইয়ংবেঙ্গলের ইতিহাস পাঠ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। সুতরাং দিশাহারা হবার মত পরিবেশ, চঞ্চল হবার মত জটিল আবহাওয়া ছিল না বলেই প্রথমাবধি বঙ্কিমচন্দ্র যুক্তিবাদী-চিন্তাশীল-আদর্শবাদী। উচ্চশিক্ষা তাঁর মনের বিচার শক্তি বাড়িয়েছে, তাঁকে বিভ্রান্ত করেনি। স্থিতধী বঙ্কিমচন্দ্র তাই অনেক ভেবেচিন্তে ইংরাজী উপন্যাস রচনা করার প্রয়াস খুব সহজেই বর্জন করতে পেরেছিলেন,—দ্বিধাগ্রস্ত হননি বিন্দুমাত্র।

১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে দুর্গেশনন্দিনী প্রথম প্রকাশিত হলেও এই অনতিদীর্ঘ উপন্যাসটি শুরু হয়েছিলো তারও তিন বছর আগে।

লেখকের সংশয় ছিল যে যথার্থ উপন্যাস হিসেবে এটি গৃহীত হবে কিনা। কিন্তু দ্বিতীয় উপন্যাসটি এক বছর পরেই প্রকাশিত হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তখন আত্মবিশ্বাসে, শক্তিসচেতনতায় দৃঢ়।

প্রথম উপন্যাসে ঔপন্যাসিক নূতন সৃজনের আবেগে কম্পিত হলেও স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়বস্তু ও কাহিনী নির্বাচনে, চরিত্ররচনায়, পরিস্থিতি অঙ্কনে যে মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন তার প্রেরণা দেশপ্রেমের অনুভব থেকেই। এই গভীর দেশাত্মবোধের স্পর্শ ছিল বলেই হয়ত দুর্গেশনন্দিনীর আত্মপ্রকাশ বাংলাদেশে একটি স্মরণীয় ঘটনা বলে চিহ্নিত হয়েছিল। বাংলার ঘরে ঘরে এই গ্রন্থ কী সমাদরে গৃহীত হয়েছিল তার অজস্র প্রমাণ আমরা পাই। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ' গ্রন্থে লিখেছেন,—

"আমরা সেদিনের কথা ভুলিব না। 'দুর্গেশনন্দিনী' বঙ্গসমাজে পদার্পণ করিবামাত্র সকলের দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিল। এ জাতীয় উপন্যাস বাঙ্গালাতে কেহ অগ্রে দেখে নাই।...দেখিয়া সকলে চমকিয়া উঠিল। কি বর্ণনার রীতি, কি ভাষার নবীনতা, সকল বিষয়ে বোধ হইল, যেন বঙ্কিমবাবু দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়া লেখনী ধারণ করিয়াছেন।"[১১]

'দুর্গেশনন্দিনীর' মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ও আদর্শের প্রসঙ্গটি শিবনাথ শাস্ত্রী উল্লেখ করেছেন। "দেশের লোকের রুচি ও প্রবৃত্তির স্রোত পরিবর্তনের" চেষ্টাটি তিনি লক্ষ্য করেছিলেন। একদিকে নতুন উপন্যাস রচনার উন্মাদনা অন্যদিকে একটি নিশ্চিত আদর্শে জাতিকে দীক্ষিত করার মহান ব্রত গ্রহণ করেই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব। "দুর্গেশনন্দিনী"তেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবণতা ধরা পড়েছিল স্পষ্টভাবে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পাল বলেছিলেন,—

১১. শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, ১৩৬২।

"দুর্গেশনন্দিনী আমাদের স্বদেশাভিমানকে জাগিয়ে দিল। আমাদের অন্তরের সমস্ত সহানুভূতি আমরা উজাড় করে দিলাম বীরেন্দ্রসিংহের উদ্দেশে।"[১২] সুতরাং নিছক উপন্যাস হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখতে চাননি পাঠকও তা নিছক উপন্যাস হিসেবে নেয়নি। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতির পরিচয় এ উপন্যাসে কিভাবে প্রতিফলিত সে আলোচনারও আগে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশভাবনার কিছু পরিচয় দেওয়া দরকার।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতক বঙ্কিমচন্দ্র প্রখর আত্মসচেতনতা নিয়ে লক্ষ্য করেছিলেন—সেযুগের শিক্ষিতাভিমানী বাঙ্গালীর সত্যকার মানসিক চিন্তাধারার বিবর্তন। ইংরেজী শিক্ষাদীক্ষা পুরোমাত্রায় গ্রহণ করে যে শিক্ষিত সমাজ গোত্রান্তরিত-ধর্মান্তরিত-রূপান্তরিত হয়েছিলেন তাঁদের দৃষ্টান্ত বঙ্কিমচন্দ্রের মনে একটা প্রচণ্ড আবেদন জাগিয়েছিল।—সে যুগীয় ধর্মান্দোলন আর সংস্কৃতির আন্দোলনের কিছু পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের আগমন। প্রখর বিচারশক্তি ও মৌলিক চিন্তার ক্ষমতা ছিল বলেই বঙ্কিমচন্দ্র নিজের ভাবীজীবন তাঁর স্বকীয় আদর্শেই গড়েছিলেন। শুধু ইংরেজীশিক্ষার পাঠগ্রহণে সন্তুষ্ট না হয়ে রীতিমত সিলেবাস মিলিয়ে পাঠ সমাপনান্তে ডিগ্রী ধারণ করেছিলেন যিনি, তিনি শিক্ষা গ্রহণের ব্যাপারেও যে বেশ একটা নিজস্ব আদর্শ মেনে চলেছিলেন সেটুকুই প্রমাণিত হয়। শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হলে অন্যান্য উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীর মতো বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী চাকুরী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী বাঙ্গালীর মতো সাহিত্যসাধনা একই সঙ্গে সমান গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করেছিলেন। প্রয়োজনের তাড়নায় চাকরী আর আত্মিক প্রয়োজনের তাগিদে কলম ধরতে হয়েছিল বলেই বঙ্কিমচন্দ্র উভয়ক্ষেত্রেই কৃতী, উভয়ক্ষেত্রেই পারদর্শিতার ছাপ রেখেছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য জীবনের আদর্শ প্রসঙ্গে একটি তথ্য প্রায় সকলেই মেনে নিয়েছেন। কৈশোর থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমিক কবি ঈশ্বরগুপ্তের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন বলেই সাহিত্যজীবনের গুরু হিসেবে ঈশ্বরগুপ্তকেই গ্রহণ করেছিলেন। কোনো সমালোচক বলছেন,—

"সংবাদপ্রভাকর ছাড়া কলকাতার বিদ্বৎসমাজের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের আর কোনো যোগসূত্র ছিল কিনা সন্দেহ।"[১৩]

পরবর্তীকালে ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রীতির উচ্ছ্বসিত গুণগান করে বঙ্কিমচন্দ্র গুরুর জয়-ঘোষণা করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের সাধারণ স্তরের লেখককেও একটা অসাধারণ

১২. বিপিনচন্দ্র পাল, চরিত্র চিত্র, ১৯৫৮, পৃ:—১৫৯।

১৩। ভবতোষ দত্ত, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬১, পৃষ্ঠা ৩।

দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যে তাঁকে স্থায়ী সম্মান জানানোর দাবী তুলেছিলেন। কিন্তু ঈশ্বরগুপ্তের দেশচর্চা বঙ্কিমকে যে যথার্থভাবেই আকৃষ্ট করেছিল—এ তথ্যটি নিঃসন্দেহে গৃহীত হবে। ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রীতির প্রত্যক্ষ আবেদন চিন্তাশীল বঙ্কিমচন্দ্রকে প্রভাবিত করলেও 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের বাল্যরচনায় দেশপ্রেমের বাষ্পটুকুও নেই। অবশ্য বাল্যরচনা দিয়ে পরবর্তী কালের সাহিত্যিককে বিচার করতে গেলে যে ভ্রমে পতিত হতে হয়, তা ত আমরা জানি। ঈশ্বরগুপ্তের সাক্ষাৎ শিষ্য হিসেবে দীনবন্ধু ও বঙ্কিমকে গ্রহণ করেছি আমরা কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র যে সুগভীর দেশচিন্তার পরিচয় দিয়েছেন সেখানে ইংরেজী-শিক্ষিত বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক চিন্তার প্রাধান্যই বেশী,—তা সম্পূর্ণই ঈশ্বরগুপ্ত প্রভাবিত দেশচিন্তা বললে ঠিক বলা হয় না।

বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার ধার'বাহিক ইতিহাস ও ক্রমপরিণতির স্তর বিশ্লেষণ করলে স্বদেশচিন্তার প্রকৃত রূপটি জানা যাবে কিন্তু মূল উপাদানগুলি অনুসন্ধানের জন্য আমাদের খুব বেশী পরিশ্রম করতে হয় না। নবজাগরণলগ্নে যে বোধ শিক্ষিত ও সচেতন বাঙ্গালীকে পীড়িত করেছে,—পরাধীনতার সেই দুঃসহ বেদনা অন্যান্য কবি-সাহিত্যিকদেব মতো বঙ্কিমচন্দ্রকেও পীড়িত করেছিলো। সমসাময়িক ঘটনার আঘাতে এই মনোকষ্ট দিন দিন বেড়েই গেছে। স্বদেশচেতনার অনুভূতিব কোন পৃথক চেহারা নেই বলে নিতান্ত ব্যক্তিগত শোকদুঃখের মতো তা হয়ত সর্বদা বিশিষ্টতা অর্জন করতে পারে না—কিন্তু স্বদেশপ্রেমিকের অনুভূতিগুলি অন্যান্য অনুষঙ্গ পেলেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে সহজেই! মধুসূদনের তীব্রতম দেশচেতনা রাবণের খেদোক্তিতে কত সহজেই উচ্ছ্বসিত হযে উঠেছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতির মূলে রয়েছে অতীত ইতিহাসপ্রীতি। একটি জাতির নিতান্তই বর্তমান দেশোন্মাদনায় তুষ্ট ছিলেন না বঙ্কিমচন্দ্র। এই উচ্ছ্বাস হঠাৎ আসা বেনোজলের মত সমগ্র দেশ প্লাবিত করবে বটে কিন্তু তা স্থায়ী হবে না। দেশপ্রেম শুধু শিক্ষাভিমানী বাঙ্গালীর চিন্তাজগতে একচেটিয়া হয়ে থাকুক—বঙ্কিমচন্দ্র তা চাননি। তাই উদ্দেশ্যেব দৃঢ়তা নিয়ে বাঙ্গালীর মনে স্থায়ী চেতনা জাগানোর শুভ সংকল্প নিয়ে তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনার চেষ্টা।

প্রখর অনুভূতি, দেশ ও জাতির জন্য অকুণ্ঠ মমতায় বিগলিতচিত্ত বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম উপন্যাসেই দেশকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলাদেশের অতীতের কাহিনী। এ কাহিনীর নায়ক হিন্দুর শক্তি ও সামর্থ্যের প্রতীক। ইতিহাসের চূম্বকে দেশপ্রেমিক যখন কাহিনীরচনা করতে চান তাতে ঐতিহাসিকত্ব পুরাপুরি পাওয়া যায় না, কিন্তু কথা-সাহিত্যিকের ইতিহাসমুগ্ধতার প্রমাণ মেলে। তাই ইতিহাস নয়,—অতীত বাংলার একটি বীরত্ব কাহিনী

পরিবেশনের সাহিত্যিক প্রচেষ্টাই 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বড়ো হয়ে ধরা পড়েছে। রোম্যান্টিক পরিবেশে গল্প কথনের প্রথমশ্রেণীর দক্ষতার পরিচয় 'দুর্গেশনন্দিনীতে' রয়েছে,—সে প্রতিভা ভাবী ঔপন্যাসিকের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ জীবনের দিকে ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাঙ্গালীজীবনের এমন একটি নিবিড় যোগাযোগ স্থাপন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র যা আমাদের কাছে নিছক গল্পপাঠের অতিরিক্ত একটি চিন্তাসামর্থ্যের যোগান দেয়। সদ্যোজাগ্রত পরাধীনতার চেতনায় আমাদের অতীত ইতিহাসের ওপর আলোকপাতের চেষ্টাটি তাই অত্যন্ত অর্থপূর্ণ মনে হয়। রঙ্গলালের রাজপুত ইতিবৃত্তপাঠ করেও আমরা এ জাতীয় আনন্দ পেয়েছিলাম। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র সে আনন্দের পেছনে কিছুটা চিন্তাশক্তিও জাগিয়ে দিলেন। সুদূর রাজস্থানে যেতে হল না—কিংবা মারাঠা ইতিহাসের মধ্যে আত্মবিম্ব দর্শনের চেষ্টা করতে হল না,—বাঙ্গলার অতীত কাহিনীতেই যথেষ্ট রোম্যান্স ও বীররসের সন্ধান পাওয়া গেলো।

ভূদেব তাঁর অনুবাদ কাহিনীতে মারাঠাবীর শিবাজীর স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রসঙ্গটি বর্ণনা করেছিলেন—কিন্তু বঙ্কিম ঘরোয়া কাহিনী দিয়েই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। বাঙ্গালী জীবনভিত্তিক এ জাতীয় কাহিনীতে বীররসের দ্বারা দেশপ্রেম সঞ্চারের চেষ্টা এই প্রথম। অবশ্য বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাস অবলম্বন করলেও রাজপুতবীর জগৎসিংহকেই এ কাহিনীর কেন্দ্রীয় চরিত্র রূপে কল্পনা করেছেন লেখক। কিন্তু ঘটনাস্থল বাংলাদেশ বলেই বীরেন্দ্রসিংহ চরিত্রটিও যথেষ্ট দূরদর্শিতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। সহায়সম্বলহীন এই বাঙ্গালী যুবা স্বীয় বুদ্ধিবলে প্রতিষ্ঠা, খ্যাতি ও আত্মসম্মানবোধ অর্জন করেছিল। মূল কাহিনীর নেপথ্যে বিচরণ করলেও বঙ্কিমচন্দ্র বীরেন্দ্রসিংহের দৃপ্ত তেজ ও মানসিক দৃঢ়তার প্রসঙ্গ বর্ণনা করেছেন। মোঘল পাঠানযুদ্ধ ঘনিয়ে এলে বীরেন্দ্রসিংহ দুপক্ষকেই শত্রু বলে মনে করছে। স্বাধীনতাকাঙ্ক্ষী ভূস্বামী বীরেন্দ্রসিংহের মনে ছিল আত্মপ্রতিষ্ঠার গোপন ইচ্ছা। কিন্তু শক্তিহীনতা হেতু সে আকাঙ্ক্ষা কখনও বাস্তবায়িত হতে পারেনি। তাই অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রসিংহকে পরামর্শ দিয়েছেন,—

তুমি নিজে বীরাগ্রগণ্য, কিন্তু তোমার সেনা সহস্রাধিক নহে; কোন যোদ্ধা সহস্রেক সেনা লইয়া শতগুণ সেনা বিমুখ করিতে পারে? মোঘল পাঠান উভয় পক্ষই সেনাবলে তোমার অপেক্ষা শতগুণ বলবান, একপক্ষের সাহায্য ব্যতীত অপর পক্ষের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে পারিবে না।

[বঙ্কিম রচনাবলী, দুর্গেশনন্দিনী, সাঃ সংসদ সংস্করণ]

বাংলা দেশের সেই সংকটকালে বাঙ্গালীর বাহুতে বল ও মনে সাহস ছিল কিন্তু প্রবলতর শত্রুদমনের অন্য কোন উপায় ছিল না। বীরেন্দ্রসিংহ শেষ পর্য্যন্ত

আত্মরক্ষা করলেন মোঘল পক্ষে যোগদান করে। কিন্তু পাঠানের বিপক্ষতা করায় বীরেন্দ্রসিংহকে চরম শাস্তি পেতে হল। এ অংশটি উপন্যাসের প্রয়োজনে রচিত হয়েছে বটে কিন্তু বীরেন্দ্রসিংহের মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনাটি আমাদের মনে একটা স্থায়ীভাব জাগিয়ে দেয়। শক্তিহীনতার অভিশাপ এমনি করেই দুর্বলের মৃত্যুদণ্ড বহন করে আনে। কিন্তু মৃত্যুমুহূর্তেও বীরেন্দ্রসিংহের দৃঢ়তার চিত্রটি তুলনাহীন। শত্রুদত্ত অনুকম্পাকে ঘৃণা করেছে বীরেন্দ্রসিংহ,—

"তুমি রাজবিদ্রোহী দস্যু, তোমাকে কেন অর্থ দিব? তোমায় কি জন্য সৈন্য দিব?···তোমার তুল্য শত্রুর দয়ায় যার জীবনরক্ষা,—তাহার জীবনে প্রয়োজন?"

বীরেন্দ্রসিংহকে স্বাধীনচেতা ভূস্বামী বলে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টামাত্রও বঙ্কিমচন্দ্র করেন নি। সেযুগের বাংলাদেশে স্বাধীনচেতনার প্রমাণ দেবার মত মানসিক শক্তি যে একেবারে ছিল না তা নয়,—কিন্তু রাজনৈতিক ইতিহাসে স্থান পাবার মত সৈন্যসামন্ত ও যথেষ্ট সামর্থ্য না থাকায় বীরেন্দ্রসিংহের মতই লোকচক্ষুর অগোচরে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল তাঁদের,—এ সত্যটি 'দুর্গেশ নন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ্য ভাবে ঘোষণা করেছেন বলা যায়। বাঙ্গালীর ইতিহাস যে নেই তার কারণ বীরেন্দ্র-সিংহের মত শক্তিহীন ভূস্বামীদের কথা রাষ্ট্রনীতিবিদের নজরে পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্র এ কাহিনীতে যে চেতনা সঞ্চার করেছেন,—তা যে খুব সূক্ষ্ম জাতীয় চেতনারই রূপান্তর এ কথা অস্বীকার করা যায় না। বীরেন্দ্রসিংহের নিঃশব্দ মৃত্যুচিত্রটির এ ছাড়া অন্য ব্যাখ্যা কি দেওয়া যায়? বীরেন্দ্রসিংহ আত্মরক্ষার মুহূর্তে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন,—পাঠান বা মোঘল এই উভয় শত্রুর মধ্যে কোনটিকে গ্রহণ করা যায়? বঙ্কিমচন্দ্রও সে দ্বিধার ভাব কাটিয়ে উঠতে পারেননি। 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই হিন্দু চরিত্রের সমালোচনা করে পাঠানপ্রশংসা করেছেন তিনি। ওসমান ও জগৎসিংহ—বঙ্কিমচন্দ্র এ'দুটি চরিত্রেই অসংখ্য লক্ষ্যণীয় গুণের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কখনও কখনও ওসমানের বীরোচিত গুণ অনেক বেশী বলে মনে হয়। তাছাড়া নিষ্ঠাবান পাঠানচরিত্র হিসেবে ওসমান অতুলনীয়—সেদিক থেকে মোঘল সেনাপতি হিসেবে হিন্দু হলেও জগৎসিংহ কিছুটা প্রভাহীন। ওসমানের শিষ্টাচার—রাজানুগত্য এবং হৃদয়াবেগের শান্ত-নিস্তরঙ্গ রূপ যে কোন মনকেই মুগ্ধ করে। শত্রুকে আতিথ্যপ্রদান করেও উত্তেজিত শত্রুর সামনে যে ভদ্রতা ও চারিত্রিক দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন ওসমান, তাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের পাঠানপ্রীতির পরিচয় দীপ্যমান। জগৎসিংহকে মোঘলসম্রাটের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার উত্তরে ওসমান বলেছেন,—

আত্মগরিমা আমার উদ্দেশ্য নহে। মোঘল সম্রাটের সহিত চিরদিন বিবাদ করিয়া পাঠানের উৎকলে তিষ্ঠান সুখের হইবে না। কিন্তু মোঘল সম্রাট পাঠানদিগকে

কদাচ নিজ করতলস্থ করিতে পারিবেন না। আমার কথা আত্মশ্লাঘা বিবেচনা করিবেন না। পাঠানেরা বাঙ্গালী নহে, কখনও অধীনতা স্বীকার করে না; একজন মাত্র জীবিত থাকিতে কখনও করিবেও না; ইহা নিশ্চিত কহিলাম।

এ উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমের কোন বিস্তৃত পটভূমিকা অঙ্কন করার চেষ্টা করেননি লেখক, কিন্তু জাতীয়চেতনা বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মচেতনার গভীরে কিভাবে স্থান লাভে সমর্থ হয়েছিল সে সত্য এ উপন্যাস পাঠ করে সহজেই বোঝা যায়। রোম্যান্টিকতা ও উপন্যাসোচিত ঘটনাসমাবেশ সমগ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই আছে—সমালোচনার সূক্ষ্ম বিচারে তা ধরা পড়েছে, কিন্তু স্বদেশপ্রাণতা উপন্যাস বিচারের অন্যতম উপাদান হতে পারেনি কোনদিন, সমালোচকবর্গ তাই এ ব্যাপারে নীরব। স্থান-কাল-পাত্র এ তিনের নিখুঁত বিচারে ঔপন্যাসিকের ব্যর্থতা ও সার্থকতার মাপজোখ করার প্রসঙ্গ বাদ দিয়ে আমরা তাঁর উদ্দেশ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতিফলন উপন্যাসে কিভাবে দেখা গেছে সে বিষয়ে আলোচনা করব।

উদ্দেশ্যহীন রচনামাত্রই বঙ্কিমের বিচারে প্রাণহীন সৃজন, 'দুর্গেশনন্দিনী'তে স্বদেশচেতনাই উপন্যাসের প্রাণ বলা যেতে পারে। উদ্ধৃত উক্তিটির শেষাংশ আলোচনা করলে দেখব যে, নিছক ওসমানের বীরত্ব ও চারিত্রিক দৃঢ়তা ফোটানোর জন্যই অংশটি রচনা করেননি লেখক—বাঙ্গালীর চরিত্র সমালোচনা করে পরাধীন বাঙ্গালীর সামনে স্বাধীনতাপ্রিয় পাঠানের জীবনাদর্শ পাশাপাশি দেখাবার চেষ্টাও করেছেন। এটি উদ্দেশ্যমূলক অংশ হিসেবে বিচার্য।

'দুর্গেশনন্দিনী' রচনায় পাশ্চাত্য আদর্শের প্রভাব পড়েছিল বলে অনুমান করা হয়। বিদেশী সাহিত্যের প্রভাবে যদি বিমলার সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে তাতে আমাদের উপকারই হয়েছে বলতে হবে। ব্যক্তিত্ব, আত্মমর্যাদা, দৃঢ়তা ও অসমসাহসিকতা এদেশীয় পুরুষচরিত্রেই অকল্পনীয়,—বঙ্কিমচন্দ্র একটি নারী চরিত্রেই তা আরোপ করেছেন। কিন্তু বীরেন্দ্রসিংহ ও অভিরাম স্বামী, জগৎসিংহ ও ওসমান এবং দুর্যোগাচ্ছন্ন বাংলাদেশের পটভূমিকায় তিলোত্তমার রোম্যান্টিক প্রেমকাহিনীর উন্মেষ ও পরিণতি রচনায় স্বকীয়ত্ব নেই, এ ধারণা ভিত্তিহীন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিক পরিবেশের সাহায্য নিয়ে গল্পকথনের চেষ্টা করেছিলেন বলেই বিষয়বস্তুর স্থান কালপাত্রোচিত বর্ণনা দেবার দায়িত্বও তিনি এড়াতে পারেননি। মোঘল-পাঠান বিরোধের পটভূমিকায় পাত্র-পাত্রীদের হৃদয়বেদনার সমস্যাজাল উন্মোচিত করার মধ্যে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। লক্ষ্যণীয় এই যে, মোঘল পাঠান প্রতিদ্বন্দ্বী হলেও নায়িকার ভূমিকায় আছেন বঙ্গদেশেরই এক ভূস্বামীর হতভাগিনী কন্যা। এই কারণেই বলেছি, বঙ্কিমের জাতীয়তাবোধ সকলের অলক্ষ্যে থেকেও কতখানি সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

ঐতিহাসিক সত্য যাচাইয়ের প্রশ্নটি অবান্তর বলেই বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের একজন ভূস্বামীর অসহায় মৃত্যুবরণের বিবরণটি সবিস্তারে বলার লোভ সম্বরণ করেন নি,—অপ্রাসঙ্গিক হলেও বাঙ্গালিনী বিমলার দুঃসাহসিকতার—প্রতিহিংসার সজীব বর্ণনা দিয়েছেন উপন্যাসে। নিছক রোম্যাণ্টিক উপন্যাস রচনার সুযোগটুকু গ্রহণ না করে—বাংলাদেশের রাজনৈতিক জটিলতার আবর্তসৃজন করে 'দুর্গেশনন্দিনী' তিলোত্তমার সুকোমল হৃদয়াবেগের অপরূপচিত্র সৃষ্টি করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। শুধু উপন্যাস লিখেই আমাদের প্রশংসা লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল অথচ তিনি তাঁর বিশুদ্ধ স্বদেশচিন্তার অভিমানটুকু পুর্ণমাত্রায় কাজে লাগিয়েছিলেন—এখানেই স্বদেশপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। উপন্যাসের আধারে এই নবলব্ধ জাতীয়তাবোধের অনুভূতিটুকু সূক্ষ্মভাবে পরিবেশন করলে তাতে রসসৃষ্টির ব্যাঘাত হয় না,—আত্মদর্শনেরও সুযোগ মেলে।

প্রথম উপন্যাসেই আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্যসৃষ্টির উদ্দেশ্য মেনে চলেছেন। নিছক চিত্তরঞ্জনী বৃত্তি নয়,—চিৎশক্তি উদ্‌ঘাটনের সহায়ক হিসেবেই উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছেন। পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে তাঁর এই প্রবণতা তুঙ্গশীর্ষে আরোহন করেছে বলা যায়। কয়েকটি ধাপ পেরিয়ে শেষ তিনটি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মতত্ত্ব—অনুশীলনতত্ত্ব—ভারতীয় শাস্ত্র গ্রন্থের মূলতত্ত্ব উপন্যাসাকারে পরিবেশনের বিপুল আয়োজন করেছিলেন। প্রথম দিকে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যে বক্তব্য পরিবেশন করেছেন তা সে যুগের বাঙ্গালীর কাছে মোটামুটি অনুধাবনীয় তত্ত্বকথা। 'দুর্গেশনন্দিনীর' রোম্যানস নিবিড়তার মাঝখানে জগৎসিংহ—বীরেন্দ্রসিংহের বীরত্বকথার অন্তরালে বঙ্কিমচন্দ্রের বক্তব্য অত্যন্ত স্বচ্ছ। মৃণালিনীতেও অনুরূপ চেতনা নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর চিন্তাশক্তি জাগানোর চেষ্টা করেছিলেন। প্রথম উপন্যাসে ঐতিহাসিক পটভূমিকার প্রয়োজন ছিল গল্পরস ঘনীভূত করার জন্য, দ্বিতীয় উপন্যাসে একটি বিশেষ দায়িত্ব পালনের সংকল্প নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন।

'মৃণালিনী' উপন্যাস সম্পর্কে মোটামুটিভাবে সব সমালোচকের বক্তব্য যেখানে এক—তা হচ্ছে, এ উপন্যাসে দেশাত্মবোধের বিকাশ সম্পর্কিত মন্তব্য। বাঙ্গালার ইতিহাস ও বাঙ্গালীর ইতিহাস সম্পর্কে কৌতূহলী বঙ্কিমচন্দ্র বিদেশীরচিত ইতিহাস পড়ে শুধু দুঃখিত নয়,—বিরক্ত ও বিক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। মৃণালিনী রচনার উৎসে বঙ্কিমচন্দ্রের বিক্ষুব্ধ অন্তর, দেশের কলঙ্ককথা মোচনের আপ্রাণ চেষ্টায় মগ্ন বঙ্কিমচন্দ্রের এই দেশসাধনাকেই আমরা বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রাণতা বলে ব্যাখ্যা করব। 'মৃণালিনী' স্বদেশপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর দেশাত্মবোধের স্মারকগ্রন্থ। বাঙ্গালীর আত্মজাগরণ লগ্নে দেশপ্রীতির স্বতোৎসার লক্ষ্য করেছি আমরা, বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন এই অনুভূতি যদি শুধুমাত্র ক্ষণিক ও বায়বীয় উচ্ছ্বাসেরই নামান্তর হয়ে ওঠে,—তবে তা থেকে

জাতি কিছুই লাভ করবে না। তাই দেশের মাটিতেই দেশাত্মবোধের বীজ বপন করতে হবে,—দেশের অতীত ইতিহাসের সঙ্গে, বিগত ঐতিহ্যের সঙ্গে, দেশাত্মবোধের সংযোগ ঘটাতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্র নবলব্ধ জাতীয়তাবোধের ভবিষ্যৎ রচনার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন সেকারণে। কাব্যে-নাটকে-সংগীতে, উপন্যাসে দেশপ্রীতিকে নিছক একটি কাল্পনিক আদর্শ হিসেবে ব্যবহার করার সুলভ পদ্ধতি বর্জন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, এখানেই সেযুগীয় স্বাদেশিকতার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাদর্শের পার্থক্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাই প্রথমাবধি যুক্তিধর্মী,—দেশের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞতা ও নীরবতার হেতু নির্ণয়ে দুঃসাহসিক বঙ্কিমচন্দ্র এগিয়ে এসেছিলেন। দেশাত্মবোধের উচ্ছ্বাস থেকে নিছক উত্তেজনা ছাড়া অন্য কিছু মেলে না, বঙ্কিমচন্দ্র সেই অন্তঃসারশূন্য ভাবোচ্ছ্বাসকে একটি বাস্তবভিত্তির ওপরে স্থাপন করতে চাইলেন।

'মৃণালিনী' উপন্যাসে এই আদর্শ রূপায়িত হয়েছে অতীত বাঙ্গালার ইতিহাস আলোচনায়। উপন্যাসের ঘনবদ্ধ ঘটনাজালের আবর্তে দেশাদর্শ ক্ষীণ হয়ে যাবে এই কারণে অনৈতিহাসিক হলেও এমন সব ঘটনা ও চরিত্রের অবতারণা করেছেন যাঁরা বিখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে। এভাবে উপন্যাসেও বিশ্বাস্য ভূমিকারোপের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি,—সম্ভবতঃ দেশপ্রেমের নির্মল আবেগই এর একমাত্র কারণ।

"মৃণালিনী" উপন্যাসের মূল অবলম্বন স্বদেশপ্রেম,—সেই আলোকেই উপন্যাসটির সমস্ত অবিশ্বাস্য পরিবেশ, চরিত্র, কাহিনী ও ঘটনাজালের মোটামুটি একটা বিচার চলতে পারে। তা যদি সম্ভব না হয়—প্রতিমুহূর্তেই উপন্যাস হিসেবে এর ব্যর্থতা আমাদের পীড়িত করবে সন্দেহ নেই। সুতরাং সৃষ্টি হিসেবে 'মৃণালিনীর' অসার্থকতার আলোচনা থেকে বড়জোড় শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের অসাবধানতার পরিচয় মিলবে কিন্তু দেশচর্চার উন্মাদ আবেগের রূপটি আবিষ্কার করতে সক্ষম হলে দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের নিষ্ঠার একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাব আমরা।

"মৃণালিনী" রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র কল্পিত কাহিনী অবলম্বন করেছেন বটে কিন্তু ঐতিহাসিক চরিত্র ও পটভূমিকা দিয়েই কথারম্ভ হয়েছে। হেমচন্দ্র যদিও কল্পিত নায়ক কিন্তু বঙ্গবিজেতা বখ্‌তিয়ার খিলিজি তার প্রতিদ্বন্দ্বী। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতার হেতুটিও পুরাপুরি রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলম্বনে গড়ে উঠেছে। বাঙ্গালার সত্য ইতিহাসের সন্ধানে ব্যর্থমনোরথ হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাধ্য হয়েছিলেন কল্পনাশ্রয়ী উপন্যাস রচনায়। কিন্তু বখ্‌তিয়ার খিলিজি যে বঙ্গবিজয় করেছিলেন অনায়াসে,—সেটা মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না—এও তিনি জানতেন। মগধ-বিজয় শেষে বঙ্গবিজয়ে অগ্রসর হচ্ছেন বিজয়ী বখতিয়ার খিলিজি, 'মৃণালিনীর'

কাহিনীর শুরুও সেখানেই। ইতিহাস ও উপন্যাস উভয়ই যেখানে প্রাধান্য পেয়েছে—সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলায় আপত্তি করেছেন। এর প্রধান হেতু লক্ষ্মণসেন এবং বখ্‌তিয়ার খিলিজি এই দুটি ঐতিহাসিক নাম ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে কোন সাহায্য পাননি। বিদেশী ঐতিহাসিকের বিবরণে বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রদ্ধা ছিল না। ইতিহাসের সত্যতার ওপর আলোকপাতের প্রাথমিক উদ্দেশ্য বজায় রেখেও মোটামুটি সেযুগের রাজনৈতিক বিপর্যয়ের বিশ্বাস্য-ভূমিকা অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র যে ধরণের সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন, তাতে বিস্মিত হতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানেও হিন্দুনেতৃত্ব ও বীরত্বচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা করেছেন। বীরেন্দ্রসিংহকে অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল,—হেমচন্দ্র এখানো কিছুটা সক্রিয়। পিতৃরাজ্য মগধ হারিয়েও হেমচন্দ্র মনোবল হারায়নি, শত্রুদমনের সংকল্প পোষণ করেছেন। 'মৃণালিনীর' আরম্ভে হেমচন্দ্রের পিতৃরাজ্য উদ্ধারের সংকল্প শুনি,

আমি কি চোরের মত বিনাযুদ্ধে শত্রু মারিব? আমি মগধ বিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নহিলে আমার মগধ রাজপুত্র নামে কলঙ্ক।
[১ম পরিচ্ছেদ, ১ম খণ্ড]

এই হিন্দুবীর মহৎ সংকল্প নিয়ে আবির্ভূত হয়েও শেষরক্ষা করতে পারেনি, মৌখিক বীরত্ব ও প্রকৃত বীরত্বের মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে তা এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে। শুধু মহৎ ও বৃহৎ উদ্দেশ্য থাকলেই চলবে না,—সেই আদর্শকে রূপদানের জন্য কঠোর সাধনারও প্রয়োজন। সাধনাহীন মহৎ আদর্শ কি ভাবে ব্যর্থ হয়ে যায় 'মৃণালিনী'তে তা দেখেছি আমরা। অবশ্য বাংলার তুর্কী অধিকারকে সত্য ঘটনা বলে ধরে নিতে হয়েছিল বলেই তুর্কীজয়ের সাফল্য দেখাতে বাধ্য হয়েছিলেন তিনি। তবে এই সাফল্যের পশ্চাতে কিছু সাধনাহীন মহৎ আদর্শের ব্যর্থচিত্র ও চরিত্র রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র সান্ত্বনা পেয়েছিলেন কিছুটা। তুর্কী বিজয়ের ঘটনাকে মিথ্যা প্রমাণের কোনো উপায় ছিল না, কিন্তু মিনহাজউদ্দীনের সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্তৃক বঙ্গবিজয়ের অবিশ্বাস্য ও ভিত্তিহীন ঘটনাটির প্রতিবাদ করাই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল। এই উদ্দেশ্য নিয়েই শক্তিহীন বৃদ্ধশাসক লক্ষ্মণসেন, ক্ষমতালোভী নির্বোধ পশুপতি ও প্রেমোন্মত্ত হেমচন্দ্রের অসার্থক প্রচেষ্টার চিত্র অঙ্কন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। বাঙ্গালীর শক্তির দীনতার চেয়েও যোগ্যনেতৃত্বের অভাবই অনুভব করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। অরাজকতাও স্বার্থপরায়ণতার ফলাফলেই বাংলার স্বাধীনতা অস্তমিত হয়েছিলো, এ সত্যটিই বঙ্কিমচন্দ্র বেদনার সঙ্গে উপলব্ধি করেছিলেন। 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মদর্শন ঘটেছিল বলা যায়। সেকারণেই হেমচন্দ্র নায়ক হলেও উদ্‌ভ্রান্ত; যোগ্যতার অভাব না থাকা সত্ত্বেও পশুপতি অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়েছে এ উপন্যাসে। যাই হোক,

স্বদেশাভিমান ছিলো বলেই বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' উপন্যাসের পরিকল্পনা করার সাহস সঞ্চয় করেছিলেন। ইতিহাসের সত্যকে পরিবর্তনের চেষ্টা করা যায় না, এ তথ্য কারোরই অজানা নয়। বাঙ্গালীর চারিত্রিক অবনতির যে রন্ধ্রপথে বিদেশী শত্রুর অনুপ্রবেশ, বঙ্কিমচন্দ্র শুধু তার ওপরই আলোকপাতের চেষ্টা করেছিলেন। ঐ সম্পর্কে একটি সমালোচনার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়। ১৩১৯ সালে 'রঙ্গপুর দর্পণ' সম্পাদক 'মৃণালিনীর' সমালোচনা প্রসঙ্গে বলেছিলেন,—

"সিংহদ্বারের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া যবনসিংহ সিংহনাদ করিতেছে, বৃদ্ধ অকর্মণ্য ভীরু রাজা ভয়ে বিক্ষিপ্ত, রাজ্যরক্ষায় অসমর্থ। এইরূপ সময়ে যদি রাজাকে সরাইয়া সমর্থ পশুপতি স্বয়ং সিংহাসনে আরোহণ করিতেন ও দুর্দান্ত যবনকে যদি উৎসারিত বিতাড়িত ও উৎসাহিত করিতেন, তবে নিন্দার পরিবর্তে তাঁহার প্রশংসা হইত, সমাজ ও দেশ তাঁহার যশোগান করিত, বঙ্গভূমি বক্ষঃস্থল পাতিত করিয়া তাঁহার অক্ষয় কীর্তিস্তম্ভ ধারণ করিত, ইতিহাসের পৃষ্ঠায় সুবৃহৎ সুবর্ণাক্ষরে তাঁহার পবিত্র নাম লিখিত থাকিত।[১৪]

উদ্ধৃত অংশটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতি যে অভিযোগ আনা হয়েছে তাতে সমালোচককে উৎকৃষ্ট পরামর্শদাতা বলা যেতে পারে কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত উদ্দেশ্য অনুধাবন করলে উদ্ধৃত মন্তব্যটিতে বহু অসতর্ক চিন্তা আবিষ্কৃত হবে। বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী' উপন্যাসে ঐতিহাসিক সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেননি বলেই বাস্তব সত্যটিই পরিবেশন করতে হয়েছে তাঁকে। পশুপতিকে আপাততঃ রাজা সাজানো চলত বটে কিন্তু উপন্যাস না হয়ে সেটি নিছক গালগল্পে পর্যবসিত হতো। পশুপতি ও হেমচন্দ্র উভয় চরিত্রেই যে ধরণের দুর্বলতা দেখিয়েছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনার অভিনবত্ব তাতে বেড়েছে বলেই আমাদের ধারণা। স্বদেশপ্রেমিকতা ও দেশানুভূতি দুটি চরিত্রেই অস্বচ্ছ এবং ব্যক্তিস্বার্থের কাছে সে সব তুচ্ছ হয়ে গেছে বলেই তাঁরা দোষেগুণে সে যুগের প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র হতে পেরেছেন। নিষ্ঠার আধিক্য থাকলে তুর্কী বিজয় ঐতিহাসিক সত্য হতে পারত না। সোনার বাংলায় বিদেশী অধিকারের সম্ভাবনা সেদিনই বিলুপ্ত হোত। লক্ষ্মণসেনের অকর্মণ্যতার সুযোগ নিয়ে ক্ষমতালাভের এই ষড়যন্ত্রের মধ্যে কিছুটা যুক্তিও আছে, পশুপতিকে নায়ক করে বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। অকর্মণ্য শাসক ও উচ্চাভিলাষী নায়কের শাসকোচিত দৃঢ়তার অভাব থেকে যে ধরণের বিপর্যয় ঘটা সম্ভব, বঙ্কিমচন্দ্র সে কাহিনী উদ্ভাবন করে সমগ্র

১৪. রংপুর দর্পন, কিশোরীমোহন দাস প্রকাশিত, রংপুর, ১৩১৯।

বাঙ্গালী জাতির কলঙ্ক কয়েকটি নির্বাচিত কল্পিত চরিত্রের উপরে আরোপ করেছিলেন। তবে মিন্‌হাজউদ্দীন যে তথ্য পরিবেশন করেছিলেন তার যথার্থ প্রতিবাদ কিংবা যোগ্য প্রতিবাদ হিসেবে 'মৃণালিনী'কে গণ্য করা চলে কি না সেটাই বিচার্য। বঙ্কিমচন্দ্র মানবচরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিশ্লেষণের মুহূর্তে যে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন তাতে দেশপ্রেমিকতার মতো মহৎ আদর্শকেও নিতান্ত ব্যক্তিগত আবেগ উচ্ছ্বাসের কাছে অর্থহীনতায় পর্যবসিত হতে দেখেছেন। তাই হেমচন্দ্র বীর হয়েও অসার্থক, পশুপতি উচ্চাভিলাষী হয়েও ব্যর্থ, সীতারাম স্বাধীনহিন্দু রাজ্য স্থাপনের সহজলভ্য প্রশংসা থেকে বঞ্চিত। উপন্যাসের দাবী ও তথ্যের দাবীকে একত্রিত করার অসুবিধা রয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র শেষপর্যন্ত উপন্যাস-এর দাবী মেনে নিয়েছিলেন। ঐতিহাসিক তথ্যের প্রতিবাদ করেও জীবন সত্যকে বিকৃত করেননি বলেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রশংসা পাবেন। তুর্কীরা দেশজয় করেছে সত্য, কিন্তু তা এসেছে ষড়যন্ত্র—বিশ্বাসঘাতকতা, ব্যক্তিগত দুর্বলতা ও ভুলের রন্ধ্রপথে। বাঙ্গালী জাতির সাহসিকতার দৃষ্টান্ত না থাকার প্রশ্নটিই এখানে অবান্তর। পতন সব সময়ই একটি জাতির শক্তি বা দুর্বলতার উপর নির্ভর করে না,—নির্ভর করে সুদক্ষ পরিচালনার ওপরেও। বঙ্কিমচন্দ্র যদি এই সত্যটিও প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হন তবে তাতেই আমাদের সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সম্পূর্ণ কল্পিত একটি কাহিনীকে বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তির উপর দাঁড় করানোর কঠিন দায়িত্ব তিনি যথাসাধ্য পালন করেছিলেন বলেই আমাদের ধারণা। তুর্কী বিজয়ের ঘটনাটি একেবারে মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন করার চেষ্টাটি হাস্যকর হোত। 'রংপুর দর্পণ' সম্পাদক আদর্শ কল্পনার কথা চিন্তা করেছিলেন। কল্পনাই যখন, তাতে যতখুশী আদর্শগত উচ্চতার প্রশ্রয় দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন তিনি। তাই ভীরু লক্ষ্মণসেনের ঐতিহাসিক স্বভাবসম্মত চরিত্র রচনার জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকে দোষারোপ করেছিলেন,

"হিন্দু ভীরু নয়, বাঙ্গালী ভীরু ছিল না, প্রাণের মমতা তাঁহাদিগের অনভ্যস্ত, একান্ত অবিদিত। প্রাণিরক্ষার জন্য, 'গোব্রাহ্মণহিতের জন্য' পতিব্রতার পাতিব্রত্যের ও দেবপ্রতিমারক্ষার জন্য হিন্দু সহাস্যমুখে অনায়াসে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে পারে। সেই হিন্দুর আদর্শ রাজা লক্ষ্মণসেনের এইরূপ ঘৃণিত চিত্রের উদ্‌ঘাটন করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় চরিত্রে কলঙ্করোপ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।" [ঐ, পৃঃ ১৮]

কিন্তু ইতিহাসের প্রতিবাদ করার জন্য ইতিহাস সমর্থিত যুক্তি না দেখিয়ে নিছক কল্পনার আশ্রয় নেওয়ার কথা চিন্তা করেননি বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিহাস যে ঘটনার বিবরণ বিকৃত করেছে,—তাকে যথাযোগ্য সত্য মর্যাদাদানের সংকল্প গ্রহণ করেছিলেন তিনি। তাই লক্ষ্মণসেনের পরাজয় কাহিনী অস্বীকার না করে যথার্থ দুর্বলতার

হেতুটি নির্ণয় করার প্রয়াস পেয়েছিলেন। বৃদ্ধত্ব ও নৈরাশ্যের মাঝখানে যাঁরা রাজাকে সাহস ও শক্তি জোগাতে পারত সেই পশুপতি প্রমুখ চরিত্র তখন স্বীয় স্বার্থচিন্তায় মগ্ন। সামগ্রিকভাবে একটি জাতির ঐক্যবোধ ও স্বাধীনতাস্পৃহার উল্লেখযোগ্য অবনতি না ঘটলে পতন এত দ্রুত হতে পারে না। ঐতিহাসিক এই সিদ্ধান্ত আমরা অস্বীকার করব কি করে? বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনীতে' খুব বিচক্ষণতার সঙ্গেই অকপট সত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছিলেন। বাংলার সেই দুর্যোগের দিনে ইতিহাস যেখানে অশ্রদ্ধেয় ও বিকৃত তথ্য পরিবেশনে তৎপর বঙ্কিমচন্দ্র আপন প্রতিভাবলে তার ওপরে আলোকসম্পাতের চেষ্টা করেছিলেন। সিদ্ধান্তের ওপরে টাকাটিপ্পনী না করে ঘটনাটিকে তিনি কল্পনার সাহায্যে প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন। তাই হেমচন্দ্র স্বদেশপ্রাণ হয়েও আত্মচিন্তায় মগ্ন, পশুপতির মধ্যে সদ্‌গুণের সমাবেশ থাকা সত্ত্বেও সে পথভ্রান্ত। বাংলার আকাশে অন্ধকার ঘনিয়ে আসার আগে ছায়াশরীরী এসব কাল্পনিক চরিত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এদের দেখে মন ক্ষুব্ধ হয়,—আপন অযোগ্যতার জন্য বেদনাবোধ জাগ্রত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র বোধহয় এমনি করেই আত্মসমালোচনার সোপান প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন। আমাদের ভ্রান্তির রন্ধ্রপথে একদা যা ঘটেছিল—তার সম্বন্ধে সচেতন হওয়ার দিন এসে গেছে, স্বদেশপ্রাণ বঙ্কিমচন্দ্র তা বুঝেছিলেন। সমালোচক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারায়' 'মৃণালিনী' সম্বন্ধে বলেছেন,—

"হেমচন্দ্র, মাধবাচার্য, পশুপতি, লক্ষ্মণসেন, শান্তশীল—একটা বিশাল রাজনৈতিক সংকটের সন্ধিস্থলে এই সমস্ত অশরীরী প্রেতমূর্তিই জাতির ভাগ্যনিয়ন্তা, ইহা ভাবিতে মন একটা ক্ষুব্ধ অতৃপ্তি ও অবিশ্বাসের ভাবে পীড়িত হইতে থাকে—তাহারা বিশাল মুসলমান প্লাবন তরঙ্গের উপর ক্ষণস্থায়ী বুদ্‌বুদের মতই প্রতীয়মান হয়।"[১৫]

এই অবিশ্বাস্য ষড়যন্ত্রের প্রতিক্রিয়া সমগ্র জাতির প্রাণে সঞ্চার করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন ঔপন্যাসিক। বাঙ্গালীর রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিলুপ্তির লগ্নে সামগ্রিক দুর্বলতা জাতিকে গ্রাস করেছিলো,—মর্মান্তিক হলেও একথা সত্য। তাই 'মৃণালিনী' উপন্যাসকে শুধু কল্পনাশ্রয়ী বা রোম্যান্টিক উপন্যাস না বলে এর সত্যতার ভিত্তিকে স্বীকার করা দরকার। আত্মদোষ অস্বীকারের হীনতা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী জাতিকে রক্ষা করেছিলেন এই উপন্যাসে। স্বাধীন ভারতবর্ষের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের অতীতকীর্তির আলোচনায় এ জাতীয় মহিমা আরও বেশী উজ্জ্বল বলে মনে হয়। যদিও সে যুগের বাঙ্গালী উদ্দীপনার মুহূর্তে এ উপন্যাসের

---

১৫. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, মৃনালিনী প্রসঙ্গে আলোচনা, পৃঃ ৭৫।

উত্তেজনার অংশ থেকে যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছে,—হেমচন্দ্রের দুর্বলতার বিচার না করে —তাঁর বীরত্বের-শৌর্যের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছে, উপন্যাসের ফলাফল নিয়ে মাথা ঘামানোর সময় ছিল না কারো।

বঙ্কিমচন্দ্র নিছক ভাববিলাস ও বায়বীয় উচ্ছ্বাসকে বরাবরই নিন্দনীয় বস্তু বলেই সমালোচনা করেছেন। তাঁর স্বদেশচিন্তা যুক্তি ও চিন্তাশক্তি দুটিকেই অবলম্বন করেছে। কায়িক বলের ওপরে জোর না দিয়ে মানসিক দৃঢ়তাকেই স্বদেশপ্রেমের বড়ো সম্বল বলে মনে করেছিলেন তিনি। তাঁর সমগ্র স্বদেশপ্রেমমূলক উপন্যাসের নায়কবৃন্দ মানসিক জটিলতার আবর্তে পড়েই আজীবনের স্বপ্ন ও সাধনাকে বিসর্জন দিয়েছেন। "মৃণালিনী" উপন্যাসেই প্রথম বাঙ্গালীর চারিত্রিক দুর্বলতা ও হিন্দুশক্তির পরিকল্পনাবিহীন দেশাত্মবোধের চিত্র অঙ্কন করেছেন। নিছক বায়বীয় উচ্ছ্বাসের পরিণাম কি হতে পারে,—বঙ্কিমচন্দ্র এখানে সেই সত্যটিই তুলে ধরেছিলেন। তবু হেমচন্দ্র ও মাধবাচার্য যে আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অসংখ্য ক্রটি থাকা সত্ত্বেও 'মৃণালিনী' সে যুগের জনপ্রিয় উপন্যাস।

'মৃণালিনীর' প্রথমাংশেই পূব ভারতের দুর্যোগের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মগধ রাজপুত্র হেমচন্দ্র পিতৃরাজ্য উদ্ধারের জন্য চেষ্টারত। কিন্তু শত্রু হত্যায় বীরত্ব প্রদর্শন করাই হেমচন্দ্রের আদর্শ।

আমি কি চোরের মত বিনাযুদ্ধে শত্রু মারিব? আমি মগধ বিজেতাকে যুদ্ধে জয় করিয়া পিতার রাজ্য উদ্ধার করিব। নহিলে আমার মগধ—রাজপুত্র নামে কলঙ্ক।

[১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]

এই উক্তির মধ্যে যথেষ্ট বীররস আছে—হেমচন্দ্রের দৃঢ়তা ও সাহসের অনবদ্য প্রকাশ এখানে দেখি। কিন্তু হেমচন্দ্রের এই পৌরুষ ও বীর্যের অন্তরালে দুর্বলতার স্বরূপটিও লেখক পরক্ষনেই ব্যক্ত করেছেন। মাধবাচার্য তাকে সস্নেহ তিরস্কার করেছেন,—

"তুমি দেবকার্য না সাধিলে কে সাধিবে? তুমি যবনকে না তাড়াইলে কে তাড়াইবে? যবন নিপাত তোমার একমাত্র ধ্যান স্বরূপ হওয়া উচিত। এখন মৃণালিনী তোমার মন অধিকার করিবে কেন?" [ঐ]

মাধবাচার্য দেশরক্ষার পবিত্র কর্তব্যকে দেবকার্য বলেছেন। দেশসচেতন করে তোলার জন্যই প্রিয় শিষ্য হেমচন্দ্রকে তিনি তীব্র ভাষায় তিরস্কার করেছেন। মাধবাচার্য গণনা করে দেখেছেন,—"যখন পশ্চিমদেশীয় বণিক বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে তখন যবন রাজ্য উৎসন্ন হইবেক।"

এই ইঙ্গিতময় বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করে মাধবাচার্য হেমচন্দ্রের ওপরেই যবনরাজ্য ধ্বংসের দায়িত্ব দিয়েছেন। মাধবাচার্যের আদেশ অমান্য করার উপায় ছিল না হেমচন্দ্রের,—কিন্তু প্রেমচিন্তা এই ব্যক্তিটির সমগ্র ব্যক্তিত্বকেই প্রায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। শক্তিমান হয়েও হেমচন্দ্র তাই দেশরক্ষার মহৎ নেতৃত্ব পালন করতে পারেননি। একই সঙ্গে বীরত্ব ও দুর্বলতা হেমচন্দ্রকে কখনও উদ্দীপ্ত কখনও বা ম্রিয়মান করেছে। উপন্যাসের নায়ক হিসেবে হেমচন্দ্র কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও স্বদেশপ্রেমিক বীর চরিত্রের মর্যাদা কিছুতেই হেমচন্দ্রকে দেওয়া যায়না। বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে প্রথম থেকেই সে বিষয়ে সচেতন করার চেষ্টা করেছেন। তবু যে হেমচন্দ্র সেযুগে আদর্শ চরিত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছিল তার কারণ যবন উৎপাটনের সদিচ্ছা একদা তিনিই উচ্চরবে ঘোষণা করেছিলেন।

'মৃণালিনী' উপন্যাসের পটভূমিকায় বিদেশী শত্রুসৈন্যের আবির্ভাব পাঠককে কৌতূহলী করে। রাজা লক্ষ্মণসেন বৃদ্ধত্বে উপনীত, বার্ধক্যহেতু শত্রুর হাতে রাজ্য তুলে দেওয়ার যে ঘৃণ্য প্রস্তাবটি তিনি উচ্চারণ করেছিলেন তাতে মর্মাহত হয়েছিল সভাস্থল,—মাধবাচার্য ক্রন্দন করেছিলেন। মাধবাচার্যের এই দেশানুভূতি পাঠকের চিত্তকে দ্রব করেছে। বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনের অসহায় মূর্তি আমাদের করুণা সঞ্চার করেনি কিন্তু দুরভিসন্ধি থাকা সত্ত্বেও পশুপতি শত্রুদমনের আয়োজন করে স্বদেশ-প্রেমিকতার জোরে আমাদের সমর্থন লাভ করেছেন। শত্রুদূতের কাছে চতুর রাজনীতিজ্ঞ পশুপতি বলেছিলেন,—

'আমি এ রাজ্য তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিব কি না, তাহা অনিশ্চিত। স্বদেশ-বৈরিতা মহাপাপ। আমি এ কর্ম কেন করিব ?' [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, ২য় খণ্ড]

আবার দুরভিসন্ধিপরায়ণ পশুপতি আবেগভরে গৃহদেবী অষ্টভূজা মূর্তির কাছে প্রণাম জানিয়ে বলেছে,—

"আমি অকূলসাগরে ঝাঁপ দিলাম, দেখিও মা! আমায় উদ্ধার করিও। আমি জননীস্বরূপা জন্মভূমি কখনও দেববেষী যবনকে বিক্রয় করিব না।"

[সপ্তম পরিচ্ছেদ ২য় খণ্ড]

পশুপতির স্বার্থবোধ এ চরিত্রের সমস্ত সদগুণ বিনষ্ট করেছে। মাধবাচার্যের সুপরামর্শও পশুপতি অগ্রাহ্য করেছে। এ বঙ্গভূমিকে জননীস্বরূপা মনে করেও পশুপতি নির্বোধের মত যবনের হাতেই তা সমর্পণ করেছে। সর্বোপরি মগধ ও বঙ্গকে একত্রিত করে শত্রু সৈন্যকে বিতাড়িত করার সুপরামর্শ অগ্রাহ্য করে পশুপতি হেমচন্দ্রকেও বিপদগ্রস্ত করেছে। তথাপি এ চরিত্রটি সম্বন্ধে ঔপন্যাসিকের কিঞ্চিৎ সহানুভূতি ছিল,—

"যে ব্যক্তি রাখিলে গৌড় রাখিতে পারিত, সে ঊর্ণনাভের ন্যায় বিরলে বসিয়া অভাগা জন্মভূমিকে বদ্ধ করিবার জন্য জাল পাতিতেছিল।"

[১ম পরিচ্ছেদ, চতুর্থ খণ্ড]

বঙ্কিমচন্দ্রের এ ক্ষোভের সীমা নেই। অতীত ইতিহাসের এই কলঙ্কজনক ইতিবৃত্তের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাই তিনি বেদনার্ত।

ইতিহাসবর্ণিত যে ঘটনার সত্যতায় বঙ্কিমচন্দ্র সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন, বঙ্গদেশ বিজয়ী সেই সপ্তদশ অশ্বারোহীর প্রসঙ্গটি বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসের যবনদূত-যমদূত অংশে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। পশুপতির মন্ত্রণানুসারেই এই ব্যবস্থা হয়েছিল, নতুবা সপ্তদশ অশ্বারোহীর পক্ষে যথার্থ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বিজয়ী হওয়াটা অসম্ভব ছিল, এ কথা প্রমাণের জন্যই পশুপতি চরিত্রটি কল্পনা করেছিলেন তিনি।

বঙ্গদেশ শত্রুকরতলগত হল। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছেন। গৌড়ের স্বাধীনতা বিলুপ্তির এই হৃদয়বিদারক অংশটি বর্ণনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে আত্মগোপন বা আত্মসংযম পালন করা কোনমতেই সম্ভব ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই মনোবেদনা প্রকাশ করেছিলেন এভাবে,

"সেই রাজকুলকলঙ্ক, অসমর্থ রাজার সঙ্গে গৌড়রাজ্যের রাজলক্ষ্মীও যাত্রা করিলেন। ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।"

[চতুর্থ পরিচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড]

লক্ষ্মণসেনের উপযুক্ত বিশেষণই দান করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, কারণ উপন্যাসে তাঁর কলঙ্কিত আচরণের দৃষ্টান্ত রয়েছে। রাজ্যবিজয়ী বখ্‌তিয়ারের বিশেষণটি সে তুলনায় লঘু। যে আমাদের প্রিয়জন, আশা ভরসার স্থল, কর্তব্যপালনে বিমুখ হলে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে সমালোচনা কেবল আমরাই করতে পারি।

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচকের আসনে উপবিষ্ট হয়ে মন্তব্য করেছেন, "ষষ্টি বৎসর পরে যবন ইতিহাসবেত্তা মিনূহাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমান কর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা, আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক।"

এই ক্ষোভ ও দুঃখ নিবারণের জন্যই 'মৃণালিনীর' পরিকল্পনা কিন্তু উপন্যাসেও বাস্তবতা সৃষ্টি করতে গিয়ে শিহরিত হয়েছিলেন তিনি। আমাদের জাতীয় দুর্বলতার বিষময় পরিণতি নতুন করে তাঁকে বেদনার্ত করেছে। পশুপতির অদূরদর্শিতার ভয়াবহ ফলাফল সম্বন্ধে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র,

আমরা পাঠক মহাশয়ের নিকট পশুপতিকে বুদ্ধিমান বলিয়া পরিচিত করিয়াছি। পাঠক মহাশয় বলিবেন, যে ব্যক্তি শত্রুকে এতদূর বিশ্বাস করিল, সহায়হীন হইয়া তাহাদিগের অধিকৃত পুরীমধ্যে প্রবেশ করিল, তাহার চতুরতা কোথায়? কিন্তু বিশ্বাস না করিয়া কি করেন। এ বিশ্বাস না করিলে যুদ্ধ করিতে হয়। উর্ণনাভ জাল পাতে, যুদ্ধ করে না। [পঞ্চম পরিচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড]

বঙ্কিমচন্দ্রের এই কৈফিয়ৎটির নানা সমালোচনার প্রসঙ্গে পূর্বে আলোচনা করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা কতটা নিখুঁত হলে আমরা খুশী হতাম আপাততঃ সে প্রসঙ্গ অবান্তর। পশুপতিকে নিছক পশু চরিত্ররূপে দেখালে আমরা সন্তুষ্ট হতাম কি না কে জানে। তবে স্বার্থসিদ্ধির জন্য সচেতন পশুপতি যথেষ্ট দক্ষতা থাকা সত্বেও যে সর্বনাশা কর্মজালে জড়িয়ে পড়লেন সেই চিত্রটি রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র যে সত্যিই দক্ষতা দেখিয়েছিলেন তাতে আমরা নিঃসন্দেহ। পশুপতি চরিত্রে স্বার্থপরতা ও নীচতা যতই থাক না কেন বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ছিলেন স্বদেশপ্রেমী। ইতিহাসের ব্যর্থতা থেকে তিনি ভবিষ্যতের আশার দীপটি জ্বালিয়ে নিতে চান। এই দুঃখের অনুভব নিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র আলোকিত ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছিলেন,—"নবদ্বীপ জয় সম্পন্ন হইল। যে সূর্য সেইদিন অস্তে গিয়াছে, আর তাহার উদয় হইল না। আর কি উদয় হইবে না? উদয় অস্তও স্বাভাবিক নিয়ম!"

'মৃণালিনী' উপন্যাসের নায়ক হেমচন্দ্রকেই সর্বাপেক্ষা নিষ্প্রভ মনে হয়। স্বদেশোদ্ধারের প্রেরণা যদি স্বতঃস্ফূর্ত না হয়ে আরোপিত হয়—তার আবেগও যে অত্যন্ত স্তিমিত হবে তা সহজেই বোঝা যায়। মৃণালিনী ধ্যানমগ্ন হেমচন্দ্রকে স্বদেশপ্রেমিকের ভূমিকায় তাই বেমানান লাগে। শত্রু অধিকৃত নবদ্বীপে যুদ্ধসাজে সজ্জিত হয়ে হেমচন্দ্র একবার যুদ্ধোদ্যম করেছিলেন কিন্তু তৎক্ষণাৎ নিরস্ত হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন,—

"একটি একটি যবন মারিয়া কি করিব? যবন যুদ্ধ করিতেছে না যবনবধেই বা কি সুখ? বরং গৃহীদের রক্ষার সাহায্যে মন দেওয়া ভাল।"

[সপ্তম পরিচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড]

মৃণালিনী লাভের সাধনায় মনোনিবেশ করেছিলেন হেমচন্দ্র সুতরাং তাঁর সেই বাসনা পূর্তির জন্যই যাবতীয় ঘটনাজালের পরিকল্পনা করেছেন ঔপন্যাসিক। স্বদেশপ্রেমের আন্তরিক পরিচয় দিতে পারেননি বলে হেমচন্দ্রের ওপর দোষারোপ করাটা অর্থহীন।—মাধবাচার্যই নির্বাচনে ভুল করেছিলেন বলেই আমাদের ধারণা। মাধবাচার্যের ভ্রান্তি কিন্তু তখনও কাটেনি। যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করেছে বটে—মাধবাচার্যের দুরাশা তখনও দমিত হয়নি,—

"যবনেরা নবদ্বীপ অধিকার করিয়াছে বটে, কিন্তু নবদ্বীপ ত গৌড় নহে। প্রধান রাজা সিংহাসন ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছেন। কিন্তু এই গৌড়রাজ্যে অনেক করপ্রদ রাজা আছেন; তাহারা ত এখনও বিজিত হয়েন নাই। কে জানে যে, সকল রাজা একত্র হইয়া প্রাণপণ করিলে, যবন বিজিত না হইবে?"

[দ্বাদশ পরিচ্ছেদ, ৪র্থ খণ্ড]

এই শুভসঙ্কল্প জাগ্রত করা মাধবাচার্যের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে যুগের পটভূমিকায় এমন চিন্তাও প্রায় অসম্ভব ছিল। মাধবাচার্যের প্রযত্নেও হেমচন্দ্র ও পশুপতি একত্রিত হয়ে যবন বিতাড়নের চেষ্টা করেননি। সুতরাং এর চেয়েও মহৎ আশার স্বপ্ন দেখাটাই আশ্চর্যের ব্যাপার। সম্ভবতঃ এই যুক্তি ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্রের। ইতিহাসের অস্বস্তিকর বিবরণকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র নতুন করে আমাদের দোষত্রুটি ও অনৈক্যের ইতিহাস আবিষ্কার করলেন। এই আত্মবিশ্লেষণের ফলে নতুন করে আঘাত পাওয়া ছাড়া অন্য কিছু লাভ হয়নি তাঁর। তবে এই জাতীয় বিশ্লেষণের চেষ্টা করে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালী জাতির প্রতি আন্তরিক প্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম আত্মপ্রকাশ 'মৃণালিনীতেই'। অনেকের মতোই সমালোচক অক্ষয়চন্দ্র দত্তগুপ্ত স্বীকার করেছেন,—

"ভবিষ্যতে কোনও কোনও গ্রন্থে যে বঙ্কিমচন্দ্র অতুলনীয় স্বদেশভক্তির পরিচয় দিয়াছেন, 'মৃণালিনী'তে তাহার সূচনা দেখা যায়। সপ্তদশ পাঠান অশ্বারোহী এই বাঙ্গলা দেশটাকে একদিনে জয় করিল বলিয়া যে আখ্যান ইতিহাসে স্থান পাইয়াছে উহার অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে বঙ্কিমই বোধ হয় প্রথম লেখনী ধারণ করেন।"[১৬]

কোন একজন ঔপন্যাসিক সম্পর্কে এই শ্রদ্ধেয় উক্তিই স্বাদেশিকতার চরম প্রমাণ। যিনি রসসৃষ্টির ও রসদৃষ্টির পরিচয় দিতে গিয়েও স্বাদেশিকতার স্বতঃস্ফূর্ত স্বাক্ষর রেখেছেন তাঁর অসামান্য কৃতিত্বের পরিমাপ সাধারণ সাহিত্যিকের মানদণ্ডে চলতে পারে না। তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে সাধারণ নিয়মে বিচার করতে গিয়েই ভুল করি আমরা। উপন্যাসে বাঙ্গালী জীবনচিত্র ফোটানোর জন্য বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাস থেকে অধুনা পর্যন্ত যথার্থ বাঙ্গালী চরিত্র খুঁজে বেড়িয়েছিলেন। দেশপ্রীতির আবেগে এই অনুসন্ধানের তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বেড়েই গিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর দুর্বলতার অপবাদ ও গ্লানি ঘোচাতে চেয়েছিলেন,—কিন্তু তা যে সম্ভব নয় এ সত্যও তাঁর অভিজ্ঞতালব্ধ আবিষ্কার। ঐতিহাসিক বিবরণের যথার্থ রূপ বজায় রাখা উপন্যাসে অবান্তর চেষ্টা বলে ইতিহাসের স্পর্শ থেকে চরিত্রগুলোকে গ্রহণ করেও উপন্যাসে তাকে জীবন্ত করে

১৬. অক্ষয়চন্দ্র দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩২৭, পৃঃ ১৭৪।

তোলার শৈল্পিক চেষ্টা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র বিরত হননি। 'মৃণালিনীর' পরেই বঙ্কিমচন্দ্র অধুনাতন সমস্যা নিয়ে সামাজিক উপন্যাস রচনায় মন দিলেন। 'বিষবৃক্ষ' থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সে চেষ্টাই করেছেন,—শুধু 'চন্দ্রশেখরই' তার ব্যতিক্রম।

দেশপ্রেমিকতা বঙ্কিমচন্দ্রকে ঔপন্যাসিক হিসেবে পৃথক মর্যাদাদান করেছে 'চন্দ্রশেখরেও' সে পরিচয় মিলবে। 'দুর্গেশনন্দিনী' ও 'মৃণালিনীতে' প্রত্যক্ষ স্বদেশপ্রীতির পরিচয় পেয়েছি আমরা। বঙ্কিমচন্দ্র অতীত ইতিহাসের অনালোকিত অধ্যায়কে উজ্জ্বল করার চেষ্টা করেছিলেন,—চন্দ্রশেখরে ঠিক সেজাতীয় কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কোন বিশেষ উদ্দেশ্যের প্রতি একনিষ্ঠতা ঔপন্যাসিকের লক্ষ্যণীয় ত্রুটি বলেই সমালোচনা করা হয়ে থাকে। 'মৃণালিনী'তে সে চেষ্টা লক্ষ্য করেছি আমরা। 'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পসৃষ্টির মুখ্য দায়িত্ব পালন করেছেন,—চরিত্রসৃজন ও নিপুণ মনোবিশ্লেষণে প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর নিষ্ঠাই এ উপন্যাসের সর্বত্র লক্ষ্যণীয়। মানব-চরিত্রের অতলগভীর রহস্যে অবগাহন করে বঙ্কিমচন্দ্র মানবজীবনের চূড়ান্ত ব্যর্থতার চিত্র অঙ্কন করেছেন এখানে। স্বদেশপ্রীতির মত নিতান্তই সাময়িক উত্তেজনা থেমে গেলেও এ উপন্যাসের বক্তব্য পাঠক আগ্রহভরে পাঠ করবে। এই উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র স্বতঃসিদ্ধরূপে ইতিহাসের সংশ্রব রক্ষা করেছেন। এ সম্পর্কে সমালোচক শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন,—"বাঙ্গালীর বীরত্ব ও মহত্ত্ব প্রদর্শনের বাসনা বরাবরই তাঁহার মনে জাগরূক ছিল। কিন্তু নিজের পারিপার্শ্বিক সমাজ জীবনের মধ্যে তাহার বিশেষ স্ফূর্তি তিনি দেখিতে পান নাই সুতরাং তিনি আবার অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ছিলেন। ইতিহাসের আশ্রয় তাহার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না; রমানন্দ স্বামী, চন্দ্রশেখর, প্রতাপ এবং রামচরণ তাঁহারই মানসপুত্র, ইতিহাসের পটভূমিকায় তাহাদিগকে সজীবতা দিবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্র মীরকাশিমের সহিত ইংরেজের সংঘর্ষ কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছিলেন।"

[ভূমিকা, 'চন্দ্রশেখর', বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত]

ইংরেজ অধিকারের পর বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থা এ উপন্যাসে পটভূমিকা-রূপে চিত্রিত হয়েছে। সিরাজদ্দৌলার পতনের পর মীরকাশেমের উত্থানে বাংলার ভাগ্যাকাশে যে ক্ষণিক আশার আলো দেখা গিয়েছিল বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময়টিকে উপন্যাসের কাল হিসেবে বেছে নিয়েছেন। যদিও মূল ঘটনার সঙ্গে ইতিহাসের এই সংযোগটুকু না রাখলে উপন্যাসের কতখানি ক্ষতিবৃদ্ধি হোত সেটা পৃথক আলোচনার বস্তু। ইতিহাসের এই অধ্যায়টুকুর আলোচনা প্রসঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের দেশচর্চার সুযোগ আমরা লাভ করেছি তাতে সন্দেহ নেই। ইংরেজশাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেও

বাংলাদেশে শান্তি ছিল। কিন্তু বিদেশীশাসকের অত্যাচার যখন তীব্র হয়ে উঠত তখন তার প্রতিবাদে মাথা উচু করে দাঁড়াতে সাহস করত এমন অনেক শক্তিমান জমিদারও সেযুগে ছিল। শৈবলিনীর লরেন্‌স ফস্‌টরের হাতে ধরা পড়ার জন্ম লরেন্‌স ফষ্টরের প্ররোচনা বা অত্যাচার কতটুকুই বা। কিন্তু প্রতাপের ক্রোধবহ্নি জ্বালিয়ে তোলার জন্ম সেটুকুই যথেষ্ট ছিল। উপন্যাসের নায়ক প্রতাপ ইংরাজ-জাতিকে শত্রু বলে মনে করেছে,—যদিও তার পেছনে কারণটি নিতান্ত সঙ্গতিহীন। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে প্রতাপের প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার প্রসঙ্গটি অনাবশ্যকভাবে বর্ণনা করেছেন। নিতান্তই স্বজাতিপ্রীতি ছাড়া এ জাতীয় অনাবশ্যক বর্ণনার অন্য কোন হেতু নেই। প্রতাপকে সমগ্র বঙ্কিমউপন্যাসের আদর্শ চরিত্ররূপে মনে করেন অনেকে। কিন্তু সে প্রসঙ্গের অভ্যন্তরে না গিয়ে শুধু বাঙ্গালী বীর হিসেবে প্রতাপকে বঙ্কিমচন্দ্র যে ভাবে চিত্রিত করেছেন তাতে নিছক স্বাজাত্যাভিমান ছাড়া অন্য কিছু খুঁজে পাই না আমরা। দেশপ্রীতি ও জাতিপ্রীতি বঙ্কিমচন্দ্রকে কতখানি মোহগ্রস্ত করেছিল তার প্রমাণ হিসেবে এ অংশটুকুর বিশেষ মূল্য রয়েছে,—

প্রতাপ জমিদার এবং প্রতাপ দস্যু। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময়ের অনেক জমিদারই দস্যু ছিলেন। বাস্তবিক দস্যুবংশে জন্ম অগৌরবের কথা বলিয়া বোধ হয় না, কেন না, অন্যত্র দেখিতে পাই, অনেক দস্যুবংশজাতই গৌরবে প্রধান। [৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]

দস্যুতার স্বপক্ষে এই যুক্তিপ্রদর্শন শুধু প্রতাপের পরিচয়কে উজ্জ্বল করার উদ্দেশ্যেই যে বর্ণিত হয়েছে তাতে সন্দেহ থাকে না। প্রতাপকে বাঙ্গালী বীরের আদর্শরূপে দেখাবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন,

"তবে অন্যান্য প্রাচীন জমিদারের সঙ্গে প্রতাপের দস্যুতার কিছু প্রভেদ ছিল। আত্মসম্পত্তি রক্ষার জন্য বা দুর্দান্ত শত্রুর দমন জন্যই প্রতাপ দস্যুদিগের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। অনর্থক পরস্বাপহরণ বা পরপীড়ন জন্য করিতেন না; এমনকি, দুর্বল বা পীড়িত ব্যক্তিকে রক্ষা করিয়া পরোপকার জন্যই দস্যুতা করিতেন। [ঐ]

এ জাতীয় যুক্তির আধিক্যে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাজাত্যাভিমানের উচ্ছ্বসিত প্রকাশ দেখা যায়। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রকে এমনভাবে উপন্যাসে আবিষ্কার করায় কিছু মাত্র বিস্মিত হই না কারণ উপন্যাসে এ জাতীয় উচ্ছ্বাস বারংবারই লক্ষ্য করেছি। স্বদেশপ্রেমই বঙ্কিমচন্দ্রের ঔপন্যাসিক চিন্তাধারাকে এভাবে প্রভাবিত করেছিল, একথা অকপটে বলা চলে। প্রতাপের এই নির্ভীকতা ও বীরত্ব দেখেও তাঁকে আমরা স্বদেশপ্রেমিক বলতে পারি না। স্বদেশপ্রেমের কোন সূক্ষ্ম অনুভূতি তাঁর চরিত্রে ছিল না। ইংরেজবিদ্বেষ প্রতাপের চরিত্রে স্বদেশপ্রেমের প্রতিক্রিয়ারূপে

দেখানো হয়নি। অথচ ইংরেজজাতির বিরোধিতা করতেই মনস্থ করেছিলেন তিনি। শত্রুকে বিনাশ করার চেষ্টামাত্রকেই আমরা স্বদেশপ্রাণতা বলি না,—আরও গভীর দেশানুরাগের আবেগ থেকেই স্বদেশপ্রেমের জন্ম। সুতরাং প্রতাপের ইংরেজ-বিদ্বেষকে নিতান্তই সাময়িক অনুভব বলেই বর্ণনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

'ইংরেজজাতি বাঙ্গালায় না আসিলে, শৈবলিনী লরেন্‌স ফষ্টরের হাতে পড়িত না। অতএব ইংরেজজাতির উপরও প্রতাপের অনিবার্য ক্রোধ জন্মিল। প্রতাপ সিদ্ধান্ত করিলেন ফষ্টরকে আবার ধৃত করিয়া, বধ করিয়া এবার অগ্নি সংকার করিতে হইবে—নহিলে সে আবার বাঁচিবে—গোর দিলে মাটি ফুঁড়িয়া উঠিতে পারে। দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত এই করিলেন যে, ইংরেজ জাতিকে বাংলা হইতে উচ্ছেদ করা কর্তব্য ; কেননা, ইহাদিগের মধ্যে অনেক ফষ্টর আছে।' [ঐ]

'চন্দ্রশেখরে' বঙ্কিমচন্দ্র যেযুগের ইতিহাস অবলম্বন করেছিলেন তাতে স্বদেশোচ্ছ্বাস প্রকাশে যথেষ্ট সুযোগ ছিল। এখানে শাসক ইংরেজ ও রাজ্যচ্যুত মুসলমান শাসকের সংঘর্ষ পটভূমিকারূপে ব্যবহৃত হয়েছে—সমসাময়িক দেশপ্রেম প্রচারের যুগে এ পটভূমিকাকে বঙ্কিমচন্দ্র কাজে লাগাতে পারতেন। কিন্তু উপন্যাসের দাবীকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শৈবলিনী ও প্রতাপের মনোবিশ্লেষণেই মনোযোগ দিয়েছিলেন তিনি। এতে উপন্যাসের আকর্ষণ বেড়েছে এবং শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতারই পরিচয় পেয়েছি। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসে সচেতন ভাবেই উপন্যাস রচনা করেছিলেন,—অন্য কোন উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রভাবিত হননি। তবু কোথাও কোথাও স্বদেশপ্রাণতা তাঁকে আত্মবিস্মৃত করেছিল বলেই অপ্রাসঙ্গিক অংশগুলো উপন্যাসে অঙ্গ হয়ে উঠতে পারেনি। প্রতাপ শৈবলিনীর এ আখ্যায়িকার মাঝখানে মীরকাসিমের প্রসঙ্গটি নিতান্তই পটভূমিকারূপে ব্যবহৃত হলেও মীরকাসেম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তাঁর দেশপ্রেম নিয়ে। পরবর্তীকালে দেশোচ্ছ্বাসের বন্যায় যে সব স্বদেশ-প্রেমিকেরা নাটকের নায়করূপে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মীরকাসেম তাঁদের অন্যতম। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাতেই মীরকাসেমের দেশপ্রেম প্রথম ধরা পড়েছিল। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করার পূর্বাহ্ণে চিন্তান্বিত মীরকাসেমের উক্তি থেকেই তাঁর দেশভাবনার পরিচয় স্পষ্ট। বৃহৎ শক্তির সামনে দাঁড়িয়ে ভাবী সর্বনাশের মুখেও মীরকাসেন আত্মরক্ষা করতে চাননি, যুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন,

"আমার আর উপায় নাই।...আমি নিশ্চিত জানি, এ বিবাদে আমি রাজ্যভ্রষ্ট হইব, হয়ত প্রাণে নষ্ট হইব। তবে কেন যুদ্ধ করিতে চাই ? ইংরেজেরা যে আচরণ করিতেছেন, তাহাতে তাহারাই রাজা, আমি রাজা নই। যে রাজ্যে আমি রাজা নই, সে রাজ্যে আমার প্রয়োজন ? কেবল তাহাই নহে। তাঁহারা বলেন, রাজা আমরা,

কিন্তু প্রজাপীড়নের ভার তোমার উপর। তুমি আমাদিগের হইয়া প্রজাপীড়ন কর, কেন আমি তাহা করিব? যদি প্রজার হিতার্থে রাজ্য করিতে না পারিলাম তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব, অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সিরাজউদ্দৌলা নহি বা মীরজাফরও নহি।" [১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]

এই উক্তি স্বদেশপ্রেমিকের। মীরকাসেমের এই বক্তব্য অন্ততঃ সেযুগের কাছে দেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত রূপেই গৃহীত হবে। এই চরিত্রের দেশপ্রেম যে পরবর্তীকালে নাটকের উপাদান হতে পারে তা এই সামান্য উদ্ধৃতি থেকেই অনুমান করা সম্ভব। কিন্তু মীরকাসেম এ উপন্যাসের নায়ক নন,—প্রতাপ শৈবলিনীর ঘটনাটিকে ইতিহাস-সম্পৃক্ত করার উদ্দেশ্যেই মীরকাসেমকে পটভূমিকায় এনেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু গৌণ চরিত্র হলেও মীরকাসেমের দৃঢ়তা ও দেশপ্রীতির অনাবিল পরিচয় পেয়েছি এ উপন্যাসে। শুধু তাই নয়, ইংরেজের রাজ্যলাভের মুহূর্তে সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফরের মূর্খতা ও বিশ্বাসঘাতকার প্রসঙ্গটি ব্যাখ্যা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইংরেজকে শত্রু বলে কল্পনা করার মত মানসিক দৃঢ়তাই মীরকাসেমের স্বাধীনচিত্ততার পরিচায়ক। 'চন্দ্রশেখরে' গুরগণ খাঁকে বিশ্বাসঘাতকের ভূমিকায় বর্ণনা করেছেন লেখক। অতিবিশ্বস্ত এই সেনাপতিও মীরকাসেমের কাছ থেকে কৌশলে রাজ্যলাভের বাসনা করেছিলো। এ চরিত্রটি আমাদের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাসে অনায়াসে স্থান পেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র কল্পনাবলে ইতিহাসের নিদারুণ সত্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা করেছিলেন মাত্র। গুরগণ খাঁর স্বগতভাষণ থেকে আমরা সেযুগের কুটিল রাজনীতির বিশদ পরিচয় পেতে পারি। মীরকাসেম মসনদে আছেন এইমাত্র, ইংরেজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটি ব্যাখ্যা করেছে গুরুগণ খাঁ,

"আমিই বাংলার কর্তা। আমি বাংলার কর্তা? কে কর্তা? কর্তা বড় উচ্চপদ! আমি বাংলার কর্তা না হই কেন? ইংরেজব্যাপারী—তাহাদের গোলাম মীরকাসেম; আমি কর্তার গোলামের গোলাম। কে আমার তোপের কাছে দাঁড়াইতে পারে? কিন্তু ইংরেজকে দেশ হইতে দূর না করিলে আমি কর্তা হইতে পারিব না। ...এখন মীরকাসেম মসনদে থাক, তাহার সহায় হইয়া বাংলা হইতে ইংরেজ নাম লোপ করিব।" [২য় খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ]

গুরগণ খাঁর এ অভিসন্ধির গূঢ়ার্থ শুধু বিশ্বাসঘাতকতার অভিজ্ঞতায় অভ্যস্ত আমরাই এক নিমিষে অনুধাবন করতে পারি। গুরগণ খাঁ মীরজাফরের উত্তর সাধকমাত্র। বঙ্গইতিহাসের যে অধ্যায়টুকু আমরা মোটামুটি জানি বঙ্কিমচন্দ্র তারই চিত্র রচনা করেছেন এ উপন্যাসে। তবে এই অংশটুকু 'চন্দ্রশেখরের' উল্লেখযোগ্য কোন অধ্যায় নয়, শুধু পটভূমিকা মাত্র। কিন্তু ইতিহাসের একটা মুমূর্ষু মুহূর্তকে

বঙ্কিমচন্দ্র রূপায়িত করেছিলেন পরম যত্নে। ইতিহাসের সত্যকে তুলে ধরার ইচ্ছা থেকেই এ অংশের অবতারণা। তাই এ অংশে পলাশীর যুদ্ধের নায়ক সিরাজউদ্দৌলা, মীরজাফরকে সামনে আনেননি বটে কিন্তু কোন কোন সুনির্বাচিত উক্তির মধ্যে সেই স্মৃতি পুনর্জীবিত হয়েছে সন্দেহ নেই। মীরকাসেম নিজেকে সিরাজউদ্দৌলা ও মীরজাফরের থেকে পৃথক চরিত্র বলে মনে করেছিলেন।

'চন্দ্রশেখরে' ইংরেজের সঙ্গে মুসলমান ও হিন্দুর মিলিত সংঘর্ষ ঘটতে দেখি। যদিও এর পেছনে ব্যক্তিগত বিদ্বেষই সক্রিয় তবু সংঘর্ষ যখন শাসক ও শাসিতের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের পক্ষে তখন নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব হয়নি। শাসক ইংরেজের উদ্ধত মনোভাব যে কোন একটি সাধারণ সেনাপতির মধ্যেও কি ভাবে সঞ্চারিত হয়েছিল, তাদের উক্তি থেকেই সেটুকু উদ্ধার করা যায়। আমিয়ট, ফস্টর শাসক ইংরেজের যোগ্য প্রতিনিধি। গুরগণ খাঁর কৌশলে যুদ্ধ যখন ধূমায়িত হল, গুরগণ খাঁ, প্রতাপ ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্যই সক্রিয় অংশ নিলেন। প্রতাপের শৈবলিনী উদ্ধার এবং গুরগণ খাঁর মসনদস্বপ্ন এই যুদ্ধের অন্যতম কারণ। ফষ্টর সম্মুখ যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়িয়েও কর্তব্য ঠিক করলেন,—তার ধারণা ও বিশ্বাসটি বঙ্কিমচন্দ্র এভাবে প্রকাশ করেছেন,—

তিনি পলাশীর যুদ্ধের পর ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন; দেশী লোকে যে ইংরেজকে লক্ষ্য করিবে, একথা তিনি মনে স্থান দিলেন না। বিশেষ ইংরেজ হইয়া যে দেশীশত্রুকে ভয় করিবে তাহার মৃত্যু ভাল। [২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ]

পলাশীর যুদ্ধের পর থেকে শাসক ইংরেজ যদি এদেশবাসী সম্পর্কে এ জাতীয় ধারণাই পোষণ করে থাকে তবে খুব বেশী অবাক হবার কিছু নেই। বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার সময়ে আমাদের দুর্বলতার নির্ভুল হিসাব প্রতিপক্ষ নিয়েছিল নিশ্চয়ই। বঙ্কিমচন্দ্র শুধু সেই মনোভাবটি ব্যাখ্যা করেছেন—কিন্তু এর অন্তর্নিহিত ইঙ্গিত বুঝে নিতে সেযুগের আত্মসচেতন বাঙ্গালীর খুব বেশী অসুবিধে হয়নি। এভাবেই রাজনীতির জটিল রহস্য নিয়ে অবলীলাক্রমে নাড়াচাড়া করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র; কোথাও বিস্তৃতি নেই,—অতিশয়োক্তি নেই, কিন্তু অভ্রান্ত লক্ষ্যবস্তুটি তিনি চিনিয়ে দিয়েছিলেন।

আমিয়টের নির্দেশে প্রতাপ রায়কে ধরার জন্য প্রতাপের বাড়ীতে উপস্থিত দুজন ইংরেজের মুখে একটি লক্ষ্যণীয় উক্তি শুনতে পাই। বদ্ধ দরজায় পদাঘাতের নির্দেশ দিয়ে জনসন বলেছিল,

"অপেক্ষা কেন, লাথি মার, ভারতবর্ষীয় কবাট ইংরেজি লাথিতে টিকিবে না।"

[২য় খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ]

পদাঘাতে কবাট ভেঙ্গে পড়ায় জনসন সদম্ভে বলেছে,—

"এইরূপে ব্রিটিশ পদাঘাতে সকল ভারতবর্ষ ভাঙ্গিয়া পড়ুক।" [ঐ]

এই বর্ণনায় আত্মশক্তি সঞ্চারের একটি পরোক্ষ চেষ্টা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিহাসের সত্যই ভবিষ্যতের কর্মপন্থার নিয়ামক হোক, রুদ্ধশ্বাসে অপমান ও অপবাদ সহ্য করেও শক্তি সঞ্চয়ের জন্ম উদ্যোগী হতে হবে, এ নির্দেশ স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের। ইংরেজের চরিত্রে শিক্ষণীয় বস্তুটিও বঙ্কিমচন্দ্র আমিয়টের চরিত্রে দেখিয়েছেন। আত্মরক্ষা যে সম্মান রক্ষার চেয়ে বড়ো জিনিষ নয়—আমিয়টই সেকথা বলেছে,—

'যেদিন একজন ইংরেজ দেশী লোকের ভয়ে পলাইবে, সেইদিন ভারতবর্ষে ইংরেজ সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিলুপ্ত হইবে। দাঁড়াইয়া মরিব সেও ভাল, তথাপি ভয় পাইয়া পলাইব না।' [পঞ্চম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]

ইংরেজের জাতিগত এই গুণটি সেযুগের বাঙ্গালীরা অনুকরণ করতে প্রস্তুত হয়েছিল। আত্মদানের সাহস সমগ্র জাতির প্রাণে সেদিন অভূতপূর্ব শক্তিসঞ্চার করেছিল। আত্মরক্ষার ভীরুতা সমগ্র জাতির চরিত্রে কলঙ্কলেপন করবে, এই সত্যটি যেদিন আমরা বুঝতে সক্ষম হয়েছি,—তখনই বঙ্কিমচন্দ্র আমিয়টের চারিত্রিক বীরত্ব, অকুতোভয় হৃদয়টি আমাদের সামনে মেলে ধরলেন। জাতির জন্য, দেশের জন্য, নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে মৃত্যুবরণ করেছে আমিয়ট,

"মরিব। আমরা আজি এখানে মরিলে ভারতবর্ষে যে আগুন জ্বলিবে, তাহাতে মুসলমান রাজ্য ধ্বংস হইবে। আমাদের রক্তে ভূমি ভিজিলে তৃতীয় জর্জের রাজপতাকা তাহাতে সহজে রোপিত হইবে।" [ঐ]

এই আত্মত্যাগের মহিমা ও নির্ভীকতাই মুষ্টিমেয় ইংরেজের সাফল্যের সূচনা করেছিল। বঙ্গ ইতিহাসের পরিচিত অধ্যায়টি উপন্যাসে যোজনাকালে বঙ্কিমচন্দ্র পূর্ণ নিরপেক্ষতার প্রমাণ রেখে যেতে পারেননি—কিন্তু যথাসম্ভব সত্যতা ও ঐতিহাসিকতাকে রক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। লেখক ইংরেজের চরিত্রে প্রশংসনীয় দিকটি যেমন উদারভাবে বর্ণনা করেছেন,—মীরকাসেমের দেশপ্রেম বর্ণনাতেও তেমনি উচ্ছ্বসিত হয়েছেন। কিন্তু প্রতাপকে বাঙ্গালী বীর হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিতে গিয়েই অতিশয়োক্তির আশ্রয় নিতে হয়েছে তাঁকে। প্রতাপ শৈবলিনীর উদ্ধারের জন্ম যে অসমসাহসিকতা প্রদর্শন করেছিলেন, প্রকারান্তরে সে শক্তির মধ্যেই হিন্দুবীরের মহত্ব ও শৌর্য অনুসন্ধানের চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

'দুর্গেশনন্দিনীর' পর 'মৃণালিনীতেই' বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রাণতার সুস্পষ্ট পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু 'চন্দ্রশেখরে' সে চেষ্টা ছিল না কোথাও। কিন্তু দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় যেমন তাঁর সব রকমের রচনাতেই স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে 'চন্দ্রশেখরে'ও সে আভাস মিলছে। ইংরেজের হাতে পলাশীর যুদ্ধে বাঙ্গালীর নতুন করে যে

ভাগ্যবিপর্যয় ঘটেছিলো। সে কাহিনী স্মরণ করতে গিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র বেদনার্ত হয়েছেন। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 'চন্দ্রশেখরের' সমালোচনায় যে কথাটি বলতে চেয়েছেন,—

"বৈদেশিক শক্তির অভিভবে আমাদের গার্হস্থ্যজীবনে যে বিক্ষোভ জাগিয়া উঠে, তাহাতে অন্তর্বিপ্লবের কোন গূঢ় সৌন্দর্য থাকে না, কেবল একটা বাহ্য ঘটনাবৈচিত্র্য থাকে মাত্র। আর অত্যাচারী ও অত্যাচারিত সংঘর্ষে, যেখানে একপক্ষ কেবল পাইবার লোভে আক্রমণ করিতেছে এবং অপরপক্ষ ব্যাকুল, দুর্বলভাবে অপ্রতিবিধেয় শক্তির বিরুদ্ধে আত্মরক্ষায় বৃথা চেষ্টা করিতেছে সেখানে আমাদের মনে বিচিত্র সৌন্দর্যবোধ অপেক্ষা করুণ রসেরই সমধিক উদ্রেক হইয়া থাকে।

[বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃষ্ঠা ৭৮]

প্রতাপ ও শৈবলিনীর কিংবা মীরকাশেম ও দলনীর প্রণয়চিত্রই উপন্যাসে মুখ্যভাবে স্থান পেয়েছে, কল্পনা রাজ্যের এই সব নরনারীর অন্তর্দ্বন্দ্বের বেদনার মাঝখানে লাঞ্ছিতা দেশমাতৃকার দুর্যোগের ও বিপর্যয়ের চিত্রও যে কোন সচেতন মানুষকে মুহূর্তের জন্য বিহ্বল করে দেবে,—এখানেই চন্দ্রশেখরের উভ।বিধ সার্থকতা।

'চন্দ্রশেখরের' পরে বঙ্কিমচন্দ্রের যে উপন্যাসটিতে দেশপ্রীতির প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে তা হল 'রাজসিংহ'। ঐতিহাসিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র দেশচর্চার কিছু নিদর্শন পেয়েছিলেন,—সাময়িক জীবনের ঘটনায় তা ছিল না। তাই সামাজিক উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু নৈতিক আদর্শ প্রচার করেছিলেন—কিন্তু তাতে দেশোচ্ছ্বাসের প্রসঙ্গ ছিল না। কিন্তু ইংরেজের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ ধীরে ধীরে ধূমায়িত হচ্ছিল,—কাব্য-নাটকে-সংবাদপত্রে-আন্দোলনে তারই বিস্ফোরণ। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিপূর্বে 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তাঁর দেশপ্রীতি প্রচার করেছেন, কাজেই উপন্যাসে সামাজিক কাহিনী অবলম্বন করলেও দেশচর্চার ধারাবাহিকতা তাতে ক্ষুণ্ণ হয়নি। জাতির সার্বিক মঙ্গলকামনা বঙ্কিমচরিত্রের প্রধান অবলম্বন। কোথাও তা একেবারে থেমে থাকেনি।

'রাজসিংহ' উপন্যাসটি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ চিন্তার ফল। 'বঙ্গদর্শনে'-এ উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়,—প্রথম সংস্করণের ৮০ পৃষ্ঠার গ্রন্থটি চতুর্থ সংস্করণে ৪৩৪ পৃষ্ঠায় পরিবর্ধিত হয়েছিল বলেই নয়,—বঙ্কিমচন্দ্র একটি পূর্ণাঙ্গ ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার জন্যই এ পরিশ্রম করেছিলেন। চতুর্থ সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্র খুব স্পষ্টভাবে তাঁর উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছিলেন,—

'ভারতকলঙ্ক' নামক প্রবন্ধে আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি, ভারতবর্ষের অধঃপতনের কারণ কি কি। হিন্দুদিগের বাহুবলের অভাব সে সকল কারণের মধ্যে নহে।

এই উনবিংশ শতাব্দীতে হিন্দুদিগের বাহুবলের কোন চিহ্ন দেখা যায় না। ইংরেজ সাম্রাজ্যে হিন্দুর বাহুবল লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু তাহার পূর্বে কখনও লুপ্ত হয় নাই। হিন্দুদিগের বাহুবলই আমার প্রতিপাদ্য।' [ভূমিকা, চতুর্থ সংস্করণ]

বাহুবলের একটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত প্রচারের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রের এই আগ্রহের কারণটি লক্ষ্যণীয়। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে 'রাজসিংহের' প্রথম সংস্করণ প্রকাশের কালে দেশপ্রেম নিছক ভাববিলাস মাত্র ছিল না। তখন রাজনৈতিক দল গঠিত হয়েছে, কংগ্রেসেরও জন্ম হয়েছে, হিন্দুমেলায় স্বাদেশিকতার বিভিন্ন দিক আলোচিত হয়েছে। বিদেশীর হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার একটা বাসনা প্রচ্ছন্নভাবে জনচিত্তে জেগে উঠেছিল কিন্তু কি উপায়ে সেটা সম্ভব হবে—তা জানা ছিল না। দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র এই পর্বেই তাঁর বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমের উপন্যাস রচনা করেছিলেন;— 'আনন্দমঠের' রচনাকালও ১৮৮২ সালেই। 'রাজসিংহে' বাহুবলের নজির স্থাপনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র একটি দৃঢ় ঐতিহাসিক ভিত্তি অবলম্বন করেছিলেন কেন তাও বিশেষ-ভাবে আলোচনাযোগ্য। তাঁর আগের যে সব উপন্যাসে আমরা স্বদেশপ্রীতির দৃষ্টান্ত পেয়েছি—তা ইতিহাস-সম্পৃক্ত কাল্পনিক কাহিনী। কাল্পনিক চরিত্রের চেয়ে একটি সজীব ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের আদর্শ যে অনেক বেশী আবেদন সৃষ্টি করবে, এ বিশ্বাস নিয়েই ঐতিহাসিক চরিত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। বাহুবল ও মনোবল নিয়ে রাজসিংহ মোগলসম্রাট ঔরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যে অভিযান চালিয়েছিলেন তার ইতিহাসানুগ বিবরণ দেবার উদ্দেশ্যেই উপন্যাসটি রচিত। তবুও রাজসিংহ যে প্রথমতঃ উপন্যাস সেকথাও স্মরণ রাখতে হবে।

"যখন বাহুবল মাত্র আমার প্রতিপাদ্য, তখন উপন্যাসের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে।...বিশেষতঃ উপন্যাসের ঔপন্যাসিকতা রক্ষা করিবার জন্য কল্পনাপ্রসূত অনেক বিষয়ই গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিতে হইয়াছে।" [ভূমিকা, চতুর্থ সংস্করণ]

রাজসিংহের ইতিহাস আমরা জানি না, একটি সচেতন জাতির এই অপরাধ বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষমা করেননি, নির্মমভাবে সমালোচনা করেছেন। ইংরেজের রাজত্বে আমাদের বাহুবলই বিনষ্ট হয়নি আমাদের দেশানুরাগও বিনষ্ট হয়েছে। ইতিহাস অচেতনতাকে বঙ্কিমচন্দ্র অমার্জনীয় অপরাধ বলে মনে করতেন। রাজসিংহের কাহিনী বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুব্ধচিত্তের পরিচয় পাই আমরা। "আমরা গ্রীক ইতিহাস মুখস্ত করিয়া মরি—রাজসিংহের ইতিহাসের কিছুই জানি না। আধুনিক শিক্ষার সুফল।" [পঞ্চম খণ্ড, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

আমাদের ইতিহাস চেতনাকে জাগাবার এই চেষ্টা 'রাজসিংহে' নতুন নয়, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসেও সে চেষ্টা বারংবার দেখেছি। শি[illegible] বঙ্কিমচন্দ্র

নবজাগরণে উদ্‌বুদ্ধ জাতিকে একটি দৃঢ় ভিত্তির ওপরে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন,—ইতিহাস এই মুহূর্তে যা শেখাতে পারে অন্যকিছুর দ্বারা তা পাওয়া সম্ভব নয়।

'রাজসিংহে' ইতিহাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপনের বাসনাটি দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের গভীর দেশচিন্তার ফল। বাঙ্গালীর ইতিহাসে যে বস্তুটি বহু আয়াসে তিনি আবিষ্কার ও প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন রাজস্থানের ইতিহাসের সর্বত্র তা ছড়িয়ে আছে। প্রতাপসিংহ, সংগ্রামসিংহ, বাপ্পারাও, পুত্তের বীরত্ব কাহিনী, আত্মদানের ভিত্তি দেশপ্রেমের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত। এই ঐতিহ্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিলেন রাজসিংহ। কাজেই মোঘলশক্তিকে প্রতিহত করার জন্য প্রাণপণ সংগ্রামের শক্তি-প্রদর্শন করে বিজয়ী হয়েছিলেন রাজসিংহ। রাজ্যরক্ষা বা সিংহাসন রক্ষার স্বার্থ ত আছেই কিন্তু তার মধ্যেও যখন অসীম বীরত্ব ও শৌর্যের প্রকাশ দেখি তখন তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হতে চাই। দেশপ্রীতিও যে এক জাতীয় স্বার্থবোধ প্রণোদিত চিন্তা এও স্বীকৃত সত্য। রাজস্থানের ইতিহাসে প্রতাপসিংহ স্বদেশপ্রেমের মূর্ত প্রতীক—রাজসিংহকেও সেই আদর্শে অঙ্কন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। রাজস্থানের ইতিহাস শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলো বহু পূর্বেই। বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু ভূমিকায় বলেছেন,

"মোঘলের প্রতিদ্বন্দ্বী হিন্দুদিগের মধ্যে প্রধান রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয়। মহারাষ্ট্রীয়দিগের কথা সকলেই জানে, রাজপুতগণের বীর্য অধিকতর হইলেও, এদেশে তেমন সুপরিচিত নহে।"

'রাজসিংহ' রচিত হওয়ার বহু আগে রঙ্গলাল, মধুসূদন, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রমুখ শক্তিমান সাহিত্যিকেরা রাজস্থানের ইতিহাস অবলম্বনে কাব্য-নাটক রচনা করে স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। কাজেই ১৮৯৩ খ্রীঃ চতুর্থ সংস্করণের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই উক্তিটি খুব সত্য বলে মনে হয় না। বিশেষতঃ রমেশচন্দ্রের 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' রচিত হওয়ার পরে নতুন করে রাজস্থানের কাহিনী পরিবেশনের কোন যুক্তি নেই। কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র বাহুবলের দৃষ্টান্ত স্থাপনের উদ্দেশ্যেই যে রাজসিংহ চরিত্রটি বেছে নিয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। রাজসিংহ বীর ও স্বদেশপ্রেমিক, রাজপুতের ঐতিহ্যরক্ষার চেয়ে বড়ো ধর্ম তার কাছে নেই,—তাই অবিচলচিত্তে তিনি দেশরক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। চঞ্চলকুমারীর মত অসাধারণ একটি নারী যখন আত্মনিবেদনে উন্মুখ—রাজসিংহ তখনও আপন কর্তব্যে অবিচল। চঞ্চলকুমারী যোগ্যব্যক্তির কাছেই আশ্রয় প্রার্থনা করেছিলেন। অনবদ্য ভঙ্গিমায় রাজসিংহকে অতীত ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে পত্র রচনা করেছিলেন চঞ্চলকুমারী,—

"দিল্লীশ্বরের সহিত বিবাদ সহজ নহে জানি। এ পৃথিবীতে আর কেহই নাই যে,

তাহার সঙ্গে বিবাদ করিয়া তিষ্ঠিতে পারে। কিন্তু মহারাজ! মনে করিয়া দেখুন, মহারানা সংগ্রামসিংহ বাবরশাহকে প্রায় রাজ্যচ্যুত করিয়াছিলেন। মহারাণা প্রতাপসিংহ আকবর শাহকেও মধ্যদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন। আপনি সেই সিংহাসনে আসীন—আপনি সেই সংগ্রামের, সেই প্রতাপের বংশধর—আপনি কি তাঁহাদিগের অপেক্ষা হীনবল? [৩য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ]

এ অংশটিতে বঙ্কিমচন্দ্রেরই কণ্ঠস্বর চঞ্চলকুমারীর মুখে শোনা যাচ্ছে যেন। ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দিতে হলে এ জাতীয় দৃপ্তভাষার সাহায্যই নেওয়া দরকার। বঙ্কিমচন্দ্র যদি ঠিক এই কথাগুলি সমগ্র জাতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করতেন তাহলে ভাষাগত পরিবর্তন কিছু হোত না। এ জাতীয় উৎসাহ উদ্দীপনার বাণী শক্তিসঞ্চয়ে ইচ্ছুক জনতার কানে খুব অর্থবহ বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক। যুদ্ধযাত্রার পূর্বাহ্ণে জাতীয়চেতনার দ্বারা উদ্দীপিত হওয়ার মুহূর্তেই রাজসিংহের হাতে চঞ্চলকুমারীর এই পত্রটি পৌঁছেছিল।

উপন্যাস রচনার মুহূর্তেও বঙ্কিমচন্দ্র আত্মবিস্মৃত হন না,—তাই উপন্যাসে তিনিও একটি চরিত্র হয়ে ওঠেন। সেটা উপন্যাসের পক্ষে কতখানি বেমানান—সে আলোচনায় নতুন করে প্রবেশের প্রয়োজন নেই। অন্যান্য সব উপন্যাসের মত 'রাজসিংহ' উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পীর নীরবতা পালনে অক্ষম হয়েছেন। তাই রাজসিংহের সপ্তম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদটি পাঠ করলে আমাদের একথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসে ঐতিহাসিক যুদ্ধ বিষয়ে একটি ক্ষুদ্র প্রবন্ধ রচনারই চেষ্টা করেছেন। রাজসিংহের কৃতিত্বকে বৃহৎ ও মহৎ করে প্রমাণ করার জন্যই এ অংশটি প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের কলম থেকেই বেরিয়েছে। নতুবা যুদ্ধদৃশ্যে এমন কোন বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা নেই—যার সাহায্যে রাজসিংহকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ যোদ্ধাদের সঙ্গে এক করে ফেলা সম্ভব। ফলে প্রমাণের জন্য বঙ্কিমচন্দ্রকেই আসরে অবতীর্ণ হতে হল। ইতিহাসের ঘটনাকে উপন্যাসের আধারে স্থাপন করেও বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহের সত্যিকারের বাহুবলের পরিচয় দিতে পেরেছেন কি না সন্দেহ। অথচ বাহুবলের প্রতিষ্ঠা করাই স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের একান্ত বাসনা ছিল, বর্ণনাদোষেই সেটি প্রস্ফুটিত হয়নি।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং আবেদন নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। রাজসিংহকে বড়ো করে দেখানোর পেছনে সচেতন ভাবে মোঘলবিদ্বেষ থাকতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুর বীরত্বচিত্র অঙ্কন করেছেন বটে—তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মহৎ আদর্শ ও সুনিপুণ যোদ্ধার পক্ষে সৈন্যবলই যে একমাত্র বল নয়,—এই সত্যটিই প্রমাণ করা। তাছাড়া ইতিহাসের বর্ণনায় অযথা হস্তক্ষেপ অন্ততঃ এ উপন্যাসে নেই।

বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে বলেছেন,

অন্যান্য গুণের সহিত যাহার ধর্ম আছে—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক, সেই শ্রেষ্ঠ। অন্যান্য গুণ থাকিতেও যাহার ধর্ম নাই—হিন্দু হৌক, মুসলমান হৌক—সেই নিকৃষ্ট। [উপসংহার]

রাজসিংহের ধর্ম ছিল দেশরক্ষার ধর্ম, এই শক্তিতেই অসম্ভব ঘটনাও সম্ভব হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পরিশেষে আবার দুঃখ জানিয়েছেন,—

"...ওলন্দাজ উইলিয়ম ও রাজপুত রাজসিংহ বিশেষ প্রকারে তুলনীয়। উভয়ের কীর্তি ইতিহাসে অতুল। উইলিয়ম ইউরোপে দেশহিতৈষী ধর্মাত্মা বীরপুরুষের অগ্রগণ্য বলিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন, এদেশে ইতিহাস নাই, কাজেই রাজসিংহকে কেহ চেনে না।" [উপসংহার]

এ খেদটি স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের। রাজস্থানের ইতিহাসে রাজসিংহের মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের অপূর্ব বিকাশ লক্ষ্য করেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কোন সমালোচক বলেছেন,—

"অন্যান্য উচ্চাঙ্গের লেখকের মত বঙ্কিমচন্দ্র প্রথমে মানুষের প্রতি ভালবাসার উচ্চ আদর্শ দেখাইয়া—ভালবাসার বিস্তার দেখাইয়াছেন। যে ভালবাসা প্রথমে মানুষে নিবদ্ধ থাকে, তাহা ক্রমে দেশপ্রেমে ও জাতিপ্রেমে পরিণতি পাইয়াছিল। রাজসিংহে দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ; আনন্দমঠে স্বজাতিপ্রেমের বিকাশ।"[১৭]

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', 'রাজসিংহের' অনতিকাল পরেই রচিত ও প্রকাশিত হয়েছিল। বাংলাসাহিত্যে 'আনন্দমঠ' ও 'আনন্দমঠের' রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের স্থান নির্ণয় করার কোনো অসুবিধে নেই। বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রকে সম্রাটের আসনে বসিয়েছে এবং দেশপ্রেমিক বলে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন এই গ্রন্থটির জন্যই। 'আনন্দমঠ' সেযুগের বিপ্লবীদের আত্মদানের প্রেরণা জুগিয়েছে। সমগ্র দেশের সংগ্রামী জনতা আনন্দমঠের আদর্শে ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করেছে।

দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের যাবতীয় দেশাত্মবোধক রচনার সঙ্গে 'আনন্দমঠের' মূল পার্থক্য রয়েছে। অন্যান্য রচনায় দেশপ্রেম কখনও ইতিহাসপ্রীতি কিংবা বীরত্বের স্মৃতির চর্চাতেই নিবদ্ধ—'আনন্দমঠেই' বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের উপযুক্ত একটি সশস্ত্র বিপ্লবের অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করেছিলেন আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে। দেশপ্রেমিকতা একটা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছে এই রচনায়। সে যুগের যে কোন স্রষ্টাই সাহিত্যের মাধ্যমে দেশচিন্তা প্রকাশ করেছেন খানিকটা বাধ্য হয়েই। প্রমথনাথ বিশী বলেছিলেন,

১৭. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬২, পৃঃ ৪২।

"স্বাদেশিকতার এই বিড়ম্বনা বৃটিশ আমলের বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান ত্রুটি—এবং এই ত্রুটির জন্যই [আরও ত্রুটি আছে] বাংলা সাহিত্য সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারে নাই।"[১৮]

কিন্তু অক্ষম লেখকের গতানুগতিক রচনায় দেশপ্রেমিকতা সুলভ হয়েছে বলে সাহিত্যের স্বাস্থ্যহীনতার অভিযোগ আনাটা কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রকে অক্ষম লেখকের সঙ্গে এ ব্যাপারে এক করে ফেলা যায় না। স্বদেশপ্রেম রচনার মূল উপাদান হলেও বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গীর অনন্যতায় তা সমৃদ্ধ। তাঁর অন্যান্য রচনায় স্বদেশপ্রেমের প্রতিফলন কোথাও প্রচ্ছন্ন, কোথাও প্রকাশ্য—কিন্তু 'আনন্দমঠে' পুরোপুরি স্বদেশপ্রেমের প্রসঙ্গ তুলে ধরা হয়েছে। প্রশ্ন উঠতে পারে স্বদেশপ্রেমের তত্ত্ব পরিবেশনের জন্য উপন্যাস রচনার প্রয়োজন কোথায়? বঙ্কিমচন্দ্রই প্রমাণ করেছেন, যে কোন দুরূহ তত্ত্বই উপন্যাসে স্থান পেতে পারে এবং উপন্যাসের সৌন্দর্য তাতেও বজায় রাখা যায়। তাঁর শেষ জীবনের তিনটি উপন্যাস একথা প্রমাণ করবে।

'আনন্দমঠের' স্বদেশপ্রেমের ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র নিছক উপদেশমূলকতার আশ্রয় নেননি। কতকগুলো কল্পিত চরিত্র সৃজন করে একটি আদর্শলোক সৃষ্টি করেছেন; তাঁরা কেউই এ জগতের নন,—এ পৃথিবীতে তাঁদের অস্তিত্ব অতীতেও ছিল না—ভবিষ্যতেও থাকবে না। একটি নিছক কল্পলোক স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমের তত্ত্ব বিশ্লেষণ করলেন অথচ সে প্রশ্নটি সে যুগের রক্তমাংসের মানুষগুলোকে এমন করে আলোড়িত করল কেন, সেটাই আশ্চর্য। 'আনন্দমঠের' অবাস্তবতার সমালোচনা হয়েছে বটে কিন্তু এই অবাস্তবতা বাস্তব চরিত্রকে প্রভাবিত করেছিল কেন সে প্রসঙ্গ চাপা পড়ে আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে ঐ উপন্যাসের পরিকল্পনা করেছিলেন সেযুগের মানুষরা অতীতের ঐতিহ্য আবিষ্কার করে উত্তেজিত, ভবিষ্যতের স্বপ্নে উন্মাদ হয়েছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে শিক্ষিত বাঙ্গালীর ধ্যান-ধারণার কোনটাই কি খুব বেশী বাস্তব? রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে' স্বাদেশিকতার যে বর্ণনা পাই তাতে বাস্তবতা ছাড়া অন্য সবকিছুই দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথ ও জ্যোতিদাদার মত নিতান্ত বালকদের কীর্তিকাহিনী হলেও একে বালকসুলভ ছেলেমানুষী বলে মনে করা যেতো। কিন্তু সে যুগের বিখ্যাত মনীষী বৃদ্ধ রাজনারায়ণ বসুকেই যখন সে সভায় নেতৃত্ব করতে দেখা যায় তখন আর বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সেই যুগটাই ছিল একটা অস্বাভাবিকতার যুগ। রক্তমাংসের মানুষরা তাদের বাস্তব বুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিলেন বলেই হাতে তৈরী গামছার টুকরো মাথায় বেঁধে

১৮. প্রমথনাথ বিশী, বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা, কমলাকান্তের দপ্তর।

স্বদেশপ্রেমিক ব্রজবাবুর তাণ্ডব নৃত্যের চিত্র 'জীবনস্মৃতির' মত একটি জীবনচরিতে স্থান পেয়েছিল। এর সত্যতায় কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। 'জীবনস্মৃতিতে' রবীন্দ্রনাথ যে সময়ের ঘটনার কথা লিখেছেন 'আনন্দমঠের' রচনাকাল থেকে সে সময় খুব বেশী দূরে নয়। প্রায় কাছাকাছি সময়ের মানুষের জীবনচরিতের এসব ঘটনার আলোকে মোটামুটি সে যুগের আবহাওয়ার একটা ছবি পাওয়া যেতে পারে। 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের প্রাণস্পন্দনটুকু ধরতে পেরেছিলেন বলেই সে যুগের মানুষরা এ উপন্যাসে অবাস্তবতা দেখেনি,—অনুপ্রাণিত হয়েছে। পরের যুগে 'আনন্দমঠের' সঙ্গীত আবৃত্তি করতে করতে ফাঁসীমঞ্চে আরোহণ করতে দ্বিধাবোধ করেনি শহীদেরা।

তবে 'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগের কাহিনী বলতে চেয়েছিলেন সে পটভূমিকা থেকে দেখলে বহু অসঙ্গতি আমাদের পীড়িত করবে। সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, মহেন্দ্র, শান্তিকে অতীতে স্থাপন করেই বিষয়টিকে অসম্ভাবিত একটি পরিবেশে টেনে আনা হয়েছে। সমালোচকদের অভিযোগ এ ব্যাপারেই। বঙ্কিমচন্দ্র অতীতের পটভূমিকায় বর্তমানের কল্পনাকে স্থাপন করেছিলেন বলেই বিষয়টি জটিলতা সৃষ্টি করেছে। উনবিংশ শতাব্দীতে যে পরিবেশ গড়ে উঠেছিল তাতেই সত্যানন্দের মত নেতা, মহেন্দ্রের মতো গৃহী, শান্তির মতো অসমসাহসিকার আবির্ভাব সম্ভব ছিল,—এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস আলোচনা করলেও এ জাতীয় বাস্তব চরিত্রের দেখা মিলবে। স্বাধীনতা আন্দোলনের ঠিক পূর্বাহ্ণে বঙ্কিমচন্দ্রের এই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত রচনাটির সমালোচনার মাপকাঠি একটু পৃথক হওয়া দরকার। এ উপন্যাস যুগেরই সৃষ্টি,—যুগন্ধরের কল্পনাতেই এ উপন্যাস জন্ম নেওয়া সম্ভব।

শাসক ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটি সে যুগেই সঠিকভাবে নির্ণীত হয়েছিল। যুক্তির আলোকে স্বাধীনতা ও পরাধীনতার পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, যা ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। হয়নি বলেই পরাধীনতার মর্মজ্বালায় অতীতের কোনো মানুষকেই আমরা এমন ভাবে পীড়িত হতে দেখিনি। কিম্বা পরাধীনতার হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য সম্মিলিত আন্দোলনের কোনো প্রয়োজনও এদেশে ইতিপূর্বে কখনও হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্র সেই আন্দোলনের মাঝখানেই এসে পড়েছিলেন,—হেমচন্দ্র সেই বেদনার কথাই কবিতায় আক্ষেপ করে গেছেন। দেশচেতনা জাগিয়ে তোলার ঠিক পরেই সংঘবদ্ধ আন্দোলন সম্ভব হল,—সেই মুহূর্তেই বঙ্কিমচন্দ্র সংঘবদ্ধতার শক্তি, দেশপ্রেমের সার্থকতার চিত্র তুলে ধরলেন। যে যুগে সমস্ত ভারতবাসী দেশের স্বাধীনতালাভের আকাঙ্ক্ষায় জীবন পণ করেছে—তার ঠিক আগেই তত্ত্বের প্রলেপ লাগিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র একটি অর্থপূর্ণ দেশপ্রেমমূলক ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন। ভবিষ্যৎদ্রষ্টা

শিল্পী অনাগতকে চিনে নিতে পারেন,—চেনাতে পারেন। কিন্তু আত্মসচেতন শিল্পী আত্মরক্ষার বর্ম পরিধান করেই আসরে অবতীর্ণ হন। হেমচন্দ্রকে স্বদেশপ্রেমের মূল্য দিতে হয়েছিল,—বঙ্কিমচন্দ্র সরকারী চাকরী করেও নির্বিবাদে 'আনন্দমঠ' রচনা করলেন। একটু ঘুরপথে চলেছিলেন বলেই অকারণ উৎপাতে বিরক্ত হতে হয়নি তাঁকে। শুধু তাই নয়, সরকারী চাকরী করতেন বলেই শেষ পর্যন্ত রাজপ্রশংসা করেই ইতি টানতে হয়েছে তাঁকে। ইংরেজ প্রশংসা চন্দ্রশেখরেও দেখেছি, প্রশংসনীয় বা গ্রহণীয় গুণকে উদারভাবে গ্রহণ করার শক্তিও থাকে অসাধারণদেরই। উনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত সম্প্রদায় সবরকম সংস্কার ত্যাগ করতেই প্রস্তুত ছিলেন, অন্ধতা থেকে মুক্ত না হলে সত্যিকারের সিদ্ধি আসতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র সে সত্য সমর্থন করতেন।

'আনন্দমঠের' স্বদেশপ্রসঙ্গ আলোচনার পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেমিকতা সম্বন্ধে আরও কয়েকটি কথা স্পষ্ট করা দরকার। জাতীয়তাবাদ ও দেশপ্রেম সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র খুব স্পষ্টভাবেই প্রবন্ধে আলোচনা করেছিলেন,

"আত্মরক্ষার ন্যায় ও স্বজনরক্ষার ন্যায় স্বদেশরক্ষা ঈশ্বরোদ্দিষ্ট কর্ম, কেন না. ইহা সমস্ত জগতের হিতের উপায়। পরস্পরের আক্রমণে সমস্ত বিনষ্ট বা অধঃপতিত হইয়া কোন পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির অধিকারভুক্ত হইলে, পৃথিবী হইতে ধর্ম ও উন্নতি বিলুপ্ত হইবে। এই জন্য সর্বভূতের হিতের জন্য সকলেরই স্বদেশরক্ষণ কর্তব্য।"

[স্বদেশপ্রীতি]

এই ধারণালব্ধ দেশপ্রীতিকে ধর্মচেতনার সঙ্গে যুক্ত করে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য দেশপ্রীতির সঙ্গে ভারতীয় দেশপ্রীতির একটা ভেদরেখা নির্ণয় করেছেন। দেশপ্রীতি যদি সর্বভূতের হিতের জন্য নিয়োজিত না হয় তবে তার মূল্য বঙ্কিমচন্দ্র স্বীকার করেননি। বিশ্বপ্রীতির ব্যাপক অর্থ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির মধ্যে রয়েছে। ইউরোপীয় দেশপ্রেম সংকুচিত, সর্বভূতের হিতচিন্তা করার মত উদারতা সেখানে নেই। একই প্রবন্ধে সমালোচনা করেছেন তিনি,—

ইউরোপীয় patriotism ধর্মের তাৎপর্য এই যে, পরসমাজের কাড়িয়া ঘরের সমাজে আনিব। স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধি করিব, কিন্তু অন্য সমস্ত জাতির সর্বনাশ করিয়া তাহা করিতে হইবে। [ঐ]

এই দুটি মতামত থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচর্চার স্বরূপটি স্পষ্ট হয়। পরস্বলোলুপ পাপিষ্ঠ জাতির লোভের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় তিনি চিন্তা করেছিলেন। স্বদেশপ্রেমের শক্তিই এই দুরবস্থার হাত থেকে মুক্তি দিতে পারে। সংঘবদ্ধতার শক্তি না থাকলে, ধর্মচেতনা বিবর্জিত হলে যথার্থ স্বদেশপ্রেম জাগতেই পারে না, এ ছিল

স্বদেশপ্রেম সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ ধারণা। 'আনন্দমঠে' এই ধারণারই উপন্যাস রূপ দেওয়া হয়েছে। পাশ্চাত্যদর্শন ও ধর্মতত্ত্ব আলোচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র স্বীয় মতামতকেই শেষ পর্যন্ত প্রাধান্য দিলেন। ভারতীয় আদর্শের সঙ্গে ত্যাগের আদর্শ জড়িয়ে আছে, ধর্মের এই মূল্যবান উপদেশটিকে 'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বিশেষভাবে ব্যবহার করা হয়েছে। দেশের দুর্দিনে পীড়িত জনগণকে রক্ষার চেয়ে বড়ো ধর্ম আর কিছু নেই,—আত্মস্বার্থ ত্যাগ না করলে আর্তরক্ষা হয় না, সুতরাং একটি সম্প্রদায়ের হাতে এ দায়িত্ব তুলে দিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাচীনভারতের মানবতার আদর্শকেই নতুন করে সঞ্জীবিত করেছিলেন,—কিন্তু সমসাময়িক আন্দোলনের পটভূমিকায় মানবতার বাণীই দেশপ্রেমিকতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অভিনব বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছিল সে যুগে। আত্মত্যাগের আদর্শ যে কোন ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, দেশপ্রেমেই তার মূল্যায়ন হোত। 'আনন্দমঠের' সন্ন্যাসীদের নিষ্কাম কর্মযোগের মধ্যে সে যুগের বাঙ্গালী যে যুগোপযোগী ভাবানুসন্ধান করেছিল—সেত সত্য কথা। অথচ 'দেবীচৌধুরাণীর' ভবানী পাঠক কিংবা 'আনন্দমঠের' সত্যানন্দের সাধনা যে মানবতারই সাধনা এ ব্যাখ্যায় খুব ভুল কিছু নেই। এ প্রসঙ্গে কোন সমালোচক বলেছেন,

"মনে হয়, ভারতের সেই প্রাচীন ধর্মতত্ত্বকেই ভিত্তি করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র যে নবধর্ম প্রণয়ন করিয়াছিলেন—তাহার দৃঢ়তম খিলান হইল এই দেশপ্রীতি।...ভারতীয় ধর্মের অঙ্গীকৃত করিয়া এই স্বদেশপ্রীতিকে এত বড় স্থান দিবার কল্পনাও পূর্বে কেহ করে নাই।"[১৯]

'আনন্দমঠ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বক্তব্যই স্থান পেয়েছে কিন্তু ইতিহাসের যে অংশে তিনি তাঁর এই নবলব্ধ ও নব আবিষ্কৃত তথ্য আরোপ করেছেন তাতেই বিষয়টি জটিলতর হয়েছে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহ সম্পর্কে পূর্বের আলোচনায় দেখানো হয়েছে যে, বাংলা দেশের ইংরেজ শাসন সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে যেসব আঞ্চলিক উপদ্রব হয়েছিল—সন্ন্যাসীবিদ্রোহ তার অন্যতম। দেশপ্রেমের মহান আদর্শ ও সুপরিণত চিন্তাধারা সেই লুঠেরা সন্ন্যাসীদের চরিত্রে আরোপ করার একটি মাত্র যুক্তি থাকতে পারে,—বঙ্কিমচন্দ্র দেশ-কাল-পাত্রকে নিরাপদ দূরত্ব থেকে নির্বাচন করে রাজকর্মচারী হিসেবে এই কৌশলের আশ্রয়টুকু নিয়েছিলেন। যেটুকু ক্ষীণ ইতিহাস ছিল সেটুকুও সদ্ব্যবহার করেছেন এ ব্যাপারে। শুধু 'আনন্দমঠ' নিয়েই যদি এ জাতীয় সমস্যা দেখা দিত তাহলে বঙ্কিমচন্দ্রের এ কৌশল সম্বন্ধে সন্দেহ থাকত।

১৯ মোহিতলাল মজুমদার, বাংলার নবযুগ, ১৩৫২ পৃঃ ১১০-১১১।

কিন্তু আগের ও পরের বহু উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্র এ জাতীয় কৌশল অবলম্বন করেছেন বলেই বিষয়টির যথার্থ কারণ অনুমান করার অসুবিধে হয় না। অন্যান্য উপন্যাসে স্বদেশপ্রেমের ব্যাখ্যাই মুখ্য কথা নয়, সুতরাং ইতিহাসের সামান্য দেহে কল্পনার কাদামাটি লেপন করার ফলে অনবদ্য দেবী প্রতিমা নির্মিত হয়েছে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর গবেষণার ফলাফল অতীত বাংলার পটভূমিকায় স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র যে সচেতন ভাবেই কালানৌচিত্য দোষ ঘটিয়েছিলেন সেকথা স্বীকার্য। উনবিংশ শতাব্দীর পরম আকাঙ্ক্ষিত স্বদেশচর্চার প্রসঙ্গটিই তিনি পরিবেশন করেছিলেন—কিন্তু কিছুটা ঐতিহাসিক সংযোগ থাকলে তার মূল্য বাড়বে এ ধারণাও ছিল বলে মনে হয়। অতীত বাংলার অরাজকতার মুহূর্তে শক্তিমান গৃহত্যাগী একদল সন্ন্যাসী যে উদ্দেশ্যেই হোক না কেন প্রতিপক্ষ ইংরেজকে বিপর্যস্ত করেছিল—এটাই বঙ্কিমচন্দ্রকে উৎসাহিত করে। তাছাড়া সবই আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনার মহত্তম আবিষ্কার। এতে ইতিহাসের সন্ন্যাসীদের মর্যাদা বিন্দুমাত্র বাড়েনি কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব রচনাকৌশলের প্রশংসনীয় দিকটি উজ্জ্বল হয়েছে। ইতিহাসের সন্ন্যাসীদের চিনতে হলে ইতিহাসের দ্বারস্থ হওয়াই বাঞ্ছনীয়, উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার অমূল্যদান—'আনন্দমঠের' সন্তানসম্প্রদায় বঙ্কিমচন্দ্রের মানসনায়ক। কোন সমালোচক বলেছেন,—

"বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনা অলীক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র অনৈতিহাসিক যে ভাববস্তুটি এদের ওপর আরোপ করেছেন তা উনবিংশ শতাব্দীর পরম আকাঙ্ক্ষিত বস্তু। দ্বিতীয়তঃ তিনি যে অতীতের প্রেক্ষাপটে দেশপ্রেমের উচ্চাদর্শ স্থাপন করেছেন তার সঙ্গত কারণ আছে। বঙ্কিমচন্দ্র যে কালটিকে উপন্যাসের জন্য নির্বাচন করেছিলেন সেই কাল ছিল অরাজকতার। এই অরাজকতাই বিদ্রোহের জন্ম দেয়।"[২০]

কাজেই বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসে যে বক্তব্য পরিবেশন করেছিলেন—তাকে বর্তমানের পটভূমিকায় স্থাপন করার সুবিধে ছিল না বলেই—অতীতের অনুরূপ একটি পরিবেশ অনুসন্ধান করেছিলেন। পরিকল্পনাগত কিছু ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও 'আনন্দমঠ' বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থক গবেষণার উপযুক্ত ফলাফল বলেই গণ্য হবে।

'আনন্দমঠের' সন্তান সম্প্রদায়ের ব্যক্তি পরিচয় নেই—যেমন আত্মোৎসর্গকারী শহীদের ব্যক্তিপরিচয় তুচ্ছ হয়ে যায়। মহৎ কাজে যাঁরা আত্মনিবিষ্ট, তুচ্ছ সামাজিক পরিচয় সেখানে বড়ো কথা নয়। এই ভাবে সংগঠন গড়ে তোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন লেখক। সামাজিক পরিচয় হারিয়েও যাদের মনে দুঃখ নেই—ব্যক্তিস্বার্থ হারিয়েও

২০. বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্র ১৯৬৩।

যাঁরা আনন্দময়, 'আনন্দমঠের' চরিত্র তারাই। আনন্দমঠ, নামটির তাৎপর্যও বোধহয় এখানেই। পরের জন্য নিজের জীবনদান করার নজিরকেই আমরা সবচেয়ে বড়ো দান বলে মেনে এসেছি। বঙ্কিমচন্দ্র সাময়িক আবেগে জীবনদানের মধ্যেও মহিমা দেখতে পাননি। "জীবন তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।"—দেশের জন্য জীবনদানের চেয়েও বড়ো কথা নিষ্ঠার সঙ্গে দেশব্রত পালন করা। যে কোন মুহূর্তেই আদর্শ ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা যেখানে বর্তমান বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে আরও কঠিন ব্রত গ্রহণের কথাই বলতে চেয়েছেন। উপক্রমণিকায় যে 'ভক্তির' কথা বলেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, তা 'দেশভক্তি' ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে না। দেশপ্রেমের আবেগে জীবন তুচ্ছ মনে করে যারা এগিয়ে আসবে তাদের মনোবল যেন অটুট থাকে,—এই কামনা ছিল বলেই ভক্তিমান ও নিষ্ঠাবান, আদর্শপরায়ণ ও নির্ভীক দেশপ্রেমিকের অনুসন্ধান করেছিলেন সত্যানন্দ। বঙ্কিমচন্দ্র ধর্মের ভিত্তির ওপরেই দেশপ্রেম প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন—তাই সন্তানসেনার মুখে ধর্মসঙ্গীত, সন্তানসেনার উপাস্য মূর্তি সাকার দেশমাতৃকা। আত্মদানের সাময়িকবিলাস কিংবা হঠাৎ উচ্ছ্বাসকে সমর্থন করেননি তিনি। জীবনব্যাপী সাধনায় ধীরে ধীরে দেশপ্রেমিক হওয়া সম্ভব,—তারই স্তরবিভাগ করেছেন। সন্তান সেনাদলের এই প্রতিষ্ঠানটির পরিকল্পনায় যে অনন্যতা, দূরদর্শিতা ও কল্পনাশক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে তা তুলনারহিত। সংগঠক বঙ্কিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করতে গেলে 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী—চৌধুরাণীর' এ সব অংশগুলির সাহায্য নিতে হবে। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন,—

সন্তান সম্প্রদায়ের গঠনের মূলে যে আশ্চর্য দেশপ্রীতি, উন্নত আদর্শবাদ, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও প্রলোভনজয়ী নিঃস্বার্থতার পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সেকালের কেন, একালের আদর্শকেও অনেকদূর ছাড়াইয়া গিয়াছে।"[২১]

'আনন্দমঠ' রচিত হওয়ার অল্পকালের মধ্যেই বহু সংগঠন সংবাদ জাতীয় আন্দোলন ইতিহাসে পাওয়া যায়,—তা যে অল্পবিস্তর বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ প্রভাবিত তাতে সন্দেহ নেই। এই সম্প্রদায়ের সদস্যরাই 'আনন্দমঠকে' বেদবেদান্ত-গীতা-উপনিষদের মত পূজা করতে পেরেছিলেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল বলেছিলেন,

'বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন সংগঠনে 'আনন্দমঠের' স্থান কত উচ্চ ও গভীর তাহা নির্ণয়ের সময় হয়ত এখনও আসে নাই। এক সময়ে স্বদেশকর্মীদের এক হাতে ছিল গীতা অন্য হাতে ছিল 'আনন্দমঠ'। যদিও গ্রন্থশেষে বিসর্জন আসিয়া প্র

২১. শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, বঙ্কিমচন্দ্র ১৯৬৩।

লইয়া যায়, তথাপি আনন্দমঠের ভিতরকার ভাব ব্যঞ্জনা তথা সন্ন্যাসী সন্তানসম্প্রদায়ের নিষ্কাম স্বদেশপ্রেম বাঙ্গালী যুবকদের প্রাণে স্বদেশভক্তির সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য ত্যাগ ও সেবা ধর্মের উদ্রেক করিয়াছিল।' [ভূমিকা, বঙ্কিমরচনাবলী, যোগেশচন্দ্র বাগল]

'আনন্দমঠের' ঐতিহাসিকত্ব সমালোচনার বিষয় হলেও রাজনৈতিক চেতনাকে নতুন করে জাগাতে পেরেছিল বলে গ্রন্থটি জাতীয়তার দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 'আনন্দমঠের' প্রথমেই যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের নিখুঁত বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পটভূমিকায় সন্তানসেনার আত্মদানের মহান ব্রতের প্রসঙ্গটি উজ্জ্বল হয়েছে। 'আনন্দমঠে' বিদ্রোহের যে চিত্র পাই—ইতিহাসে ঠিক সেই উদ্দেশ্য-প্রণোদিত বিদ্রোহের প্রসঙ্গ নেই, কিন্তু ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ যে সমগ্র বাংলাকে গ্রাস করেছিল, সে কথা ঐতিহাসিক। বাংলার সে দুর্দিনের চিত্র রচনা করেছেন তিনি পরম সহানুভূতির সঙ্গে,—

"১১৭৬ সালে বাঙ্গালা প্রদেশ ইংরেজের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাঙ্গালার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখন বাঙ্গালীর প্রাণসম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণাবেক্ষণের ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজের, আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ নরাধম বিশ্বাসহন্তা মনুষ্য কুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাংলা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেসপাচ লেখে। বাঙ্গালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়। [১ম খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ]

এ বর্ণনায় ঐতিহাসিকত্ব আছে পুরোমাত্রায়। হতভাগ্য বাংলাদেশে সেদিন সত্যিকারের কোন সংগঠন ছিল না। মীরজাফরের নিষ্ঠুরতা আর স্বার্থান্ধতায় শাসক ইংরেজের অর্থলোলুপতার চাপে বাঙ্গালী যেদিন শুধুই নিষ্পেষিত, সেই ভয়াবহ শ্মশানের পটভূমিকায় একদল দেশসাধককে উপস্থাপিত করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এই কল্পনায় যে অসাধারণত্ব রয়েছে দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য ও সাধনার ইতিহাস আলোচনা করলেই তা স্পষ্ট হবে। সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সঙ্গে সন্তানসেনার দেশসাধনার পার্থক্য বঙ্কিমচন্দ্রেরই সুপরিকল্পিত সৃষ্টি। সন্ন্যাসীরা গৃহত্যাগী দস্যু, বঙ্কিমচন্দ্র গৃহী সন্তান সৃষ্টি করেছেন। বাংলার ঘরে ঘরে যখন হাহাকার, শুধু দু'একজন গৃহত্যাগী মহাপুরুষের মহানুভবতায় তা দূর করা সম্ভব নয়। সমগ্র বাংলা জুড়ে যে ভয়াবহ তাণ্ডব চলছে—তা অপসারণ করতে হলে ঘরে ঘরে বিপ্লবীর আবির্ভাব হওয়া দরকার। দেশব্রতসাধনের জন্য ব্যক্তিস্বার্থকে ভুলতে হবে, দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য ভোগ-সুখ-বিলাস বর্জন করতে হবে, সংঘবদ্ধ হতে হবে। এই মহামন্ত্রের প্রয়োগ ক্ষেত্র হিসেবে বাংলার অতীত ইতিহাস বেছে নিলেও ঊনবিংশ

শতাব্দীর উত্তেজনার মাটিতেই যে এ বীজ বপন সম্ভব—বঙ্কিমচন্দ্র এ কথা জানতেন।

আনন্দমঠেই প্রথম একটি সুপরিকল্পিত সশস্ত্র বিদ্রোহের নিখুঁত পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইতিপূর্বে জাতীয় চেতনায় বিদ্রোহের উত্তেজনা এমন ভাবে কোনও রচনায় প্রতিবিম্বিত হয়নি। সশস্ত্র বিদ্রোহ করাই সন্তানসেনার উদ্দেশ্য, প্রয়োজন হলে শত্রুনিধন ও বলপ্রয়োগ করার নির্দেশ পেয়েছে তারা। সত্যানন্দ মহেন্দ্রকে সন্তান ব্রতে দীক্ষিত করার পর অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুতের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সন্তানসেনার দীক্ষা শক্তিরূপিনী দেশমাতৃকার কাছে। বাঙ্গালীর বাহুবলের অভাবের অন্যতম কারণ এদেশে চৈতন্যপ্রবর্তিত প্রেমধর্মের প্রাবল্য, এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রই। "চৈতন্যদেবের বিষ্ণু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময় সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়।"

[দ্বিতীয় খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

শক্তিসাধনার এমন একটি সুপরিকল্পিত পন্থা স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর সামনে তুলে ধরেছিলেন অনেক আশা করেই। তাঁর আশা যে ব্যর্থ হয়নি পরবর্তী কালের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসই সে কথা প্রমাণ করবে। ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের খসড়া রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র জাতির অশেষ কৃতজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। লেখনী চালনা করেই তিনি পরোক্ষভাবে অসংখ্য সশস্ত্র বিপ্লবীদেরই চালনা করেছিলেন—একথা সত্য।

আনন্দমঠের সংগঠক পরিচালক সত্যানন্দ অরাজক বাংলায় সাময়িক শান্তি স্থাপিত হতে দেখেও তৃপ্ত হননি। শান্তি স্থাপন ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা পৃথক বস্তু। পরাধীন জাতির জীবনেও শান্তির স্পর্শ লাগে—যদি স্বাধীনতার চেতনা তাদের বিব্রত না করে। সুশাসন বিদেশী বা স্বদেশী যে কোন যোগ্য শাসকেরই ব্যক্তিগত দক্ষতার ফল। 'আনন্দমঠে' শান্তি প্রতিষ্ঠার আয়োজন করেছিল সন্তান সম্প্রদায়, শান্তি প্রতিষ্ঠারও পরে সত্যানন্দ মহাক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন,

সত্যানন্দের দুইচক্ষে জলধারা বহিতে লাগিল। তিনি উপরিস্থিতা, মাতৃরূপা জন্মভূমি প্রতিমার দিকে ফিরিয়া জোড়হাতে বাষ্পনিরুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিলেন, "হায় মা! তোমার উদ্ধার করিতে পারিলাম না—আবার তুমি ম্লেচ্ছের হাতে পড়িবে। সন্তানের অপরাধ লইও না। হায় মা! কেন আজ রণক্ষেত্রে আমার মৃত্যু হইল না।"

[চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ]

সত্যানন্দ তবে কি চেয়েছিলেন? ইংরেজের শাসন যে ফলপ্রদ হবে—সে কথা জানার পরেও,

"সত্যানন্দের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। তিনি বলিলেন—'শত্রুশোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব।" [ঐ]

এ সত্যানন্দের সত্যিকারের আদর্শ কারোর অজানা থাকে না। বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজ শাসনের সুফলের কথা যত সাড়ম্বরেই বলুন না কেন—আনন্দমঠের সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর দায়িত্ব কি ফুরিয়ে গেছে? তবে সত্যানন্দের চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গের কথা বললেন কেন লেখক? এই সত্যানন্দের যে পরিচয় সমগ্র 'আনন্দমঠে' বিবৃত হয়েছে—তার সঙ্গে উপন্যাসের শেষাংশের সত্যানন্দকে ঠিক মেলানো যায় না। যিনি সমস্ত সন্তানসেনাকে নিপুণভাবে পরিচালনা করেছিলেন, সন্তানসেনার ঈপ্সিত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরেও তিনি বিক্ষুব্ধচিত্তে স্বীয় প্রাণ হনন করতে চেয়েছিলেন কেন? বঙ্কিমচন্দ্র এই বিক্ষুব্ধ, উত্তেজিত, আত্মবিস্মৃত সংগঠককে শেষ পর্যন্ত শান্ত করতে পারেননি। মহাপুরুষ তাঁকে হিমালয়ের মাতৃমন্দিরে নিয়ে গেলেন বটে, কিন্তু সত্যানন্দ যেতে চাননি,—তাঁর কর্তব্য সম্পন্ন হয়েছে বলে বঙ্কিমচন্দ্রও মনে করেননি। 'আনন্দমঠের' পরিচালক সত্যানন্দের চরিত্রের মাধ্যমেই বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের ইঙ্গিতপূর্ণ বাণী প্রচার করেছেন।

সন্তানসেনার দেশব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অরাজকতা দমন করা, কিন্তু স্পষ্টভাবে না বললেও দেশোদ্ধারের আদর্শটি তার মধ্যেই নিহিত ছিল। সত্যানন্দের কণ্ঠে সেই বাণী বহুভাবে ধ্বনিত হয়েছে,—ভবানন্দের আবেগে এই বক্তব্যই স্পষ্ট হয়েছে বারবার। সত্যানন্দ যে পথে সন্তানসেনাকে চালিত করেছিলেন বাহুবলে, ধৈর্যে, সংযমে, নিষ্ঠায়, ধর্মবিশ্বাসে সেপথটি দেশসেবার ও দেশোদ্ধারের উৎকৃষ্ট পন্থা বলে বিবেচিত হতে পারে। দেশপ্রেমিকের কর্তব্য কি, সেকথা বিশ্লেষণের পরেই দেশপ্রেমিকের জীবন্ত বিগ্রহটিকে বঙ্কিমচন্দ্র এমন অপরূপ উপায়ে আমাদের সামনে এনেছেন। কোন সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যায় বলেছেন,—

"তাঁহার আনন্দমঠের শেষ দৃশ্যে বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গিয়াছে। তথাপি স্বাধীন হইবার এই প্রবৃত্তি তিনি কখনই পরিত্যাগ করেন নাই এবং এই কারণেই 'আনন্দমঠের' সন্ন্যাসীরা মৃত্যুপণ করিয়াছিল।—আনন্দমঠের সন্তান সম্প্রদায় বঙ্গজননীর এই লুপ্ত স্বাধীনতা ফিরাইয়া আনিবার সাধনা করিয়াছিলেন, কিন্তু বঙ্কিম স্বীয় অপরিসীম প্রবৃত্তি সত্ত্বেও তাঁহাদিগকে বিজয়গৌরব দিতে পারেন নাই। আনন্দমঠের ট্রাজিডি ইহাই।"[২২]—উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর অন্তর এমন একটি আদর্শ নেতাকেই খুঁজে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু স্রষ্টার কল্পনাতেই তার জন্ম

২২. সজনীকান্ত দাস, বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা, সীতারাম। পৃঃ ৮৬।

হয়েছে সবার আগে। পৃথিবীর মাটিতে নিঃশ্বাস নেবার আগেই আমাদের কল্পনার জগতে জন্ম নিয়েছিলেন আগামী দিনের সংগঠক নেতা সত্যানন্দ। স্বদেশপ্রেমের আবেগ সংগঠনের মাধ্যমে কিভাবে রূপ নেবে এই নির্দেশ দেবার জন্যই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব, সত্যানন্দ বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের জীবন্ত মূর্তি।

'আনন্দমঠে' বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রেম উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে বঙ্গজননীর রূপ কল্পনায়। বাংলাসাহিত্যে ঐ বস্তুটি অভিনব নয়, যদিও বহু সমালোচক এ ব্যাপারটি সম্পর্কে অতি উচ্ছ্বসিত। দেশকে মাতৃরূপে বন্দনার রীতি ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই প্রথম ধরা পড়ল, এ উক্তির কোন ভিত্তি নেই। দেশচিন্তার প্রথম পর্ব থেকেই স্বদেশপ্রেমী লেখকেরা দেশমাতৃকারাই বন্দনা করে এসেছেন। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, মধুসূদনই এর প্রথম উদ্গাতা। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের পৃথক গৌরবটুকুও অনস্বীকার্য,—তিনিই এই ভাবজগতের দেশমাতার সাকারমূর্তি কল্পনা করেছেন,—নানাভাবেই বঙ্গ প্রতিমার রূপ বর্ণনা করেছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' 'আমার দুর্গোৎসবে' দেবীদুর্গার পরিচয় বঙ্গজননী রূপেই। সুবর্ণময়ী এই বঙ্গপ্রতিমা মূর্তিটিকে বঙ্কিমচন্দ্রই বাংলার মানস মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আনন্দমঠে বঙ্গজননীর উদ্দেশ্যে রচিত বন্দেমাতরম সংগীত রচনাও বঙ্কিমচন্দ্রের অসামান্য কীর্তি। দেশবন্দনার এমন নিখুঁত স্তোত্র এযুগের ভারতবর্ষে স্বদেশপ্রেমী বঙ্কিমচন্দ্রের এক অবিস্মরণীয় অবদান। বন্দোমাতরম স্বাধীনতা আন্দোলনের একমাত্র মন্ত্র।

এই সংগীত বাঙ্গালীকে আত্মদানের আহ্বান জানিয়েছে। প্রখ্যাত সাহিত্যিক রমেশচন্দ্র Encyclopaedia Britannica-য় এ সংগীত সম্পর্কে বলেছেন,—

Although the Bande Mataram was not used during Chatterje's life time as a party war-cry, it became, during the agitation which followed the partition of Bengal, the recognised patriotic song of the revolutionary party...whatever Chatterje's original intention (it is sometimes held that it is merely an invocation of the mother land) the story of the Sanyasis, the ingenious language and its stirring air, the Mallar-Kawali Tal, all have a strong appeal to the Hindu mind and the Bande Mataram has become a powerful influence in political agitation and the accepted hymn of the extremist party,[২৩]

২৩. Encyclopaedia Britannica (Vol-5), England, 1962.

'আনন্দমঠের' সন্তানসেনার দেশপ্রেমব্রত পুরোপুরি কল্পিত বলেই একটা ভাবতন্ময় পরিবেশেই বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের স্থাপন করেছেন। মাঝে মাঝে প্রাণের স্পর্শ সঞ্চার করার চেষ্টা করলেও ভাবলোক থেকে এঁদের মর্ত্যলোকে টেনে আনা যায় না কোন মতেই। ভুলত্রুটি করেও সন্তানসেনা ভুলের সংশোধনের জন্য এমন একটি নতুন উদ্যম দেখিয়েছে যার ফলে চরিত্রগুলোর অসাধারণ দিকটি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভবানন্দই প্রথম সন্তানদের দেশসাধনার কথা ব্যক্ত করে বলেছিল,

আমরা অন্য মা মানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই,—স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা মলয়জ সমীরণ শীতলা শস্যশ্যামলা,—" [১ম খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]

দেশকে ভালবাসার এমন আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পনাতেই স্থান পেয়েছিল। দেশের দুর্দিনে সব চিন্তা বাদ দিয়ে এমনি করে দেশকে ভালবাসতে হবে। দেশই হবে সব সাধনার সাধনা, সব উপাসনার সার। আধ্যাত্মিকতার চরম মার্গে যেমন একাগ্রতার কথা বলা হয়ে থাকে, বঙ্কিমচন্দ্র সেই ব্যঞ্জনাটিই দেশসাধনার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছিলেন। 'আনন্দমঠে' দেশসাধনা মুখ্য হলেও ধর্মচেতনাই এই দেশপ্রেমের মূলে সক্রিয়ভাবে বর্তমান। শুধু বিষ্ণু, মহেশ্বর, লক্ষ্মীর জায়গায় দেশমাতৃকামূর্তি স্থাপন করা হয়েছে—এটুকুই যা প্রভেদ। আধ্যাত্মিকতায় যেমন কায়-মন-বাক্যের পবিত্রতার প্রয়োজন হয়,—চিন্তা ও ভাবে সেখানে কোন প্রকার আবিলতার স্থান নেই তেমনি 'আনন্দমঠের' সন্তানদেরও ব্রহ্মচর্য পালন করতে হয়। একাগ্রমনে ঈশ্বরচিন্তার সাধনা যেমন অব্যর্থ ফল দেবেই, দেশসাধনার ক্ষেত্রেও এসত্য প্রযোজ্য। শুধু কর্তব্যে নিষ্ঠা ও পবিত্রতার প্রয়োজন। 'আনন্দমঠের' সন্তানরা পরিচালকের এ নির্দেশ অলংঘনীয় বলেই জানে। তবু মানবচিত্তের দোলাচল প্রবৃত্তির হাত থেকে সন্তানরাও মুক্তি পায় না—ভবানন্দের কল্যাণী মোহ সে কথাই প্রমাণ করেছে। দেশপ্রেমিক ভবানন্দ ব্রতচ্যুতির প্রায়শ্চিত্ত করেছে,—স্বেচ্ছায় আত্মবিসর্জন দিয়ে।

দেশের দুর্দিনের আভাস দিতেও তিনি সুবর্ণময়ী দেবীপ্রতিমার সাহায্য নিয়েছেন। সন্তানের চৈতন্যসঞ্চারের জন্য এই সাকার দেবীপ্রতিমা সর্বদাই দৃষ্টিপথে বিরাজমানা। মহেন্দ্র এই দেবীপ্রতিমা দেখেই সন্তানব্রত গ্রহণ করতে চেয়েছিল। ব্রহ্মচারী মহেন্দ্রকে নগ্নিকা কালীমূর্তি দেখিয়ে বলেছিলেন,

'আজি দেশে সর্বত্রই শ্মশান—তাই মা কঙ্কালমালিনী।'

[১ম খণ্ড, একাদশ পরিচ্ছেদ]

দেশের দুর্দিনের এমন জীবন্ত মূর্তি শুধু সন্তান সেনাকেই নয়,—যে কোন দেশপ্রেমীকেই ব্যথিত করবে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই কল্পনাটি নিখুঁত ও অর্থপূর্ণ। ইতিপূর্বে কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় 'ভারতমাতা' নাটকে ভারতমাতাকে চরিত্ররূপে কল্পনা করে ভারতবর্ষের দুর্দিনের প্রতীকরূপিনী এই দেবীকে সর্বরিক্তারূপে দর্শকের সামনে এনেছিলেন। তারপরে বঙ্কিমচন্দ্রই দেশজননীর রূপ কল্পনা করেছেন 'আনন্দমঠে'। মা—যা ছিলেন, মা—যা হইয়াছেন, মা—যা হইবেন, এই ত্রয়ীমূর্তির পরিকল্পনায় যে অভিনবত্ব ও অপরূপত্বের সমাবেশ হয়েছে বাংলা সাহিত্যের কোথাও কোনো প্রয়োজনেই এমন দ্বিতীয় চিত্র রচিত হয়নি। 'আনন্দমঠের' সমস্ত সাধনা এই বঙ্গজননীর দুঃখমোচনের জন্যই। এই দেবীকে প্রসন্ন করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি,

"যবে মার সকল সন্তান মাকে মা বলিয়া ডাকিবে, সেইদিন উনি প্রসন্ন হইবেন।"

দেশমাতৃকার সাধনায় মগ্ন ও আত্মত্যাগে উৎসুক সাধকের কাছে এর চেয়ে আন্তরিক প্রেরণা আর কীই বা হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমিকের সমগ্র চৈতন্যের দ্বার খুলে দিয়েছিলেন,—দেখিয়ে দিয়েছিলেন আলোকিত দেশসাধনার রাজপথ। সত্যানন্দ নয়,—বঙ্কিমচন্দ্রই বাঙ্গালীর দেশারাধনা যজ্ঞের পুরোহিতের দায়িত্ব পালন করেছিলেন। কোনো কোনো সমালোচক সাম্প্রদায়িক রূপকল্পনার ও হিন্দুপৌত্তলিকতার স্পর্শে সঞ্জীবিত বঙ্কিমচন্দ্রের এই মাতৃধ্যানের ফলাফল এভাবে বর্ণনা করেছেন,—

"এই দেশপ্রেম সাম্প্রদায়িক রূপকল্পনাকে প্রতীক করায় সর্বজনীন আবেগ তাতে প্রকাশ পেতে পারল না।"[২৪]

কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে বঙ্কিমচন্দ্র দেশকেই আকৃতি দিয়েছিলেন—দেশকে সজীব ও চিন্ময়ী সত্তারূপে বর্ণনা করে যে উপায়ে তিনি দেশপ্রেম জাগিয়ে তুললেন—তার সাফল্য সর্বজনবিদিত।

আনন্দমঠের সন্তান সেনারাও জাতিনির্বিশেষেই গৃহীত হয়েছে। রক্ষণশীলতার বা সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শ এ গ্রন্থের কোথাও নেই। এই গ্রন্থেই সত্যানন্দ বলেছেন,—
"সকল সন্তান একজাতীয়। এ মহাব্রতে ব্রাহ্মণ-শূদ্র বিচার নাই।"

[২য় খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ]

যে কোন সংস্কারই এই সংগ্রামের মুহূর্তে ভেসে গিয়েছিল।

ঐতিহ্যের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া কোন সাধারণ মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়—কিন্তু দেশের আহ্বানে সাড়া দেবার আন্তরিক প্রেরণা যদি কেউ পেয়ে থাকেন,তিনি

২৪. ভবতোষ দত্ত, চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র, ১৮৬১, পৃঃ ১৪৫।

যে সম্প্রদায়েরই হোন না কেন দেশকে সজীব বলে চিন্তা করাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক হবে। বঙ্কিমচন্দ্র স্রষ্টা হিসেবে যে শিল্পসম্মত পন্থার আশ্রয় নিয়েছিলেন তার মূল্যায়ন প্রসঙ্গে বিরাট সাফল্যের দিকটাই দৃষ্টি আকর্ষণ করে আমাদের। তিনি সম্প্রদায়গত চিন্তার উর্ধ্বে একটি সর্বজনীন দেশসাধনার আবেগই সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন এবং তাতে সফল হয়েছিলেন।

'আনন্দমঠের' দেশসাধনার স্বরূপ প্রসঙ্গে দেশসাধকের মূর্তিটিও আমাদের মনে সবিস্ময় সম্ভ্রমবোধ জাগিয়ে তোলে। দেশমাতৃকার পদতলে নিবেদিত প্রাণ এই সব মহাত্মা দেশসাধকদের চরিত্র রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কল্পনার উচ্চতা প্রমাণ করেছিলেন। সত্যানন্দের কথা পূর্বেই বলেছি,—পরিচালক ও সংগঠক হিসেবে প্রচণ্ড ও নির্ভীক ব্যক্তিত্বের পরিচয়ই তাঁর সমস্ত আচরণে ফুটে উঠেছে। উপন্যাসের চরিত্র বলেই কল্পলোকেই এঁর অবস্থান। মর্ত্য পৃথিবীতে যে দু'চারজন ক্ষণজন্মা মহাত্মার জীবনচরিত পাঠ করেছি আমরা, তাঁদের সঙ্গে সত্যানন্দের খুব বেশী পার্থক্য নেই। এ চরিত্রটিতে মহাপুরুষসুলভ ব্যক্তিত্ব আরোপ করে বঙ্কিমচন্দ্র নেতৃত্বশক্তির ব্যাখ্যা দিতে চেয়েছিলেন। যদিও বাস্তবে নেতৃত্ব যাঁরা করেন তাঁরা সত্যানন্দ না হয়েও নেতা হয়েছেন। কল্পনার সঙ্গে বাস্তবের পার্থক্য এখানেই। তবু কল্পনাই যখন তা যত নিখুঁত হয় ততই ভালো। অন্যান্য সব চরিত্র প্রসঙ্গে এতখানি কাল্পনিকতার অভিযোগ আনা যায় না। সত্যানন্দ নেতা—কিন্তু জীবানন্দ, ভবানন্দ শিষ্য। শিষ্যের চরিত্রে সম্পূর্ণতা এলে তবেই সে নেতৃত্ব লাভের অধিকারী হয়। তাই জীবানন্দ ও ভবানন্দও নিখুঁত নন। উপন্যাসের দাবী রক্ষার তাগিদে এঁদের প্রাণচঞ্চল চরিত্র রূপেই অঙ্কন করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। দেশের জন্য সবকিছু ত্যাগ করা যে সম্ভব নয়,—জীবানন্দ সে কথা তাঁর পরিণীতা পত্নীর সামনে দাঁড়িয়ে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন। রক্তমাংসের মানুষ আদর্শের জন্য জীবনধারণের সাধারণ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হতে চায় না। ভবানন্দেরও ব্রতভঙ্গ হয়েছিলো। কিন্তু আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সুকৌশলে এঁদের পতন রোধ করেছেন। ভাঙনের মুখে ভেঙে পড়ার মুহূর্তেই শান্তি জীবানন্দকে রক্ষা করেছে,—সাধ্বী কল্যাণীর ধিক্কারবাণী ভবানন্দকে সাময়িকভাবে চৈতন্য দান করেছে। দেশসেবার মহৎ আদর্শ যে শুধু পুরুষকেই অনুপ্রাণিত করে তা নয়,—জীবনের সমস্ত আনন্দ ও সুখকে অবহেলায় সরিয়ে দিয়ে নারীও দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে, শান্তি সেকথা প্রমাণ করেছে। সেদিক থেকে শান্তি কিছু মাত্র অবাস্তব নয়। বাস্তবে, ইতিহাসে এমন নজির রয়েছে, সেদিক থেকে শান্তি ভারতীয় ঐতিহ্যেরই ধ্বজাবাহী। জীবানন্দের সন্তানব্রত যখন মুমূর্ষু তখন শান্তিই সে ব্রতরক্ষায় অগ্রণী,

'ছি—তুমি বীর। আমার পৃথিবীতে বড় সুখ যে, আমি বীরপত্নী। তুমি অধম স্ত্রীর জন্য বীরধর্ম ত্যাগ করিবে? তুমি আমায় ভালবাসিও না—আমি সে সুখ চাহি না—কিন্তু তুমি তোমার বীরধর্ম কখনও ত্যাগ করিও না।

[১ম খণ্ড, ষোড়শ পরিচ্ছেদ]

শান্তিও দেশসেবিকা—জীবানন্দের চেয়ে তার চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মনোবল বেশীই বলতে হয়। বঙ্কিমচন্দ্র শান্তির এই দৃঢ়তাকে পরে অসমসাহসিকতা বলে ব্যাখ্যা করেছেন। দেশসেবার আদর্শে এই দুটি নরনারী তাদের পার্থিব ভোগ-সুখ-কামনা জয় করে যে মহৎ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল—তাতে বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শসৃষ্টির নিপুণতাই প্রমাণিত হয়েছে। অসম্ভব হলেও দেশপ্রেমের আবেগ মানুষকে যে কতবড় ত্যাগ করতে শেখায় সে কথাটুকু বঙ্কিমচন্দ্র এ চরিত্র দু'টিতে দেখিয়েছেন। সন্তানব্রত সাঙ্গ হলেও জীবানন্দ ও শান্তি গৃহজীবনে ফিরে আসেনি, বঙ্কিমচন্দ্র উদ্গত অশ্রু লুকোতে পারেননি এঁদের জন্য,

হায়! আবার আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি? [চতুর্থ খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ]

'আনন্দমঠের' সন্তানব্রত সাঙ্গ হয়েছে,—দেশে শান্তি স্থাপিত হয়েছে,—ইতিহাস সমর্থিত সংবাদ পরিবেশনের জন্য বঙ্কিমচন্দ্র এই অহেতুক অংশটি যোজনা করেছেন কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে। সন্তানব্রত সাঙ্গ হতে পারে না, যা শুরুই হয়নি তা সারা হবে কি করে? উনবিংশ শতাব্দীর সংঘবদ্ধ স্বাধীনতা আন্দোলন যখন সবেমাত্র রূপ নিচ্ছে—এমন সময় উপন্যাসের জগতে একটা আকস্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। এটা যে পরিণত বাস্তববুদ্ধিরই প্রকাশ সে কথা আজ সন্দেহাতীত। অবশ্য ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠায় বঙ্কিমচন্দ্র যে সন্তুষ্ট ছিলেন—সে কথা সর্বথা স্বীকার্য। স্বাধীনতা আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে নিঃসংশয় বিশ্বাস ও আশা পোষণ করলেও মোঘল শাসনের অবসানে এদেশে ইংরেজ অধিকার প্রতিষ্ঠায় যে কোন উদার দৃষ্টি-সম্পন্ন শিক্ষিত বাঙ্গালীই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন। সেদিক থেকে 'আনন্দমঠের' ঐতিহাসিক পটভূমিকায় ইংরেজ রাজ্যস্থাপনে বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থন খুব অসঙ্গত নয়। কিন্তু তথ্যের সঙ্গে আদর্শের ব্যবধান এমন আকস্মিকভাবে এ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে বলেই বঙ্কিমচন্দ্রের সত্যিকারের বক্তব্যটি বোঝা মুস্কিল হয়ে পড়ে। দেশপ্রেমের এমন জলন্ত দৃষ্টান্ত যিনি স্থাপন করেছেন, স্বাধীনতার মূল্য ও দেশসাধনার আবশ্যকতা যিনি এমন স্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন তাঁর পক্ষে জাগ্রতচেতনা নিয়ে বিদেশীর দাসত্ব সমর্থন করা কোনোমতেই সম্ভব ছিল না,—তাই সত্যানন্দের চোখে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ দেখেছি আমরা। বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজ প্রশংসার পশ্চাতে কিছু রহস্যের ইঙ্গিত তাই যে কোন লোকের

চোখেই ধরা পড়ে। মুসলমানবিতাড়ন প্রসঙ্গে ও ইংরেজঅধিকার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লক্ষ্যণীয় উক্তি করেছেন,—

"উত্তর বাংলা মুসলমানের হাতছাড়া হইয়াছে। মুসলমান কেহই এ কথা মানেন না—মনকে চোখ ঠারেন—বলেন, কতগুলো লুঠেরাতে বড় দৌরাত্ম্য করিতেছে—শাসন করিতেছি। এইরূপ কতকাল যাইত বলা যায় না? কিন্তু এই সময়ে ভগবানের নিয়োগে ওয়ারেন্ হেষ্টিংস্ কলিকাতার গবর্নর জেনারেল। ওয়ারেন হেষ্টিংস্ মনকে চোখ ঠারিবার লোক নহেন—তাঁর সে বিদ্যা থাকিলে আজ ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য কোথায় থাকিত। [চতুর্থ খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

ইংরেজ অধিকারকে ভগবানের আশীর্বাদ বলে বর্ণনা করে বঙ্কিমচন্দ্র যে নির্জলা রাজভক্তিরই পরিচয় দিয়েছেন—তাতে সন্দেহ নেই। বৃটিশ রাজকর্মচারীর পক্ষে এ আনুগত্য প্রদর্শন অত্যন্ত স্বাভাবিকই, কিন্তু 'আনন্দমঠ' রচয়িতার পক্ষে আনুগত্য প্রদর্শনের এই সাড়ম্বর প্রস্তুতিটাই যেন বেমানান।

সমালোচক রমেশচন্দ্রও 'আনন্দমঠের' এ অংশটিতে অসঙ্গতি খুঁজে পেয়েছিলেন। Encyclopaedia Britannica-য় তিনি খুব সংক্ষেপে সার্থক সমালোচনায় বলেছিলেন,—

"His outstanding work however is the Ananda Math, a story of the Sannaysi rebellion of 1772. The rebels gained a crushing victory over the British and Mohammedan forces. This success was, however, not followed up as a mysterious "physician" speaking as a divinely-inspired prophet, advised Satyananda to abandon further resistance, as, for the time, British rule was the only alternative to Mohammedan oppression".

ঈশ্বরগুপ্তের দেশপ্রেমে এ জাতীয় বৈপরীত্য আবিষ্কার করেছি আমরা—বঙ্কিমচন্দ্রের দেশভক্তির সঙ্গে অন্ততঃ এই ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্তের কোন পার্থক্য নেই। বৃটিশ রাজছত্রের তলে স্বদেশপ্রেমিকের আত্মরক্ষার এইটিই সর্বাপেক্ষা সুলভপন্থা। তাই দেশপ্রেমের গভীরতা কিংবা উপলব্ধিতে তারতম্য থাকতে পারে—কিন্তু আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে ঈশ্বরগুপ্ত কিংবা বঙ্কিমচন্দ্র একটি উপায়ই বেছে নিয়েছিলেন। 'আনন্দমঠের' প্রথম সংস্করণে বঙ্কিমচন্দ্রের বিজ্ঞপ্তির ভাষাটি খানিকটা কৈফিয়তের মতোই শুনিয়েছে,

"সমাজবিপ্লব অনেক সময়ই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজেরা বাংলাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থে বুঝান গেল।"

কিন্তু গ্রন্থের বর্ণনায় দেখি, যে সন্তানেরাই অবলীলাক্রমে মুসলমান অত্যাচার দমন করেছে, ইংরেজ দমন করেছে, অরাজকতা দমনের কৃতিত্ব তাঁদেরই প্রাপ্য—অথচ ইংরেজসেনার ওপরে সে গৌরব অর্পণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। অথচ তিনিই পাকা ইংরেজ ওয়ার্ডসের যে দুর্গতিচিত্র অঙ্কন করেছেন-তারপরেও দমনের কৃতিত্ব আর ইংরেজের হতে পারে কি?

"যেমন দুইখণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরের সংঘর্ষে ক্ষুদ্র মক্ষিকা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, তেমনি দুই সন্তানসেনা সংঘর্ষে এই বিশাল রাজসৈন্য নিষ্পেষিত হইল।

ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।"

[৪র্থ খণ্ড, ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

এই বিদ্রোহী সন্তানসেনারা ওয়ারেন হেষ্টিংসকেও কিভাবে চোখ রাঙ্গিয়েছিলেন, তার বর্ণনা দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। ইংরেজ শাসনের প্রথমে নির্বিবাদে দেশজয় করা সম্ভব হয়নি তাদের,--ইতিহাসই সে সত্য প্রকাশ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে ইংরেজ ভারতের একচ্ছত্র শাসক, একালের তুলনায় ইতিহাসের বাঙ্গালী যে অনেক বেশী রাজনীতি সচেতন, স্বাধীনচেতা ছিল বঙ্কিমচন্দ্র সেকথা প্রমাণ করতে চাইলেন,

"এই সময়ে প্রথিত নামা, ভারতীয় ইংরেজকুলের প্রাতঃসূর্য্য ওয়ারেন হেষ্টিংস সাহেব ভারতবর্ষের গভর্নরজেনরল। কলিকাতায় বসিয়া লোহার শিকল গড়িয়া তিনি মনে মনে বিচার করিলেন যে, এই শিকলে আমি সদ্বীপা সসাগরা ভারতভূমিকে বাঁধিব। একদিন জগদীশ্বর সিংহাসনে বসিয়া নিঃসন্দেহে বলিয়াছিলেন, তথাস্তু। কিন্তু সেদিন এখন দূরে। আজিকার দিনে সন্তানদিগের ভীষণ হরিধ্বনিতে ওয়ারেন হেষ্টিংসও বিকম্পিত হইলেন।" [তৃতীয় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ]

কিন্তু এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সন্তানসেনা রাজ্য চায়নি, রাজত্ব চায়নি, শুধু শান্তি চেয়েছে। 'আমরা রাজ্য চাইনা'—সত্যানন্দ সন্তানসেনাকে এ তথ্যই বুঝিয়েছেন।

সেই শক্তিমান বিদ্রোহীরা গীতার উপদেশ,—ভারতবর্ষের সনাতন ত্যাগের মহিমা প্রচারের জন্য সমস্ত শক্তি সংযত করেছে,—সত্যানন্দের মত সংগঠক শেষ পর্যন্ত হিমালয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এসব অংশ থেকেই স্পষ্টতঃই বোঝা যায় বঙ্কিমচন্দ্র কিছু স্বকৃত জটিলতা এই উপন্যাসে সৃষ্টি করেছেন। সন্তানসেনার অসাধারণ ও অবিশ্বাস্য বীরত্বের বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি যেমন তন্ময় তেমনি এ গ্রন্থ রচনার আসল উদ্দেশ্যটি গোপন করার জন্যও তৎপর হয়েছিলেন,—দু'য়ের সংমিশ্রণে যে লক্ষ্যণীয় অসঙ্গতি সৃষ্টি হয়েছে,—যে কোন সাবধানী পাঠকের চোখে তা ধরা পড়বেই।

'আনন্দমঠের শেষাংশে চিকিৎসক ইংরেজ রাজত্বে বাঙ্গালীর ভবিষ্যতের যে চিত্র

বর্ণনা করেছেন তা বঙ্কিমচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর চরিত্র থেকেই গ্রহণ করেছেন; শিক্ষায় ও জ্ঞানে যে প্রাচীন আর্য্যসভ্যতা সমগ্র ভারতে শক্তিবিস্তার করেছিল—নবলব্ধ পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার আলোকে তারই পুনরুজ্জীবন লক্ষ্য করেছিলেন সে যুগের মনীষিবৃন্দ। আত্মিক জাগরণ না ঘটলে সর্বাত্মক কোন পরিবর্তন আসতে পারে না,—বঙ্কিমচন্দ্র এ সত্য জানতেন। এখানেও দূরদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন,—"ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতনধর্ম প্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না। তখন প্রকৃত ধর্ম আপনাআপনি পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। যতদিন তা না হয়, যতদিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুণবান্ আর বলবান হয়, ততদিন ইংরেজ রাজ্য অক্ষয় থাকিবে।"

[চতুর্থ খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ]

এ বিশ্বাস বঙ্কিমচন্দ্রেরই শুধু নয় শিক্ষিত প্রজ্ঞাবান চিন্তাবিদেরা এ কথা বারবার বলেছেন। 'আনন্দমঠের' মত জাতীয়তাবাদী উপন্যাসের উপসংহারে সুকৌশলে বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীর আশু কর্তব্য নির্ধারণ ও চৈতন্যসম্পাদন করেছিলেন, এখানেই গ্রন্থটির অসামান্যতা। সমালোচক শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ 'বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থটিতে বঙ্কিমচন্দ্রের দেশসেবাপ্রসঙ্গে বলেছেন,

"বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার উপন্যাসে বাঙ্গালীকে বাংলার অনেক ঐতিহাসিক ব্যক্তির ও ঘটনার সহিত পরিচিত করিয়াছেন। সন্ন্যাসীবিদ্রোহ, দেবী চৌধুরানী, সীতারাম—বঙ্কিমচন্দ্রের এই উপন্যাস ত্রয়ের প্রকাশের পূর্বে কয়জন বাঙ্গালী এ সকলের কথা জানিতেন?"[২৫]

আমাদের অগৌরবের ইতিহাস যাঁকে পীড়া দিয়েছিল,—গৌরবের ইতিহাস সন্ধান করে সমগ্র বাঙ্গালীর সামনে তুলে ধরেছিলেন যিনি, স্পর্শকাতর, প্রখর আত্মমর্যাদাসম্পন্ন সেই সার্থক বাঙ্গালী বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবে ধন্য হয়েছিল বঙ্গদেশ ও বাঙ্গালী। ইতিহাসের অনুজ্জ্বল অধ্যায়ের সঙ্গে কল্পনার মিশ্রণেই তাঁর অধিকাংশ ঐতিহাসিক উপন্যাসের জন্ম হয়েছে, কিছু অবাস্তবতা, অতিশয়োক্তি তাতে থাকবেই। কিন্তু যে প্রেরণা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র এ জাতীয় গ্রন্থরচনায় জীবনব্যাপী সাধনা করে গেছেন তা পুরোপুরি স্বদেশপ্রেমের। 'দেবী চৌধুরানীতে' জাতীয়চেতনা-সমৃদ্ধ বাঙ্গালীর সামনে অসমসাহসিকা একটি বঙ্গললনার বীরত্বের কাহিনী পরিবেশনের প্রথম চেষ্টা তাঁরই। বাঙ্গালীর বাহুবলের পরিচয়দানের উদ্দেশ্যেই তিনি ইতিহাসের অস্পষ্ট ও বিস্মৃত সূত্রের সাহায্য নিয়েছিলেন, ইতিহাসের

২৫. হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬২।

বাঙ্গালিনীর গৌরবচিত্র রচিত না হলে উদ্দেশ্যটি পূর্ণ হোত না। 'আনন্দমঠের' শান্তির মধ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গললনার শক্তি, ত্যাগ ও মনোবলের স্মরণীয় চিত্র রচনা করেছেন কিন্তু দেবীরানী পেয়েছে নেতৃত্বের দায়িত্ব। এ চরিত্রের সঙ্গে ইতিহাসের যে সামান্য সংযোগসূত্র পেয়েছিলেন উপন্যাসে সেটুকুই তিনি রমণীয় করে তুলেছিলেন। উত্তরবঙ্গে ভবানীপাঠক ও দেবীরানী শুধু কিংবদন্তীতেই স্থান পেয়েছেন তা নয়, কিছু কিছু স্থানীয় ঐতিহাসিক স্মৃতি এখনও সে ইতিহাস স্মরণ করিয়ে দেয়। এ ঘটনার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র আর্তরক্ষার জন্য শক্তিমানের সঙ্গে সংঘবদ্ধশক্তির সংঘর্ষ কল্পনা করে নিয়েছিলেন। এ জাতীয় কল্পনার মধ্যে মহিমারোপ করাটা সেই যুগের পরিবেশে সম্ভব হয়েছিল। স্বদেশপ্রেম ত একটি নির্জীব অনুভূতি নয়, স্বতস্ফূর্তভাবে যখন এই মনোভাব জন্ম নেয় তখন আবেগ ও উচ্ছ্বাসে তা ভরপূর থাকে। নিতান্ত নগণ্য প্রচেষ্টাকেই তখন মহৎ বলে চালানো যায়। ভবানীপাঠক ও দেবীরানী ডাকাত দলের নেতৃত্ব করতেন। ডাকাতির মধ্যে মহিমা আবিষ্কার করা এবং নির্বিচারে তার দ্বারা অভিভূত হওয়া সম্ভব ছিল সেই উত্তেজনার যুগেই। 'চন্দ্রশেখরে'ও দস্যুতার প্রশস্তি রচনা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। দস্যুতা বা ডাকাতির উদ্দেশ্য যদি লোককল্যাণ হয় তবে তা নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের যুক্তি মোটামুটিভাবে জনগণের সমর্থন পেয়েছিল এজন্যই। 'রাজসিংহে' ডাকাত মানিকলাল সম্বন্ধে সমালোচনা কিছু তিক্ততার সৃষ্টি করেছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্র দুঃখ পেয়েছিলেন। তবে যোগ্য সমর্থকরা তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। কোন সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের সমর্থনে বলেছিলেন,

"চন্দ্রশেখর বাবুতে এবং আমাতে একযোগে বলিলাম, মানিকলালের মত দুই একটা ডাকাতের চিত্র দেশের সমুখে ধরিলে উপকার ভিন্ন অপকার হইবে না।"[২৬]

বাঙ্গালীর বাহুতে বল আর হৃদয়ে দেশভক্তি জাগানোর সুমহতী ব্রত তিনি গ্রহণ করেছিলেন—তাঁর পক্ষেই ইতিহাসের সূত্র ধরে এমন একটি অনবদ্য কল্পলোকের চিত্র উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব। ভবানীপাঠক ও দেবীরানীর চরিত্রে গীতোক্ত নিষ্কাম কর্মের প্রসঙ্গ এমন নিপুণ ভাবে উপস্থাপিত করায় চরিত্র দু'টি বাস্তবক্ষেত্রের বহু ঊর্ধ্বেই বিরাজ করছে। যুক্তিবাদী ভবানীপাঠক তাঁর উদ্দেশ্যকে এমন প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন যে নিছক দস্যুতার দীনতা এ চরিত্রটিকে আর স্পর্শ করতে পারে না। তার আগে অরাজতার ভয়াবহ চিত্র রচনা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র; যে দুর্বিপাক বাঙ্গালী জীবনকে বিধ্বস্ত করেছিল, ভবানীপাঠক দেবীরানীকে সে

২৬. শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, বঙ্কিম প্রসঙ্গ, রাজসিংহ।

চিত্রটিই তুলে ধরেছিলেন। 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসের ঘটনাকাল; ইংরেজ রাজত্বের শুরু ও মুসলমান রাজত্বের অবসান পর্ব।

'মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে, ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ ছারখার করিয়া গিয়াছে।' [১ম খণ্ড, অষ্টম পরিচ্ছেদ]

এ অংশটির ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে—অরাজকতার পটভূমিকায় কল্পনার প্রশস্ত ক্ষেত্রটি বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করেছেন। ভবানীপাঠকও দেবীরানীকে বলেছিলেন,—"এ দেশে রাজা নাই। মুসলমান লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে তাহারা রাজ্য শাসন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।" [১ম খণ্ড, পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ]

দেবীরানীর দীক্ষা ভবানীপাঠকেরই কাছে– কিন্তু ডাকাতির অপরাধ দেবীকে পীড়িত করত; ন্যায়বোধের তাগিদেই দেবীরানী নেতৃত্ব থেকে মুক্তি চেয়েছিল। কিন্তু ভবানীপাঠক তাঁকে সত্য চিনিয়েছেন,—

"দেশ অরাজক, দেশে রাজশাসন নাই, দুষ্টের দমন নাই, যে যার পায়, কাড়িয়া খায়। আমরা তাই তোমায় রানী করিয়া রাজশাসন চালাইতেছি। তোমার নামে আমরা দুষ্টের দমন করি, শিষ্টের পালন করি। এ কি অধর্ম?

[২য় খণ্ড, ১০ম পরিচ্ছেদ]

ডাকাতির এমন মহিমা দেখানোর উদ্দেশ্যটি বোঝানোর জন্যই বারবার কৈফিয়ৎ দিতে হয়েছে লেখককে। দেশব্রত ও পরহিতব্রত পৃথক বস্তু, কিন্তু দেশের দুর্দিনে দেশের দুঃস্থ মানুষের মুক্তির জন্যই যাঁরা সাধনা করেন তাঁরা একই সঙ্গে পরহিতব্রতী এবং দেশব্রতী। স্বদেশপ্রেমিক বলেই বঙ্কিমচন্দ্র পরাধীন বাংলার বুকে দেশপ্রেমের যে ক্ষীণ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করেছিলেন তাকেই উপন্যাসাকারে উপস্থিত করেছেন। উদ্দেশ্যের সততায়, নির্ভীকতায়, দৃঢ়তায় ভবানী পাঠক শ্রদ্ধেয় চরিত্ররূপে কল্পিত। স্বাদেশিকতার জোয়ারে ইতিহাসের কলঙ্কিত অকর্মণ্য ঐতিহাসিক চরিত্রকেও যখন 'national hero'-র আসনে বসানো সম্ভব তখন বঙ্কিমচন্দ্রের এই উদ্দেশ্যমূলক আদর্শচরিত্র রচনাকে অভিনন্দন জানাতে হয়। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রাক্ মুহূর্তে আবির্ভূত হয়েছিলেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্র এ জাতীয় উপন্যাস লিখেছিলেন। সাহিত্য ও সাময়িকতা এমনি এক অদৃশ্য সূত্রে যুক্ত হয়ে যায়,—কোনো স্রষ্টাই এর হাত থেকে রেহাই পান না। সাহিত্য তাই সামাজিক ও সাময়িকতার দলিল হয়ে থাকে। অতীত ইতিহাসের আন্দোলন সমর্থন করে পক্ষান্তরে সমসাময়িক অভ্যুত্থানকেই যে সমর্থন করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তা আর দুর্বোধ্য কিছু নয়। অতীতে বাঙালীর

বাহুবল ছিল, নির্ভীকতা ছিল, শক্তি ও সাহস ছিল বলে বর্তমানের বাঙ্গালী শুধু তার প্রশংসাই করেনি—ঐতিহ্যের অনুসরণ করে অতীত মহিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করার চেষ্টাই সমগ্র জাতির চরিত্রে লক্ষ্য করি। 'দেবী চৌধুরানীর' মত উপন্যাসের কিছু প্রভাব এর মূলে সক্রিয়।

দেবীচৌধুরানী উপন্যাসের দেবীরানী যে বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিলেন তা অবশেষে ইংরেজেরই বিরোধিতায় পর্যবসিত। গভীর জঙ্গলে একটি নারীর নেতৃত্বে যে সেনাদল শুধু আর্তের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলো শাসক ইংরেজ তাদের দমন করতে উদ্যত হলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আসন্ন হল। বঙ্কিমচন্দ্র অন্যান্য উপন্যাসে যে পদ্ধতিতে যুদ্ধ ও তার ফলাফল বর্ণনা করেছেন এ উপন্যাসে তার ব্যতিক্রম হয়নি। সর্বত্র একই নিয়মে বিরুদ্ধ শক্তির শোচনীয় পরাজয়ের বিস্তৃত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রেও দেবীরানীকে বন্দী কর'র অভিযানে ব্যর্থ হয়ে ইংরেজ অধিনায়ক লেফটেনণ্ট্ ব্রেনান্ দেবীরানীর হাতে বন্দী হলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ প্রসঙ্গে লাঠি-বন্দনা করেছেন ;—শক্তিমান বাঙ্গালীর [illegible]ত্র অস্ত্র হিসেবে লাঠিই একদিন মুখরক্ষা-ধর্মরক্ষা করেছিল।

"হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে! তুমি ছার বাঁশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে, এমন কাজ নাই। তুমি বাঙ্গালায় আব্রু পর্দা রাখিতে, মান রাখিতে, ধান রাখিতে, ধন রাখিতে, জন রাখিতে, সবার মন রাখিতে। মুসলমান তোমার ভয়ে ত্রস্ত ছিল, ডাকাইত তোমার জালায় ব্যস্ত ছিল, নীলকর তোমার ভয়ে নিরস্ত ছিল। এখন তোমার সে মহিমা গিয়াছে।

[তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ]

এই আক্ষেপ শুধু বীর্যহীন বাঙ্গালীদের দুরবস্থা দেখে! আত্মরক্ষায় অক্ষম বাঙ্গালী অসহায়ভাবে পীড়িত হয়েছে,—তবু সংঘবদ্ধ হয়নি, অত্যাচারের প্রতিবাদ করেনি, এ অভিজ্ঞতা বঙ্কিমচন্দ্রকে দুঃখ দিয়েছে। কোনো উপায়ে যদি এই নির্জীব-অচেতন জাতিকে সচেষ্ট করা যায়—সেই চিন্তাই বঙ্কিমচন্দ্রকে নিরন্তর বিব্রত করেছে। প্রবন্ধেই বহুভাবে বাঙ্গালীর চারিত্রিক দুর্বলতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তিনি,—কিন্তু উপন্যাসেও সম্পূর্ণ নীরবতা পালন করা সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে। কোনো প্রসঙ্গে এ জাতীয় আলোচনার সূত্রপাত হলে বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের মধ্যেই একটি উপদেশ-মূলক প্রবন্ধের স্থান করে নিয়েছেন। বাঙ্গালীর অতীতমহিমা কীর্তনে আত্মহারা হয়ে বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবীচৌধুরানীতে' লাঠির ওপর একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধই রচনা করে ফেলেছেন। অতীত মহিমার পুনরুজ্জীবনের বিচিত্র আয়োজন করেছিলেন সেযুগের সমস্ত স্বদেশপ্রেমী লেখকেরাই। ইতিহাস আলোচনায়, কল্পিত বীরত্ব কাহিনী

পরিবেশন করে, উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়ে বাঙ্গালীর নির্জীব মনে প্রাণের সঞ্চার করার অনলস সাধনাই এ যুগের সমস্ত স্বদেশপ্রেমী লেখকের প্রধানতম কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র 'দেবীচৌধুরানী'তে দেবীরানী চরিত্রের সমস্ত মাধুর্যটুকু বজায় রেখেও তাকে ডাকাত দলের অধিনায়িকা রূপে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। বঙ্গললনাকে তিনি আকস্মিক পরিবেশে স্থাপন করলেও, আধ্যাত্মিকতার মন্ত্রে দীক্ষিত করলেও নারী চরিত্রের স্বাভাবিক মোহজয় করেনি সে। সুতরাং ভবানী পাঠক চালিত এ চরিত্রটির মধ্যে সত্যিকারের কোনো পৃথক দেশচেতনা কোথাও দেখতে পাই না। সংগঠকরূপে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ভবানীপাঠক স্বয়ং, তাঁকেও ঠিক দেশসেবী বলা যায় না। সত্যানন্দের মধ্যে দেশচেতনার প্রচণ্ড আবেগ লক্ষ্য করেছি কিন্তু ভবানীপাঠক কর্মফলত্যাগী গীতোক্ত এক মহামানব। তাঁকে এযুগের লেখক বঙ্কিমচন্দ্র ঠিক অবতার বলেও প্রমাণ করতে চাননি অথচ সমস্ত বৈষয়িকতার উর্ধ্বে ভবানীপাঠক ঠিক পরিত্রাতার দায়িত্ব পালনের জন্যই অবতীর্ণ হয়েছেন যেন। প্রফুল্লকে তিনি যে ধর্মে দীক্ষা দিয়েছিলেন [illegible]-উপদেষ্টারাই সে কাজটি পালন করে থাকেন। শুধু পীড়িত—অত্যাচারিত-সর্বহারা মানবসন্তানের রক্ষার জন্যই এমন একটি অসাধু পন্থা অবলম্বন করতে হয়েছিল তাঁকে। দেশের দুঃখে বিচলিত হয়েছিলেন বলেই শক্তিধারণ ও অস্ত্র-প্রয়োগের প্রয়োজন হয়েছিল তাঁর। ভবানীপাঠক কৃতকর্ম পালন করে স্বেচ্ছায় দ্বীপান্তরে গেলেন এ দৃষ্টান্তটি স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র পন্থানুসারীদের কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বলে বিবেচিত হওয়াটাই স্বাভাবিক। পরবর্তীকালে এ জাতীয় ঘটনার উল্লেখযোগ্য বিবরণ স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে স্থান পেয়েছে—সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্র এ ক্ষেত্রেও পরোক্ষভাবে দেশসেবার একটি জ্বলন্ত চিত্রই অঙ্কন করেছিলেন। তাছাড়া সনাতন ভারতীয় আদর্শের বাণী তাঁর সমস্ত বক্তব্যকেই গাম্ভীর্য দান করেছে। দেশসেবার মধ্যেই ব্যক্তিগত স্বার্থচেতনার পূর্ণ-বিলুপ্তি ঘটেছে। ভবানীপাঠক ঐতিহাসিক চরিত্র,—কিন্তু উপন্যাসের ভবানীপাঠক বঙ্কিমচন্দ্রের অভিনব সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মচেতনা ও দেশপ্রেমিকতার সমন্বয়ে এ চরিত্র অনবদ্য হয়েছে।

'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসের লক্ষ্যণীয় আর একটি দিক রয়েছে। মানবী প্রফুল্লকে দেবীরানীতে রূপান্তরিত করার যে নিখুঁত পদ্ধতির বর্ণনা আছে—ভবানী-পাঠক নির্দেশক হলেও বঙ্কিমচন্দ্রই এর উদ্ভাবক। কঠোর আত্মসংযম ও নিয়মনিষ্ঠার মধ্যেই মানসিক ও শারীরিক শক্তির স্ফূরণ সম্ভব। ভবানী পাঠকের রানী তৈরীর পদ্ধতিটি একটি নিখুঁত পদ্ধতি বলেই গণ্য হবে। শক্তি সামর্থ্য জন্মগত গুণ না হলেও এভাবে তা অর্জন করা সম্ভব। প্রফুল্লের মত নিতান্তই গ্রাম্য-অশিক্ষিতা-স্বভাব-

কোমল নারীর পক্ষে যদি এ শিক্ষা সুফল প্রসব করে থাকে তবে অধিক মনোবল-সম্পন্ন পুরুষের পক্ষে তা যে কার্যকরী হবেই এ ইঙ্গিতটুকু সহজেই বোঝা যায়। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরানী' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র সুকৌশলে যুগোপযোগী বক্তব্যগুলিই পরিবেশন করেছিলেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম স্তরে নির্ভীক দেশপ্রেমী সৃষ্টি করার এমন তাগিদ অনেকেই অনুভব করেছিলেন। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে দৈহিক শক্তি ও মানসিক দৃঢ়তা অর্জন করার উপদেশটি সেকারণেই মূল্যবান। উত্তর বাংলার নিবিড় অরণ্যে ভবানীপাঠক এমনি নিখুঁত পদ্ধতিতে ভাবী উত্তরাধিকারী সৃষ্টির আয়োজন করেছিলেন—এ ভাবাও যায় না;—কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর শেষপাদে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উৎকণ্ঠিত ভারতবাসী শক্তি ও সামর্থ্য অর্জনের চেষ্টা করেছিল—তা আমরা জানি। বঙ্কিমচন্দ্র একালের আকাঙ্ক্ষাকে এ যুগের পরিবেশে স্থাপন করার অসুবিধে চিন্তা করেছিলেন—সেজন্যই অতীতযুগের বাংলায় এ কাহিনীর পরিকল্পনা করতে হল তাঁকে। সর্বত্রই বঙ্কিমচন্দ্র যুগোপযোগী ভাবধারার বিশদ বিশ্লেষণ করেছেন। দেবীরানী ভবানীপাঠকের নির্দেশ পালন করেছে মাত্র কিন্তু দেশচেতনার কোন আবেগ এ চরিত্রে ছিল না। সুতরাং এ উপন্যাসের নায়িকাচরিত্রে স্বদেশচিন্তার কোন প্রতিফলন নেই। দেশপ্রেমের মহৎ প্রেরণা শুধু ভবানীপাঠক চরিত্রেই লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিমচন্দ্রের সর্বশেষ উপন্যাস সীতারামেও স্বদেশচিন্তার প্রতিফলন খুব স্পষ্ট। শেষ পর্বের ত্রয়ী উপন্যাসেই বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন দর্শনের প্রভাব অত্যন্ত গভীর। দেশচিন্তা ও জাতির মঙ্গল কামনা বঙ্কিম মনীষার একটি লক্ষ্যণীয় দিক। 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরানী'তে, ভাবী আন্দোলনের খসড়া রচনা করেছিলেন তিনি অত্যন্ত সুকৌশলে। তাঁর সর্বশেষ উপন্যাসে বাঙ্গালী ভূস্বামী সীতারাম রায়ের স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের আকাঙ্ক্ষা ও তার শোচনীয় ব্যর্থতার কাহিনী পরিবেশিত হয়েছে। এ দৃষ্টান্ত 'মৃণালিনীতেই' পেয়েছি আমরা—সীতারামে তার পুনরাবৃত্তি হয়েছে বলা চলে। তবে সীতারামের বীরত্ব, দেশপ্রাণতার প্রসঙ্গ আরও উজ্জ্বল ও আশাপ্রদ। স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের বাসনাকে রূপ দেবার সমস্ত আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করেছিলেন তিনি;—তাঁর দুর্বলতা ঠিক হেমচন্দ্রের মত ছিল না। কিন্তু উভয়ের ব্যর্থতার মূল কারণ এক। সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি, মোঘলের বিরুদ্ধে শক্তিসঞ্চয় করে স্বাধীন হবার প্রচেষ্টা তাঁকে জনপ্রিয় করেছিল। ঐ অঞ্চলের আরও একজন ভূস্বামী প্রতাপাদিত্যও ঠিক এই চেষ্টা করেছিলেন। প্রতাপাদিত্য জাতীয় আন্দোলনের যুগে জাতীয় বীরের মর্যাদায় ভূষিত হয়েছিলেন। জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণা হিসেবে স্বদেশপ্রেমিক সাহিত্যিকের কল্পনায় এসব চরিত্র নবজীবন লাভ করেছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহাসিকত্ব বজায় রেখেই চরিত্রটি অঙ্কন করেছিলেন কিন্তু শুধু ইতিহাসের বিবরণ দেওয়া বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য ছিল না। স্বদেশপ্রেমী ও জাতীয়তাবাদী বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শের ছায়ায় চরিত্রটির মর্যাদা বেড়েছে। এ প্রসঙ্গে কোন সমালোচক 'সীতারামের' আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন,

"সীতারাম যেভাবে রাজ্যস্থাপন করেছেন তা ইতিহাসসম্মত, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তথ্যকে এমন কৌশলে বর্ণনা করেছেন যে ইতিহাস আর ইতিহাস থাকেনি, তা একটা জাতীয় অভ্যুত্থানের মহিমা পেয়েছে।"[২৭]

এই মহিমাটুকুই বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব সৃষ্টি। জাতীয় অভ্যুত্থানের লগ্নে আপন শক্তিতে রাজ্যস্থাপনের এমন একটি সংপ্রচেষ্টাকে জনগণ যে অভিনন্দিত করবে—বঙ্কিমচন্দ্র তা জানতেন। সেদিক থেকে সীতারামের চরিত্র নির্বাচন করে বঙ্কিমচন্দ্র দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছেন। উপন্যাসের প্রারম্ভেই সীতারামের নির্ভীক হৃদয়ের উজ্জ্বল চিত্রটি তুলে ধরেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। প্রজারক্ষণে, ন্যায়প্রতিষ্ঠায় অভীক সীতারাম আত্মদান করেও আদর্শরক্ষা করতে চেয়েছে। গঙ্গারামের উদ্ধারকল্পে সীতারাম বলেছে,

"ও আমার যেই হোক, আমি উহার প্রাণদানে স্বীকৃত—আমি সর্বস্ব দিয়া উহার প্রাণ রাখিব। এই আমাদের হিন্দুর ধর্ম।" [১ম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

চারিত্রিক এই দৃঢ়তাই সীতারামকে প্রচণ্ড শক্তি দিয়েছিল, সামান্য ভূস্বামী হয়েও সীতারাম যে স্বাধীন রাজ্যস্থাপন করতে পেরেছিল তার কারণটি প্রথমেই ব্যাখ্যা করেছেন তিনি। সীতারামের সাফল্যের মূলে তাঁর অদম্য সাহস ও মনোবলই সক্রিয়। অবশ্য গঙ্গারামের জন্য আত্মদানে উন্মুখ সীতারামকে প্রত্যক্ষ প্রেরণা দান করেছিল শ্রী। বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীর মুখে একটি মূল্যবান উক্তি আরোপ করেছেন,—"হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে?"—বঙ্কিমসাহিত্যের প্রবাদতুল্য উক্তির মধ্যে এটি অন্যতম। স্বাজাত্যপ্রেমের প্রেরণা এমন একটি ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তির মধ্যেই প্রকাশ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র নতুবা শ্রীর চেতনায় এটি ঠিক স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়েছিল বলে মনে হয় না। স্বামী পরিত্যক্তা ও ভ্রাতৃগৃহে পালিতা এই নির্যাতিতা নারী আকস্মিক আঘাতে জীবনের এই সত্যটি আবিষ্কার করেছে যেন হঠাৎ। সীতারামের অনুগ্রহলাভের আকাঙ্ক্ষায় শ্রী তাঁর স্বামী সীতারামের সাহায্য চায়নি,—আর্তরক্ষার ক্ষমতা যার হাতে সেই সীতারামের সাহায্য প্রার্থনা করেছে। দুর্বলকে রক্ষা করতে পারে শক্তিমানই,—কিন্তু স্বজাতিপ্রীতিই যে একমাত্র

২৭. বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬৩।

রক্ষাকবচ, দুরদর্শিতায় ও আপাতঃ অভিজ্ঞতায় একথা বুঝতে পেরেছিলো শ্রী। পরোক্ষে বঙ্কিমচন্দ্র সমস্ত নির্যাতিতকে সম্মিলিত হবার মন্ত্রে দীক্ষিত করতে চাইছেন এখানে। এখানে ধর্মীয় চেতনার প্রসঙ্গটিই বড়ো কথা নয়। যদিও ঐ পরিবেশে ধর্মীয় চেতনা জাগাটাই সম্ভব ছিল। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণ লগ্নে জাতীয়তাবাদ সমস্ত ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে বিরাজিত একটি মহৎ উপলব্ধি। দেশোদ্ধারের আদর্শে যাঁরা নিবেদিতপ্রাণ তাঁদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বক্তব্যটি যথাযথ ভাবে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন বলেই আমাদের ধারণা। ইতিহাসের কাহিনীতে এই জাতীয় ধর্মীয় চেতনা থাকাটাই স্বাভাবিক—কারণ ধর্মের ভিত্তিই সেদিন সমাজের সব চেয়ে বড়ো শক্তি ছিল। ধর্মের নামেই মানুষ সেদিন মিলিত-একত্রিত ও সংঘবদ্ধ হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কারবিচ্ছিন্ন দেশাত্মবোধের প্রসঙ্গ প্রাচীন ইতিহাসে স্থাপন করলে বেমানান হোত। বঙ্কিমচন্দ্র তাই ইতিহাসভিত্তিক বীরত্ব ও ত্যাগের কাহিনী পরিবেশনের সময়ে ধর্মচেতনাকে একেবারে বাদ দিতে পারেননি। সীতারামে যে সংঘাত চিত্র পাই তাতে হিন্দু জাতীয়তারই উদ্বোধন দেখতে পাই,—যা ইতিহাস সম্মতসত্য। শ্রী রণরঙ্গিনী মূর্তিতে উৎসাহ দিয়েছে,—

মার! মার! শত্রু মার!…দেবতার শত্রু, মানুষের শত্রু, হিন্দুর শত্রু, আমার শত্রু—মার। শত্রু মার। [১ম খণ্ড, চতুর্থ পরিচ্ছেদ]

ধর্মই সর্ববিপদ থেকে রক্ষা করবে,—এই বিশ্বাস সেদিন মানুষের মনে দৃঢ় ছিল। তাই দেখি, রাজ্যজয়ের উন্মাদনাতেও ধর্মচেতনা বিস্মৃত হোত না সেদিনের মানুষ। বখ্‌তিয়ার পশুপতিকে বন্দী করে প্রথমেই প্রস্তাব করেছিল,—

"আমাদিগের পুরোহিত উপস্থিত, এখনই আপনাকে ইসলামের ধর্মে দীক্ষিত করিবেন।" [মৃণালিনী]

আর সে কারণে ধর্মকে রক্ষা করার জন্যই ইতিহাসের মানুষরা প্রাণ দিতে উদ্যত হয়েছে। স্বাধীনতার জন্য যে জাগরণ উনবিংশ শতাব্দীতেই প্রথম দেখতে পাই, সেখানে ধর্মের পরিবর্তে দেশকেই স্থাপন করা হয়েছে, বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠেই' এ বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন। সর্বধর্মের ওপরে দেশ, দেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করার জন্য সমস্ত কিছুই ত্যাগ করা সম্ভব - সেই ব্রতেই সন্তানদের উৎসাহিত করেছেন স্বামী সত্যানন্দ। 'সীতারামে' হিন্দু জাতীয়তা স্থাপনের প্রসঙ্গটি স্বদেশ-চেতনার দ্বারাই পরিকল্পিত। ধর্মান্ধতা এর মূলে নেই। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশচর্চার স্বরূপ আবিষ্কার করলে এ সত্য স্পষ্ট হবে। স্বজাতিপ্রেমিক সীতারামের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একজন স্বদেশপ্রেমিককেই আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন।

গঙ্গারামের রক্ষাব্যাপারে মুসলমানদের সঙ্গে অযথা বিরোধ সৃষ্টির কোন ইচ্ছা

ছিল না সীতারামের। কিন্তু মুসলমানের দৌরাত্ম্যের হাত থেকে স্বজন ও স্বধর্মরক্ষার জন্য এ জাতীয় বিরোধের প্রয়োজনীয়তাও ছিল। লেখক এ অংশটিতে সীতারামের দূরদর্শিতার বর্ণনা দিয়েছেন,

"সীতারামের এমন ইচ্ছা ছিল যে, যদি বিনা বিবাদে গঙ্গারামের উদ্ধার হয় তবে আর তাহার প্রয়োজন নাই। তবে বিবাদ হয় মন্দ নয়,—মুসলমানের দৌরাত্ম্য বড় বেশী হইয়া উঠিয়াছে, কিছু দমন হওয়া ভাল।" [১ম খণ্ড, নবম পরিচ্ছেদ]

এ অংশে সীতারামের চরিত্রে প্রজাপালনের মহত্ত্ব দেখা যায়—কিন্তু এ জাতীয় আবেগের নাম দেশপ্রেম নয়। সীতারামকে দেশপ্রেমিকরূপে প্রতিষ্ঠিত করার প্রধান বাধা ছিল—ইতিহাসের সত্য। বঙ্কিমচন্দ্র ইতিহাসের সত্য রক্ষা করেছিলেন বলেই সীতারামকে দেশপ্রেমিক বলে প্রতিষ্ঠা দিতে পারেন নি। সীতারাম আত্মরক্ষার্থ সৈন্যসংগ্রহ ও পুরী সংরক্ষিত করেছিলেন,—দেশপ্রেমের মূলে আত্মত্যাগের ব্যঞ্জনাটিই এখানে অনুপস্থিত। সীতারামের চরিত্র আগাগোড়া বিশ্লেষণ করলে এ ধারণা আরও দৃঢ় হবে। স্বীয় শক্তিতে স্বাধীন হিন্দু রাজত্ব স্থাপনের যে আয়োজন সম্পূর্ণ করেছিলেন—সীতারাম, নিছক ব্যক্তিগত ব্যর্থতার ক্ষোভে তিনি নিজেই তা বিনষ্ট করেছিলেন। রূপমোহের পরিণাম ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র এ উপন্যাসে যথেষ্ট ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন,—কিন্তু স্বাধীনতাকামী সীতারামের এই দুর্গতির চিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের দেশাদর্শের ছকে পড়েনি। শিল্পী বঙ্কিমের অসাধারণ প্রতিভা এখানে আদর্শবাদী বঙ্কিমচন্দ্রকে ঢেকে ফেলেছে। সীতারামের অভ্যুদয়ে হিন্দুশক্তির পুনরুজ্জীবনের আশা সীতারামের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই বিলুপ্ত হয়েছে। উপন্যাসের বক্তব্যের সঙ্গে আদর্শবাদের বিচ্ছেদ বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসেও বর্তমান। কিন্তু সর্বশেষ উপন্যাসটিতেই আত্মজাগরণ উন্মুখ জাতির সামনে তিনি একটি মানবচরিত্রের শোচনীয় পরিণাম চিত্র তুলে ধরেছিলেন। ঐ প্রসঙ্গে কোন সমালোচকের বক্তব্য,—

"যদিও 'আনন্দমঠের' উপসংহারে বলা হইয়াছে, বিসর্জ্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই শেষ তিনখানি উপন্যাস তুলনা করিলে মনে হয়, আনন্দমঠ ও দেবীচৌধুরানীতে প্রতিষ্ঠাই আছে, বিসর্জনের চিত্র সীতারামে দেওয়া হইয়াছে।"[২৮]

'সীতারামে' স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় সীতারামের হিন্দুরাজত্ব স্থাপনের বর্ণনা প্রসঙ্গে খানিকটা উচ্ছ্বসিত হয়েছে। মুসলমান বিতাড়ন করে হিন্দুরাজত্ব স্থাপনের প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য সন্দেহ নেই—কিন্তু এ উপন্যাসে স্বল্পক্ষণের জন্যই তা

২৮. অক্ষয়চন্দ্র দত্তগুপ্ত, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৩২৭, পৃঃ—৫৪৫।

সম্ভব হয়েছিল। সে স্বাধীনতাস্পৃহা বিনষ্ট হয়ে গেছে—সীতারামের অমনোযোগিতার ফলে। এ বিষয়টি হিন্দুব্যক্তিত্বের দুর্বলতাকেই সূচিত করছে,—সীতারামকে হিন্দু-শক্তির প্রতীক হিসেবে বর্ণনা করেছেন কিন্তু হিন্দুশক্তির ভিত্তি যে কত দুর্বল তাও প্রমাণ করেছেন বঙ্কিম। সব মিলিয়ে উপন্যাসিক যে নিরপেক্ষ আত্মসমালোচনাই করতে চেয়েছিলেন,—তা সন্দেহাতীত সত্য। বাঙ্গালীর চরিত্রে আবেগ আছে,—শক্তি আছে,—কিন্তু আবেগের মাত্রাধিক্যে দুর্বলতাই প্রকট হয়ে উঠেছে, এ সত্যটি বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছেন। তাই ঐতিহাসিক প্রচেষ্টাকেও সাফল্যের গৌরব অর্পণ করেননি কোথাও। ঊনবিংশ শতাব্দীর নব জাগরণে বাঙ্গালীর চরিত্রশোধনের দায়িত্ব যে কজন সাহিত্যিক গ্রহণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁদের পুরোভাগে ছিলেন। 'বঙ্গদর্শনে' নির্মম সমালোচনার আঘাতে জর্জরিত করেছিলেন বাঙ্গালীকে কারণ সমস্ত সাহিত্যরথীরাই যখন অতীতের ঐতিহ্যের প্রসঙ্গ বর্ণনা করে তার দ্বারাই প্রেরণাসঞ্চারের চেষ্টা করছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র অতীতমুগ্ধতারও সমালোচনা করেছেন। আমাদের অতীত ঐতিহ্য যে নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়, নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ বাঙ্গালীকে এ ব্যাপারে সচেতন করা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশচেতনা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চিত্রটিই কল্পনা করেছে,—পরাধীনতার মর্মজ্বালার অভিজ্ঞতার হাত থেকে মুক্তির বাসনাই ছিলো তাঁর প্রার্থিত বস্তু। কিন্তু সেই ঈপ্সিত স্বাধীনতালাভের যোগ্যতা যে তখনও অর্জিত হয়নি—সে সত্য দূরদর্শী বঙ্কিমচন্দ্র বুঝেছিলেন। জাতির চরিত্রে দুর্বলতার অবসান না ঘটলে শুধু উচ্ছ্বাস বা সাময়িক আবেগে স্বাধীনতার মত মূল্যবান সম্পদ যে আহৃত হতে পারে না সে সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করার দিন এসেছে,—বঙ্কিমচন্দ্র সে কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন। তাই তাঁর উপন্যাসে বাঙ্গালীর অতীত শৌর্যবীর্যের চিত্র আছে বটে কিন্তু দুর্বলতার রন্ধ্রপথে নিষ্ফল হতাশার কথা কোথাও অস্পষ্ট নেই। সীতারামের পতনের চিত্রটি সেই কথাই মনে পড়িয়ে দেয়।

তথাপি সে যুগের রাজশক্তির উদ্যত দম্ভকে অগ্রাহ্য করে একজন স্বাধীনমনা ভূস্বামীর ক্ষণিক জাগরণের বর্ণনা সে যুগের মানুষের কাছে একটি লক্ষ্যণীয় বিষয় বলে পরিগণিত হয়েছিল। সীতারাম জনপ্রিয় নায়ক, এই বিষয় অবলম্বন করেছিলেন বলে বঙ্কিমচন্দ্রের জনপ্রিয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছিলো। বিশেষতঃ 'আনন্দমঠের' মতো স্বদেশপ্রেমসর্বস্ব রচনার পরে স্বাধীন নৃপতি সীতারামের কাহিনী নির্বাচন করে বঙ্কিমচন্দ্র সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

অন্যান্য উপন্যাসের মত 'সীতারাম' উপন্যাসেও বঙ্কিমচন্দ্র আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। হিন্দুমহিমার উচ্ছ্বসিত বর্ণনাপ্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র হিন্দুস্থাপত্যের ঐশ্বর্যের ব্যাখ্যা করেছেন,—তুলনা করেছেন বর্তমানের অধঃপতনের সঙ্গে। আমাদের

নিজস্ব ঐশ্বর্যকে অবহেলা করে অন্যের সম্পদকে বাহবা দিই আমরা,—আত্মবিস্মৃত ও অধঃপতিত বাঙ্গালীর এই প্রবণতাকে ধিক্কার দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মদর্শনের পরিচয় পেয়েছি, সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র 'সীতারাম' উপন্যাসে এভাবেই আত্মসমালোচনা করেছেন শুধু। শ্রীর মুখে এই আলোচনাটি খানিকটা অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়েছে। বর্তমানের বাঙ্গালীর নির্বুদ্ধিতাকে নিন্দা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,—

"হায়, এখন কি না হিন্দুকে ইণ্ডাষ্ট্রিয়ল স্কুলে পুতুল গড়া শিখিতে হয়। কুমারসম্ভব ছাড়িয়া স্বইনবর্ণ পড়ি, গীতা ছাড়িয়া মিল পড়ি, আর উড়িষ্যার প্রস্তর শিল্প ছাড়িয়া সাহেবদের টিনের পুতুল হাঁ করিয়া দেখি। আরও কি কপালে আছে বলিতে পারি না।

…এই সকল স্ত্রীমূর্তি যারা গড়িয়াছে, তারা কি হিন্দু? তখন হিন্দুকে মনে পড়িল। তখন মনে পড়িল, উপনিষদ, গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, কুমারসম্ভব, শকুন্তলা, পাণিনি, কাত্যায়ন, সাংখ্য, পাতঞ্জল, বেদান্ত, বৈশেষিক, এসকলই হিন্দুর কীর্তি-এ পুতুল কোন ছার। তখন মনে করিলাম, হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছি।" [১ম খণ্ড, ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ]

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের এ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দেশকে ভালবাসার প্রবণতা মানুষের সহজাত কিন্তু সে ভালবাসাকে সোচ্চার রবে ঘোষণা করার প্রয়োজন হয় সেই যুগেই যখন জড়ত্ব এসে গ্রাস করে মানুষের স্বাভাবিক ক্ষমতাকে। উনবিংশ শতাব্দীর কবিরা যত ভাবে দেশপ্রেমের কথা বলেছেন প্রাচীন কবিরা কিংবা প্রত্যক্ষ বর্তমানের কবিরা ঠিক সেভাবে বলেন না—বলেননি হয়ত প্রয়োজন ফুরিয়েছিল বা প্রয়োজন নেই বলে। জড়তা থেকে মুক্তির অভিযানে যেদিন সমগ্র বাংলাদেশ ও বাঙ্গালী সংঘবদ্ধ হয়েছিল—নবজাগ্রত সেই অনুভবকে নানা ভাবে প্রকাশের ব্যাকুলতা সে যুগের মানুষের মধ্যেই দেখেছি। রবীন্দ্রনাথ কিংবা সত্যেন্দ্রনাথ কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গজননীর বন্দনায় মেতে উঠেছিলেন—সে প্রয়োজন আজকের কবিরা নতুন করে অনুভব করেন না। বঙ্কিমচন্দ্রের উচ্ছ্বাসের ভাষাটিই একটু হেরফের করলে রবীন্দ্রনাথের "সার্থক জন্ম আমার জন্মেছি এই দেশে"-র আবেগে এসে পৌঁছে যাব আমরা। উপন্যাস লিখতে বসেও পরিবেশ ও ঘটনা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে দেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করাটা বঙ্কিমযুগেরই বৈশিষ্ট্য। সীতারামের রাজ্যধ্বংসের বর্ণনায় স্তব্ধবাক বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীর মুখেই সীতারামের সমালোচনা করেছেন,

"ছি! ছি! মহারাজ! এই জন্য কি হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলে! আমার কাছে হিন্দু সাম্রাজ্য খাটো হইয়া গেল, ধর্ম গেল, আমিই সব হইলাম! এই কি রাজা সীতারাম রায়?" [৩য় খণ্ড, দশম পরিচ্ছেদ]

এ কাহিনীতে ব্যক্তিগত দুর্বলতার অপূর্ব বর্ণনা আছে কিন্তু স্বাধীনতা বিসর্জনের বেদনায় মুহ্যমান বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের অসাফল্যের বিশদ বর্ণনা দেননি। ইতিহাসে প্রতিষ্ঠার বর্ণনা নেই, বঙ্কিমচন্দ্রও সীতারামের বিসর্জনের বিবরণ দিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক ঔপন্যাসিক হিসেবে রমেশচন্দ্র দত্তের রচনায় দেশপ্রেমের যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ দেখা যায়—অন্যত্র তা দুর্লভ। রমেশচন্দ্রের উপন্যাস রচনার মূলে ছিল দেশপ্রেমেরই আন্তরপ্রেরণা, কিন্তু প্রকাশের আকুলতা থাকলেও সহজাত কুণ্ঠাবোধ ও বিনয় তাঁর প্রতিভাকে দমিত করেছিলো। উচ্চশিক্ষিত রমেশচন্দ্র উদার চিন্তাধারা ও উদ্বেলিত দেশপ্রেম লাভ করেছিলেন নিতান্তই আপনামানসিকতার শক্তিতে। দেশসেবাকে পবিত্রতম কর্তব্য হিসেবেই বেছে নিয়েছিলেন রমেশচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের এখানেই গভীর সাদৃশ্য। আত্মপ্রকাশকুণ্ঠ রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রের সস্নেহ প্রেরণায় কত সহজেই যে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন—তার প্রমাণ তাঁর উপন্যাস রচনায় ধরা পড়েছে। ইতিহাসপ্রেমিক রমেশচন্দ্র বঙ্কিমের উপদেশ ও নিজের গভীর দেশানুরাগ সম্বল করেই বাংলা উপন্যাস রচনায় হাত দিয়েছিলেন। বঙ্কিম প্রদর্শিত ধ্রুবপথ অনুসরণ করে ইতিহাসাশ্রিত দেশানুরাগ কাহিনী রচনা করেছিলেন রমেশচন্দ্র। আত্মানুসন্ধানের শ্রেষ্ঠ পথ হিসেবে ইতিহাসের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যে সর্বদাই বিশেষ প্রেরণাসঞ্চারী এ সত্যে বিশ্বাস করতেন উভয় লেখকই। বঙ্কিমচন্দ্রের মত রমেশচন্দ্রও দেশানুরাগের অন্যতম পন্থা অনুসন্ধান না করে ইতিহাসের অতীত পটভূমিকায় কাল্পনিক চরিত্র সৃজন করে দেশকথা ও দেশপ্রেমবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনীর' আদর্শই রমেশচন্দ্রের উপন্যাসের প্রেরণা ছিল—সহজেই তা বোঝা যায়। পাশ্চাত্যশিক্ষা বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মমর্যাদাবোধ ও দেশপ্রেম জাগিয়েছিল, রমেশচন্দ্রও উচ্চশিক্ষা লাভ করে নতুন আলোকে দেশের ভবিষ্যৎ ও বর্তমান নিয়ে গবেষণা করেছেন। উভয়েই বঙ্গমাতার সার্থক সন্তান ;—শিক্ষা, কৌলিন্য ও প্রতিভাকে এঁরা দেশসেবার পবিত্র কর্মে নিয়োগ করেছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টির অন্ধতা মোচনের জন্য আমরণ ব্রত গ্রহণ করেছিলেন,—উপন্যাসে-সমালোচনায়-ব্যঙ্গরচনায় বাঙ্গালীর জড়ত্বনাশের নিখুঁত আয়োজন করেছিলেন তিনি। কিন্তু রমেশচন্দ্রের স্বদেশচর্চার আড়ম্বর ছিল না, শুধু নিভৃত দেশসাধকের মত দেশের প্রতি অগাধ ভালবাসায় তিনি আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। তাই বঙ্কিমের প্রচণ্ড স্বদেশপ্রীতির উন্মাদ আবেগের পাশে রমেশচন্দ্রের দেশসাধনাকে খুব শান্ত ও স্তিমিত বলেই মনে হয়। কিন্তু গভীরতা তাতে বিন্দুমাত্র কম ছিল না। জীবনের নানা কর্মে ও জটিলতার নানা আবর্তে রমেশচন্দ্রের দেশপ্রীতির একটি স্বচ্ছন্দপ্রবাহিত শান্ত-স্নিগ্ধরূপ সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়। বিদেশে

শিক্ষাপ্রাপ্ত, ধনে-মানে-গৌরবে-মর্যাদায় শীর্ষাসনে অবস্থান করেও, রাজকর্মের দায়িত্ব পালন করেও, রমেশচন্দ্র দেশ ও জাতির প্রতি তার কর্তব্য মুহূর্তের জন্যও ভোলেননি। স্বদেশচিন্তা যে মানুষের ধ্যান—রমেশচন্দ্র সেই জাতীয় মানুষ ছিলেন। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে লেখকরূপে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেমিক রমেশচন্দ্রের পরিচয় পেতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না;—উচ্চশিক্ষা ও বিদেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর দেশভক্তিকে আরও গাঢ় করেছিল। রমেশচন্দ্রের সাহিত্যালোচনায় তাঁর অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমের প্রসঙ্গটি সব সমালোচকেরই প্রধান আলোচ্য বিষয়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মন্তব্য করেছিলেন,—

"স্বদেশের সর্ববিধ উন্নতিই ছিল তাঁহার আন্তরিক লক্ষ্য। আমরা যাহাকে Patriotism বা স্বদেশপ্রেম বলি তাহা তাঁহার ভিতরে বিশেষভাবে ছিল, আর তাঁহার ইংরেজী বাঙ্গালা সকল রকম রচনার মধ্যে এই স্বদেশপ্রেম বিধৃত। তাই বলিয়া তিনি সংস্কারকে যুক্তির উপরে কখনও জ্ঞাতসারে স্থান দেন নাই, এককথায় বলিতে গেলে রমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ছিল বাস্তবধর্মী ও যুক্তিনিষ্ঠ।"[২৯]

রমেশচন্দ্রের সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড হিসেবে স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গের স্থান সবার ওপরে। বঙ্কিমপ্রদর্শিত পথে রমেশচন্দ্র উপন্যাসকেই স্বদেশপ্রেম প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। অতীত দৃষ্টান্ত আমাদের ঐতিহ্যবুদ্ধি জাগাতে সমর্থ হবে মনে করেই নবজাগ্রত বাঙ্গালীর সামনে ইতিহাসের কাহিনী পরিবেশনের যে চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন, রমেশচন্দ্র সে পথটিই অনুসরণ করেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বক্তব্য নির্বাচন করে তা প্রমাণের জন্য যেমন অতিব্যস্ত হতেন—রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে তেমনটি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী'তে যে প্রচারকার্য চালিয়ে ছিলেন উপন্যাসের সর্বত্র তা প্রকট হয়ে উঠেছে,—'রাজসিংহের' মত ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাসেও একটি বিশেষ বক্তব্য সব কিছুকে অতিক্রম করে পাঠককে সচেতন করে তুলেছে। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে ঠিক সে জাতীয় কোন উদ্দেশ্যমূলকতা ছিল না। বঙ্কিমপ্রভাবিত হলেও স্বদেশপ্রেম রমেশচন্দ্রের আন্তরিক অনুভব বলে তার প্রকাশভঙ্গিটি অনায়াসলব্ধ। উপন্যাসের বক্তব্যকে তা অতিক্রম করেনি,—পাঠককেও ব্যতিব্যস্ত না করে তা স্বয়মপ্রকাশিত। এতে রমেশচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেমিকতার স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছন্দ স্বরূপটি ধরা পড়েছে। সমালোচকগণ রমেশচন্দ্রের এই বিনম্র স্বদেশচিন্তার রূপটি আবিষ্কার করেছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তার পার্থক্যটিও স্পষ্ট করেছেন। অবশ্য উপন্যাসশিল্পী হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের তুলনা না

২৯. যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত রমেশ রচনাবলীর ভূমিকা, সাহিত্য সংসদ কলিকাতা, ১৯৬০।

করে স্বদেশপ্রেমিক হিসেবে বিচার করার সময়ই এ সত্য ধরা পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তার মৌলিকতা রমেশচন্দ্রে আশা করা যায় না,—কিন্তু দেশসাধনাকে উভয়েই জীবনব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বলেই উভয় শিল্পীর সাধর্ম্য ও পার্থক্য আলোচনায় এসে যায়। এ প্রসঙ্গে শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন,

"বঙ্কিম ছিলেন কোন কোন বিষয়ে সংস্কার বিমুখ এবং তাঁহার স্বদেশপ্রীতির মধ্যে উপদেষ্টার ভাব ছিল। রমেশচন্দ্র সংস্কারবিমুখ ছিলেন না, তাঁহার মনোবৃত্তি ছিল শুশ্রূষুর।··স্বদেশপ্রীতি এবং স্বাজাত্য গর্ব রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া অধিকতর অকৃত্রিম ও অনাড়ম্বর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।"৩০

উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের দেশপ্রেমের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ রয়েছে কিন্তু পরবর্তী জীবনে সক্রিয় ভাবে তিনি দেশসেবার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে যার প্রথম পরিচয় স্বদেশপ্রেমিকরূপে, জীবনের ক্ষেত্রেও তিনি সেই পরিচয়টিই উজ্জ্বল করেছিলেন। দেশপ্রেম তার সব কাজেই প্রেরণা সঞ্চার করেছে। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিমাপ করতে গিয়ে হয়ত শৈল্পিকতার মাপকাঠিতে তাঁকে কিছুমাত্র নতুন গৌরব আমরা দিতে পারব না,—কিন্তু সে যুগের দেশপ্রেমী স্রষ্টা হিসেবে তাঁর বিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়বেই।

রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতার' রচনা কাল ১৮৭৪ সাল। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সুদীর্ঘ ন'বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাংলার সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বলতম স্রষ্টা রূপে বিরাজমান,—রমেশচন্দ্রের আবির্ভাব সে যুগেই। সুতরাং বঙ্কিমপ্রতিভার পক্ষচ্ছায়ায় রমেশচন্দ্রের প্রতিভাকে খুব গতানুগতিক মনে হওয়াটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে কেউই সে যুগে বঙ্কিমপ্রতিভাকে অতিক্রম করতে পারেন নি,—রমেশচন্দ্রও নয়। তাঁর প্রথম উপন্যাসের পরিকল্পনাতেও আমরা কোন অভিনবত্ব বা বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই না। অতীত কালের যে সময়ের ইতিহাস তিনি অবলম্বন করেছিলেন—তা 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসেও পেয়েছি। হিন্দুশক্তির অবসানের অব্যবহিত পরে পাঠান ও মোঘলশক্তির সংঘর্ষের পটভূমিকায় বাংলা দেশে মোঘলশক্তির প্রতিষ্ঠার কাহিনী এতে স্থান পেয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনীতে' মানসিংহের বঙ্গদেশ অভিযানের কাহিনী এবং 'বঙ্গবিজেতায়' রাজা টোডরমল্ল বাংলার জমিদারদের সহায়তায় কিভাবে পাঠান উপদ্রুত বাঙ্গালায় শান্তি স্থাপন করলেন—সেই কাহিনীই স্থান পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বাঙ্গালী জমিদার বীরেন্দ্রসিংহের বীরত্ব কাহিনী শুনিয়েছেন,—

৩০. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস। ২য় খণ্ড। বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬২, পৃঃ—২১৩।

শিক্ষাপ্রাপ্ত, ধনে-মানে-গৌরবে-মর্যাদায় শীর্ষাসনে অবস্থান করেও, রাজকর্মের দায়িত্ব পালন করেও, রমেশচন্দ্র দেশ ও জাতির প্রতি তার কর্তব্য মুহূর্তের জন্যও ভোলেননি। স্বদেশচিন্তা যে মানুষের ধ্যান—রমেশচন্দ্র সেই জাতীয় মানুষ ছিলেন। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে লেখকরূপে আত্মপ্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশপ্রেমিক রমেশচন্দ্রের পরিচয় পেতে আমাদের কোনো অসুবিধে হয় না ;—উচ্চশিক্ষা ও বিদেশভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর দেশভক্তিকে আরও গাঢ় করেছিল। রমেশচন্দ্রের সাহিত্যালোচনায় তাঁর অকৃত্রিম স্বদেশপ্রেমের প্রসঙ্গটি সব সমালোচকেরই প্রধান আলোচ্য বিষয়। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল মন্তব্য করেছিলেন,—

"স্বদেশের সর্ববিধ উন্নতিই ছিল তাঁহার আন্তরিক লক্ষ্য। আমরা যাহাকে **Patriotism** বা স্বদেশপ্রেম বলি তাহা তাঁহার ভিতরে বিশেষভাবে ছিল, আর তাঁহার ইংরেজী বাঙ্গালা সকল রকম রচনার মধ্যে এই স্বদেশপ্রেম বিধৃত। তাই বলিয়া তিনি সংস্কারকে যুক্তির উপরে কখনও জ্ঞাতসারে স্থান দেন নাই, এককথায় বলিতে গেলে রমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম ছিল বাস্তবধর্মী ও যুক্তিনিষ্ঠ।"[২৯]

রমেশচন্দ্রের সাহিত্য বিচারের মানদণ্ড হিসেবে স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গের স্থান সবার ওপরে। বঙ্কিমপ্রদর্শিত পথে রমেশচন্দ্র উপন্যাসকেই স্বদেশপ্রেম প্রচারের উপযুক্ত ক্ষেত্র হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। অতীত দৃষ্টান্ত আমাদের ঐতিহ্যবুদ্ধি জাগাতে সমর্থ হবে মনে করেই নবজাগ্রত বাঙ্গালীর সামনে ইতিহাসের কাহিনী পরিবেশনের যে চেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন, রমেশচন্দ্র সে পথটিই অনুসরণ করেছেন। তবে বঙ্কিমচন্দ্র একটি বক্তব্য নির্বাচন করে তা প্রমাণের জন্য যেমন অতিব্যস্ত হতেন—রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে তেমনটি নেই। বঙ্কিমচন্দ্র 'মৃণালিনী'তে যে প্রচারকার্য চালিয়েছিলেন উপন্যাসের সর্বত্র তা প্রকট হয়ে উঠেছে,—'রাজসিংহের' মত ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাসেও একটি বিশেষ বক্তব্য সব কিছুকে অতিক্রম করে পাঠককে সচেতন করে তুলেছে। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে ঠিক সে জাতীয় কোন উদ্দেশ্যমূলকতা ছিল না। বঙ্কিমপ্রভাবিত হলেও স্বদেশপ্রেম রমেশচন্দ্রের আন্তরিক অনুভব বলে তার প্রকাশভঙ্গিটি অনায়াসলব্ধ। উপন্যাসের বক্তব্যকে তা অতিক্রম করেনি,—পাঠককেও ব্যতিব্যস্ত না করে তা স্বয়মপ্রকাশিত। এতে রমেশচন্দ্রের স্বদেশ-প্রেমিকতার স্নিগ্ধ ও স্বচ্ছন্দ স্বরূপটি ধরা পড়েছে। সমালোচকগণ রমেশচন্দ্রের এই বিনম্র স্বদেশচিন্তার রূপটি আবিষ্কার করেছেন এবং বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তার পার্থক্যটিও স্পষ্ট করেছেন। অবশ্য উপন্যাসশিল্পী হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রমেশচন্দ্রের তুলনা না

২৯. যোগেশচন্দ্র বাগল সম্পাদিত রমেশ রচনাবলীর ভূমিকা, সাহিত্য-সংসদ কলিকাতা, ১৯৬০।

করে স্বদেশপ্রেমিক হিসেবে বিচার করার সময়ই এ সত্য ধরা পড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পীসত্তার মৌলিকতা রমেশচন্দ্রে আশা করা যায় না,—কিন্তু দেশসাধনাকে উভয়েই জীবনব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন বলেই উভয় শিল্পীর সাধর্ম ও পার্থক্য আলোচনায় এসে যায়। এ প্রসঙ্গে শ্রীসুকুমার সেন বলেছেন,

"বঙ্কিম ছিলেন কোন কোন বিষয়ে সংস্কার বিমুখ এবং তাঁহার স্বদেশপ্রীতির মধ্যে উপদেষ্টার ভাব ছিল। রমেশচন্দ্র সংস্কারবিমুখ ছিলেন না, তাঁহার মনোবৃত্তি ছিল শুশ্রূষুর।... স্বদেশপ্রীতি এবং স্বাজাত্য গর্ব রমেশচন্দ্রের উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়া অধিকতর অকৃত্রিম ও অনাড়ম্বর ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।"[৩০]

উপন্যাসে রমেশচন্দ্রের দেশপ্রেমের স্বচ্ছন্দ প্রকাশ রয়েছে কিন্তু পরবর্তী জীবনে সক্রিয় ভাবে তিনি দেশসেবার ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। সাহিত্য ক্ষেত্রে যার প্রথম পরিচয় স্বদেশপ্রেমিকরূপে, জীবনের ক্ষেত্রেও তিনি সেই পরিচয়টিই উজ্জ্বল করেছিলেন। দেশপ্রেম তার সব কাজেই প্রেরণা সঞ্চার করেছে। ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্রের কৃতিত্বের পরিমাপ করতে গিয়ে হয়ত শৈল্পিকতার মাপকাঠিতে তাঁকে কিছুমাত্র নতুন গৌরব আমরা দিতে পারব না,—কিন্তু সে যুগের দেশপ্রেমী স্রষ্টা হিসেবে তাঁর বিশেষত্ব আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়বেই।

রমেশচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'বঙ্গবিজেতার' রচনা কাল ১৮৭৪ সাল। 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সুদীর্ঘ ন'বছর পরে বঙ্কিমচন্দ্র যখন বাংলার সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বলতম স্রষ্টা রূপে বিরাজমান,—রমেশচন্দ্রের আবির্ভাব সে যুগেই। সুতরাং বঙ্কিমপ্রতিভার পক্ষচ্ছায়ায় রমেশচন্দ্রের প্রতিভাকে খুব গতানুগতিক মনে হওয়াটা কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে কেউই সে যুগে বঙ্কিমপ্রতিভাকে অতিক্রম করতে পারেন নি,—রমেশচন্দ্রও নয়। তাঁর প্রথম উপন্যাসের পরিকল্পনাতেও আমরা কোন অভিনবত্ব বা বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই না। অতীত কালের যে সময়ের ইতিহাস তিনি অবলম্বন করেছিলেন—তা 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসেও পেয়েছি। হিন্দুশক্তির অবসানের অব্যবহিত পরে পাঠান ও মোঘলশক্তির সংঘর্ষের পটভূমিকায় বাংলা দেশে মোঘলশক্তির প্রতিষ্ঠার কাহিনী এতে স্থান পেয়েছে। 'দুর্গেশনন্দিনীতে' মানসিংহের বঙ্গদেশ অভিযানের কাহিনী এবং 'বঙ্গবিজেতায়' রাজা টোডরমল্ল বাংলার জমিদারদের সহায়তায় কিভাবে পাঠান উপদ্রুত বাঙ্গালায় শান্তি স্থাপন করলেন—সেই কাহিনীই স্থান পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী'তে বাঙ্গালী জমিদার বীরেন্দ্রসিংহের বীরত্ব কাহিনী শুনিয়েছেন,—

---

৩০. সুকুমার সেন, বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস। ২য় খণ্ড। বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা, ১৩৬২, পৃঃ—২১৭।

রমেশচন্দ্রও বাঙ্গালী বীরের চরিত্র কল্পনা করেছেন, সমরসিংহের বীরত্ব গাথা প্রচার করেছেন। আত্মকলহে ও অনৈক্যে লিপ্ত বাঙ্গালী ভূস্বামীদের শক্তি ও বীরত্বের কথাই শোনাতে চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক। সমরসিংহ মৃত্যুদণ্ড বরণ করেছিলেন কিন্তু তার ব্যক্তিত্বময়ী বিধবা পত্নী স্বামীহত্যার প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর। পাঠান ও মোঘলের যুদ্ধ-কাহিনীর অন্তরালে এই কাহিনীটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে উপন্যাসে।

সমরসিংহের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্যই সুরেন্দ্রনাথ শক্তিসঞ্চয় করতে চেয়েছিলেন। টোডরমল্লের সৈন্যদলে যোগ দিয়ে সুরেন্দ্রনাথ পাঠানদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছিলেন। পাঠান সেনাপতি মাসুমী ইন্দ্রনাথের [সুরেন্দ্রনাথ] মোঘলপ্রীতিকে ব্যঙ্গ করেছিলেন। পরাধীন বাঙ্গালীর নিশ্চেষ্টতার নিন্দা করেছে মাসুমী,—"হিন্দু ! তোমরা বিধির নির্বন্ধের উপর প্রত্যয় করিয়া নিশ্চেষ্ট হইয়া থাক, সাহসী পাঠানেরা জীবন থাকিতে নিশ্চেষ্ট হইবে না, অধীনতা স্বীকার করিবে না। পাঠান গৌরবসূর্য্য এখনও অস্ত যায় নাই।"[৩১]

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্রের নিরপেক্ষ সত্যপ্রকাশের প্রবণতা এখানে ধরা পড়েছে। পরাধীন বাঙ্গালী সত্যিকারের স্বাধীনতার স্বাদ কোনদিনই পায়নি শুধু হস্তান্তরিত হয়েছে একাধিক শাসকগোষ্ঠীর হাতে। স্বাধীনচেতা পাঠানের সঙ্গে পরাধীন বাঙ্গালীদের পার্থক্য এখানেই। স্বাধীনতাকে জীবন দিয়েও রক্ষা করতে জানে পাঠান কিন্তু বাঙ্গালী পাঠানের বিরোধিতা করেছে মোঘলের অধীনতাপাশ নতুন করে বরণ করার জন্য। পাঠান শক্তির সঙ্গে মোঘলের বিবাদের ঘটনাস্থল বাংলা দেশ কিন্তু বাঙ্গালীরা শুধুমাত্র দর্শকের ভূমিকায় অংশগ্রহণ করেছে। ইন্দ্রনাথের মত যারা সক্রিয় হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে মাসুমী বলেছে,—

"তুমি বঙ্গদেশের প্রাচীন রাজবংশকে আর কখনও বিদ্রোহী বলিও না। যাঁহারা ক্রমান্বয়ে চারিশত বৎসর এই রাজত্ব করিয়াছেন, বখ্‌তীয়ার খিলিজীর সময় হইতে যে পাঠানেরা একাধীশ্বর হইয়া হিন্দুদিগকে শাসন করিয়াছেন, তোমার পিতা, তোমার পিতামহ, তোমার প্রপিতামহ যে রাজবংশের অধীনে বাস করিয়াছেন, সেই পাঠান বিদ্রোহী, না অদ্য যে অন্যায়াচারী দিল্লীর অধীশ্বর চাতুরী ও প্রতারণার দ্বারা আমাদের পুরাতন সাম্রাজ্য লইতে চাহে, সে বিদ্রোহী ?

[রমেশ রচনাসম্ভার, পৃঃ ২৫৫]

স্বাধীনচেতা পাঠানের কাছে উনবিংশ শতাব্দীর জাগ্রত বাঙ্গালী স্বদেশপ্রেমের

৩১. প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, রমেশ রচনাসম্ভার। ১৯৫৮।

দীক্ষা নিতে পারে। যে চেতনা মাহ্‌মীকে আত্মবিসর্জনের প্রেরণা দেয়, পাঠান-শক্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠায় শক্তিসঞ্চার করে,—সেটিই স্বদেশপ্রেমের অবিমিশ্র অনুভূতি। রমেশচন্দ্র নিরপেক্ষভাবে হিন্দুশক্তির সমালোচনা ও পাঠানের স্বাধীনতাপ্রিয়তার উল্লেখ করেছেন। আত্মকলহে লিপ্ত হিন্দু জমিদারদের কীর্তিকলাপ উপন্যাসে বেশ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করেছেন ঔপন্যাসিক। সমরসিংহের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের পটভূমিকায় অনৈক্যের প্রসঙ্গটি খুব স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। Stewart-এর 'History of Bengal'-অনুসরণ করে রমেশচন্দ্র টোডরমল্লের কাহিনীটিকে ইতিহাসের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র এ জাতীয় কাহিনীর মধ্যেও হিন্দুগৌরব অনুসন্ধান করেছেন। রমেশচন্দ্র পাঠানের চরিত্রেই স্বদেশপ্রেম লক্ষ্য করেছিলেন। প্রথম উপন্যাসে ঔপন্যাসিকের আড়ষ্টতা সর্বত্র প্রকট হলেও ঐতিহাসিকতা ও নিরপেক্ষ স্বদেশপ্রেমের উজ্জ্বলতা 'বঙ্গবিজেতায়' আছে।

রমেশচন্দ্রের দ্বিতীয় উপন্যাস 'মাধবীকঙ্কণে'ও বাংলাদেশের ঐতিহাসিক পটভূমিকা স্থান পেয়েছে। এ কাহিনীর নায়ক নরেন্দ্রনাথ বঙ্গসন্তান হলেও ঘটনাচক্রে মোঘলসম্রাট শাজাহানের রাজত্বকালের জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করেছে। বঙ্গদেশ থেকে বহুদূরে দিল্লী ও মেবারের পটভূমিকায় তাঁকে আবিষ্কার করি আমরা। এই পরিবেশেই কিন্তু মেবারের শৌর্য ও বীর্যের ইতিহাস প্রসঙ্গ এসে পড়ে, ঔপন্যাসিকও স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস বর্ণনা করতে বসেন। এ উপন্যাস রচনাকালে লেখকের সমস্ত অন্তর স্বদেশপ্রেমে ভরপূর ছিল। গ্রন্থটির উৎসর্গ পত্রটি সে যুগের বিখ্যাত স্বদেশসেবী সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের নামে নিবেদন করেছেন তিনি,

"তুমি যে ব্রতধারণ করিয়াছ, তাহা অপেক্ষা মহত্তর ব্রত জগতে আর নাই। সেই মহৎকার্যে সফল হও, এই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষার সহিত এই সামান্য পুস্তকখানি তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম।"

এই অংশটি থেকেই সাহিত্যিক রমেশচন্দ্রের মানসিকতার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। দেশপ্রেমকে জগতের মহত্তর ব্রত বলে মনে করেছিলেন তিনি। উপন্যাসেও এই মহান ব্রত পালনের নির্দেশ দিয়েছেন নানাভাবে।

ভাগ্যতাড়িত নায়ক নরেন্দ্র গৃহত্যাগ করে রাজনৈতিক জটিলতায় জড়িয়ে পড়লেন,—দিল্লীতে তাঁকে আবিষ্কার করি আমরা। দিল্লীতে দুর্গ প্রবেশের পথে দুটি মূর্তি দেখে বিস্মিত হয়ে নরেন্দ্র মূর্তিদুটির পরিচয় জানতে চেয়েছিলেন। উত্তর শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন তিনি,—স্বদেশপ্রাণ রমেশচন্দ্র রাজপুত শৌর্যবীর্যের পরিচয় দিতে গিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। গজপতি মূর্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে পরোক্ষভাবে স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছে,—"কিন্তু রাজপুত রাজাদিগের কীর্তি চিরস্মরণীয় করিবার জন্য

প্রতিমূর্তির আবশ্যক নাই, যতদিন বীরত্বের গৌরব থাকিবে, রাজপুত নাম কেহ বিস্মৃত হইবে না। রাজপুতানার প্রত্যেক পর্বত শেখরে রাজপুতের বীরনাম খোদিত আছে, ভারতবর্ষের প্রত্যেক বেগবতী নদীতরঙ্গে রাজপুতের বীরনাম শব্দিত হইতেছে।"

[পৃঃ ৩৯, রমেশ রচনাসম্ভার]

জয়মল্ল ও পুত্তের মূর্তির ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে গজপতি রাজপুতের স্বদেশপ্রেমের প্রশংসায় আত্মহারা হয়েছে,—এই অভিব্যক্তিতে রমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রাণতাই স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করি আমরা। মেবারের অতীত কীর্তিকাহিনীর বর্ণনায় রমেশচন্দ্র তাঁর আবেগ দমন করতে পারেননি। স্বদেশপ্রেমের এমন জলন্ত দৃষ্টান্ত ভারতের ইতিহাসে অন্যত্র সুলভ নয়,—তাই ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রেমী সাহিত্য-স্রষ্টাদের লুব্ধদৃষ্টি রাজস্থানের কাহিনীতে নিবদ্ধ। এ উপন্যাসে মেবারপ্রসঙ্গ মুখ্য ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নয়। কিন্তু গৌণ প্রসঙ্গের বর্ণনায় লেখক মাত্রাতিরিক্ত আবেগ প্রকাশ করেছেন—সহজেই তা চোখে পড়ে। প্রতাপসিংহের বীরত্ব এবং মানসিংহের ভীরুতা ও কাপুরুষতাকে তীব্রভাষায় ধিক্কার দিয়েছেন ঔপন্যাসিক। এ উপন্যাসেও মেবারের অতীত মহিমার বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন চারণ—যাঁর ব্রতই হচ্ছে অতীত কাহিনী বর্ণনা করে বর্তমানকে উৎসাহিত করা। প্রতাপের দেশপ্রেমের মহিমা কীর্তন করেছে চারণ,

"রাজপুতগণ, প্রতাপের জয়গীত গাও, সমগ্র রাজস্থানে এই গীত শব্দিত হইতে থাকুক···হিমালয় অতিক্রম করিয়া সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত হউক, আর যদি স্বর্গে সাহস ও স্বদেশানুরাগের গৌরব থাকে সে গীত আকাশপথে উত্থিত হইয়া স্বর্গের দ্বারে সজোরে আঘাত করিয়া মানবের যশঃ-কীর্তি বিস্তার করুক।" [পৃঃ ৫২-৫৪, ঐ]

এই উদ্দীপনাময়ী ভাষায় রমেশচন্দ্র স্বদেশপ্রেমের আবেগ সঞ্চার করেছিলেন। এই আবেগ সেযুগের আত্মজাগরণোন্মুখ বাঙ্গালীকে উৎসাহ দিক, এই বাসনাটি কোথাও অস্পষ্ট হয়ে নেই। উপন্যাসের নায়ক নরেন্দ্রনাথ দেশপ্রেমের মহিমায় মুগ্ধ হয়ে দেশের কথা চিন্তা করতে শিখেছে। স্বদেশভাবনা পীড়িত নরেন্দ্রনাথ চিন্তা করেন,

"স্বদেশেও মহাবল পরাক্রান্ত রাজারা আছেন, তাঁহারা কি করিতেছেন, সুন্দর বঙ্গদেশের এ দুর্দশা কেন? আজি ছয়শত বৎসর অবধি পরাক্রান্ত মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া রাজপুতেরা স্বীয় স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছে, বঙ্গদেশে মুসলমান পদার্পণ না করিতে করিতে হিন্দুরাজ্যের নাম লুপ্ত হইল।···আর বঙ্গদেশ! বেগপ্রবাহিনী গঙ্গানদী গৌরবগীত গায় না, ব্রহ্মপুত্র স্বাধীনতার গীত গায় না, রাজা-প্রজা সকলেই অধীনতা নিদ্রায় সুপ্ত, বড় সুখে নিদ্রা যাইতেছে। জগতে তাহাদিগের নাম নাই, অথবা তাহাদিগের নাম কেবল ঘৃণার পদার্থ।" [পৃঃ ৫৪ ঐ]

এই অংশটিতে রমেশচন্দ্রের স্বচ্ছ বিচারশক্তির পরিচয় আছে। অতীত ইতিহাসে

স্বদেশভাবনা বাঙ্গালীকে কোনদিনই উৎসাহিত করেনি, রাজপুত ইতিহাসের সঙ্গে তুলনা করলেই সে সত্য স্পষ্ট হয়। যা আমাদের জাতীয় চরিত্রে ছিল না সেই অনুভবকে বর্ণনা করে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চাননি রমেশচন্দ্র, শুধু সত্য বর্ণনা করেছেন। অবশ্য নায়ক নরেন্দ্রনাথ এই ইতিহাস পর্যালোচনা করে মর্মাহত হয়েছিল, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়েছিল মাতৃভূমি উদ্ধারের সংকল্পে। রমেশচন্দ্র স্পষ্টভাবে আমাদের অতীত ইতিহাসের কলঙ্কজনক তথ্য পরিবেশন করেছিলেন বটে কিন্তু সে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি তাঁর কাম্য ছিল না। ইতিহাসের উজ্জ্বল ঐতিহ্য যেমন আমাদের প্রেরণা সঞ্চার করতে সক্ষম—তেমনি আমাদের দুর্বলতার অবস্থাটি ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করেও প্রেরণা পাই আমরা। নবশক্তির উত্থান আমাদের পূর্ব কলঙ্ক স্খালন করুক, এ ছিল নায়ক নরেন্দ্রনাথের স্বপ্ন, পক্ষান্তরে রমেশচন্দ্রেরও। তাই ইতিহাসের সত্যকেও অকপটে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন রমেশচন্দ্র, তাকে ফেনায়িত করেননি।

নায়ক নরেন্দ্রনাথের জীবনে প্রেমের দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়েছে যখন বাল্যের প্রেম সাময়িকভাবে অস্পষ্ট হয়ে এসেছিল এবং যবনীর মোহ তাঁকে বিচলিত করেছিল। কিন্তু স্বদেশপ্রেমের আদর্শই তাঁকে পথ দেখিয়েছিল,—ব্যক্তিগত প্রেমবাসনার সঙ্গে দেশসাধনার দ্বন্দ্ব এই অংশটিতে মুখ্য হয়ে উঠেছে। প্রবাসী নরেন্দ্রনাথকে দেশের-কল্যাণে আত্মনিয়োগ করতে উপদেশ দিয়েছিলেন শৈলেশ্বর,—

"শুনিয়াছি তোমার বঙ্গদেশ বীরশূন্য, যশঃশূন্য। যাও নরেন্দ্রনাথ! সেই দূর বঙ্গদেশে যশঃস্তম্ভ স্থাপন কর, যাও, স্বদেশের গৌরব সাধন কর, সিংহবীর্য্য ধরিয়া আপনকীর্তি স্থাপন কর। এ মহৎ উদ্দেশ্যে তোমার জীবন সমর্পণ কর।"

পরোক্ষভাবে এ উপদেশটি ঔপন্যাসিকেরও। দেশসেবার মহৎ আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার সুযোগ এসেছিল উনবিংশ শতাব্দীতেও, স্বদেশপ্রেমী ঔপন্যাসিক সেই প্রস্তুতির লগ্নে উৎসাহবাণী শোনাতে এসেছিলেন।

মুসলমান যবনীর মোহ থেকে আত্মরক্ষার তাগিদে দেশপ্রেমই পথ দেখিয়েছে নরেন্দ্রনাথকে। ব্যক্তিগত প্রেমদ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে বিরাজিত এই দেশভাবনাই শেষ পর্যন্ত পথভ্রান্ত নরেন্দ্রনাথকে রক্ষা করেছে। নরেন্দ্রনাথ ব্যক্তিচিন্তাকে প্রাধান্য দিয়েছিলেন বলে তীব্রভাবে ভর্ৎসিত হয়েছিলেন,—

"দেশের হিতসাধনের জন্য আসিয়াছ? কোন্ বীরব্রতে ব্রতী হইয়া আসিয়াছ? কোন্ দেবোচিত মহদুদ্দেশ্য সাধনার্থ আসিয়াছ? ধিক্ নরেন্দ্র! তোমার ন্যায় বীরপুরুষ একটি বালিকার মুখ দেখিবার জন্য জীবনের মহৎ উদ্দেশ্যে ভুলিয়া থাকে?

হেমচন্দ্র মৃণালিনীপ্রেমে কর্তব্য বিস্মৃত হয়েছিলেন, মাধবাচার্য এমনি করেই

হেমচন্দ্রের চৈতন্য সম্পাদন করেছিলেন। দেশপ্রেম যে ব্যক্তিস্বার্থের চেয়েও অনেক মূল্যবান ভাবনা, একথাটিই সে যুগের লেখকগোষ্ঠী প্রমাণের চেষ্টা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত রমেশচন্দ্রও দেশপ্রেমকে সবচেয়ে পবিত্র ভাবনা বলে মনে করতেন,— উপন্যাসেও সেকথা প্রচার করেছেন।

নরেন্দ্রনাথের চৈতন্য সম্পাদিত হয়েছিল,—যবনীমোহমুক্ত নরেন্দ্রনাথ যেভাবে আত্মবিশ্লেষণ করেছিলেন তাতেও স্বদেশচিন্তা প্রাধান্য পেয়েছে,—দেশের উন্নতি! জাতির উন্নতি! মুসলমান হইয়া খ্যাতিলাভ করিলে মুসলমান রাজ্যের মুসলমান সমাজের গৌরববৃদ্ধি হইবে, দেশের, স্বজাতির কি হইল?

নরেন্দ্রনাথও কল্পিত চরিত্র,—ইতিহাসের যে অধ্যায়ে বঙ্গদেশে স্বাধীনতার কোন চিন্তাই জন্ম নেয়নি, রমেশচন্দ্র সেই অধ্যায়ে একটি কল্পিত দেশপ্রেমিক চরিত্র সৃজন করেছিলেন শুধু দেশপ্রেম প্রচারের উদ্দেশ্যেই। এ ছাড়া উপরোক্ত চরিত্রকে অন্য কোন উপায়ে ব্যাখ্যা করা চলে না। ঐতিহাসিক উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনাই স্থান পাবে—কিন্তু যে উপন্যাসে ঔপন্যাসিক স্পষ্টতঃই দেশপ্রেমের ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে বসেন—কিংবা দেশপ্রেমকে মহত্তম কর্তব্য বলে প্রমাণ করতে চান তখন ঔপন্যাসিকের উদ্দেশ্যটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণলগ্নে এ জাতীয় উপন্যাসের প্রয়োজনীয়তাও ছিল। স্বদেশপ্রেমী লেখকরা দেশকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়ে কিছু চিন্তা করতে পারতেন না,- এ জাতীয় ইতিহাস-সম্পৃক্ত রচনাগুলো পাঠ করতে করতে এ ধারণাটিই বদ্ধমূল হয় পাঠকের মনে।

রমেশচন্দ্র এ উপন্যাসে রাজপুত জাতির শৌর্যবীর্যের ইতিহাস আলোচনা করতে গিয়ে ভাববিহ্বল হয়ে পড়েছিলেন। রাজপুতের স্বদেশপ্রেম বাঙ্গালীর চরিত্রে ছিল না বলে উদ্গত দুঃখ তিনি গোপন করতে পারেননি। স্বাধীন রাজপুত জাতির গৌরবকাহিনী স্বাধীনতাপ্রিয় লেখকের অন্তরে যে বিশেষ ভাবান্দোলন সৃজন করেছিল,- তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। যশোবন্ত সিংহও এ উপন্যাসের লক্ষ্যণীয় চরিত্র, মোঘলের বিরুদ্ধে তার দৃপ্ত অভিযানের বর্ণনাও এ উপন্যাসে উচ্ছ্বাসের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে। রাজপুত জাতির হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টাকে রমেশচন্দ্র বর্ণনা করেছেন। কিন্তু পরাধীন বঙ্গভূমির ইতিহাসের স্তব্ধ মুহূর্তগুলো সেই অবস্থার তুলনায় যে কত নিষ্প্রভ সে কথা বলতে গিয়েও ব্যথিত হয়েছেন রমেশচন্দ্র।

'মাধবীকঙ্কণের' কাহিনীতে বিদেশী গল্পের ছায়া আবিষ্কার করেছেন কোন সমালোচক,—কিন্তু এ উপন্যাসের কাহিনীগত সৌন্দর্য ইতিহাসের অসংলগ্ন পটভূমিকার বিস্তৃত বিবরণের চাপে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে মনে হয়। শেষাংশে

কোনোমতে কাহিনীটির সমাপ্তি টানতে চেয়েছিলেন ঔপন্যাসিক। মূলতঃ দেশানুরাগ ও স্বাধীনতালাভের বাসনায় উদ্বেল লেখক নিছক একটি গল্প পরিবেশন করতেই চাননি. এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব এ উপন্যাসে অধিকতর স্পষ্টভাবে অনুভব করি। বঙ্গদেশের নায়ককে রমেশচন্দ্র এমন একটি পরিবেশের মধ্যে স্থাপন করেছেন—যেখানে দেশপ্রেমের প্রসঙ্গটি অনায়াসে বর্ণনা করা যাবে। এতে কাহিনীর দিক থেকে কিছু বৈচিত্র্য হয়ত সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু ঔপন্যাসিকের বক্তব্য প্রকাশের সুবিধে হয়েছে অনেক বেশী। এ জাতীয় উপন্যাসকেই হয়ত উদ্দেশ্যমূলক উপন্যাস বলা সঙ্গত। কাহিনীগত বৈচিত্র্যের মাধ্যমে পাত্রপাত্রীর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও হৃদয়গত রহস্যের গ্রন্থিমোচন যদি সার্থক ঔপন্যাসিকের বাসনা হয়—এ জাতীয় উপন্যাসে সেটিই পরোক্ষ বিষয়। ঔপন্যাসিকের দেশপ্রেমচিন্তার বিস্তৃত বিবরণের সঙ্গে পাত্রপাত্রীকে কোনমতে মিলিয়ে দেওয়ার চেষ্টাটাই প্রকট। একে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলার যুক্তি যেমন নেই,—নিছক উপন্যাস হিসেবেও ব্যাখ্যা করা যায় না,—দেশপ্রেমিক লেখকের ভাবনাই এ জাতীয় উপন্যাসের মূল অবলম্বন।

'মাধবীকঙ্কণে' রাজপুত ইতিহাসের প্রাসঙ্গিক বর্ণনায় লেখকের গভীর অনুরাগ লক্ষ্য করেছি,—চিতোরের বীর প্রতাপসিংহের জীবনকাহিনী গল্পচ্ছলে বর্ণনায় লোভ সংবরণ করতে পারেননি লেখক। পরবর্তী উপন্যাসেও রাজপুত ইতিহাস অবলম্বন করেছিলেন রমেশচন্দ্র। বর্ণনার গাম্ভীর্যে আবেগের অতিশায়নে এ অধ্যায়টি রমেশচন্দ্রের রচনাশক্তির উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলে গণ্য হতে পারে। যশোবন্তসিংহের পরাজয়ে লজ্জা ও ঘৃণায় যোধপুরের রাজ্ঞী দীর্ঘ বিলাপে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন,—

"তিনি ক্ষত্রিয় নহেন, তিনি আমার স্বামী নহেন. এ নয়ন যশোবন্তসিংহকে আর দেখিবে না। আমি মেওয়ারের রানার দুহিতা, প্রতাপসিংহের কুলে যে বিবাহ করিবে সে ভীরু কাপুরুষ কেন হইবে? যুদ্ধে জয় করিতে পারিলেন না, কেন সম্মুখরণে হত হইলেন না?"

স্বাধীনচেতনাই কোনো চরিত্রকে এই দৃপ্তব্যক্তিত্ব দান করতে পারে।—রাজস্থানের ইতিহাসেই এমন উজ্জ্বল নারী চরিত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছি আমরা। রমেশচন্দ্রের মত স্বদেশপ্রেমী লেখক যে রাজস্থান-ইতিহাসের বর্ণনা দিতে গিয়ে আবেগাকুল হবেন—এটাই স্বাভাবিক। যশোবন্তসিংহের পরাজয় বৃত্তান্তও এ উপন্যাসের ঘটনা হয়ে উঠেছে—সে শুধু স্বদেশপ্রেমের বর্ণনা দেবার অতি আগ্রহ লেখককে উৎসাহিত করেছিলো বলেই। 'মাধবীকঙ্কণেই' স্বদেশপ্রেমিক রমেশচন্দ্রের প্রবণতার প্রকৃত রূপ আবিষ্কার করি আমরা। এর পরেই দু'খানি ঐতিহাসিক

উপন্যাস রচনা করে ভারত ইতিহাসের দুটি উজ্জ্বল অধ্যায় বিশ্লেষণ করেছেন তিনি। তবে ঐতিহাসিকতা রক্ষার দায়িত্ব স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন রমেশচন্দ্র। বাংলা সাহিত্যে যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা তাঁরই কীর্তি। প্রমথনাথ বিশী এ প্রসঙ্গে যে কারণ নির্দেশ করেছিলেন তা যথার্থ বলে মনে হয়।—"বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের ক্ষেত্রে ইতিহাসের প্রেরণা ছাড়াও অন্য আর একটি প্রেরণা ছিল, পরাধীনতার প্রেরণা।···দেশের স্বাধীনতা বা পরাধীনতার কারণ কেবল রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে সন্ধান করিলে চলিবে না—বঙ্কিমচন্দ্র বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এ ক্ষমতা বা দৃষ্টি রমেশচন্দ্রের ছিল না, তিনি সে চেষ্টাও করেন নাই। তাই রাজনৈতিক ঘটনাও মানবচরিত্রের উপরে নির্ভর করিয়া তিনি জীবনসন্ধ্যা ও জীবনপ্রভাত রচনা করিয়াছিলেন।"[৩২]

বঙ্কিমচন্দ্র নিছক ইতিহাস অবলম্বন করেননি, অবাধ কল্পনা, নবলব্ধ ধর্ম-চেতনা, ভারতীয় আদর্শের প্রতি আনুগত্যের সমবায়ে তিনি উপন্যাসের জটিলতা বৃদ্ধি করেছিলেন। কিন্তু স্বাদেশিকতা সেখানেও স্বতোপ্রবাহিত। রমেশচন্দ্র সরল ইতিহাস এবং গভীর দেশপ্রেম অবলম্বন করে অপেক্ষাকৃত সুবোধ্য ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন—এখানেই তার কৃতিত্ব। ভারত ইতিহাসের দুটি উজ্জ্বল অধ্যায়কে অবিকৃত রেখেও উচ্চাঙ্গের ইতিহাসনির্ভর উপন্যাস রচনা করা সম্ভব, এ সত্য রমেশচন্দ্রই জানিয়েছেন। কল্পনার সাহায্যে উৎকৃষ্টতর উপন্যাস লেখা সম্ভব হতে পারে কিন্তু রাজস্থানের বা মারাঠা জাতির সত্য ইতিহাসে এমন সব চরিত্রের সাক্ষাৎ পাই আমরা, যা কল্পনাতীত। শুধু সেই বিস্ময়কর চরিত্রগুলিকে উদ্দীপনাময়ী ভাষাতে ব্যক্ত করার ক্ষমতা থাকলেই তা সার্থক সৃষ্টি হতে পারে। রমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমের আবেগ ছিল, পরিণত মন ও অন্তর্দৃষ্টি ছিল—তাই ইতিহাসভিত্তিক কাহিনী রচনায় তিনি সাফল্য অর্জন করেছিলেন। ভারতের অতীত ইতিহাসের প্রতি আত্মিক সম্পর্ক অনুভব করতেন রমেশচন্দ্র,—ইতিহাসপ্রিয়তা ও সহজাত দেশপ্রেম উভয়টিই প্রবলভাবে তাঁর চরিত্রে বর্তমান ছিল। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানেই তিনি 'জীবন-প্রভাত' ও জীবন-সন্ধ্যার মত দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা সমাপ্ত করেছিলেন।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে 'জীবন-প্রভাত' রচনাকালে রমেশচন্দ্র বিষয় নির্বাচনে সাময়িক যুগ থেকে প্রত্যক্ষ কোন প্রেরণা লাভ করেন নি। মারাঠা ইতিহাস তার উপজীব্য ছিল কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে রাজস্থানের ইতিহাসই প্রধানভাবে অবলম্বিত হোত—

৩২. প্রমথনাথ বিশী সম্পাদিত, রমেশ রচনাসম্ভার। ১৯৫৮।

মারাঠা ইতিহাস নিয়ে কোনো রচনা চোখে পড়ে না। দীর্ঘদিন পূর্বে 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে' 'অঙ্গুরীয় বিনিময়ে' ভূদেব মুখোপাধ্যায় শিবাজীকে নায়ক হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দেশাত্মবোধক বহু কাব্য-কবিতা-নাটকেও শিবাজী-প্রসঙ্গ কেন বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়নি সেটাই বিস্ময়ের ব্যাপার। এর একটি যুক্তিগ্রাহ্য কারণ হয়ত এই হতে পারে যে, রাজস্থানের ইতিহাসই সেযুগে অতিমাত্রায় জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। মধুসূদনের 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকে কিংবা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একাধিক নাটকে রাজস্থানের কাহিনীই অবলম্বিত হয়েছে - এর মূলে টডের রাজস্থানের প্রভাবও অবশ্যস্বীকার্য। বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহের কাহিনী রাজস্থানের ইতিহাস থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। অতএব একথা মনে হতে পারে যে শিবাজীর অভ্যুত্থানের কাহিনী নিয়ে ইংরেজীতে ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হলেও তা জনপ্রিয় হয় নি,—লেখকগোষ্ঠীও রাজস্থানপ্রসঙ্গ নিয়ে চর্বিতচর্বণ করেছিলেন কিন্তু শিবাজী নেপথ্যেই রয়ে গেলেন। জনপ্রিয় প্রসঙ্গ অবলম্বনে সুলভ সাহিত্য রচনা করে সম্মান পাবার লোভ শুধু প্রাচীন কবিদেরই বৈশিষ্ট্য নয়—যে কোন যুগের ধারাবাহিক সাহিত্য ইতিহাস আলোচনা করলে সে ঘটনার পুনরাবৃত্তি চোখে পড়ে। সাধারণতঃ জনপ্রিয় ও পরিচিত বিষয়ের প্রতি একটা দুর্বলতা থাকাই স্বাভাবিক, টডের 'রাজস্থান'-প্রীতি সে কথাই প্রমাণ করে। কিন্তু রমেশচন্দ্র মুখ্যতঃ ইতিহাসপ্রেমিক ছিলেন—টডের রাজস্থান তাঁরও প্রিয় গ্রন্থ। তাছাড়া গ্রাণ্ট ডফের লেখা মহারাষ্ট্রীয় জাতির ইতিহাসও তিনি সাগ্রহে পাঠ করেছিলেন। এই উদ্দীপনাময়ী ইতিহাসই রমেশচন্দ্রকে ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় প্রেরণা দিয়েছিল। সেদিক থেকে রমেশচন্দ্রের বিষয় নির্বাচনের মৌলিকত্ব স্বীকার করতে হয়। দেশপ্রেমের আদর্শ প্রচারের চেষ্টা যেখানে মুখ্য, শিবাজী চরিত্রবর্ণনায় সে উদ্দেশ্যটি মূর্ত হতে পারে, রমেশচন্দ্র সে কথা জানতেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় কণ্টারের কাহিনী অনুবাদ করেছিলেন,—রমেশচন্দ্র ইতিহাস-ভিত্তিক উপন্যাসে শিবাজীকে জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীকরূপে বর্ণনা করেছেন।

রাজপুত ইতিহাসের গৌরব যখন স্তিমিত হয়ে এলো তখন মারাঠা বীর শিবাজীর অকস্মাৎ আবির্ভাব হয়েছিল। এর মধ্যে একটি নিগূঢ় সংযোগ আবিষ্কার করেছিলেন রমেশচন্দ্র। 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যায়' যে বক্তব্য তারই উপসংহার রূপে 'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাতের' পরিকল্পনা—যদিও রচনার দিক থেকে 'জীবন প্রভাত' পূর্ববর্তী রচনা। স্বাধীনতা লাভের অদম্য বাসনা একটি জাতির জীবনে কিভাবে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে তারই চিত্র বর্ণনা 'জীবন প্রভাতে' স্থান পেয়েছে, পরবর্তী রচনায় দেশোদ্ধারের অমলিন আদর্শ, অনৈক্য ও আত্মকলহের ফলে কিভাবে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেল,—সেকথাই সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন রমেশচন্দ্র। দুটি উপন্যাসেই ঐতিহাসিক সত্য

অবিকৃত রেখে দেশপ্রেম সাধনার সাফল্য ও দেশপ্রেমে শৈথিল্যের কলঙ্কজনক পরিণাম বর্ণনা করেছেন লেখক। সত্যানুসন্ধানই লেখকের মূল উদ্দেশ্য, তাই নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের নির্লিপ্ততা দুটি উপন্যাসেই চোখে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্রের যে কোন ইতিহাস-ভিত্তিক কাহিনীতে এই দুর্লভ সংযম অনুপস্থিত—সেজন্য রমেশচন্দ্রকে সার্থকতর ঐতিহাসিক উপন্যাস স্রষ্টা বলে অভিনন্দিত করেছিলেন সমালোচকবৃন্দ। দেশপ্রেমের আবেগাতিশায়নেও স্রষ্টার সংযম বিনষ্ট হয় নি,—রমেশচন্দ্রের এ দুটি উপন্যাস পাঠ করে এ উপলব্ধি হয় যে কোন পাঠকের।

'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত'-এর বিষয়টিই স্বদেশপ্রেমাত্মক, এ কাহিনীর অসামান্য বিষয়গৌরব সে যুগের বাঙ্গালী জীবনে ভাবান্দোলন সৃজনে সক্ষম হবে-এ প্রত্যাশা ছিল লেখকের। ভূমিকায় স্বীয় আত্মজ অবিনাশচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন—

"প্রিয় ভ্রাতঃ!

ইউরোপ হইতে তুমি যে নানা ভাষা ও নানা বিদ্যা আহরণ করিয়া আনিয়াছ, তাহা যখন চিন্তা করি তখনই আনন্দিত হই! কিন্তু তুমি ইহা অপেক্ষাও অমূল্য রত্নের অধিকারী। সে রত্ন, নির্মল উদার চরিত্র, মনঃসংযমে অসাধারণ ক্ষমতা, বিজ্ঞানচর্চ্চায় আনন্দনীয় উৎসাহ ও জীবনব্যাপী চেষ্টা।

এই অসাধারণ সদগুণ সমূহ দ্বারা স্বদেশের মঙ্গল সাধন কর, ভ্রাতার এই মঙ্গলেচ্ছা!"

এই উৎসর্গ পত্রটি স্বদেশপ্রাণ রমেশচন্দ্রের দেশসেবাব্রতে উৎসাহ দানের নজির রূপে গণ্য হবে। স্বীয় ভ্রাতাকেও দেশাদর্শে দীক্ষা দেবার আকাঙ্ক্ষা পত্রটিতে প্রকাশিত হয়েছে। শিক্ষা, উদারতা, জ্ঞানানুরাগ দেশসেবায় নিয়োজিত না হলে তার সার্থকতা কোথায়? যোগ্য ব্যক্তিই দেশসেবার অধিকারী! রমেশচন্দ্র তাঁর সমস্ত শিক্ষা ও উদারতা দেশসেবার পবিত্র কর্তব্যে নিয়োগ করেছিলেন, অনুরূপ প্রেরণায় স্বীয় আত্মজকেও দীক্ষা দিতে চান তিনি। দেশপ্রেমকাহিনী রচনার মূলেও একই বাসনা বর্তমান ছিল বলেই ধারণা করি। উপন্যাসে দেশপ্রেম প্রচারের চেষ্টাকে এ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে ব্যাখ্যা করা যায় না।

'জীবনপ্রভাতের' রচনাকালে বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাসগুলি সবই প্রকাশিত হয়েছে বটে, কিন্তু তখনো শেষ চারটি উপন্যাসের জন্ম হয়নি। বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ পর্বের উপন্যাসে আদর্শবাদ ও তত্ত্বপ্রাধান্য বঙ্কিমচন্দ্রের শিল্পী মনের চূড়ান্ত জটিলতা ও অপরিসীম ক্ষমতার সাক্ষ্য দেয়। রমেশচন্দ্র মোট ছ'টি উপন্যাস রচনা করেছিলেন—তাঁর কোন উপন্যাসে কোনো ভাবেই তত্ত্ববাহুল্য প্রাধান্য পায়নি। শিল্পী বঙ্কিমের শিল্পীসত্তার গভীরত্ব বিশ্লেষণকালে সমালোচক পরিশ্রান্ত বোধ

করেন,—তত্ত্ব ও দর্শন, দেশপ্রেম ও স্বজাতি সমালোচনা, উদারতা ও প্রাচীনতার সমর্থন একই সঙ্গে উপন্যাসে পরিবেশিত হয়েছে বলেই এ সমস্যার উদ্ভব হয়েছে। রমেশচন্দ্র সে তুলনায় সরল ও উদার সত্যকেই অনলঙ্কৃত ভাবে প্রকাশের চেষ্টা করেছেন। রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে জটিলতা নেই বল্লেই চলে,—উপরন্তু দেশপ্রেমের নিরন্তর প্রবাহ সব বক্তব্যকেই আর্দ্র করেছে বলেই রমেশচন্দ্র সহজে বোধগম্য। দেশপ্রেমের বক্তব্যেও তিনি অকপট। 'আনন্দমঠে' দেশপ্রেমের স্বরূপ উদ্ঘাটনে সমালোচক যখন দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েন—উপন্যাসের শেষাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের সমস্ত বক্তব্যই যখন ধোঁয়াটে হয়ে যায়,—রমেশচন্দ্রের উপন্যাসে দেশপ্রেমের অকপট প্রকাশমহিমা তখন অত্যন্ত সহজেই অভিনন্দনযোগ্য বলে মনে হওয়াটাই স্বাভাবিক।

'জীবনপ্রভাতে' রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক সত্য প্রচারেই অধিক মাত্রায় উৎসাহী। উপন্যাসের প্রথমেই 'জীবনউষা' অংশটিতে রমেশচন্দ্র যে অনুচ্চার বর্ণনা দিয়েছেন সেটি লক্ষ্যণীয়। ইতিহাসের যথাযথ বর্ণনায় পাঠকের রুচি সম্পর্কে রমেশচন্দ্র অজ্ঞ ছিলেন—কারণ উপন্যাসে ইতিহাসের প্রসঙ্গ যে ভাবে আলোচিত হোত তাতে আবেগাতিশয্যই লক্ষ্য করেছিলেন রমেশচন্দ্র। সে যুগটি উচ্ছ্বাসেই কম্পমান,—অতিশয়োক্তিও সেখানে মানিয়ে গিয়েছিল। ইতিহাসের সত্যতা নিয়ে দুশ্চিন্তা করার মতো অবসর ছিল না সেদিন বাঙ্গালীর জীবনে। তাই রমেশচন্দ্র বিনীতভাবে প্রার্থনা করেছিলেন সহৃদয় পাঠকের কাছে,—

'উপন্যাসের প্রারম্ভে দেশের ইতিহাস ও লোকের আপন অবস্থা সংক্ষেপে বিবৃত হইল, তাহাতে বোধ হয় পাঠক মহাশয় বিরক্ত হইবেন না।' সত্য বর্ণনায় পাঠক বিরক্তবোধ করেনি তার প্রমাণ রমেশচন্দ্রের উপন্যাসই যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাসের সম্মান পেয়েছে। তবে সত্য ইতিহাসের অনুসরণে হিন্দুশক্তির পরাজয়ের বর্ণনা দিতে গিয়ে রমেশচন্দ্রও বেদনাবোধ করেছিলেন।

ভারতবর্ষের প্রথম হিন্দুশক্তির পতনের সংক্ষিপ্ত একটি ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ণনা করেছেন রমেশচন্দ্র।

"খ্রীষ্টের একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই গজনীর অধিপতি মামুদ ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন ও সেই সময় হইতে দুইশত বৎসরের মধ্যে আর্য্যাবর্ত্তের অধিকাংশই মুসলমান দিগের হস্তগত হয়।"

এ বর্ণনায় কোন উচ্ছ্বাস নেই বরং পরাধীনতার কালানুক্রমিক সত্য বর্ণনার চেষ্টা আছে। রমেশচন্দ্র লক্ষ্য করেছিলেন,—

"সে সময়ে হিন্দুদিগের জাতীয়জীবন ক্ষীণ ও অবনতিশীল, বিজয়ী মুসলমান

দিগের জাতীয়জীবন উন্নতিশীল ও প্রবল, সুতরাং একে অন্যের ধ্বংস সাধন করিল।"—পরাধীনতার এমন যুক্তিপূর্ণ স্বীকারোক্তি সেযুগের কোন রচনায় আছে বলে মনে হয় না। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণলগ্নে আবেগ ও উচ্ছ্বাস ছিল বটে কিন্তু যুক্তিবাদের ওপরেই তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার, বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর চরিত্রে যুক্তিপ্রীতি সঞ্চার করেছিলেন। উচ্ছ্বাসের আধিক্যেও যুক্তির উপযোগিতা একেবারে বিনষ্ট হয়নি। রমেশচন্দ্র নিরাসক্ত চিত্তে দেশোচ্ছ্বাসের গতি লক্ষ্য করেছিলেন বলেই উপন্যাসে যুক্তিধর্মিতাকে আশ্রয় করে সুলভ ভাবালুতা ত্যাগ করেছিলেন। মহারাষ্ট্র দেশের অতীত ইতিহাসের ধারাবাহিক বর্ণনাশেষে রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিকের মত নিঃসংশয় চিত্তে হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন,

"জাতিবিরোধের ন্যায় আর বিরোধ নাই, পর্বতসঙ্কুল কঙ্কণ ও মহারাষ্ট্র প্রদেশে সর্বস্থানে ও সর্বকালেই স্থানীয় বড় বড় বংশে আত্মবিরোধ দৃষ্ট হইত ও পর্বত কন্দরে ও উর্বরা উপত্যকায় সর্বদাই মহাযুদ্ধ সংঘটিত হইত। বহু শোণিতপাত হইলেও সেগুলি কুলক্ষণ নহে, সেগুলি সুলক্ষণ; পরিচালনার দ্বারায় আমাদের শরীর যেরূপ সুবদ্ধ ও দৃঢ়ীকৃত হয়, সর্বদা কার্য্য ও উপদ্রব ও বিপর্যয় দ্বারা জাতীয় বল ও জাতীয় জীবন সেইরূপ রক্ষিত ও পরিপুষ্ট হয়। এইরূপ মহারাষ্ট্রীয় জীবন-উষার প্রথম রক্তিমাচ্ছটা শিবাজীর আবির্ভাবের অনেক পূর্বেই ভারত আকাশ রঞ্জিত করিয়াছিল।

[১ম পরিচ্ছেদ]

ঐতিহাসিকের মতোই সত্য ঘটনার দলিল মেলে ধরেছেন রমেশচন্দ্র। এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র নিজের ধারণার ওপরই নির্ভর করেছিলেন। মহারাষ্ট্র ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষতঃ শিবাজীচরিত্র নিয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকের গবেষণার সঙ্গে সেযুগের ঐতিহাসিকের ধারণায় অমিল রয়েছে যথেষ্ট। আধুনিক ঐতিহাসিকেরা শিবাজীর অসমসাহসিকতার প্রশংসা করেছেন,—কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক হিসেবে শিবাজীর প্রতিষ্ঠার হেতু নির্ণয় করতে গিয়ে তাঁরা সংশয় প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রমেশচন্দ্রের যুগে সে তথ্য জানা ছিল না—কিংবা এ তথ্যে বিশ্বাস স্থাপন করার মত মানসিকতা ছিল না। জাতীয় আন্দোলনের পূর্বাহ্নে শিবাজী স্বদেশপ্রেমিক বলেই বন্দিত হবেন এটাই স্বাভাবিক। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার মহারাষ্ট্রের ইতিহাস সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন,—

"It was only human nature if the noblest members of the despised families (or castes) resented this injustice and tyrany of Society and, in the bitterness of public humiliation, sought to be

avenged on the persecuting church and state by going over to the enemies of their country and faith. Such action, ,on the part of the oppressors and the oppressed alike, is impossible where a true sense of nationality has taken root. Patriotism could not grow on the Indian soil (except among compact clans of blood kindred like the Rajputs). The state, as an impersonal continuous being,—higher and more durable than our individual selves, could not be conceived by the rulers of Hindu India whose sole care was for the benefit of self and not for the good of the community as a whole."৩৩

শিবাজীকে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাতারূপে কল্পনা করেই 'মহারাষ্ট্র জীবনপ্রভাতের' সৃষ্টি। সুতরাং শিবাজীর চরিত্রে রাজ্য সংগঠকের সমস্ত গুণই খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। মহারাষ্ট্রের হিন্দু নায়কের পুণ্য চরিতকথাই এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। শিবাজীর দুঃসাহসিকতার ও দূরদর্শিতার কথা শত্রু মোঘল ও স্বজাতি মহারাষ্ট্রীয়েরা ভালভাবেই জানত। তাই হিন্দুশক্তির উন্মেষ লগ্নে মহারাষ্ট্রীয়েরা শিবাজীকে নেতৃত্ব-পদে অভিষিক্ত করেছে। মহাদেওজী শিবাজীর সন্ধির অভিপ্রায় নিবেদন করতে এসেছেন বিপক্ষ শিবিরে,—কিন্তু শায়েস্তা খাঁ স্পষ্টই বলেছে,—"ধূর্ত কপটাচারী মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আমি কদাচ বিশ্বাস করি না, এমত ধূর্ততা নাই যে তাহাদের অসাধ্য।" [পঞ্চম পরিচ্ছেদ]

রমেশচন্দ্রের বক্তব্যও অত্যন্ত স্পষ্ট। ঘটনাপ্রবাহের ফলাফল বর্ণনা করার যথাযথ চেষ্টা এ উপন্যাসে সর্বত্র প্রকট। চাতুর্যই যে শিবাজীর সাফল্যের অন্যতম সোপান—সে প্রসঙ্গ গোপন করার চেষ্টামাত্র না করে লেখক তীব্রভাবে তা সমালোচনা করেছেন। ধূর্ততা ও কপটতার সমর্থন করে, নিখুঁত ইতিহাস রচনার চেষ্টামাত্র না করে রমেশচন্দ্র পাঠকের ধন্যবাদ লাভ করেছেন। তবু শিবাজীর মত নেতা ও সংগঠক অকৃপণ প্রশংসা পেতে পারেন, রমেশচন্দ্র তা দিয়েছেনও। মোঘলরাও স্বীকার করেছে,—

"তিনি শিবাজীকে বিশেষ করিয়া জানিতেন, শিবাজীর অসাধারণ ক্ষমতা, তাঁহার বহু সংখ্যক দুর্গ, তাঁহার অপূর্ব ও দ্রুতগামী অশ্বারোহী সেনা, তাঁহার হিন্দুধর্মে আস্থা, হিন্দুরাজ্য স্থাপনে অভিলাষ, হিন্দু স্বাধীনতা সাধনে প্রতিজ্ঞা, এ সমস্ত চাঁদ খাঁর নিকট অগোচর ছিল না।" [ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ]

---

৩৩. Jadunath Sarkar, Sivaji and His Times, 1919, P. 394—395.

শিবাজী সম্পর্কে মোঘল সেনাপতি চাঁদ খাঁর এ উক্তি শত্রুরই অভিনন্দন বাণী। এ উপন্যাসের সর্বপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অংশ রাজপুত মারাঠা বিরোধের কাহিনী। মোঘল সেনাপতি যশোবন্তসিংহ শিবাজীর বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়েছেন,—এ অংশটিতে স্বাধীনতাপ্রিয় মারাঠাশক্তির সঙ্গে অপর একটি হিন্দুশক্তিরই যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে, ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্র অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে এ চিত্র বর্ণনা করেছেন। 'মাধবী কঙ্কণে'ও যশোবন্ত চরিত্রের সাক্ষাৎ লাভ করেছি আমরা। রাজপুত হয়েও মোঘলের অধীনতা স্বীকার করে স্থায়ী অপযশ লাভ করেছিলেন যশোবন্তসিংহ। মোঘলশক্তির কাছে পরাভূত হয়ে স্বীয় পত্নীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছিলেন তিনি। এখানেও যশোবন্ত চরিত্রে যে কালিমা আছে তা অনপনেয় কলঙ্ক। তবু যশোবন্ত বিবেকবান, বিশ্বস্ত রাজপুত প্রতিনিধি হিসেবে অতি উজ্জ্বল একটি চরিত্র। স্বদেশোদ্ধারের ক্ষমতা হারিয়েও যশোবন্ত মনুষ্যত্ব হারায়নি—দেশপ্রেমিক হতে পারেননি বলে আক্ষেপ করলেও মানবিকতা রক্ষার আপ্রাণ চেষ্টা-করেছিলেন তিনি। রাজপুত ও মারাঠার দ্বন্দ্ব ব্যাখ্যায় রমেশচন্দ্র যথেষ্ট নৈপুণ্য ও ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন।

শিবাজীর দূত মহাদেওজীর প্রচণ্ড আক্ষেপবাণী ধ্বনিত হয়েছে, যশোবন্তের আদর্শচ্যুতির জন্য। সপ্তম পরিচ্ছেদটি রমেশচন্দ্রের রচনা নৈপুণ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন বলেই গণ্য হবে। এখানে স্বদেশপ্রেমের অপূর্ব উচ্ছ্বাস স্বদেশচেতনাহীন মানুষকেও উদ্দীপিত করতে পারে। রমেশচন্দ্র যশোবন্তের সমালোচনা করেছেন নিরপেক্ষভাবে। মহাদেওজীর জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমেরও বর্ণনা দিয়েছেন। শিবাজীর আদর্শই এই চরিত্রটিকে এমন মহৎ প্রেরণা দিয়েছে। যশোবন্ত শিবাজী প্রসঙ্গে বলেছে,—

"কেবল দিল্লীশ্বরের জয়ের জন্য যুদ্ধ নহে;—আমি তোমার প্রভুর সহিত কিরূপে মিত্রতা করিব? শিবজী বিদ্রোহাচারী, চতুর শিবজী অন্যের অঙ্গীকার অনায়াসে কল্য ভঙ্গ করে।" [সপ্তম পরিচ্ছেদ]

জ্বলন্ত ক্রোধে উত্তর দিয়েছেন মহাদেওজী—"মহারাজ। সাবধান, অলীক নিন্দা আপনার সাজে না।...জেতা ও বিজিতদিগের মধ্যে কবে কোন্ দেশে সখ্যতা? বজ্রনখ যখন সর্পকে ধারণ করে, সর্প সে সময় মৃতবৎ হইয়া থাকে, মৃত বলিয়া তাহাকে পরিত্যাগ করিবামাত্র জর্জরিত শরীর নাগরাজ সময় পাইয়া দংশন করে এটি বিদ্রোহাচরণ নয়; এটি স্বভাবের রীতি।...আমাদের প্রাণের প্রাণ, জীবনের জীবন স্বরূপ স্বাধীনতা যে মুসলমানেরা শত শত বৎসর অবধি শোষণ করিতেছে, হৃদয়ের শোণিত স্বরূপ বল, মান, দেশগৌরব, জাত্যাভিমান শোষণ করিতেছে, ধর্ম বিনাশ করিতেছে, তাহাদিগের সহিত আমাদিগের সখ্যতা ও সখ্য সম্বন্ধ? তাহাদিগের

নিকট হইতে যে উপায়ে সেই জীবন স্বরূপ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারি, স্বধর্ম ও জাতিগৌরব রক্ষা করিতে পারি, সে উপায় কি নিন্দনীয়? [ঐ]

রমেশচন্দ্র স্বাধীনতার মূল্য ও স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ সম্বন্ধে তার অকপট বিশ্বাসের কথাই এ অংশটিতে ব্যক্ত করেছিলেন। শক্তিমানই স্বাধীনতা লাভে সক্ষম। দুর্বলের পক্ষে স্বাধীনতা লাভের স্বপ্ন দেখা হয়ত সম্ভব কিন্তু তা দুর্বলের লভ্য হতে পারে না। রমেশচন্দ্র স্বদেশপ্রেমিকের চরিত্রে বজ্রকঠিন দৃঢ়তা অনুসন্ধান করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দের বীর্য লাভের উপদেশটিও সে যুগের মানুষের জীবন সাধনার পূর্ণাঙ্গ নির্দেশ বলে গৃহীত হয়েছিলো। রমেশচন্দ্র নির্যাতিতের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন,—এই শক্তি পরাধীন ও নির্যাতিত মানুষের চরিত্রে ধীরে ধীরে প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। যখন শক্তি স্ফুরিত হয় তখন উপায় সম্বন্ধে কোন বিধিনিষেধ আরোপ করাই চলে না—তা নিজের পথেই এগিয়ে যায়। শিবাজীর রাজ্যলাভের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষার শক্তি কোন পথই ভেবেচিন্তে গ্রহণ করেনি, তা অকস্মাৎ আপন আবেগেই প্রকাশিত হয়েছে। চাতুর্য বা কপটতার অপবাদ দিয়ে এই পবিত্র দেশোদ্ধারের ব্যঞ্জনাকে কলুষিত করা যায় না। দেশপ্রেমের এই অভ্রান্ত আবেগের শক্তিতে বিশ্বাসী ছিলেন রমেশচন্দ্র। শেষ জীবনে বিলেতে অবস্থানকালে তিনি প্রচণ্ড উদ্যম নিয়ে ভারতের স্বার্থরক্ষার চেষ্টা করে গেছেন। সে সময়ের বহু বক্তৃতাতে তিনি অকুণ্ঠ ভাষায় তাঁর বিশ্বাসের কথা ব্যক্ত করেছেন নির্ভয়ে। দেশপ্রেমের শক্তিই রমেশচন্দ্রের প্রেরণা ছিল। বিদেশী শাসকগোষ্ঠীর অন্যায় শাসনের প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠেছিলেন তিনি। সে সময়ের ইংরাজী বক্তৃতায় স্বদেশপ্রেমিক রমেশচন্দ্রকে আমরা নতুনরূপে আবিষ্কার করি। সাহিত্যে যে দেশপ্রেমের বাণী দেশবাসীর কাছে নিবেদন করেছিলেন—বিদেশে ইংরেজী বক্তৃতায় তারই প্রতিফলন দেখতে পাই। শিবাজীকে সমর্থন করে রমেশচন্দ্র স্বাধীনতাকামী মানুষকেই অভিনন্দিত করেছিলেন। বিলেতে ইংরেজ শাসনের ত্রুটি সম্বন্ধে সমালোচনা করতে গিয়ে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন,

It would render despotism more despotic, it would silence criticism and public opinion, it would endanger the empire. For if there be dissatisfaction in the land with certain measure of the Government, is it not for better and far safer that people should speak it out—and that you should know it—that you should try to remove it—than

that the dissatisfaction should work in the dark and end in a catastrophe ?[৩৪]

রমেশচন্দ্রের এই সাবধানবাণী তাঁর দৃঢ় দেশচেতনাকেই চিনিয়ে দেয়। মারাঠা অভ্যুদয়ের ইতিহাস নিয়ে পূর্ণাঙ্গ একটি গ্রন্থ রচনার অভিলাষ ছিল রমেশচন্দ্রের, 'জীবনপ্রভাতে' তিনি শুধু শিবাজীর আদর্শের স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন।

যশোবন্তের মুখে আদর্শ রাজপুতের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিবরণ শুনেছি আমরা,—

"রাজপুতগণও স্বাধীনতা রক্ষা করিতেছেন, কিন্তু তাহারা সাহস ও সম্মুখ রণ ভিন্ন অন্য উপায় জানে না।"

এ যুক্তির অসারত্ব প্রমাণ করার জন্য মহাদেওজী উৎকৃষ্ট যুক্তি প্রদর্শন করেছেন,—

"মহারাজ! রাজপুতদিগের পুরাতন স্বাধীনতা আছে, বিপুল অর্থ আছে, দুর্গম পর্বত বা মরুবেষ্টিত দেশ আছে, সুন্দর রাজধানী আছে, সহস্র বৎসরের অপূর্ব রণশিক্ষা আছে, মহারাষ্ট্রীয় দিগের ইহার কোনটি আছে? তাহারা দরিদ্র, তাহারা চিরপরাধীন, তাহাদের এই প্রথম রণশিক্ষা।"

একটি অনগ্রসর জাতির প্রথম স্বাধীনতাবুদ্ধির উন্মেষ লগ্নটি বিশ্লেষণ করেছেন লেখক। শিবাজীর আদর্শ ব্যাখ্যায়ও রমেশচন্দ্র স্বাধীনতাকামী জনগণের উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের মত রমেশচন্দ্রও ভারতীয় আদর্শ ভিত্তিক স্বদেশচেতনার পক্ষপাতী ছিলেন। এ দেশের মাটিতে বিলাতি Patirotism যে সম্ভব নয়—বঙ্কিমচন্দ্রের মত রমেশচন্দ্রও গভীর ভাবে সে কথা বিশ্বাস করতেন। স্বদেশচেতনার বৈশিষ্ট্যটি জাতিভেদে দেশভেদে ভিন্ন হওয়াই স্বাভাবিক। ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি দৃঢ়ভাবে ভারতভূমির সনাতন আদর্শের ওপরেই প্রতিষ্ঠিত হোক এ আকাঙ্ক্ষা রমেশচন্দ্রেরও। মহাদেওজী শিবাজীর স্বপ্ন ও সাধনা ব্যাখ্যা করেছেন,—

"মুসলমান শাসন ধ্বংসকরণ, হিন্দুজাতির গৌরব সাধন, স্থানে স্থানে দেবালয় স্থাপন, সনাতন ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি, হিন্দুশাস্ত্রের আলোচনা, ব্রাহ্মণকে আশ্রয়দান, গোবৎসাদি রক্ষাকরণ, ইহা ভিন্ন শিবাজীর অন্য উদ্দেশ্য নাই। এই বিষয়ে যদি তাঁহাকে সাহায্য করিতে বিমুখ হয়েন তবে স্বহস্তে এই কার্য্য সাধন করুন। আপনি এই দেশের রাজত্ব গ্রহণ করুন, মুসলমান দিগকে পরাস্ত করুন, মহারাষ্ট্রে হিন্দু স্বাধীনতা স্থাপন করুন।"

৩৪. R. C. Dutt. Speeches and Papers on Indian Questions [1897—1900]

শিবাজীর এই আদর্শ হিন্দু রাজ্যস্থাপনের আদর্শ। স্বাধীনতা উদ্ধারের এই প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। মহাদেওজীর ভাবাবেগপূর্ণ শিবাজী-মাহাত্ম্য-কথায় শেষ পর্যন্ত অভিভূত হয়ে যশোবন্তসিংহ স্বীকার করেছিলেন,

"অদ্যাবধি শিবজী আমার মিত্র, আমি শিবজীর মিত্র। রাজপুতের প্রতিজ্ঞা কখনও মিথ্যা হয় না, অদ্যাবধি শিবজীর পণ ও আমার পণ এক, শিবজীর চেষ্টা ও আমার চেষ্টা অভিন্ন। সেই হিন্দুবিরোধী দিল্লীশ্বরের বিরুদ্ধে এতদিন যিনি যুদ্ধ করিয়াছেন সে মহাত্মা কোথায়? একবার তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া হৃদয়ের সন্তাপ দূর করি।"

এইভাবে রাজপুত ও মারাঠার মিলন সেতু কল্পনা করেছেন রমেশচন্দ্র। মারাঠা শক্তির অভ্যুদয়কালে রমেশচন্দ্র এই দুটি স্বদেশপ্রাণ জাতির ঐক্যের স্বপ্ন দেখে কিছুটা শান্তি পেতে চেয়েছিলেন হয়ত। এমন সম্ভাবনার মুহূর্ত ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের কোথাও ছিল না। কিন্তু ইতিহাসের নির্মম সত্য স্বদেশপ্রাণ ঐতিহাসিকের সমস্ত কল্পনা ধূলিস্যাৎ করে দিয়েছিল। ঔরঙ্গজেব যশোবন্তের অকর্মণ্যতা বুঝতে পেরে জয়সিংহকে স্থলাভিষিক্ত করেছিলেন।

শিবাজীর সমগ্র জীবন দেশসেবায় উৎসর্গীকৃত। বাল্যকালে দেশপ্রেমের যে দীক্ষা শিবাজী পেয়েছিলেন,—রমেশচন্দ্র শিবাজীর বাল্যকথা বর্ণনায় তা ব্যক্ত করেছেন। দাদাজী মৃত্যুশয্যায় শায়িত অবস্থায় তাঁর প্রিয় শিষ্যটিকে বলেছিলেন,—

—"বৎস, তুমি যে চেষ্টা করিতেছ তাহা হইতে মহত্তর চেষ্টা আর নাই। এই উন্নত পথ অনুসরণ কর, দেশের স্বাধীনতা সাধন কর।"

এ আদেশ মৃত্যু পর্যন্ত মান্য করেছিলেন শিবাজী। ভারতের ইতিহাসে দেশপ্রেমের এমন উজ্জ্বল মহিমার চিত্র থাকা সত্বেও পরাধীনতায় দীর্ঘকাল ডুবে থেকেছি আমরা, অতীত ঐতিহ্যের প্রতি নীরব থেকেছি। শিবাজী ও প্রতাপসিংহের দৃষ্টান্ত নতুন করে আলোচিত হয়েছে বলেই স্বাধীনতা আন্দোলনে অনেক দ্রুত অগ্রসর হতে পেরেছি আমরা। সাহিত্যিকবৃন্দই পথ প্রদর্শন করেছেন এ ব্যাপারে। জলন্ত ভাষায় দেশমহিমার কথা তাঁরাই বারংবার উচ্চারণ করেছেন,—আমাদের সচেতন করেছেন আপন কর্তব্য সাধনে।

শিবাজী দমনে ঔরংজীব জয়সিংহকে পাঠিয়েছিলেন,—ইতিহাসের সিদ্ধান্ত অনুসারে জয়সিংহ ছিলেন চূড়ান্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। কিন্তু শিবাজী জয়সিংহকেও নতুন আদর্শের পথ চিনিয়ে দিলেন। রাজপুত জাতির চরিত্রে মোঘল বিরোধিতার সঙ্গে মোঘলপ্রীতি ওতপ্রোত হয়ে আছে। প্রতাপসিংহের নিষ্কলঙ্ক স্বদেশপ্রেমের পাশাপাশি মানসিংহের মোঘল-দাসত্ববরণের চিত্র রাজপুত ইতিহাসেই

পাই আমরা। শিবাজী জয়সিংহের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রাজপুতের কলঙ্ক স্খালন করার উপদেশ দেন,

"বাল্যকাল হইতে আপনাদের গৌরব গীত গাইতে ভালবাসিতাম; অদ্য দেখিলাম সে গীত মিথ্যা নহে, জগতে যদি মাহাত্ম্য, সত্য, ধর্ম থাকে, তবে রাজপুত শরীরে আছে। এ রাজপুত কি যবনাধীনতা স্বীকার করিবেন? মহারাজা জয়সিংহ কি যবন আরংজীবের সেনাপতি?" [চতুর্দশ পরিচ্ছেদ]

শিবাজী মহারাষ্ট্রীয় ও রাজপুতকে মিলিত করার আপ্রাণ সাধনা করেছিলেন,—যশোবন্ত ও জয়সিংহের কাছে তাঁর আবেদন একই। মোঘলশক্তিকে প্রতিহত করার আদর্শেই তিনি উৎসাহিত করতে চান। শুধু হিন্দু বলেই জয়সিংহের কাছে, যশোবন্তের কাছে ছুটে এসেছিলেন শিবাজী। মোঘলরা রাজশক্তির দম্ভ নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ শাসন করেছে,—কিন্তু সম্মিলিত কোন হিন্দুশক্তির অভ্যুত্থান কখনও হয়নি। শিবাজীর বক্তব্য অনেক বেশী মূল্যবান ছিল সন্দেহ নেই—কিন্তু জয়সিংহ এর মহিমা প্রথমে বুঝতে পারেননি। জয়সিংহ উত্তর দিয়েছেন,

"যখন দিল্লীশ্বরের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছি, তখন তাঁহার কার্যসিদ্ধির জ সত্যদান করিয়াছি; যে বিষয়ে সত্যদান করিয়াছি তাহা করিব।…রাজপুতে ইতিহাস পাঠ করুন, সহস্র বৎসর মুসলমানদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছেন, কখনও স লঙ্ঘন করেন নাই। জয়লাভ করিয়াছেন, অনেক সময়ে পরাস্ত হইয়াছেন, জয়ে, পরাজয়ে, সম্পদে, আপদে সর্বদা সত্য পালন করিয়াছেন। এখন আমাদে সে গৌরবের স্বাধীনতা নাই, কিন্তু সত্য পালনের গৌরব আছে।"

শিবাজী দুজন রাজপুত প্রতিনিধির সঙ্গে আলাপ করে বুঝলেন যে যশোবন্ত জয়সিংহ এক নন। জয়সিংহের চাতুরী অসাধারণ। অথচ শিবাজী কৌশলে ক উদ্ধার করতে চান। জয়সিংহ যশোবন্তকেও সমালোচনা করেছে, তার চুক্তিভঙ্গে জন্য। শিবাজীর উক্তি তাঁর সমগ্র জীবনাদর্শের বাণী,—

"মহারাষ্ট্রীয়েরাও মৃত্যু ডরে না, যদি এই অকিঞ্চিৎকর জীবন দান করি আমার উদ্দেশ্য সাধন হয়, হিন্দুস্বাধীনতা, হিন্দুগৌরব পুনঃস্থাপিত হয়, ভবানীর সাক্ষাতে এই মুহূর্তে এই বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিব, অথবা রাজপুত। অব্যর্থ বর্শা ধারণ কর, এই হৃদয়ে আঘাত কর, সহাস্য বদনে প্রাণত্যাগ করিব কিন্তু যে হিন্দু গৌরবের বিষয় বাল্যকালে স্বপ্ন দেখিতাম, যাহার জন্য শতযুদ্ধ যুঝিলাম, শত শত্রুকে পরাস্ত করিলাম, এই বিংশ বৎসর পর্বতে, উপত্যকায়, শিবিরে, শত্রুমধ্যে, দিবসে, সায়ংকালে, গভীর নিশীথে চিন্তা করিয়াছি; আমি মরিলে সে হিন্দু ধর্মের, সে হিন্দু স্বাধীনতার, সে হিন্দু গৌরবের কি হইবে?"

এই ভাবাবেগপূর্ণ কথায়ও জয়সিংহ আদর্শভ্রষ্ট হননি। তাঁর বক্তব্য, সত্যপালন ধর্মরক্ষারই অঙ্গ। দেশের স্বাধীনতার জন্যও ধর্মভ্রষ্ট হওয়া যায় না। জয়সিংহ ভবিষ্যতের প্রতি ইঙ্গিত করে বলেছিলেন,

'ক্ষত্রিয়রাজ, চাতুরী যোদ্ধার পক্ষে সকল সময়ে নিন্দনীয়, কিন্তু মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে চাতুরী অধিকতর নিন্দনীয়।···অদ্য আপনি নগর লুণ্ঠন করিতে শিখাইতেছেন, কল্য তাহারা ভারতবর্ষ লুণ্ঠন করিবে, অদ্য আপনি চতুরতা দ্বারা জয়লাভ করিতে শিখাইতেছেন, পরে তাহারা সম্মুখযুদ্ধ কখনই শিখিবে না। যে জাতি অচিরে ভারতের অধীশ্বর হইবে, আপনি সেই জাতির বাল্যগুরু, গুরুর ন্যায় ধর্মশিক্ষা দিন।'

জয়সিংহ ও শিবাজীর কথোপকথনের দ্বারা রমেশচন্দ্র স্বাধীনতা আন্দোলনের ভিত্তি কত দৃঢ় হওয়া দরকার,—স্বদেশসেবকের আদর্শই বা কি হওয়া উচিত, এ সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন। শিবাজী একটি স্বদেশপ্রেমোদ্বেল জাতিকে পরিচালনা করেছেন। সমস্ত জাতি তাঁকে নেতৃত্ব দিয়েছে—সুতরাং নির্ভুল পরিচালনার ওপরেই শিবাজীর বর্তমান ও ভবিষ্যতের সাফল্য নির্ভর করছে। জয়সিংহ শিবাজীকে শুধু বর্তমান নয়, মারাঠা জাতির ভবিষ্যৎও চিন্তা করতে বলেছিলেন। জয়সিংহ শিবাজীকে সংগঠক হিসেবেই বিচার করেছিলেন, তাঁর দেশপ্রাণতার ওপর অপরিসীম শ্রদ্ধা ছিল বলেই তিনি সমালোচনা করেছেন তাঁকে নিপুণভাবে। শিবাজী অবশেষে জয়সিংহের পরামর্শ অনুসরণ করে আরংজীবের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করেছিলেন।

উপন্যাসের এই অংশটুকু ঔপন্যাসিক রমেশচন্দ্রের নয়, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, সত্যসন্ধী ঐতিহাসিকের সৃষ্টি। ইতিহাসের নির্ভুল সত্যকে অত্যন্ত নিপুণভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন রমেশচন্দ্র। এই অংশটি সম্পর্কে Bengalee পত্রিকা সমালোচনায় বলেছিলেন,

Characters drawn from history and characters drawn from the imagination are alike inspired by this noble feeling and Jay Singh and Sivaji display the same noble devotion to duty which inspires the younger heroes Surendra Nath or Raghunath Ji Havildar in their lifelong struggle and endeavour.

[Bengalee, the 15th March, 1879.]

রমেশচন্দ্র দেশপ্রেমের বাণী প্রচার করতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁর উপন্যাসের নায়ক চরিত্রে স্বদেশপ্রেমিকতা একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রূপেই অঙ্কিত হয়েছে।

'জীবনপ্রভাতে' রঘুনাথজীর চরিত্রে স্বদেশপ্রেমের অমলিন আদর্শ শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কল্পিত এই চরিত্রটিতে রমেশচন্দ্র দেশপ্রেমিকের নিষ্ঠা, দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাসের ছবি অঙ্কন করেছিলেন। বিশ্বাসঘাতক হিসেবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হলেও রঘুনাথ আত্মবিশ্বাস হারায়নি। যথার্থ স্বদেশপ্রেমিকের দৃঢ়তা নিয়েই লক্ষ্মীকে বলেছিলেন,—

"আমার জীবন আর নিরুদ্দেশ্য নহে, আমার হৃদয় উৎসাহ শূন্য নহে ; ভগবান সহায় হউন, রঘুনাথজী বিদ্রোহী নহে, ভীরু নহে, একথা এখনও প্রচার হইবে।"

এই পরিচ্ছেদে রমেশচন্দ্র ভারতপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। অবসন্ন রঘুনাথ যে বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন—সেখানেই ব্রাহ্মণগণ পুরাণপাঠে রত ছিলেন। সে প্রসঙ্গেই রমেশচন্দ্রের গভীর ভারতপ্রেম উচ্ছ্বসিত হয়েছে,—

"এখনও কাশী বা মথুরায় পুরাতন মন্দিরে সূর্যোদয়ে বা সুস্নিগ্ধ সায়ংকালে সহস্র ব্রাহ্মণে সেই অনন্ত পুরাণকথা ও বেদমন্ত্র পাঠ করেন।···সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরের ব্রাহ্মণেরা চারিদিকে উপবেশন করিয়া গম্ভীর স্বরে বেদপাঠ বা পুরাণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন, তখন আমি দেশকাল বিস্মৃত হই, আধুনিক সময় ও আধুনিক জীবনের ভীষণ গণ্ডগোল বিস্মৃত হই, হৃদয়ে নানা স্বপ্নের উদয় হয়, বোধ হয়, যেন সেই প্রাচীন আর্যাবর্তের মধ্যে বাস করিতেছি, চারিদিকে সেই পুরাকালের লোক, পুরাকালের সমাজ ও সভ্যতা, পুরাকালের শান্তি সুস্নিগ্ধতা।"

এখানে রমেশচন্দ্রের আত্মপরিচয়টিই যেন বিবৃত হয়েছে। এই ভারতপ্রীতি রমেশচন্দ্রের জীবনের প্রধান অবলম্বন ছিল। ইংরেজীতে তিনি ঋগ্বেদ, রামায়ণ, মহাভারতের অনুবাদ করেছিলেন এই প্রেরণা থেকেই। রমেশচন্দ্রের স্বদেশচেতনার মূলেও ছিল এই গভীর ভারতপ্রীতি, সেদিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর দেশপ্রীতিকে ভারতপ্রীতিরই নামান্তর বলা যেতে পারে। সেযুগের দেশভাবনা ভারতমহিমাকে নতুন করে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে,—ইতিপূর্বে ভারত-বিস্মৃতিই আমাদের সার্বিক অধঃপতন ঘটিয়েছিল বলা যেতে পারে। তাই স্বদেশপ্রেমিক মনীষীবৃন্দ দেশভাবনার অকৃত্রিম আবেগ ভারতচর্চার দ্বারাই নিঃশেষিত করেছিলেন। পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ ভারতবাসী যেদিন দেশপ্রেমের গভীর অনুভূতি লাভ করেছে, বর্তমান তাঁদের কাছে অন্ধকারময় কারাগার ; তাই অতীত ভারতচর্চার উন্মুক্ত ও প্রশস্ত পথটিই দেশপ্রেমিকের প্রধান অবলম্বন হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্য তাই বর্তমানের কথা নয়—অতীতেরই রোমন্থন। কাব্যে-নাটকে-উপন্যাসে অতীত ফিরে এসেছে বারবার। এছাড়া কোন উপায়ও ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত চেতনা

সেযুগের আর্তিকে অতীতের রঙ্গমঞ্চে আবিষ্কার করেছিল। দেশপ্রেমের অনুরূপ চেতনা ইতিহাসে মৃত অতীত হয়েই ছিল,—এতদিন সেকথা নিয়ে কাব্য-উপন্যাস লেখার তাগিদও ছিল না। যুগ প্রয়োজনে অতীত তার সমস্ত গৌরব ও গর্ব নিয়ে আমাদের সামনে দাঁড়িয়েছে। রমেশচন্দ্র ঐতিহাসিক উপন্যাসে ঠিক এই বক্তব্যই প্রকাশ করেছেন।

"পাঠক, একত্র বসিয়া এক একবার প্রাচীন গৌরবের কথা গাইব, আধুনিক রাজপুত ও মহারাষ্ট্রীয় বীরত্বের কথা স্মরণ করিব, কেবল এই উদ্দেশ্যে এই অকিঞ্চিৎকর উপন্যাস আরম্ভ করিয়াছি। যদি সেই সমস্ত কথা স্মরণ করাইতে সক্ষম হইয়া থাকি তবেই যত্ন সফল হইয়াছে,—নচেৎ পুস্তক দূরে নিক্ষেপ কর, লেখক তাহাতে ক্ষুণ্ণ হইবে না।"

উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য এত স্পষ্টভাবে বলার পরও আমাদেরও দিক থেকে আলোচনার আর কোন অসুবিধা থাকে না। স্বদেশচেতনাই এ উপন্যাস রচনার মূল প্রেরণা এবং তা প্রচারেই লেখকের সার্থকতা।

'মহারাষ্ট্র জীবন প্রভাত' শিবাজীর স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস, ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের আসন্ন আয়োজনে রমেশচন্দ্রের যথাশক্তি সংযোজন।

শিবাজী ধৃত হয়ে দিল্লী আনীত হলেন,—দিল্লীতে অতীতের হিন্দু মহিমার স্মৃতি নূতন করে উদ্দীপ্ত করেছিল তাঁকে। শিবাজীর দেশোদ্ধারের স্বপ্ন ও লেখকের স্বদেশব্রতের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা একসঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে যেন,—"সেদিন হিমালয় হইতে কাবেরী পর্যন্ত হিন্দু বীরগণ সবলহস্তে স্বাধীনতা রক্ষা করিত, হিন্দু ললনাগণ উল্লাসে স্বাধীনতা গান গাইত। কিন্তু স্বপ্নের ন্যায় সেদিন গত হইয়াছে, ঐ পুরাতন দুর্গের নিকট পৃথুরায় অন্যায় সমরে হত হইলেন, পুণ্য ভারতস্থান অন্ধকারে আবৃত হইল। দিবসের আলোক গত হয়, পুনরায় দিবস আইসে, শীতকালে বিলুপ্ত পত্র কুসুম বসন্তে অচিরে দেখা যায়, ভারতের গৌরবদিন কি আর দেখা দিবে না? একদিন ভরসা করিয়াছিলাম, সেই গৌরবের দিন আবার আসিবে, সে আশা কি ফলবতী হইবে?"

এ অংশে শিবাজীর স্বপ্ন ও রমেশচন্দ্রের আকাঙ্ক্ষা পৃথক করা যায় না। যে প্রেরণা একদিন মারাঠা শক্তিকে সাফল্য এনে দিয়েছিল তারই পুনর্জাগরণ রমেশচন্দ্রের অভিপ্রেত।

জয়সিংহের মৃত্যুর ঘটনাটিতে লেখক নাটকীয়ভাবে শিবাজীর কর্তব্য ও আদর্শের পরিবর্তনের কথা ঘোষণা করলেন। ভারতীয় আদর্শের জয়ঘোষণা ও স্বাধীনতার জন্য আসন্ন প্রস্তুতির নির্দেশটিও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। শিবাজী

হিন্দুর পুনর্জাগরণ ঘটাতে চেয়েছিলেন ; যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু জাতীয়তাবোধই সম্মিলিত দেশচেতনায় পরিবর্তিত হয়েছিল। শিবাজী যবন অত্যাচার দমন করতে চেয়েছিলেন,—রমেশচন্দ্র সমগ্র ভারতের আসন্ন স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি লক্ষ্য করেছিলেন। শিবাজীর সর্বশেষ ঘোষণাটি যে কোন স্বাধীনতা আন্দোলনের ধ্বনি হতে পারে,—

"চারিদিকে চাহিয়া দেখ, চারিদিক হিন্দু অবমাননা,—হিন্দুদেবের অবমাননা, দেবালয়ের অবমাননা। হিন্দুগণ, অদ্য আমরা এ অবমাননা দূর করিব ; এ শোক, এ অবমাননার যদি পরিশোধ থাকে, বীরগণ! রণরঙ্গে আমরা ইহার পরিশোধ করিব।"

রমেশচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাস চতুষ্টয়ের মধ্যে 'মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাতের' মৌলিকতা ও স্বদেশপ্রসঙ্গটি সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। কল্যাণকামী সাহিত্যিক রমেশচন্দ্রের সাহিত্যপ্রীতির প্রসঙ্গে জে, এন, গুপ্ত রমেশচন্দ্রের ইংরাজী জীবনী গ্রন্থটিতে যা বলেছিলেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য,—

"His own aim was to be a votary at the same shrine, and his proudest amibition was belong to "to that band of noble hearted patriots and gifted men who have taught us to regard our past religion and history and literature with legitimate and manly admiration. For our first and greatest indebtedness for the progress of this half-century is to those who have brought us to have faith in ourselves."[৩৫]

রমেশচন্দ্রের 'জীবন-প্রভাত' সম্বন্ধে অতি আধুনিক গবেষকও এই একটি মাত্র সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছিলেন,—

"রমেশচন্দ্র প্রমুখ সাহিত্যিকবৃন্দ দেশের প্রতি প্রবল অনুরাগ নিয়েই সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন।...মোঘল শাসনের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে প্রাচীন হিন্দু গৌরবকে পুনরুদ্ধার কাজে যে সমস্ত রাজা আপনাদের শক্তি নিয়োজিত করেছিলেন তাঁরা সকলেই লেখকের প্রশংসাভাজন হয়েছেন।...শিবাজীর মধ্য দিয়ে জাতীয় ঐক্য দৃঢ় হবে ; বৈদিক সভ্যতার অরুণোদয় ঘটবে, স্বাধীনতার মর্ম্মবাণীটি ধ্বনিত হবে এইটিই লেখকের কাম্য ছিল।...আনন্দমঠের আদর্শে রচিত রমেশচন্দ্রের এই উপন্যাসে সেই স্বদেশপ্রেরণার বীজ দেখতে পাই।"[৩৬]

৩৫. J. N. Gupta, Life and Works of Romesh Chandra Dutt, 1911.

৩৬. বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, রমেশচন্দ্র দত্ত, ১৯৬৩।

বস্তুতঃ রমেশচন্দ্রের সাহিত্য বিচারের প্রসঙ্গে তাঁর স্বদেশসাধনার উজ্জ্বলতাই সবার আগে চোখে পড়ে। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার মূলেও প্রধান ভাবে এই উদ্দেশ্যই [illegible]। এ ব্যাপারে বঙ্কিম[illegible] হিসেবেই রমেশচন্দ্রের নাম স্মরণযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের আশা সফল হয়েছিল,—'কমলাকান্তের [illegible] বয়সের কথায়' দুঃখ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র,—

"উৎসাহ আমার কাছে পণ্ডশ্রম—আশা আমার কাছে আত্মপ্রতারণা। কই আমার ত আশা ভরসা কিছু নাই।"

এ আক্ষেপটি কিছুটা ভিত্তিহীন। বঙ্কিমচন্দ্রই স্বদেশপ্রেম ও ইতিহাসপ্রীতি শিক্ষিত বাঙ্গালীর মজ্জায় ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর স্বপ্ন সফল হয়েছিলো এবং আশা আত্মপ্রতারণায় পর্যবসিত হয়নি। রমেশচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্রই উদ্দীপিত করেছিলেন সাহিত্য রচনায়।

রমেশচন্দ্রের শেষ ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজপুত জীবনসন্ধ্যা' রাজপুত কাহিনী অবলম্বনে রচিত। রাজপুত ইতিহাস তাঁর অন্য তিনটি ঐতিহাসিক উপন্যাসেও স্থান পেয়েছে।

রাজপুতের স্বদেশপ্রেম সমগ্র ভারতবাসীর অতি গর্বের বস্তু। স্বদেশপ্রাণ রমেশচন্দ্র, প্রসঙ্গরূপে রাজপুত মহিমার বিবরণ দিয়েছেন, অপ্রাসঙ্গিক হলেও রাজপুতের শৌর্য-বীর্য বর্ণনায় তিনি সর্বদাই আত্মহারা। 'মাধবীকঙ্কণে' রাজপুত ইতিহাস অবান্তর হলেও প্রাধান্য পেয়েছে। 'জীবন-প্রভাতে' মহারাষ্ট্র নায়ক শিবাজীর সঙ্গে মোঘল বিরোধের সম্ভাবনার কথা বলতে গিয়েও রাজপুত আদর্শ ব্যাখ্যা করছেন রমেশচন্দ্র। রাজপুতের সুপ্রাচীন স্বদেশপ্রেম মহিমার জয়ঘোষণাই এ উপন্যাসের মুখ্য ঘটনারূপে স্থান পেয়েছে। যশোবন্ত সিংহ ও জয়সিংহ, এ দুজন রাজপুত বীর মহারাষ্ট্র নায়ক শিবাজীর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সংশোধন করেছেন। রাজপুত মহিমা 'জীবন-প্রভাতে' নানাভাবে উচ্চারিত হয়েছে। মহাদেও যশোবন্তকে বলেছেন,—

'রাজপুতের গৌরবই অনাথ ভারতবর্ষের একমাত্র গৌরব। রাজপুতের যশোগীত আমাদের রমণীগণ এখনও গাইয়া থাকে, রাজপুত দিগের উদাহরণ দেখিয়া আমাদের বালকগণ শিক্ষিত হয়।'

এই ঐতিহ্যপূর্ণ রাজপুত ইতিহাস সে কালের শিক্ষিত স্বদেশপ্রাণ বাঙ্গালীর অতিপ্রিয় বস্তু ছিল। রমেশচন্দ্রও রাজপুত মহিমা বর্ণনার পবিত্র দায়িত্ব পালন করেছেন। মুগ্ধ দেশভক্ত-দেশসাধক প্রতাপসিংহের পবিত্র জীবনকথা পরিবেশন করেছেন এ গ্রন্থটিতে। উপন্যাসটিতে তিনি সে উদ্দেশ্যও ব্যক্ত করেছেন,

'পাঠক ! এ উপন্যাস কথা নহে. প্রতাপসিংহের বিস্ময়কর বীরত্বকথার নিকট উপন্যাসকথা কি ছার। কোন্ উপন্যাসে ইহা অপেক্ষা দুর্দমনীয় সাহস ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার—ইহা অপেক্ষা প্রকৃত দেশানুরাগ ও বীরত্বের পরিচয় পাইয়াছ? ভারতবর্ষের প্রকৃত গৌরবের কথা স্মরণ হইলে উপন্যাসকথা কি অসার বোধ হয়। আর্জুনির কথা কি অলীক বোধ হয় ? প্রতাপসিংহের বীরত্ব আলোচনা কর ; তিনি সপ্তরথীর সহিত যুদ্ধ করেন নাই, সপ্তকোটি লোকের অধীশ্বর আকবর সাহের সহিত একাকী যুঝিয়াছিলেন। তিনি একদিবস যুদ্ধ করেন নাই, পঞ্চবিংশ বৎসর অবিশ্রান্ত কন্দরবাসী ক্ষত্রিয় একাকী দেশরক্ষা ও স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিলেন। পঞ্চবিংশ বৎসর যুদ্ধের পর জীবনদান করিলেন ; স্বাধীনতা দান করেন নাই।'

প্রতাপের গৌরবগাথা 'জীবনসন্ধ্যার' বিস্তৃত বর্ণনায় স্থান পেলেও রাজপুত জাতি সম্পর্কে আরও অনেক লক্ষণীয় তথ্য এ গ্রন্থে বিবৃত করেছেন লেখক। রাজপুতগণ একদা পারস্পরিক অনৈক্যের মধ্যেই বসবাস করত। তেজসিংহের সঙ্গে দুর্জয়সিংহের বৈরিতা বংশগত। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা পালনের জন্যই দৃঢ়চিত্ত রাজপুত। চারনী দেবী বলেছেন,

'বংশানুগত শত্রুতা ও বৈরী রাজপুত ধর্ম। তিলকসিংহ ও দুর্জয়সিংহের বংশের মধ্যে বৈরী নির্বাণ হইবে না।.

কিন্তু বিদেশী শত্রুকে দমন করার জন্য এই গৃহকলহ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে পেরেছিল রাজপুতই। দুর্জয়সিংহ বলেছেন,—

'যতদিন শিশোদীয়ের একজন বীর জীবিত থাকিবে, যতদিন চন্দ্রাত্তয়ৎ ধমনীতে শোণিত প্রবাহিত হইবে, ততদিন বীরপ্রসবিনী মেওয়ারভূমি পরাধীনতার কলঙ্করেখা ললাটে ধারণ করিবেন না।'

রাজপুতের স্বদেশপ্রেম সমস্ত ব্যক্তিগত তুচ্ছতা ও বিবাদের ঊর্ধ্বে, রাজপুতের কাছে স্বদেশের মান সবার ওপরে। রমেশচন্দ্র এ অংশটিতে বারংবার একটি ধ্রুবপদ উচ্চারণ করেছেন,—"ক্ষতি নাই, প্রতাপসিংহ শিশোদীয়ের নাম রাখিবেন, প্রতাপসিংহ স্বদেশের স্বাধীনতা রাখিবেন।"

জীবনসন্ধ্যায় রাজপুতের পতনের বর্ণনা আছে। শুধু স্বদেশপ্রেম সম্বল করে প্রবল ও দুর্ধর্ষ শত্রুকে বাধা দেওয়া যায় না। প্রতাপসিংহের উত্তরপুরুষরা তাঁর ঈপ্সিত স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেননি। রমেশচন্দ্র সে অংশটুকু সচেতনতার সঙ্গে বর্ণনা করেছেন। প্রতাপসিংহের যোগ্য উত্তরপুরুষরা মৃত্যুপণ করে সংগ্রাম করেছিলেন,—কিন্তু সফল হননি,

"সে যুদ্ধ বর্ণনা করিতে আমরা অক্ষম ;—বর্ণনা করিবার আবশ্যকতাও নাই।

রাজপুতগণ মৃত্যু নিশ্চয় জানিলে মানরক্ষার জন্য কিরূপ যুদ্ধ করে, ইতিহাসের প্রত্যেক পত্রে তাহা বর্ণিত আছে। মনুষ্যের যাহা সাধ্য, রাজপুতগণ তাহা সাধিল, কিন্তু দশের সহিত একের যুদ্ধ সম্ভবে না ; রাজপুত হীনসংখ্য হইয়া ক্রমে হটিতে লাগিল।"

যুদ্ধের বিস্তৃত বর্ণনাটি বাদ দিয়ে রমেশচন্দ্র বিষয়টিকে আরও গভীরতা দিয়েছেন। রাজপুত শৌর্যের অবাস্তব ও কাল্পনিক বর্ণনা 'রাজসিংহের' পাঠককে ক্লান্ত করে। রমেশচন্দ্র এ ব্যাপারে মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন। তবে 'রাজসিংহের' উপন্যাস-গুণ 'জীবনসন্ধ্যাতে' অনুপস্থিত। রমেশচন্দ্র উপন্যাস হিসেবে ইতিহাসকথাই পরিবেশন করেছেন আগাগোড়া। দেশপ্রেমের গভীর আবেগে নীরস ইতিবৃত্তের মধ্যেও খানিকটা রসসঞ্চারিত হয়েছে মাত্র।

সাহিত্যক্ষেত্রে রমেশচন্দ্রের আবির্ভাবেরও আগে প্রতাপচন্দ্র ঘোষ 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' উপন্যাসটি শুরু করেছিলেন দুটি খণ্ডে। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার প্রেরণা সঞ্চার করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রই,—প্রতাপচন্দ্রও ইতিবৃত্ত অক্ষুণ্ন রেখে ঐতিহাসিক কাহিনী রচনারই পরিকল্পনা করেছিলেন। বাংলার বারো ভুইঞাদের অন্যতম বীর প্রতাপাদিত্যকে 'জাতীয় বীর'রূপে গণনা করার আবেগ সেযুগেই এসেছিল। কিন্তু ঔপন্যাসিক প্রতাপচন্দ্র প্রতাপাদিত্যের গৌরবের কাহিনীটুকুই অবলম্বন করেননি ঐতিহাসিকতাও অনুসরণ করেছিলেন। প্রতাপের স্বদেশপ্রেম, বীরত্ব, স্বাধীন রাজ্যস্থাপনের বাসনাকে উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করে ঔপন্যাসিক তাঁর স্বদেশপ্রেমেরই পরিচয় দিয়েছেন। প্রতাপাদিত্যের মূল ঐতিহাসিক কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন ইতিহাসপ্রেমী লেখক। আকবরের সঙ্গে যুদ্ধে তাঁর পরাজয় ঘটনাটিও মেনে নিয়েছিলেন। ইতিহাসের সত্যের প্রতি এ আনুগত্য রক্ষা করেই তিনি গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন,—'বঙ্গাধিপ পরাজয়' বা 'বঙ্গেশ বিজয়'। প্রতাপাদিত্যের শৌর্যবীর্য ও উচ্চকাঙ্ক্ষার বর্ণনাই গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল না ; প্রতাপাদিত্যের নিন্দনীয় ও গর্হিত কাজের সমালোচনাও করেছিলেন তিনি। গ্রন্থটির বিশেষত্ব এখানেই। জাতীয় আন্দোলনের পূর্বপ্রস্তুতি লগ্নে যে বায়বীয় উচ্ছ্বাস উপন্যাসে ও কাব্যে অতিমাত্রায় সোচ্চারিত হয়েছিল 'বঙ্গাধিপ পরাজয়'কে তার ব্যতিক্রম বলতে হবে। বঙ্কিমচন্দ্রই ইতিহাসের আধারে আদর্শ অনুসন্ধান করতে গিয়ে অতি উচ্ছ্বসিত হয়েছিলেন। এছাড়া উপায় ছিলো না তাঁদের।

প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে প্রথম স্তুতি রচনা করেছিলেন ভারতচন্দ্র। যবনলাঞ্ছিত বাংলাদেশে স্বাধীনচেতা প্রতাপাদিত্যকে যোগ্য সম্মান দিয়েছিলেন তিনি। মূল ঐতিহাসিক চরিত্র হিসেবে বিচার করলে মানুষ প্রতাপাদিত্যকে আমরা যেভাবে আবিষ্কার করি আদর্শের দৃষ্টিতে দেখলে তার সেই তুচ্ছতাটুকু ঢাকা পড়ে যায়।

বাংলা নাটকে স্বদেশপ্রেমের জোয়ার এসেছিল এই সব বীরচরিত্র অবলম্বন করেই—যাঁদের ঐতিহাসিকত্ব নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। সিরাজদ্দৌলা, মীরকাশেম, প্রতাপাদিত্য, মহারাজা নন্দকুমার, সীতারাম—আমাদের কল্পিত স্বদেশপ্রেমিক। এঁদের সামনে রেখেই আমরা দেশোদ্ধারের শপথ নিয়েছিলাম। কিন্তু সে আরও অনেক পরের কথা। প্রতাপাদিত্যকে 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' আমরা একটি সজীব চরিত্ররূপেই প্রত্যক্ষ করি। রাজনৈতিক জটিলতা, মানসিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ও উচ্চাশায় পীড়িত প্রতাপাদিত্যের জীবন কাহিনী শুনিয়েছেন লেখক। তবে ঔপন্যাসিকের ক্ষমতা দেখাতে পারেননি বলেই উপন্যাসটি সার্থক হতে পারেনি। প্রতাপাদিত্য অবলম্বনে অসফল এই একটিমাত্র উপন্যাস রচনা করেছিলেন তিনি। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্য কাহিনী নিয়ে উপন্যাস রচনা করেছিলেন, 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' সম্ভবতঃ তিনি পড়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সর্বপ্রথম এই উপন্যাসটিও বঙ্কিমপ্রভাবিত। তবে রবীন্দ্রনাথ প্রতাপাদিত্যের সাংসারিক জীবনই উপন্যাসে স্থান দিয়েছিলেন, রাজনৈতিক বিষয়কে প্রাধান্য দেননি। প্রতাপচন্দ্রের 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' প্রতাপাদিত্যের রাজনৈতিক জীবনাবর্তই প্রাধান্য পেয়েছে। প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে জ্বল স্বদেশপ্রেমের আবেগ ছিল, তিনি দেশের স্বাধীনতাকে অমূল্য সম্পদ বলে জ্ঞান করেছেন। পারিবারিক যে কলহের ফলে প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে নৃশংসতা, নিষ্ঠুরতা প্রত্যক্ষ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ প্রতাপচন্দ্র তাকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা করেছেন দেশানুরাগ ছিল বলেই প্রতাপচরিত্রের মর্যাদাও বাড়িয়েছেন লেখক। রবীন্দ্রনাথ 'বৌঠাকুরানীর হাটের' ভূমিকায় বলেছিলেন,—

"এই উপলক্ষে একটা কথা এখানে বলা আবশ্যক। স্বদেশী উদ্দীপনার আবেগে প্রতাপাদিত্যকে এক সময়ে বাংলা দেশের আদর্শ বীরচরিত্র রূপে খাড়া করবার চেষ্টা চলেছিল। এখনও তার নিবৃত্তি হয়নি। আমি সে সময়ে তাঁর সম্বন্ধে ইতিহাস থেকে যা কিছু তথ্য সংগ্রহ করেছিলুম তার থেকে প্রমাণ পেয়েছি তিনি অন্যায়-কারী অত্যাচারী নিষ্ঠুর লোক, দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মতো অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য তাঁর ছিল কিন্তু ক্ষমতা ছিল না। সে সময়কার ইতিহাস-লেখকদের উপরে পরবর্তীকালের দেশাভিমানের প্রভাব ছিল না। আমি যে সময়ে এই বই অসংকোচে লিখেছিলুম তখনও তাঁর পূজা প্রচলিত হয়নি।"

১৮৮৩ খৃঃ 'বৌঠাকুরানীর হাট' রচনাকালে রবীন্দ্রনাথ যে দেশাভিমান বর্জিত নিরপেক্ষ বিচার বুদ্ধির পরিচয় রেখেছিলেন—তা যুগ বিচারের পটভূমিকায় বিস্ময়কর বলতে হবে। দিল্লীশ্বরকে উপেক্ষা করবার মত ঔদ্ধত্য যে প্রতাপাদিত্যের ছিল—ঐতিহাসিকরা তা স্বীকার করেছিলেন। দেশপ্রেমিক লেখকের কাছে এই ঔদ্ধত্যই

দেশপ্রেমিকতা বলেই গৃহীত হয়েছিল; রবীন্দ্রনাথ তাকে নিছক অনভিজ্ঞ ঔদ্ধত্য বলেই ব্যাখ্যা করেছিলেন।

প্রতাপাদিত্য সম্পর্কে সত্য ইতিহাসের বিবরণ দিতে গিয়েও লেখক সম্প্রদায় যে প্রতাপের বীরত্বে ভাবাচ্ছন্ন হয়েছেন এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। বস্তুতঃ নৃশংসতা, অমানবিকতা ইত্যাদি চারিত্রিক ত্রুটিকে যদি আত্মস্বার্থের বাইরের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় তখনই কিছু মহত্ত্ব আবিষ্কার করা সম্ভব হতে পারে। প্রতাপাদিত্যের ইতিহাস রচনাকালে ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় সে চেষ্টাই করেছিলেন। প্রতাপের অমার্জনীয় অপরাধকে লঘু করার চেষ্টা না করেও কিছু প্রশংসা না করে পারেননি তিনি। এখানে ঐতিহাসিকের বিচারক্ষমতার সঙ্গে দেশপ্রেমিকের আগ্রহটিই বর্তমান। প্রতাপ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায় যে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন তাতে বসন্ত রায়ের সঙ্গে প্রতাপের সংঘর্ষ কাহিনীর মূলেও তিনি প্রতাপের স্বদেশানুরাগ লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর ভাবাবেগপূর্ণ উক্তিটি স্মরণীয়,

"বঙ্গভূমিকে স্বাধীনতার লীলানিকেতন করিবার জন্য তিনি অদম্য অধ্যবসায় আশ্রয় করিয়াছিলেন, বঙ্গবাসীর কাপুরুষ নাম অপনোদনের জন্য যিনি তাহাদের বাহুতে শক্তি দিয়াছিলেন, বাঙ্গালীর রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিবার জন্য যিনি আসমুদ্র বিজয়নিশান উড্ডীন করিয়াছিলেন তাহার গৌরব গীতি গাহিতে কাহার না ইচ্ছা হয়।"[৩৭] দস্যু ভবানীপাঠক ঔপন্যাসিকের কল্পনায় মহাপুরুষরূপে বন্দিত, অবাঙ্গালী সন্ন্যাসী সম্প্রদায় যখন স্বার্থরক্ষার জন্যই ইংরাজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল—বঙ্কিমচন্দ্র এই অবাস্তব ঘটনাকেও একটি সুউচ্চ ভাব ও মহিমময় আদর্শে সজ্জিত করেছিলেন—শুধু যুগ প্রয়োজনেই। প্রতাপচন্দ্রের মধ্যে নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকচেতনা থাকা সত্বেও তিনি রবীন্দ্রনাথের মত প্রতাপাদিত্যকে নিছক অত্যাচারীরূপে চিত্রিত করেননি। রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসের এই দৃঢ়ধারণা পরবর্তীকালের নাট্যকারও গ্রহণ করেননি। ক্ষীরোদপ্রসাদের 'প্রতাপাদিত্য' নাটকে প্রতাপাদিত্য জাতীয় বীরের প্রতিভূরূপেই গৃহীত হয়েছিলেন। ঐতিহাসিকতা ও দেশাত্মবোধের সঙ্গে যে সংঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিলো অধিকাংশক্ষেত্রেই ঐতিহাসিকতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে—দেশাত্মবোধের আবেগই জয়ী হয়েছে।

এ গ্রন্থে প্রতাপাদিত্যকে স্বাভাবিক ভাবেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও দেশপ্রেমী বলে প্রমাণ করেছেন লেখক। আকবরের সেনাপতি টোডরমল যশোহরের কর্তৃত্বভার অর্পণ করেছিলেন বসন্তরায়কে। প্রতাপ এ ঘটনাটিকে সম্পূর্ণ অন্যভাবে ব্যাখ্যা

৩৭. নিখিলনাথ রায়, প্রতাপাদিত্য, ১৯০৬, পৃঃ ৭৪।

করেছিলেন। প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে বিজয়কৃষ্ণের কথোপকথনকালে প্রতাপাদিত্য বলেছেন,—

"খুড়া বসন্তরায়ের রাজ্যকৌশল অতি হীনবৃত্তি লোকের মত ছিল। তিনি আপন ঘরের দ্বাররুদ্ধ করিয়া সিংহাসনে বসা সুখজ্ঞান করিতেন। তাহার কথা ছাড়িয়া দাও। তাঁহার মত কাপুরুষ যশোরের সিংহাসন আর কেহ অপবিত্র করে নাই। তিনি বিনাযুদ্ধে দিল্লীশ্বরকে পত্র লিখিয়া দিলেন ও তাহাকে সম্রাট বলিয়া স্বীকার করিলেন। যশোরের স্বাধীনতা এক কালে নষ্ট করিলেন।"[৩৮]

এখানে প্রতাপের স্বদেশচিন্তার প্রসঙ্গটি স্পষ্ট হয়েছে। যশোরের স্বাধীনতাকে তিনি অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু বলেই মনে করতেন। খুল্লতাতের সঙ্গে তাঁর মত পার্থক্যের হেতুটি যে স্বদেশপ্রীতি এ কথাটি লেখক স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রতাপাদিত্য স্বাধীন হিন্দুরাজ্যের আধিপত্য চেয়েছিলেন। বসন্তরায় তাঁর এই স্বদেশপ্রেমকে বুঝতে পারেননি। প্রতাপাদিত্য সে বিষয়টি স্পষ্ট করেছিলেন,—

"কাপুরুষেরা যুদ্ধকে ভয় করিয়া বুদ্ধিমানের কাজ করে ও সাহসী পুরুষকে অবোধ, গোঁয়ার বলে।"

প্রতাপাদিত্য নিজের আদর্শে অবিচল ছিলেন এবং দেশনিষ্ঠাই যে প্রতাপাদিত্যের শক্তি ও শৌর্যের মূলপ্রেরণা ছিল, উপন্যাস পড়লে এ ধারণাটি স্পষ্ট হয়। বসন্তরায়ের সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের বিরোধের মূলে স্বদেশচেতনা কল্পনা করেছিলেন বলে পাঠকের সমস্ত সহানুভূতি প্রতাপাদিত্যই লাভ করেন। পিতৃব্যহত্যার মূলেও যশোরের স্বাধীন নৃপতি হওয়ার বাসনাটিই প্রবল। প্রতাপাদিত্য চরিত্রের এই অমার্জনীয় অপরাধটিকে এইভাবে কিঞ্চিৎ লঘু করার চেষ্টা করেছিলেন লেখক। কিন্তু তাঁকে মহামানবরূপে বা অনিন্দনীয় চরিত্ররূপে দেখানোর চেষ্টা কোথাও নেই। উপন্যাসের শেষাংশে বিমলা প্রতাপাদিত্যকে সমালোচনা করে বলেছিল,—"আপনার পাপ আর সংসারে ধরে না। মহারাজ! আপনার দুষ্টবুদ্ধি আপনাকে কত শত ভয়ানক গর্হিত প্রায়শ্চিত্ত বিহীন পাপে লিপ্ত করিয়াছে তাহা অবগত নহেন।" [ঐ, পৃঃ ৩২৮]

ভালমন্দ মেশানো মানুষ হিসেবেই প্রতাপাদিত্য চরিত্রের কল্পনা করেছিলেন লেখক, অথচ তাঁর দেশচেতনা ও স্বাধীনতাপ্রীতি কোথাও অস্পষ্ট হয়নি, এখানেই গ্রন্থটির অভিনবত্ব। চরিত্রটির ঐতিহাসিক ভিত্তিকে অগ্রাহ্য না করেও প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে অসামান্য স্বাধীনচেতনার আরোপ করে আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ

৩৮. প্রতাপচন্দ্র ঘোষ, বঙ্গাধিপ পরাজয় বা বঙ্গেশ বিজয়, । ১৮৬৯—১৮৮৪

করেছিলেন লেখক। বিজয়কৃষ্ণ প্রতাপাদিত্যকে দ্বাদশ সূর্যের একজন বলে প্রশংসা করেছিলেন। তাঁর উত্তরে ক্ষুব্ধ প্রতাপাদিত্য বলেছিলেন,—

"এখন দ্বাদশমাত্র রাজত্বের চিন্তা করিতে হয়, যথেষ্ট জ্ঞান করিলে, কিন্তু বিবেচনা করিলে না যে, প্রতাপাদিত্যের মন ভারতবর্ষ এককালে গ্রাস করিতে সমর্থ।—আমি যতদূর পর্যন্ত মনপটে দেখিতে পাই, তাহার মধ্যে অপর কাহার শাসন আমার যেন হৃদে শেলমত লাগে। আমার তাহা সহ্য হয় না।···যুধিষ্ঠিরের সিংহাসনে যে বিদেশীয় যবন বসিবে, ইহা আমার অসহ্য। পৃথুরাজ চৌহান 'যে ছত্র শিরে ধারণ করিয়াছিলেন, সে ছত্র অশ্বামাংসলোলুপ, বাসহীন, অসভ্য তাতারে অধিকার করে এ কোন সৎ হিন্দুর বক্ষে সহে?"

এই উক্তি স্বদেশপ্রেমিক প্রতাপাদিত্যের পূর্ণ পরিচয় উদ্ঘাটন করেছে বলা যায়। বারো ভুইঞাদের মধ্যে প্রতাপাদিত্যই মোঘল শাসনে সন্তুষ্ট ছিলেন না। বিদেশী শাসনমুক্ত হবার শক্তি হয়ত তাঁর ছিল না,—কিন্তু বাসনা ছিল। পরাধীনতার গ্লানির মধ্যেই স্বদেশপ্রীতির অমলিন প্রকাশ। 'বঙ্গাধিপ পরাজয়ে' প্রতাপাদিত্য চরিত্রে এই সত্যটিই লেখক অকুণ্ঠচিত্তে প্রচার করার আয়োজন করেছিলেন।

প্রতাপাদিত্যকে বঙ্গের শেষবীর রূপে প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে হারাণচন্দ্র রক্ষিত লিখেছিলেন 'বঙ্গের শেষবীর'। রবীন্দ্রনাথের 'বৌঠাকুরানির হাট' প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। এখানেও প্রতাপাদিত্যের রাজনৈতিক জীবন উপন্যাসের উপজীব্য হয়েছে। প্রতাপাদিত্যের চরিত্রে যুগোপযোগী ভাব আরোপ করে উচ্ছ্বসিত হতে চেয়েছিলেন সেযুগের স্বদেশপ্রেমী লেখকসম্প্রদায়।

বাংলা সাহিত্যের সার্থক মহিলা ঔপন্যাসিক রূপেই নয় স্বদেশচেতনা নিয়ে উপন্যাস রচনা করার প্রথম গৌরবও আমরা স্বর্ণকুমারী দেবীকেই দিতে পারি। স্বর্ণকুমারী দেবী যে পরিবেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন—সাহিত্যপ্রতিভা কিংবা দেশচেতনা সেই পরিবেশেই লালিত হতে পারে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কন্যা, দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্র-নাথের ভগিনী, রবীন্দ্রনাথের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য প্রতিভা তাঁর সহজাত গুণ। কিন্তু দেশচেতনাটি তিনি পরিবেশ থেকেই লাভ করেছিলেন। বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনে ঠাকুর পরিবারের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। মহর্ষি দেশপ্রাণ ছিলেন,—তাঁর সবকটি সন্তানের চরিত্রেই এই দেশবোধ, স্বাজাত্যপ্রীতি দেখতে পাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের মধ্যে এই দেশচেতনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। সাহিত্যরচনায়, হিন্দুমেলা উপলক্ষে, স্বদেশী ব্যবসা গড়ে তোলার আপ্রাণ চেষ্টায় জ্যোতিরিন্দ্রনাথ অগ্রণী ছিলেন। বাংলায় স্বদেশপ্রেমের নাটক লিখে তিনিই মঞ্চকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবী এমন একটি পরিবেশেই বড়ো হয়েছিলেন

১৮৬৭ সালে হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে যে স্বদেশীয়ানার জোয়ার দেখা দিয়েছিল স্বর্ণকুমারী দেবী সে উত্তেজনায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রবেশের বহুপূর্বেই তিনি সাহিত্যজগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। সুতরাং স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল বলা যায়। সেযুগের সচেতন লেখিকা হিসেবে তিনি বাংলাদেশের সাহিত্য পরিমণ্ডলের মূল ভাবটিই অনুসরণ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ভাল লেখিকাই শুধু নন—বাংলা সাহিত্যের প্রথম স্বদেশ সচেতন লেখিকা হিসেবেই স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য বিচার চলতে পারে।

১৮৭৬ সালে স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' প্রকাশিত হয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস রচনা প্রসঙ্গে সমালোচক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সাহিত্য সাধক চরিতমালায় বলেছিলেন,—

"স্বদেশপ্রেমই স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য সাধনার উৎস।...এই স্বদেশপ্রেমই তাঁহার প্রায় সকল রচনাতেই লক্ষ্যণীয়।"—স্বদেশভাবনা তাঁর সমগ্র রচনায় কিছু পরিমাণে আছে বলেই নয়, স্বর্ণকুমারী দেবীর সমগ্র জীবন পর্যালোচনা করলেও আমরা তাঁর স্বদেশচিন্তার একটি স্বতোপ্রবাহিত ধারা লক্ষ্য করি। সংবাদপত্র পরিচালনায়, সখী সমিতি সংগঠনে ও মহিলা শিল্পমেলার প্রবর্তনেও তাঁর স্বদেশসেবার পরিচয় পাই 'ভারতী'র সার্থক সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী দীর্ঘকাল একটি প্রথম শ্রেণীর সাহিত্য পত্রিকা প্রচার করেছিলেন যোগ্যতার সঙ্গে। পত্রিকা সম্পাদনায় প্রথম বাঙ্গালী মহিলা ছিলেন তিনি। 'ভারতী' সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে বিশেষ সুনাম অর্জন করেছিল সেযুগে। সেযুগের ভাবান্দোলনেও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিল এই পত্রিকাটি। সুতরাং 'ভারতী'র সম্পাদিকা স্বর্ণকুমারী দেবী এই গৌরবের অংশভাগিনী। এ সম্বন্ধে কোনো সমালোচক বলেছেন,—

"ভারতীর" মূল উদ্দেশ্য ছিল দেশের শিল্প সংস্কৃতিকে নূতন করে পরিবেশন করা দেশচর্চার এই ব্রত স্বর্ণকুমারী সযত্নে পালন করেছেন।"[৩৯]

স্বর্ণকুমারী দেবীর জীবনাদর্শ ও সাহিত্যপ্রতিভা এই পত্রিকাটিকে কেন্দ্র করে উচ্ছ্বসিত হয়েছিল। সহজাত সাহিত্যপ্রতিভা ও দেশচেতনা তাঁর সাহিত্যজীবনকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিল বলা যায়।

স্বর্ণকুমারী দেবী উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ থেকে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত সাহিত্যসেবায় ব্রত ছিলেন। তাঁর প্রথম যুগের লেখা উপন্যাস আমাদের আলোচনায়

৩৯. বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, স্বর্ণকুমারী দেবী, ১৯৬৩।

স্থান পাবে। তাঁর প্রথম যুগের উপন্যাসে দেশপ্রেমের যে উজ্জ্বল প্রকাশ লক্ষ্য করি পরবর্তীকালের রচনায় তা আরও স্ফীত হয়েছিল। স্বদেশচিন্তা কোন কোন উপন্যাসে হয়ত প্রসঙ্গতই এসেছে,—কোথাও তা অপ্রাসঙ্গিক ও গৌণ। তবু দেশচর্চার কথা একেবারে বাদ দিয়ে লেখিকা কিছু চিন্তা করতে পারেননি। স্বর্ণকুমারী দেবী গতানুগতিক রীতি অনুসরণ করেই উপন্যাসের ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র জনচিত্তজয়ী ঔপন্যাসিক,—তাঁর প্রভাব অনতিক্রম্য ছিল সেকালে। রমেশচন্দ্রও স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত, স্বর্ণকুমারী দেবীর ওপরে এঁদের প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের মত স্বর্ণকুমারী দেবীও ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস রচনা করে দেশপ্রেম প্রকাশ করেছিলেন। ১৮৭৬ থেকে ১৮৯৮ সালের মধ্যে প্রকাশিত স্বর্ণকুমারী দেবীর আটখানি উপন্যাসের মধ্যে চারখানি উপন্যাসেই তিনি ইতিহাস অনুসরণ করেছিলেন। তাঁর প্রথম উপন্যাসে ভারতবর্ষে প্রথম যবনাধিকারের কাহিনী স্থান পেয়েছে। 'দীপনির্বাণ' নামকরণের মাধ্যমে তিনি ভারতের সর্বপ্রথম আর্য গৌরবের পতনের কথাই বলতে চেয়েছেন। 'মিবাররাজ' ও 'বিদ্রোহ'—রাজপুত ইতিহাস অবলম্বনে রচিত। 'ফুলেরমালায়' রাজা গণেশদেবের কাহিনী স্থান পেয়েছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্রের নির্দেশিত পথে বিচরণ করলেও কাহিনী নির্বাচনে ও ইতিহাস নির্বাচনে তিনি স্বকীয় মৌলিকত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। রাজপুত ইতিহাসের নির্বাচনেও তিনি মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন। রাজপুত ইতিহাসের আদিযুগে ফিরে গেছেন লেখিকা। প্রচলিত রাজপুত চরিত্র নির্বাচন করেননি তিনি। বাংলার ইতিহাস থেকেও তিনি যে অধ্যায়টি বেছে নিয়েছিলেন তাতেও তাঁর যথেষ্ট কল্পনাশক্তি ও বৈচিত্র্যের সন্ধান মেলে। ইতিহাসের পটভূমিকায় দেশচেতনা যে অবাধে প্রকাশ করা চলে এ রহস্যটি তিনি হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বলেই সম্ভবতঃ ইতিহাসের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু সামাজিক উপন্যাসেও দেশপ্রেম প্রসঙ্গের অবতারণা করা লেখিকার বিশিষ্টতার পরিচায়ক। বঙ্কিমচন্দ্রও সামাজিক উপন্যাসে দেশকথা উহ্য রেখেছিলেন,—স্বর্ণকুমারী এ ব্যাপারে অনেক বেশী অগ্রসর ছিলেন। ছিন্ন মুকুল [১৮৭৯] ও স্নেহলতা [১৮৯০] উপন্যাসে তিনি অবাধে দেশপ্রেম প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন।

স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস 'দীপনির্বাণ' তাঁর দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ মনটিকে চিনিয়ে দেয়। উৎসর্গ পত্রে তিনি লিখেছিলেন,

"আর্য—অবনতি-কথা, পড়িয়ে পাইবে ব্যথা,
বহিবে নয়নে তব শোক অশ্রুধার,
কেমনে হাসিতে বলি, সকলি গিয়েছে চলি,
ঢেকেছে ভারত ভানু ঘন মেঘজাল,
নিভেছে সোনার দীপ ভেঙ্গেছে কপাল।"

এ অংশের বক্তব্যটি লেখিকার স্বদেশপ্রাণ অন্তরেরই কথা। ভারতবর্ষের পরাধীনতার চেতনা সেযুগের সমস্ত দেশপ্রেমীদের বেদনাহত করেছিল, স্বর্ণকুমারী দেবীও তা মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। বাংলা কাব্য-নাটক-উপন্যাসে এই চেতনাটিই নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করতে চেয়েছে বারবার। ভারতের বর্তমান দুরবস্থায় তিনি ক্রন্দন কাহিনীই শোনাতে পারেন, আনন্দের বার্তা শোনানোর ক্ষমতা তাঁর নেই।

'দীপনির্বাণ'—কাহিনীতে প্রথম যবন আক্রমণের মুহূর্তটি চিত্রিত হয়েছে। মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে দিল্লীর সম্রাট পৃথিরাজের সংঘর্ষ কাহিনীই স্থান পেয়েছে এখানে। হিন্দু শৌর্যবীর্যের ও হিন্দু স্বাধীনতা অবলুপ্তির মর্মান্তিক চিত্রটি অশেষ যত্নে ফুটিয়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন লেখিকা।

দিল্লীর সম্রাট পৃথিরাজের সঙ্গে মহম্মদ ঘোরীর সংঘর্ষ কাহিনীটি পরিবেশন করেছেন লেখিকা। হিন্দুসম্রাট পৃথিরাজ সংগ্রামে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন কিন্তু আত্মরক্ষা করতে পারেননি, ভারতের স্বাধীনতাসূর্য অস্তমিত হয়েছিল। কাহিনীটিতে স্বদেশ-ভাবনা প্রকাশের অবকাশ রয়েছে প্রচুর। প্রতিটি চরিত্রই দেশাত্মবোধে সচেতন ও সজীব। দেশের দুর্দিনে দেশরক্ষার চেয়ে বড়ো কর্তব্য অন্য কিছু থাকতে পারে না, একথা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন লেখিকা। রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি প্রত্যেকেই দেশসচেতন ও দেশপ্রাণ, তথাপি তাঁদের পরাজয় ঘটেছে। পক্ষান্তরে যবনকে ভাবে চিত্রিত করে লেখিকা কিছুটা স্বপক্ষপ্রীতি প্রচার করেছেন। দেশপ্রেমই নানা ভাবে প্রকাশের পথ খুঁজেছে মাত্র।

দেশপ্রেমের আদর্শেই চরিত্রগুলোকে রূপ দেবার প্রকট চেষ্টা সর্বত্র চোখে পড়ে উপন্যাসের প্রারম্ভে, মন্ত্রীপুত্র বিজয়সিংহ প্রেমিকা রাজকন্যাকে যবন আগমনের সংবাদ দিয়েছে,—কিন্তু রাজকুমারী উষাবতীর স্বদেশচেতনার পরিচয় দেওয়াই লেখিকার উদ্দেশ্য ছিল। উষাবতী উত্তরে বলেছে—

'যদি এখনই কেহ আসিয়া বলে, 'তোমার মৃত্যু হইলে দেশরক্ষা হয়', দেখিবে আমি তৎক্ষণাৎ মরিতে পারি কি না। তোমার মত আমি স্বদেশ অপেক্ষা প্রাণকে অধিক মূল্যবান মনে করি না।'[৪০] ঊনবিংশ শতাব্দীতে নাটক ও উপন্যাসে এ জাতীয় স্বদেশপ্রাণ নায়ক নায়িকার সাক্ষাৎ পেয়েছি আমরা। এঁদের চরিত্রে স্রষ্টার মনোভাবের প্রতিফলন পড়েছে বলেই চরিত্রগুলোর স্বাভাবিকত্ব রক্ষার প্রতি সাময়িক অন্যমনস্কতা ধরা পড়ে। লেখিকা এখানে একটি জীবন্ত রাজকন্যা অঙ্কনের দিকে দৃকপাত করেননি—কিন্তু স্বদেশবৎসল একটি নায়িকাকেই কল্পনানেত্রে প্রত্যক্ষ করেছেন। রাজকুমারী উষাবতীর চরিত্রেও স্বদেশপ্রেমই সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল, ব্যক্তিগত

৪০. স্বর্ণকুমারী দেবী, দীপনির্বাণ, ১৯০৮

প্রেম ভালবাসাকে তুচ্ছ মনে করেন রাজকন্যা,—স্বদেশপ্রীতিকেই সবার উপরে স্থান দেন। প্রেমিক বিজয়সিংহকে উৎসাহ দেবার জন্য উষাবতী বলেন,

"তুমি রুষের ন্যায় পলায়ন করা অপেক্ষা রণে যদি মরিতে, তাহা হইলে আমি তোমাকে অধিক ভালবাসিতাম। আমার ভ্রাতা নাই, তোমার মৃত্যুর পর তোমাকে বীরভ্রাতাজ্ঞানে তোমার জন্য কাঁদিতাম—কাঁদিতেও আমার আহ্লাদ হইত। বলিতে পারিতাম, আমার বীরভ্রাতা দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন।"

মহিলা লেখিকা স্বর্ণকুমারী নারীর চরিত্রেও স্বদেশপ্রেম কতখানি দৃঢ়মূল হতে পারে—সেকথাটি উষাবতীর চরিত্রের মাধ্যমে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। 'পুরুবিক্রম' নাটকের ঐলবিলার চরিত্রে আমরা এ জাতীয় স্বাজাত্যবোধের তীব্র চেতনা লক্ষ্য করেছি। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে কিংবা রমেশচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমভিত্তিক উপন্যাসে ঠিক এ জাতীয় চরিত্র নেই। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠের' শান্তিকেও নিছক স্বদেশপ্রাণ হিসেবে চিত্রিত করেননি,—শান্তিকে তিনি আরও বহুতর গুণে সমৃদ্ধ করে এঁকেছিলেন, কিন্তু উষাবতী নিছক স্বদেশপ্রাণা। বিদেশী আক্রমণকারীকে বাধা দেবার শক্তিও তাঁর নেই—আছে শুধু দেশের জন্য জীবনদানের অটুট সঙ্কল্প। জীবনের মূল্যে স্বদেশকল্যাণ সাধনের মহৎ ইচ্ছাই উষাবতীকে চঞ্চল করেছে, স্বদেশ-প্রেমিক লেখিকার কল্পনায় উষাবতীর অন্য কোন পরিচয় নেই। সেযুগের জাতীয় ভাবান্দোলনে আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ নারীসম্প্রদায়কে এমনি করেই অনুপ্রাণিত করেছিলেন লেখিকা। 'দীপনির্বাণ' স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রথম উপন্যাস বলেই আদর্শ-বাদের এমন অকপট চিত্র এ উপন্যাসে পাওয়া যায়। এ সম্পর্কে কোন সমালোচক যথার্থই বলেছিলেন,

"স্বর্ণকুমারীর জীবনে এই সময়ে বিপ্লবের কিংবা আন্দোলনের ঢেউ কতখানি পৌঁছেছিল জানি না, কিন্তু হিন্দুমেলার আঁচ তাঁকেও স্পর্শ করেছিল। জাতীয়তার উদ্‌বোধনের একটি অঙ্গ ছিল প্রাচীন শৌর্য বীর্যগাথা উদ্ধারে, তাদের নব পরিবেশনে। হিন্দুমেলার মধ্য দিয়ে তাকেই নূতন করে অনুভব করা গেল। স্বর্ণকুমারী দেবী এ ন্যাশন্যাল জোয়ারে নিজেকেও যুক্ত করেছিলেন। কর্মে কতটা জানি না, কিন্তু চিন্তায় তিনি এঁদেরই সগোত্র। দীপনির্বাণ তার প্রমাণ। পরাধীনতার বেদনা স্বর্ণকুমারী দেবীকেও স্পর্শ করেছিল।"[৪১]

'দীপনির্বাণের' উষাবতী চরিত্রে আমরা লেখিকার মনকেই প্রতিবিম্বিত হতে দেখি। স্বর্ণকুমারী দেবীর মৌলিকত্ব এই যে—উপন্যাসটিতে দেশকথা সমস্ত জটিলতা

৪১. বিজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, স্বর্ণকুমারী দেবী ১৯৬৩।

ভেদ করেও দীপ্যমান। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশচর্চা তাঁর অন্যান্য বক্তব্যের সঙ্গে, উপদেশের সঙ্গে সংমিশ্রিত হওয়ার ফলে তত্ত্ববাহুল্য দেশপ্রেমকে গ্রাস করেছে। সেখানেই অবশ্য শিল্পী বঙ্কিমের কৃতিত্ব, স্রষ্টা বঙ্কিমের সাফল্য। কিন্তু স্বর্ণকুমারী দেবী সহজকথাকে অধিকতর সহজভাবেই পরিবেশন করেছিলেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রে দেশপ্রীতিই প্রধান অবলম্বন। বহু বক্তব্য একটি চরিত্রের আধারে স্থাপন করে শৈল্পিক কলাকৌশল প্রদর্শনের জটিল পন্থা তিনি অনুসরণ করেননি বলে তাই আক্ষেপ করি না।

বিজয়সিংহের পিতা বৃদ্ধ মন্ত্রী অমরসিংহকেও দেশপ্রাণ মনে করা যায়। রাজ্যের বিপদে স্বীয় পুত্রকে তিনি অভয় দিয়ে গুরুতর রাজকর্মে পাঠাচ্ছেন। স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,—

"তুমি যদিও আমার প্রাণ অপেক্ষা প্রিয়, তথাপি স্বদেশের হিতের নিমিত্ত তোমাকেই প্রেরণ করিতেছি—দেশের জন্য এই বৃদ্ধ বয়সে একমাত্র পুত্রকেও হারাইতে স্বীকৃত হইতেছি।"

এ স্বদেশপ্রেম উনবিংশ শতাব্দীতে বহুভাবে ধ্বনিত হতে শুনেছি, স্বর্ণকুমারীকে এই নির্ভীক দেশপ্রাণতাই প্রেরণা দিয়েছে সাহিত্য রচনায়। সমরসিংহ ও পৃথিরাজের নেতৃত্বে যবনের সঙ্গে যুদ্ধ যখন আসন্ন, লেখিকা অত্যন্ত ভাবাবেগপূর্ণ ভাষায় উৎসাহিত করেছেন তাদের,

"সৈন্যগণ। যদি তোমরা আর্যনামের গৌরব রক্ষা করিতে চাও, যদি ক্ষত্রিয় নামের গৌরব রক্ষা করিতে চাও, যদি যবন পদদলিত হইতে বাসনা না থাকে, যদি তোমাদের প্রাণসম স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদিগকে নিষ্ঠুর যবনপীড়ন হইতে রক্ষা করিতে ইচ্ছা থাকে, যদি হিন্দুধর্মের প্রতি, হিন্দু-মঠ-মন্দিরের প্রতি তোমাদের কিছুমাত্র শ্রদ্ধাভক্তি থাকে, যদি দেবী আশাপূর্ণার আশাপূর্ণ করা তোমাদের গৌরব বলিয়া মনে হয়,—তবে আর বিলম্ব করিও না, পাষণ্ডদিগকে এমন শাস্তি দাও, যেন তাহারা সিন্ধুনদ অতিক্রম করিতে আর সাহসী না হয়।"

—এ অংশটিতে ইতিহাসের পটভূমিকায় বর্তমানের প্রস্তুতিকেই যেন আহ্বান জানিয়েছেন লেখিকা। ধর্মের নামে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার আবেদন সেকালের প্রথা বলে মনে করা যায়। সেযুগের ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্রে এর চেয়ে বড়ো শক্তি আর অন্য কিছুই নেই,—সেযুগের সমস্ত দেশপ্রেমের ভিত্তিতেই তাই ধর্মের অস্তিত্ব কল্পনা করা হোত, এযুগে তারই নতুন নাম দেওয়া হয়েছে মানবতাবোধের আহ্বান।

স্বর্ণকুমারী দেবী সনাতন হিন্দুধর্মের নামেই যুদ্ধ আহ্বান করেছিলেন। হিন্দুশক্তির পতনের অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি যবনের কূটবুদ্ধি ও ধূর্ততার কথা বলেছেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামে হিন্দুরা শক্তিপ্রদর্শন করেছে—কোনো অসৎপথ অবলম্বন করেনি

তারা। আত্মদানের মহিমায় তারা উজ্জ্বল। অন্যদিকে কূটনীতিক মহম্মদ ঘোরী বলেছে,—

"ধর্মনিষ্ঠ অথবা নির্বোধ হিন্দুদিগকে ন্যায়যুদ্ধে পরাজয় করিতে চেষ্টা করা আর প্রবল অগ্নিতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া অগ্নি নিভাইতে যাওয়া উভয়ই সমান—এরূপ স্থলে শঠতা ভিন্ন আমাদের অন্য অস্ত্র নাই। হিন্দুদের অন্য বিষয়ে যতই বুদ্ধি থাকুক ধূর্ততায় আমরা তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিব; এই বিশ্বাসে ভর করিয়াই আমরা এখানে আসিয়াছি।"

লেখিকার স্বাজাত্যবোধই এই বিদ্বেষের মূলে বিরাজমান। সে যুগে শত্রুকে ঘৃণা করার মত উত্তেজনাসঞ্চারী ভাবসৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন সাহিত্যিক-বৃন্দ—সাহিত্যে এ চেষ্টাই বিদ্বেষরূপে প্রকাশ পেয়েছে। মুসলমান বা যবন নয় দেশপ্রেমিকের চোখে দেশের শত্রুর চরিত্র একই ভাবে চিত্রিত হয়েছে বলেই শত্রু সর্বদাই নিন্দিত। স্বর্ণকুমারী দেবীর স্বদেশচেতনায় অকপট সরলতা চোখে পড়ে। শত্রুদমনের উল্লাসে বিজয়সিংহকে উন্মত্ত হতে দেখি, পৃথিরাজের জয়ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুশক্তির মহিমাজ্ঞাপন ও শত্রুবিদ্বেষ প্রচার করেছে সে উদ্দীপনাময়ী ভাষায়,—

"যবনদিগের আবার ইচ্ছা কি। যখন তাহারা অহংকারে মত্ত হইয়া পুণ্যভূমি আর্যাবর্তকে তাহাদের ম্লেচ্ছ পদস্পর্শে কলঙ্কিত করিতেও স্পর্ধিত হইয়াছে, তখন তাহাদের ইচ্ছা থাকুক বা নাই থাকুক, আমরা যুদ্ধে সমুচিত দণ্ড বিধান করিয়া তাহাদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিব। যবনদিগকে আবার ক্ষমা কি? বৈরনির্যাতনে অমায়িকতা কি?"

স্বাধীনতা আন্দোলনে এই জাতীয় উত্তেজনাময় বক্তৃতার প্রয়োজনীয়তা ছিল—এভাবে স্বর্ণকুমারী দেবী নিপুণ ভাষায় স্বদেশচেতনা সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। বৈরনির্যাতনে যে অমায়িকতা থাকতে পারে না,—এ সত্যটি স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

শেষ পর্যন্ত পৃথিরাজের পরাজয় হয়েছে,—এ পরাজয়ে লেখিকার খেদ ও আন্তরিক বিলাপ ধ্বনিত হয়েছে। ভারতবর্ষের হিন্দু স্বাধীনতা বিলুপ্তির বেদনায় লেখিকা মুহ্যমান।

"চির প্রজ্জ্বলিত দীপ এইবার নির্বাণ হইল। আর্যগৌরবসূর্য আজ অস্তমিত হইল, ধর্ম আজ অধর্মের নিকট পরাস্ত হইলেন, ভারতবর্ষ আজ বিষাদ অন্ধকারে মগ্ন হইল। বাসুকি সহস্র মস্তকে ব্যথিত হইল—আসমুদ্র ভারতবর্ষ কম্পিত শিহরিত হইয়া উঠিল—স্বাধীনতা অনন্ত মূর্চ্ছায় মূর্চ্ছিত হইলেন—দীপনির্বাণ হইল।"

ভারতবর্ষের হিন্দু স্বাধীনতা বিলুপ্তির অধ্যায়কে উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসেবে

নির্বাচন করেই স্বর্ণকুমারী যথেষ্ট মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন। হিন্দু স্বাধীনতার অবলুপ্তি লগ্নটিতে স্বদেশপ্রেম প্রকাশের যে অবকাশ রয়েছে—সেটুকু তিনি নির্ভুল ভাবে নির্বাচন করেছিলেন। স্বর্ণকুমারী দেবীর দ্বিতীয় উপন্যাস 'ছিন্নমুকুল' ১৮৭৯ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। এ উপন্যাসটিতে স্বর্ণকুমারী আধুনিক জীবন কাহিনী অবলম্বন করেছিলেন, যদিও উপন্যাসের ঘটনাসন্নিবেশে রূপকথাসুলভ রীতিই প্রাধান্য পেয়েছে। বোম্বাই-এলাহাবাদ-কলিকাতা জুড়ে ঘটনাস্থল পরিকল্পিত হয়েছে, অবাস্তব আবহাওয়ায় চরিত্রগুলো ভেসে বেড়াচ্ছে। তবু এই উপন্যাসের একটি চরিত্র সম্বন্ধে লেখিকা কিছু লক্ষ্যণীয় মন্তব্য করেছেন ;—যেখানে স্বদেশপ্রেমই প্রকাশিত হয়েছে মনে করা যায়। প্রমোদের বন্ধু যামিনীনাথ সম্বন্ধে লেখিকা যে মন্তব্য করেছেন—সে যুগের দেশানুরাগী যুবকদের সম্পর্কে সেটা প্রযোজ্য হতে পারে। যামিনীনাথের বাল্যজীবন বর্ণনায় তিনি বলেন,

"যামিনীনাথ বিদেশীয় রীতিনীতি ও আচার ব্যবহারের বড় বিদ্বেষী ; ভালই হোক আর মন্দই হোক এ সকলের প্রতি তাহার দারুণ ঘৃণা। এমনকি বিদেশীয় ভাষা আর শিখিবেন না বলিয়াই তিনি স্কুল ত্যাগ করেন।"[৪২]

যে সমাজে স্বর্ণকুমারী বর্ধিত হয়েছিলেন—দেশচেতনা সে পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ; স্বর্ণকুমারী জন্মসূত্রেই দেশপ্রেমের দ্বারা প্রভাবিত। 'ছিন্নমুকুল' তিনি দেশপ্রেমী নাট্যকার জ্যোতিরিন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করেছিলেন। দেশাভিমান সে যুগের শিক্ষিত ও আলোকপ্রাপ্ত মানুষের সবচেয়ে বড়ো চরিত্র সম্পদ। দেশপ্রেম যেমন অসাধারণ-সাধারণ সমস্ত লেখকের রচনায় প্রেরণা এনে দিয়েছে—তেমনি সামাজিক জীবনেও দেশপ্রেমের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে সর্বসাধারণ। সে যুগটিকে তাই 'ন্যাশানালইজমের' যুগ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। একটি আধুনিক যুবকের জীবনসমস্যা যে উপন্যাসে স্থান পেয়েছে,—সেখানেও তাই দেশপ্রেম প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন লেখিকা। এ উপন্যাসের দ্বাদশ পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'দেশানুরাগ'।

যামিনীনাথের স্বদেশচর্চার স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন লেখিকা,—

"বিদেশীয় অনুকরণের প্রতি তাঁহার যেমন ঘৃণা, ভারতগৌরবলোপকারী বিদেশীয়গণের প্রতিও তাঁহার তেমনি জাতক্রোধ, ভারতের অস্তমিত গৌরবদিন ফিরাইবার জন্য তিনি প্রাণপণ করিয়াছিলেন, এমনকি অনেক সময় স্কুলের ছাত্রদিগকে সমবেত করিয়া আর্যগরিমার পুনরুদ্দীপন বিষয়ে বক্তৃতাও দিতেন, গভর্নমেণ্টকে ভ্রূক্ষেপ

৪২. স্বর্ণকুমারী দেবী, ছিন্ন মুকুল, ১৯১৩। ৪র্থ সংস্করণ।

না করিয়া তিনি তাহাদের গালি দিয়া সংবাদপত্রে কয়েকবার লিখিয়াও ছিলেন, কিন্তু সেই গালি পড়িলে সহসা অনেকেরই তাহা প্রশংসা বলিয়া ভ্রম হইত।"

স্বর্ণকুমারী সে যুগের সংবাদপত্রে প্রশংসাচ্ছলে যে ইংরেজনিন্দা চলত তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এখানে। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র এ জাতীয় সমালোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। সম্ভবতঃ স্বর্ণকুমারী দেবী সে যুগের সংবাদপত্রের স্বদেশচর্চার প্রতিই কটাক্ষপাত করেছিলেন।

যামিনীনাথের স্বদেশানুরাগের মধ্যেও কিছু নিন্দনীয় দিক ছিল। স্বর্ণকুমারী সে প্রসঙ্গেও নীরব থাকেননি। প্রকৃত দেশপ্রেমের চেয়ে দেশপ্রেম প্রদর্শনই কোনো কোনো লোকের চরিত্রে প্রকট হয়ে উঠেছিল। এরা দেশের শত্রু, বঙ্কিমচন্দ্র-দ্বিজেন্দ্রলাল এই ভণ্ড-দেশপ্রেমীদের ক্ষমা করেননি। স্বর্ণকুমারীও যামিনীনাথের দেশপ্রেমের নিন্দনীয় দিকটি সমালোচনা করেছিলেন,—

"ভালই হউক, মন্দই হউক, বিদেশীয় অনুকরণের নামমাত্রেই জ্বলিয়া উঠেন অথচ সুবিধার অনুরোধে ইংরাজী প্রথায় গৃহ সাজাইতে, বিলাসের অনুরোধে ইংরাজী বুট, ট্রাউজারস ও কোট পরিতে এবং সভ্যতার অনুরোধে হাতের পরিবর্তে কাঁটা চামচ ব্যবহার করিতে কুণ্ঠিত হন না।"

স্বর্ণকুমারী দেবীও স্বাজাত্যবোধের অর্থ খুব উদারভাবে গ্রহণ করেননি। দেশপ্রেম যদি আমাদের ঐতিহ্য বিরোধী ও সংস্কৃতিবর্জিত বস্তু হয়, স্বর্ণকুমারী তাকে ঠিক উদার ভাবে গ্রহণ করতে চাননি। অথচ ইংরাজী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি একটা প্রকাশ্য অনুরাগ আমরা উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকেই লক্ষ্য করেছি। বেশবাসে-ভূষায়-গৃহসজ্জায়-কথোপকথনে বিদেশীয়ানা আমাদের প্রকৃত দেশানুরাগের পরিপন্থী বলে সমালোচনাও কম হয়নি কিন্তু তা সত্বেও দেখা যাচ্ছে, আধুনিক জীবনযাপনে অভিলাষী একটি সম্প্রদায়ের মানুষ ধীরে ধীরে কিছু কিছু বিদেশীয়ানায় অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। অথচ এই শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যেই প্রথম স্বদেশচেতনা দেখা গিয়েছিল একথাও অনস্বীকার্য। যে যুগে পরাধীনতার মর্মপীড়ায় আমরা আক্রান্ত, উদারভাবে বিদেশীয়ানা গ্রহণ করায় কিছু কিছু প্রতিবাদ সেখানে থাকবেই। স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্যে একদা প্রবলভাবে বিদেশী পণ্য বর্জনের জন্য তুমুল প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল। স্বর্ণকুমারী দেবীও বিদেশীয়ানাকে বাহ্যিকভাবেও স্বীকার করার উদারতা দেখাতে পারেননি। তিনি দেশপ্রেমের মধ্যে স্ব-সংস্কৃতি-চেতনাকে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন।

'ছিন্নমুকুল' উপন্যাসে স্বদেশপ্রেম মুখ্যবিষয় নয়—তবুও প্রসঙ্গক্রমে লেখিকা যে স্বদেশচর্চার অবতারণা করেছিলেন সে শুধু দেশচিন্তা অন্তর্নিহিত প্রেরণা বলেই।

কাহিনীটির মধ্যে লক্ষণীয় কোনো বৈচিত্র্য নেই, কল্পনাগত ত্রুটি, চরিত্র সৃজনে ও ঘটনাস্থাপনেও যথেষ্ট দুর্বলতা রয়েছে, কিন্তু দেশ প্রসঙ্গে স্বর্ণকুমারী তাঁর বলিষ্ঠ ও স্বকীয় চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েছিলেন সে কথা অবশ্যই স্বীকার্য।

এর পরের দু'টি উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী পুনর্বার ইতিহাসের আশ্রয়ে ফিরে এলেন। ইতিহাসের পটভূমিকায় স্বদেশপ্রেম প্রসঙ্গ যেমন সহজেই উৎসারিত হতে পারে অন্যান্য বিষয়ে স্বদেশপ্রেম প্রকাশের তেমন সুবিধে নেই। উনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস-চেতনা ও স্বদেশচেতনার মধ্যে একটা স্পষ্ট যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। স্বর্ণকুমারী এ দুটি উপন্যাসে রাজপুত ইতিহাস অবলম্বন করেছেন। 'মিবাররাজে' [১৮৮৭] রাজপুত ইতিহাসের এমন একটি বিষয় তিনি নির্বাচন করেছিলেন যা নিয়ে ইতিপূর্বে কোন আলোচনাই হয়নি। 'বিদ্রোহ' উপন্যাসে [১৮৯০] রাজপুত ইতিহাসের সূচনারও পূর্বে রাজপুতানার আদিবাসীদের সঙ্গে রাজপুতদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লগ্নটি চিত্রিত হয়েছে। দুটি উপন্যাসেই বিষয়গত বৈচিত্র্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আলোচিত রাজপুত কাহিনী বর্জন করে, মৌলিক বিষয় নির্বাচন করে স্বর্ণকুমারী স্বকীয়ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। উপরন্তু স্বদেশপ্রেমের চেতনাই এ দুটি উপন্যাসে প্রধানবস্তু রূপে গৃহীত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র ও রমেশচন্দ্র প্রচলিত রাজপুত শৌর্যবীর্য কাহিনী অবলম্বন করে দেশপ্রেমের মহিমা প্রচার করেছিলেন। টডের রাজস্থানই অনুসৃত হয়েছিল সে যুগে। কিন্তু স্বর্ণকুমারী টডের রাজস্থানে বর্ণিত রাজপুত রাজাদের পূর্বপরিচয় সম্পর্কিত বর্ণনাটিতে কিছু অসঙ্গতি লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর 'মিবাররাজ' গ্রন্থটিতে টডের উক্তির প্রকাশ্য প্রতিবাদ করেছিলেন লেখিকা।

টডের রাজস্থানে রাজপুত রাজাদের বংশ পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, ' Rana's family consider themselves descendants of Noshiawan"—টড আকবরের নবরত্নসদস্য ঐতিহাসিক আবুলফজলের মতামত অনুসরণ করেছিলেন। 'মাসার অল অমরা' নামক গ্রন্থটিতে বলা হয়েছে মিবাররাজকুল ইরাণবংশীয় নসিরাণ-পুত্র নসিজাদের সন্তান অথবা এজিদ কন্যা মহাবানুর সন্তান। এই পারম্পর্যহীন ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেছিলেন স্বর্ণকুমারী। 'মিবাররাজের' পরিশিষ্টে গ্রন্থ রচনার হেতুটি তিনি বর্ণনা করেছেন,

'সুতরাং কেবল এইরূপ কথা হইতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সন্তান কুলোদ্ভব বিখ্যাত সূর্যবংশ রাণাগণকে ইরানী পিতামাতার সন্তান বলিয়া অনুমান করা নিতান্তই অদ্ভুত বলিয়া মনে হয়।'

'মিবাররাজে' মেবারের রাণাবংশের উৎপত্তি ইতিহাস বর্ণনা করার জন্যই লেখিকা সচেষ্ট। মেবাররাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে তিনি গুহার নামোল্লেখ করেছেন।

সৌরাষ্ট্রের শেষরাজা শিলাদিত্যের পুত্রই গুহা। ঘটনাচক্রে গুহা ব্রাহ্মণকন্যা কমলাদেবী কর্তৃক ব্রাহ্মণপুত্ররূপে পালিত হয়েছিল। কালক্রমে সেই মেবাররাজবংশের প্রতিষ্ঠা করে। আরাবল্লী পর্বতের পাদদেশে শৈলময় বনভূমিতে আদিবাসীদের রাজা মন্দালিক ভীল রাজত্ব করতেন। গুহা মন্দালিকের আশ্রয়েই বড়ো হয়েছিল,—আপন ক্ষমতায় সে ইদরে রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হয়।

বিদেশী লেখক রাজপুত রানার বংশগৌরবে যে কলঙ্ক আরোপ করেছেন লেখিকা তারই প্রতিবাদে এ উপন্যাস রচনা করেছেন। তবে ঐতিহাসিকতা রক্ষা করার উপায় ছিল না বলেই লেখিকাকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। রাজপুত বংশীয়দের বংশ প্রথা অবলম্বন করেই তিনি বিষয়টির ওপর আলোকসম্পাত করেছিলেন। এ উপন্যাস টডের মতবাদকে কতখানি আচ্ছন্ন করেছিল বলা মুস্কিল, কিন্তু লেখিকার প্রয়াসটিই অভিনন্দনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

স্বর্ণকুমারী দেবী এ গ্রন্থটি উপহার দিয়েছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে। 'উপহারপত্রে' কবিতাটির শেষ দুটি পংক্তিতে লেখিকা আক্ষেপ করেছেন—

'এনেছি এ শোক গীতি তোমার পরশপ্রীতি
ফুটাবে বিরাগমাঝে স্বরাগমুকুল।'[৪৩]

এ উপন্যাসকে শোকগীতি বলার তাৎপর্যটিও সহজেই অনুমেয়। পরবর্তী উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী রাজপুত ভীলের দ্বন্দ্বচিত্র অঙ্কন করেছিলেন। এ উপন্যাসে মন্দালিক ভীলের মৃত্যুকাহিনীর অবতারণা করেছেন উপন্যাসের শেষাংশে। সরল-বন্য-জাতি হলেও ভীলেরা সাহসী ও স্বাধীনতাপ্রিয়। কিন্তু শক্তিমানের কাছে পরাভব স্বীকার করা ছাড়া দুর্বলের অন্য কোন গত্যন্তর থাকে না। তাই ভীল সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা অস্তমিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রাজপুত শক্তির অভ্যুদয় ঘটা সম্ভব হল। এ অংশটিতে লেখিকা পরাধীন ও দুর্বল ভারতবাসীর সঙ্গে ভীল সম্প্রদায়ের কিছু সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। এই ধারণাটি লেখিকার মনে এত প্রবলভাবে জেগেছিল বলেই তিনি পরবর্তী উপন্যাসে ভীল-রাজপুত দ্বন্দ্বকেই উপজীব্য করেছিলেন।

গুহা মন্দালিকের স্নেহ ভালবাসা পেয়েছিল বলেই ভীলপুত্র তালগাছ পিতৃস্নেহ বঞ্চিত মনে করেছিল নিজেকে। আদিম সারল্য নিয়েই স্বার্থলেশহীন মহত্ত্ব দেখিয়েছিল ভীলরাজা মন্দালিক। কিন্তু অন্য একটি ভিন্‌দেশী যুবকের এই প্রাধান্য খুশীমনে মেনে নেয়নি মন্দালিক পুত্র। এই দ্বন্দ্বটিই মিবাররাজের মূল ঘটনাগত দ্বন্দ্ব।

৪৩. স্বর্ণকুমারী দেবী, মিবাররাজ ১৮৮৭

ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত রচনায় তথ্যগত স্বল্পতাটুকু কল্পনায় পূর্ণ করে নিয়েই তিনি 'ফুলের মালা' [১৮৯৫] রচনা করেছিলেন। বাংলার ইতিহাসে মুসলমান রাজাদের তালিকায় যে একটি মাত্র হিন্দুরাজার নাম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি গণেশদেব। লেখিকা উপন্যাসে এই হিন্দুরাজার কাহিনী অবলম্বন করেছেন। বাংলাদেশের রাজনৈতিক অবস্থার বর্ণনাও এ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। গীয়সুদ্দিনের আমলে জমিদার গণেশদেবের আকস্মিক উত্থান হয়েছিল। রাজনীতির জটিলতার রন্ধ্রপথে শক্তি সঞ্চয় করে গণেশদেব গৌড়াধিপতি হয়েছিলেন। লেখিকা গণেশদেবের চরিত্রে শৌর্য-বীর্য-বুদ্ধিমত্তার সমন্বয় ঘটিয়েছেন। রাজা গণেশদেবের ব্যক্তি জীবনের কাহিনীই উপন্যাসের মূল ঘটনা হলেও গণেশদেবের ব্যক্তিত্ব ও সৎসাহসের দৃষ্টান্তটি তিনি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গীয়সুদ্দিনের ভ্রাতুষ্পুত্র সাহেবুদ্দিনের আশ্রয়-দানকালে যে বিপদের সম্মুখীন হয়েছিলেন গণেশদেব, নির্ভীকতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের দ্বারাই সে বিপদ থেকে মুক্ত হয়েছিলেন তিনি। গণেশদেবের নির্ভীক চরিত্র তার উক্তিতেই ধরা পড়ে,—

"আমি সেই বীর সন্তানগণের পিতা যাঁহারা আমার জন্য, দেশের জন্য, অসহায়ের জন্য, ধর্মযুদ্ধে প্রাণ সমর্পণ করিতেছে! যাহারা পুণ্যকীর্তিতে অমরত্ব লাভ করিয়া মহত্বের চিরদৃষ্টান্ত স্বরূপ হইয়া স্বর্গের গৌরব রক্ষা করিবে।[৪৫]

—এই গণেশদেবই গৌড়াধিপতি হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্রই মুসলমান কন্যা বিবাহ করে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। গণেশদেবের পূর্ব প্রণয়িণী শক্তির প্রতিহিংসা গ্রহণের কাহিনীটিই উপন্যাসের মূল ঘটনা। শক্তির প্রেম অস্বীকার করেছিলেন বলেই শক্তি যবন গৌড়াধিপতিকে স্বামীত্বে বরণ করেছিল। কিন্তু লেখিকা গণেশদেবের ওপর পূর্ণ সহানুভূতি দেখিয়েছেন। আত্মবিশ্লেষণে সক্ষম নায়ক হিসেবে গণেশদেব তাঁর পূর্বপ্রেমকে অস্বীকার করেননি বরং নিরুপায়ের বেদনায় মুহ্যমান হয়েছিলেন। আদর্শ রাজা হিসেবে কল্পনা করার বাসনাটি এ ব্যাপারেও প্রকট। বাংলার ইতিহাসে এমন একটি দেশপ্রাণ সাহসী জননেতার চরিত্র কল্পনা করে আমাদের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন লেখিকা।

স্বর্ণকুমারীর সাহিত্যজীবন উনবিংশ—বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ জুড়ে। উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁর লেখা উপন্যাসই আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে লেখা তাঁর বহু উপন্যাসেও স্বদেশপ্রেমচেতনার প্রকাশ দেখেছি। বিংশ শতাব্দীতে লেখা 'বিচিত্রা', 'স্বপ্নবাণী' ও 'মিলনরাত্রি' উপন্যাসে তিনি বঙ্গের রাজ-বিপ্লবের কাহিনী অবলম্বন করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা 'স্নেহলতা'

৪৫. স্বর্ণকুমারী দেবী, ফুলের মালা, ১৮৯৮।

[১৮৯০] উপন্যাসটিতে স্বর্ণকুমারী দেবী যে সামাজিক কাহিনীর অবতারণা করেছিলেন তাতেও স্বদেশপ্রেমের ধারণাটি বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে। বহুদিন পরে লেখা 'মিলনরাত্রি' উপন্যাসের পূর্বাভাষে স্বর্ণকুমারী দেবী বলেছিলেন,—

"৪০/৪২ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত মৎ প্রণীত 'স্নেহলতা' উপন্যাস অর্দ্ধাধিক শতাব্দীরও পূর্বতন সমাজচিত্র। তখনকার নব্যযুবকের প্রাণে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা, উদ্দীপনা ক্ষীণ স্রোতোধারায় বহমান দেখা যায়—কংগ্রেস যাহার মূলগত প্রধান প্রপাত—এ যুগের নব্যবঙ্গের মানসজাত খরস্রোতা মহালহরী সেই ধারারই ক্রমসঞ্চিত বিরাট বিকাশ।"

এই পূর্বাভাসের উক্তি থেকে 'স্নেহলতা' উপন্যাসের বক্তব্যটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'স্নেহলতা'র কাহিনীতে স্বদেশপ্রেমের বর্ণনা সে যুগের আবহাওয়াকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। ঐতিহাসিক কাহিনীর আশ্রয়ে দেশোদ্ধারের প্রকৃত পথ নির্দেশ করার চেষ্টা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে', স্বর্ণকুমারী দেবী আনন্দমঠের প্রায় আট বৎসর পরে 'স্নেহলতা' উপন্যাসে যে দেশসাধনার প্রসঙ্গ আলোচনা করেছিলেন তাতে সরাসরি কোন সংগঠন ও সভাসমিতির মাধ্যমে কিভাবে দেশোদ্ধার সম্ভব সে বিষয়টিই ব্যক্ত করেছেন। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর গুপ্ত সমিতি ও বিপ্লবী সংস্থা কিভাবে গড়ে উঠেছিল তার বিবরণ আমরা রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি'তেই পাই। স্বাদেশিকের সভা স্থাপনের এ জাতীয় স্বপ্নাবিষ্ট ক্রিয়াকলাপ হয় ত প্রথম যুগে ব্যর্থ হয়েছিল—কিন্তু ধীরে ধীরে এ জাতীয় বহু প্রতিষ্ঠান সফল ভাবে তাঁদের অব্যর্থ দেশসাধনা চালিয়ে গেছেন। 'স্নেহলতা' উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী দেবী নায়ককে এ জাতীয় একটি সংগঠনের পরিচালক হিসেবে দেখিয়েছেন।

শিক্ষা ও যোগ্যতা নিয়েই দেশসেবার পবিত্র কর্তব্য পালন করা সম্ভব তাই নায়ক জীবন সভাস্থাপন করে তরুণ সম্প্রদায়কে দেশমাতৃকার শৃঙ্খলমোচনের জন্য জীবনপণ করার পথ দেখাতে চায়। দেশের ভাবী যুবকরাই একদিন স্বাধীনতা সংগ্রামের সৈনিক হবে, জীবন সেই ভাবী যুবকদেরই স্বদেশপ্রেমের আদর্শে দীক্ষা দেয়। স্বর্ণকুমারী যে দেশপ্রেমমূলক উপন্যাস রচনায় চিন্তার দিক থেকে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছিলেন 'স্নেহলতা' উপন্যাসকেই তার প্রমাণ হিসেবে গ্রহণ করা যায়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ভাবী সৈনিকরা দীক্ষা গ্রহণের জন্য সমবেত হয়েছেন জীবনবাবুর গুপ্ত সভাগৃহে। তাদের হাতে পদ্মবিদ্ধ খড়্গ তুলে দিয়ে জীবনবাবু বললেন,—"এই পদ্ম ভারতের চিহ্ন স্বরূপ, এই খড়্গ বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিবার চিহ্ন স্বরূপ।"[৪৬]

৪৬, স্বর্ণকুমারী দেবী, স্নেহলতা, ১৮৯২।

সভাপতি হিসেবে তিনি তাদের শপথ গ্রহণ করালেন—"শপথ কর, আজ হইতে তুমি ভারতের মঙ্গলকার্যে প্রাণপণ করিলে আজ হইতে আমাদের সহিত ভ্রাতৃত্বে আবদ্ধ হইলে।" স্বদেশী সংগীতও গীত হোল,

এক সূত্রে গাঁথিলাম সহস্র জীবন।
জীবনে মরণে রব শপথ বন্ধন॥
ভারতমাতার তরে সঁপিনু এ প্রাণ।
সাক্ষী পুণ্য তরবারি সাক্ষী ভগবান॥

এই সভার বর্ণনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকের সভার পার্থক্য খুব বেশী নেই। 'জীবনস্মৃতির' ঘটনার সত্যভিত্তি মেনে নিলে এ কথা মনে করা যেতে পারে যে, রবীন্দ্রনাথের মত স্বর্ণকুমারীও এ জাতীয় সভাসমিতির উৎসব অনুষ্ঠানের প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন। সভাপতি হিসেবে জীবনবাবু দীর্ঘ বক্তৃতায় সভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন,—

"ভ্রাতৃগণ, আমরা এই পবিত্র ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া যে মহৎব্রত গ্রহণ করিয়াছি দেশহিতকর অনুষ্ঠানে জাতিগত মাহাত্ম্যবৃদ্ধিই ইহার মূল সংকল্প, দেশোন্নতিই ইহার চরম উদ্দেশ্য।"

উনবিংশ শতাব্দীর কাব্যে-নাটকে-উপন্যাসেই স্বদেশপ্রেমচর্চা শুরু হয়,—কিন্তু এই শতাব্দীর শেষাংশে লেখা নাটক-উপন্যাসেই তার বিস্ফোরণ চূড়ান্ত আকার ধারণ করেছিল। উপেন্দ্রনাথ দাসের 'সুরেন্দ্র বিনোদিনী' ও 'শরৎ সরোজিনী' নাটকের আলোচনা কালেও একথা বলেছি যে স্বদেশপ্রেম তখন শুধু ভাবজগতেই সীমায়িত ছিল না, সংগ্রামের প্রস্তুতির আয়োজনও প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে এসেছিল। উপন্যাসে স্বর্ণকুমারী দেবী প্রত্যক্ষ স্বদেশসেবার আহ্বান জানিয়েছেন এভাবেই। সভাসমিতি ও বিপ্লবীদল সংগঠন কালে এ জাতীয় কাহিনী যে অত্যন্ত উদ্দীপনা সঞ্চারী হবে তা অনায়াসেই বোঝা যায়। তবে উপেন্দ্রনাথের নাটক রাজরোষ এড়াতে পারেনি, স্বর্ণকুমারী দেবী তা এড়াতে পেরেছিলেন। তিনি যে সভা সংগঠকদের কথা বলেছেন—তারাই আবার মুক্তকণ্ঠে ইংরেজ প্রশংসা করেছে। জীবনবাবু দেশোদ্ধারের চেয়ে দেশোন্নতির দিকেই উৎসাহিত করেছেন সদস্যদের। ওরাই আবার বলেছেন,—

"আমরা বিদ্রোহী নহি—আমরা ইংরাজের প্রতিদ্বন্দ্বী নহি।"

জীবনবাবু জাতির কুসংস্কার দূর করতে চেয়েছিলেন—জাতির উন্নতির উপায় চিন্তা করেই তিনি বিদ্রোহিতা সমর্থন করেননি। এখানে লেখিকার সচেতন

মনোভাবের পরিচয় পাই। বস্তুতঃ আন্দোলন ও সংগঠনের সত্যিকারের কর্মপন্থা কি হবে এ নিয়ে স্থিরসিদ্ধান্তে এসে পৌঁছয়নি সে যুগের মানুষরা,—তখন চলছিল পরীক্ষা নিরীক্ষার পালা। শুধু ভবিষ্যৎদ্রষ্টা সাহিত্যিকের কল্পনাতেই ভবিষ্যতের কর্মসূচীর আভাস পেয়েছি মাত্র; তার সঙ্গে বাস্তবের আকাশচুম্বী পার্থক্য ছিলো। বঙ্কিমচন্দ্র যে ধর্মভিত্তিক সশস্ত্র সংগ্রামের পরিকল্পনা করেছিলেন—সেই আদর্শের বাস্তবায়ন হতে পারে কি না এ নিয়ে নিঃসংশয় বিশ্বাসে পৌঁছনোর আগেই 'স্নেহলতা' উপন্যাসের জন্ম। সুতরাং সে যুগের সমাজে স্বদেশী সংগঠনের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছিলেন লেখিকা। জীবনবাবু দেশব্রতে দীক্ষা দেবার সময় খড়্গ তুলে দিয়েছিলেন দেশসেবকের হাতে—যদিও খড়্গের ব্যঞ্জনা বীরধর্মে নিহিত। শত্রুশক্তি দলনের কোন ইঙ্গিত যদি থেকেও থাকে সেটি উচ্চারিত হয়নি, কিন্তু ব্যঞ্জিত হয়েছে।

স্বর্ণকুমারী দেবী বিংশ শতাব্দীতেও বহু উপন্যাস রচনা করেছিলেন—এবং স্বদেশপ্রেমের যে আন্তরপ্রেরণা তাঁর প্রথম যুগের উপন্যাসে প্রতিফলিত হয়েছিল, পরবর্তী যুগের রচনায়ও তার পরিচয় পাই। দেশপ্রেমের অমলিন আদর্শ তাঁর সমস্ত-রচনার মূলেই দীপ্যমান ছিল,—সুতরাং স্বর্ণকুমারী দেবীর সাহিত্য বিচারের প্রধান মানদণ্ড হিসেবে স্বদেশচেতনাকেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরে উপন্যাস রচনার যে প্রচণ্ড জোয়ার ঊনবিংশ শতাব্দীতে দেখা গেছে, সবই প্রায় বঙ্কিমী আদর্শে প্রভাবিত। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের ও রমেশচন্দ্রের অম্লান কীর্তির পাশে খুব বেশী উজ্জ্বল হতে পারেননি এঁরা। স্বদেশীভাবের জোয়ার অন্যসব ছেড়ে স্বদেশপ্রেমবিষয়ক রচনার মূল্য বাড়িয়েছিল অনেক—'আনন্দমঠ', 'জীবন প্রভাত' ও জীবন সন্ধ্যার' অপরিসীম মূল্য সে যুগেই নির্ণীত হয়েছিল। এযুগে যাঁরা স্বদেশপ্রেমমূলক উপন্যাস রচনা করেছেন তাঁরা চক্রাকারে বঙ্কিম ও রমেশচন্দ্রের যুগেই পাদচারণা করেছেন বলা যেতে পারে। বিষয়গত মৌলিকতার পীড়াদায়ক অভাবসত্ত্বেও ঔপন্যাসিকের স্বদেশচিন্তার পরিচয় যেখানে প্রকট হয়েছে—লেখক সেখানে সম্মানিত হয়েছেন। সে যুগের অন্যতম ঔপন্যাসিক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রেরই আত্মীয় লেখক দামোদর মুখোপাধ্যায়। 'কপালকুণ্ডলা'র উপসংহার ভাগ রচনা করেই তিনি সাহিত্য আসরে অবতীর্ণ হন। টডের রাজস্থান অবলম্বনে ইনি 'প্রতাপসিংহ' উপন্যাস রচনা করে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছিলেন। কাব্যে ও উপন্যাসে রাজস্থানের সমস্ত বীরত্বের দৃষ্টান্তগুলি সে যুগে আগ্রহের সঙ্গে গৃহীত হয়েছিল যুগপ্রয়োজনেই। প্রতাপসিংহ ছিলেন স্বদেশপ্রেমের সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সেদিক থেকে দামোদর মুখোপাধ্যায় অতি পরিচিত বিষয়বস্তুরই অবতারণা করেছিলেন। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের জীবনীর যে

সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া গেছে তাতে স্বদেশপ্রেমিক হিসেবেই তিনি উল্লিখিত হয়েছেন। সাহিত্যসাধক-চরিতমালায় সংক্ষিপ্ত হলেও তাঁর সম্বন্ধে বলা হয়েছে—

"তাঁহার ন্যায় স্বদেশ হিতৈষী একান্ত দুর্লভ—যেদিন হইতে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, সেইদিন হইতে একমাত্র ঔষধ ব্যতীত তিনি সর্ববিধ বৈদেশিক দ্রব্যের সহিত সংস্রব ত্যাগ করিয়াছিলেন। এমন কি বিলাতী চিনির সংস্রবের আশংকায় গুড় ব্যতীত অন্য কোন মিষ্টান্ন ভক্ষণ করিতেন না।"

যে কোন মানুষ সম্পর্কেই এ জাতীয় শ্রদ্ধেয় উক্তি থেকে সেই চরিত্রের মহত্তর গুণাবলীই প্রকাশিত হয়। দামোদরের স্বদেশপ্রাণতার পরিচয় উদ্ধৃত উক্তিতে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'প্রতাপসিংহ' রচনা করেই তিনি শুধু সাহিত্যিকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন মাত্র। টডের রাজস্থানে প্রতাপ সম্পর্কে যে উচ্ছ্বসিত উক্তি রয়েছে গ্রন্থকার তা টাইটেল পেজেও উদ্ধৃত করেছেন। বিজ্ঞাপনে সবিনয়ে তিনি আপনার দীনতা নিবেদন করেছেন,

"যে মহাত্মার মহান চরিত্র অবলম্বনে বর্তমান উপন্যাস লিখিত, তাহার জীবনী ও কার্যকলাপ যেরূপ অমানুষী ব্যাপারসমূহে পরিপূর্ণ তাহার যথোপযুক্ত বর্ণনা করা মানুষের সাধ্য নহে। আমার দ্বারা তাহা যে কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সিদ্ধ হইয়াছে, এরূপ প্রগল্‌ভবিশ্বাসকে আমি ভ্রমেও মনে স্থান দিই না।"[৪৭]

প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রেম লেখকচিত্তে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এ উজ্জ্বল-দৃষ্টান্ত সাধারণকেও উদ্দীপিত করুক—এ আশাও ধ্বনিত হয়েছে লেখকের কণ্ঠে। উপন্যাসের মধ্যেও সেকথা তিনি দৃঢ় ভাবে জানিয়েছেন।

'চিতোর রক্ষার্থ যুদ্ধে রাজপুত্ত বীরগণ ও রাজপুত রমণীমণ্ডলী যে অসাধারণ বীরত্ব ও স্বদেশানুরাগ প্রকাশ করেন, তাহার তুলনা বোধহয় অন্য কোন জাতির ইতিহাসমধ্যে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। আমরা পাঠকগণকে ইতিহাস হইতে সেই অসাধারণ ঘটনার বিবরণ অধ্যয়ন করিয়া হৃদয়কে বিমুগ্ধ করিতে বারবার অনুরোধ করি।'

লেখকের উদ্দেশ্যটি তখন আর অস্পষ্ট থাকে না। জনসাধারণকে স্বদেশপ্রেমে উদ্বোধিত করার এই দায়িত্ব যে কোনো স্বদেশপ্রেমী সাহিত্যিকই স্বেচ্ছায় বরণ করেছিলেন। এই বিশেষ উদ্দেশ্য উপন্যাসের সর্বত্র প্রকট। রাজপুত কাহিনীতে চারণ একটি সাধারণ চরিত্র—অতীত যশোগাথা ভাবাবেগে বর্ণনা করাই যার একমাত্র কাজ। দেশাত্মবোধের চেতনা সঞ্চারে এই চারণ সম্প্রদায় একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। দেশাত্মবোধক সংগীতও চারণের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে,—

৪৭. দামোদর মুখোপাধ্যায়, প্রতাপসিংহ, ১৮৮৪।

কোথায় সে দিন মনের গরবে
হাসিত ভারত সেদিন সুখে ?
কোথায় এখন স্বাধীনতা ধন ?
পর নিপীড়ন ভারত বুকে।

এ বর্ণনাটিতে শুধু চিতোরের বর্তমান দুরবস্থার কথা বলা হয়নি, পরাধীন ভারতের চিত্রটিই লোকসমক্ষে তুলে ধরেছেন লেখক। আত্মসমালোচনা ও উদ্গত দুঃখ নিয়ে চারণ উচ্চারণ করেন,—

"হায়! পূর্বে যে হৃদয় লইয়া রাজপুতগণ জগৎ পূজিত ছিলেন, এক্ষণে আমাদের সে হৃদয় নাই—সে উদ্যম নাই, সে অদম্য স্পৃহা নাই, সে উচ্চ আশা নাই, সুতরাং এক্ষণে আমাদের এই হীনতা, এই দুর্দশা, এই অপমান।"

তখন বুঝতে অসুবিধে হয় না এ আক্ষেপ লেখকেরই। পরাধীনতার মর্মদাহ লেখকের অন্তরে যে গভীর বেদনাবোধ জাগিয়েছিল সেটিই চারণের মুখে স্থাপন করেছেন। এ জাতীয় মহৎ দৃষ্টান্ত তুলে ধরার সুযোগে লেখক আপন অন্তরের বেদনাটি সর্বদাই ব্যক্ত করার প্রয়াস পান।

এ উপন্যাসে উর্মিলাকে লেখক দেশপ্রেমিকা রূপেই কল্পনা করেছেন। এ ধরণের চরিত্র বাংলা উপন্যাসে সুলভ সৃষ্টি হলেও জলন্ত স্বদেশপ্রেমের আবেগ এ চরিত্রের মধ্যে যে আত্মমর্যাদাবোধ ও আত্মদানের প্রেরণা জাগিয়েছিল সে কথা লেখক বোঝাতে চেয়েছেন। উর্মিলা বলেছে,—

"আমি দেশের জন্য আমার এ ক্ষুদ্র প্রাণ বিক্রীত করিয়াছি, দেশের হিতার্থে আমি সকল ভোগবাসনা বিসর্জন দিয়াছি, যবনবধই আমি জীবনের সারব্রত করিয়াছি, এবং শাণিত লৌহই এদেহের প্রধান ভূষণ বলিয়া স্থির করিয়াছি।"

দেশপ্রেমই এ চরিত্রের শক্তি। এই কঠোর সংকল্প নিয়ে দেশসাধনার বন্ধুর পথে এগিয়ে যেতে হবে। দুর্গমকে অতিক্রম করতে গেলেই চাই অটুট মনোবল, অদম্য শক্তি ও সাহস। নারীও এই দেশসাধনার পবিত্রব্রতে জীবন উৎসর্গ করতে পারে, লেখক প্রকারান্তরে সে কথাটিই বুঝিয়েছেন।

স্বদেশপ্রেমের জীবন্ত প্রতিমূর্তি প্রতাপসিংহকে পরাধীন জাতির সামনে আশা ও উদ্দীপনার প্রতীকরূপে স্থাপন করতে চেয়েছেন লেখক। দেশসাধনা যার জীবনব্রত তার পুণ্য চরিতকথাই এ উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। হলদীঘাটের যুদ্ধে পরাজিত প্রতাপ গভীর মনোদুঃখে ভেঙ্গে পড়েছিলেন কিন্তু মনোবল হারাননি। এই হলদীঘাটকেই টড বলেছিলেন, "Huldighat is the Thermopylae of

Mewar"—প্রতাপসিংহ দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জীবন পণ করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পরাজিত দেশপ্রেমিকের হাহাকার লেখক সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন,

'মিবারের চিরবিরাজিত গৌরব লক্ষ্মী আর রহিলেন না। তবে এ জীবনে কাজ কি? হায়! অন্তিম সময়ে মিবারের এই শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া যাইতে হইল, ইহার কিছুই করিতে পারিলাম না। এ ভূতময় দেহ ধরিয়া, এই উন্নত রাজপদ লাভ করিয়া স্বজাতির স্বাধীনতা সংস্থাপন করিতে পারিলাম না। বৃথা এ জীবন! বৃথা এ দেহ! মিবারের স্বাধীনতা বিলুপ্ত, মিবারবাসী এখন বনবাসী, মিবার এখন শ্মশানভূমি। মিবারের এ দশা দেখিলাম তথাপি কিছুই করিলাম না।'

এ জাতীয় উপন্যাসে লেখকের কৃতিত্ব শুধু দেশপ্রেমের অনবদ্য বর্ণনায়। প্রচলিত ও পরিমিত কাহিনীতে কৃতিত্ব সৃষ্টির অবকাশ স্বল্প—কিন্তু জাতীয় জাগরণের লগ্নে দেশপ্রেমের পৌনঃপুনিক বর্ণনাতেও উদ্দীপনা সঞ্চার করা সম্ভব। সম্ভবতঃ এই কারণেই সে যুগের লেখকবৃন্দ প্রচলিত ও পরিচিত চরিত্র অবলম্বন করে দেশপ্রেম প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন।

সেই স্বদেশপ্রেমিক লেখক সম্প্রদায় এখন সাহিত্য জগত থেকে বিস্মৃতির গর্ভে বিলীন হয়ে গেছেন। কোন অসাধারণ শক্তি নিয়ে এঁরা আসেননি, শুধু যুগধর্মের দাবী আর প্রতিষ্ঠালাভের ক্ষীণবাসনা নিয়ে এঁরা আবির্ভূত হয়েছিলেন। কিন্তু দেশপ্রেমের আবেগই ছিল এই লেখক সম্প্রদায়ের মূলধন। এঁরা যা অনুভব করেছেন, লেখায় তা প্রকাশ করার বাসনা নিয়েই এঁদের আবির্ভাব।

রায় সাহেব হারাণচন্দ্র রক্ষিতের লেখা 'বঙ্গের শেষবীর' উপন্যাসটি এ প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। হারাণচন্দ্রের কোনো বিশিষ্ট পরিচয় নেই সাহিত্য ইতিহাসে। কিন্তু রায়সাহেব হারাণচন্দ্র যে স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন তাঁর পরিচয় আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মুগ্ধ ভক্ত ছিলেন ইনি, 'বঙ্গদর্শনের' স্বদেশাত্মক রচনা এঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল। স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাস সম্বল করেই ইনি 'বঙ্গের শেষ বীর' রচনা করেছিলেন দু'টি খণ্ডে।

'বঙ্গের শেষ বীর' গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক বলেছেন,—

"বাঙ্গালী পাঠক সহজে ইতিহাস পড়িতে চাহেন না, তাই ঐতিহাসিক উপন্যাসের অবতারণা।"

বঙ্কিমভক্ত হারানচন্দ্র বঙ্কিমপ্রদর্শিত পথেই স্বদেশপ্রেম প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন। বাঙ্গালীর ইতিহাসে বীরচরিত্র অনুসন্ধান করাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। প্রতাপাদিত্যকে নির্বাচন করেছেন সেই সূত্রেই। ঐতিহাসিক প্রতাপাদিত্যকে অবলম্বন করে প্রতাপচন্দ্র

ঘোষ 'বঙ্গাধিপ পরাজয়' রচনা করেছিলেন বৃহদায়তন উপন্যাসে। তা সত্ত্বেও একই চরিত্র অবলম্বন করে উপন্যাস লেখার উদ্যম করেছিলেন হারাণচন্দ্র। প্রতাপচন্দ্রের লেখায় সত্যসন্ধানের আতিশয্য ছিল বলেই প্রতাপাদিত্যকে অকুণ্ঠভাবে সমালোচনা করেছিলেন তিনি। প্রতাপের চারিত্রিক দোষত্রুটির এই নির্ভীক সমালোচনার জন্যই লেখক সমাদৃত হননি। প্রতাপাদিত্য সম্বন্ধে সত্য ইতিহাস অবলম্বন করলেই এ জাতীয় সমালোচনাকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। তাতে অবায়বীয় উচ্ছ্বাস থাকতে পারে,—আদর্শরক্ষা হতে পারে, কিন্তু ইতিহাসের মুখরক্ষা করা যায় না। তবু ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার দোহাই দিয়েই হারাণচন্দ্র তাঁর দেশপ্রেমের আদর্শপ্রচারের জন্যই 'বঙ্গের শেষ বীর' রচনা করেছেন। বলাবাহুল্য ইতিহাস এখানে গৌণ, আদর্শান্বিত মহামানব প্রতাপাদিত্যকে জনসমক্ষে অনিন্দনীয় চরিত্ররূপে দেখানোর বাসনাই মুখ্য।

নামকরণ সম্পর্কে লেখক বলেছেন,—

"এই নামে যদি কাহারও আপত্তি থাকে, তিনি একবার বাংলার বীর জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবেন,—দেখিবেন, প্রতাপাদিত্যই বঙ্গের শেষ বীর বটে।"[৪৮]

এই আদর্শেই প্রতাপ চরিত্রটি আগাগোড়া কল্পনা করে নিয়েছেন লেখক। উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমী ঢং-এ তিনিও মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়েছেন,—অবিরল উপদেশামৃত বর্ষণ করেছেন পাঠক সম্প্রদায়ের উদ্দেশ্যে। 'আনন্দমঠের' উদ্দীপনাময়ী ভাষার অনুকরণও এ উপন্যাসে স্পষ্ট। চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে উচ্ছ্বসিত লেখক বাঙ্গালী চরিত্রের সমালোচনা করেছেন,—

"বাঙ্গালী বীর, বাঙ্গালী যোদ্ধা, বাঙ্গালী রাজাধিরাজ-রাজরাজেশ্বর,—একথা, আজিকার দিনে বাঙ্গালী পাঠকের কেমন লাগিবে, জানি না। কারণ, জগৎ জুড়িয়া কলঙ্ক—বাঙ্গালী দুর্বল। বাঙ্গালীর বাহুতে বল নাই, মনে সাহস নাই, হৃদয়ে উৎসাহ নাই;—বাঙ্গালী ভীরু, কাপুরুষ ও নিস্তেজ;—বাঙ্গালী লাঠি খেলিতে জানে না, বাঙ্গালী তরবারি ধরিতে জানে না, বাঙ্গালী বন্দুকের শব্দে মূর্চ্ছা যায়, বাঙ্গালী আগ্নেয় অস্ত্রের নামে ভয় পায়, সুতরাং বাঙ্গালী অতি অপদার্থ ও হেয়—ইত্যাকার এবং আরও অনেক প্রকার কথার আলোচনা করিয়া একদল (ইঁহাদের সংখ্যাই পনের আনা) আপন আপন বিজ্ঞতা ও বহুদর্শিতার পরিচয় দিয়া থাকেন। পাঠক কি তাহাদের আজন্মসংস্কার ভুলিতে পারিবেন? বাল্যে বঙ্গবিদ্যালয়ে এবং যৌবনে ইংরাজী বিদ্যালয়ে বাঙ্গালীচরিত্র সম্বন্ধে, তাহারা যে ভুল শিক্ষা পাইয়াছিলেন, ইংরেজ ইতিহাস লেখকের এবং ইংরেজ পুচ্ছধারী বাঙ্গালী ঐতিহাসিকের ইতিহাসগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিয়া

৪৮. হারাণচন্দ্র রক্ষিত, বঙ্গের শেষ বীর, ১৩০৪।

তাহারা আপনাদের পূর্বপুরুষগণ সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন, অধমের এ অধমগ্রন্থ পড়িয়া সহসা কি মন হইতে সেই বহুদিনের বিশ্বাস অপনোদন করিতে সমর্থ হইবেন ?"

এ অংশটুকুতে লেখকের সমস্ত উষ্মা ও অভিযোগই স্ফুটবাক্ হয়েছে। এটি কোন ঐতিহাসিক উপন্যাসের ভূমিকা নয়, এ যেন স্বদেশপ্রেমিক কোন বক্তার উচ্ছ্বসিত বক্তৃতা। দেশের দুর্দশায় মর্মান্তিক দুঃখে এঁরা স্থান-কাল-পাত্র বিস্মৃত হন। প্রতাপাদিত্যের ঐতিহাসিক চরিতাখ্যান বর্ণনাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নয়, উদ্ধৃত মন্তব্য থেকে এটুকু স্পষ্ট হয় সর্বাগ্রে।

প্রতাপাদিত্যকে 'বঙ্গের শেষ বীর' বলে প্রমাণ করার চেষ্টা উপন্যাসের সর্বত্রই দেখা যাবে। প্রতাপপত্নী পদ্মিনীকেও দেশপ্রেমের আদর্শে দীক্ষা দিয়েছেন লেখক। প্রতাপ শৈশব থেকেই স্বাধীনচেতা ও স্বদেশোদ্ধারে দৃঢ়চিত্ত। বন্ধু শংকর প্রতাপকে যুবরাজ বলে সম্বোধন করেছিল বলে প্রতাপ প্রতিবাদ করেছে,—

এ ভুয়া রাজসম্মানে লাভ কি? ইচ্ছা করিলেই যে রাজ্য কাড়িয়া লইতে পারে, ইচ্ছা করিলেই যে, এই যশোহরের শাসনভার আর একজনের হস্তে দিতে পারে, অনুগ্রহ বা নিগ্রহ যাহার খেয়ালের উপর নির্ভর করিয়া থাকে, তাহার নিকট হইতে রাজা বা মহারাজা, আমির বা উজীর কোনো উপাধিরই কোন মূল্য নাই।—যাহার এতটুকুও স্বাধীনতা নাই, হাত-পা-মন অবধিও যার অধীনতা নিগড়ে বদ্ধ, তার আবার সম্মান কি?

রায়সাহেব হারাণচন্দ্র এ অংশটিতে সম্ভবতঃ আপন মনোক্ষোভ গোপন করতে পারেননি। প্রতাপের উদ্বেলিত স্বদেশপ্রেমের ক্রমপরিচয়টি এ উপন্যাসে প্রকাশিত হয়েছে—যথার্থ স্বদেশসাধকের মতই প্রতাপ বলেছে,—

'আমার বাসনা আপনাকে লইয়া নহে, এই সমগ্র বঙ্গবাসীকে লইয়া।—এ বাসনা কি মিটিবে না?'

স্বদেশপ্রেমিক লেখক প্রতাপ চরিত্র অবলম্বন করেই আপন মনের সমস্ত বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। অভিমন্যুর যুদ্ধসাজ দেখে প্রতাপ মন্তব্য করেছে,—

"জননী জন্মভূমিকে কি আমি অধীনতা পাশ হইতে মুক্ত করিতে পারিব না?"

সমগ্র জাতির অন্তরে যেদিন এই আকুলতাই স্পষ্ট হয়েছিল—সেই লগ্নেই ঔপন্যাসিক উদ্গত মনোভাব সোচ্চারে প্রকাশ করেছিলেন।

প্রতাপ সূর্যকান্ত ও শংকরের সঙ্গে দিল্লীযাত্রা করেছিল, কিন্তু যাত্রাপথে সে দুঃখিনী ভারতমাতার অবর্ণনীয় দুর্দশার চিত্রটি দেখে শিহরিত হয়েছে—এ অভিজ্ঞতা যে লেখকেরই, সে কথা সহজেই বোঝা যায়,—

"আহা ; কি দুর্ভাগ্য। যাহাদের দেশ, যাহাদের জন্মভূমি, তাহারা আজ নিরন্ন ও বিবস্ত্র, আর যাহারা নেতা ও বলবান, তাহারাই ভোগৈশ্বর্যে বিহ্বল। স্বাধীনতার লীলাক্ষেত্র, বীরত্বের সঞ্জীব উৎস, পৃথিবীর নন্দন কানন—হিন্দুস্থানের আজ কি মর্মান্তিক শোচনীয় পরিবর্তন। হিন্দু জীবনের আজ কি দারুণ অভিশাপ। এই পতিত হিন্দুর, এই পতিত জাতির কি পুনরুদ্ধার হইবে না ?"

প্রতাপের মনে এই অমলিন স্বদেশপ্রেমের অনুভব প্রকাশের আন্তরিক বাসনাটি স্পষ্ট করার জন্যই ঔপন্যাসিকের ব্যাকুলতা, কিন্তু ইতিহাসের সমর্থন তিনি পাননি। এই উপন্যাসে লেখক একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা করেছেন, প্রতাপের বন্ধু শংকর বঙ্গদেশ ভ্রমণ করে বঙ্গবাসীকে স্বদেশপ্রেমে উদ্দীপিত করেছে। গ্রামে-গঞ্জে ভ্রমণ করে দেশপ্রেম জাগানোর চেষ্টা করেছে,—

"ভাইসব, হিন্দুর দেশে বিধর্মী মোঘলের আধিপত্য কেন ? প্রতিজ্ঞা করো, প্রাণ থাকিতে আর মোঘলের অধীনতা স্বীকার করিবে না। বলো, "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী,"—শপথ করো, "মন্ত্রের সাধন কিম্বা শরীর পাতন।"

এ অংশটিতে স্বদেশপ্রেমের একটা প্রত্যক্ষ আহ্বান আছে, আন্দোলন সৃষ্টি করার একটা সুচিন্তিত পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন লেখক। ঔপন্যাসিকের স্বদেশচেতনা একটা সক্রিয় সংগঠন শক্তিকেই আহ্বান জানিয়েছে।

এ উপন্যাসটির অন্যতম বিশেষত্ব ফুলজানি চরিত্রে স্বদেশপ্রেম আরোপ। স্বদেশপ্রেমিকা এই নারী প্রেমের চেয়ে দেশপ্রেমকেই বড়ো বলে মনে করেছে। এ কল্পনাটি আরও পরে বিশিষ্টতা হারিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে সত্যবতী চরিত্রে অবাস্তবতা সৃষ্টির মূলে এই অস্বাভাবিক চেতনা রয়েছে। ফুলজানিও স্বাভাবিক নারী নয়—দেশপ্রেমিক লেখকের কল্পনায় উদ্ভাসিত একটি অসামান্যা নারী রূপে চিত্রিত। সে বলেছে,—

"দেশ ব্যাপিয়া মোঘলের অত্যাচার ; জননী জন্মভূমি বিষাদময়ী, স্বদেশবাসী শত অভাবগ্রস্ত, নরনারী দুঃখে ও মনাগুনে দগ্ধ,—সে চিন্তা দূরে রাখিয়া আমি কিনা প্রেম উপাসনা করিতেছি ? হা ধিক্ আমার রমনী জনমে।···আজ হইতে আমার প্রেমব্রত, জননী জন্মভূমিকে লইয়া।"—দেশপ্রেমের উদ্দীপনাই এ চরিত্রের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করেছে।

এ উপন্যাসের ছদ্মবেশী কুমার চরিত্রটিতেও স্বদেশভাবনা প্রকট হয়েছে। ফুলজানিই নারীবেশ ত্যাগ করে দেশসাধনার জন্য পুরুষবেশ ধারণ করেছে। সম্ভবতঃ 'আনন্দমঠের' শান্তি চরিত্রের অনুসরণ করেছিলেন লেখক। কুমারের ভাষায়

'আনন্দমঠের' ছায়াপাত দুর্লক্ষ্য নয়। প্রতাপাদিত্যের সঙ্গে যোগ দিয়ে কুমার উদ্দীপনাময়ী ভাষায় ব্যাখ্যা করেছে তার উদ্দেশ্য,

"হিন্দুর চক্ষের জল হিন্দু না মুছাইলে আর কে মুছাইবে? হিন্দুর যে সৌভাগ্যরবি অস্তমিত হইয়াছে, তাহা কি আর ভারত গগনে উদিত হইবে না?"

এ ভাষা বঙ্কিমের উদাত্ত উচ্ছ্বাসের বাণীকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এভাবেই লেখকের স্বদেশপ্রেমোচ্ছ্বাস ঐতিহাসিক প্রতাপাদিত্যের কাহিনী অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে

প্রতাপাদিত্য শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করতে পারেননি। প্রতাপাদিত্যের পরাজয় লেখকের অন্তরে যে গভীর দুঃখসঞ্চার করেছিল তারই প্রকাশ,

"আকবরের মৃত্যু ও সেলিমের সিংহাসনপ্রাপ্তি, এই দুই ঘটনা উপলক্ষ্যে প্রতাপ কয়েক বৎসর সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগে, বাংলার সিংহাসন সুশোভিত করেন।···কিন্তু হায়! কালও পূর্ণ হইল, আর বঙ্গের শেষ বীরেরও পতন হইয়া, সমগ্র বাঙ্গালী জাতির,— বঙ্গদেশস্থ সমগ্র হিন্দুর স্বাধীনতা-রত্ন চিরকালের জন্য অদৃষ্ট সমুদ্রে ডুবিয়া গেল।"

প্রতাপাদিত্যকে দমনের জন্য আকবর সেনাপতি মানসিংহকে পাঠিয়েছিলেন। স্বদেশপ্রেমী লেখকের উচ্ছ্বাস ও বেদনা এখানেও মূর্ত হয়ে উঠেছে। হিন্দুর কলঙ্ক মানসিংহকে কোন স্বদেশপ্রেমী লেখকই ক্ষমা করতে পারেননি। প্রতাপাদিত্যের স্বদেশপ্রেমের পাশাপাশি মানসিংহের স্বদেশদ্রোহিতার প্রসঙ্গটি স্পষ্ট করেছেন লেখক। ইতিহাসের সত্য বর্ণনা করতে গিয়ে বারংবার লেখক নিজের গভীর স্বদেশপ্রেমই ব্যক্ত করেছেন। দেশপ্রেমিকের প্রশস্তি রচনা আর দেশদ্রোহীর নিন্দাবাদ স্বদেশপ্রেমিকেরই কাজ। হারাণচন্দ্র মানসিংহকে তীব্রভাষায় নিন্দা করে, আপন চরিত্রের দেশানুরাগই ব্যক্ত করেছেন,

"বস্তুতঃ—মানসিংহ ভিন্ন এমন স্বজাতিদ্রোহী আত্মস্বাধীনতা ধ্বংসকারী রাজপুত-কলঙ্ক আর কে আছে? এমনই স্বধর্মত্যাগী, স্বদেশবৈরী, কুলাঙ্গার না জুটিলে, বঙ্গের বা ভারতের স্বাধীনতাসূর্য চিরঅস্তমিত হইবে কেন?"

এ জাতীয় দেশপ্রেমমূলক রচনায় গতানুগতিকতা অনুসরণ করা ছাড়া লেখকদের উপায় ছিল না। হারাণচন্দ্র চিরাচরিত পথই অনুসরণ করেছিলেন এবং বারবার উৎসাহিতও হয়েছিলেন—এর প্রমাণ মিলবে তাঁর পরবর্তী উপন্যাসে। প্রতাপাদিত্যের চরিতকথা ভাবাবেগে আবৃত্তি করে স্বদেশপ্রেমিক যে আনন্দলাভ করেছিলেন পরবর্তীকালে প্রতাপসিংহের জীবনকাহিনী রচনার মূলেও সেই একই আদর্শ বর্তমান। 'মন্ত্রের সাধন' [১৩০৫] নাম দিয়ে ঐ উপন্যাসে হারাণচন্দ্র তাঁর দৃঢ় স্বদেশপ্রীতি ব্যাখ্যা করেছেন। 'মন্ত্রের সাধন' গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন হারাণচন্দ্র,—

"বাঙ্গালীর প্রতাপ যাঁহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিয়াছে, আশা আছে, রাজপুত

প্রতাপও তাঁহাদের হৃদয় আকর্ষণ করিবে। মন্ত্রের সাধন সেই স্বদেশপ্রেমিক পুণ্যশ্লোক প্রতাপসিংহের জীবনী অবলম্বনে রচিত।"[৪৯]

সমসাময়িক স্বদেশপ্রেমিক উপন্যাসকারগণ এই ভাবেই মহান ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের প্রয়াস পেয়েছিলেন। কল্পিত স্বদেশপ্রেমিকের কাহিনী রচনায় রুচি ছিল না তাঁদের,—প্রকৃত সত্য ও বাস্তব ইতিহাসের পুনরাবৃত্তিতে উৎসাহ হারাননি এঁরা। প্রতাপসিংহের বহুকথিত বহুলপ্রচারিত কাহিনীতে রসসঞ্চারের অভিনব উপায় জানা ছিলো না এঁদের,—তবু অকৃত্রিম দেশানুরাগসিক্ত হৃদয়ের আবেগে এঁরা পুনরাবৃত্ত কাহিনীকেই বলবার চেষ্টা করেছেন। মহাজনদের পথে অনুগমনের বাসনা অতিক্রম করা ত সাধারণ লেখকের পক্ষে কোন যুগেই সম্ভব নয়। প্রাচীন যুগের লেখকরাই এ অভিযোগে অভিযুক্ত নন,—উনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশ-চেতনার মত একটি সর্বজন অনুভববেদ্য বিষয় নিয়েও এ যুগের লেখকেরা চূড়ান্ত গতানুগতিকতা দেখিয়ে গেছেন। প্রতাপসিংহের কাহিনী অবলম্বনে হারাণচন্দ্র যে উপন্যাস রচনার আন্তরিক আবেগ অনুভব করেছিলেন সে শুধু বিষয়ান্তরে যাবার পথ জানা ছিলো না বলেই। এ কাহিনীতে প্রতাপসিংহের বীরত্ব, শৌর্যবীর্য যথাসাধ্য শক্তি দিয়েই পরিস্ফুট করার চেষ্টা করেছেন লেখক।

স্বদেশোদ্ধার প্রতাপসিংহের আবাল্য সাধনা—আহেরিয়া উৎসবে প্রতাপসিংহ জলন্ত ভাষায় উদ্দীপনা সঞ্চার করেছেন,—

"যাহারা রাজপুত জাতির শত্রু, রাজপুতের স্বাধীনতার শত্রু, সমগ্র মিবারের শত্রু, সেই পাপ মোঘলের করাল গ্রাস হইতে জননী জন্মভূমিকে উদ্ধার করিবার জন্য, কায়মনোবাক্যে দেবীসমক্ষে প্রার্থনা করাই এ ব্রতের গূঢ় উদ্দেশ্য।"

সমস্বরে উচ্চারণ করেছে সকলে—"মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"। এই মন্ত্রটিই সমগ্র গ্রন্থটিতে একটি গাম্ভীর্যপূর্ণ আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে। স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা কিংবা অর্জন করা অসাধ্য নয়—মন্ত্রের সাধনা যার প্রাণে শক্তিসঞ্চার করে সে সর্ববিপদমুক্ত হতে পারে অনায়াসে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটিতে 'মন্ত্রের সাধন' শব্দটিকে ব্যাখ্যা করেছেন লেখক। প্রতাপসিংহ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সমগ্র জাতিকে যে কঠোরব্রত পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন তার বর্ণনা পাই এখানে। এই কঠিন আত্মসংযমের আদর্শে দীক্ষিত হলেই ঈপ্সিত স্বাধীনতা লাভ সম্ভব। ত্যাগের শক্তিতেই প্রতাপসিংহ অজেয় বীর

৪৯. হারাণচন্দ্র রক্ষিত, মন্ত্রের সাধন, ১৩০৫।

হতে পেরেছিলেন। রাজ্যসুখ, বিলাস, আরাম, ত্যাগ করে, রাজধানী ত্যাগ করে আরাবল্লীর পর্বত কন্দরে আশ্রয় নিয়েছিলেন প্রতাপসিংহ এবং সমগ্র দেশবাসী প্রতাপের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন। প্রতাপসিংহ বলেছেন,

"এ ব্রত গ্রহণের নাম 'মন্ত্রের সাধন'। স্বদেশের জন্য, স্বজাতির মঙ্গলের জন্য, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য,—এই মহামন্ত্র সাধন করিলে, জগদীশ্বর অবশ্যই আমাদের মনস্কাম পূর্ণ করিবেন। মিবার আমাদের মাতৃভূমি, জননীস্বরূপা; সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমি—সেই সোনার রাজস্থানের উৎকৃষ্ট অংশ—স্বর্গতুল্য চিতোর আজ মোঘলের পদানত। মা আজ শত্রু কর্তৃক নিগৃহীতা—সেই মায়ের সন্তান হইয়া কি আমরা অধম কুলাঙ্গারের ন্যায় নিষ্ফল জড়জীবন ধারণ করিব ?"

লেখক এই অংশটিতে দেশসেবার উৎকৃষ্ট পথটি চিনিয়ে দিয়েছেন। এই কঠোর আত্মত্যাগের মধ্যেই সাফল্যের ইঙ্গিত রয়েছে। এই আদর্শে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বাঙ্গালীকে চালিত করার সাধনা করেছিলেন লেখকেরা। বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠে' দেশভক্তি সঞ্চার করেছিলেন,—হারাণচন্দ্র ইতিহাসের কাহিনী থেকে ত্যাগ—সাধনার বক্তব্য প্রতিষ্ঠা করেছেন। সব সাধনার শেষে ত্যাগের সাধনাই জয়যুক্ত হবে, এ বিশ্বাস নিয়েই প্রতাপসিংহ আমরণ সংগ্রাম করেছিলেন।

প্রতাপসিংহের পরাক্রম দেখা গেছে হলদিঘাটের যুদ্ধে। লেখক হারাণচন্দ্র হলদিঘাটকে নিয়ে আপন অন্তরের উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেছেন,

"এই কি সেই হলদিঘাট ? যেখানে সহস্র সহস্র রাজপুত স্বদেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ, হাসিতে হাসিতে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছিল ? এই কি সেই বীর জাতির পুণ্যতীর্থ ? হায়! কালে সব গিয়াছে, আছে কেবল পুণ্যময়ী স্মৃতি। স্মৃতি পুণ্যময়ী বলিয়া, প্রীতিময়ী বলিয়া, সহৃদয় কবি ও স্বদেশবৎসল লেখক, অন্তরের অন্তরে সেই চিত্র জাগাইয়া রাখিয়া, কাব্যে ও ইতিহাসে তাহা অঙ্কিত করিয়া আসিতেছেন।

এ জাতীয় বর্ণনা কাব্যেও অজস্র আছে। পলাশীক্ষেত্র দেখে নবীনচন্দ্র এ জাতীয় উচ্ছ্বাসের পরিচয় দিয়েছেন। হারাণচন্দ্র স্বদেশপ্রেমিক, তাই এ ব্যাপারে স্বদেশপ্রেমিক কবিদের সঙ্গে তার সাধর্ম্য লক্ষ্য করি।

'মন্ত্রের সাধন' উপন্যাসটি দুটি খণ্ডে বিভক্ত। প্রতাপসিংহের ভ্রাতা শক্তসিংহের সঙ্গে শত্রুতার অবসানে প্রথম খণ্ডটি সমাপ্ত হয়েছে। প্রতাপসিংহের স্বদেশপ্রেমেই অবশেষে বশীভূত হয়েছিল শক্তসিংহ।

দ্বিতীয় খণ্ডে প্রতাপসিংহের আজীবন সাধনার পরিণতির কথা শুনিয়েছেন লেখক। প্রতাপসিংহ চিতোরের স্বাধীনতা অর্জনের সংগ্রামে অটল ছিলেন, অপরাজেয় ছিলেন—কিন্তু জয়ী হতে পারেননি। মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে এই গ্লানি প্রতাপকে

পীড়িত ও উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল। উপন্যাসের শেষাংশে অবসাদগ্রস্ত-বেদনার্ত প্রতাপসিংহকে চিতোরলক্ষ্মী স্বপ্নে দেখা দিয়ে বললেন,

"তারপর শুন বৎস। ভারতে হিন্দু মুসলমানকে একতাসূত্রে আবদ্ধ করিতে, শান্তি ও সভ্যতা চিরস্থাপিত করিতে, সুদূর শ্বেতদ্বীপ হইতে শ্বেতকায় একদল মহৎজাতি শীঘ্রই এখানে আগমন করিবেন। তাহারাই ভারতের ভাবী সম্রাট। সেই অশেষ গুণালংকৃত, মহামহিমান্বিত রাজার রাজত্বে সূর্য্য অস্তাগমন করিবেন না। জ্ঞানে, গুণে, কার্য্যকারিতায়, তাহারা পৃথিবীর অগ্রগণ্য। অজ্ঞান মোঘল তোমার মর্য্যাদা বুঝিল না বটে; কিন্তু সেই জ্ঞানবান, ন্যায়বান, সুসভ্য রাজরাজেশ্বর তোমার মহত্ত্ব কাব্যে ও ইতিবৃত্তে জলন্ত অক্ষরে ঘোষিত করিবেন।"

এ অংশটিতে লেখকের বক্তব্যটি লক্ষণীয়। লেখকের ইংরেজ প্রীতি ও ইংরেজ মুগ্ধতা প্রকট হয়ে উঠেছে এখানে। বঙ্কিমভক্ত লেখক বঙ্কিম নির্বাচিত পদ্ধতিতেই উপন্যাসের উপসংহার করেছেন। সেযুগের আত্মজাগরণ লগ্নেই এই অচিন্তিত উদার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় রেখেছেন লেখকরা। দেশপ্রেমে ভরপুর হয়েও ইংরেজের মহিমা-কীর্তনে বিরত থাকেননি এঁরা। লেখক হারাণচন্দ্রও বলেছেন,

"চিতোরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর এই ভবিষ্যৎ বাণী আজ সম্পূর্ণ রূপে সফল হইয়াছে। ইংরেজরাজের কৃপায় ভারতবাসী আজ সর্ববিধ সুখের আস্বাদ পাইতেছে।"
—সর্ববিধ সুখের আস্বাদ পাওয়া সত্ত্বেও কোন অশান্তি নিশ্চয়ই লেখকের শিরঃপীড়ার কারণ হয়েছিল। এ জাতীয় উদ্দেশ্যমূলক রচনার মূলেও সেই বেদনাই বর্তমান। এ জাতীয় স্পষ্ট ইংরেজ প্রশস্তির সঙ্গে স্বদেশপ্রেমিকতার বিরোধ কল্পনা করা যায় সহজেই কিন্তু পরাধীনতার অভিশাপেই লেখক স্বভাবের বিশুদ্ধি রক্ষা করতে পারেননি—বুদ্ধিমান লেখকবৃন্দ প্রশস্তি দিয়ে তুষ্ট করেছেন শাসকগোষ্ঠীকে। আত্মরক্ষার এ অস্ত্র যোগ্য রথীকেও ব্যবহার করতে দেখেছি সাধারণ লেখকসম্প্রদায় এ ব্যাপারেও মহাজনপন্থাই অনুসরণ করেছিলেন।

এ যুগের খ্যাতনামা লেখক চণ্ডীচরণ সেনও ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনার মাধ্যমে স্বদেশপ্রেমের পরিচয় রেখেছেন। চণ্ডীচরণের স্বদেশপ্রেম সর্বজনবিদিত। চণ্ডীচরণের স্বদেশপ্রেমের প্রেরণা 'Uncle Tom's Cabin'. এই ঐতিহাসিক গ্রন্থটি অনুবাদের সময় চণ্ডীচরণ অনুভব করেছিলেন দেশের নির্যাতিত মানুষের কথা। 'টম কাকার কুটির'-ই তাঁর প্রথম রচনা।

চণ্ডীচরণ ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করেছিলেন বটে কিন্তু জনশ্রুতিমূলক কাহিনীর সঙ্গে কল্পনার সংমিশ্রণে উপন্যাস রচনার যে ঐতিহ্য চলে আসছিল এতদিন—চণ্ডীচরণ সে পথ অনুসরণ করেননি। চণ্ডীচরণ মুখ্যতঃ অধুনাতন যুগের

কাহিনীই অবলম্বন করেছিলেন। এমন সব চরিত্রকে তিনি উপন্যাসে জীবন্ত করে তুলেছেন যাঁরা তখনো ঠিক ইতিহাস হয়ে যাননি। তাঁরা তখনও অবিসংবাদিতভাবে বীরত্বের আদর্শ কিংবা জাতীয় বীরচরিত্র রূপে পূজিত বা গৃহীত হননি। সেদিক থেকে বিষয় নির্বাচনে চণ্ডীচরণ মৌলিক পন্থা আবিষ্কার করেছিলেন। চণ্ডীচরণের উপন্যাসের বক্তব্যও অন্যজাতীয়। স্বদেশপ্রেমের উচ্ছ্বাসে অভিভূত না হয়ে তিনি জাতীয়চরিত্রের সমালোচনার দিকেই অধিক মনোযোগ দিয়েছিলেন। তাঁর এ শ্রেণীর রচনাকে উপন্যাস বলা যায় কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। লেখক তাঁর 'মহারাজা নন্দকুমার' উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন, "বঙ্গদেশের ইতিহাস পাঠ করিতে জনসাধারণের রুচি হয় এই নিমিত্তই উপন্যাসের আকারে এই পুস্তক লিখিত হইল।"

সুতরাং উপন্যাসের আকারে তিনি সত্য ঘটনা সম্বন্ধে জনগণকে অবহিত করবারই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। উপন্যাসটির দ্বিতীয় নামটিও অর্থপূর্ণ—"শতবর্ষ পূর্ব্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা।"—এ জাতীয় রচনার মূলে স্বদেশপ্রেমের প্রত্যক্ষ-প্রেরণাই বর্তমান। লেখকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল নন্দকুমার চরিত্রের একটি নিরপেক্ষ সমালোচনা রচনা করা। নন্দকুমারকে সে যুগের মানুষ সঠিকভাবে বিচার করতে পারেনি বটে, কিন্তু নন্দকুমারের ফাঁসির ঘটনাটিতে শিহরিত হয়েছিল সে যুগের ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা। বস্তুতঃ বিদেশীরা সত্যবিচারের অছিলায় একটি নির্মম হত্যাকাণ্ডেরই সূচনা করেছিল সেদিন, নন্দকুমার সেদিক থেকে বিদেশী শাসনের প্রথম বলি। ঔপন্যাসিক নিরপেক্ষভাবে নন্দকুমারের প্রকৃত তথ্য বর্ণনা করেছেন,—অকারণ প্রশংসা বা অহেতুক উচ্ছ্বাস সত্যবিচারে বাধা দেয়নি। এ জাতীয় ঘটনা বর্ণনায় স্বদেশপ্রাণ লেখক অবিচল নিষ্ঠারই পরিচয় দিয়েছেন। সেদিক থেকে গ্রন্থটির তথ্যগত মূল্য স্বীকার্য। নন্দকুমারের বিচারের নথিপত্র পাঠ করে লেখক যে ধারণা অর্জন করেছিলেন,—সে বর্ণনাই স্থান পেয়েছে গ্রন্থটিতে। তা ছাড়া শতবর্ষ পূর্বের বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থার চিত্রটিও উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বাঙ্গালীর সামনে তুলে ধরেছিলেন তিনি।

বঙ্গের সুবাদার সর্বনিন্দিত মীরজাফরের দেওয়ান নন্দকুমার কিভাবে সমগ্র জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন—সেটাই আশ্চর্য। হিন্দু ব্রাহ্মণ নন্দকুমার রাজকার্য করে, ধর্ম-বুদ্ধি ও সৎচিন্তা বজায় রেখেছিলেন তার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। অবশ্য এখানে নন্দকুমারের গুরুদেব চরিত্রটি কল্পনা করে লেখক খানিকটা যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। এই তেজস্বী বৃদ্ধ নন্দকুমারকে বিপদে-সম্পদে শুভ-বুদ্ধি দান করেছেন। রাজপদ প্রাপ্ত হয়ে নন্দকুমার দেশের দুর্দশা অনুভব করেছিলেন মনে প্রাণে। নন্দকুমার আত্মবিশ্লেষণ করেছেন,—

"অত্যাচারী রাজার দাসকেও বাধ্য হইয়া অত্যাচার করিতে হয়—আমি নবাবের দেওয়ান? আমি এক প্রকার ইংরাজদিগের দেওয়ান হইয়া পড়িয়াছি। ইংরাজ কে? কয়েকজন বণিক মাত্র। তাহারা কি দেশের রাজা? তবে তাহারা কেন প্রজাদিগের উপর ঈদৃশ অত্যাচার করিবে?"৫০

এই সচেতনতা নিয়ে নন্দকুমারের পক্ষে নির্বিচার দাসত্ব ও অন্যায়ের সমর্থন করা সম্ভব হয়নি। নন্দকুমার বাঙ্গালী জাতির মনোভাব বিশ্লেষণ করে বলেছেন,—

"দেশের সমুদয় লোকই ইংরাজদিগের বাণিজ্যকুঠীতে চাকরি পাইবার নিমিত্ত লালায়িত; তাহারা বাণিজ্যকুঠীতে চাকরি পাইবার নিমিত্ত প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে; তাহারা কি ইংরাজদিগকে দেশ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিতে অগ্রসর হইবে? কখনই না।...বাঙ্গালী জাতি! চাকরি ইহাদিগের জীবনসর্বস্ব। সকলেই নবকৃষ্ণ মুন্সির পথাবলম্বন করিবে,—ইংরেজদিগের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দেশের লোকের উপর অত্যাচার করিবে।"

এই উক্তি নন্দকুমারের গভীর দেশচিন্তারই ফল। ইংরেজরাজত্বের প্রারম্ভে নন্দকুমার বাঙ্গালীর যে চরিত্রলক্ষণ নির্ণয় করেছিলেন তা প্রায় অভ্রান্ত। চাকুরীজীবী বাঙ্গালী সমাজের প্রতি লেখকেরও দারুণ অভিযোগ। চণ্ডীচরণ সে যুগের সমাজ সমালোচনায় এই নতুন এবং বলিষ্ঠ বক্তব্যটি যোগ করেছিলেন। স্বার্থপরতা ও ঐক্যবোধের অভাব নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের অভিযোগ ছিল সীমাহীন। চণ্ডীচরণ বাঙ্গালীর এই দুর্দশাটির প্রতি আলোকপাত করেছিলেন,—

"বাঙ্গালী জাতি চাকরির নিমিত্ত বিশেষ লালায়িত। জগতে এমন কি কুকার্য্য আছে যে অনেকানেক বাঙ্গালী চাকরির প্রত্যাশায় তাহা করিতে সংকুচিত হয়েন? চাকুরি বাঙ্গালীর প্রাণ, চাকুরি বাঙ্গালীর জীবনসর্বস্ব, চাকুরি বাঙ্গালীর একমাত্র উপাস্য দেবতা।"

বঙ্কিমচন্দ্রের মত আত্মত্রুটি সংশোধনের পথটিকেই ধ্রুবপথ হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন লেখক। সমাজদরদী লেখক হিসেবে চণ্ডীচরণ মাঝে মাঝে সাবধান-বাণীও উচ্চারণ করেছেন,—

"যতদিন এ সংসারে পাপ ও অত্যাচার থাকিবে, যতদিন জনবিশেষের স্বার্থপরতা সামাজিক সহানুভূতির বন্ধন ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিবে, ততদিন সেই দাবাগ্নি-স্বরূপ প্রজ্বলিত পাপানলের আক্রমণ হইতে কেহই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না।"

চণ্ডীচরণ সনাতন সত্যে বিশ্বাসী ছিলেন। বাংলা দেশের চরম দুরবস্থার কারণ নির্ণয় করতে গিয়ে তিনি বলেছেন,—

৫০. চণ্ডীচরণ সেন, মহারাজ নন্দকুমার অথবা শতবর্ষপূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থা, ১২৯২।

শতবর্ষ পূর্বে দেশের সামাজিক অবস্থা ঈদৃশ শোচনীয় ছিল বলিয়াই বঙ্গবাসিগণকে স্বীয় কুকার্য্যের প্রতিফল স্বরূপ নানাপ্রকার অত্যাচারে নিপীড়িত হইতে হইয়াছিল।... এইরূপ সমাজে প্রকৃত দেশহিতৈষীর কখন উদ্ভব হয় না। এইরূপ সামাজিক অবস্থা নিবন্ধন প্রত্যেক নরনারীর অন্তর নীচাশয়তার আধার হইয়া উঠে।

চণ্ডীচরণ শতবর্ষ পূর্বে বঙ্গের সামাজিক অবস্থার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি বর্ণনা প্রসঙ্গেই একথা উচ্চারণ করেছিলেন।

নন্দকুমারের চারিত্রিক ত্রুটি সম্পর্কেও লেখক সোচ্চার। অত্যাচার-অবিচার ও অসত্য যেন সেদিনের জনজীবনকে গ্রাস করেছিল, কিন্তু আত্মাহুতি দিয়ে তার প্রতিবাদ করার শক্তি ও সাহসেরই অভাব ছিল। আত্মস্বার্থরক্ষা যেখানে প্রবল-দুর্বল সেখানে অসহায় অরক্ষিত। বাঙ্গালী চরিত্রের এ কলঙ্ক কাহিনী লেখক মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন। নন্দকুমারের প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রচারিত হবার পরে বাপুদেব শাস্ত্রী শেষ সাক্ষাৎকারে বলেছেন,—

"দেশীয় লোকের উপকার করা তো তোমার ইচ্ছা ছিল না। অন্য লোক দেশীয় লোকের উপর অত্যাচার করে, প্রভুত্ব করে, তাহা তোমার সহ্য হইত না। তোমার মনের ভাব ছিল যে, আমি থাকিতে অন্যে কেন ইহাদিগের উপর প্রভুত্ব করিবে? এই তো তোমার স্বদেশানুরাগ ও দেশহিতৈষিতা। অথচ মুখে বলিতে যে দেশের অত্যাচার নিবারণার্থ কেবল দেওয়ানি লাভ করিবার চেষ্টা করিতেছ।"

নন্দকুমার চরিত্রের যথার্থ সমালোচনা হিসেবে এ অংশটি গ্রহণ করা চলে। নন্দকুমারের মৃত্যুতে ক্ষোভ প্রকাশ করেও এই চরম সত্যটি বর্ণনা করতে দ্বিধাবোধ করেননি লেখক। নন্দকুমারের সমসাময়িক যুগের অন্যান্য বাঙ্গালী চরিত্র সম্বন্ধেও লেখক মন্তব্য করেছেন। মৃত্যুভয়ভীত, আত্মস্বার্থপরায়ণ বাঙ্গালীর সামনে সেদিন কোন আদর্শ ছিল না। এ গ্রন্থে বাপুদেব শাস্ত্রী অবশ্য আদর্শপ্রচারের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ঐ চরিত্রটি সম্পূর্ণ কল্পিত এবং লেখকের বাণী প্রচারের উদ্দেশ্যেই এর আবির্ভাব। বাপুদেব শাস্ত্রী রাজবল্লভকে বলেছেন,—

"তোমরা সম্মুখ সংগ্রামে বিনষ্ট হইলেও দেশের বিশেষ মঙ্গল হইবে। পরাজিত হইলেও উপকার আছে। স্বাধীনতা রক্ষার্থ সংগ্রামানল একবার প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে, শতবর্ষেও তাহা নির্বাপিত হয় না। যতকাল স্বাধীনতা লাভ না হইবে, ততকাল এই অগ্নি প্রজ্বলিত থাকিবে, পুরুষ-পরম্পরায়ক্রমে বর্দ্ধিত ভাবে প্রজ্বলিত হইতে থাকিবে। সমরনিহত পিতৃপিতামহের শোণিতসিক্ত পরিচ্ছদ তাহাদের পুত্রপৌত্রগণ সগৌরবে পরিধানপূর্ব্বক দ্বিগুণতর উৎসাহে শত্রু সম্মুখীন হইবে।

বাপুদেব শাস্ত্রীকে যে যুগের আদর্শ পুরুষ রূপে কল্পনা করেছেন লেখক, সে

যুগে এ ধরণের দেশচেতনা এদেশে দুর্লভ ছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের পূর্বাহ্নে দেশপ্রেমী লেখকের পক্ষেই এ কল্পনা সম্ভব ছিল। স্বাধীন চেতনার অভাবেই আমরা পরপদানত হয়েছি,—উনবিংশ শতাব্দীতে এই চেতনার আবির্ভাবেই আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছি, সংগ্রামশক্তি অর্জন করেছি। সমসাময়িক যুগচেতনাই ইতিহাসের আধারে স্থাপন করেছিলেন লেখক। স্বাধীনতা সংগ্রাম যে যুগে আসন্নপ্রায় তার পূর্বাহ্নে এই মূল্যবান ও প্রেরণাসঞ্চারী উক্তিটি লেখকের গভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচায়ক।

নন্দকুমারের মৃত্যুতে শোকগ্রস্ত হয়েছেন লেখক। নন্দকুমার ইংরাজশাসনের প্রথম প্রকাশ্য বলি। অন্যায় বিচারের নিদর্শন হিসেবেই এ ঘটনাটিকে গ্রহণ করেছেন লেখক। ইংরাজ লেখকও এ ঘটনাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছেন,—লেখক মেকলের মত উদ্ধৃত করেছেন.—

'Impey, sitting as a judge put a man unjustly to death in order to serve a political purpose No other such judge dishonoured the English Ermine, since Jefferies drank himself to death in the Tower".

নন্দকুমার বিনা অপরাধে দণ্ডিত হয়েছিলেন—এ সত্যটুকু প্রতিষ্ঠা করাই লেখকের উদ্দেশ্য। নন্দকুমারেরও সান্ত্বনা ছিল যে দেশবাসী একদিন এ সত্য নির্ণয় করবে। চণ্ডীচরণ অপ্রিয় হলেও সত্য পরিবেশন করেছেন মৃত্যুপথযাত্রী নন্দকুমারের সামনেই। শেষ সাক্ষাতের জন্য বাপুদেব শাস্ত্রী এলেন,—দুঃখ প্রকাশ করলেন কিন্তু সত্যবিচারে অপক্ষপাত দৃষ্টির পরিচয় দিলেন তিনি,—

"বঙ্গবাসিগণ স্বাধীন অনুসন্ধান দ্বারা যখন বঙ্গের ইতিহাস লিখিতে আরম্ভ করিবে, তখন দেশের লোক জানিতে পারিবে যে, তুমি বিনা অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছিলে; তখনই দেশের লোক জানিতে পারিবে যে, ইংরাজেরা কৌন্সিল পুস্তকে তোমার বিরুদ্ধে যাহা কিছু লিখিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা।···কিন্তু বঙ্গদেশে তুমি কখনও দেশহিতৈষী বলিয়া পরিগণিত হইবে না। তোমাকে কখনও দেশহিতৈষী বলাও যাইতে পারে না। বঙ্গদেশে দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তোমার ন্যায় স্বার্থপর লোক দেশহিতৈষির পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দেশহিতৈষী বলিয়া আপন আপন পরিচয় প্রদান করিবে। কিন্তু ভাবী বংশাবলি তাহাদিগকে অনায়াসে চিনিতে পারিবে।"

এই ভাবে নন্দকুমারের ঐতিহাসিক পরিচয় নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করাই লেখকের উদ্দেশ্য ছিল। দেশপ্রেমিক বীরচরিত্রের কাহিনী অবলম্বনে বাঙ্গালী ঐতিহাসিক

উপন্যাসকার যখন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছিলেন,—চণ্ডীচরণ সেই সময়ে বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করলেন। তিনি গতানুগতিক বীরচরিত্র অবলম্বন করেননি, কিন্তু দেশপ্রেমের যথার্থ মহিমা নির্ণয় করার উদ্দেশ্যেই দেশপ্রেমিকের সঙ্গে দেশের শত্রুর যথার্থ রূপটিও ফোটানোর চেষ্টা করেছেন। দেশপ্রেমিকের মহিমা যেমন আমাদের উদ্দীপিত করবে, দেশের ক্ষতিসাধনকারীর মুখোশ খুলে দেওয়ার মধ্যেও সেই একই উদ্দেশ্য বর্তমান,—তাও পরোক্ষভাবে আমাদের দেশানুরাগই বাড়তে সাহায্য করবে। তবে নন্দকুমারের চারিত্রিক গুণাবলীরও মুক্তকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন লেখক,—দুঃখপ্রকাশ করেছেন তাঁর নির্মম হত্যাকাণ্ডটির জন্য। সজলচিত্তে বর্ণনা করেছেন মহারাজ নন্দকুমারের ফাঁসীর মুহূর্তটি। বিদেশী শাসনের, নিষ্ঠুরতার এ নজির স্বদেশচেতনাসম্পন্ন দেশবাসীর কাছে উপস্থাপনার চেষ্টাটিই মুখ্য হয়ে উঠেছে, সেখানেই উপন্যাসটির বিশেষত্ব। বঙ্কিমচন্দ্রের মত চণ্ডীচরণ সেনও ইতিহাসপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন,—সত্য ইতিহাস রচনায় মনোনিবেশ করেছেন। এ উপন্যাসেই তিনি বলেছেন,—

"যে জাতীয় লোকের ইতিহাস নাই, তাহাদের জাতীয় জীবন নাই। তাহারা সভ্যতা সভ্যতা বলিয়া যতই আস্ফালন করুক না কেন, তাহাদের সে অসারসভ্যতা দ্বারা মানবমণ্ডলী ক্রম-উন্নতির পথাবলম্বন করিতে সমর্থ হয় না। প্রকৃত ইতিহাসের অভাবই ভারতের অধঃপতনের একটি প্রধান কারণ।

এই উদ্ধৃতির আলোকে চণ্ডীচরণের উপন্যাস রচনার যথার্থ উদ্দেশ্যটি স্পষ্ট হবে। স্বদেশপ্রাণ লেখকের আদর্শ নিয়েই তিনি সাহিত্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

একই সময়ে তিনি কুখ্যাত দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কাহিনী অবলম্বনে আরেকটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। কুখ্যাত ও নিন্দিত চরিত্র নিয়ে উপন্যাস রচনা করেও চণ্ডীচরণ আপন উদ্দেশ্যের সততা প্রমাণ করতে পেরেছিলেন। বাংলারই বুকে দেশপ্রেমিক বীর ও নীচ শয়তান একই সঙ্গে জন্মেছে। কেউ দেশের জন্য জীবন দিয়েছেন, কেউ সর্বনাশ ডেকে এনেছে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ এ জাতীয় একটি নাম। দেশী বিদেশী সমালোচকরা এ চরিত্রটিকে নির্মম ভাষায় সমালোচনা করেছেন। গ্রন্থকার উদ্ধৃতি দিয়ে চরিত্রটির স্বরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। Title page-এ তিনি Edmund Burke-এর উক্তি উদ্ধৃত করেছেন,

Mr. Hasting's Government was one whole system of oppression, of robbery of individuals, of destruction of the public and of supercession of the whole system of the English Government, in order to vest in the worst of the natives all the powers that

could possibly exist in any Government, in order to defeat the ends which all Governments ought in common to have in view.[৫১]

মণীষী বার্ক ভারতবন্ধুর কাজ করেছিলেন, ভারতবাসীর দুর্দশা তাঁর অন্তর স্পর্শ করেছিল। স্বদেশপ্রাণ লেখক কুখ্যাত স্বদেশীয়দের পাপের চিত্র বর্ণনা করেছেন, মহৎ ইংরেজের মহানুভবতা অনুভব করেছেন এভাবে। দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের অত্যাচার বর্ণনা করেছিলেন অন্য একজন ইংরেজ। হেস্টিংস-এর বিচার সভায় Mr. Peter Moore বলেছিলেন,

"Ganga Govinda was considered as a general oppressor of every native, he had to deal with. By Europeans he was detested, by natives he was dreaded".

ষোড়শ অধ্যায়ের ভূমিকায় লেখক এই উদ্ধৃতি তুলে দিয়েছেন।

ঔপন্যাসিক চণ্ডীচরণ ক্ষোভে-দুঃখে-ঘৃণায় আপন দুর্বলতার কাহিনী বর্ণনা করেছেন। অত্যাচারী নীচ দেশবাসীরাই আমাদের দুর্গতি বাড়িয়েছিল চতুর্গুণ। সপ্তদশ অধ্যায়ের প্রারম্ভে তিনি নবীনচন্দ্রের আক্ষেপবাণীটি তুলে দিয়েছেন—

রে পাপিষ্ঠ রাজা রায়দুর্লভ দুর্ব্বল,
বাঙ্গালি কুলের গ্লানি, বিশ্বাস ঘাতক
ডুবিলি ডুবালি পাপি। কি করিলি বল,
তোর পাপে বাঙ্গালির ঘটিবে নরক।

এ জাতীয় কলঙ্কের ইতিহাসও আমাদের জানা দরকার। লেখক নির্ভীকভাবে আত্মসমালোচনা করেছেন। দেশাত্মবোধই তাঁকে এই জাতীয় চরিত্র রচনার শক্তি দান করেছিল। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কলঙ্কিত নাম ইতিহাস থেকে মুছে গেছে—কিন্তু আত্মপ্রতিষ্ঠার লগ্নে সেই কলঙ্কের ইতিহাসই আমাদের মনে নতুন শক্তি সঞ্চার করবে। আমরা শৌর্যবীর্যের দ্বারা উদ্দীপ্ত হবো, বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত আমাদের স্বদেশপ্রেমকে আরও দৃঢ় করবে। বিদেশীরাও এ জাতীয় কলঙ্কিত চরিত্রকে ঘৃণা করেছে,—আমরা সে সম্বন্ধে অবহিত হবো নিশ্চয়ই। লেখক সমস্ত মালমশলা সংগ্রহ করে ঐতিহাসিক দলিলই উপস্থাপিত করেছেন।

Edmund Burke নির্মম ভাষায় গঙ্গাগোবিন্দ সিংহকে ব্যাখ্যা করেছিলেন,—

"a name at the sound of which all India turns pale the most

৫১. চণ্ডীচরণ সেন, দেওয়ান গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ, ১২৯২।

wicked, the most atrocious, the boldest, the most dexterous villain that ever the rank servitude of that country has produced".

এ অপমান আমাদের জাতীয় চরিত্রের ওপরেই যেন আঘাত করেছে। লেখকও মহাদুঃখে বলেছেন,—

"আমাদের ভারতবর্ষের যে সকল লোকের বীরত্ব ছিল, শূরত্ব ছিল, তেজ ছিল, মনুষ্যত্ব ছিল, তাহারা প্রায় সকলেই মুসলমানদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া সংগ্রামক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন করিলেন। কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্র হইতে যাহারা পলায়ন করিয়া প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন, আমরা তাহাদের সন্তান। পলায়িতদের বংশাবলী বলিয়াই আমরা এত কাপুরুষ হইয়া পড়িয়াছি।"

লেখকের স্বদেশচেতনা এখানে পূর্ণমাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। বাঙ্গালী চরিত্রে তিনি কাপুরুষতা দেখেছিলেন। আত্মশক্তিতে জাগ্রত বাঙ্গালী চরিত্রের সামগ্রিক শুদ্ধতা কামনা করেছিলেন যে লেখকবৃন্দ চণ্ডীচরণ তাঁদেরই একজন। বাঙ্গালীর সামাজিক জীবনে যে অধঃপতনের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন লেখক—তাতেও এ উদ্দেশ্যই প্রকট। রাজনৈতিক স্বাধীনতা পাওয়ার আগে নৈতিক স্বাধীনতা লাভ করা দরকার, রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন যখন ঘনীভূত সেখানে লেখক আপন মতামতই ব্যক্ত করেছিলেন। এ উপন্যাসের একটি চরিত্র [প্রেমানন্দ] বলেছেন—

"বাঙ্গালী জাতি যদি কাপুরুষতা নিবন্ধন কেবল রাজনৈতিক অত্যাচারে নিপীড়িত হইত, তবে সমবেত চেষ্টা দ্বারা রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির জন্য যত্ন করিতাম। কিন্তু ইহাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থাও যারপরনাই ঘৃণিত। জাতিভেদ, স্ত্রীজাতির অবরুদ্ধাবস্থা, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌলিন্যপ্রথা, সহমরণ প্রভৃতি কুৎসিৎ দেশাচার ইহাদিগকে ক্রমেই অবনতাবস্থা হইতে সমধিক অবনতাবস্থায় পরিচালন করিতেছে।"

লেখক যে যুগে রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির প্রসঙ্গ কল্পনা করেছেন সে যুগে তা ছিল অচিন্তিত-অভাবনীয়। লেখক তাঁর সমসাময়িক যুগের রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির আয়োজন প্রত্যক্ষ করেছিলেন, এ সমালোচনা তাঁর সাময়িক যুগের প্রকৃত অবস্থারই সমালোচনা বলে মনে করতে হবে।

চণ্ডীচরণ এ জাতীয় ঐতিহাসিক উপন্যাস আরও লিখেছিলেন,—'ঝান্সীর রানী' উপন্যাসটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ১৮৮৮ খৃঃ ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ-এর জীবনচরিত রচনা করতে বসেছিলেন লেখক,—ইতিপূর্বেই এ উজ্জ্বল ইতিহাসটি নিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু রচনা হয়নি বলে লেখক এ ব্যাপারে যথেষ্ট মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিয়েছেন। ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈ তখনও ঐতিহাসিক চরিত্র হননি। ১৮৫৭ খৃঃ সমগ্র ভারতে

যে সমরানল প্রজলিত হয়েছিল, ঝান্সীর রানী সেই সংগ্রামেই প্রাণত্যাগ করেন। এই বীরাঙ্গনা নারীর অসীম বীরত্বকাহিনীর সম্যক প্রচারের প্রয়োজনও ছিল। গ্রন্থকার সে প্রয়োজন ছাড়াও আরও একটি কারণে এ গ্রন্থরচনার আয়োজন করেছিলেন। ইংরেজ ইতিহাসলেখকগণ ঝান্সীর রানীর সঠিক মূল্যায়ন না করে কল্পিত অভিযোগ এনে এ চরিত্রটিকে কলঙ্কিত করার চেষ্টা করেছেন—গ্রন্থকার তারই প্রতিবাদে লেখনী ধারণ করেছেন। এ প্রচেষ্টাটিকে স্বদেশপ্রেমী লেখকের নির্ভীক রচনা বলেই অভিনন্দিত করা প্রয়োজন। আমাদের ইতিহাসের সত্য সঠিকভাবে নির্ণয়ের দায়িত্ব আমাদেরই হাতে। ইংরেজ ঐতিহাসিকের প্রদত্ত মিথ্যা বিবরণ প্রতিবাদযোগ্য বিবেচনা করেছিলেন বলেই স্বদেশচেতনার প্রেরণায় এ গ্রন্থ রচনা করেছিলেন তিনি।

ভূমিকায় তাঁর উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত করছেন লেখক,—

"ইংরেজ ইতিহাসলেখকগণ ঝান্সীর রানী বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈয়ের চরিত্র অনর্থক কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহারা বলেন ঝান্সীর হত্যাকাণ্ড রানীর আদেশানুসারে হয়। কিন্তু ঝান্সির হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে যে রানীর সংশ্রব ছিল, তাহার কিঞ্চিৎমাত্রও প্রমাণ নাই।"

রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের ন্যায় বীরাঙ্গনা ইংলণ্ডে কিংবা আমেরিকাতে জন্মগ্রহণ করিলে প্রত্যেক লোক আপন আপন গৃহে যত্ন সহকারে তাঁহার প্রতিমূর্তি রাখিতেন। কিন্তু ভারতবর্ষের লোক এখন পর্য্যন্তও রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের গুণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়েন নাই।

লক্ষ্মীবাঈয়ের চরিত্রের এই বৃথা কলঙ্ক নিবারণার্থ ঝান্সী বিদ্রোহের প্রকৃত ঘটনা অবলম্বনপূর্বক এই পুস্তক লিখিত হইয়াছে।"[৫২]

ঝান্সীর রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের স্বদেশপ্রাণতা, বীরত্ব কাহিনী বর্ণনাই এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য হলেও পটভূমিকায় গুরুত্বপূর্ণ সিপাহীবিদ্রোহের বিষয়টি তিনি গ্রহণ করেছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহ সম্বন্ধে গতানুগতিক ধারণার সঙ্গে চণ্ডীচরণের বর্ণনার মিল নেই। তিনি একে বর্ণনা করেছেন এভাবে।

"১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে ভারতে আবার দেশব্যাপী সমরানল প্রজলিত হইয়া উঠিল। এক বৎসর পূর্বে ভারতের অভ্যন্তরে ও বাহিরে সর্বত্রই শান্তি বিরাজ করিতেছে, ভারতে ইংরাজরাজত্ব চিরকালের নিমিত্ত দূরীভূত হইয়াছে—এই ধ্বনিতে দেশ নিনাদিত হইতেছিল। কিন্তু এক বৎসর অতিবাহিত হইতে না হইতে 'ইংরাজ-রাজত্ব বিলোপপ্রায়' এই ধ্বনিতে দেশ পরিপূর্ণ হইল।

স্পষ্টতঃই বোঝা যায় সিপাহীবিদ্রোহের যে ব্যাখ্যা তিনি দিতে চেয়েছিলেন,

৫২. চণ্ডীচরণ সেন, ঝান্সীর রানী, ১৩০১।

সেটা তাঁর গভীর বিশ্বাসপ্রসূত ধারণা। সিপাহীবিদ্রোহ তাঁর দৃষ্টিতে ইংরাজ রাজত্ব বিলোপের আন্দোলন।

এই আন্দোলনের পটভূমিকায় রানী লক্ষ্মীবাঈয়ের দেশপ্রাণতার মহিমা অনেক বেশী অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে সহজেই। রানী লক্ষ্মীবাঈ স্বাধীনতা আন্দোলনের পুরোভাগে একটি উজ্জ্বল নারীচরিত্ররূপেই প্রতিভাত হয়েছেন লেখকের চোখে—এখানেই তাঁর কল্পনার বিশেষত্ব। লক্ষ্মীবাঈ ও তাঁর সপত্নী গঙ্গাবাঈয়ের মধ্যে তিনি জ্বলন্ত স্বদেশপ্রেমের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। গঙ্গাবাঈ বলেছেন,—

"দেশের সমুদয় লোকই যদি ইংরাজদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার নিমিত্ত ক্ষেপিয়া উঠিয়া থাকে, তবে ইংরাজগণ এবার নিশ্চয়ই পরাজিত হইবে। দেশের কোটি কোটি লোক একত্র হইলে কি আর এই জনকয়েক ইংরাজকে তাড়াইয়া দিতে পারিবে না।"

এই অভিলাষ গঙ্গাবাঈয়ের মনে জলে উঠেছিল দেশাত্মবোধের প্রেরণায়। এই প্রেরণায় লেখকও উদ্দীপিত। ঝান্সীর রানীর বীরত্ব কাহিনী বর্ণনায় সিপাহী বিদ্রোহের উদ্দেশ্যও ব্যাখ্যা করেছেন লেখক,—

"বর্তমান সিপাহী বিদ্রোহের বীজ ইংরাজরাজত্বের প্রারম্ভ হইতেই অঙ্কুরিত হইতেছিল। কিন্তু তৎপ্রতি এ পর্যন্ত কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। এখন সেই বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবামাত্র চতুর্দিক হইতে আহুতি পড়িতে লাগিল। যে সকল লোক এ পর্যন্ত নিতান্ত নিশ্চেষ্ট অবস্থায় জড়ের ন্যায় জীবন যাপন করিতেছিল, আজ তাহারাও ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। তাহাদিগের অন্তরেও বীরত্বের সঞ্চার হইল।"

ইংরাজ জাতির ব্যর্থ রাজনীতিই যে এই সংগ্রামের সূচনা করেছিল সেকথা লেখক বারংবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। রাজ্য পরিচালনায় প্রজার স্বার্থ উপেক্ষিত হলে বিপ্লব অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।

"যে দেশের রাজা প্রজাসাধারণের হিতাকাঙ্ক্ষী নহেন, প্রজার মঙ্গল সাধনে যত্নবান নহেন, যে দেশের রাজা শুদ্ধ কেবল প্রজাদিগের অর্থাপহরণের চেষ্টা করেন, সেদেশে নিশ্চয়ই রাজবিপ্লব উপস্থিত হইবে।"

এই শোচনীয় অবস্থার অবসান ঘটেনি তখনও—সুতরাং চণ্ডীচরণ এ উপন্যাসে যে সত্য পরিবেশন করেছিলেন তার যুগোপযোগী আবেদন তখনও শেষ হয়নি। স্বাধীনতার আন্দোলন একবার প্রজ্বলিত হলে তার দাহ প্রতিটি মানুষের মনে উত্তেজনা সঞ্চার করবেই,—সিদ্ধিলাভ না হওয়া পর্যন্ত তা থেমে যাবে না,—এই ভবিষ্যৎ বাণীটিও লেখকেরই।

"দেশের স্বাধীনতা রক্ষার্থ কিম্বা সমগ্র মানব মণ্ডলীর অধিকার রক্ষার্থ একবার সংগ্রামানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে তাহা কখনও নির্বাপিত হয় না। পুরুষ পরম্পরায় এবং যুগযুগান্তর ব্যাপিয়া সে সংগ্রামানল জ্বলিতে থাকে।"

পঞ্চদশ অধ্যায়ে সিপাহী বিদ্রোহের মূল কারণ অনুসন্ধানে লেখক যথেষ্ট চিন্তা-শক্তি ও যুক্তির পরিচয় দিয়েছেন। এ সংগ্রামকে আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম রূপেই প্রত্যক্ষ করেছিলেন লেখক। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশে ভারতবর্ষে আত্মশক্তি প্রতিষ্ঠার যে আয়োজন চলেছিল সেই মুহূর্তে ঔপন্যাসিকের এ জাতীয় প্রচেষ্টাকে বিশেষভাবে অভিনন্দন জানাতে হয়। অনুরূপ দৃষ্টান্তের আলোচনায় কিছু রাজনৈতিক সচেতনতা সঞ্চারিত হোক এই শুভেচ্ছা লেখকের হৃদয়ে বর্তমান ছিল বলেই রচনাটির অপরিসীম মূল্য স্বীকার করতেই হবে। ঝান্সীর রানীর বীরত্ব বর্ণনাই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। তিনি সমগ্র আন্দোলনটির যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দিয়ে রানীর আত্মদানের মহিমাটির মূল্যায়ন করেছেন।

ঝান্সীর রানী সম্পর্কে ইংরেজদের যে মিথ্যা ধারণা ছিল তা দূর করার জন্ত লেখক ভাবাবেগে বলেছেন,—

ইংরেজরা যদি ভারতবাসীদিগের স্বভাবচরিত্র বিশেষরূপে জানিতেন, তবে কখনও তাঁহারা এই ভীষণ নরহত্যা, স্ত্রীহত্যা এবং শিশুহত্যার কলঙ্কে বীরাঙ্গনা লক্ষ্মীবাঈয়ের পবিত্র নাম কলঙ্কিত করিতেন না।"

এই যুদ্ধে ঝান্সীর রানী যেমন বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন ইংরেজ সৈন্তরাও বীরত্বের সঙ্গে জীবন দান করেছিল। মেজর স্কিনের একটি উক্তির মধ্যে দুঃসাহসী ও আত্মদানে নির্ভীক ইংরাজের বীরত্ব কাহিনী প্রচার করেছেন লেখক,—

"ইংরাজেরা আপন দেশের এবং স্বজাতির মঙ্গলার্থে প্রাণ বিসর্জন করিতে সর্বদাই প্রস্তুত তাহা ইহারা একবার চক্ষু মেলিয়া দেখুক। আমাদিগের এই নির্ভীক মৃত্যু, আমাদিগের জীবনের এই শেষ দৃষ্টান্ত এই অধঃপতিত জাতির মনে বীরত্বের ভাব আনয়ন করুক।"

এখানে আত্মসমালোচনায় মুক্তকণ্ঠ হয়েছেন লেখক। আমাদের স্বদেশচেতনা ও আত্মদানের প্রেরণা যে পরোক্ষভাবে ইংরাজ চরিত্র থেকেই এসেছে সেকথা লেখক অস্বীকার করেননি। আমাদের Patriotism যে বিলাতী আমদানি বঙ্কিমচন্দ্রই সে তথ্য পরিবেশন করেছিলেন,—তাতে চণ্ডীচরণেরও স্পষ্ট সমর্থন আছে। স্বদেশপ্রেমাত্মক রচনাতেও এ জাতীয় উদার মত অকপটে প্রচারের চেষ্টা সেযুগের স্বদেশপ্রেমী লেখকেরই বৈশিষ্ট্য ছিল। সেযুগের এই জাতীয় চেতনা একটা মুক্ত আত্মদর্শনেরই নামান্তর ছিল। পাশ্চাত্য দেশীয় যুক্তিবাদের আলোকে আমাদের

সমস্ত ধারণাগুলোকে যাচাই করার প্রচেষ্টা ছিল বলেই জাতীয়চেতনা একটা সুদৃঢ় ভিত্তির ওপরেই প্রতিষ্ঠালাভ করেছিল।

এ উপন্যাসে যোগীরাজ চরিত্রটি লেখকের নিজস্ব কল্পনা। এ জাতীয় অন্যান্য উপন্যাসেও আমরা একজন সর্বজ্ঞ, উদারচেতা মনস্বী পুরুষের সাক্ষাৎ পেয়েছি। 'মহারাজা নন্দকুমারে' বাপুদেব শাস্ত্রী, দেওয়ান 'গঙ্গাগোবিন্দ সিংহে' প্রেমানন্দ ও 'ঝান্সীর রানী'তে যোগীরাজ একই আদর্শজাত। এঁরা সম্ভবতঃ ঔপন্যাসিকের মনোভাবটি তুলে ধরেন উপন্যাসে। যোগীরাজই রাজা রামমোহনের সমাজসংস্কার ও ধর্মান্দোলনের সমালোচনা করেছেন গ্রন্থটিতে। বিংশতিতম অধ্যায়টিতে বাংলা দেশের সামাজিক চিত্র অঙ্কন করেছেন লেখক, যার বীভৎস রূপ দেখে আমরা ভীত। মূল ঐতিহাসিক কাহিনীর সঙ্গে যোগিরাজের জীবন অভিজ্ঞতার কাহিনী পরিবেশনে কিছু ফললাভ হয়নি বটে, কিন্তু লেখকের মনোভাবটি ধরা পড়েছে।

যোগিরাজ ইংরাজী শিক্ষিত। স্যর হেনরি লরেন্স-এর মুখে আমরা শুনি, "The Bengalees are very loyal to our Government"। সিপাহীবিদ্রোহে ইংরেজের সাফাই গেয়েছেন হেনরি লরেন্স। বাঙ্গালী সম্পর্কে তাঁর এ উক্তিটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু মিথ্যা নয়। সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে সেযুগের বাঙ্গালীর মনোভাবের পরিচয় ঈশ্বরগুপ্তের রচনায় মিলবে। ইংরাজ আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ সে কবিতা সম্পর্কে আমাদের বক্তব্য পূর্বেই যথাস্থানে আলোচনা করেছি।

যোগিরাজ সিপাহীবিদ্রোহ সম্পর্কে যে মতামত দিয়েছেন—সে মতবাদ লেখকেরই। যোগিরাজই বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে ভারতবাসীর মনে স্বদেশানুরাগ ছিল। তিনি বলেছেন,—

Sir, this is not a sudden outbreak. It has its origin in the selfish policy of the East India Company. The policy of Exclusion and Monopoly has been the cause of great disaffection since your first occupation of the country, and the present outbreak, though apparently sudden, is the inevitable consequence of that widespread disaffection". [পৃঃ ২০৬]

এই অংশটি থেকেই লেখকের স্বদেশচেতনার পরিচয় যেমন স্পষ্ট হয় তেমনি সিপাহী বিদ্রোহ সম্পর্কে বাঙ্গালীর ধারণার যে পরিবর্তন ঘটেছিল তাও বোঝা সহজ হয়। সিপাহী বিদ্রোহ নিয়ে দীর্ঘ ইতিহাস রচনা করেছিলেন রজনীকান্ত গুপ্ত। এখানে লেখক তাঁর নিজস্ব ধারণাটিই প্রচার করেছেন, দ্বিধাহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, সিপাহী বিদ্রোহ স্বদেশপ্রেমী জনগণের প্রথম আত্মপ্রতিষ্ঠারই সংগ্রাম। ঝান্সীর

রানী লক্ষ্মীবাঈ ছিলেন সেই প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বীর নায়িকা। যুদ্ধক্ষেত্রে, প্রত্যক্ষ-সংগ্রামে আত্মবিসর্জন করে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। পরবর্তী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি লগ্নে এ দৃষ্টান্তটি লেখকের মনে গভীর দেশানুরাগের সঞ্চার করেছিল. উপন্যাসের আকারে ইতিহাসের এই উজ্জ্বল অধ্যায়টি রচনা করে তিনি পরোক্ষভাবে তাঁর দেশপ্রীতিরই পরিচয় দিয়েছেন।

চণ্ডীচরণের এই স্বদেশপ্রেমসর্বস্ব উপন্যাস সম্পর্কে সাহিত্য সাধক চরিতমালাকার ব্রজেন্দ্রনাথের উক্তিটি স্মরণযোগ্য।

'চণ্ডীচরণের গল্প বলিবার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল, ইহার সহিত তাঁহার তেজস্বিতা ও স্বদেশপ্রেমিকতা মিলিত হওয়াতে তাঁহার রচিত ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলি একদিকে যেমন জনসাধারণের প্রিয় হইয়াছিল, অন্যদিকে তেমনি সরকারের বিরাগভাজন হইয়াছিল। 'নন্দকুমার, অযোধ্যার বেগম ও ঝান্সীর রানী'র—কাহিনী প্রণেতাকে বাঙ্গালী কোনদিনই ভুলিতে পারিবে না।'

এই শ্রদ্ধাঞ্জলি লেখকের প্রাপ্য।

সপ্তম অধ্যায়

॥ ব্যঙ্গাত্মক রচনা ॥

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গদ্যসাহিত্য সৃষ্টির অনতিকাল পরেই ব্যঙ্গাত্মক রচনার সাক্ষাৎ পাই। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠীর রচনায় বাংলা গদ্য শুধু অবয়ব লাভ করেছে মাত্র, কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই গদ্যে নানা বৈচিত্র্য সম্পাদিত হয়েছিল, ব্যঙ্গাত্মক রচনা তারই অন্যতম। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠীর রচনাতেও আমরা সমাজসচেতনতা কিংবা স্বদেশপ্রীতির আভাস লক্ষ্য করেছি, মাতৃভাষাপ্রীতির মাধ্যমে, স্বধর্মরক্ষার প্রয়াসের দ্বারা পরোক্ষভাবে সমাজসেবাই করেছিলেন তাঁরা। অবশ্য রামমোহনের বিশাল ব্যক্তিত্ব ও দেশসেবার আদর্শ প্রত্যক্ষভাবে প্রতিটি চিন্তাশীল মানুষের মনেই প্রভাব ফেলেছিল। রামমোহনের যুগ থেকেই রক্ষণশীলতার সঙ্গে উদার আদর্শের লড়াই ঘনীভূত হয়েছে, কিন্তু এঁদের উদারতা বা রক্ষণশীলতা শুধু ব্যক্তি স্বার্থ রক্ষার জন্যই সচেষ্ট ছিল না। উভয়পন্থীরাই আত্মচিন্তা বিসর্জন দিয়ে বৃহত্তর জনস্বার্থের কথা চিন্তা করেছেন। দেশপ্রেম আত্মস্বার্থবিরোধী বৃহত্তর ভাবনাকে কেন্দ্র করেই পুষ্টিলাভ করে। পারস্পরিক সংঘর্ষে আত্মরক্ষার জন্য শক্তিশালী রচনাকার ব্যঙ্গের আবরণেই আঘাতের দুর্ভেদ্য জাল বোনেন। সুতরাং কোন স্বদেশপ্রেমিক লেখক হাতিয়ার হিসেবে ব্যঙ্গকে কাজে লাগানোর চেষ্টা যদি করেন তাদের প্রসঙ্গও বিশেষ ভাবে আলোচনার প্রয়োজন। বাংলা গদ্যের শুরুতেই রামমোহনের নবধর্মকে আক্রমণ করে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ যেদিন সক্রিয় হয়ে উঠেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ব্যঙ্গাশ্রয়ী রচনার মাধ্যমে সমাজরক্ষা ও স্বধর্মরক্ষার ব্রত গ্রহণ করেছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সেযুগের অদ্বিতীয় ব্যঙ্গশিল্পী ভবানীচরণের দেশপ্রেমও আজকের নিরপেক্ষ আলোচনায় স্থান পাওয়া দরকার। ইংরাজীশিক্ষিত যুবসম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে লেখনীধারণ করে ভবানীচরণ সেদিন সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় চিন্তা করেছিলেন বলেই তাঁকে বিরাগভাজন হতে হয়েছিল আধুনিক সম্প্রদায়ের কাছে। কিন্তু ভবানীচরণের আদর্শের মূলে যে প্রবল দেশচিন্তাই বর্তমান ছিল সে বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। পরবর্তীকালে উদারপন্থী প্রগতিবাদীদের জয়গানে সকলেই যখন মুখর, রক্ষণশীল স্বদেশপ্রেমিক ভবানীচরণের নাম সেখানে অনুচ্চারিত। সাহিত্য সাধক চরিতমালাকার এ সম্বন্ধে বলেছেন,

"হিন্দু কলেজে ইংরাজী শিক্ষালাভের ফলে যুবকদের মধ্যে হিন্দু আচারের বন্ধন

শিথিল হইয়া আসিতেছে দেখিয়া তিনি নবীন আচার ব্যবহারের ত্রুটি প্রতিপাদনের জন্য লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। এজন্য তাঁহাকে সে যুগের ছাত্র সমাজের বিরাগ ভাজন হইতে হইয়াছিল। হিন্দুকলেজের এই সকল ছাত্রই উত্তরকালে সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং বিরোধী ভবানীচরণের কীর্তি ন্যায্য মূল্য প্রাপ্ত হয় নাই।"

অবশ্য সাহিত্য সাধক চরিতমালাকার ভবানীচরণের সঠিক মূল্য বিচারে অশেষ যত্ন করেছেন। ভবানীচরণ বিপক্ষতা করেছিলেন কিন্তু মহৎ আদর্শই তাঁকে প্রেরণা দান করেছিল। ব্যঙ্গাত্মক রচনার কোন আদর্শ তাঁর সামনে ছিল না, এ সম্পূর্ণই তাঁর স্বকীয় উদ্‌ভাবন। সদ্যসৃষ্ট বাংলা গদ্যসাহিত্যে এই মৌলিক সংযোজনের জন্য যে অপরিসীম কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন ভবানীচরণ' তার যথার্থ মূল্য এখনও অনির্নীত। আমাদের আলোচনায় দেশপ্রেমী ভবানীচরণের ব্যঙ্গাত্মক রচনা-শৈলীর বিচারই স্থান পাবে, সেখানেও তাঁর উদ্দেশ্যের সততা উদ্‌ঘাটিত হয়েছে৷ সেযুগের বাঙ্গালী স্বার্থচিন্তার ক্ষুদ্রগণ্ডী অতিক্রম করে দেশভাবনার পরিচয় দিয়েছিল নানা ক্ষেত্রে, সম্ভবতঃ যুগধর্মই তাঁদের প্রেরণা যুগিয়েছে। সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, সাহিত্য ও রাষ্ট্র সম্বন্ধে এঁদের ভাবনাকে বিশেষভাবে আলোচনা করে দেখলে দেশপ্রেমের একটি স্বচ্ছধারা চোখে পড়বে। ব্যঙ্গ সাহিত্যে ভবানীচরণ দেশপ্রেমের বক্তব্যটিই পরিবেশন করেছিলেন। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ভবানীচরণের প্রথম ব্যঙ্গাত্মক রচনা "কলিকাতা কমলালয়ে" দেশপ্রসঙ্গ নানাভাবে ধরা পড়েছে। ব্যঙ্গাত্মক রচনার মূল লক্ষণ ভবানীচরণের রচনায় ঈষৎ প্রকাশিত হলেও ভবানীচরণ মূলতঃ ব্যঙ্গশিল্পী রূপেই আলোচিত হয়ে থাকেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগোষ্ঠীর পরই দুরূহ বাংলাগদ্যে লালিত্যসঞ্চার ও কৌতুকজনক ভঙ্গি আশ্রয় করেই ভবানীচরণ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। কিন্তু সমাজসংস্কারকের প্রচ্ছন্ন চেতনা, দেশসেবার আদর্শ যাঁকে প্রেরণা দান করেছে তাঁর পক্ষে নিছক ব্যঙ্গাশ্রয়ী হাস্যরস বিতরণ করা সম্ভব ছিল না। ভবানীচরণের ব্যঙ্গাত্মক রচনাতেও সমাজচিন্তার গাম্ভীর্য মাঝে মাঝে ধরা পড়েছে। বিদ্যাসাগরের কৌতুককর রচনা সম্পর্কেও এ কথা সত্য। ভবানীচরণ 'সমাচারচন্দ্রিকা' সম্পাদনাকালে 'বাবু' প্রসঙ্গে একাধিক রচনা প্রকাশ করেছিলেন। বাবুর উপাখ্যান, শৌকিন বাবু ইত্যাদি রচনাতেই কৌতুকজনক ব্যঙ্গ সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন, পরবর্তীকালে ছদ্মনামে রচিত 'নববাবু বিলাস' ও 'নববিবি বিলাস' গ্রন্থ দুটিতেও ভবানীচরণ একই সঙ্গে সমাজ চেতনা-সৃষ্টির ও ব্যঙ্গ সৃষ্টির আয়োজন করেছেন। তবে 'কলিকাতা কমলালয়' গ্রন্থটিতে ভাষা প্রসঙ্গে ভবানীচরণ যে সুস্পষ্ট দেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন তাঁর অন্যান্য রচনায় তা

সুলভ নয়। ব্যঙ্গ সৃষ্টির প্রয়াস এখানে স্তিমিত হলেও দেশপ্রীতির প্রকাশ অনবদ্য, সেজন্য আমাদের আলোচনায় এ গ্রন্থটি স্থান পেয়েছে। সদ্য কলিকাতায় আগত বিদেশীর প্রশ্ন ও নগরবাসীর উত্তরদানের ভঙ্গীতে গ্রন্থটি রচিত। বস্তুতঃ এ প্রশ্ন স্বদেশপ্রেমিক ভবানীচরণের। এখানে ভাষাপ্রসঙ্গ নিয়েই আলোচনা শুরু হয়েছে। দেশপ্রেমের প্রথম উচ্ছ্বাস ভাষাপ্রীতিকে কেন্দ্র করেই দেখা গিয়েছিল। এখানে বিদেশীর বিস্মিত প্রশ্ন,

"কলিকাতার এমন অখ্যাতি কেন হইল যে আপনার দিগের শাস্ত্রের অধ্যয়ন ত্যাগ করিয়া কেবল পারসী ও ইংরাজী পড়েন বাংলা লিখিতে ও পড়িতে জানেন না এবং বাংলাশাস্ত্র হেয়জ্ঞান করিয়া শিক্ষা করেন না।"[১]

বলাবাহুল্য যে, বিদেশীর ছদ্মবেশে এ অভিযোগ এনেছেন স্বয়ং লেখক,— মাতৃভাষার প্রতি অনাদর তিনি সহ্য করতে পারেননি বলেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন এখানে। ভবানীচরণ নগরবাসীর মুখে একটি যুক্তিপূর্ণ উত্তর শুনিয়েছেন। আত্মদোষ ক্ষালনের ক্ষীণ প্রচেষ্টা নিয়ে নগরবাসী বলেছে,—

'কেহ সংস্কৃত শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন না তুমি ইহাই শুনিয়াছ, কিন্তু সে ভ্রান্তিমাত্র দেখ অমুক বাবু কত প্রকার সংস্কৃত গ্রন্থ করিয়াছেন—আর অনেক ভদ্রলোকের সন্তানেরা অগ্রে সংস্কৃতানুযায়ী বাংলা ভাষা ও লেখা পড়া অভ্যাস করিয়া পশ্চাৎ অর্থকরী ইংরাজী ও পার্সি বিদ্যাশিক্ষা করেন অর্থকরী বিদ্যাশিক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য—যখন যিনি দেশাধিপতি হয়েন তখন তাঁহাদিগের বিদ্যাভ্যাস না করিলে কি প্রকারে রাজকর্ম নির্বাহ হয়।'

এই বুদ্ধিদীপ্ত উত্তরে লেখকের রক্ষণশীল মনোভাবের চেয়ে উদার উপলব্ধিই ব্যক্ত হয়েছে। ভাষাশিক্ষার উপযোগিতা বিচার করে তিনি সাম্প্রতিক শিক্ষা ধারার সমর্থনেই কথা বলেছেন।

এ গ্রন্থটিতে ভাষা সম্পর্কে লেখকের স্বচ্ছ চিন্তাধারার পরিচয় পেয়েছি। বাংলা ভাষায় পারসী ও আরবী প্রভৃতি শব্দের অবাধ মিশ্রণ ঘটেছিল। প্রত্যক্ষভাবে মোঘল শাসনের ফলাফল এটা, বিদেশীর প্রশ্নে এ প্রসঙ্গটিই ব্যক্ত হয়েছে।

'ভদ্রলোকের মধ্যে অনেক লোক স্বজাতীয় ভাষায় অন্য জাতীয় ভাষা মিশ্রিত করিয়া কহিয়া থাকেন যথা কম, কবুল, কমবেশ, কয়লা, কর্জ, কষাকষি, কাজিয়া ইত্যাদি ক কার অবধি ক্ষ কার পর্য্যন্ত, ইহাতে বোধ হয় সংস্কৃত শাস্ত্র ইহারা পড়েন

১। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা কমলালয়, ১৮২৩।

নাই তাহা হইলে এতাদৃশ বাক্য ব্যবহার করিতেন না। স্বজাতীয় এক অভিপ্রায়ের অধিক ভাষা থাকিতে যাবনিক ভাষা ব্যবহার করেন না। যথা

যাবনিক ভাষা	সাধুভাষা
কমিনে	অন্ত্যজ, ক্ষুদ্র, সামান্য, নীচ
কল	যন্ত্র,
কসম	শপথ, দিব্য
কবুল	স্বীকার, অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুত
খারাব	মন্দ, কদর্য্য,

এখানে সংস্কৃত শব্দসম্পদের বৈচিত্র্য প্রদর্শনের চেষ্টাটিও লক্ষণীয়। লেখক বিশুদ্ধ ভাষা প্রয়োগের দাবী তোলেননি—কিন্তু সংস্কৃত জ্ঞানের অভাব তাঁকে পীড়া দিয়েছে। স্বভাষার সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার উপেক্ষা করাকে তিনি প্রশংসা করতে পারেননি। এভাবেই ভবানীচরণ দেশপ্রীতির আন্তরিক পরিচয় দিয়েছেন ভাষাপ্রীতির মাধ্যমে।

সেযুগের সম্পন্ন কলকাতাবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গীকেও সমালোচনা করেছিলেন লেখক। এঁরা দেশাত্মবোধশূন্য, আত্মমর্যাদাজ্ঞানহীন। ভবানীচরণ এই মেরুদণ্ড-বিহীন বাঙ্গালীর চরিত্র রচনা করেছেন। এ গ্রন্থের সমালোচনামূলক অংশটুকু বিদেশীর প্রশ্নাকারে ব্যক্ত হয়েছে,—লেখক নিজে নগরবাসীর পক্ষ সমর্থন চেষ্টা করেছেন। এখানে রচনা-কৌশলটি যথার্থ ব্যঙ্গশিল্পীর। বিদেশীর প্রশ্নেই দেশচেতনা প্রকাশ পেয়েছে,—নগরবাসী শুধু আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছে মাত্র। তৎকালীন কলিকাতার সম্পন্ন ব্যক্তিদের মনোভাব বিশ্লেষণ করে বিদেশী সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছে,—

"কলিকাতার অনেক ভাগ্যবান লোক আপন সন্তানদিগ্যে অপূর্ব আভরণ ও বস্ত্রাদি দেন আর বিবাহাদি কর্মে কেহ একলক্ষ কেহ দুই তিন চারি পাঁচ লক্ষও হইবেক অত্যানন্দে ব্যয় করিয়া থাকেন। কিন্তু শুনিতে পাই আপন সন্তানদিগের বিদ্যাবিষয়ে মনোযোগের অত্যন্ত অল্পতা যেহেতু স্বজাতীয় ভাষা ও অক্ষর শিক্ষার্থে একজন ব্যাকরণাদি শাস্ত্রে ব্যুৎপন্নলোককে কিঞ্চিৎ অধিক বেতন দিয়া না রাখিয়া হ্রস্বদীর্ঘ ইত্যাদি বিবেচনাশূন্য কেবল অঙ্কশাস্ত্রে কিঞ্চিৎ জ্ঞানাপন্ন লোককে কিঞ্চিৎ বেতন প্রদানে রাখিয়া তাঁহাই শিক্ষা করান। ইহাতে কি প্রকারে সেই সন্তান দিগ্যের উত্তম বিদ্যা হইতে পারে আর যদি স্বজাতীয় বিদ্যায় অপকৃতা রহিল তবে অন্যান্য জাতীয় বিদ্যাতেই বা কি প্রকারে পারদর্শী হইবেন।"

এই আলোচনা ভবানীচরণের দূরদর্শিতার পরিচায়ক,—ইংরাজী শিক্ষার প্রারম্ভে

ভবানীচরণ স্বজাতীয় বিদ্যার অপকৃতার পরিণাম চিন্তা করেছিলেন ;—অধুনাও যে আলোচনা শেষ হয়নি। স্বজাতীয় বিদ্যা শব্দটি প্রয়োগ কালে তিনি সঠিক কি বোঝাতে চেয়েছিলেন বোঝা দুষ্কর,—কিন্তু প্রগতির অর্থই যে ঐতিহ্য অস্বীকার নয়, এ সত্য তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন।

ভবানীচরণের অন্যান্য ব্যঙ্গাত্মক রচনায় দেশাত্মবোধের পরিচয় সুস্পষ্ট হয়নি কিন্তু তৎকালীন বিপথগামী বাবু সম্প্রদায়ের চরিত্রচিত্রণ করে তিনি বাঙ্গালীকে সচেতন করে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। সহমরণের মত বীভৎস প্রথাকে সমর্থন করে যিনি ধর্মসভার সদস্যপদ অলংকৃত করেছিলেন তিনিও বিপথগামী বাঙ্গালীর পরিণাম চিন্তা করে ভীত হয়েছিলেন। উভয়ক্ষেত্রেই তিনি রক্ষণশীল কিন্তু দেশপ্রীতিই তাঁর সমস্ত চিন্তাধারায় প্রতিফলিত। হিন্দু আচারের গতানুগতিকতা নির্বিচারে মেনে নেবার মধ্যে যেমন অনুদারতা আছে তেমনি আছে অন্ধদেশভক্তি। এ বিষয়টি প্রশংসনীয় নয় কিন্তু এ আদর্শের মধ্যে ব্যক্তিস্বার্থের স্পর্শ নেই। অন্ধআনুগত্যের সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি বলেই ভবানীচরণ অভিযুক্ত হতে পারেন। কিন্তু ইংরাজী সভ্যতার স্রোতে ভেসে যাবার প্রবণতাকে কোন স্বদেশপ্রাণ মনীষীই সমর্থন জানাতে পারেননি, ভবানীচরণ এঁদের পুরোধা। পরবর্তীকালে দেশপ্রীতির অন্য একটি অর্থ দাঁড়িয়েছিল স্বসংস্কৃতিপ্রীতি। হিন্দু সংস্কৃতি বিরোধী আচরণকে তীব্র নিন্দা করাটা স্বদেশপ্রেমিকের অবশ্যপালনীয় কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভবানীচরণই প্রথম সংরক্ষণীমনোবৃত্তির পরিচয় দিয়েছেন, এই কারণেই তিনি প্রগতিবাদীদের কাছে নিন্দিত কিন্তু পরবর্তীকালে জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায় ধর্ম-সংস্কৃতি-সমাজরক্ষায় আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন যাঁরা সেই স্বদেশপ্রেমিক সম্প্রদায় ভবানীচরণকে অভ্যর্থনা জানাবেন।

ব্যঙ্গসাহিত্যে ভবানীচরণের পথানুসরণ করেছিলেন প্যারীচাঁদ মিত্র ও কালীপ্রসন্ন সিংহ। 'আলালের ঘরের দুলাল' গ্রন্থে ভবানীচরণের 'নববাবু বিলাসের' প্রভাব খুব স্পষ্ট। কাহিনীগত সাদৃশ্যই শুধু নয় উভয়ের মধ্যে আদর্শগত মিলও রয়েছে। কলকাতার সদ্য ধনীসম্প্রদায়ের আদর্শবিহীন জীবনযাত্রা ও তাঁদের বিপথগামী সন্তানের জীবনচরিত রচনার দ্বারা সমাজের কল্যাণসাধনের প্রচেষ্টাই উভয়ের মধ্যে বর্তমান। দেশপ্রেমই সাহিত্য রচনার অন্যতম প্রেরণা ছিল এঁদের। প্রবন্ধে প্যারীচাঁদের স্থান নির্ণয় প্রসঙ্গে সেকথা আলোচিত হয়েছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহের সাহিত্য প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে যে কথা সর্বাগ্রে আলোচনা করা দরকার তা হল, কালীপ্রসন্নের ব্যক্তিচরিত্র ও আদর্শের প্রসঙ্গ। স্বল্পায়ু জীবন, অমিত কার্যক্ষমতা ও সাহিত্যপ্রতিভা নিয়ে তাঁর আবির্ভাব কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই

কালীপ্রসন্ন একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। নানা জনহিতকর সভাসমিতি ও অনুষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত কালীপ্রসন্ন আপন বদান্যতায়, লোককল্যাণের আদর্শে ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ, সর্বদাই অগ্রগামী। তাঁর সমগ্র কার্যাবলীর আলোচনা থেকে তাঁর স্বদেশপ্রেমিকতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়। বাঙ্গালীর স্বার্থ ও সম্ভ্রমরক্ষার দায়িত্ববোধ ছিল তাঁর, নানা কাজে তার পরিচয় পেয়েছি। 'নীলদর্পণ' প্রকাশক লঙ সাহেবের জরিমানার অর্থদান করে কালীপ্রসন্ন দেশপ্রেমিকতারই পরিচয় দিয়েছিলেন, আবার সার মর্ডাণ্ট ওয়েলস যখন বিচারাসনে বসে সমগ্র বাঙ্গালীকে মিথ্যাবাদী ও প্রতারক বলে অভিহিত করেন, কালীপ্রসন্নও অন্যান্য গণ্যমান্য বাঙ্গালীদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে তার প্রতিবাদ জানান। এ জাতীয় দেশপ্রাণতার পরিচয় তাঁর জীবনের প্রতিটি কার্যাবলীতেই পাওয়া যাবে। কিন্তু ব্যঙ্গসাহিত্যিক হিসেবে কালীপ্রসন্নের বিচারকালে স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ কোথাও ঘটেছে কিনা আমাদের আলোচনা তাতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

কালীপ্রসন্নের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র বিশেষ সমাদর কথ্যরীতির সাহিত্যিক নিদর্শনরূপে, তাছাড়া ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিমায় সে যুগের সমাজ সমালোচনামূলক রচনা হিসাবেও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র বিশেষ আলোচনা হয়ে থাকে। কিন্তু স্বদেশপ্রেমিক কালীপ্রসন্নের কলমে সমাজচিত্রণের এই প্রচেষ্টার মূলে যে প্রবল দেশচেতনাও বর্তমান ছিল, সেটুকু বিশেষভাবে তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য।

'নক্সা' নামাঙ্কিত এই গ্রন্থের ভঙ্গিটি অতীব সরস ও হাস্যরসাত্মক। সমাজ সমালোচনার উদ্দেশ্য সমাজসংশোধন হলেও প্রত্যক্ষভাবে সমাজকে তীব্র আঘাত হানলে অনেক ক্ষেত্রেই তা বিষময় ফলপ্রসব করতে পারে। সুতরাং রসিকতার আশ্রয়ে ও ব্যঙ্গের মোড়কে সমাজের দোষত্রুটিকে মোটামুটিভাবে সহনীয় করে তোলার তির্যক ভঙ্গিটিই লেখক অবলম্বন করেছিলেন। উচ্চাঙ্গের হাস্যরস সৃষ্টির কোন প্রত্যক্ষ প্রেরণা ছিল না এর মূলে কিন্তু সমাজব্যবস্থার গলদ লোকচক্ষুর সামনে তুলে ধরার আগ্রহ ছিল পুরোমাত্রায়। তবু হাস্যরস সৃষ্টির চেষ্টায়, উদ্দেশ্যের সততায় ও স্বাভাবিক রচনাগুণেই 'হুতোমপ্যাঁচার নক্সা' ব্যঙ্গাত্মক রচনার উৎকৃষ্ট নিদর্শন হতে পেরেছিল। ব্যঙ্গের শাণিত অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন লেখক এবং হাস্যরসিকের মতো নিজেকেও আঘাত করেছেন। অশ্লীলতার অভিযোগে রুচিহীন প্রসঙ্গে পূর্ণ গ্রন্থটিকে অনেক সমালোচকের মত বঙ্কিমচন্দ্রও উচ্চ মর্যাদা দেননি। সেযুগের ক্যালকেশিয়ান ভাষার নিদর্শন গ্রন্থটির অশ্লীলতার অন্যতম হেতুরূপে ধরা হয়েছে, কিন্তু এজন্য লেখকের উদ্দেশ্যের সততা সমালোচিত হতে পারে না। তিনি বাস্তবের যথাযথরূপই পরিবেশনের আয়োজন করেছিলেন। শহর কলকাতার জঘন্য ও কুরুচিপূর্ণ পরিবেশ যথাযথ

চিত্রণের জন্ত তিনি যে বাস্তবতার আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন তার জন্য কালীপ্রসন্ন ধন্তবাদ পাবেন। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সায়' কালীপ্রসন্নের নিজস্ব বক্তব্যটি অনুধাবন করলেই রচনার উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে,

"কি অভিপ্রায়ে এই নক্সা প্রচারিত হলো, নক্সাখানির প্রতি দেখলেই সহৃদয় মাত্রেই তা অনুভব করতে সমর্থ হবেন।

...নক্সাখানিকে আমি একদিন আরসি বলে পেস কল্লেওকর্ত্তে পারতেম কারণ পূর্বে জানা ছিল যে, দর্পণে আপনার মুখ দেখে কোন বুদ্ধিমানই আরসিখানি ভেঙ্গে ফেলেন না বরং যাতে ক্রমে ভালো দেখায় তারই তদ্বির করে থাকেন, কিন্তু নীলদর্পণের হাঙ্গাম দেখে শুনে ভয়ানক জানোয়ারদের মুখের কাছে ভরসা বেঁধে আরিসি ধরতে আর সাহস হয় না, স্থতরাং বুড়ো বয়সে সং সেজে রং কত্তে হলো পূজনীয় পাঠকগণ বেয়াদবী মাফ কর্বেন।"

এই স্পষ্ট স্বীকারোক্তির আলোকে কালীপ্রসন্নের মনোভাবটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সহৃদয় ও বিবেচনাশীল পাঠকের উদ্দেশ্যেই তিনি গ্রন্থটি নিবেদন করেছেন। রচনাভঙ্গীর অভিনবত্ব সৃষ্টির মূলেও লেখকের দূরদর্শিতা ছিল। যাদের সংশোধনের বাসনা নিয়ে লেখক নক্সাটির পরিকল্পনা করেছিলেন, তাদের চেহারাটি বিকৃত হলেও অবিকৃতভাবে তা তুলে ধরার ইচ্ছাটিই বর্তমান ছিল লেখকের মনে। 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' সেদিক থেকে একটি প্রামাণ্য দলিল এবং অবিকৃতরূপে তা উপস্থিত করেছেন লেখক। সে যুগের ধর্মান্দোলন, সামাজিক দুর্নীতি, অনাচারের বিরুদ্ধে খড়্গ উদ্যত করেছিলেন যিনি তাঁর দৃঢ় চিত্ততার প্রশংসা করতেই হয়। তাছাড়া সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও নির্ভীকতা ছিল বলেই তিনি ন্যায় ও সত্যের সমর্থন করেছেন। অন্ধ সংস্কারানুগ রক্ষণশীলতার ঊর্ধ্বে উঠতে পেরেছিলেন বলেই সত্য কথনের সাহস ছিল তাঁর। রামমোহনের আদর্শকেও হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন তিনি। অন্যদিকে নীলকরদের অত্যাচারের বর্ণনা, স্বার্থান্বেষী লোকের ক্ষুদ্রতার পরিমাপ করেছেন নির্ভীক চিত্তে। বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের দপ্তরে' সমাজ সমালোচনা করেছিলেন বিচিত্র পদ্ধতিতে। কালীপ্রসন্ন তাঁরও বহু পূর্বে সমাজ শোধনের অক্লান্ত প্রয়াস চালিয়েছেন। সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্যে হুতোমের বিদ্রূপাত্মক রচনা সেযুগেই সমালোচিত হয়েছিল দেখে দ্বিতীয় সংস্করণে কালীপ্রসন্ন বলেছিলেন,

"পাঠক! কতগুলি আনাড়িতে রটান, হুতোমের নকসা অতি কদর্য বই, কেবল পরনিন্দা পরচর্চা খেঁউর ও পচালে পোরা ও স্বন্ধ গায়ের জালা নিবারণার্থ কতিপয় ভদ্রলোককে গাল দেওয়া হয়েছে। এটি বাস্তবিক ঐ মহাপুরুষদের ভ্রম; একবার

ক্যান, শতেকবার মুক্তকণ্ঠে বলবো-ভ্রম। হুতোমের তা উদ্দেশ্য নয়, তা অভিসন্ধি নয়, হুতোম ততদূর নীচ নন যে দাদতোলা কি গালদেবার জন্য কলম ধরেন।"[২]

এই ভাবেই হুতোম আপন উদ্দেশ্যের সততা বারবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। কালীপ্রসন্নের স্বদেশপ্রীতির পরিচয় 'হুতোম প্যাঁচার নকসার' কোন কোন অংশে প্রকাশ পেয়েছে। সেযুগের উন্মাদনায় সাধারণ লোকেরও চিত্তবিকার ঘটেছিল, লেখক একটি বর্ণনায় বলেছেন,—

"গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠলো—কখন বোধ হতে লাগলো কিছু দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবো। (ওঁ শ্রীবিষ্ণু কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন) তা হওয়া হবে না, তবে ব্রিটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত জনসন? (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন, সেটি বড় অসঙ্গত হয়) রামমোহন রায়? হ্যাঁ একদিন রামমোহন রায় হওয়া যায়—কিন্তু বিলেতে মর্ত্তে পার্বো না। ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচজনে চিনবে সেই চেষ্টাই বলবতী হলো, তারই সার্থকতার জন্যই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজলেম,—গ্রন্থকার হয়ে পড়লেম—সম্পাদক হতে ইচ্ছা হোলো—সভা কল্লেম—ব্রাহ্ম হলেম—তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই—বিধবা বিয়ের দালাদলী করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে লোকে জানুক যে আমরাও ঐ দলের একজন ছোটখাট কেষ্টবিষ্টুর মধ্যে।"

কালীপ্রসন্ন সেযুগের সমস্ত সদনুষ্ঠানের বর্ণনা দিয়েছেন কিন্তু অযোগ্য লোকের ভানকে বরদাস্ত করতে পারেননি। যথার্থ সৎকর্মেরই প্রয়োজন, অযোগ্য লোকের অকারণ ব্যস্ততা দেখে আসল ও নকল কর্মীর মধ্যে যেন বিভ্রান্তি সৃষ্টি না হয়, সে বিষয়ে সচেতন করে দিয়েছেন হুতোম। কালীপ্রসন্ন সে যুগের প্রগতির সমর্থক ছিলেন তার অজস্র প্রমাণ রয়েছে। রামমোহনের আদর্শের সঠিক মূল্য বিচার করা সে যুগে নিশ্চয়ই যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচায়ক, কালীপ্রসন্ন 'হুতোম প্যাঁচার নক্সার' তরলায়িত ভঙ্গিতেও শ্রদ্ধানিবেদন করেছিলেন রামমোহনকে,—

"সহস্র সহস্র বৎসরে শত শত তত্ত্ববিৎ ও প্রকৃতিজ্ঞ জ্ঞানীরা যাঁরে পাবার উপায় অবধারণে অসমর্থ হলো, আমরা যে সামান্য হীনবুদ্ধি হয়ে তাঁর অনুগৃহীত বলে অহংকার ও অভিমান করি সে কতটা নিবুদ্ধির কর্ম? ব্রহ্মজ্ঞানী যেমন পৌত্তলিক, কৃশ্চান ও মোসলমানদের অপদার্থ ও অসার বলে জানেন, তাঁরাও ব্রাহ্মদের পাগল ও ভণ্ড বলে স্থির করেন।......যে রামমোহন রায় বেদকে মান্য করে তার সূত্রে

২। কালীপ্রসন্ন সিংহ, হুতোম প্যাঁচার নক্সা, ১৭৮৪ শকাব্দা।

ব্রাহ্মধর্মের শরীর নির্মাণ করেছেন, আজ এক'শ বছরও হয় নাই, এরই মধ্যে তাঁর শিষ্যরা সেটী অস্বীকার করেন, ক্রমে কৃশ্চানীর ভড়ং ব্রাহ্মধর্মের অলংকার করে তুলেছেন—আরও কি হয়।" [নাককাটা বন্ধ, পৃঃ ১০৩]

উদ্ধৃত অংশটুকু পাঠ করলে কালীপ্রসন্নের উদার ধর্মবোধ ও সত্যনিষ্ঠার পরিচয় মিলবে,—তিনি ব্রাহ্মমতের মধ্যে অসঙ্গতি খুঁজে পান না, কিন্তু ব্রাহ্মধর্মের বিকৃতিকেও সহ্য করতে পারেন না। এদিক থেকেই কালীপ্রসন্ন ন্যায় ও সুনীতির সমর্থক।

বাঙ্গালীর অধঃপতন 'হুতোমে' চিত্রিত হয়েছে। সে যুগের প্রখ্যাত ধনী পরিবারের সন্তান কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালী বড়মানুষের চরিত্র প্রসঙ্গে উক্তি করেছেন,—

"এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন যে অন্তরীক্ষ থেকে দেখলে পেটের ভেতর হাত পা সেধিঁয়ে যায় ও বাঙ্গালী বড় মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়।" এ তাঁর আন্তরিক ক্ষোভ। বাঙ্গালীর উন্নতি ও অবনতির আলোচনা করে যিনি আনন্দ লাভ করেছেন—তিনি পরোক্ষভাবে দেশপ্রীতিরই পরিচয় দিয়েছেন। কালীপ্রসন্নের জীবনকাহিনীর পটভূমিকায় 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'কে স্থাপন করলেই এ গ্রন্থের যথার্থ মহিমাটি নির্ণীত হতে পারে। সামাজিক দুর্নীতির চিত্র রচনায় গোপনতা বর্জন করেছিলেন বলে তাঁকে অভিনন্দন জানানো দরকার। বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধ-সমালোচনা সত্ত্বেও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সার' অনুকূল সমালোচনা সে যুগে হয়েছিল। বঙ্কিম সমসাময়িক লেখক অক্ষয়চন্দ্র সরকার কোনো এক সম্মিলনে সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন,

"বঙ্কিমবাবু মিত্রজার [প্যারীচাঁদ মিত্র] গ্রন্থ দেখাইয়া রত্নোদ্ধার করিতেছিলেন তখন তাঁহার কালীপ্রসন্নের কথা বলিবার প্রয়োজন নাই, আমাদিগকে এখন বলিতে হইবে। আমরা যখন নিতান্ত বালক, তখন হুতোম প্যাঁচার নক্সা প্রকাশিত হইল। তাহার ভাষার ভঙ্গীতে, রচনার রঙ্গেতে একেবারে মোহিত হইয়াছিলাম।[৩]

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনায় হুতোম অপ্রশংসিত হলেও পরবর্তী কালে ব্যঙ্গের মাধ্যমে সমাজ চিত্রণের যে আদর্শ বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করেছিলেন তা একমাত্র হুতোমেই পাওয়া যায়। হয়ত এ ব্যাপারে বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষ প্রভাবিত নন, কিন্তু ব্যঙ্গাত্মক সাহিত্যধারার আলোচনায় হুতোমের অব্যবহিত পরবর্তী লেখক হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের নামই সর্বাগ্রে আলোচ্য। এ জাতীয় রচনায় সমাজের যে অশেষ উপকার সাধিত হতে পারে বিদ্যাসাগর এ মত পোষণ করতেন। এতে প্রত্যক্ষ স্বদেশপ্রেম হয়ত নেই কিন্তু উদ্দেশ্যের মূলেই স্বদেশপ্রীতি বর্তমান। হুতোমের রচনার প্রেরণা হিসেবে

৩। অজিতকুমার দত্ত, বাংলা সাহিত্যে হাস্যরস থেকে উদ্ধৃত।

"নীলদর্পণের" নামোল্লেখ করা চলে, ভূমিকায় প্রাসঙ্গিকভাবে সেকথা ব্যক্তও হয়েছে। 'নীলদর্পণ'কার সমাজের প্রকৃত ছবি তুলে ধরেছিলেন, হুতোমের প্রেরণাও ছিল তাই। দীনবন্ধুর হাস্যরসের মধ্যে কিন্তু হুতোমী ব্যঙ্গ অনুপস্থিত। হুতোমী ব্যঙ্গ বাংলা সাহিত্যেরই অভিনব বস্তু। একটি অংশ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে; সে যুগের ধর্মালোচনা করতে গিয়ে হুতোম সরস উক্তি করেছেন,

"ইংরাজী লেখাপড়ার প্রাদুর্ভাবে, রামমোহন রায়ের জন্মগ্রহণেও সত্যের জ্যোতিতে হিন্দুধর্মের যে কিছু দুরবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তিনি কায়মনে পুনরায় তার অপনয়নে কৃতসংকল্প হলেন।"

সেযুগের সমাজসংস্কার ব্রত পালনের সর্বজনীন আবেগকে হুতোম ব্যঙ্গ করেছেন এখানে। প্রগতিবাদী ও প্রগতিবিরোধীদের সংঘর্ষে সেযুগের উত্তপ্ত আবহাওয়ায় হুতোমের এ মন্তব্যটি স্মরণযোগ্য। স্বদেশসেবার নামান্তর হিসেবে ধর্মসংস্কার কিংবা সমাজসংস্কারকে গণ্য করা হোত, হুতোম সে কথাটিই স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

ব্যঙ্গাত্মক রচনাধারায় কালীপ্রসন্ন সিংহের পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব হলেও উভয়ের মধ্যে প্রতিভাগত পার্থক্য বিরাট ব্যবধান রচনা করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র অপরিণত, অশালীন হাস্যরসকে প্রতিভার দৃপ্ততেজে শোধন করে ব্যঙ্গাত্মক রচনায় যে সাফল্য অর্জন করেছিলেন পৃথকভাবে তার আলোচনা করা দরকার। তবে হুতোমী ব্যঙ্গে যে স্বদেশভাবনার উৎসার দেখেছি, বঙ্কিমী ব্যঙ্গেও সেটুকু রয়েছে, সেদিক থেকে দুজনের মধ্যে সাধর্ম্যও বর্তমান। বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা প্রবন্ধকে একঘেঁয়েমি থেকে মুক্ত করতে চেয়েছিলেন, একথা তার হাস্যরসাত্মক ব্যঙ্গরচনা পাঠ করলেই বোঝা যায়। প্রবন্ধের নীরস শরীরে রসের নির্ঝর সৃষ্টি করে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাসাহিত্যে নতুনত্ব সৃজনের চেষ্টা করেছিলেন, আবার দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র এই রচনারীতির আড়ালেই আত্মগোপনের একটা কৌশলও আবিষ্কার করেছিলেন বলা যেতে পারে। দেশপ্রেমের যে আবেগ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে প্রতিফলিত হতে দেখেছি, ব্যঙ্গাত্মক রচনার আশ্রয়ে তা বিস্তৃত হয়েছে শতধারে। এখানে আত্মগোপন করার উপায়টি তাঁরই আবিষ্কৃত, বক্তব্য প্রকাশের কুণ্ঠাও অনুপস্থিত। প্রবন্ধশিল্পী বঙ্কিম গুরুগম্ভীর, কিন্তু ব্যঙ্গশিল্পী বঙ্কিম রসিক। এ প্রসঙ্গে 'বঙ্গদর্শন পত্রিকার সম্পাদকরূপী বঙ্কিমচন্দ্রের বিচিত্র উদ্‌ভাবনী ক্ষমতাটির কথাই বারবার মনে হয়। "বঙ্গদর্শন" বঙ্কিমচন্দ্রের দেশদর্শন ও আত্মদর্শনের মাধ্যম। ব্যঙ্গাত্মক রচনায় দেশদর্শনের সুযোগও ঘটেছিল অনায়াসে। 'বঙ্গদর্শনের' নামকরণ বিশ্লেষণ করলেই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্যের পরিচয় মিলবে। সমাজচেতনা ও দেশচেতনার সমন্বয়ে যে মুক্তদৃষ্টির অধিকার লাভ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র, 'বঙ্গদর্শনের' প্রত্যেকটি ব্যঙ্গাত্মক রচনায় তার প্রতিফলন পড়েছে।

সেযুগে দেশপ্রেমের উচ্ছ্বসিত আবেগ যখন বাধাবন্ধহীন, বঙ্কিমচন্দ্র সেই উচ্ছ্বাসের গতিরোধ করার সচেতন চেষ্টা করেছিলেন সমালোচনা ও ব্যঙ্গের মাধ্যমে। দেশচিন্তাকে বাস্তবভূমিতে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন বলেই তাঁকে নির্মম সমালোচক হতে হয়েছিল। দেশধারণায় নিছক উচ্ছ্বাস যখন মাত্রাহীন হয়ে উঠেছে, চিন্তার দৈন্য যখন আমাদের অস্থির করে তুলেছে, বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের সচেতন করেছিলেন ব্যঙ্গের চাবুকে। এ আঘাত তাঁর ইচ্ছাকৃত, এ আঘাত আমাদের সচেতন করারই অস্ত্র হিসেবে পরিকল্পিত। স্বদেশপ্রেমের এই ভাবালুতা প্রসঙ্গে কোন ইংরেজ সমালোচক যথার্থই বলেছিলেন,

Love of country, expressing itself nobly, as we have seen, in service, in supreme sacrifice or in mystical devotion, is yet perhaps in nothing so intimate and tender as in the passion the patriot feels for the very earth of his familiar habit......And if a man knowing nothing of this emotion, can never learn the more deliberate parts of national patriotism, still less can he learn as the citizen of a state to think justly of the citizens of others [8]

এই আবেগকে সঠিক পথে চালনার প্রয়োজন ছিল বঙ্কিমচন্দ্রই তা অনুধাবন করেছিলেন। বাংলা প্রবন্ধের গুরুগম্ভীর উপদেশে এ বক্তব্য যথেষ্ট আবেদন সৃষ্টিতে সক্ষম হবে না, বঙ্কিমচন্দ্র তা জানতেন। সুতরাং ব্যঙ্গাশ্রয়ী প্রবন্ধরচনার নতুন রীতিকেই তিনি অবলম্বন করলেন 'বঙ্গদর্শনের প্রথম দিকের সংখ্যায়। বঙ্কিমসাহিত্যে এ এক অভিনব সংযোজন; নতুনরীতিতে লেখা প্রবন্ধসমষ্টি বাংলাদেশে আলোড়ন সৃষ্টি করল, বঙ্কিম প্রতিভার নতুন পরিচয় পেয়ে সমগ্র বঙ্গসমাজ তখন বিস্মিত। 'লোকরহস্য' সেই যুগেরই রচনা। 'লোকরহস্য' লোকচরিত্রের রহস্য নির্ণয়েরই প্রচেষ্টা। বঙ্কিমচন্দ্রের সামগ্রিক প্রতিভার পরিচয় এখানেও আছে, কিন্তু তা আবিষ্কারের চেষ্টা না করে 'লোকরহস্যে' স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করাই আমাদের উদ্দেশ্য হবে।

লোহরহস্যের আগাগোড়াই রসবিতরণ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র, কিন্তু সে রসটি সর্বদাই মধুর নয়—মাঝে মাঝে তিক্ত-কটু-কষায়। দেশপ্রেমিকতা ব্যঙ্গের আবরণে নতুন মহিমা লাভ করেছে এখানে। হাস্যরস যখন নকসাজাতীয় রচনাতেই সুলভ ছিল—বঙ্কিমচন্দ্রই তখন প্রবন্ধের পর্যায়ে হাস্যরসের অকৃপণ বর্ষণ শুরু করলেন।

৪। John Drinkwater, Patriotism in Literature, London, 1919, P-109.

প্রবন্ধসাহিত্যের বিচিত্রতা সম্পাদিত হল, স্বদেশচিন্তার গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ণ না করেও বঙ্কিমচন্দ্র রসবৈচিত্র্য সাধন করলেন।

এই সমালোচনার ফলে বঙ্কিমচন্দ্র দেশবাসীর প্রশংসা পাননি বরং বিরাগ-ভাজন হয়েছিলেন বহুলোকের। এ জাতীয় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ অনেক সময়ই রুচিকর হয় না। সমাজের কল্যাণের আদর্শে অবিচলিত ছিলেন বলেই বঙ্কিমচন্দ্র দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াই চালিয়েছিলেন। সমাজের প্রবণতার প্রসঙ্গে একজন সমালোচক চমৎকার বলেছেন,—

Society has many grounds for its dislike and distrust of satire. No matter what abuses it may expose, no matter what lofty motives the satirist may profess, he has no right (so goes the chief moral argument) to take the honour and reputation of other men into his hands or to set himself up as a censor of established institutions or models or behaviour.[৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের সমালোচনাও এই নিয়মেই নিন্দিত হয়েছিল, কিন্তু এর ভাবী ফলাফল হয়েছিল শুভপ্রদ।

'লোকরহস্যের' প্রথম প্রবন্ধ 'ব্যাঘ্রাচার্য্য বৃহল্লাঙ্গুল' হাস্যরসের অকৃত্রিম উৎসার,—দেশপ্রীতিও এখানে কম ছিল না। ব্যাঘ্রসমাজ সংঘবদ্ধ সভ্যসমাজ সৃষ্টি করতে চায়,—বঙ্কিমচন্দ্র সেযুগের সংঘবদ্ধ সুসভ্য ভারতসমাজ গঠনের প্রচেষ্টার চিত্রটিই যে পরোক্ষভাবে আরোপ করেছেন এখানে,—তাতে সন্দেহ করার কোন হেতু নেই। সভ্যসমাজ সৃষ্টির এই প্রচেষ্টার আবরণে বঙ্কিমচন্দ্রের মূল বক্তব্যটিও অস্পষ্ট হয়ে নেই। বৃহল্লাঙ্গুলের ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি প্রসঙ্গে তিনি মোক্ষমূলর ও মিল-এর কথা প্রসঙ্গতঃ স্মরণ করেছেন। উভয়ের বক্তব্যেও মিল রয়েছে। ভারতবর্ষ ও ভারতবাসী সম্বন্ধে ইউরোপীয় গবেষণার বিবরণ-এর আভাস উক্ত প্রবন্ধে মিলবে। কিন্তু পরাধীন ভারতবাসী এ জাতীয় গবেষণার প্রতিবাদ করেনি কোন দিন। স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিবাদও প্রকাশ্য বা প্রত্যক্ষ নয়—তবু দেশপ্রেমিকের মনোভাব থেকেই প্রবন্ধটির জন্ম হয়েছে বলা যেতে পারে।

বৃহল্লাঙ্গুলের দেশপ্রেমের বিস্তারিত পরিচয় এ প্রবন্ধে আছে। লৌহজালাবৃত প্রকোষ্ঠে বাস করার সুখ ত্যাগ করার হেতুটি স্বদেশবাৎসল্য। বর্ণনাটিও তুলনাহীন,—"আহা! যখন এই জন্মভূমি আমার মনে পড়িত, তখন আমি হাউ হাউ করিয়া

৫। Robert C. Elliott, The Power of Satire, Princeton, 1960, P-270-271.

ডাকিতে থাকিতাম। হে মাতঃ সুন্দরবন! আমি তোমাকে কখন ভুলিতে পারিব? ……হে জন্মভূমি! যতদিন আমি তোমাকে দেখি নাই, ততদিন ক্ষুধা না পাইলে খাই নাই, নিদ্রা না আসিলে নিদ্রা যাই নাই।"

হাস্যরসের মোড়কে দেশপ্রীতির সমালোচনা বলে উদ্ধৃত অংশটিকে ব্যাখ্যা করা বোধ হয় খুব অসঙ্গত হবে না। দেশপ্রীতির অতিমাত্রিক চর্চা নিবারণের এই কৌশলটি বঙ্কিমচন্দ্রেরই আবিষ্কার বলা যায়। দেশপ্রেম যদি প্রকৃত না হয়—দেশপ্রেমিকের আচরণ ও বক্তব্য তবে বৃহল্লাঙ্গুলের মতই শোনাবে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রবাহ এদেশে প্রবেশ করেছিল বলেই আমরা সভ্য হয়েছি,—এ অসত্য ধারণাটি স্পষ্ট করার চেষ্টাও এ প্রবন্ধে আছে। সভাপতি অমিতোদর বৃহল্লাঙ্গুলের বক্তব্য সমর্থন করে সার সংকলন করেছে,—

"মনুষ্য অতি অসভ্য পশু। আমরা অতি সভ্য পশু। সুতরাং আমাদের কর্ত্তব্য হইতেছে যে, আমরা মনুষ্যদিগকে আমাদের ন্যায় সভ্য করি। বোধ করি, মনুষ্যদিগকে সভ্য করিবার জন্যই জগদীশ্বর আমাদিগকে এই সুন্দরবন ভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন।"

এই উদ্ধৃতাংশের মর্মার্থ ও ব্যঙ্গার্থ বিশ্লেষণ করলে বঙ্কিমচন্দ্রের নির্ভীক দেশপ্রীতিরই পরিচয় স্পষ্ট হয়। পরাধীনতা মানুষের সৎসাহস ও বিচারবুদ্ধিকে অনেক সময়ই আবৃত করে রাখে—বাঙ্গালী জাতি উত্তরাধিকারসূত্রেই এই জড়ত্ব লাভ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর জড়ত্ব নাশ করার মন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন। উপদেশের গাম্ভীর্যে জড়ত্ব নাশ অসম্ভব জেনেই তিনি ব্যঙ্গের চাবুকে বক্তব্য পরিবেশনের চেষ্টা করেছেন। সেযুগের পরিস্থিতিতে প্রত্যক্ষ সমালোচনার অসুবিধেও ছিল। বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্ত্য জাতির দম্ভ, অহংকার, সভ্যতার আস্ফালনকে এ প্রবন্ধে যত স্পষ্টভাবে ব্যঙ্গ করেছেন,—প্রত্যক্ষ কোন আলোচনায় তা সম্ভব ছিল না। দেশপ্রীতি তাঁকে নির্ভীকতা দান করেছে—প্রতিভা দিয়েছে শক্তি। লোকরহস্যের প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের এই বিশেষ ক্ষমতাটিই লক্ষ্য করি। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গদর্শন' পর্বের বঙ্কিম সাহিত্যের নাম দিয়েছেন যুদ্ধপর্ব। এই যুদ্ধপর্বের নিপুণ সৈনিক রূপে বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্যেই' আবির্ভূত হয়েছেন। শ্রীহরপ্রসাদ মিত্র বলেছেন,—

'লোকরহস্যে' হাস্য "পরিহাসের অস্ত্রচালনায় কৌশল আয়ত্ত করে নিয়ে, 'কমলাকান্তে' সে অস্ত্র বঙ্কিম যেন পূর্ণশক্তিতে প্রয়োগ করেছিলেন।"[৬]

রহস্য ও উদ্দেশ্য পরিপূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করলে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবটি পুরোপুরি

৬। হরপ্রসাদ মিত্র, বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ, ১৯৬৩, পৃঃ ৭০

সৈনিকের মতই মনে হবে। সুন্দরবনের ব্যাঘ্রসভার কল্পনায় হাস্যরসের অফুরন্ত অবকাশ আছে কিন্তু অন্তর্নিহিত অর্থ হৃদয়ঙ্গমের ক্ষমতা যাদের নেই বঙ্কিমচন্দ্রের আবেদন সম্ভবত তাদের কাছে নয়। বঙ্কিমচন্দ্র শিক্ষিত বাঙ্গালীর চৈতন্যসম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। শিক্ষাগর্বে স্ফীত বিকৃতবুদ্ধি বাঙ্গালীর সামনে বঙ্কিমচন্দ্র শাণিত বাক্যাস্ত্র সমন্বিত সাহিত্য উপস্থিত করেছিলেন। এ ছাড়া গত্যন্তরও ছিল না। এ জাতীয় তীক্ষ্ণ ও গভীর ব্যঙ্গরচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের অপরিসীম দক্ষতা দেখেছি, রস বিতরণ ও চৈতন্য সম্পাদন একই সঙ্গে উভয় উদ্দেশ্য পালন করেছেন এ জাতীয় রস সাহিত্যের মাধ্যমে। বৃহল্লাঙ্গুল সভ্যতার সংজ্ঞা নির্ণয় কালে বলেছে,

"সম্ভ্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয়কর্ম, অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উঞ্ছবৃত্তি এবং ভিক্ষা। ধূর্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি; বলবানের আহারান্বেষণ দস্যুতা; লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না; তৎপরিবর্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা আছে, সেই দস্যুর কার্যের নাম দস্যুতা, যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। আপনারা যখন সভ্য সমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই সকল নামবৈচিত্র্য স্মরণ রাখিবেন, নচেৎ লোকে অসভ্য বলিবে।"

সভ্য সমাজের এমন পূর্ণাঙ্গ ও তথ্যবহ বর্ণনা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতেই পেয়েছি আমরা। সভ্যতাভিমানী সম্প্রদায়ের মনে কিছু প্রতিক্রিয়া জাগানোর আশা হয়ত ছিল লেখকের। পাশ্চাত্য গর্বের মূলে কুঠারাঘাতের এমন নিখুঁত আয়োজন বাংলা প্রবন্ধে অচিন্তিত ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের দেশনিষ্ঠাই তাঁকে স্পষ্টবাক করেছে বলা চলে।

পাশ্চাত্য প্রভাবে আমাদের সমাজের যে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটেছে সে প্রসঙ্গেও বঙ্কিমচন্দ্র বহু ভাবে আলোচনা করেছেন। এ প্রবন্ধেও অর্থসর্বস্বতার মানদণ্ডে সামাজিক পদমর্যাদা নির্ণয়ের রীতিকে নিন্দা করেছেন তিনি। বৃহল্লাঙ্গুল মনুষ্য সমাজের বর্ণনাকালে বলেছে,

"মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতা বিশেষ। ......দেবতাও বড় জাগ্রত। এমন কাজই নাই যে, এই দেবীর অনুগ্রহে সম্পন্ন হয় না। পৃথিবীতে এমন সামগ্রী নাই যে, এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্মই নাই যে, এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে, ইহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না।......মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও মনুষ্য শাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়।"—বঙ্কিমচন্দ্র ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী সমাজের অর্থ-সর্বস্বতার ধিক্কার দিয়েছেন। চরিত্র ও বিদ্যার বিনিময়ে জড়ত্বের উপাসনা কোনো

জাতির চরিত্রে প্রকট হয়ে উঠলে তার ফলাফল ভালো হতে পারে না। বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনের' পাতায় এ প্রসঙ্গ নিয়েও আলোচনা করেছেন বারংবার। কমলাকান্তেও এ প্রসঙ্গ আছে, তাছাড়াও আছে আত্মস্বার্থবোধ বিসর্জন দিয়ে পরোপকারের মহিমা ব্যাখ্যার চেষ্টা।

বঙ্কিমচন্দ্র একটি বলিষ্ঠ বাঙ্গালী সমাজের স্বপ্ন দেখেছেন তাই সমাজের সর্বাঙ্গীণ সুস্থতাই ছিল তাঁর কাম্য। দেশপ্রেমী বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজচিন্তার পরিচয় 'লোকরহস্যের' অন্যত্রও আছে। 'লোকরহস্যের' 'বাবু' প্রবন্ধটিতে এই চেষ্টাই লক্ষ্য করি। সেযুগের বাংলাদেশের বাবুর চরিত্র বর্ণনা করে বঙ্কিমচন্দ্র সামাজিক অসুস্থ ব্যক্তিদের প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করেছেন। সামাজিক প্রগতি সামাজিক মানুষের জন্যই, কিন্তু বাবুশ্রেণীর প্রাধান্য থাকলে তা কি সম্ভব হতে পারে? এঁদের চরিত্র মাহাত্ম্য রচনার প্রয়োজন শুধু সে যুগেই বিশেষ ভাবে দেখা দিয়েছিল কেন? কারণ বঙ্কিমচন্দ্রই বলেছেন পূর্ণ মনুষ্যত্ব পরসুখ বর্ধনেই নিহিত। এছাড়া বাঁচাই অর্থহীন। সামাজিক উন্নতিও অচিন্ত্যনীয় সেখানে। বাবু মাহাত্ম্য সামগ্রিকভাবে জাতীয় চরিত্র রক্ষার প্রয়োজনেই লিখিত হয়েছে বলে আমাদের ধারণা। বাবুর বর্ণনা কালে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন,

"যাহারা বাক্যে অজেয়, পরভাষা পারদর্শী, মাতৃভাষা বিরোধী, তাহারাই বাবু। মহারাজ! এমন অনেক মহাবুদ্ধিসম্পন্ন বাবু জন্মিবেন যে, তাঁহারা মাতৃভাষায় বাক্যালাপে অসমর্থ হইবেন।"

বঙ্কিমচন্দ্রের ভবিষ্যৎ বাণীর মধ্যে যে সুতীব্র ব্যঙ্গ নিহিত আছে মাতৃভাষা-বিরোধী বাবু সম্প্রদায় তাতে ভীত না হলেও অপদস্থ হয়েছেন নিশ্চয়ই। স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব তখনও আসেনি, বঙ্কিমচন্দ্র তখন চরিত্র সৃষ্টির চেষ্টা করছেন। সাধারণ মানুষের চরিত্ররচনা পর্ব সমাপ্ত করেই তিনি 'আনন্দমঠের' সংগ্রামী সেনার পরিকল্পনা করেছিলেন। মসী যে অসির চেয়েও শক্তিশালী বঙ্কিমচন্দ্রের এই নিপুণ সমাজচিত্র ও সামাজিক চরিত্র রচনাই তা প্রমাণ করেছে। স্বদেশপ্রেম যে চরিত্রকে আন্দোলিত করবে সেই দেশসচেতন মনুষ্যসমাজ গঠনের পরিকল্পনাটাই সর্বাগ্রে গ্রহণ করেছিলেন তিনি। 'বাবু' প্রবন্ধটিতে ভাষার চাবুকে মনুষ্য চরিত্র সংশোধনচেষ্টাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেমই ব্যক্ত হয়েছে।

'লোকরহস্যের' কয়েকটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র পাশ্চাত্য সমালোচনার পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। পাশ্চাত্য সমালোচকের মানদণ্ডে ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীর বিচারের রসোজ্জ্বল বিবরণ দিয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র। নির্মল হাস্যরসের অবতারণা করার উদ্দেশ্যই যে এখানে প্রধান উদ্দেশ্য নয় তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু আত্মসচেতনতা অর্জনের জন্য এ জাতীয় রহস্যের যে অপরিসীম মূল্য আছে তা অস্বীকার করা যায় না।

'রামায়ণের সমালোচনা' ও 'কোন স্পেশিয়ালের পত্র'-এ জাতীয় রচনার উদাহরণ। এ জাতীয় রচনায় যে স্বদেশচেতনা ও আত্মমর্যাদাবোধ সঞ্চারিত হতে পারে বঙ্কিমচন্দ্র তা অনুমান করেছিলেন। কিন্তু রসসঞ্চারের চেষ্টা না করে প্রতিবাদের ঝড় তুললে ব্যাপারটি ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারত। হেমচন্দ্রের 'ভারত সংগীতের' বক্তব্যেও এই তীব্রতা সঞ্চারিত হয়েছিল। হেমচন্দ্র রাজরোষ এড়াতে পারেননি, বঙ্কিমচন্দ্র স্বকৌশলে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছেন। স্বদেশপ্রেমের প্রত্যক্ষ আবেদন ছিল না বলেই এটি সম্ভব হয়েছিল।

'লোকরহস্যে'র 'ইংরাজস্তোত্র' নামক প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সে যুগের অন্ধ ইংরেজভক্তির চূড়ান্ত নিদর্শন রচনা করেছেন। কিন্তু তাতেও যে ইংরেজপ্রীতির পরিবর্তে স্বদেশপ্রীতিই প্রাধান্য লাভ করেছে সেটিও নিতান্তই রচনা গুণে। মহাভারত থেকে ইংরাজস্তোত্রের বঙ্গানুবাদে বঙ্কিমচন্দ্র অনুবাদকের নিষ্ঠা বজায় রেখেছেন আগাগোড়া। এই স্তোত্র রচনার উদ্দেশ্যটিও স্পষ্ট। স্তোত্র রচনা করা হয় সাধারণতঃ দেবতাকে কেন্দ্র করে। পরাধীন ভারতবর্ষে ইংরেজ যে দেবতার স্থান অধিকার করেছিল তাতে সন্দেহ কি। বঙ্কিমচন্দ্র এই স্তোত্র রচনায় তাঁর রাজভক্তিরই নিদর্শন রক্ষা করেছেন প্রকাশ্য ব্যঙ্গে। বঙ্কিমচন্দ্র উপদেশক ছিলেন না, তিনি ছিলেন দ্রষ্টা। শাসকগোষ্ঠীর মনস্তুষ্টি সাধন যুগধর্মেরই প্রেরণা, কিন্তু স্বাধীনচেতা বঙ্কিমচন্দ্র এতে সমর্থন জানাতে পারেননি। 'ইংরাজস্তোত্র' রচনা করেই শেষ পর্যন্ত তাঁর যথার্থ মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। ব্যঙ্গের চূড়ান্তরূপ এ প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে বলেই নির্মম আঘাতে সমস্ত জাতিকে তিনি সচেতন করে তুলেছেন। এ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সর্বশ্রেণীর ইংরাজ তোষণকারীর আন্তরিক বাসনাটি ব্যক্ত করেছেন।

'তুমি বেদ, আর ঋকযজুসাদি মানি না; তুমি স্মৃতি, মন্বাদি ভুলিয়া গিয়াছি; তুমি দর্শন, ন্যায়, মীমাংসা প্রভৃতি তোমারই হাত। অতএব হে ইংরাজ! তোমাকে প্রণাম করি।"

হে শুভঙ্কর! আমার শুভ কর। আমি তোমার খোশামোদ করিব, তোমার প্রিয়কথা কহিব, তোমার মন রাখা কাজ করিব—আমায় বড় কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।

হে মিষ্ট ভাষিণ্‌! আমি মাতৃভাষা ত্যাগ করিয়া তোমার ভাষা কহিব, পৈত্রিক ধর্ম ছাড়িয়া ব্রাহ্মধর্মাবলম্বন করিব; বাবু নাম ঘুচাইয়া মিষ্টর লেখাইব; তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও। আমি তোমাকে প্রণাম করি।

হে সর্বদ, আমাকে ধন দাও, মান দাও, যশঃ দাও,—আমার সর্ব বাসনা সিদ্ধ কর। আমাকে বড় চাকরি দাও, রাজা কর, রায়বাহাদুর কর, কৌন্সিলের মেম্বর কর, আমি তোমাকে প্রণাম করি।"

বঙ্কিমচন্দ্র রাজকর্মচারী হয়ে রাজবন্দনা করেছিলেন—কিন্তু এর অন্তর্নিহিত আবেদনটি যে স্বদেশসচেতন বঙ্কিমেরই তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য এই দৃপ্তসিংহ বঙ্কিমকেও নিষ্ঠার সঙ্গে রাজকর্ম পালন করতে হয়েছে,—ইংরেজপ্রদত্ত সম্মান মাল্য কণ্ঠে ধারণ করতে হয়েছে। কোন সমালোচক দুঃখ করে বলেছিলেন, "লোক-রহস্য যাঁহার তীব্র ব্যঙ্গময়ী লেখনীপ্রসূত যিনি 'ইংরাজস্তোত্রের' রচয়িতা, বিধি বিড়ম্বনায় তিনিই কি না আজ রায়বাহাদুর। যাঁহার তেজস্বিনী, রসময়ী প্রতিভায় বঙ্গদেশ অদ্যাবধি মুগ্ধ হইয়া রহিয়াছে, যিনি দুর্গোৎসব হইলে অভাগিনী বঙ্গভূমির কলঙ্ক মোচনের দিন গণনা করেন, সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা জননী জন্মভূমির বন্দনা করিয়া যিনি বাঙ্গালীর চক্ষে অশ্রু প্রবাহিত করিয়াছেন, তাহার প্রতি এ অত্যাচার কেন?"[৭]

পরাধীন দেশের লেখকের এই অন্তর্দাহ থাকবেই। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক রচনাসম্ভার বঙ্কিমচিত্তের তীব্র অন্তর্দাহেরই পরিচয় বহন করছে। প্রত্যক্ষভাবে আঘাত করার কিংবা আক্ষেপ করার সুযোগ ছিল না বলেই পরোক্ষভাবে বিদ্রূপাত্মক পন্থাই বেছে নিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তে' বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশভাবনা ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপেই ব্যক্ত।

"লোকরহস্যে" বঙ্কিম ক্ষমাহীন। আত্মদোষ সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব আছে বলেই পরাজয়ের গ্লানি আমাদের স্পর্শ করে না,—নির্বিকার ঔদাসীন্যে আমরা জড়বৎ। বঙ্কিম তাই উত্তেজনা চান, আঘাতের তীব্রতাই উত্তেজনা সঞ্চারে সক্ষম, বঙ্কিমও তাই খড়্গহস্তে উদ্যত। 'গর্দভ' প্রবন্ধে বঙ্কিমের সমালোচনা নির্মম। শাস্ত্র-পুরাণের মর্যাদা রক্ষার চেয়েও আত্মবোধ সঞ্চারের প্রতিই বঙ্কিমচন্দ্র অধিক মনোযোগী। 'গর্দভ' স্তুতিপ্রসঙ্গে বঙ্কিম বলেছেন,—

"তুমি কলিযুগে বঙ্গদেশে বৃদ্ধ সেন রাজা ছিলে,—নহিলে বঙ্গদেশে মুসলমান কেন?"

বঙ্গে যবনাধিকারের ঘটনাকে বঙ্কিমচন্দ্র নানা ভাবে সমালোচনা করেছেন—কিন্তু এ জাতীয় ব্যঙ্গ অন্যত্র নেই। বাংলাদেশের স্বাধীনতা লক্ষ্মণসেনের আমলেই অস্তমিত হয়,—সে জন্য বৃদ্ধ লক্ষ্মণসেনকে বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও ক্ষমা করেননি। 'মৃণালিনী'তে লক্ষ্মণসেনের চরিত্রে তিনি অনায়াসে কলঙ্ক লেপন করেছিলেন। দেশাত্মবোধই বঙ্কিমচন্দ্রকে ক্ষমাহীন করেছে—এ অংশটিতে সেই বিক্ষুব্ধ মনোভাবটিই প্রতিবিম্বিত। 'লোকরহস্যের' কিছু প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী ও বাংলা দুটি

৭। হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, বঙ্কিমচন্দ্র, ১৯৬২।

ভাষারই সাহায্য নিয়েছেন—রঙ্গরস সৃজন ছাড়াও সেযুগের ইংরেজীপ্রেমিকদের অপদস্থ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। সেযুগের শিক্ষিত বাঙ্গালীর মাতৃভাষাঅবহেলা অতিমাত্রায় বিস্তারলাভ করেছিল। অশিক্ষিত ও ইংরেজীঅনভিজ্ঞ পত্নীর সঙ্গে কথোপকথনেও তারা হাস্যকর মনোভাবের পরিচয় দিত। বাংলা ভাষার এই অনাদরে বঙ্কিমচন্দ্র কতটা ক্ষুব্ধ ও বিরক্ত বোধ করতেন তার পরিচয় এই বৈভাষিক প্রবন্ধপুঞ্জে মিলবে। 'হনুমদ্বাবুসংবাদের' বাবুটিও মাতৃভাষায় কথোপকথনে সম্পূর্ণ অনভ্যস্ত। হনুমানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের মুহূর্তে ইংরাজীবুলির আধিক্যে বিরক্ত হয়ে হনুমান বলেছে,—"হে টুপ্যাবৃত মহাপুরুষ। মাতৃভাষায় কথা কও।"

এই বাবুটির পরিচয় নির্ণয় কালে হনুমানের বর্ণনাটিও উপভোগ্য,—"মহাশয়! দুঃখিত হইবেন না। আপনার বুলি ইংরেজি, বেশ কিষ্কিন্ধ্যা, এবং মূর্খতা পাহাড়ে রকম দেখিয়া আপনার জাতি নিরূপণার্থ আপনাকে এতটা কষ্ট দিয়াছি।

বঙ্কিমচন্দ্র এই বাবুটির দেশ চর্চার পরিচয়ও দিয়েছেন, হনুমানকে বাবুটি বলেছে,—

"তুমি রামের দাস আমি ইংরেজের দাস। তোমার রাম বড়, কি আমার ইংরেজ বড়?"

এই দেশচেতনাই সে যুগের চাকুরীপ্রাণ বাঙ্গালীর গর্বের বিষয় হয়েছিল। স্বাধীনতার অর্থব্যাখ্যায় বাবুরা কখনও পশ্চাৎপদ নন কিন্তু স্বাধীন মনোভাবটিই তাদের চরিত্রে অনুপস্থিত। হনুমানকে স্বাধীনতার মাহাত্ম্য জ্ঞাপন করে বাবু বলেছে,

"স্বাধীনতাশূন্য মনুষ্যজন্মই পশুজন্ম। পরাধীনেরা গো-মহিষাদির ন্যায় রজ্জুবদ্ধ হইয়া তাড়িত হয়। সৌভাগ্যক্রমে আমাদের রাজপুরুষেরা আজন্ম স্বাধীন—freeborn."

আত্মদৈন্যের এমন অকপট স্বীকারোক্তি, মূর্খতার এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তুলে ধরাই বঙ্কিমচন্দ্রের মূল উদ্দেশ্য ছিল। বাবু সম্প্রদায়ের চরিত্রালোচনায় বঙ্কিমচন্দ্র গভীর দেশচিন্তারই পরিচয় দিয়েছেন।

'BRANSONISM' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র ইলবার্ট বিলের সমালোচনা করেছেন সুকৌশলে। সমগ্র দেশব্যাপী এই আন্দোলনে বঙ্কিমচন্দ্রও অংশ নিয়েছিলেন। নেটিভ ডেপুটি জন ডিকসনকে শাস্তি দেওয়ায় ইংরাজীদৈনিকে এই সংবাদ প্রকাশিত হয়,—

"Possibly the Babu was under the impression that Lord Ripon's cruel and nefarious Government had already passed into Law the Bill which is to authorize every man with a dark skin lawfully to murder and hang every man with a white one. May that day be distant yet!"

ডেপুটির আত্মরক্ষার একমাত্র পথ রইল কৌশল অবলম্বন। পরাধীনতা মানুষের পলায়নী মনোভাব সৃষ্টি করে। সত্য ও ন্যায় যেখানে লাঞ্ছিত, মনুষ্যত্ব শুধু আত্মরক্ষার পথ খোঁজে। ম্যাজিষ্ট্রেট কৈফিয়ৎ তলব করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র ডেপুটির তৎপরতার বর্ণনা দিয়েছেন,

"এখন ডিপুটি বাবুটি বহুকালের ডিপুটি—জানিতেন যে, তর্কে তাঁহার জিত নিশ্চিত, কিন্তু তর্কে জিতিলেই বিপদ। অতএব সুচতুর দেশী চাকুরের যাহা কর্তব্য, তাহা করিলেন, তর্ক ছাড়িয়া দিলেন। বলিলেন, "I do not presume to discuss the matter with you, Sir, I see I was wrong, and I am very sorry for it."

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ডেপুটি ছিলেন,—বিচারপ্রহসনের এই নমুনাটি থেকে আমরা আত্মসচেতন হবার সুযোগ পেতে পারি। বাঙ্গালী যতদিন অচেতন ছিল সুকৌশলী ডেপুটিদের পদমর্যাদা বেড়েছে। "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত" রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র সে তথ্য সম্বন্ধে আমাদের সচেতন করেছেন। এক একটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বঙ্গদর্শন করেছিলেন। স্বদেশপ্রেমিকের বাসনা নিয়ে তিনি সমাজের রাজপথ পরিত্যাগ করে কানাগলিতে প্রবেশ করেছেন। যথার্থ সমাজদর্শন ত হয়েছেই উপরন্তু আত্মদর্শনেরও সুযোগ পেয়েছি আমরা। 'লোকরহস্য' পর্যায়ের প্রবন্ধগুচ্ছ সেদিক থেকেই মূল্যবান রচনা।

'বাংলা সাহিত্যের আদর'ও 'New Year's Day'—রচনা দুটিতে তরল হাস্যরসের মধ্যে কিঞ্চিৎ দেশচেতনাও মিশ্রিত আছে। দুটিই সংলাপাকারে [ইঙ্গ বঙ্গ মিশ্রিত সংলাপে] রচিত। পাত্রী বাঙ্গালী ঘরের সাধারণ বধূ, পাত্র শিক্ষিত বঙ্গযুবা। 'বাংলা সাহিত্যের আদরে' নায়িকা বঙ্গসাহিত্য প্রেমিকা। শিক্ষিতস্বামীর বাংলা-সাহিত্যে রুচি নেই,—

"কি জান—বাংলা-ফাংলা ওসব ছোটলোকে পড়ে ওসবের আমাদের মাঝখানে চলন নেই ওসবকি আমাদের শোভা পায়?"

এই মনোভাবের হেতু বিশ্লেষণে শিক্ষিত যুবাটি আরও বলেছে,—

"আমাদের হলো polished society—ও সব বাজেলোকে লেখে—বাজে লোকে পড়ে—সাহেব লোকের কাছে ওসবের দর নেই—polished society-তে কি ওসব চলে?"

এর উত্তরে ভার্যার মন্তব্যটি অনবদ্য,—

"তা মাতৃভাষার ওপর পালিশষষ্ঠীর এত রাগ কেন?"

এ জাতীয় রচনায় রঙ্গরসের ফোয়ারা শতধারে উচ্ছ্বসিত হয়েছে এবং মাতৃভাষা-

প্রেমী বঙ্কিমচন্দ্রকেও আমরা আবিষ্কার করেছি। মাতৃভাষার মহিমা সম্বন্ধে বহুরচনা স্বদেশচেতনার প্রথম স্তরেই পাওয়া যায়। বঙ্কিমচন্দ্র যেযুগে বঙ্গসাহিত্যের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সেযুগেও মাতৃভাষা সম্পর্কে তথাকথিত ইংরাজীশিক্ষিতের উন্নাসিকতা ঘোচেনি। রবীন্দ্রনাথ "বঙ্কিমচন্দ্র" প্রবন্ধে সেকথাই বলেছেন,—

"অসম্মানিত বঙ্গভাষাও তখন অত্যন্ত দীন মলিনভাবে কালযাপন করিত। তাহার মধ্যে যে কতটা সৌন্দর্য কতটা মহিমা প্রচ্ছন্ন ছিল তাহা তাহার দারিদ্র্য ভেদ করিয়া স্ফূর্তি পাইত না। যেখানে মাতৃভাষার এত অবহেলা সেখানে মানবজীবনের শুষ্কতা-শূন্যতা-দৈন্য কেহই দূর করিতে পারে না।

এমন সময়ে তখনকার শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ বঙ্কিমচন্দ্র আপনার সমস্ত শিক্ষা সমস্ত অনুরাগ সমস্ত প্রতিভা উপহার লইয়া সেই সংকুচিতা বঙ্গভাষার চরণে সমর্পণ করিলেন; তখনকার কালে কী যে অসামান্য কাজ করিলেন তাহা তাঁহারই প্রসাদে আজিকার দিনে আমরা সম্পূর্ণ অনুমান করিতে পারি না।" [বঙ্কিমচন্দ্র]

বঙ্কিমচন্দ্রের মাতৃভাষাপ্রীতির নিদর্শন হিসাবে 'লোকরহস্যের' উক্ত প্রবন্ধটির মূল্য স্বীকার করতে হবে। এই নির্মম সমালোচনায় শিক্ষিতযুবার শোচনীয় চরিত্র উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

New Year's Day-তে ইংরেজীয়ানার মোহ সম্বন্ধে লেখক সতর্ক করে দিয়েছেন আমাদের। শিক্ষিত যুবা ইংরেজী নববর্ষ উৎসবের আয়োজন করেছে, স্ত্রী সমালোচনা করেছে,—

"শ্বশুর ধরিতেন ১লা বৈশাখ থেকে, তুমি ধর ১লা জানুয়ারী থেকে, আমার ছেলে বোধ করি ধরিবে ১লা শ্রাবণ থেকে?"—এই পরানুকরণ ব্যাধির প্রতিকারের উপায় জানা ছিল না আমাদের,—কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বদেশপ্রাণ মনীষীবৃন্দ চৈতন্য সম্পাদনের প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাটি তারই নিদর্শন। 'লোকরহস্য' ও 'কমলাকান্তের' মধ্যে বঙ্কিমমনীষীর যে বিচিত্র পরিচয় পাওয়া যায় তার পূর্ণাঙ্গ আলোচনার সুযোগ আমাদের নেই। স্বদেশপ্রেমাত্মক ভাবনা 'লোকরহস্যের' বক্তব্যকে অর্থপূর্ণ করেছে,—রসিকতার অন্তরালে স্বদেশপ্রেমী বঙ্কিমচন্দ্রের আন্তর পরিচয়টি উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। 'লোকরহস্যের' রচনাভঙ্গি 'কমলাকান্তে'ও অনুসৃত, কিন্তু কমলাকান্তের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র জনপ্রিয়তার তুঙ্গশীর্ষে আরোহণ করেছেন। সম্ভবতঃ 'কমলাকান্ত' চরিত্রটির জন্যই গ্রন্থটির একটি বিশেষ মূল্য স্বীকৃত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ সংস্করণের ভূমিকায় 'কমলাকান্ত' রচনার যুক্তিসঙ্গত হেতু নির্ণয় করেছেন সম্পাদকদ্বয়, "স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় মন প্রথমটা 'লোকরহস্যে'র সহজ পথে একটা মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিয়া কতক সান্ত্বনা

লাভ করিয়াছিল। কিন্তু মাসের পর মাস নিছক রহস্য সৃষ্টি করিয়া তৃপ্ত থাকিবার মত পল্লবগ্রাহী মন বঙ্কিমচন্দ্রের ছিল না। অর্ধোন্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তখন তাঁহার উপায় ছিল না। সোজাসুজি সজ্ঞানে যে সকল কথা বলিতে তিনি সঙ্কোচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসঙ্কোচে বলিতে পারিতেন, এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর মাস পাঠক ভুলাইতে তাঁহার বেগ পাইতে হইত না। এক আধারে ব্যঙ্গের শর্করামণ্ডিত কাব্য, পলিটিকস, সমাজবিজ্ঞান এবং দর্শন পরিবেশনের উপায় সৃষ্টি করিয়া সম্পাদক এবং প্রচারক বঙ্কিমচন্দ্র নিজের কাজ অনেকটা সহজ করিয়া লইলেন। কমলাকান্ত জন্মের ইহাই ইতিহাস।"

['কমলাকান্ত'—সম্পাদক ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস] কমলাকান্ত নামক নেশাগ্রস্ত ও রহস্যময় পাগলের বকলমে কবি, ভাবুক, স্বদেশপ্রাণ, দার্শনিক-রাজনীতিসমালোচক, সমাজব্যাখ্যাতা বঙ্কিমচন্দ্র আত্মপ্রকাশ করেও আত্মগোপন করে আছেন। স্বদেশপ্রেম ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি, কিন্তু প্রকাশ্য স্বদেশবন্দনা ও উত্তেজিত স্বদেশাত্মক রচনার জন্য রাজন্য-বর্গের কাছ থেকে অভিনন্দনের পরিবর্তে শাসনের হুমকি প্রাপ্য হোত লেখকের কপালে। বঙ্কিমচন্দ্র শ্যাম ও কুল রাখার জন্যই যে এই অভিনব পদ্ধতির আশ্রয় নিয়েছিলেন—তাতে সন্দেহ নেই। কোথাও তিনি যুক্তিবাদী ভাবুক, কোথাও তিনি অসংলগ্ন চিন্তার আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত। পরাধীনতা লেখকের স্বাধীনতা গ্রাস করে, কিন্তু তার প্রতিভাকে স্পর্শ করতে পারে না। নব নব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে স্বদেশপ্রেমিক লেখক অভিনব উপায়ে বিকশিত করেন নিজেকে। এ সম্বন্ধে সমালোচক প্রমথনাথ বিশী স্বদেশীসাহিত্য সম্বন্ধে একটি মূল্যবান উক্তি করেছেন,—

"পরাধীন জাতির সাহিত্য একদিক ভারী নৌকার মতো, আর সে অবস্থাটা যে কিছুতেই সুখকর নয়, তাহা তো সহজেই বুঝিতে পারা যায়। পরাধীন জাতি কিছুতেই নিজের বাস্তব অবস্থা ভুলিতে পারে না, তাই সতত স্মৃত এই বাস্তব অবস্থা তাহার জীবননৌকার এক পাশ চাপিয়া বসিয়া তাহাতে কাত করিয়া ফেলে।··· বৃটিশ আমলের প্রত্যেক বাঙ্গালীলেখক এবং প্রায় প্রত্যেক উল্লেখযোগ্য পুস্তক অল্প-বিস্তর পরিমাণে এই ত্রুটিসম্পন্ন। অল্প শক্তিমান লেখকের হাতে পড়িলে এই ত্রুটির পরিণামে সৃষ্ট হয় 'মেবার পতন', প্রতিভাধরের হাতে পড়িলে সৃষ্টি হইতে পারে 'কমলাকান্তের দপ্তর'। মূল প্রেরণা এক, তারতম্য প্রতিভাতে।"[৮]

৮। প্রমথনাথ বিশী, বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা, কমলাকান্তের দপ্তর,

'কমলাকান্ত' আলোচনা করলেই পরাধীন জাতির জাতীয়সাহিত্যের মূল উপাদান ও ভঙ্গি এতে মিলবে। সেদিক থেকে প্রবন্ধ সাহিত্যে 'কমলাকান্ত' তুলনাহীন এবং কমলাকান্তস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনা শুধু তিনিই।

বঙ্কিমচন্দ্র 'কমলাকান্তের' ছদ্মবেশে কখনও উত্তেজিত সমালোচক, কখনও অভিভূত দেশপ্রেমিক। তীব্র ব্যঙ্গের চাবুকে তিনি যখন সমগ্র বাঙ্গালীসমাজকে সচকিত করে তোলেন তখনও দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র নীরবে অশ্রুবর্ষণ করেন আবার চরম হতাশায় যখন তাঁকে মুহ্যমান হতে দেখি তখনও তাঁর স্বদেশপ্রেমিকতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কখনও তিরস্কার, কখনও ভৎর্সনা, কখনও আক্ষেপে ও দুঃখে কমলাকান্তরূপী বঙ্কিমচন্দ্র এখানে জীবন্ত স্বদেশপ্রেমিক। স্বদেশচিন্তার এই সুগভীর আন্তরিকতাই 'কমলাকান্তে' পৃথক রস সঞ্চার করেছে।

'কমলাকান্তেই' বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্গপ্রেমে আত্মহারা হয়েছেন। ইতিহাসের লুপ্ত কাহিনী উদ্ধারের পূর্বাপর বাসনাকে 'কমলাকান্তে' তিনি যত আবেগের সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন অন্যত্র তা পাই না। বিপথগামী দেশবাসীকে সচেতন করে তোলার দায়িত্ব পালনে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে তৎপর। ছদ্ম দেশপ্রেমীদের মুখোশ খুলে দেওয়ার মত নির্ভীকতা 'কমলাকান্তে' স্পষ্ট। কমলাকান্তেই বঙ্গজননীর জন্য আকুলভাবে ক্রন্দন করেছিলেন তিনি। কাজেই স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র জীবনের স্বদেশ সাধনা এই গ্রন্থটিতে সূত্রাকারে ব্যক্ত হয়েছে বলা যায়।

সমগ্র 'কমলাকান্ত' তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে,—দপ্তর, পত্র ও জোবানবন্দী। এই তিনটি ভাগের প্রবক্তাই কমলাকান্ত স্বয়ং। দপ্তর রচনার ইতিহাস প্রসঙ্গে কমলাকান্তেরও ইতিহাস খানিকটা পাওয়া যায়। স্বদেশপ্রেমিকতা কমলাকান্তের চারিত্রিক গুণ। কমলাকান্তের সমগ্র জীবন পরার্থে উৎসর্গীকৃত, যদিও সার্থকতার মানদণ্ডে কমলাকান্ত কোথাও সমাদৃত হয়নি। কমলাকান্তের পরিচয় দান করেছেন ভীষ্মদেব খোশনবীস,—চাকুরী পেয়েও কমলাকান্ত কেন শেষ পর্যন্ত চাকুরীকে জীবিকা হিসেবে গ্রহণ করতে পারেনি তার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বলা হয়েছে,—

"একবার সাহেব তাহাকে মাস্কাবারের পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছিলেন। কমলাকান্ত বিলবহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে, সাহেব দুই চারিটা পয়সা ছড়াইয়া ফেলিয়া দিতেছেন। নীচে লিখিয়া দিল 'যথার্থ পে-বিল।' সাহেব নূতনতর পে-বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন।

এই অংশটিতেই কমলাকান্ত চরিত্রের স্পষ্ট পরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়েছে,—চাকুরী-প্রাণ বাঙ্গালীসমাজে পাগল কমলাকান্তকে ব্যতিক্রম বলতে পারি, কিন্তু চিত্রকর

কমলাকান্তের ছদ্মরূপ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে,—কমলাকান্তের পাগলামির উদ্দেশ্য কিন্তু অর্থপূর্ণ। যে চিত্র রচনা করে কমলাকান্ত বিতাড়িত হয়েছেন,—তার মূলে দেশপ্রাণতার অনুভূতিই তীব্রভাবে বর্তমান। তিনি কমলাকান্ত বর্ণিত চিত্রে একটি মর্মান্তিক সত্যই বর্ণনা করেছিলেন। শাসক ও শাসিতের সম্পর্ককে এমন সুতীক্ষ্ণ ব্যঙ্গচিত্রে রূপদানের কৌশলটি কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের। কমলাকান্তের স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র এভাবেই গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্যের আভাস দিয়েছিলেন।

'কমলাকান্তের দপ্তরে' বঙ্কিমচন্দ্রের দেশপ্রীতির উচ্ছ্বাস অন্ততঃ দুটি প্রবন্ধে চূড়ান্ত রূপ পেয়েছে। 'আমার দুর্গোৎসব' ও 'একটি গীত' নিছক স্বদেশপ্রেমিকের রচনা। 'আনন্দমঠের' মাতৃবন্দনার মন্ত্র 'আমার দুর্গোৎসবে'-ই প্রথম সূচিত হয়েছে। কমলাকান্তের মাতৃপূজার আবেগ এ প্রবন্ধে একটি গভীর ব্যঞ্জনাসৃষ্টি করেছে। কমলাকান্ত যে মাতাকে দর্শন করেছেন তিনিই জন্মভূমি; দুর্গামূর্তির এই নতুন ব্যাখ্যা 'আনন্দমঠে-ও' পেয়েছি—

"চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী মৃত্তিকারূপিনী—অনন্তরত্ন ভূষিতা এক্ষণে কালগর্ভেনিহিতা।"

দুর্গামূর্তির মধ্যে সাক্ষাৎ বঙ্গজননীকে আবিষ্কার করেই তিনি উচ্ছ্বসিত আবেগে আত্মহারা হয়েছেন। ঘোর দুর্দিনের পটভূমিকায় কমলাকান্ত সমগ্র বঙ্গবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন,

"এস, ভাই সকল! আমরা এই অন্ধকার কালস্রোতে ঝাঁপ দিই। এস, আমরা দ্বাদশকোটি ভুজে ঐ প্রতিমা তুলিয়া, ছয়কোটি মাথায় বহিয়া ঘরে আনি। এস, অন্ধকারে ভয় কি? ঐ যে নক্ষত্রসকল মধ্যে মধ্যে উঠিতেছে, নিবিতেছে, উহারা পথ দেখাইবে—চল! চল! অসংখ্য বাহুর প্রক্ষেপে, কালসমুদ্র তাড়িত, মথিত, ব্যস্ত করিয়া, আমরা সন্তরণ করি—সেই স্বর্ণপ্রতিমা মাথায় করিয়া আনি। ভয় কি? না হয় ডুবিব, মাতৃহীনের জীবনে কাজ কি?"

এই আহ্বান দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের আকুল আহ্বান। মাতৃরূপে ঈশ্বরদর্শন বাঙ্গালীর চির-আকাঙ্ক্ষিত—ধর্মে, সাহিত্যে তারই প্রতিরূপ, সেখানেই বাঙ্গালীর বিশিষ্টতা। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও সেই ভাবটিই ঈষৎ রূপান্তরিত হয়ে দেশপ্রেমে পরিণত হয়েছে। ধর্ম মানুষের আন্তরিক আবেগেরই বহিঃপ্রকাশ – দেশপ্রেমের মধ্যে এই ব্যঞ্জনাটুকু আরোপের চেষ্টা করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। ধর্মচেতনার সঙ্গে দেশচেতনাকে সঞ্জীবিত করলে দেশপ্রেম একটি বিশেষ লক্ষ্যে পরিণত হবে, সার্থকতা লাভ করা সম্ভব হবে তখনই। তাই বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমকেও সাধনার পর্যায়ে তুলে ধরেছেন। 'আনন্দমঠের' সন্তানরা দেশসাধনাকে ধর্মসাধনার সঙ্গে এক করে দেখেছে।

ধর্মসাধনায় সিদ্ধির জন্য যে নিষ্ঠা, ত্যাগ ও সংযম পালন করতে হয়,—দেশপ্রেমের সাধনা তার চেয়ে কম কষ্টকর নয়। 'আনন্দমঠ' রচনারও বহু আগেই যে বঙ্কিমচন্দ্র দেশপ্রেমের এই জাতীয় মহিমা প্রচারের চেষ্টা করেছিলেন, 'আমার দুর্গোৎসব' প্রবন্ধটি তার প্রমাণ। এখানেও অবশ্যপালনীয় যে কর্তব্য নির্দেশ করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র তা এই,

"উঠ মা হিরণ্ময়ী বঙ্গভূমি! উঠ মা। এবার সুসন্তান হইব, সৎপথে চলিব—তোমার মুখ রাখিব। উঠ মা, দেবী দেবানুগৃহীতে—এবার আপনা ভুলিব—ভ্রাতৃবৎসল হইব. পরের মঙ্গল সাধিব-অধর্ম, আলস্য, ইন্দ্রিয়ভক্তি ত্যাগ করিব—উঠ মা—একা রোদন করিতে'ছি, কাঁদিতে কাঁদিতে চক্ষু গেল মা। উঠ উঠ, উঠ মা বঙ্গ জননী।"

এই অংশে বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমিকের কর্তব্য নির্ণয় করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র দেশসাধককে পরার্থপর, ইন্দ্রিয়জয়ী, কর্মঠ, ঐক্যপরায়ণ হবার উপদেশ দিয়েছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তরের' অন্যান্য প্রবন্ধে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য সমাজতাত্ত্বিকদের অনুসরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র জাতীয় চরিত্র গঠনের মূলসূত্র নির্ণয় করেছেন। দেশপ্রেমিককে দেশসাধক হবার উপদেশ দিয়েছেন তিনি।

'একটি গীত' দেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্রের অনবদ্য একটি রচনা। বৈষ্ণব-মহাজন পদ অবলম্বনে বঙ্কিমচন্দ্র যে অভিনব সৌন্দর্য ও ভাব আরোপ করেছেন—সেদিক থেকে প্রবন্ধটির সূক্ষ্ম কলাকৌশলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়েছেন সমালোচকবৃন্দ। তাছাড়া দেশপ্রেমের ব্যঞ্জনায় প্রবন্ধটি আরও উজ্জ্বল হয়েছে। পরাধীনতার দুঃখ ও আক্ষেপ এ প্রবন্ধে তীব্র আকারে প্রকাশিত। মুক্তির আশা মানুষকে শান্ত করে,—কিন্তু কমলাকান্ত ভবিষ্যৎদর্শন করে আরও গভীর বিষাদে নিমজ্জিত হয়েছেন। প্রচণ্ড হতাশার এ কাহিনী পাঠকের অন্তরে যে গভীর ক্ষোভের সঞ্চার করে—সেটুকুই রচনাটির স্থায়ী মূল্য। এ প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র অতীতপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। প্রচণ্ড বেদনার মধ্যে আলোকোজ্জ্বল অতীতের দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। পরোক্ষভাবে সমগ্র বাঙ্গালীর প্রাণে গভীর ক্ষোভ ও উত্তেজনার সঞ্চার করতে পেরেছিলেন বলে প্রবন্ধটির বিশেষ মূল্য স্বীকার করতে হয়। কমলাকান্তের আবেগ এই অংশটিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে,—

"আমার এক দুঃখ, এক সন্তাপ, এক ভরসা আছে। ১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যে দিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যে দিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায়! কত গণিব। দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়, বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার গণি।...যাহা

চাই তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? এক জাতীয়ত্ব মিলিল কই, ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণসেন কই? আর কি মিলিবে না? হায়! সবারই ঈপ্সিত মিলে, কমলাকান্তের মিলিবে না?"

ইতিহাস চেতনাকে পুনর্জীবিত করলে বাঙ্গালী আবার বাঁচার আনন্দ ফিরে পাবে,—উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সঙ্গে বাঙ্গালীর ইতিহাস চেতনা যুক্ত করার এ প্রয়াস বঙ্কিমচন্দ্রের দূরদর্শিতার পরিচায়ক। কাব্যে-নাটকে-উপন্যাসে অতীতচারণা স্বদেশপ্রেমিক সাহিত্যিকের অবলম্বন হয়েছিল, সে কারণেই আর্য্যগৌরব—হিন্দুপ্রীতি সেযুগের শিক্ষিত-স্বদেশপ্রাণ বাঙ্গালীর একমাত্র অবলম্বন হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র নিছক আর্যগরিমায় উচ্ছ্বসিত হননি। আর্য-সংস্কৃতির সঙ্গে বঙ্গসংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য ব্যবধান তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি; এ নিয়ে 'বিবিধপ্রবন্ধে' আলোচনার ঝড় তুলেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিমচন্দ্র প্রকৃত দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার জন্য যা চেয়েছিলেন—তা হল মনুষ্যত্ব, একজাতীয়ত্ব, ঐক্য। পাশ্চাত্ত্য সমাজআন্দোলন-এর প্রকৃতির সঙ্গে এদেশের জাগরণলগ্নকে মেলাতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র হতাশ হয়েছিলেন। বঙ্গসমাজের অভ্যন্তরীণ জীর্ণতা তাঁকে ব্যথিত করেছিল,—তাই তীব্রভাবে এই সমাজকে তিনি আক্রমণ করেছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের এই আক্রমণাত্মক মনোভাবের অন্তরালে যে বাসনাটি সর্বদাই সক্রিয় হয়েছিল তার ব্যাখ্যাকালে সমালোচক যথার্থই বলেছেন,—

'হিন্দু জাতিকে স্বাধীন দেখিবার আকাঙ্ক্ষা বঙ্কিমের মনে কখনও নির্বাপিত হয় নাই; যদিচ পরিণত বুদ্ধির সহায়তায় তিনি ভাল করিয়াই বুঝিয়াছিলেন, বর্তমান অবস্থায় এই স্বাধীনতা হিন্দুর লক্ষ্য নয়।'

[বঙ্কিম সাহিত্যের ভূমিকা,—'সীতারাম'-সজনীকান্ত দাস]

এই পরিস্থিতিতে স্বাধীনতা অর্জন যে অসম্ভব এই ধারণা বঙ্কিমচন্দ্রের মনে বদ্ধমূল হয়েছিলো বলেই তিনি স্বাধীনতা লাভের প্রস্তুতির আয়োজন চালিয়েছিলেন। আবেদন-নিবেদন-ক্রন্দন ও আক্ষেপের সাহায্যে তা সম্ভব ছিল না বলেই সৈনিকের বেশে যুদ্ধপর্বের নায়কত্ব করেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'একটি গীতে' বঙ্কিমচন্দ্রের রুদ্ধরোষ ফেটে পড়েছে যেন,—

"আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ, প্রয়াগ পর্য্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী-রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন দিকে? সে গৌড় কই? সে যে কেবল যবন লাঞ্ছিত ভগ্নাবশেষ।"

এই তীব্র আত্মজিজ্ঞাসার কোন সদুত্তর খুঁজে পাননি বঙ্কিমচন্দ্র, কিন্তু প্রতিটি বাঙ্গালীর মনে এই জিজ্ঞাসা জাগিয়েছিলেন তিনিই। অত্যন্ত ভাবাবেগপূর্ণ বর্ণনায় বঙ্গ ইতিহাসের অতীত পৃষ্ঠাটি হতাশাপীড়িত নির্জীব বাঙ্গালীর সামনে তুলে ধরেছিলেন তিনি। কমলাকান্তের ছদ্মবেশ এখানে নেই,—স্বদেশপ্রেমিক বঙ্কিমচন্দ্র এখানে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন।

'কমলাকান্তের' কয়েকটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র নির্মম সমালোচকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। 'ঢেঁকি' প্রবন্ধে বাঙ্গালীর দেশচর্চার সমালোচনা করেছেন তিনি।

"পরহিতেচ্ছা, দেশবাৎসল্য 'সাধারণ আত্মা' অর্থাৎ public spirit, বিশেষতঃ কার্য্য দক্ষতা, এ সকল খানায় পড়িলে হয় কি না?"

সমগ্র বাঙ্গালীজাতির চরিত্র লক্ষণ নির্ণয়কালেও বঙ্কিমচন্দ্র নির্মম সত্য উদ্ঘাটন করেন,—

"আয় ভাই, ঢেঁকির দল। তোমাদের সব বিদ্যাবুদ্ধি বুঝিয়াছি। যখনই পিঠে রমণীপাদপদ্ম ওরফে মেয়ে লাথি পড়ে, তখনই তোমরা ধান ভান,—নহিলে কেবল কাঠ-দারুময়—গর্তে শুঁড় লুকাইয়া, লেজ উঁচু করিয়া, ঢেঁকিশালে পড়িয়া থাক। বিদ্যার মধ্যে খানায় পড়া, আনন্দের মধ্যে "ধান্ধ", পুরস্কারের মধ্যে সেই রাঙ্গা পা।"

এই জাতীয় সমালোচনা নিছক রচনাগুণেই উপভোগ্য হয়েছিল। দেশবাৎসল্য জাতীয়চরিত্রে স্বতঃপ্রকাশিত হয়ে থাকে। কিন্তু ভণ্ড দেশপ্রেমীদের সাংখ্যাধিক্য লক্ষ্য করেই বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'পঞ্চানন্দ' ছদ্মনামে এই দায়িত্ব পালন করেছিলেন। বিরূপ সমালোচনা সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্যই প্রয়োজন। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্তী বিদ্রোহ সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যের এই অভাব পূর্ণ করেছে। বঙ্গদর্শনের অর্থনির্ণয় কালে লেখকের কোন বন্ধু বলেছিলেন, "শকারের উপর যে রেফটি আছে, বোধ হয়, তাহা মুদ্রাকারের ভ্রম, শব্দটি 'বঙ্গদশন', অর্থাৎ 'বাংলার দাঁত।"

এই ব্যাখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র খুশী হননি কিন্তু আমাদের খুশী করেছেন, কারণ এই অদ্ভুত ব্যাখ্যাটি তাঁর নিজস্ব। কমলাকান্ত স্বদেশহিতৈষণা বোঝেন কিন্তু ভণ্ডামির ঘোরতর শত্রু তিনি। 'মনুষ্যফলের' একটি অংশে সমালোচক কমলাকান্তের বক্তব্য, —"এ দেশে এক জাতি লোক সম্প্রতি দেখা দিয়াছেন, তাঁহারা দেশহিতৈষী বলিয়া খ্যাত। তাঁহাদের আমি শিমূল ফুল ভাবি। যখন ফুল ফুটে, তখন দেখিতে শুনিতে বড় শোভা—বড় বড়, রাঙ্গা রাঙ্গা, গাছ আলো করিয়া থাকে।…কালক্রমে চৈত্র মাস আসিলে রৌদ্রের তাপে, অন্তর্লঘু ফল, ফট করিয়া ফাটিয়া উঠে, তাহার ভিতর হইতে খানিক তুলা বাহির হইয়া বঙ্গদেশময় ছড়াইয়া পড়ে।"

এই সমালোচনাটিও উপভোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রেমের সাধনার কথা আলোচনা করেছেন 'আনন্দমঠে',—'কমলাকান্ত' রচনাপর্বে তিনি স্বদেশপ্রেমের মূল্যবিচার করার চেষ্টা করেছেন। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' পরার্থপরতাকেই মনুষ্যজীবনের সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় গুণ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে, স্বার্থলেশহীন ব্যক্তির পক্ষেই দেশপ্রেমী হওয়া সম্ভব। সন্তানব্রতধারী সৈনিকেরাও আত্মসুখভোগ, স্বকীয়ত্ব বিসর্জন দিয়েই দেশসাধক হয়েছিল।

কিন্তু বাঙ্গালীচরিত্রে তিনি এজাতীয় গুণের অভাব লক্ষ্য করেছিলেন। ইউটিলিটি বা উদরদর্শনে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর সামনে একটি মাত্র অনুসরণযোগ্য দর্শন প্রচার করেছেন. 'দেশের হিতসাধনের দর্শন।' বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম, উপাসনা, বল ও প্রতারণায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব সুতরাং দেশের হিতসাধনের দ্বারাই পুরুষার্থ লাভ সম্ভব। এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের বাঙ্গালীচরিত্র সমালোচনা তীব্রতর আকার ধারণ করেছে। দৈহিক ও মানসিক শক্তিতে ক্ষীণ বঙ্গবাসীকে তিনি উপহাস করেননি কিন্তু সচেতন করেছেন। আক্রমণের লক্ষ্য বাঙ্গালী কিন্তু এ বাঙ্গালী তাঁর স্বজাতি। কমলাকান্ত নিজেই দুর্বল-অসহায়ের ভূমিকায় অবতীর্ণ। অনেক দুঃখেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন,

"সুখের কথাতেই বাঙ্গালির অধিকার নাই। গোপীর দুঃখ, বিধাতা গোপীকে নারী করিয়াছেন কেন, আমাদের দুঃখ, বিধাতা আমাদের নারী করেন নাই কেন, তাহা হইলে এ মুখ দেখাইতে হইত না।" ॥ একটি গীত ॥

সমগ্র বাঙালিকে তিনি পৌরুষহীন ক্লীবরূপে আবিষ্কার করে যে দুঃখ পেয়েছেন, তার হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় তাঁর জানা ছিল না। কিন্তু আত্মোপলব্ধির অভাবটুকু তিনি মোচন করেছেন। সুশিক্ষিত বাঙালির কাছে বঙ্কিমচন্দ্র সময়োচিত আবেদন জানিয়েছিলেন।

'কমলাকান্তের পত্র' পর্যায়ের 'পলিটিক্স' প্রবন্ধে রাজনীতি জ্ঞানশূন্য বাঙ্গালীকে তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন,

"ভাই পলিটিক্‌স্‌ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ী আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্‌স্ নাই। "জয় রাধে কৃষ্ণ, ভিক্ষা দাও গো?" ইহাই তাহাদের পলিটিক্‌স্। তদ্‌ভিন্ন অন্য পলিটিক্‌স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

ক্ষোভ-দুঃখ ও আত্মসমালোচনাই এখানে প্রকট। বাঙ্গালীর তোষামোদ-প্রিয়তার তীব্রনিন্দা 'কমলাকান্তের দপ্তরে' অন্যত্রও আছে। কিন্তু রাজনীতির ক্ষেত্রে এই

নিন্দনীয় গুণটি যে কত কদর্যরূপেই প্রকটিত হতে পারে—'পলিটিকসে' বর্ণিত কুক্কুর জাতীয় পলিটিশিয়ানের আচরণের মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা করেছেন। "উলসি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দরের পলিটিশ্যন।"

'বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে বাঙ্গালীর চরিত্র ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন, "তোমার এ বঙ্গভূমে জন্মগ্রহণ করিয়া ঘ্যান ঘ্যান করিব না ত কি করিব ? বাঙ্গালী হইয়া কে ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়া ? কোন বাঙ্গালির ঘ্যানঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে। তোমাদের মধ্যে যিনি রাজা মহারাজা কি এমনি একটা কিছু মাথায় পাগড়ি হইলেন, তিনি গিয়া বেলভিডিয়রে ঘ্যান্ ঘ্যান্ আরম্ভ করিলেন। যিনি হইবেন উমেদ রাখেন, তিনি গিয়া রাত্রি দিবা রাজদ্বারে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করেন।···কেহ বা মনে করেন, ঘ্যান্‌ঘ্যানানির চোটে দেশোদ্ধার করিবেন সভাতলে ছেলেবুড়া জমা করিয়া ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করিতে থাকেন।"

এখানে বঙ্কিমচন্দ্র রাজামহারাজা, সাধারণ-অসাধারণ সকলকেই লক্ষ্য করে বাঙ্গালী জাতির চরিত্রগত দুর্বলতার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভীক-স্বদেশপ্রাণ বাঙ্গালি জাতির স্বপ্ন দেখেছিলেন বলেই সমগ্র জাতির চরিত্র সংশোধনের উপায়ও চিন্তা করেছেন। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' রচনার উদ্দেশ্য বিশ্লেষণ করলেও এই সত্যটিই প্রকট হয়ে ওঠে। আগাগোড়া হাস্যের আবরণে বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরাম গুড় নামক একটি বাঙ্গালীর জীবনকাহিনীই রচনা করেননি, তিনি একটি শ্রেণীর চরিত্রমাহাত্ম্য উদ্‌ঘাটিত করেছেন মাত্র। নবজাগরণের ফলাফল হিসেবে সভাসমিতি, এসোসিয়েসন গঠন করতে শিখেছি আমরা কিন্তু মুচিরাম সে সভার বক্তা হলে পুলকিত হওয়ার কোন হেতু নেই। বঙ্কিমচন্দ্র মুচিরামের জীবননাট্যের সফল দৃশ্যটির বর্ণনা করেছেন,

"মুচিরামও বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভায় একজন বক্তা হইয়া দাঁড়াইলেন। তিনি বকিতেন মাথা-মুণ্ডু, কিন্তু ছাপার বিজ্ঞাপনীতে যাহা বাহির হইত, সে আর একপ্রকার। মুচিরাম নিজে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেন না। যাহারা বুঝে তাহারা পড়িয়া নিন্দা করিত না। সুতরাং মুচিরাম ক্রমে একজন প্রসিদ্ধ বক্তা বলিয়া খ্যাতিলাভ করিতে লাগিলেন। যেখানে লোকে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, মুচিরাম তাহার কোন জায়গায় যাইতেই ছাড়িত না। গভর্নমেণ্ট হৌসে ও বেলবিডীরে গেলে বড়লোক বলিয়া গণ্য হয়, সুতরাং সে গভর্নমেণ্ট হৌসে ও বেলবিডীরে যাইত।"

কিন্তু পাঠক মুচিরামের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিতে শঙ্কিত না হয়ে পারে না। মুচিরাম সম্প্রদায়ের আধিপত্য বর্ণনা করে বঙ্কিমচন্দ্র বাংলাদেশের ভয়াবহ পরিস্থিতি সম্পর্কেই

দেশবাসীকে সচেতন করে দিতে চান। নিপুণ ব্যঙ্গশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র রঙ্গরস ও দেশচিন্তা একই আধারে স্থাপন করেছিলেন—এখানেই তাঁর বিশেষত্ব। 'কমলাকান্তের দপ্তরের' সঙ্গে "মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতের" রচনাগত সাদৃশ্যও আছে। নির্মল হাস্যরসের অফুরন্ত আয়োজন কমলাকান্তের দপ্তরের মত এ রচনাটিতেও সুলভ। কিন্তু হাস্যের অন্তরালে চিন্তার অবতারণা করেছিলেন বলেই রচনাগুলির বিশেষ মূল্য স্বীকৃত হবে। জাতীয় উত্থানের প্রারম্ভে বাঙ্গালী চরিত্রের সংশোধন কার্য-টুকুই বঙ্কিমচন্দ্র করেছিলেন। আত্মসুখ বিসর্জন ও স্বার্থত্যাগের মহৎ আদর্শ, সাম্যবাদের প্রচার সমগ্র বঙ্কিমসাহিত্যেই ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত সত্য—'কমলাকান্তের দপ্তরে' অভিনব রচনাবৈচিত্র্যে তা উজ্জ্বল হয়ে আছে।

'কমলাকান্ত' পর্যায়ের কোনো রচনাতেই শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তীব্র বিদ্বেষ ভাবের পরিচয় নেই। দেশসচেতন ও পরাধীনতাসচেতন লেখকের পক্ষে শাসকগোষ্ঠী সম্বন্ধে নীরবতা পালন যে সত্যিই সংযমের পরিচায়ক, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তর' পাঠকালে এ কথা বার বার মনে হয়। আত্মদোষ নির্ণয়েই বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত মগ্ন। কিন্তু পরিশিষ্টের 'কাকাতুয়া' প্রবন্ধটিতে ইংরেজ জাতির চরিত্র সমালোচনা করেছেন অত্যন্ত কৌশলে। অথচ রূপকের ঘনপর্দার আবরণ ভেদ করে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজবিদ্বেষ আবিষ্কার করা সত্যিই শক্ত ব্যাপার। কাকাতুয়ার জন্মকাহিনী শোনাবার জন্য তিনি হাস্যকর ঘটনা ও পরিস্থিতির যে বিবরণ দিয়েছেন—তাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য চাপা থাকেনি। কাকাতুয়া বলেছে,—"আমরা সাদা ডানা বিস্তার করিয়া সমুদ্র পার হইয়া এ দেশে ও দেশে যাইতে লাগিলাম। যেখানে উত্তম আহারের সম্ভাবনা দেখিলাম, সেই খানে বাসানির্মাণ করিতে আরম্ভ করিলাম। যে প্রতিবাদী হইল, তাহাকে মারিয়া ফেলিলাম, অথবা তাড়াইয়া দিলাম।"

এই পাখীটিকে বঙ্কিমচন্দ্র কোন একটি সাম্রাজ্যলোভী সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসেবেই অঙ্কন করেছেন—তাতে সন্দেহ নেই। এদেশীয় দ্বিপদবিশিষ্ট জন্তুকে অবজ্ঞা মিশ্রিত করুণাপ্রদর্শন করাই পাখীটির বৈশিষ্ট্য। বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা দিয়েছেন পাখীর জবানিতে,—

"আমার কাছে মাথা খুঁড়িয়া খুঁড়িয়া উহারা মাথা ফুলাইয়া ফেলিয়াছে। উহারাই প্রকৃত বুদ্ধিমান। দেখিতেছ না উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শান্তশিষ্ট স্বজাতীয়দিগকে মারিয়া ধরিয়া, তাড়াইয়া দিয়া আমার ডাঁড়ের নীচে দাঁড়াইয়া মাথা নাড়িয়া আমাকে কত সেলাম করিতেছে এবং আমার প্রসাদের সারাংশ সংগ্রহ করিয়া দুরক্ষিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বলদের দলে প্রবেশ করিয়া মোটা মাথা উন্নত করিয়া বেড়াইতেছে।...

······দেখ, আমি প্রকৃত পক্ষে কাহাকেও যত্ন কি অনুগ্রহ করি না। আমার সমস্ত যত্ন এবং অনুগ্রহ আমাতেই অর্পিত। তবে মোটা মাথাগুলো আমাকে খুব সেলাম করে এবং বিভীষণের স্থায় আপনাদের ঘরের সমস্ত কথা আমাকে বলিয়া দেয়, তাই উহাদিগকে দুধের উপর দুই একটা ছোলার খোসা দিয়া থাকি।”

উদ্ধৃত বক্তব্যের অন্তর্নিহিত সত্য বিশ্লেষণ করলে শাসক ইংরেজের উদ্দেশ্য ও পরাধীন বঙ্গবাসীর অবস্থাটি আবিষ্কৃত হবে। পরাধীনতা দুর্বল জাতির জীবনকে জড়ত্বপাশে বদ্ধ করে। তাছাড়া এক শ্রেণীর কৃপাভিক্ষু নিজের ও দেশের সর্বনাশ করেও শাসকগোষ্ঠীর মনোরঞ্জন করে বেঁচে থাকতে চায়। এই দলের সংখ্যাবৃদ্ধিতে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন। সামগ্রিকভাবে জাতির চেতনা যতদিন সুপ্ত থাকবে ততই এই শ্রেণীর সংখ্যাধিক্য ঘটতে থাকবে। বঙ্কিমচন্দ্র বিশ্বাসঘাতক ও শাসকসম্প্রদায়ের কৃপাপ্রার্থী এই সম্প্রদায় সম্পর্কে সচেতন করে তুলেছেন। কোনো সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাব খুব স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করেছেন,—

“যাঁহারা জয়চাঁদ বা মীরজাফরকে ভারতের পরাধীনতার কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন, তাঁহাদের মতবাদও বঙ্কিমচন্দ্র গ্রহণ করিতে পারেন নাই। তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াছিলেন—যে সমাজে বা রাষ্ট্রে প্রাণধারা অব্যাহত থাকে, সেখানে কখনও কৃতঘ্নতা বা বিশ্বাসঘাতকতা আত্মপ্রকাশ করে না কিন্তু জাতীয় জীবনের যখন চরম দুর্গতি উপস্থিত হয়, তখন সহস্র সহস্র জয়চাঁদ, মীরজাফর ও লালসিংহে দেশ ছাইয়া ফেলে।”

[বঙ্কিম দর্শনের দিগদর্শন—ত্রিপুরাশংকর সেনশাস্ত্রী। পৃঃ ১৬-১৭]

বাঙ্গালীর ভয়াবহ মানসিক অধঃপতনের চিত্ররচনাতে বঙ্কিমচন্দ্র সাফল্য অর্জন করেছিলেন। সাহিত্যস্রষ্টার হাতে যেটুকু ক্ষমতা আছে—তার সদ্ব্যবহার করেছিলেন তিনি। কিন্তু আত্মসন্তুষ্ট অলস বাঙ্গালীকে তিনি আত্মসচেতন হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন বলেই সমস্ত প্রচেষ্টার মধ্যেই স্বদেশপ্রেমিক ও স্বজাতিবৎসল বঙ্কিমচন্দ্রকে আবিষ্কার করি আমরা। এই পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র যত অকপট দেশপ্রেমের পরিচয় দিয়েছেন অন্য পর্বে তা নেই। ‘কমলাকান্ত’ পর্বের রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র পাঠকের মনের খুব কাছে এসেছেন, আন্তরিকতাই প্রবন্ধগুলোকে মর্মস্পর্শী করেছে,—সুতরাং আঘাত পেয়েও বাঙ্গালী ‘কমলাকান্ত’ পাঠের অনুরাগ প্রদর্শন করেছে।

বাংলা সাহিত্যের ব্যঙ্গাত্মক রচনাকার হিসেবে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কেই Patriot satirist বলে অভিনন্দন জানিয়ে ছিলেন পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যঙ্গাশ্রয়ী রচনার মূল প্রেরণা নিঃসন্দেহে স্বদেশপ্রেম, ইন্দ্রনাথের যে-কোন পাঠ করলেই যে-কোন সমালোচক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত এই সিদ্ধান্তেই

আসবেন। ইন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টির মূলে স্বদেশচিন্তা মুখ্য হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তির্য্যক। গদ্যে কিংবা কবিতায়, প্রবন্ধে কিংবা উপন্যাসের ছাঁচে আপন আবেগে তিনি যা লেখেন—তাই একটা তীব্র বিদ্রূপাত্মক রচনা হয়ে ওঠে। বাংলা সাহিত্যে ইন্দ্রনাথের আবির্ভাবের অনেক আগেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন, 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকাও সমগ্র বাঙ্গালীর অন্তরে একটি স্থায়ী আসন লাভ করেছে। ইন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের ধারাবাহিক ব্যঙ্গ রচনাগুলির আদর্শই সম্ভবতঃ গ্রহণ করেছিলেন। 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' রচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র শুষ্ক ও গম্ভীর সাহিত্যখাতে হাস্যরসের অজস্র প্রবাহ সৃষ্টি করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে এই স্বাদ অভিনব ও অনাস্বাদিতপূর্ব। আলালী কিংবা হুতোমী ব্যঙ্গের সঙ্গে নিশ্চয়ই বঙ্কিমীব্যঙ্গের লক্ষণীয় পার্থক্য রয়েছে আর সেটুকুই বাংলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে নিপুণ হাস্যরসস্রষ্টা হলেও, তিনি খুব বেশীদিন এ জাতীয় রচনায় মনোনিবেশ করেননি। 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' তাঁর এ পর্বের শেষ রচনা। বঙ্কিমপ্রবর্তিত হাস্যরসাশ্রিত ও স্বদেশপ্রেমাত্মক এই রচনা পরবর্তীকালে যে কয়েকজনের অনুশীলনে পরিপুষ্টি লাভ করেছিল ইন্দ্রনাথ তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের সুতীব্র ও গভীর স্বদেশভাবনা ব্যঙ্গাত্মক রচনায় যতো উচ্ছ্বসিত হয়েছিল অন্য রচনায় তা হয়নি। ইন্দ্রনাথও গভীর স্বদেশচিন্তা ব্যঙ্গাকারে ব্যক্ত করেন। পরাধীন লেখকের আত্মগোপনের সহজ উপায় হিসেবেই ইন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। ইন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে তাঁর গদ্য ও পদ্য উভয় ধরণের ব্যঙ্গাত্মক রচনায়। ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গে আঘাত দানের উদ্দেশ্য সর্বত্রই অত্যন্ত প্রকট। ইন্দ্রনাথ সাহিত্যের আদর্শ লংঘন করেও অনেক সময় তীব্র আঘাত হেনেছেন এক একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের উপরে। ইন্দ্রনাথের এই আঘাত-দানের উদ্দেশ্য যেখানে সমাজরক্ষা কিংবা ঐতিহ্যরক্ষা সেখানেই তিনি সার্থক স্রষ্টা। ব্যঙ্গ রচনাকারদের এ প্রবণতা থাকবেই। এ প্রসঙ্গে কোন সমালোচক বলেছেন,

The satirist claims, with much justification, to be a true conservative. Usually (but not always—there are significant exceptions) he operates within the established framework of society, accepting its norms, appealing to reason (or to what his society accepts as rational) as the standard against which to judge the folly he sees. He is the preserver of tradition, the true tradition from which there has been grievious falling away.[১]

১। Robert C. Elliott, The Power of Satire, Princeton, 1960, P-266.

ইন্দ্রনাথ ঐতিহ্যসচেতন ও সনাতন হিন্দুধর্মাশ্রয়ী বলে তাঁর আঘাত সেযুগের সংস্কারপন্থী ব্রাহ্মদের উপরেই উদ্যত হয়েছিল। ইন্দ্রনাথের এ জাতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে সমালোচকের আপত্তি থাকা স্বাভাবিক কিন্তু স্বদেশপ্রেমী ইন্দ্রনাথ ভণ্ড দেশহিতৈষী কিংবা দুর্বল বাঙ্গালীকে তীব্র আঘাত হেনে পরোক্ষভাবে তাঁদের সচেতনতা ফিরিয়ে এনেছেন, সেখানে তিনি প্রশংসা পাবেনই। স্বদেশপ্রেমী ইন্দ্রনাথের পরিচয় 'ভারতউদ্ধার' কাব্য, পাঁচু ঠাকুর প্রবন্ধ গ্রন্থাবলী ও ক্ষুদিরাম [গালগল্প] ইত্যাদি গ্রন্থে বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর সমগ্র রচনাসম্ভারের দু'একটি গ্রন্থ ছাড়া সবকটিতেই দেশচিন্তা মুখ্যস্থান লাভ করেছে। ইন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের পরিচয় দান কালে পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

"তিনি খাঁটি বাঙ্গালী হইয়া থাকিতে পারিয়াছিলেন, খাঁটি বাঙ্গালীর গৌড়ীয় ভাষায় তিনি মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন। ······দেশ ও কালের প্রভাবকে অতিক্রম করিয়া, অতীতের ভঙ্গীকে এমন সাগ্রহে জড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে তাঁহার ন্যায় ইংরাজিনবীশ কোনও বাঙ্গালীকেই আমরা দেখি নাই। ···বাঙ্গালীর দুঃখে, বাংলার অধঃপতনে, তিনি অহঃরহ কাতরতা প্রকাশ করিতেন। তাই আমি তাঁহাকে 'বাংলার ইন্দ্রনাথ' আখ্যা দিয়াছি।" [পাঁচকড়ি রচনাবলী]

'বাঙ্গালীর ইন্দ্রনাথ' বলে যাঁকে অভিনন্দিত করা হয়েছে,—তিনি তাঁর সমগ্র সাহিত্যকর্মেই বাঙ্গালীচিন্তা পোষণ করেছিলেন। ইন্দ্রনাথের দেশচিন্তায় জাতি-হিতৈষণাই মুখ্য, কিন্তু সে যুগের স্বদেশী সম্প্রদায়ের আদর্শবিহীন ভাবোচ্ছ্বাসকে কেন্দ্র করে ইন্দ্রনাথই প্রথম ব্যঙ্গকাব্য রচনা করেন। ইন্দ্রনাথ স্বদেশী জোয়ারের আবর্তে পড়েও দিশাহারা হননি, এটাই আশ্চর্য। একনজরে তাকালে দেখা যাবে, ১৮৭২ সালের মধ্যেই জাতীয় নাট্যশালা, হিন্দুমেলা 'বঙ্গদর্শন' ও বঙ্কিমচন্দ্রের 'মৃণালিনী' একইসঙ্গে সমগ্র দেশবাসীর চিত্তে একটি সুগভীর আলোড়ন সৃজন করেছিল। ইন্দ্রনাথ এর দ্বারা আদর্শায়িত হয়েছিলেন সন্দেহ নেই—তা যদি না হোত সমগ্র সাহিত্যকর্মেই দেশচিন্তার এমন উচ্ছ্বাস নিশ্চয়ই প্রকাশ পেত না। কিন্তু ইন্দ্রনাথের প্রকাশভঙ্গি ছিল স্বতন্ত্র—গতানুগতিকতার ব্যতিক্রম। স্বদেশপ্রেমিক ছিলেন বলেই একটি সুপরিকল্পিত আদর্শের দ্বারা সমগ্র জাতির দেশসাধনা পরিচালিত হোক এ ছিল তাঁর আন্তরিক কামনা। কিন্তু কিভাবে তা করা সম্ভব সেটি ছিল তাঁর চিন্তার বাইরে। কিন্তু সাহিত্যিক হিসেবে এ বিষয়ে ইন্দ্রনাথ স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছিলেন ব্যঙ্গসাহিত্য রচনা করে। 'ভারত উদ্ধার' কাব্যের বিষয়বস্তু আলোচনাকালে ইন্দ্রনাথের গভীর স্বদেশবোধ ও তার লঘুপ্রকাশভঙ্গি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ব্যঙ্গাত্মক দেশপ্রেমের কাব্য রচনা সম্পর্কে ইন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"ভারত উদ্ধার" বাজারে বাহির হইল, অমনি দেবগণ মুষলধারে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, মলয়জ গন্ধে দিগ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল, পক্ষাপক্ষ নিবৃত্ত হইয়া, দিবারাত্র কেবল কৌমুদী কেলি হইতে লাগিল,—আমার শুভ্র যশোরাশির ভয়ে ধরণী ভারাক্রান্তা হইয়া যেন ত্রাহি ত্রাহি করিতে লাগিলেন। ধরিত্রীকে অভয় দিলাম, ভয় নাই, আর বোধ হয়, আমি লেখনী চালাইব না।"

ইন্দ্রনাথের 'ভারত উদ্ধার' কাব্যের বিষয়বস্তু সাময়িক দেশোচ্ছ্বাসের তীব্র সমালোচনা মাত্র। ভারত উদ্ধারব্রত পালনের যোগ্যতা অর্জন না করেই ভণ্ড স্বদেশপ্রেমিক দীর্ঘ বক্তৃতা দেবার আগ্রহে অধীর হন। ইন্দ্রনাথ বাকপটু বাঙ্গালীকেই আঘাত করেছিলেন, যথার্থ দেশপ্রেমিক সম্বন্ধে তাঁর শ্রদ্ধার অভাব ছিল না। নিছক বক্তৃতায় সত্যকারের কোন ফললাভ হতে পারে না, ভারত উদ্ধার কাব্যের মূল বক্তব্য এটুকু। অথচ দেশাত্মবোধ সমগ্র জাতির চেতনাকে আলোকিত করেছে—এত সত্য! ইন্দ্রনাথও বঙ্কিমচন্দ্রের মত বাঙ্গালীর বাহুবলের অভাব সম্পর্কে চিন্তা করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্গালীর সামনে অতীতের গৌরব কাহিনী ও বাঙ্গালী বীরের যে চিত্র বর্ণনা করেছিলেন, সেখানে বাঙ্গালীকে সচেতন করে তোলার বাসনাটিই প্রবল ছিল। ইন্দ্রনাথের সে ক্ষমতা ছিল না। তিনি মেরুদণ্ডহীন নব্যবাঙ্গালীযুবকের বাক্যবলের শক্তিটিই ব্যঙ্গাকারে পরিবেশন করেছিলেন। ইন্দ্রনাথ ব্যঙ্গশিল্পী, যেখানে তিনি চারিত্রিক দুর্বলতা প্রত্যক্ষ করেন সেখানেই তাঁর রচনা স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে ওঠে। ইন্দ্রনাথের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল সে যুগের দুর্বল বাঙ্গালী যুবকসম্প্রদায়। বঙ্কিমচন্দ্র প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিতে 'বাঙ্গালীর বাহুবল' প্রবন্ধে যে আলোচনা করেছেন, ইন্দ্রনাথের বক্তব্যের সঙ্গে তার যোগাযোগ নেই। বাঙ্গালীর চরিত্রে নবজাগরণের উন্মাদনা লক্ষ্য করে বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন,—

"উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল। যে জাতির উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায় আছে, তাহাদের শারীরিক বল যেমন হউক না কেন, তাহাদের বাহুবল আছে। এই চারিটি বাঙ্গালীর কোন কালে নাই, এজন্য বাঙ্গালীর বাহুবল নাই। কিন্তু সামাজিক গতির বলে এ চারিটি বাঙ্গালী চরিত্রে সমবেত হওয়ার সম্ভাবনা।"

ইন্দ্রনাথও বাঙ্গালীর চরিত্রে এই সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন,—কিন্তু বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁকে নিরাশ করেছিল। অজস্র বাক্যশক্তি ও কার্যক্ষেত্রে সামান্যতম বাহুবলের পরিচয় দিতে অক্ষম বাঙ্গালীকে তাই ইন্দ্রনাথ ব্যঙ্গের পাত্র করে তুলেছেন। কিন্তু ইন্দ্রনাথের এই আক্রমণের অন্তর্নিহিত প্রেরণা যে অবিমিশ্র স্বদেশপ্রেম তাতে

আমরা নিঃসন্দেহ। বিকৃত বাঙ্গালী চরিত্র যিনি প্রকাশ্যে কীর্তন করেন তাঁর মনে আদর্শ বাঙ্গালীর স্বপ্নটিই বর্তমান।

শ্রীরামদাস শর্মা ছদ্মনামে ইন্দ্রনাথ 'ভারত উদ্ধার' রচনা করেন। ১২৮৪ খৃঃ মাঘ মাসে "ভারতীতে" "ভারত উদ্ধারের" সমালোচনায় লিখিত হয়েছিল,

"বাস্তবিক এরূপ সরস গ্রন্থ আমরা অনেকদিন পাঠ করি নাই এবং বোধ হয় এরূপ বিদ্রূপাত্মক কাব্য (satire) বঙ্গভাষায় আর নাই। ভারতের স্বাধীনতাপ্রিয় বঙ্গ-যুবক কর্তৃক কিরূপে "পাষণ্ড ইংরাজ" 'ঝঁটায়িত' নিরস্ত ও পরাস্ত হইবে তাহাই গ্রন্থকার ভবিষ্যদ্বক্তারূপে বর্ণনা করিয়াছেন।"

সুতরাং 'ভারত উদ্ধার কাব্যের' সমালোচনাতেও গ্রন্থকারের আদর্শের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 'ভারত উদ্ধারের' সমালোচনাতে লেখকের আদর্শের প্রশংসা অন্যত্রও মেলে। 'সমালোচনার' লেখক যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

যাহাদিগের অন্তরে সেই স্বদেশানুরাগের ভাব জলদক্ষরে লিখিত হইয়াছে, তাঁহারা এরূপ বিদ্রূপোক্তিতে ভগ্নহৃদয় না হইয়া বরং দ্বিগুণতর উৎসাহিত হইবেন। কারণ এ বিদ্রূপোক্তির উদ্দেশ্য স্বদেশানুরাগের মূলে কুঠারাঘাত করা নহে, ইহাকে উত্তেজিত করা মাত্র। যে সকল স্বদেশানুরাগাভিমানী স্বদেশানুরাগকে শুদ্ধ বক্তৃতায় আবদ্ধ রাখিতে চান, যে সকল তরলমতি যুবক ভারতোদ্ধার ব্রতের গুরুত্ব ও দায়িত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া হাস্যাস্পদ কল্পনাজালে আবদ্ধ হন, এই বিদ্রূপবান তাঁহাদিগের প্রতিই নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।"

ইন্দ্রনাথের 'ভারত উদ্ধার কাব্যের' অন্য একটি ব্যাখ্যা করেছেন স্বয়ং লেখক। তিনি বলেছেন গ্রন্থটি ভবিষ্যৎ ইতিহাসের এক পৃষ্ঠা। ৫টি সর্গে বিভক্ত এই গ্রন্থটিতে অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখক কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন। বিপিন নামক কোন ইংরাজী শিক্ষিত যুবকের ভারতোদ্ধার ব্রতের বিস্তারিত কাহিনী স্থান পেয়েছে এতে। 'আর্য-কার্যকরী সভার' উদ্যোক্তা বিপিন নিরন্তর ভারতচিন্তায় মগ্ন। ভারতের স্বাধীনতা লাভের বাসনায় চঞ্চল হয়ে অবশেষে সে নিজেই কিছু গঠনাত্মক পরিকল্পনা করেছে, তারই বিস্তারিত বর্ণনা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে।

প্রথম সর্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্রষ্টা মধুসূদনের ভঙ্গিমাতে লেখক বন্দনা করেছেন সরস্বতী দেবীকে,

গাও মাতঃ সুররমে, বাণী বিধায়িনী,
কমল আসনে বসি, বীণা করি করে,
কেমনে ইংরেজ-অরি দুর্দান্ত বাঙ্গালী
ত্যাজিয়া বিলাস ভোগ, চাকুরীর মায়া,

টানা পাখা, বাঁধা হুঁকা, তাকিয়ায় ঠেস
উৎসৃজি সে মহাব্রতে, সাপটি গুঁজিয়া
কাচার অন্তরে নিজ লম্বা ফুল কোঁচা
ভারতের নির্ব্বাপিত গৌরব-প্রদীপ
তৈলহীন, সলতেহীন, আভাহীন এবে—

আলস্য ও আরামের সুখশয্যায় শুয়ে চাকুরীপ্রাণ বাঙ্গালীর দেশচিন্তার স্বরূপ কি হতে পারে সহজেই তা অনুমেয়। ইন্দ্রনাথ দুর্বল ও আত্মসুখপরায়ণ গৃহস্থ বাঙ্গালীর স্বদেশপ্রেমের চিত্ররচনা করেছেন। গৃহসুখলালিত এই বাঙ্গালীকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করেছিলেন বলে তারাই ভারত উদ্ধারের বিশিষ্ট চরিত্র রূপে কল্পিত।

এ কাব্যের নায়ক বিপিনের দেশোদ্ধারের হাস্যকর পরিকল্পনা ও স্বার্থচিন্তার নিদর্শন দেখিয়েছেন ইন্দ্রনাথ,

আমিত মরিব আগে, ক্রমে বংশ লোপ ;
এইরূপে ক্রমে ক্রমে সব যদি যায়,
থাকিলেও বঙ্গ তার নাম কে করিবে ?

ভারত উদ্ধারের নায়ক বিপিনের চারিত্রিক ও মানসিক দৃঢ়তার চিত্রটি হাস্য-রসিকের লেখনীতে সুঅঙ্কিত হয়েছে। সে যুগের সাহিত্যে দেশোদ্ধারের সংকল্প উচ্চারিত হয়েছে বারবার, ইন্দ্রনাথ এর তাৎপর্য নির্ণয়ের চেষ্টা না করে ব্যঙ্গ করেছেন এ নিয়ে। বিপিন ভারতউদ্ধারের কোন উপায় না দেখে শেষ পর্যন্ত কাব্যালোচনায় স্বদেশপ্রেম জাগানোর ব্রত নিয়েছে,

ভাবি নিরুপায়, আসি সাহিত্যের হাটে,
বিবিধ কল্পনা খেলা করিতে লাগিনু,
সাজাইনু নানামতে দ্রব্য অপরূপ,
ঘুমন্ত ভারতে ডাকি লক্ষ লম্বোধনে
জাগাইতে গেনু—মা! সকলেই জেগে,
সকলেই ডাকিতেছে—ভারত! ভারত!
সকলে বিক্রেতা হাটে, ক্রেতা কেহ নাই—
ভারতে ভারত-কথা বিকায় না আর।

এ অংশটিতে ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গ সে যুগের স্বদেশী সাহিত্যকে লক্ষ্য করে বর্ষিত হয়েছে। 'ভারতকথার' অতি-আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে ইন্দ্রনাথ হতাশ

হয়েছিলেন, সেই সম্পর্কে আরও তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করেছেন ইন্দ্রনাথ,

বঙ্গের সুপুত্র যত পত্র-সম্পাদক
কবি আর নাট্যকার, যেদিন লেখনী
ধরিয়াছে, সেইদিন হইতে তটস্থ
কম্পমান—কলেবর ইংরাজের কুল।
ভারত, ধরিলে অস্ত্র এ হেন বাঙ্গালী,
কি হইবে কাপুরুষ ইংরেজের গতি!

এ আঘাত প্রত্যক্ষভাবে সমগ্র স্বদেশী সাহিত্যিকের প্রতি নিক্ষিপ্ত হয়েছে। কিন্তু ইন্দ্রনাথ নিজেও যে এই অভিযোগে যুক্ত হয়ে পড়েছেন তা তিনি সাময়িকভাবে বিস্মৃত। পরাধীনতার যে চেতনা ইন্দ্রনাথের মনে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল সেটিও পরোক্ষভাবে স্বদেশী সাহিত্যপাঠেরই ফলাফল। ইন্দ্রনাথ বাঙ্গালীর ভীরুতার নিন্দা করতে চান কিন্তু যাঁরা ভীরুতার বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করেছিলেন—সেই লেখকগোষ্ঠী তাঁর আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারে না। পরাধীন ভারতে স্বাধীনচেতনা জাগানোর এই একটি মাত্র পথই উন্মুক্ত ছিল, ইন্দ্রনাথ তা বিস্মৃত হয়েছিলেন। তবে 'ভারত উদ্ধারের' যে পরিকল্পনার চিত্র এখানে তুলে ধরেছেন লেখক তা আগাগোড়াই হাস্যকর। 'আর্য-কার্যকরী' সভার সদস্যবৃন্দ দেশোদ্ধারের মহান উদ্দেশ্যের উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলেন বটে কিন্তু স্বার্থ ব্যাহত হলেই তাঁদের সমস্ত শুভচেতনা নির্বাপিত হয়। এ সভার কোন এক সদস্য আক্ষেপ করেছে,

তুমিও হবে না রাজা, আমিও হব না,
আমাদের ইহজন্ম প্রজাভাবে যাবে
তবে কেন নিজ পায়ে মারিব কুঠার?
রাজার কল্যাণ কেন না চিন্তিব সদা?

এখানে সাধারণ লোকের দেশচিন্তা ও স্বার্থচিন্তার দ্বন্দ্ব প্রদর্শন করেছেন ইন্দ্রনাথ। 'আনন্দমঠে' মহান আদর্শের চিত্র অঙ্কন করে বঙ্কিমচন্দ্র প্রাণবিসর্জনকেও তুচ্ছ বলে মনে করেছিলেন,—"প্রাণ তুচ্ছ, সকলেই ত্যাগ করিতে পারে।" সেখানে বঙ্কিম আদর্শের কথাই প্রচার করেছিলেন,—সে আদর্শের সঙ্গে বাস্তবের যোগাযোগ ছিল অতি ক্ষীণ। ইন্দ্রনাথ অতি সাধারণ লোকের চিন্তাধারার কথাই অকপটে ব্যক্ত করেছেন। স্বার্থচিন্তায় পীড়িত এই বাঙ্গালীর চরিত্র শোধনের জন্য ইন্দ্রনাথ যে ব্যঙ্গের আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, তাতে পরবর্তীকালে কিছু সুফল লাভ হয়েছিল, নিঃসন্দেহে এ কথা বলা যায়।

"ভারত উদ্ধারের" নায়ক বিপিন ও তার বন্ধু কামিনীকুমার শেষ পর্যন্ত ভারত উদ্ধারের সুপরিকল্পনা করেছে,—

পারি যদি রণে
পরাভবি দেশবৈরী মৌরুসী দুশমন
ইংরেজ-কর্বুর কুলে, যশো-বৈজয়ন্তী
উড়াইতে ফরফরি ভারত আকাশে,
তবে সে সফল জন্ম।...
উচ্চে ডাকি নিদ্রাগত ভারত সন্তানে
জাগাও হে বঙ্গবাসি, জাগুক সকলে,
উঠ সবে মুখ ধোও, পর নিজ বেশ,
ভারত উদ্ধারে মন করহ নিবেশ।

দেশবৈরী বিতাড়নের জন্য বিপিন ও সম্প্রদায়ের বিশাল পরিকল্পনার চিত্রটিতে যথার্থ হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। সুয়েজখালের জলে ছাতু ফেলে জাহাজ চলাচলের পথরোধ করার পরিকল্পনাও এর অন্তর্গত ছিল। অবশেষে চিৎপুরের খাল থেকে ফোর্ট উইলিয়ম পর্যন্ত মস্ত সুড়ঙ্গের মুখে প্রচুর লঙ্কা সংগ্রহ করে লঙ্কার স্তূপে পটকার সলতে লাগিয়ে দেওয়া হলো। বাঙ্গালী বীরেরা বঁটি হস্তে অগ্রসর হল, কেউ আবার বালিগোলা জল পিচকিরি করে চোখে মুখে ছিটিয়ে দিয়ে ইংরাজবিতাড়নের চেষ্টা করে। অবশেষে তারা,—

কাসাইল শত্রুদলে, ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ ফ্যাঁচে
হাঁচাইল ভয়ঙ্কর, কাতরিল সবে।

ভারতউদ্ধার পর্ব শেষ হল।

স্বাধীন বাংলা এবে, স্বাধীন ভারত,
ভারতের জয় শব্দ উঠিল চৌদিকে,
বাঙ্গালী ভারত-প্রাণ হইল বিখ্যাত,
ভারত উদ্ধার যবে হৈল হেন মতে।

এই ব্যঙ্গকাব্যে ইন্দ্রনাথের চূড়ান্তশক্তি প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। ভারত উদ্ধারের অবাস্তব কল্পনা নিয়ে রঙ্গরস সৃষ্টি করার মধ্যেও লেখকের দেশপ্রেমেরই পরিচয় পাই আমরা। ভারতউদ্ধারের হাস্যকর পরিকল্পনার চিত্র দেখে বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে কেউ হয়ত সচেতন হবেন, এ আশা লেখকের ছিল। ইন্দ্রনাথের প্রবন্ধরচনাতেও হাস্যরসের অভ্যন্তরে তাঁর সুগভীর দেশপ্রেমের পরিচয়

পাওয়া যায়। পরাধীন ভারতবাসীর মনে কর্মমুখর উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলাই ইন্দ্রনাথের বাসনা ছিল।

ইন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম সম্পর্কিত ধারণার পরিচয় পেতে হলে 'বঙ্গবাসীতে' [২রা আষাঢ়, ১৩১৩ সাল] প্রকাশিত 'স্বদেশী' শীর্ষক প্রবন্ধটির সাহায্য নেওয়া দরকার। এখানেও ইন্দ্রনাথের ধারণাটি সমালোচনাত্মক আলোচনার মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তথাকথিত স্বদেশীদের ইন্দ্রনাথ নানা দোষে অভিযুক্ত করেছেন। যথার্থ স্বদেশপ্রেম ভারতের জলবায়ু মাটির সঙ্গে একীভূত হওয়া দরকার—এ ছিল তাঁর অভিমত। ইন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে সে যুগের স্বদেশীয়ানায় বিদেশী প্রভাব অত্যন্ত প্রকট। এই বিদেশীয়ানার তীব্র সমালোচনা করে ইন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' সঙ্গীতেরও সমালোচনা করেছেন। অবশ্য এ জাতীয় সমালোচনায় ইন্দ্রনাথের নির্ভেজাল গোঁড়ামিই প্রকাশ পেয়েছে তাও প্রসঙ্গত স্বীকার করতে হবে। ইন্দ্রনাথ বলেছেন,—

"উপস্থিত স্বদেশী আসল স্বদেশী নহে, ইহা নকল স্বদেশী, ইহা প্রকৃত স্বদেশী নহে, ইহা বিকৃত বিদেশী। তাহাই, যদি না হইবে, তবে জয়োচ্চারণের এত বাক্য থাকিতে, আমাদের সহস্র সহস্র মন্ত্র থাকিতে বন্দেমাতরং বলিয়া গগন ফাটাইবার চেষ্টা করিতে হইবে কেন? 'জয় জনার্দন', 'জয় জগদম্বা', 'জয় ভবানী' ইত্যাদি ধর্মসূচক জয়ধ্বনি কাহারও মনে ধরে না কেন? উপন্যাসের বন্দেমাতরং এত ভাল লাগে কেন?"

এই সমালোচনার আলোকে ইন্দ্রনাথের দেশচর্চার স্বরূপ নির্ণীত হতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতের মাধ্যমে যে ভাবান্দোলন সৃজন করেছিলেন ইন্দ্রনাথ তার প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করতে পারেননি। ধর্মচেতনাকে বাদ দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র দেশচেতনাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাননি, দেশচেতনার মধ্যেই ধর্মচেতনা সঞ্চার করেছিলেন। ইন্দ্রনাথ শুধু রক্ষণশীল সমালোচকমাত্র, তাঁর দেশচিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রের গভীরতা নেই।

তবে ইন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তায় আন্তরিকতার অভাব ছিল না। তিনি ব্যাপক কোনো পরিকল্পনা করতে পারেননি কিন্তু আপন অন্তরের সীমিত দেশপ্রেমে মগ্ন ছিলেন। এ দেশপ্রেমের মধ্যে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার স্থান নেই কিন্তু বর্তমানের ত্রুটিটুকু রোধ করার মত ক্ষমতা আছে। ইন্দ্রনাথ এ প্রবন্ধেই বলেছেন,—

"আমার যদি ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে আমি অন্যভাবে স্বদেশী চালাইতাম।"

কিন্তু এই 'অন্যভাব'-টির স্বরূপ নির্ণয় করা কঠিন কারণ তাঁর সমগ্র রচনার কোথাও একটি বিশিষ্ট দেশপ্রেমের পরিকল্পনা নেই। অথচ দেশের প্রতি অগাধপ্রেম তাঁর রচনার মূল্য বাড়িয়েছে নিঃসন্দেহে। তিনি যে স্বদেশীভাব নিবন্ধ দেশপ্রেমের কথা বলেছেন —তারও প্রকৃত অর্থ নির্ণয় করতে পারেননি, তবু সমালোচনা করেছেন তীব্র ভাবে।

"আমার মনে হয় যে, উপস্থিত স্বদেশীটি 'পেট্রিয়টিজমের' নকল। এ স্বদেশীর ধাতুটুকু বিদেশী। কিন্তু কেমিকেল সোনায় সত্যিকারের কাজ হয় কি? যিনি কেমিকেল পরিয়া বাহার দেন, তিনি মনে মনে কখনই ভুলিতে পারেন না যে, আমার কাছে খাঁটি মাল নাই।...আমাদের স্বধর্ম ছাড়িয়া 'স্বদেশী' হওয়া আর খাঁটি সোনা ফেলিয়া কেমিকেল কেনা, একই কথা।"

কিন্তু 'পেট্রিয়টিজম' যে বিদেশী ভাবেরই অনুভব—যা আমাদের চিত্তে একটি স্থায়ী ভাবে পরিণত হয়েছিল একথাটি ইন্দ্রনাথ কোথাও বলেননি। বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশপ্রীতি প্রবন্ধে বিলাতি patriotism-এর সমালোচনা করে আমাদের দেশাত্মবোধের স্বরূপ নির্ণয় করেছিলেন, ইন্দ্রনাথ সে বিষয়েও নীরব। কিন্তু স্বদেশপ্রেমে বিদেশীভাবের সমালোচনায় তিনি অকুণ্ঠ। একজাতের স্বদেশী আন্তরিকতাবিহীন দেশসেবা করে আত্মপ্রচার চালাচ্ছেন। ইন্দ্রনাথ তাদের প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন,—

"স্বদেশকে ইহারা কোনও অংশেই বড় বলিয়া মনে করেন না, বরং ইহারা মনে করেন যে, এদেশ সর্বাংশেই দীনহীন কাঙ্গাল এবং কৃপারই পাত্র; আমাদের দেশ বলিয়া এ দেশকে আমরা কৃপা করিব, কৃপা করিয়া দেশটাকে স্বর্গে তুলিয়া দিব, আমাদের কীর্তিতে এদেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে, দেশের মাঝে এদেশ মুখ তুলিয়া চাহিতে পারিবে, চাহিয়া অনন্তকাল পর্যন্ত আমাদিগকে ধন্ত ধন্য করিতে থাকিবে। বিদেশের উপরই ইহাদের ভক্তি ষোল আনা, এই স্বদেশকে বিদেশ করিয়া তুলিতে পারিলেই বুঝি, ইহারা কৃতকৃতার্থ হইবেন।"

ইন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তায় এই জাতীয় সমালোচনার আধিক্যই চোখে পড়ে। স্বদেশপ্রেমের যে বিকার সেযুগের সাধারণ বাঙ্গালীর চরিত্রে দেখা গেছে ইন্দ্রনাথ তাঁরই সমালোচনা করেছেন। অনেক বড় ভাবাদর্শ প্রচার করার যৌক্তিকতা আছে নিশ্চয়ই—কিন্তু বিকৃতবুদ্ধি বাঙ্গালীকে সেই আদর্শের পথে পরিচালনার জন্য এ জাতীয় সমালোচনারও প্রয়োজন রয়েছে। ইন্দ্রনাথ সমগ্র জাতির অধঃপতনের জন্যই বেদনাবোধ করেছিলেন, এ জাতীয় সমালোচনার মূলে লেখকের সেই মনোভাবের পরিচয় পেয়েছি।

'ক্ষুদিরাম' নামক ক্ষুদ্র গালগল্পজাতীয় রচনার শেষাংশে ইন্দ্রনাথের সমালোচনার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যায়। নিবারণ নামে কোন বঙ্গযুবকের দৃষ্টিতে সে যুগের দেশপ্রেমের সমালোচনাটি এই,

"যতদিন বামুন ঠাকুর আছেন, ততদিন পলিত, গলিত, পরপদদলিত ভারতভূমির আশা-ভরসা কিছুই নাই; আশা যাহা আছে তাহা নিবারণকে লইয়া। নিবারণ

জানে যে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। কেননা ভারতবর্ষের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই ইংরেজী শিখিতে পারে নাই, সকল লোকেরই একটি একটি বড় চাকরি নাই, সকলে সভা করিতে পারে না, বক্তৃতা করিতে পারে না, প্রবন্ধ লিখিতে পারে না, আজিও অনেকে ধুতি ব্যবহার করে, খাদ্যাখাদ্যের বিচার করে, হিন্দু মুসলমানে প্রভেদ দেখে, লঘুগুরু জ্ঞান করে। নিবারণ ইহাও জানে যে, ইংরাজের অধীন বলিয়াই ভারতবর্ষের এই দুর্গতি। সর্বাপেক্ষা গুরুতর কথা নিবারণ জানে যে, উত্তম চোখা চোখা গুটিকতক প্রবন্ধ যদি সংবাদপত্রে বাহির হয়, তাহা হইলেই ইংরেজ যে সাতহাজার ক্রোশ অন্তর হইতে আসিয়া এদেশে আধিপত্য করিতেছে, সেই দিনই সেই সাতহাজার ক্রোশ অন্তরে ইংরেজকে পলাইতে হয়।"

এখানে দেখি ইন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের অনুভূতিটি যতই আন্তরিক হোক না কেন, সেযুগের স্বদেশীসাহিত্যের প্রতি কটাক্ষপাত না করে তিনি পারেননি। ইন্দ্রনাথ অবশ্য জানতেন যে এই স্বদেশাত্মক রচনাবলীই পরবর্তীকালে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্মদান করেছে। পরাধীন জাতির বাহুবল প্রদর্শনের সুযোগ নেই,—বাক্যবলই তার একমাত্র শক্তি। ইন্দ্রনাথও স্বদেশীসাহিত্যের রচয়িতা, কিন্তু স্বদেশীসাহিত্যের প্রতি তাঁর বিরূপতার কারণ ছিল। সেযুগের অল্প শক্তিমান লেখকও বাহবা পাবার আশায় দুচার লাইন স্বদেশী সাহিত্য রচনার লোভ সংবরণ করতে পারেননি। কিন্তু উৎকৃষ্ট স্বদেশপ্রেমাত্মক রচনার শক্তি সম্পর্কে ইন্দ্রনাথ নিশ্চয়ই সচেতন ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধটিতে এ বিষয়ে মূল্যবান আলোচনা করেছেন,

"বস্তুতঃ বাহুবল অপেক্ষা বাক্যবল সর্বাংশে শ্রেষ্ঠ। এ পর্যন্ত বাহুবলে পৃথিবীর কেবল অবনতিই সাধন করিয়াছে—যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। সভ্যতার যাহা কিছু উন্নতি ঘটিয়াছে তাহা বাক্যবলে। সমাজনীতি, রাজনীতি, ধর্মনীতি, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প যাহারই উন্নতি ঘটিয়াছে, তাহা বাক্যবলে। যিনি বক্তা, যিনি কবি, যিনি লেখক,—দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, নীতিবেত্তা, ধর্মবেত্তা, সকলেই বাক্যবলে বলী।"

ইন্দ্রনাথও স্বদেশী সাহিত্য রচনা করে পরোক্ষভাবে স্বদেশচিন্তাই প্রচার করেছিলেন। 'ক্ষুদিরাম' নামক গালগল্প রচনা করতে বসেও দেশচিন্তা বিস্মৃত হওয়া ইন্দ্রনাথের পক্ষে সম্ভব হয়নি। তাঁর সমস্ত রচনাই দেশচিন্তায় আকীর্ণ। কোন না কোন ভাবে সমাজের দুর্নীতিকে আঘাত করার প্রবণতাটিই স্বদেশপ্রেমিকের। তবে প্রগতিমাত্রকেই যিনি সমালোচনা করেন, তাঁর অনুদার দৃষ্টিভঙ্গিটিও উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মমতের প্রতি বিদ্বেষপোষণ এবং তীব্রভাবে ব্রাহ্ম মতাবলম্বীদের আক্রমণ ইন্দ্রনাথের

অনুদার চিন্তাধারার পরিচায়ক। অবশ্য ব্যঙ্গশিল্পীর পক্ষে রক্ষণশীলতার প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন একটি সাধারণ ঘটনা। কোন সমালোচক বলেছেন,

The satirist, it is true, claims to be conservative, to be using his art to shore up the foundations of the established order ; and in so far as one can place satirist politically I suspect that a large majority are what would be called conservative.[১০]

ইন্দ্রনাথকে সেদিক থেকে খুব বেশী দোষ দেওয়া যায় না। ব্যঙ্গশিল্পীর প্রবণতাই তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রকেও এ ধরণের অভিযোগ করা হয়, তাঁর ব্রাহ্মমতের প্রতি উপেক্ষাপ্রদর্শন কিংবা বিধবাবিবাহের প্রতি আস্থার অভাব ছিল বলে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রক্ষণশীলতার মধ্যেও বিচারবুদ্ধি বা যুক্তিহীনতার অভাব ছিল না। বস্তুতঃ ইন্দ্রনাথ যেখানে নিছক satirist বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে জীবনশিল্পী। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গাত্মক রচনার গঠনাত্মক ভঙ্গি আমাদের মুগ্ধ করে। বাঙ্গালীর জাতীয়চরিত্র শোধনের যে প্রচেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার সম্পদ—ইন্দ্রনাথও তারই দ্বারা প্রভাবিত।

ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গরচনা সম্পর্কে শ্রীপাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটি তাঁর রচনার মূল্য নির্ণয়ে সহায়তা করবে,

"ইন্দ্রনাথের শ্লেষ ব্যঙ্গ উদ্দেশ্য শূন্য ছিল না। কেবল হাসাইবার জন্য তিনি হাসাইতেন না। তাঁহার হাসির নিম্নস্তরে হতাশার দীর্ঘশ্বাস যেন ফুটিয়া উঠিত।...... দেশের দুঃখ ও সমাজের অধোগতি দেখিয়া রোদনে কুলাইত না বলিয়াই তিনি হাসিতেন। [ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি রচনাবলী]

ইন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের পরিচয় অনুসন্ধানের জন্য তাঁর লেখা 'ভারতউদ্ধার কাব্য' ও 'ক্ষুদিরাম' গালগল্পের সাহায্য নিয়েছি। প্রবন্ধাকারে লেখা তাঁর বিপুল রচনা "পাঁচু ঠাকুর গ্রন্থাবলীতে"ও স্বদেশপ্রেমিক ইন্দ্রনাথকে সহজেই আবিষ্কার করা যায়। পাঁচুঠাকুর পর্যায়ের রচনাবলী তিনটি খণ্ডে [১৮৮৪—১৮৮৫] খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। প্রথমে 'সাধারণী' পত্রিকায় ও পরে 'পঞ্চানন্দ' পত্রিকায় প্রকাশিত এই রচনাবলী ইন্দ্রনাথের সমগ্র সৃষ্টির একটি বৃহৎ অংশ। এই প্রবন্ধ সমষ্টিতে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অবলম্বনে ইন্দ্রনাথ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আলোচনা করেছেন।

পাঁচু ঠাকুরের রচনার উদ্দেশ্যটিও বর্ণিত হয়েছে মুখপাতে—"রহস্য এবং রসিকতা এক পদার্থ নহে। আমি সরস রহস্য লিখিতে পারিয়াছি কি না, বলিতে পারি না।

১০। Ibid. P-273.

কিন্তু শুধু রসিকতার অনুরোধে কিছু লিখি নাই, ইহা যেন পাঠক মহাশয়দের—এখন আবার বলিতে হয়—পাঠিকা মহাশয়াদের মনে থাকে। বাংলায় এখন হাসিবার কিম্বা হাসাইবার দিন আইসে নাই। তবুও যে লোকে হাসে সে আমার কপাল গুণে এবং হাসকদের বুদ্ধির অনুগ্রহে।"

নিছক রসিকতা শক্তিমান ব্যঙ্গশিল্পীর উদ্দেশ্য হতে পারে না। ইন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য মহৎ,—সুতরাং পাঁচু ঠাকুরের রচনামূল্য নির্ধারণের অন্যতম মানদণ্ড হবে লেখকের এই স্বীকারোক্তি। অবশ্য "পঞ্চানন্দ" পত্রিকার আবির্ভাব প্রসঙ্গে তিনি 'তামাসা নয়' প্রবন্ধে বলেছেন,—

'ষড়দর্শনের অভাব দূরীকরণ জন্য 'বঙ্গদর্শন', 'আর্য্যদর্শন', শ্যাম দেশোদ্ভব যমজ ভ্রাতার ন্যায় কিঞ্চিৎ অগ্রপশ্চাৎ ধরাতলে অবতীর্ণ হইলেন। এখন তাঁহাদেরও অন্তিম দশা—মুখব্যাদান করেন বটে, কিন্তু সে খাবি খাইবার জন্য—আর কি নীরব থাকিবার সময়? অতএব উঠ বন্ধুগণ উঠ। জাগ ভারতের হিতব্রত, জাগো।'

'পঞ্চানন্দ'কে 'বঙ্গদর্শন' কিম্বা 'আর্য্যদর্শনের' সমগোত্রীয় বলে দাবী করেছেন লেখক। হাস্যরস সৃজন ও পরোক্ষে সমাজসমালোচনা করে ইন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ রচনারই অনুশীলন করেছেন বলা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যাদর্শ ও স্বদেশপ্রেম ইন্দ্রনাথের রচনায় অনুসৃত হয়েছে। তবে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাকে প্রত্যক্ষ না হলেও পরোক্ষে সমালোচনা করেছেন ইন্দ্রনাথ।

প্রাচীনত্বের গর্বকে ইন্দ্রনাথ তীব্র ব্যঙ্গাকারে পরিবেশন করেছেন,—

"এখনকার ভারত, আর তখনকার ভারত! মনে করিলেই দীর্ঘ নিশ্বাস না ফেলে এমন একটি বীরও জুওলজিক্যাল গার্ডেনে নাই। এখন যে ভারত উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পাইতেছে না, সে কেবল সেই প্রাচীন দুঃখের স্মৃতি জন্য। এ কাদা চলাহয় বাটীর বাহির হওয়া দায়, সুতরাং ভারত কেমন করিয়া অগ্রসর হইবে?" [প্রাচীন বাণিজ্য]

প্রাচীনত্বের গর্ব নিয়ে স্ফীত হওয়াকেই চূড়ান্ত কর্তব্য বলে মনে করে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকাটা বিপজ্জনক। এই মোহও ভবিষ্যতের যথার্থ কর্তব্য নির্ণয়ে সাহায্য করবে না। দেশপ্রীতির নামে এই অকারণ ভাববিলাস সে যুগের বাঙ্গালীকে আরও নিষ্ক্রিয় করে তুলেছিল, ইন্দ্রনাথ তারই প্রতিবাদ করেছেন। এ ছাড়াও বক্তৃতার আধিক্যে ক্লান্তিবোধ করেছেন লেখক। কথার পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছিল সেযুগে, কিন্তু যথার্থ কাজের কোন উদ্যম দেখা যায়নি। বক্তৃতাপ্রিয় বাঙ্গালীর উপরেও আঘাত হেনেছেন লেখক,—

"কে বলিবে বক্তৃতা লাভজনক নয়? যে বাঙ্গালী, ইংরেজী ভাষায় বক্তৃতা করে,

অথচ "দেশের হিতের জন্য আমার জীবন ধারণ" কথায় বা ব্যবহারে এই ভাব প্রকাশ করে, সেই প্রকৃত সারগ্রাহী ব্যক্তি; দুর্লভ মানব জন্মে তাহার ন্যায় মানব ততোধিক সুদুর্লভ। যাহাকে বলিতেছি, সে আমার মনের ভাব জানিতে পারিল না, যাহার হইয়া বলিতেছি, সে আমার কথার বিন্দুবিসর্গও বুঝিতে পারিল না, বক্তৃতার ইহা অপেক্ষা বেশী বুজরুকী আর কি হইতে পারে বলো?"

ইন্দ্রনাথের দেশপ্রীতি এমনি আন্তরিক ও অকপট ছিল। দেশপ্রাণতা ইন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধের মূল্য বাড়িয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধের অন্যত্র ইংরেজ লিখিত ইতিহাসের প্রতি ইন্দ্রনাথের ব্যঙ্গোক্তি লক্ষণীয়,—

"ভারতবর্ষ পূর্ব পূর্বকালে নিতান্ত অসভ্য ছিল, একথায় যে বিশ্বাস করে না, সে ইংরাজী ইতিহাস পড়ে নাই। ইংলণ্ড তাহাকে সভ্য করিয়াছেন, ইহাও নিঃসংশয়।"— বঙ্কিমচন্দ্রও 'বিবিধ প্রবন্ধে' এ বিষয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

ভারতবাসীর বীরত্বের বিষয়ে ইন্দ্রনাথ উচ্চবাচ্য করেননি বটে কিন্তু ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে কাবুলীরা যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ খুব সুন্দরভাবে তা ব্যাখ্যা করেছেন। 'কাবুলস্থ সংবাদদাতার পত্র' প্রবন্ধটিতে ইন্দ্রনাথের রসিকতা সংবাদদাতার মন্তব্যের ওপরে; সংবাদদাতার পরামর্শ,—

"এমন করিয়া মরা অপেক্ষা যুদ্ধে ক্ষান্ত হইয়া ইংরাজের বশ্যতা স্বীকার করাই উচিত। তাহাতে সে অসভ্য মূর্খ আমাকে কতকগুলা কটুকাটব্য বলিয়া শেষে চিৎকার করিয়া উঠিল—কাবুল পরাধীন হইতে পারে, কিন্তু তাই বলিয়া কাবুলী কখনও হইবে না; যেমন মূর্খ তেমনি শাস্তি; পাষণ্ডের ফাঁসি হইল।"

ইন্দ্রনাথের রসিকতার সারার্থটি পরাধীন ভারতবাসীর চরিত্রে আরোপ করলেই মূল উদ্দেশ্য স্পষ্ট হবে। ইন্দ্রনাথ পরাধীন জাতির দাসমনোভাবের অনুকূলে মন্তব্য করেছেন বটে কিন্তু স্বদেশপ্রাণতার পরিচয় এ প্রবন্ধের শেষাংশে পাওয়া যাবে।

"সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, একটি স্বাধীন জাতিকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করা অন্যায় বলিয়া যে সকলে এত গোলযোগ করিতেছে, তাহাতে তোমার মত কি? আমি বলিলাম, যাহারা এমন কথা বলে তাহারা বোকা, ইংরেজের মত স্বাধীনতাপ্রিয় জাতি জগতে আর নাই, সুতরাং যেখানে স্বাধীনতা পাইবে, ছলে হউক, বলে হউক, কৌশলে হউক, তাহা আত্মসাৎ করিবার যত্ন করিবে, ইহাতে দোষ কি? বরং তাহা না করিলে স্বাধীনতাপ্রিয়তার প্রতি সন্দেহ জন্মিতে পারে।"

শাসক ইংরেজের প্রশংসায় পঞ্চানন্দ যখন উন্মুখ হয়ে ওঠেন,—তার অন্তর্নিহিত বক্তব্য তখন চিন্তাশীল, স্বদেশসচেতন বাঙ্গালীকে ভাবিয়ে তোলে। এখানেই ইন্দ্রনাথের সার্থকতা।

তীব্র সমাজসচেতনতা ও সাময়িকতার প্রতি কটাক্ষপাত ইন্দ্রনাথের স্বদেশচর্চার প্রধান অবলম্বন। 'নেটিব সিভিল সার্বিস' কিংবা 'শোকশেল' প্রবন্ধে ইন্দ্রনাথ সাময়িক অবস্থার সমালোচনা করেছেন। ইংরাজের কৃপাদত্ত অবস্থাটিতে অসহায় বাঙ্গালীর জীবন যে দুর্বিসহ হয়ে উঠেছিল—শিক্ষিত বাঙ্গালীরা সে বিষয়ে সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। 'নেটিভ সিবিল সার্বিস' প্রবন্ধে ইন্দ্রনাথের সমালোচনাটি হাস্যরসের আধারে স্থাপিত—"ইহাও নিয়ম করা যাইতেছে যে, সে সকল ব্যক্তি কালা হইয়া গৌরাঙ্গ প্রাপ্ত হইবেক, তাহারা 'নেটিব' রহিল অতএব দরবারে কিম্বা এজলাসে কিম্বা প্রকাশ্যস্থানে জুতা পায়ে দিয়া উপস্থিত হইতে পারিবেক না····· ইহাও নিয়ম হইতেছে যে, যে সামাজিক ব্যবহারে ইহারা কদাচ সাহেবদের সহিত না মিশ্রিত হয় বা হইবার উপক্রম বা চেষ্টা করে; ফলতঃ যদি ইহারা কালা আদমিদের সহিত সামাজিকতা করে, তাহা হইলে 'সিবিল সার্বিস' হইতে আকছর খারিজ করা যাইবেক।"

এমন বেদনাদায়ক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব অন্ততঃ স্বদেশপ্রেমী সাহিত্যিকের ছিল না, ইন্দ্রনাথের রচনাই তার প্রমাণ।

বাংলাভাষাপ্রীতি প্রথম যুগের রচনায় সুলভ হলেও ইন্দ্রনাথের যুগে বাংলাভাষার মর্যাদা কিছুমাত্র বাড়েনি। অবশ্য সংবাদপত্র লেখক ও সাহিত্যিকের কলমে বাংলা-ভাষা সমৃদ্ধ হলেও একশ্রেণীর ইংরেজীশিক্ষিত ব্যক্তি বাংলাভাষার প্রতি সর্বদাই উপেক্ষা প্রদর্শন করতেন। যে কোন স্বদেশপ্রাণ ব্যক্তির কাছে এ আচরণ নিন্দিত হবেই। বঙ্কিমচন্দ্র 'লোকরহস্যের' কয়েকটি প্রবন্ধে মাতৃভাষাপ্রীতি প্রদর্শন করেছেন। ইন্দ্রনাথও মাতৃভাষাপ্রেমিক। বাংলা ভাষার যোগ্য সমাদর প্রতিষ্ঠার জন্যই ইন্দ্রনাথ রসিকতা করে বাংলা ভাষার অযোগ্যতা প্রমাণ করেছেন। "বাংলা ভাষা উঠাইয়া দিতে আপত্তি আছে"—এই শিরোনামে প্রবন্ধটি রচনা করেই ইন্দ্রনাথ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। বাংলা ভাষার প্রতিদ্বন্দ্বী ভাষা হিসেবে ইংরেজীর সঙ্গে বাংলার তুলনা করেছেন ইন্দ্রনাথ, সর্বত্রই তিনি ইংরাজীর প্রশংসা করে বাংলার দোষ কীর্তন করেছেন। বলা বাহুল্য, অনুরাগের ভাষাটি বর্জন করে প্রবন্ধে তিনি যে রসসঞ্চার করেছেন ব্যঙ্গশিল্পীর পক্ষেই তা সম্ভব। ইন্দ্রনাথ বলেছেন,

"এখন যে কারণে বঙ্গবাসীর হিতের কথা হইলে, কোন একটা দরকারী কথা হইলেই ইংরাজীতে বাদ, প্রতিবাদ, বিতর্ক, বিতণ্ডা, বিচার, বক্তৃতা করা যায়, বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিলেও ত সে কারণের বিনাশ হইতেছে না। সাধারণ বাঙ্গালী যাহাতে না বুঝিতে পারে তাহাই ত উদ্দেশ্য, তা বাংলা উঠাইয়া দিলেই যে সকলেই ইংরাজীতে দখলীস্বত্ব বিশিষ্ট হইয়া উঠিবে, মারুন আর কাটুন এমন বিশ্বাস ত আমার

হয় না। লোকে এখনও বোঝে না, তখনও বুঝিবে না এমত স্থলে সামান্ত ব্যক্তিদের যৎসামান্ত ভাববিনিময়ের পথে কাটা দেওয়াটা কি খুব সুবিবেচনার কাজ হইবে ?”

[বাঙ্গালা ভাষা উঠাইয়া দিতে আপত্তি আছে]

শিক্ষিত ব্যক্তিদের ইংরেজীপ্রীতির সমালোচনাও করেছেন ইন্দ্রনাথ, শিক্ষিত সম্প্রদায়ের এই অশিক্ষিতসুলভ মনোভাবের কথাই বলেছেন ইন্দ্রনাথ,

‘যাহারা ধনবান, জ্ঞানবান, বিদ্যাবান, স্বদেশবৎসল, বাক্যস্বচ্ছল, তাঁহারা এখনও বাংলা শেখেন না, তখনও শিখিবেন না। সুতরাং তাহাদের কোন কষ্ট নাই। তবে জোর করিয়া ভাষাটি উঠাইয়া দিয়া কাজ কি ?

······কেহ কেহ বলেন যে বাংলায় শিখিবার কোনও কথা নাই, পড়িবার কোনও পুস্তক নাই, তবে এমন ভাষা থাকিতে দিব কেন ?’

এ জাতীয় প্রত্যক্ষ ব্যঙ্গ নিশ্চয়ই ইংরেজপ্রেমিক সম্প্রদায়ের চৈতন্য সম্পাদনে সক্ষম। ইন্দ্রনাথ মেকির শত্রু বলে প্রশংসিত হয়েছিলেন ; ব্যঙ্গশিল্পী কোন অসঙ্গত আচরণ ক্ষমা করেন না, ব্যঙ্গের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে তিনি তাদের চেতনা সম্পাদন করার চেষ্টা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গরচনায় আমরা ঠিক এজাতীয় আদর্শ লক্ষ্য করেছি। ইন্দ্রনাথ যে বঙ্কিম প্রভাবিত সে সত্য তাঁর রচনারীতি, বক্তব্য-পরিবেশনে বারবারই ধরা পড়েছে।

‘বর প্রার্থনা’ প্রবন্ধটিতে বাঙ্গালীর স্বার্থমগ্ন সুখের চিত্র অংকন করেছেন ইন্দ্রনাথ। এই জড়ত্ব ও নিশ্চেষ্টতার হাত থেকে জাতিকে উদ্ধার করতে চেয়েছিলেন বলেই খানিকটা কমলাকান্তী ঢংএ ইন্দ্রনাথ বলেছেন,

“তোতাপাখী যাহা পারে না, আমি তাহা করিয়াছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিগ্রস্ত হইয়াছি, ওকালতীর যোগ্য হইয়াছি, দয়াময়, আমাকে মোক্তারের ভগিনীপতি, জমিদারের ভাগিনেয়, আমলার শালিপতিভাই, কিম্বা হাকিমের জামাতা যাহা হউক একটা করিয়া দাও, আমি লোক ভুলাইয়া গ্রাসাচ্ছাদনের সংস্থান করিয়া লইব। দয়াময়, এখন যে তকৃমা অপেক্ষা সুখতলার মূল্য বেশী তাহাতে আমার দোষ কি ?

আমাকে দেশহিতৈষী করিয়া দাও, আমি যাহা ইচ্ছা বকিতে থাকিব, মাতৃভাষায় শ্রীমুখ কলুষিত করিব না, তোমার কোনও অনিষ্ট করিব না, আমাকে পাগলাগারদে পাঠাইয়া দিও না।”

এই প্রকাশ্য ব্যঙ্গে ইন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর মনোভাব যেভাবে ব্যক্ত করেছেন তা প্রায় তুলনারহিত। আত্মশক্তিহীনতা শিক্ষিত বাঙ্গালীর চরিত্রের সমস্ত সদ্গুণ বিনষ্ট করে তাকে একটি জড়জীবে পরিণত করেছিল। ইন্দ্রনাথ সমগ্র শিক্ষিত

বাঙ্গালীর উদ্দেশ্যেই এই বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেছেন। এই আঘাত যে সুফল প্রসব করেছিল স্বাধীনতা আন্দোলনে বাঙ্গালীই তা প্রমাণ করেছিল সেদিন।

ইন্দ্রনাথের সাময়িককালে সুরেন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রাণতা সমগ্র বঙ্গবাসীর মনপ্রাণ জয় করেছিল। সুরেন্দ্রনাথ যখন কারারুদ্ধ হলেন ইন্দ্রনাথ তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছেন ব্যঙ্গের আবরণে। বাঙ্গালীর কাপুরুষতার ইতিহাসে সুরেন্দ্রনাথের নির্ভীকতা উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। অতীত ইতিহাসের পটভূমিকায় সুরেন্দ্রনাথের কৃতিত্ব প্রচার করেছেন লেখক।—"যেদিন বেএক্তেয়ার খিলিজি সপ্তদশ অশ্বরোহীমাত্র সম্বল করিয়া, নীরবে নবদ্বীপ প্রবেশপূর্বক বঙ্গদেশ করতলস্থ করিল, সেদিন এত গোল না হইবারই কথা। কিন্তু পলাশীর যুদ্ধও ত শুনিয়াছি। [শুনিয়াছি, কেন না চক্ষু চাহিয়া কষ্ট স্বীকার করিয়া কোনো কিছু দেখা আমার অভ্যাস নহে; একটু কান লম্বা হইলেই যে কাজ হয়, তাহার জন্য চক্ষুর অপব্যয় করাটা আমাদের মত বিরাট বুদ্ধিমন্ত দেবজাতির লক্ষণ নহে।] পলাশীর যুদ্ধ শুনিয়াছি এত গোল ত হয় নাই।···

···আজি তবে কেন বাপু এমন? কথাটা কি, না, সুরেন্দ্র কারাসাৎ হইয়াছে। উত্তম হইয়াছে, তাহার এত গোল কেন?···আমি বেশ ছিলাম, সুরেন্দ্র জেলে গেল, আমাকে একেবারে মাটি করিয়া গেল। সামান্য নরলোকে সুরেন্দ্র, জেলে গিয়া বিশকোটি মানুষের বুকের উপর সিংহাসন পাতিয়া আমাকে টিটকারি করিতেছে।"

[সুরেন্দ্রায়ন]

বাঙ্গালীর গৌরব সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে লেখক নিজের তুলনা দিয়েছেন,—সুরেন্দ্রনাথের কারাবাসের মধ্যে তিনি যে সৌভাগ্যের মহিমা খুঁজে পেয়েছেন—অন্য যে কোন কৃতিত্বও তার কাছে ম্লান হয়ে গেছে। দেশের জন্য কারাবরণের গৌরব যারা অর্জন করতে পারেননি, ইন্দ্রনাথের ভাষায় তাদের সবই মাটি হয়ে গেছে। ইন্দ্রনাথ ঘোষণা করেছেন,—

"মাটি হইবেন না সুরেন্দ্রনাথের পরম পূজনীয়া জননী, আর মাটি হইবেন না আমাদের জননী জন্মভূমি। কারণ উভয়ই স্বর্গাদপি গরীয়সী।"

এভাবেই দেশের জন্য দুঃখ বরণের মহিমাকে প্রশংসা করে লেখক স্বদেশপ্রেমিকের চিত্তে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন।

স্বদেশের জন্য দুঃখবরণের মধ্যে তিনি যে মহিমা আবিষ্কার করেছেন, বক্তৃতাপ্রিয় স্বদেশপ্রেমিকের চেষ্টার মধ্যে তা তিনি খুঁজে পাননি। "মাথা নাই, বাকি সবই আছে"—প্রবন্ধে তিনি তাদের নিয়ে ব্যঙ্গ সৃষ্টি করেছেন,—

"ভারত মাতার জন্য চিন্তা, সে ত সহজ আগুন নয়। দিবানিশি ধূ ধূ করিয়া

জ্বলিতেছে।......তোমাদের চিন্তা আর তাঁহার চিন্তা অনেক তফাৎ। বিলাতে ভারতে, পশ্চিমে পূর্বে যত তফাৎ ততই, বরং তাহা হইতেও বেশী তফাৎ। তোমাদের চিন্তায় শরীর শুকায়, তত কাজ ফলে না। কিন্তু তাঁহার চিন্তায়? আর্য্য ধমনীর ভিতর দিয়া মহাবেগে আর্য্য শোণিত প্রবাহিত করিতে থাকে।...যখন বক্তৃতা রূপে কিম্বা সংবাদপত্রের প্রবন্ধমূর্ত্তিতে দেখা দেয়, তখনই আগ্নেয়গিরির উদ্গার,—একি সামান্য চিন্তা।"

ইন্দ্রনাথের এই মনোভাব তাঁর বহু প্রবন্ধেই প্রতিফলিত হয়েছে। দেশাত্মবোধের আবেগে অসংখ্য রচনার জন্ম হয়েছিল সেযুগে,—প্রাণহীন শুষ্ক দেশপ্রেমের সুলভ ও গতানুগতিক অনুশীলনের প্রতিক্রিয়া হয়নি বিন্দুমাত্র শুধু অসফল রচনায় সাহিত্যজগৎ ভারাক্রান্ত হয়েছে। বিশেষ করে যশলোভীর তৃষ্ণা যে সব আচরণে প্রতিফলিত,—ইন্দ্রনাথ তারই সমালোচনা করেছেন। দুর্ভিক্ষ [তিরস্কার] প্রবন্ধে ইন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন,—

"লিখিতে হইলেই লাটসাহেবকে গালাগালি দিতে হয়। তাহাতে শর্মা নারাজ। লাটকে যদি গালি দেওয়া না হয়, তাহা হইলে দেশশুদ্ধলোকের বিরুদ্ধাচরণ করা হয়, তবেই একদিকে রাম একদিকে রাবণ, কাহার মন রাখিতে গিয়া কাহার কোপে পড়ি?...আমি দেশহিতৈষী, পরোপকার উপজীবিকাধারী, ধার্মিক ব্যক্তি; যে কাজে একা আমার খোস নাম কিম্বা বাহাদুরি নাই, তাহাতে আমি কেন লিপ্ত হইব?"

কমলাকান্তের মত পাঁচু ঠাকুরও নিজেকে হাস্যাস্পদ করে অপরকে হাস্যরস বিতরণ করেছেন,—কিন্তু জাতীয় চরিত্রের লক্ষণীয় ত্রুটির সমালোচনাও করেছেন একই সঙ্গে।

পঞ্চানন্দের চরিত্র বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে পাঁচু ঠাকুর 'শ্রীশ্রী পঞ্চানন্দ' প্রবন্ধ রচনা করেছেন।

"আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পঞ্চানন্দ জগতে অদ্বিতীয় নামলব্ধ হইয়াও এই কুলপ্রথার অন্যথাচরণ করেন নাই। ধন্য ইহার স্বদেশভক্তি।

পরপদদলিত, সাতশত বৎসরের দাসত্বে জর্জরিত, দুঃখিনী ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াও ইনি মুহূর্তের জন্যও স্বীয় চিরাভ্যস্ত স্বাধীনতা হারান নাই।"

পঞ্চানন্দ নামধারী ইন্দ্রনাথ আত্মপরিচয়েও স্বদেশহিতৈষী বলেই চিহ্নিত করেছেন নিজেকে।

'পঞ্চানন্দের ডায়েরীতে' পঞ্চানন্দ নামধারী ইন্দ্রনাথ প্রশ্ন তুলেছেন,—

"অনেকে আমাদিগকে ভাষার শত্রু, জাতির শত্রু, মনে করিতে পারেন, করিয়া থাকেন এবং করিবেন, তাহা জানি। কিন্তু ভাষা কি? জাতি কি? ধর্ম কি?

নীতি কি? দেশ কি? কিছুই নহে। শুদ্ধ মায়া, অর্থাৎ রজ্জুতে সর্পভ্রম মাত্র।"

এখানে লেখক নিজেকে যথোচিত বিশেষণে ভূষিত করেছেন। দেশের দুর্নীতির সমালোচক ও যথার্থ দেশপ্রেমিক হয়েও ইন্দ্রনাথ যদি নিন্দিত হন,—তবে তার কারণ হবে সমগ্র দেশের স্বাস্থ্যরক্ষার দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। কিন্তু এ নিন্দাকে জয়মাল্য বলেই গ্রহণ করার সাহস ইন্দ্রনাথের ছিল। কারণ অপ্রতিহত গতিতে ও নতুন উদ্যমে তিনি লেখনী চালনা করেছিলেন একই ভঙ্গিতে, রচনারীতি পরিবর্তন করার চেষ্টামাত্রও করেননি। ব্যঙ্গশিল্পী ইন্দ্রনাথের অনবদ্য কবিতা "ভারত ভক্তের গানে"—ভণ্ড দেশহিতৈষীদের মুখোশ খুলে দেওয়ার চেষ্টা,—

আমি অনুরক্ত ভারত-ভক্ত
ভারত মাতার সুসন্তান।
[আমার] দাও তুলে নিশান।
বীরত্ব আমার যত,
মুখ ফুটে বোলবো কত,
ভারত উদ্ধারের ব্রত
নিয়ে, থাকি দিনমান।
শুধু রাত্রিকালে, ইয়ার পেলে,
গড়ের মাঠে সখের প্রাণ।
পোড়া ভারতের তরে
যখন আমায় শোকে ধরে,
ডেকে ডুকে সভা কোরে
ইংরেজীতে ছাড়ি তান।
ও ছার মাতৃভাষা, কর্মনাশা,
সভাস্থলে অপমান।"

উদ্ধৃত কবিতাটিতে ইন্দ্রনাথের বহু প্রবন্ধের সারাংশই ব্যক্ত হয়েছে। বক্তৃতাপ্রিয় স্বদেশী, মাতৃভাষানিন্দুক স্বদেশী, ভারতভক্তির উচ্ছ্বাসসর্বস্ব স্বদেশীকে আক্রমণ করতে চান ইন্দ্রনাথ। কিন্তু যথার্থ স্বদেশপ্রেমিকের জন্য সমস্ত শ্রদ্ধাটুকুই তিনি অর্পণ করেন, 'সুরেন্দ্রায়ন' তার প্রমাণ। সুরেন্দ্রনাথের কারাবাস ও বিচারের বিরুদ্ধে যে অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল ইন্দ্রনাথ একটি প্রবন্ধে তা ব্যক্ত করেছেন। এ জাতীয় প্রকাশ্য প্রতিবাদ সেযুগের রচনায় খুব সুলভ ছিল না। অবশ্য অন্যান্য রচনার ভঙ্গি এই প্রবন্ধে অনুসৃত হয়েছে। সুরেন্দ্রনাথের মত দেশভক্ত সন্তানের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেছেন। চতুর্দিকে কেবল নকলেরই প্রাবল্য কিন্তু

দু'একজন যে নির্ভীক ও দেশপ্রাণ ছিলেন, ইন্দ্রনাথের সান্ত্বনা সেটুকুই। 'কার্যকারণ তত্ত্ব' প্রবন্ধটিতে ইন্দ্রনাথের বিক্ষুব্ধ মনোভাবেরও পরিচয় স্পষ্ট হয়েছে। কার্য ও কারণ ব্যাখ্যা করেছেন তিনি,—

যেহেতু—	অতএব—
বিচারকের চক্ষে বর্ণভেদ ধর্মভেদ বা জাতিভেদ নাই, সকলেরই প্রতি এক বিচার, সমান বিচার হইয়া থাকে।	আদালতের অবজ্ঞা করা অপরাধে, টেলর ও ফেনিক সাহেবের সম্বন্ধে যে আদেশ হইয়াছিল, সুরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে সে না হইয়া অন্যরূপ হইল।
যেহেতু—	অতএব—
ভারতবর্ষে সাধারণের কোন একটা মত নাই, রাজনীতিঘটিত কথায় শ্রদ্ধা বা অনুরাগ নাই, স্বজাতীয়তার মূলে ভিন্ন ভিন্ন জাতি, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসীদের কোনও প্রকার একতা বা সমসংযোগ নাই।	সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড হওয়াতে হিন্দু ও মুসলমান, উড়ে পার্শি, পাঞ্জাবী ও আসামী সমস্বরে মনোবেদনা প্রকাশ করিতেছে। হাটে, মাঠে, সহরে, পাড়াগাঁয়ে সভা করিতেছে চাঁদা করিয়া টাকা তুলিতেছে ইত্যাদি।

পরাধীন জাতির অসহায় অবস্থার চিত্রটি ফুটিয়ে তোলাই ইন্দ্রনাথের উদ্দেশ্য ছিল। শাসকের হাতে শাসনদণ্ড থাকলে ন্যায় ও নীতির প্রচলিত মানদণ্ডে বিচার আশা করা যায় না—পরাধীনতার অভিশাপ এখানেই। ইন্দ্রনাথ সেই চেতনাটুকুই জাগাতে চান। বিচারব্যবস্থায় এ জাতীয় অবিচারের নিদর্শন শুধু একটি ক্ষেত্রেই নয়—প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যেতো। বিচারক বঙ্কিমচন্দ্রও এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমাদের। ইংরাজপ্রবর্তিত আদালতের আইনের অপপ্রয়োগ যে-কোন সচেতন মনকেই বিক্ষুব্ধ করে তুলবে। ইন্দ্রনাথের আলোচনা থেকে সেযুগের ধূমায়িত অসন্তোষের খানিকটা পরিচয় মিলবে। সেযুগের কবিতাতেও এই ধরণের বিক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট মনোভাবের পরিচয় আছে। ইংরেজ শাসকের প্রতি ইন্দ্রনাথের মনোভাব অন্যান্য প্রবন্ধেও ব্যক্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন,—

"ইংলণ্ডের রাজত্ব উপলক্ষে কোনও কথা বলিতে হইলে বৃটিশসিংহ বলিয়া তাহার উল্লেখ হয়, সিংহই ইংলণ্ডের রাজচিহ্ন। সকলে এ রূপকের সম্পূর্ণ ভাব গ্রহণ করিতে পারে না বলিয়া, বুঝাইয়া দিতে পঞ্চানন্দের বাসনা হইয়াছে। সিংহ পশুরাজ ও আর ইংলণ্ড যাহাদের উপর রাজত্ব করেন, তাহা[illegible] পশুরাজ হইলেও সিংহ নিজেও পশু, ইংলণ্ডের আচরণে ইংলণ্ডের আস্ফালনে, ইংলণ্ডের হুঙ্কারে ইহার প্রমাণ।"

এ জাতীয় ব্যঙ্গ দৃপ্তভঙ্গিতে প্রকাশ করেছেন ইন্দ্রনাথ। অবশ্য ব্যঙ্গশিল্পী যেমন নিজেকেও ব্যঙ্গের পাত্র করে তোলেন ইন্দ্রনাথও সে পথই অবলম্বন করেছেন। বৃটিশকে সিংহরূপে বর্ণনা করে নিজেদের পশুরূপে ব্যাখ্যা করতেও তার দ্বিধা নেই কিন্তু এই সরস ব্যাখ্যার মূলেও স্বদেশপ্রেমিক ইন্দ্রনাথের পরিচয়টিই দীপ্যমান।

ইন্দ্রনাথের গঠনমূলক আলোচনাও কিছু কিছু আছে। আত্মনির্ভরতা, স্বাবলম্বন, ব্যবসায়িক জ্ঞানঅর্জনের উপদেশ দিয়েছেন ইন্দ্রনাথ। প্রথম যুগের স্বদেশাত্মক রচনায় নিছক ভাবোচ্ছ্বাসের আধিক্য ঘটলেও ধীরে ধীরে এই স্বদেশচেতনাকে একটি সাংগঠনিক ভূমিতে স্থাপন করার চেষ্টা করেছেন উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের লেখকবৃন্দ। স্বদেশপ্রেম নিয়ে যাঁরা ব্যঙ্গ করেছেন তাঁরাই যথার্থ স্বদেশচর্চার পথটিও নির্দেশ করেছেন।

বস্তুতঃ স্বদেশপ্রেমের সার্থকতা একদিন সংগঠনের মাধ্যমেই আসবে, এ বিশ্বাস দৃঢ় হয়েছে কালক্রমে। 'পরকালের উপদেশ' প্রবন্ধটিতে ইন্দ্রনাথের উপদেশও অত্যন্ত মূল্যবান।

"ভ্রান্ত নর! আর কতকাল এ মোহ-জালে আচ্ছন্ন হইয়া, ইহকালের ইন্দ্রজালে বঞ্চিত হইয়া রহিবে? একবার ভাবিয়া দেখো, এ প্রকাণ্ড প্রশস্ত সংসারে তোমার কেহই নাই. তোমার কিছুই নাই।...ঐ যে দিব্যবস্ত্রে তোমার কলেবর আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছ তাহা তোমার নহে, মাঞ্চেষ্টারের। উহাতে তোমার শীত নিবারণ হইতেছে বটে, কিন্তু লজ্জা নিবারণ হইতেছে না। এখনই যদি মাঞ্চেষ্টারের কোপ হয় কিম্বা বিরক্তি জন্মে, এখনই যদি মাঞ্চেষ্টার তোমাকে বলে আর দিব না—তাহা হইলে তোমার গতি কি হইবে? এমন ক্ষণিকপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া থাকিও না। অবিনশ্বর আচ্ছাদনের উপায় করো।

...তুমি বিজাতীয় মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে চিরস্থায়িনী কীর্তি সম্পাদনের প্রলোভনে অচৈতন্য হইয়া রহিয়াছ, জাহাজে পেষ্টবোর্ড আমদানি করাইয়া তদ্বারা তোমার গ্রন্থের আবরণ দৃঢ় করিবার ভান করিতেছ—সত্য; কিন্তু ভ্রমান্ধ নর! এ সমুদয়ই ফক্কিকার।...ওকি করিতেছ? দেশলাই জ্বালিলে কি হইবে? ও আলোকে এ অন্ধকার দূরীভূত হইবার নহে। তাহার পর, তুমি যে দেশলাই জ্বালিতেছ তাহাও যে তোমার নহে। অজ্ঞান! একথা এখনও বুঝিতে পারিলে না?"

ইন্দ্রনাথের গভীর দেশচেতনার রূপটিই এখানে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। স্বাতন্ত্র্য অর্জন করতে গেলে স্বাবলম্বী হওয়া দরকার। জীবনযাপনের জন্য প্রতিমুহূর্তে পরনির্ভর হলে স্বাতন্ত্র্য অর্জনের কল্পনাটাই অবান্তর হয়ে দাঁড়ায়, ইন্দ্রনাথ সেই সত্যটিই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। হিন্দুমেলার উদ্যোক্তারা একযোগে ইতিপূর্বে এ জাতীয়

আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন,—প্রসঙ্গতঃ বলা যেতে পারে যে দেশলাই তৈরীর প্রচেষ্টাও চালিয়ে ছিলেন প্রথমে এঁরাই। রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতিতে' সে প্রসঙ্গে যে সরস বর্ণনা পাই সেটি উদ্ধার করলেই বোঝা যাবে বাণিজ্য করার পরিকল্পনাতেও ভাববিলাসের চেয়ে গুরুতর কিছু ছিল না, রবীন্দ্রনাথ দেশলাই তৈরীর পর্ব সম্বন্ধে বলেছেন,—

স্বদেশে দেশলাই প্রভৃতির কারখানা স্থাপন করা আমাদের সভার উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি ছিল।…অনেক পরীক্ষার পর বাক্স কয়েক দেশলাই তৈরি হইল। ভারত সন্তানদের উৎসাহের নিদর্শন বলিয়াই যে তাহারা মূল্যবান তাহা নহে—আমাদের এক বাক্সে যে খরচ পড়িতে লাগিল তাহাতে একটা পল্লীর সম্বৎসরের চুলা ধরানো চলিত। আরও একটু সামান্য অসুবিধা এই হইয়াছিল যে, নিকটে অগ্নিশিখা না থাকিলে তাহাদিগকে জ্বালাইয়া তোলা সহজ ছিল না। দেশের প্রতি জ্বলন্ত অনুরাগ যদি তাহাদের জ্বলনশীলতা বাড়াইতে পারিত, তবে আজ পর্য্যন্ত তাহারা বাজারে চলিত।"

ইন্দ্রনাথ যথার্থ স্বাবলম্বনের উপায় অনুসন্ধানের প্রেরণা দিয়েছিলেন। ভাবাত্মক উদ্যমের নিষ্ফল অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি নয়,—যথার্থ গঠনমূলক বাণিজ্য গড়ে তোলার উপদেশ দিয়েছিলেন তিনি। বাঙ্গালীর ব্যবসা বিমুখতা সেযুগের অগ্রগতির পথে প্রচণ্ড অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল।

ইন্দ্রনাথের সমগ্র সাহিত্য আলোচনার সুযোগ আমাদের নেই। হাস্যরসের ক্ষেত্রেও ইন্দ্রনাথের সাফল্যের সর্বাঙ্গীণ ইতিহাস আমাদের আলোচনায় অনুপস্থিত। কিন্তু দেশাত্মবোধ সম্বল করে ইন্দ্রনাথ ব্যঙ্গাকারে বক্তব্য পরিবেশনের যে আয়োজন করেছিলেন তার বিশ্লেষণ করলে ইন্দ্রনাথের গভীর স্বদেশপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। অধিকাংশ রচনাতেই তিনি ব্যঙ্গাকারে আঘাত হেনেছেন সমগ্র বাঙ্গালীসমাজকে। দেশাত্মবোধের নিন্দনীয় দিকটিই ছিল তার অবলম্বন,—সমালোচনার দ্বারা তাঁর এই ত্রুটি সংশোধনের চেষ্টাটি নিশ্চয় প্রশংসিত হবে। ব্যঙ্গশিল্পী হিসেবে তাঁর কিছু ত্রুটি থাকতে পারে,—কিন্তু দেশপ্রেমিক হিসেবে তাঁর প্রচেষ্টার একটি বিশেষ মূল্য স্বীকৃত হওয়া দরকার।

ব্যঙ্গ সাহিত্যিক ইন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছিল 'বঙ্গবাসী' সম্পাদক যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর [১৮৫৪—১৯০৫] ব্যঙ্গ রচনায়। ইন্দ্রনাথ ও যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিলেন। পাঁচুঠাকুর প্রবন্ধাবলী শেষের দিকে 'বঙ্গবাসী' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হোত। ইন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগেন্দ্রচন্দ্রের আদর্শগত সাধর্ম্য ছিল। রক্ষণশীলতা উভয়েরই সমগ্র আদর্শের মূলে বিরাজমান। ইন্দ্রনাথের দ্বারা সামগ্রিক

ভাবে প্রভাবিত হলেও যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় [illegible]নাথের সমপর্যায়ভুক্ত ছিল না। তাছাড়া স্বদেশপ্রেমাত্মক রচনায় ইন্দ্রনাথের যে গভীর চিন্তা, আন্তরিকতা ও সদিচ্ছার পরিচয় পাওয়া যায় যোগেন্দ্রচন্দ্রের রচনায় তা অনুপস্থিত। যে যুগের উদার আবহাওয়াতেও যোগেন্দ্রচন্দ্রের দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ প্রাচীন। কোনো কোনো রচনায় যোগেন্দ্রচন্দ্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের আঘাতে সামাজিক প্রগতিকে ধিক্কার দিয়েছেন। স্ত্রীশিক্ষার কোন উপযোগিতাই তিনি স্বীকার করেননি। স্ত্রীশিক্ষার কুফল প্রদর্শনের জন্য চারখণ্ডে তিনি একটি ব্যঙ্গকাহিনীই রচনা করেছিলেন।

ইন্দ্রনাথের আদর্শে দেশপ্রেমাত্মক কিছু রচনাও লিখেছিলেন যোগেন্দ্রচন্দ্র। ‘জন্মভূমি’ নামে একটি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করে ইনি [illegible] দেশপ্রেমিকের কর্তব্য পালন করেছেন। ‘জন্মভূমি’ পত্রিকার প্রথম ভাগের উদ্দেশ্য অংশটিতে যোগেন্দ্রচন্দ্র স্বদেশপ্রেমিকের মতই বলেছিলেন,—

“এই ভারতভূমিই মানব জীবন সফল করিবার ভূমি। কিন্তু যুগধর্মে ভারত এখন ঘোরঘুমে অভিভূত; বল নাই, কেবল শূন্য ভূমিখণ্ড পড়িয়া আছে। আজ কালবশে এই জন্মভূমি, —এই ভারতভূমি ইংরেজের করতলগত।

আমরা নিদ্রাতুর; দিশাহারা, ভূমিহারা। স্বধর্মরক্ষা করিতে আমরা আগাইয়া যাইতেছি। রাজাই ধর্মের রক্ষক। কিন্তু রাজা আমাদের নিজের নহে। রাজা ম্লেচ্ছ ইংরেজ; এ দুর্দিনেও এই সুখ—রাজা ম্লেচ্ছ হইলেও আমাদের ধর্মে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে হস্তক্ষেপ করিতে অভিলাষী নহেন। বিজিত জাতি এমন রাজা বহু পুণ্যে পাইয়া থাকে। ইংরেজ রাজা আছেন, রাজাই থাকুন, এই প্রার্থনা হিন্দুর ধর্মে যেন তিনি করক্ষেপ না করেন।

রাজা বিধর্মী, সুতরাং রাজা যখন ভ্রমক্রমে হিন্দুর সনাতন ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করিবার চেষ্টা করিবে, তখন আমরা উপদেশ দিব, সতর্ক করিয়া পথ দেখাইব। ইহাই আমাদের প্রধান ব্রত।”

এই দীর্ঘ উক্তির মধ্যে যোগেন্দ্রচন্দ্রের স্বদেশ সম্পর্কিত ধারণার একটি স্পষ্ট রূপ খুঁজে পাওয়া যাবে। ইন্দ্রনাথের পরবর্তী যুগের লেখক হয়েও যোগেন্দ্রচন্দ্র সে যুগের দেশাত্মবোধের প্রবণতাকেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। বস্তুতঃ পরাধীনতার সুতীব্র চেতনা বা বেদনা কোনটিই তাঁর রচনায় প্রকাশিত হয়নি। সমস্ত আন্দোলনের মধ্যে একটি তাৎপর্যই তিনি আবিষ্কার করেছিলেন তা হল—স্বধর্মরক্ষা। স্বধর্মরক্ষা ও স্বদেশপ্রীতির মধ্যে যে পার্থক্য রয়েছে যোগেন্দ্রচন্দ্র তা বুঝতে পারেননি। ইংরেজ রাজত্বে তিনি অসুখী নন—বরং খানিকটা আত্মসান্ত্বনাও লাভ করেন এই বলে যে, ‘এমন রাজা বহু পুণ্যে পাইয়া থাকে।’

তবু স্বদেশচর্চা করেছিলেন বলেই হিন্দুর সনাতন ধর্মরক্ষার জন্য তিনি সচেষ্ট মনোভাবের পরিচয় দিয়েছিলেন। ইন্দ্রনাথের মত দেশপ্রেমের গভীরতা হয়ত ছিল না কিন্তু যোগেন্দ্রচন্দ্র দেশসেবকের ভূমিকাপালনের জন্য যে সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন তাঁর রচনা পাঠে এ ধারণাটি স্পষ্ট হয়।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের তিন ভাগে লেখা 'বাঙ্গালী চরিত' [১৮৮৫-৮৬] গ্রন্থটিতে স্বদেশ-চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। এ গ্রন্থের পরিচয়দান কালে লেখক বলেছেন,—"সামাজিক বিষয়ে ছোট ছোট প্রবন্ধ"। ইন্দ্রনাথের পাঁচুঠাকুর প্রবন্ধাবলীতেই সামাজিক বিষয় অবলম্বনে ছোট ছোট প্রবন্ধ রচিত হয়েছিল। যোগেন্দ্রচন্দ্র সেই রীতিটিই অনুসরণ করেছিলেন। [illegible]নামকরণের সাহায্যে তিনি বিষয়টির আভাস দিয়েছিলেন। সে যুগের বাঙ্গালীর চরিত্র চিত্রণের প্রয়াস হিসেবেই গ্রন্থটিকে গণ্য করা যায়।

প্রথমেই দেখি এম. এ. পাশ একটি বঙ্গীয় যুবক চাকরীর চেষ্টায় রত। কিন্তু চাকরী সুলভ ছিল না সে যুগেও। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক চাকরী ছাড়া অন্য কোন জীবিকার সন্ধান জানত না।

এ গ্রন্থের অন্যতম একটি চরিত্র কার্তিকবাবু বি. এল পাশ করেও চাকরী পাননি বলে মৃত্যুবরণের চেষ্টা করেন। অবশ্য শিক্ষিত বঙ্গযুবক শেষ পর্যন্ত হৃদয়ঙ্গম করেছেন,

"বহু দর্শিতার দ্বারা জানিয়াছি, পরাধীনতা বড় কষ্ট। পরের তোষামোদ করিব না। স্বাধীন ব্যবসায় অবলম্বন করিব।"

এই উপলব্ধিটি যে লেখকের—তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। ইন্দ্রনাথের মত যোগেন্দ্রচন্দ্রও বক্তৃতাপ্রিয় বঙ্গযুবকের নিন্দা করেছেন নানাভাবে। 'কাল্পনিক স্বদেশানুরাগ' প্রবন্ধটিতে স্বদেশপ্রেমিকের আস্ফালনের চিত্র রচনা করেছেন,

"সেই গারিবল্ডীর অবতার, ওয়াশিংটনের প্রপৌত্র, কসথের মাসতুত ভাই, আরাবী পাশার সম্বন্ধী—তখন ম্লেচ্ছভাষায় চিৎকার করিতে লাগিলেন,—"কোন মূর্খ বলে, ভারত নির্জীব?—আমি যে বক্তৃতা দিয়া, ভারতকে সজীব করিয়া তুলিয়াছি!—বক্তৃতা বক্তৃতা, বক্তৃতা, অচিরে ভারত উদ্ধার হইবে। ভারতবাসি! ভয় নাই, আমি আছি, বক্তৃতা দিয়া তোমাদের সকল অভাব মোচন করিব;—বক্তৃতায় তোমাদের শত শত সহস্র সহস্র কলের জাহাজ সমুদ্রবক্ষে ভাসিয়া উঠিবে;"

এই জাতীয় বাক্‌পটুর সংখ্যাবৃদ্ধিতে আশাবৃদ্ধি হয় না, বরং একটা চরম নৈরাশ্যে পীড়িতবোধ করেন লেখক। যথার্থ স্বদেশপ্রেমিকের সঙ্গে এই শ্রেণীর বাক্‌সর্বস্ব ছদ্ম স্বদেশপ্রেমিকের পার্থক্যটি লেখক বোঝাতে চান আমাদের। যথার্থ ও প্রকৃত স্বদেশপ্রেমিক সম্বন্ধে লেখকের ধারণারও পরিচয় পাই আমরা এখানে—তিনি বলেন,

"স্বদেশানুরাগ বড় শক্ত পদার্থ। সহজে দেশের প্রতি মমতা জন্মে না—শিক্ষা চাই, সচরাচর একপুরুষে প্রকৃত দেশহিতৈষিতা জন্মে না। দুঃখ এই, আমাদের দেশে অনেক বিড়ালতপস্বী হইয়াছেন,—আগাছা জন্মিয়া জঙ্গলময় দেশকে আরও জঙ্গলময় করিতেছেন। স্বদেশের জন্য প্রাণ দিতে হয়, হৃদয়ের শোণিত দিতে হয়, স্বার্থত্যাগ করিতে হয়। আমাদের দেশের স্বদেশানুরাগী পুরুষের আত্মত্যাগ দূরে যাউক, দুই পয়সার জন্য কাতর। ম্যাটসিনি জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়া, সংসার সুখ ছাড়িয়া, অর্থলোভ দমন করিয়া কতকাল অন্ন কষ্টে থাকিয়া, স্বদেশের কার্যে ঘুরিয়াছিলেন। তেমনটি এখানে কে আছেন?"

যোগেন্দ্রচন্দ্র এই আশাবাদ শিক্ষিত বঙ্গযুবকের কাছেই পেশ করেছেন। স্বদেশপ্রেমের কোন আদর্শ যোগেন্দ্রচন্দ্রের ছিল না, তিনি স্বাধীনতা অর্জনের চিন্তাও করেননি, কিন্তু খাঁটি স্বদেশপ্রেমিক অনুসন্ধান করে ফিরেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র বা ইন্দ্রনাথ স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অভিলাষ ব্যক্ত করেন, যোগেন্দ্রচন্দ্র এ ব্যাপারে নীরব।

'ভারত মাতার শ্রাদ্ধ' শীর্ষক কবিতাকারে রচিত satire-টিতে যোগেন্দ্রচন্দ্র চরম আঘাত হেনেছেন। ভারতমাতার প্রেমে উন্মত্ত গয়ারাম চীৎকার করে কাঁদে,—

কাঁদে গয়ারাম, গুরু গভীর গর্জনে,
Awake, O! mother, arise, awake.

উত্তর না পেয়ে গয়ারাম ভাবে মাতার সম্ভবতঃ মৃত্যু ঘটেছে। বাংলা-ইংরেজীতে ব্যক্ত ভারতপ্রেমের এই নমুনাটি যোগেন্দ্রচন্দ্রের কল্পনার চূড়ান্ত শক্তি প্রকাশ করেছে। গয়ারাম ভারত মাতার মৃত্যু ঘটেছে এই সিদ্ধান্ত করার পর ভজহরি নামক অন্য একটি স্বদেশপ্রেমিকের বিস্মিত প্রশ্ন,

পুড়াবে কি মাতৃঅঙ্গ জাহ্নবীর কূলে?
ছি ছি ছি, ছি ছি ছি ধ্বনি করে গয়ারাম,
কি কহিলি, রে বর্ব্বর! বাঙ্গালী কুলের কালী
উনবিংশ শতাব্দীর এই শেষ ভাগ—
আলোকিত দেশ যত সভ্যতা আলোকে,
অসভ্যতা-পনা, এবে, দাহি দেহ! শুধু
দাহ নহে—গঙ্গা উপকূলে! Prejudice!
They name is Traitor! শুনিবে যখন,
ইংলণ্ডবাসী একথা; কাটি করি কালী
দিবে মুখে; ······গোর দিব মাকে, সার কথা এই।

এ জাতীয় হাস্যরসের দৃষ্টান্ত অন্যত্র নেই। স্বদেশীয়ানার বিকৃতিকে এমন সরস করে প্রকাশ করার কল্পনাটিতেও যোগেন্দ্রচন্দ্রের মৌলিকত্ব প্রকাশ পেয়েছে। বিদেশীয়ানার সম্পূর্ণ মোহ নিয়ে ভারতপ্রেম প্রকাশের হাস্যকর প্রবণতা সে যুগেই দেখা দিয়েছিল, যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রতিবাদ এদের বিরুদ্ধেই।

যোগেন্দ্রচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির আলোচনাকালেও এই সত্যটিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে প্রথম যুগের ব্যঙ্গরচনায় যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছে পরবর্তীকালের রচনায় তার অনুকরণ চেষ্টাটাই প্রকট। তাছাড়া মৌলিক সৃজনী প্রতিভার অভাব থাকলে মহাজনপন্থা অবলম্বনের স্বাভাবিক প্রবণতাকে এড়ানো যায় না। যোগেন্দ্রচন্দ্রের ব্যঙ্গ সম্পর্কে যে রক্ষণশীলতা ও অশ্লীলতার সমালোচনা হয়ে থাকে—তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক রচনা সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য হতে পারে না। স্বদেশপ্রেমিকের আন্তরিকতাটুকু না থাকলে ভণ্ড স্বদেশহিতৈষীর মুখোস খুলে দেওয়ার গতানুগতিক প্রচেষ্টাটুকুই বা করবেন কেন যোগেন্দ্রচন্দ্র? শুধু এদিক থেকেই তাঁর স্বদেশপ্রেমাত্মক রচনার কিছু মূল্য স্বীকার করতে হয়। যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন,

যোগেন্দ্রচন্দ্রের হৃদয় ছিল—তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তিনি দেখিয়াছিলেন, আমাদের ধর্মে ভেল, আমাদের কর্মে ভেল, আমাদের সমাজসংস্কারে ভেল, আমাদের সাহিত্য সাধনায় ভেল, আমাদের ব্যবসায়-বাণিজ্যে ভেল, আমাদের বিজ্ঞাপনে ভেল, আমাদের রাষ্ট্রনৈতিক আন্দোলনে ভেল, আমাদের দেশহিতৈষিণায় ভেল। তাই তিনি সাহিত্য গুরু ইন্দ্রনাথের ন্যায়, এই ভেল নিবারণের জন্য এই ভেল উড়াইবার পুড়াইবার তাড়াইবার ছাড়াইবার জন্য, সুতীব্র বিদ্রূপবাণ নিক্ষেপ করেন। এই চোখা চোখা শরে অনেক রকম ভণ্ডামি দেশ হইতে বিতাড়িত হইয়াছে; কিন্তু এখনও বোধ হয় অনেকগুলি ভেল মরিয়া না মরে। [সাহিত্য সাধক চরিতমালা থেকে উদ্ধৃত]

যোগেন্দ্রচন্দ্রের প্রাপ্য সম্মান তিনি পেয়েছেন এ রচনায়।

ইন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগেন্দ্রচন্দ্রের নাম ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত বলে উভয়ের রচনাগত আদর্শেরও মিল খুঁজে পাওয়া যায়। কিন্তু এ ছাড়াও কোনও কোনও লেখক বাংলাদেশের সামাজিক দুর্নীতির সমালোচনা করে কিছু কিছু ব্যঙ্গচিত্র রচনা করেছেন, প্রসঙ্গতঃ পরাধীনতার বেদনায় লেখকের দুঃখও প্রকাশ পেয়েছে। এ জাতীয় একটি গ্রন্থ হরিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রচিত 'বিচিত্র বঙ্গ চিত্র'

ব্যঙ্গ সাহিত্যের লক্ষণ এই গ্রন্থটিতে পরিস্ফুট। গ্রন্থের নাম ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে লেখক বলেছেন—

"সত্য ঘটনা অবলম্বন করিয়া ইহাতে বঙ্গসমাজের আভ্যন্তরিক কুসংস্কার ও

দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিগণের রীতিনীতি অতি বিচিত্ররূপে বিশদভাবে বিবর্ণীত হইয়াছে।" লেখক প্রগতির উপাসক ও উদারপন্থী, কিন্তু জাতীয় অধঃপতনের প্রসঙ্গ সমালোচনা করেছেন নির্ভীকভাবে। চাকুরীপ্রাণ বাঙ্গালীর সমালোচনা এখানেও কবিতাকারে ব্যক্ত করেছেন লেখক,—

"চাকরী চাকরী রবে, ফিরে দেশবাসী সবে, চাকরী যে কবে হবে,
গেল কত ঘুস।
কেহ চির উমেদার, চাকরী যুটে না আর, খাটনী হইল সার,
বৎসর একুশ॥"

লেখক এর মধ্যে দাস মনোভাবের পরিচয় পেয়েছেন। যে জাতি স্বাবলম্বী নয়, তারা স্বাধীনতা অর্জনে অক্ষম, একথা স্পষ্টভাবে বলেছেন লেখক,—

"এই ত আমাদের দেশের সভ্যতা অভিমানীদিগের মনের ভাব। কেবল বাহ্য চাকচিক্যতেই মুগ্ধ। যে দেশের ব্যক্তিরা পরের চাকর হওয়া শ্লাঘার বিষয় জ্ঞান করেন সে দেশ আর কোনো কালে উন্নত পদবীতে পদার্পণ করিবেক। ভ্রমেও ভাবেন না যে পরাধীনতার ন্যায় কষ্টকর বিষয় আর কিছুই নাই।"

লেখকের মনোভাবটি স্বদেশপ্রেমিকের। পরাধীনতার বেদনা কবিতাকারে প্রকাশ করেছেন তিনি,

ধিক ধিক শতধিক পরাধীনতায়।
এ দেশের জনগণ, মান্য করে তায়॥
স্বাধীনের শাক অন্ন, স্বাদু অতিশয়।
পরাধীনে পরমান্ন, মান্য কভু নয়।

কিন্তু পরাধীনতার এ অভিশাপটুকু অনুভব করা ছাড়া লেখকের স্বাধীনচেতনার অন্য কোন পরিচয় এ গ্রন্থে নেই। স্বদেশচেতনার চেয়ে সমাজচেতনাই লেখকের রচনার প্রেরণা দান করেছে। কিন্তু প্রসঙ্গতঃ স্বদেশপ্রেমের মনোভাবটিও ব্যক্ত করেছেন। সে যুগের সমাজতত্ত্বমূলক আলোচনা অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে, দেশাত্মবোধের প্রসঙ্গ সেখানে অবলীলাক্রমে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে। এ জাতীয় আরেকটি গ্রন্থে স্বদেশপ্রেমিকতার পরিচয় পাওয়া গেছে। গ্রন্থটির নাম 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়'—গ্রন্থকর্তা হরনাথ ভঞ্জ। বিখ্যাত পরলোকগত ব্যক্তিদের জবানিতে বাংলাদেশের অবস্থার পর্যালোচনা করেছেন লেখক। সুরলোকে গিয়েও বাংলার দুর্দশা তাঁরা বিস্মৃত হতে পারেননি। জীবিতকালে দেশসেবাই যাঁদের ব্রত ছিল লেখক তাঁদের বক্তব্যই পরিবেশন করেছেন। বিজ্ঞাপনে লেখকের দেশপ্রেমিকচিত্তের প্রতিফলন দেখতে পাই,

"অধুনাতনকালের বঙ্গসমাজে যে সকল মহাদোষ প্রবেশ করিয়াছে, তাহা দর্শন করিয়া মধ্যে মধ্যে মনে অতিশয় দুঃখের উদয় হয়। সেই দুঃখই আমাকে এই গ্রন্থ প্রকাশে প্রবৃত্ত করিয়াছে। বন্ধুভাবে সুমিষ্ট স্বরূপাখ্যান বর্ণনা, সেই দোষ সকল প্রতিকারের প্রধান উপায় মনে করিয়া গ্রন্থের সকল স্থানে আমি তাহা অবলম্বন করিতে চেষ্টা করিয়াছি।"

গ্রন্থটির পরিকল্পনাগত মৌলিকত্ব প্রথমেই চোখে পড়ে। মৃত মহাত্মাদের বঙ্গ সমালোচনায়ও স্বদেশপ্রীতি প্রকাশিত হয়েছে। দেশপ্রেমিক পরলোকে গিয়েও দেশচিন্তা বিসর্জন দিতে পারেননি। এঁরা বর্তমানের বেদনায় মর্মাহত। বিখ্যাত সাংবাদিক কাশীপ্রসাদ ঘোষ দুঃখ করেছেন,—

"নিদারুণ দুঃখের কথা কি কহিব, বাঙ্গালি বাবুরা বাঙ্গালীর সভাতে নিরবচ্ছিন্ন ইংরাজী বক্তৃতা করিয়া, মাতৃভাষার প্রতি অরুচির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। ......ইংরাজীর প্রাদুর্ভাব হইয়া বঙ্গীয় পুরুষেরা প্রায় সকলেই স্বজাতীয় ভাব বিসর্জন দিয়াছেন।"

ইংরাজীয়ানার প্রাদুর্ভাবে স্বজাতীয়ভাবের বিলুপ্তি ঘটেছে বলেই মৃত স্বদেশপ্রেমিক মহাত্মা আক্ষেপ করেছেন। বস্তুতঃ এ আক্ষেপ লেখকের। ইংরাজীয়ানার সমালোচনা সেযুগে স্বদেশপ্রেমিক সমালোচকের রচনায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। একই বিষয়ে আরও একজন মৃত মহাত্মার উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে এ গ্রন্থে। জাষ্টিস শম্ভুনাথ পণ্ডিতের মৃত আত্মা আক্ষেপ করেছেন,—

"ইংরাজী শিক্ষিতেরা আপনার পিতামহ ও মাতামহের নাম হঠাৎ বলিতে পারেন না। কিন্তু বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিনের সাত পুরুষের নাম চক্ষের নিমিষে উচ্চারণ করেন। ইংরাজী পুস্তক ও সমাচারপত্র স্তূপাকার পাঠ করিতে অরুচি জন্মে না, কিন্তু দুই চারি পংক্তি বাংলা পড়িতে মুখমণ্ডল বিকৃত ও সর্বাঙ্গ ঘর্মাক্ত হয়।" [ইংরাজী শিক্ষিত]

স্বদেশীয়ানার নিদর্শন জাতীয়ভাবের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনের দ্বারাই নির্ণীত হবে। স্বদেশসেবার প্রথম আবেগ জাতীয়তার প্রতি সত্যকারের প্রেমেই প্রকাশিত হয়, এ ধারণাটি লেখকের মনে বদ্ধমূল।

বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমিক রামগোপাল ঘোষের মৃত আত্মার উক্তি—"দাসত্ব এক প্রকার জীবন্মৃতের অবস্থা, তাহাতে লঘুতার একশেষ, এই দাসত্ব উপলক্ষে কত জ্ঞান বিমূঢ় প্রভুর সম্মুখে কৃতাঞ্জলি হইয়া কালক্ষেপ করিতে হয়, দাসত্বের ক্ষুদ্রত্ব বৃহত্ব নাই, সকল দাসই প্রভুর পদানত ;" [দাসত্ব]

যে কোন স্বদেশপ্রেমিকই স্বাধীন জীবনের প্রতি অনুরক্ত হবেন,—এটাই

স্বাভাবিক। বাঙ্গালীর দাসমনোভাব বিনষ্ট না হলে স্বাধীন জীবনের প্রতি আকাঙ্ক্ষাই জাগবে না—এজন্যই মৃত স্বদেশপ্রেমিক আক্ষেপ করেছেন।

এ গ্রন্থের সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় আলোচনাটি করেছেন সেযুগের খ্যাতনামা ব্যক্তি মৃত প্রসন্নকুমার ঠাকুরের আত্মা। জাতীয় ভাবানুরাগের আলোচনা কালে তিনি হিন্দুমেলার সমালোচনা করেছেন। হিন্দুমেলাই সেযুগের প্রথম জাতীয় মেলা,—কিন্তু বাহ্যিক আড়ম্বরই যদি এই মেলায় প্রধান হয়ে ওঠে তবে উদ্দেশ্য সফল হবে না—এই ছিল তাঁর অভিমত। তিনি বলেছেন,—

"স্বদেশানুরাগী সুধীর মহাশয়গণের যত্নে জাতীয় ভাবের উন্নতি সাধনার্থ জাতীয় সভা, জাতীয় বিদ্যালয়, জাতীয় সম্বাদপত্র, জাতীয় মেলা, ইত্যাদির সৃষ্টি হইয়াছে। সেই সকলের নাম জাতীয়, কিন্তু অদ্যাবধি তত্তাবতের কার্য্যের অনেকাংশে জাতীয় ভাব নিবিষ্ট হইবার কালবিলম্ব আছে।...স্থূলতঃ কি কি উপায়ে জাতীয়ভাব রক্ষা পায় ও নিন্দিত বিজাতীয় ভাব দূরীভূত হয়, সুযোগ্য বঙ্গলেখক কর্তৃক তাহার প্রবন্ধ নিচয়, বিরচিত হইয়া মেলা স্থানে পাঠ হয়। কেবল অসংখ্য স্বজাতি একত্র হইয়া এদিক ও ওদিক ছুটাছুটী, রৈ রৈ নিনাদ ও দুমদাম বোমা বাজিশব্দায়মান করিলে জাতীয় মেলার অভিসন্ধি সফল হইতে পারে না। যাহা হউক, ভরসা হয় ক্রমশঃ মেলার অধ্যক্ষ মহাশয়েরা মুমূর্ষু জাতীয়ভাবকে পুনরুদ্দীপন করিতে সক্ষম হইবেন। সংপ্রতি কি করিলে জাতীয় ভাবের শিক্ষা হয়, কাহাকে জাতীয় ভাব বলে অধ্যক্ষেরা অদ্যাপি তাহা নির্ণয় করিতে পারেন নাই।" [অনুরাগ তত্ত্ব]

এই আলোচনা থেকেই বোঝা যায় যে লেখক হিন্দুমেলার সাফল্য সম্বন্ধে সন্দিহান ছিলেন। জাতীয় ভাবের শিক্ষাগত সম্পূর্ণতা ঘটেনি বলেই বাহ্যিক আড়ম্বরই প্রাধান্য পেয়েছে হিন্দুমেলায়,—কিন্তু যথার্থ জাতীয় ভাবটি যে কী লেখক তা বলেননি।

এ গ্রন্থের 'প্রিন্সের আক্ষেপ' প্রবন্ধটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কালীপ্রসন্ন ও কিশোরী চাঁদ বর্বরস্থানে গমন করলে প্রিন্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। প্রিন্স দুঃখিত চিত্তে বললেন,—

"বঙ্গের উন্নতি হইতেছে,—বঙ্গের উন্নতি হইতেছে। এ উনবিংশ শতাব্দী, এ অদ্ভুত উন্নতির সময়। ইত্যাকার চীৎকার বহুদিনাবধি আকাশ ভেদ করিয়া সুরলোকেও উত্থিত হইতেছে। উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতি ইউরোপ খণ্ডে হইতেছে, বঙ্গের সহিত তাহার কোন সংস্রবই দেখিতে পাই না। আপনাদের নিকট বঙ্গের যৎকিঞ্চিৎ উন্নতির পরিচয় পাইলাম, তদ্‌ভিন্ন সকলেই ত তাহার অবনতির চিহ্ন, ভ্রান্ত ব্যক্তিরা যাহা উন্নতি বলিয়া মানিতেছেন, তাহা উন্নতি নহে।"

এ অংশে বাংলার অগ্রগতির ইতিহাসকে ইউরোপের অপ্রত্যাশিত অগ্রগতির সঙ্গে তুলনা করে লেখক হতাশ হয়েছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার জাতীয়জীবনে, সমাজজীবনে যে অপ্রত্যাশিত অগ্রগতি ঘটেছিল পরোক্ষভাবে লেখক তা স্বীকার করেছেন। প্রিন্সের জবানিতে বিষয়টি আক্ষেপে পরিণত হলেও হাস্যরসিক লেখকের পরিস্থিতি রচনার মৌলিকত্ব স্বীকার করতেই হয়।

'স্বরলোকে বঙ্গের পরিচয়' [২য় খণ্ডে]-এর বিজ্ঞাপনে পাশ্চাত্ত্য দেশের নব জাগরণের হেতু নির্ণয়কালে লেখক সমাজতত্ত্বমূলক রচনাকারদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা করে বলেছেন,—

"লণ্ডন নগরের বিখ্যাত লেখকেরা সমাজ সম্বন্ধে ঐরূপ বহু সংখ্যক পুস্তক লিখিয়া সমাজের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। অনেক ব্যক্তির অনুচিত রীতি পদ্ধতি দূরে প্রস্থান করিতেছে। আমারদিগের দেশে ঐরূপ পুস্তক উপকারী হইবে আশা করিয়া এই দ্বিতীয় খণ্ডেও সমস্ত স্বরূপ বিবরণ প্রকাশ ও সুচারু গদ্য পদ্য লেখক মহাত্মাগণকে যথাযোগ্য প্রশংসা করিতে ত্রুটি করি নাই, যাহাতে তাঁহাদিগের উৎসাহ বর্ধন হইতে পারে।"

'স্বরলোকে বঙ্গের পরিচয়' স্রষ্টার উদ্দেশ্যের সততাটি এই মন্তব্যে পরিস্ফুট হয়েছে। সামগ্রিক সামাজিক উন্নতিই লেখকের কাম্য। এবং এই জাতীয় আলোচনার দ্বারা কিছু লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটবে এমন আশাও পোষণ করতেন লেখক,—সুতরাং তাঁর যথাশক্তি প্রচেষ্টা হিসেবে এই আলোচনা গ্রন্থটির মূল্য স্বীকার করতেই হবে। দেশালোচনা ও সমাজসমালোচনার মূলে যে গভীর স্বদেশ ভাবনার প্রেরণা রয়েছে, সে কথাও স্মরণ রাখতে হবে।

শব্দসূচী